

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্রঃ নবম খণ্ড

সশস্ত্র সংগ্রাম (১)

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক :	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়- এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, সড়ক # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ Email: infor@paramabd.com
কপি রাইট :	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ :	জুন, ১৯৮৪ আবায়, ১৩৯১
পুনর্মুদ্রণ :	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ :	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রবন্ধ :	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর :	মেঃ আবুল হাসান হাক্কানী পাবলিশার্স এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬।

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE DOCUMENTS, VOL-9

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka- 1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax: (8802) 9662844
E-mail: info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Copyright : Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by : Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane-2, House # 1
Block # A, Sec. # 11, Mirpur, Dhaka- 1216

First Published : June, 1984
Reprint : December, 2003
Reprint : June, 2009

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : নবম খন্ড

সচিব

তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই “বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র”। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খণ্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদক বৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় “বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র” গ্রন্থমালা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

“বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র” গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় “বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র” গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘হাক্কানী পাবলিশার্স’কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাঙ্গিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, “বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র” গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯

তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : “বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)” পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদসাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র’ গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খণ্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুঃস্বাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আশ্রয় চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পাণ্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর দ্বয়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিসেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমৃদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদযাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দৃষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুর্লভ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খণ্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যসম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খণ্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথম খণ্ডঃ	পটভূমি (১০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খণ্ডঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খণ্ডঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খণ্ডঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খণ্ডঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খণ্ডঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খণ্ডঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খণ্ডঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খণ্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খণ্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খণ্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খণ্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খণ্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চতুর্দশ খণ্ডঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খণ্ডঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খণ্ডঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খন্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খন্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকরণ, এই ভূখন্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খন্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খন্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখন্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমা। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোঁগাড়া করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবে একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খন্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যা দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিগত ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট

ছয়

সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিন্তু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেকেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখাও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুস্ত্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

- ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
- ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
- ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
- ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
- ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গ্রহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দূরত্ব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুস্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষ সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তম্ভের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপারিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিদ্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডের দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘণ্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘণ্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অব্যাহত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরউদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকভাবে সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খন্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খন্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের আক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সংযোজন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সাবেক পরিচালক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিব কিছুকাল প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং এরপর পরিচালকের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল তবে তিনি চার খন্ডের মুদ্রিত রূপ দেখে যেতে পেরেছিলেন আর ছয় খন্ড মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র সংকলন ও মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন ছিলেন। ফলে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়নি। প্রামাণ্যকরণ কমিটির গঠন পূর্বানুরূপ থাকে এবং এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে এবং কর্মরত গবেষক ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সেগুলোর সম্পাদনা যুগপৎভাবে করতে হয়েছে বলে দলিল খণ্ডসমূহের ক্রম অনুযায়ী মুদ্রণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। কোন কোন খণ্ডের বিষয় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যপ্রাপ্তির বিলম্বই তার একমাত্র কারণ।

প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভূমিকাটি পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও অপরিবর্তিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সবগুলো দলিলখণ্ডের মধ্যে গুনগত ও পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খণ্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই দায়িত্ব পালনে আমরা সমর্থ হয়েছি বলে ভাবতে পারব।

কে এম মোহসীন

দলিল প্রসঙ্গঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (১)

সশস্ত্র সংগ্রামের দলিলপত্র তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘ নয় মাস স্থায়ী এই যুদ্ধের প্রকৃতি বিচার করে বিভাজনগুলি করা হয়েছে।

প্রথম ভাগে এসেছে প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ, যেহেতু মার্চ থেকে মে-জুন পর্যন্ত এর ধরন ছিল প্রতিরোধমূলক। দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে সংঘটিত যুদ্ধের ঘটনাবলী (মধ্য ডিসেম্বরে হানাদার বাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ পর্যন্ত)। তৃতীয় ভাগে রয়েছে সরকারী দলিলপত্রের সংকলন।

বর্তমান খণ্ড সশস্ত্র সংগ্রাম (১) প্রাণীত হয়েছে প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধে ঘটনাবলী নিয়ে। প্রতিরোধ যুদ্ধ যেহেতু ছিল সারাদেশে বিস্তৃত, সেহেতু এ সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ জেলাওয়ারীভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

মার্চ মাসের ব্যাপক গণ-অসহযোগের মূল কেন্দ্র ঢাকায় হানাদার বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ এবং সশস্ত্র বাঙালী সেনা ইউনিটগুলিকে নিরস্ত্রকরণ ও বাঙালী সেনা নিধন, ছাত্রাবাস আক্রমণ, বুদ্ধিজীবী ও নিরস্ত্র জনগণকে অবাধে হত্যার (পৃঃ ৫-৬, ৬-৭, ১১-১৩, ১৪-১৯, ৩২-৪১) তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দেশের সর্বত্র সশস্ত্র বাঙালী ইউনিটসমূহ- ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর (বর্তমানে বি-ডি-আর), পুলিশ প্রভৃতি রুখে দাঁড়ায়। যেসব স্থানে এসব সশস্ত্র ইউনিট অবস্থান করছিল সেসব স্থানে ব্যাপক গণ-অসহযোগের পটভূমিতে তাদের এই তাৎপর্যতা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দৃঢ় সক্রিয় সমর্থনে প্রবল প্রতিরোধ যুদ্ধে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে তা বিজয় অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে।

প্রাথমিকভাবে এ যুদ্ধ ছিল অসংগঠিত, উপস্থিত স্থানীয় নেতৃত্বনির্ভর এবং অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত একটি প্রবল শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র জনতার আত্মরক্ষার মরিয়া প্রয়াস-সজ্জাত এক অসম লড়াই। অনিবার্যরূপে এ ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের এক খণ্ডিত পর্যায়। এ যুদ্ধে প্রতিরোধী শক্তির প্রাথমিক পরাজয় ঘটা সত্ত্বেও তাদের ত্যাগ, বীরত্ব ও অসমসাহসিকতার অত্যাশ্চর্য নিদর্শনাবলী গভীর প্রেরণার উৎস ছিল। এ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বিন্যাস দেশের তৎকালীন প্রশাসনিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মূল কেন্দ্র ঢাকা থেকে শুরু করা হয়েছে এবং পরে পৃথক পৃথক শিরোনামে প্রত্যেক জেলার ঘটনা পরপর তুলে ধরা হয়েছে। এ বিন্যাসে দেশের তৎকালীন ক্যান্টনমেন্টগুলিতে অবস্থানরত ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টগুলির বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন, যেমন ১ম বেংগল, ২য় বেংগল, ৩য় বেংগল, ৪র্থ বেংগল ও ৮ম বেংগলের ভূমিকা এবং তাদের অফিসারদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার কথা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে আধাসামরিক বাহিনী ই-পি-আর উইংগুলির সময়োচিত নেতৃত্বদ, ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে একীভূত বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের বিবরণ। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ যুদ্ধকে সুসংহত করার লক্ষ্যে মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং তৎকালীন কর্নেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক করে মুক্তিবাহিনী গঠনের বিষয়ও বিবরণে এসেছে (পৃঃ ১২৪, ২৪৫-২৪৭, ২৫৮-২৬১)।

প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ সংবলিত দলিলপত্র সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করা মোটেও সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার বিবরণ রাখতে সমর্থ হননি। এ বিষয়ে তাই স্বাধীনতা যুদ্ধের উত্তরকালে এ যুদ্ধের সাথে জড়িত বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্বদে সাক্ষাৎকারসমূহের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে মুখ্যভাবে। এছাড়া সমসময়ে প্রণীত ‘প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ’ এ ব্যাপারে মূল্যবান আকর গ্রন্থ রূপে কাজ করেছে। পরবর্তীতে রচিত আরও কিছু গ্রন্থ, যেমন ‘লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে’, ‘মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস’ প্রভৃতি তথ্য ও সত্যে প্রতিরোধ যুদ্ধকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে (পৃঃ ৪৬-৪৯, ৫৭-৮৯, ২৬১)। পত্র-পত্রিকার বিবরণও সশস্ত্র প্রতিরোধের পরিস্থিতিতে তুলে ধরতে

অনেকখানি সাহায্য করেছে (পৃঃ ৩৮৬-৪৪৮)। সমগ্র দেশ দখলদার বাহিনী কবলিত থাকায় এ ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী মিত্ররাষ্ট্র ভারতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা থেকেই সাহায্য নেওয়া হয়েছে বেশী। মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত দু'একটি পত্রিকার খবরও নেওয়া হয়েছে (পৃঃ ৩৮৬, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৪৬, ৪৪৮)। তবে বেংগল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর-এর অধিনায়ক পর্যায়ে মূল ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত সাক্ষাৎকারগুলিই এ খণ্ডের সারবস্তুরূপে কাজ করেছে।

সাক্ষাৎকারগুলির অধিকাংশ গৃহীত হয়েছিল বাংলা একাডেমীর অঙ্গীভূত জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস পরিষদের উদ্যোগে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, মেজর জেনারেল (অবঃ) কে. এম. শফিউল্লাহর সাক্ষাৎকার দু'টিসহ (পৃঃ ৯৬-১২৮, ১৬০-১৮৪) বেশ কয়েকটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার বাংলা একাডেমীর গবেষক সুকুমার বিশ্বাস ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সংগৃহীত সাক্ষাৎকারগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিরোধের বিবরণপূর্ণ প্রথমার্ধ সশস্ত্র সংগ্রাম (১)-এ এবং প্রতিরোধের পর কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে বিভিন্ন সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ সাধারণতঃ সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয়াংশে এসেছে। যেখান থেকে প্রতিরোধ পরবর্তী সংগঠিত যুদ্ধের কথা শুরু হয়েছে, সেখানকার অংশগুলি যশস্ত্র সংগ্রাম (২)-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিরোধ ও সংগঠিত প্রত্যাঘাত পর্বের যুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থের সবশেষে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কতিপয় গেরিলা বা গণবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিবরণ (পৃঃ ৪৫০-৪৯৫)। প্রাথমিক পর্বে প্রতিপক্ষের উন্নততর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মুখে প্রাথাগত পদ্ধতির সম্মুখযুদ্ধমূলক প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে যুদ্ধ ক্রমশঃ গেরিলা রণকৌশলের দিকে মোড় নেয়। এই অবস্থায় নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধের কৌশল হিসাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। অনেক স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয় অবস্থার ওপর ভিত্তি করেও অনেক গেরিলা দলের সৃষ্টি হয়। তাদের ক্ষিপ্ত তৎপরতা, সাহস ও আত্মত্যাগ স্বাধীনতা যুদ্ধকে সাফল্যজনক যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছাতে বিপুলভাবে সহায়তা করেছিল। গেরিলা বাহিনীগুলির কর্মকান্ড বাংলাদেশের গোটা রণাঙ্গন জুড়ে এতই ব্যাপক ও বিচিত্র ছিল যে, তা স্বতন্ত্র খণ্ডে সন্নিবেশিত হওয়ার দাবী রাখে। কিন্তু এ ব্যাপারে তথ্যের নিদারুণ স্বল্পতার কারণে (যেহেতু গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের দৈনন্দিন তৎপরতার লিখিত বিবরণ বেশি পাওয়া যায়নি) তাদের মাত্র কয়েকটি বাহিনীর তৎপরতাসমূহের প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র এখানে তুলে ধরা সম্ভবপর হয়েছে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

আবদুস সোবহান

উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/231

Dated: 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1. Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2. Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3. Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4. Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5. Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6. Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7. Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8. Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

- To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.
- To determine validity and price of document are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25)

Dated: 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members:

1. Dr. Mafizullah Kabir	Chairman
Pro-Vice Chancellor, Dacca University	
2. Professor Salahuddin Ahmed	Member
Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	
3. Dr. Anisuzzaman	Member
Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	
4. Dr. Safar Ali Akanda	Member
Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	
5. Dr. Enamul Huq	Member
Director, Dacca Museum.	
6. Dr. K. M. Mohsin	Member
Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	
7. Dr. Shamsul Huda Harun	Member
Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	
8. Dr. K. M. Karim	Member
Director, National Library and Archives, Dacca	
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman	Member-
O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project	Secretary
2. The following shall be the terms of reference of the Committee:	
To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.	
To determine validity and price of document are required for the committee.	

M.A. Salam Khan
Section Officer

পরিশিষ্ট
তিন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

নং-তম/২/৮০/ইতিহাস (অংশ) ১২২৮৬

তাং ১১-০৯-৮৩ ইং

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কে, এম, মোহসীনকে তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ “বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রন প্রকল্পের” প্রকল্প পরিচালক পদে জনস্বার্থে ৬-৯-১৯৮৩ (পূর্বাহ্ন) তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৮৪ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত শর্তাধীনে নিয়োগ করা হইল।

... ..

স্বাক্ষর-
মোঃ শফিকুর রহমান
উপ-সচিব।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ঢাকা	
১।	ঢাকার সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণঃ	... ১-২৭
	সাক্ষাৎকার ঃ লেঃ কর্নেল আবু তাহের সালাহউদ্দিন	... ১
	সাক্ষাৎকার ঃ এয়ার কমোডর এম, কে বাশার	... ৯
	সাক্ষাৎকার ঃ আব্দুল করিম খোন্দকার, ডেপুটি চীফ অব স্টাফ, বাংলাদেশ ফোর্সেস	... ১০
	সাক্ষাৎকার ঃ মেজর দেলোয়ার হোসেন	... ১২
	সাক্ষাৎকার ঃ আশরাফ আলী সরদার	... ১৩
	সাক্ষাৎকার ঃ মোঃ আসমত আলী আকন্দ, এস-আই, পুলিশ	... ১৪
	সাক্ষাৎকার ঃ আঃ গনি তালুকদার (পুলিশ)	... ১৫
	সাক্ষাৎকার ঃ শরীফ খান মোহাম্মদ আলী, এস-আই, পুলিশ	... ১৬
	সাক্ষাৎকার ঃ মোহাম্মদ আঃ সোবহান, এস-আই, রিজার্ভ পুলিশ	... ১৯
	সাক্ষাৎকার ঃ লেঃ (অবঃ) আনোয়ার হোসেন	... ২১
	প্রতিবেদন ঃ সত্যেন সেন	... ২২
	সশস্ত্র প্রতিরোধঃ চট্টগ্রাম	
২।	চট্টগ্রামের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণঃ	... ২৮-৯৫
	সাক্ষাৎকার ঃ লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান	... ২৮
	সাক্ষাৎকার ঃ মেজর এনামুল হক চৌধুরী	... ৩২
	সাক্ষাৎকার ঃ ক্যাপ্টেন শমসের মুবিন চৌধুরী	... ৪১
	সাক্ষাৎকার ঃ ব্রিগেডিয়ার হারুন আহমেদ চৌধুরী	... ৪৪
	সাক্ষাৎকার ঃ মেজর এম, এস, এ, ভূঁইয়া	... ৪৬
	সাক্ষাৎকার ঃ লেঃ কর্নেল মাহফুজুর রহমান	... ৫১
	সাক্ষাৎকার ঃ মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম	... ৫৯
	সাক্ষাৎকার ঃ লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী	... ৮৮
	সশস্ত্র প্রতিরোধঃ কুমিল্লা- নোয়াখালী- ঢাকা	
৩।	৪র্থ বেঙ্গল ও অন্যান্য বাহিনীর কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ঢাকা জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধঃ	... ৯৬-১৫৮

আঠার

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাক্ষাৎকার	ঃ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ...	৯৬
সাক্ষাৎকার	ঃ লেঃ কর্নেল শাফায়াত জামিল ...	১২৮
সাক্ষাৎকার	ঃ মেজর আবদুল গাফফার ...	১৩৪
সাক্ষাৎকার	ঃ মেজল আইনউদ্দিন ...	১৩৭
সাক্ষাৎকার	ঃ মেজর ইমামুজ্জান ...	১৪১
সাক্ষাৎকার	ঃ সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান ...	১৪২
সাক্ষাৎকার	ঃ সুবেদার সৈয়দ গোলাম আশ্বিয়া ...	১৪৮
প্রতিবেদন	ঃ সত্যেন সেন ...	১৪৯

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ঢাকা- ময়মনসিংহ- টাঙ্গাইল

৪।	সশস্ত্র প্রতিরোধে ২য় বেঙ্গল ও অন্যান্য বাহিনীঃ ...	১৬০-২১১
সাক্ষাৎকার	ঃ মেজর-জেনারেল (অবঃ) কে, এম, শফিউল্লাহ ...	১৬০
সাক্ষাৎকার	ঃ ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মোরশেদ খান ...	১৯৬
সাক্ষাৎকার	ঃ মেজর এম, এ, মতিন ...	১৯৯
সাক্ষাৎকার	ঃ সিপাই আবতাব হোসেন ...	২০১
সাক্ষাৎকার	ঃ মেজর এম, এস, এ, ভূঁইয়া ...	২০৪
সাক্ষাৎকার	ঃ ব্রিগেডিয়ার মোঃ মতিউর রহমান ...	২০৬
প্রতিবেদন	ঃ সত্যেন সেন ...	২০৯

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ময়মনসিংহ

৫।	ময়মনসিংহ ও অন্যান্য এলাকায় সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ...	২১২-২২০
সাক্ষাৎকার	ঃ সুবেদার এ, কে, এম, ফরিদউদ্দিন আহমদ ...	২১২
সাক্ষাৎকার	ঃ সুবেদার মেজর জিয়াউল হক ...	২১৬
প্রতিবেদন	ঃ সত্যেন সেন ...	২১৮

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ সিলেট

৬।	সিলেট অঞ্চলে সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণঃ ...	২২১-২২৩
সাক্ষাৎকার	ঃ ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত ...	২২১
ডায়েরী	ঃ লেঃ কর্নেল আবদুর রব ...	২২৮
সাক্ষাৎকার	ঃ ল্যান্স নায়েক সোনা মিয়া ...	২৩০
প্রতিবেদন	ঃ সিপাই শফিক আহমেদ ...	২৩১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সশস্ত্র প্রতিরোধঃ কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা	
৭।	কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গার সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধঃ	২৩৪-২৬২
	সাক্ষাৎকার ঃঃ লেঃ কর্নেল এম. এ, ওসমান চৌধুরী	২৩৪
	সাক্ষাৎকার ঃঃ মেজর এ, আর. আজম চৌধুরী	২৪৭
	সাক্ষাৎকার ঃঃ মোহাম্মদ তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী	২৫০
	প্রতিবেদন ঃঃ মেজর (অবঃ) রফিক-উল- ইসলাম	২৬০
	সশস্ত্র প্রতিরোধঃ যশোর	
৮।	যশোর-নড়াইল-গোপালগঞ্জের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ	২৬৩-২৭৮
	সাক্ষাৎকার ঃঃ মেজর আবদুল হালিম	২৬৩
	সাক্ষাৎকার ঃঃ ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন আহসদ	২৬৫
	প্রতিবেদন ঃঃ সত্যেন সেন	২৬৮
	সশস্ত্র প্রতিরোধঃ রংপুর- দিনাজপুর	
৯।	রংপুর- দিনাজপুর জেলার সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণঃ	২৭৯-২৮৯
	সাক্ষাৎকার ঃঃ মেজর মোঃ আনোয়ার হোসেন	২৭৯
	সাক্ষাৎকার ঃঃ লেঃ মোঃ আবদুস সালাম	২৮২
	সাক্ষাৎকার ঃঃ সুবেদার মোঃ আবদুল খালেক	২৮৩
	সাক্ষাৎকার ঃঃ হাবিলদার জয়নাল আবেদীন	২৮৭
	সাক্ষাৎকার ঃঃ মোঃ নুরুজ্জামান	২৮৮
১০।	দিনাজপুর- ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধঃ	২৯০-৩২০
	সাক্ষাৎকার ঃঃ সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দীন	২৯০
	সাক্ষাৎকার ঃঃ নায়ক সুবেদার মোঃ আনসার আলী	২৯৯
	সাক্ষাৎকার ঃঃ সুবেদার আরব আলী	৩০০
	সাক্ষাৎকার ঃঃ হাবিলদার বাসারতউল্লাহ	৩০২
	সাক্ষাৎকার ঃঃ সুবেদার আহম্মদ হোসেন	৩০৩
	সাক্ষাৎকার ঃঃ নায়ক সুবেদার আবু তালেব শিকদার	৩০৬
	সাক্ষাৎকার ঃঃ খন্দকার আবদুস সামাদ	৩০৭
	প্রতিবেদন ঃঃ সত্যেন সেন	৩০৮
	সাক্ষাৎকার ঃঃ সুবেদার মেজর এ, রব (ডি- এ- ডি)	৩০৯

বিশ

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
সশস্ত্র প্রতিরোধঃ রাজশাহী		
১১।	রাজশাহী জেলার সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধঃ	৩২১-৩৩৫
সাক্ষাৎকার	ঃ ব্রিগেডিয়ার গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী	৩২১
সাক্ষাৎকার	ঃ সুবেদার আলী মোঃ মকিবর রহমান সরকার	৩২৯
সাক্ষাৎকার	ঃ সুবেদার মোঃ মতিউর রহমান	৩৩০
সাক্ষাৎকার	ঃ হাবিলদার মোঃ ফসিউদ্দিন	৩৩২
প্রতিবেদন	ঃ 'দৈনিক বাংলা'	৩৩৪
সশস্ত্র প্রতিরোধঃ বগুড়া		
১২।	বগুড়ায় সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণঃ	৩৩৬-৩৪৭
প্রতিবেদন	ঃ সত্যেন সেন	৩৩৬
সাক্ষাৎকার	ঃ গাজীউল হক	৩৩৯
সশস্ত্র প্রতিরোধঃ পাবনা		
১৩।	পাবনা জেলায় সংঘটিত প্রতিরোধের বিবরণঃ	৩৪৮-৩৫৬
প্রতিবেদন	ঃ সত্যেন সেন	৩৪৮
সাক্ষাৎকার	ঃ মোজাফফর হোসেন	৩৫১
সাক্ষাৎকার	ঃ আবদুর রহমান, এম-পি	৩৫৩
প্রতিবেদন	ঃ মনজুর আহমদ	৩৫৫
সশস্ত্র প্রতিরোধঃ বরিশাল-খুলনা- ফরিদপুর		
১৪।	বরিশাল খুলনা- ফরিদপুর জেলার সশস্ত্র প্রতিরোধঃ	৩৫৭-৩৮৫
সাক্ষাৎকার	ঃ মেজর মেহেদী আলী ইমাম	৩৫৭
সাক্ষাৎকার	ঃ মহিউদ্দিন আহমদ, এমপি	৩৬১
সাক্ষাৎকার	ঃ আবদুল করিম সরদার, এম-পি	৩৬৪
সাক্ষাৎকার	ঃ ডাঃ মোহাম্মদ শাহজাহান	৩৬৪
প্রতিবেদন	ঃ সত্যেন সেন	৩৬৬
প্রতিবেদন	ঃ শহীদ সেরনিয়াবাত	৩৭৪
প্রতিবেদন	ঃ সত্যেন সেন	৩৭৫
সাক্ষাৎকার	ঃ মোমিনউদ্দিন আহমেদ, এম-পি	৩৮১

একুশ

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতিবেদন	ঃ শরীফ আফজাল হোসেন	৩৮১
প্রতিবেদন	ঃ অধ্যাপক আহমেদ কামাল	৩৮৩
	পত্র পত্রিকায় সশস্ত্র প্রতিরোধ	
১৫	পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণঃ	৩৮৬-৪৪৮
	সশস্ত্র সংগ্রামে গেরিলা বাহিনী	
১৬।	সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে গেরিলা বাহিনী গঠন ও যুদ্ধ তৎপরতার বিবরণ (কাদেও বাহিনী, আফসার ব্যাটালিয়ন, হেমায়েত বাহিনী ঢাকায় গেরিলা অপারেশন)	৪৪৯-১৯৫
সাক্ষাৎকার	ঃ কাদের সিদ্দিকী	৪৫০
প্রতিবেদন	ঃ হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ	৪৫১
প্রতিবেদন	ঃ মোহাম্মদ মোদাবেবর	৪৫৯
প্রতিবেদন	ঃ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান	৪৬৪
প্রতিবেদন	ঃ এম, এ, সামাদ	৪৭৫
সাক্ষাৎকার	ঃ মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়্যা	৪৭৮
সাক্ষাৎকার	ঃ এ, মাসুদ (চুলু)	৪৮০
সাক্ষাৎকার	ঃ আবদুস সামাদ	৪৮০
সাক্ষাৎকার	ঃ নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু	৪৮৬
প্রতিবেদন	ঃ শাহাদাত চৌধুরী	৪৯০
প্রতিবেদন	ঃ মোঃ জহিরুল হক	৪৯২
১।	নির্ঘণ্ট	৪৯৫
	বাংলা	...
	ইংরেজী	...

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ঢাকা

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১।	ঢাকার সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

ঢাকা সেনানিবাস ও শহরে যা ঘটেছিল
সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল আবু তাহের সালাহউদ্দীন*

অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে সকল ছোটখাটো গুপ্তগোল আরম্ভ হয় তাতে পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণরূপে আওয়ামী লীগের উপর দোষারোপ করে এবং এই দোষ দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সরকারের সহযোগিতায় ২৫শে মার্চ বাংলাদেশে সীমাহীন গণহত্যা চালায়। কিন্তু এই হত্যার পরিকল্পনা অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব থেকে পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর ছিল। তার কারণস্বরূপ-

যে কোন দেশে সেনাবাহিনীর সৈন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মোতায়েন করতে হলে তার মূল জায়গা অর্থাৎ যেখানে থেকে সৈন্য পাঠান হয় সেই জায়গায় প্রতিরক্ষার উপর প্রথম গুরুত্ব দিতে হয় এবং সেটা করতে পারলেই সেই জায়গা থেকে সরানোর আদেশ হয়। (এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পাকিস্তান সামরিক সরকার ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ থেকেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে থাকে। তাতেই প্রমাণ হয় যে পাকিস্তানী সামরিক সরকারের সুপরিকল্পনা ছিল)।

যেহেতু সীমান্ত এলাকায় শত্রুদেশের সৈন্যের সঙ্গে কোন ছোটখাট গোলাগুলি বিনিময় হয়নি বা দেশের জনসাধারণ ও খবরের কাগজে যুদ্ধের কোন হুমকির আভাসও পাওয়া যায়নি তথাপি পাকিস্তান সরকারের এরূপ সৈন্য মোতায়েনে (বিভিন্ন থানা পর্যায়ে) প্রমাণ হয় যে পাকিস্তানী সামরিক সরকার বাংলাদেশের জনসাধারণের উপর গণহত্যার পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই করেছিল।

১লা মার্চ, ৭১ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ জেনারেলগণ বিভিন্ন সময়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে সম্মেলন করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেনঃ

(১) লেঃ জেঃ টিক্কা খান, কমান্ডার ইন্টার্ন কমান্ড। (২) মেঃ জেঃ খাদেম হোসেন রাজা, জি-৩-সি, ১৪ ডিভিশন। (৩) জেনারেল অবদুল হামিদ খান, চীফ অব আর্মি স্টাফ। (৪) লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী, কোর কমান্ডার। (৫) মেঃ জেঃ আকবর হোসেন, ডাইরেক্ট জেনারেল, ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স। (৬) মেঃ জেঃ ওমর, চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিশন। (৭) মেঃ জেঃ কমর আলী মীর্জা, প্রাক্তন ডাইরেক্টর, মিলিটারী ইনটেলিজেন্স (তখন- ডাইরেক্টর সাপ্লাই এন্ড ট্রান্সপোর্ট। (৮) মেঃ জেঃ মিঠা খান, স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ কমান্ডার এন্ড কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল। (৯) মেঃ জেঃ খোদা দাদ, এডজুট্যান্ট জেনারেল। (১০) মেঃ জেঃ গুল হাসান, চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ। (১১) মেঃ জেঃ রাও ফরমান আলী খান, সিভিল এফেয়ার্স এডভাইজার, গভর্নমেন্ট অব ইস্ট পাকিস্তান। (১২) ব্রিগেডিয়ার আনসারী (মেঃ জেঃ আনসারী) (স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা), (পরে-জি-৩-সি, ৯-ডিভিশন)। (১৩) মেঃ জেঃ নজর হুসেন শাহ। (১৪) মেঃ জেঃ কাজী আবদুল মজিদ। (১৫) লেঃ জেঃ পীরজাদা, (পি-এস-৩-টু জেঃ ইয়াহিয়া খান। (১৬) মেজর জেনারেল জামশেদ। (১৭) মেঃ জেঃ বাহাদুর শের।

* ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে ক্যান্টন পদে ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন।

সৈন্য বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করার পূর্বে কতকগুলো দিক চিন্তা করতে হয়, যেমন- সৈন্যদের থাকা, খাওয়া, বেতন, যানবাহন, যোগাযোগ ইত্যাদি। তাছাড়া ডাটা, ম্যাপ ইত্যাদি করতে হয়। পঁচিশে মার্চের গণহত্যা যদি হঠাৎই হতো তাহলে পাকিস্তানী সৈন্যগণ ২৫ শে মার্চে বাংলাদেশে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একই সাথে একই সময়ে বাঙ্গালী সৈন্য, ই-পি-আর, পুলিশ, আনসার, তথা জনসাধারণের উপর আক্রমণ ও গণহত্যা চালায় কিভাবে! এতেই প্রমাণ হয় যে পাকিস্তান সামরিক সরকারের পূর্ব পরিকল্পনা নিশ্চয়ই ছিল।

১৫ই মার্চ, ৭১-এ প্রেসিডেন্ট জেঃ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা, ক্ষমতা হস্তান্তর, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট হাউসে (বর্তমান গণভবন) এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভায় আলোচনা করেন- অপরদিকে রাতের অন্ধকারে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে উপরোল্লিখিত জেনারেলদের সঙ্গে গোপন যড়যন্ত্র চলত।

যেহেতু আর্মি ইনটেলিজেন্স-এ ছিলাম ও সাধারণ পোশাকে কর্তব্য পালন এবং চলাফেরা করতাম, সেজন্যই আমি পাকিস্তান সামরিক সরকারের কার্যকলাপ অনুসরণ করতে পারি।

২৫শে মার্চের পূর্বেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যে সমস্ত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন, তাঁদেরকে বিভিন্ন অজুহাতে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসারসহ কিছু বাঙ্গালী সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠায়। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাঞ্জাবী সৈন্যদের সঙ্গে যে সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্য ছিলেন তাঁদেরকে নিরস্ত্র করা হয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল সৈন্যকে সীমান্ত এলাকায় প্রেরণ করে ভারতের হুমকির অজুহাতে।

যে সকল বাঙ্গালী অফিসারকে স্ব স্ব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ও কয়েকজনকে অন্য পদে দেওয়া হয়, তাদের পরিচয় যথাক্রমেঃ (১) মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ, চীফ অব জেনারেল স্টাফ, বাংলাদেশ আর্মি। তিনি ছিলেন ৫৭-ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের (ঢাকা) ব্রিগেড মেজর (ব্রিগেড মেজরের কাজ হচ্ছে ব্রিগেডের অপারেশন প্লান করা এবং পরিচালনা করা)। মেজর খালেদ মোশাররফকে পাঠায় কুমিল্লা ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে এবং তদন্তে একজন পাঞ্জাবী অফিসারকে নিয়োগ করে।

(২) ব্রিগেডিয়ার মজুমদার। তিনি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ডান্ট ছিলেন। তাঁকে ২২শে মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসা হয় এবং গৃহবন্দী অবস্থায় রাখা হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী। ক্যাপ্টেন চৌধুরী (বর্তমানে মেজর) বর্তমানে বাংলাদেশে ১৬-বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার।

(৩) লেঃ কঃ মাসুদুল হাসান খান। তিনি ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টে জয়দেবপুরে ছিলেন। তাঁকে ২২শে অথবা ২৩শে মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসে এবং তাকেও গৃহবন্দী করে এবং তাঁর স্থলে লেঃ কঃ রকিবকে জয়দেবপুর ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টে পাঠায়। কারণ লেঃ কঃ রকিব ৩২-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিলেন। ৩২-পাঞ্জাব রেজিমেন্টে কঃ তাজ মোহাম্মদকে নিয়োগ করে। ৩২-পাঞ্জাব রেজিমেন্টেই ঢাকায় ২৫শে মার্চের রাতে গণহত্যা চালায়। এছাড়াও কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসারকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় রাখা হয়। তাদেরকে বাইরের যোগাযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়।

বেঙ্গল রেজিমেন্টকে কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট থেকে সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন করা হয়। যেমন, প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে চৌগাছা (সীমান্ত এলাকা) পাঠায়। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে জয়দেবপুর থেকে তাঁদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এক কোম্পানী পাঠায় টাঙ্গাইল। উক্ত কোম্পানীর কমান্ডার ছিলেন মেজর শফিউল্লা (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার-চীফ অব বাংলাদেশ আর্মি)। অন্য একটি কোম্পানী পাঠায় ময়মনসিংহে। উক্ত কোম্পানীর কমান্ডার ছিলেন মেজর নূরুল ইসলাম (বর্তমান লেঃ কর্নেল)।

সৈয়দপুর অবস্থিত ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে সীমান্ত এলাকায় পাঠায়। কুমিল্লায় অবস্থিত ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পাঠায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। উক্ত রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ। ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিল চট্টগ্রামে। তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানোর আশ্রয় চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চট্টগ্রাম শহর ও বন্দর এলাকায় মোতায়েন করে। ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে (ন্যাশনাল সার্ভিস ব্যাটালিয়ন, যার অধিকাংশই ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল) ২৫শে মার্চের পূর্বেই ঢাকায় নিরস্ত্র করে। এছাড়াও ৬০৪ ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটের প্রায় ২৫ জন বাঙ্গালীকে (যার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলাম আমি নিজেই) নিরস্ত্র করা হয়। শুধুমাত্র আমার অস্ত্রটা নিতে তারা সাহস করে নাই। তাছাড়া ঢাকায় অবস্থানরত নিম্নপদের সৈন্যগণ-যেমন সিগনাল রেজিমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, ৬০৪ কন্স্ট্রাক্ট ওয়ার্কশপ, ১৪৭ ইনফ্যান্ট্রি ওয়ার্কশপ, সাপ্লাই এন্ড ট্রান্সপোর্ট ব্যাটালিয়ন, স্টেশন সাপ্লাই ডিপো, গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী, কন্সট্রাক্ট অর্ডন্যান্স ডিপো, স্টেশন সাপ্লাই ডিপো, ট্রানজিট ক্যাম্প, ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ও পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর সমস্ত সৈন্যদেরকে অতি কায়দায় ও চালাকি করে নিরস্ত্র করে। বাঙ্গালীকে কেন নিরস্ত্র করা হচ্ছে পাঞ্জাবীরা তার কারণস্বরূপ দেখায় যে, যারা বাঙ্গালী তারা বাঙ্গালী আইন-শৃংখলা ভঙ্গকারী জনগণের উপর গুলি চালাতে সক্ষম হবে না। জনগণের উপর গুলি চালাতে আমাদের মায়া-মমতা লাগা স্বাভাবিক। কাজেই পাঞ্জাবীদের হাতে অস্ত্র কম থাকায় আমাদের অস্ত্র নিয়ে আইন-শৃংখলা স্বাভাবিক ও আয়ত্তে আনার চেষ্টা করবে- এই কারণেই আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিচ্ছে।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন শাহেদ নসরুল্লাহ (ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) আমার অফিসে প্রায়ই দেখা করত ও আমার নিকট থেকে খবরাখবর নিত। শাহেদ নাসরুল্লাহ এভাবে আসা-যাওয়া করাতে আমাকে আমার অফিসার কমান্ডিং মেজর মনোয়ার হোসেন জিজ্ঞাসা করেন যে ছেলেটি কে এবং কেন আসে। আমি আমার আত্মীয় বলে পরিচয় দেই এবং জানাই যে, যেহেতু আমাকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হতে দেওয়া হয় না সেজন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। পরে একদিন শাহেদ নাসরুল্লাহ যখন আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন রাস্তায় মেজর মনোয়ার হোসেনের হাওয়ালদার মোঃ আশরাফ তার ফটো তুলে নেয়।

পরদিন নসরুল্লাহ আমার নিকট এসে হাওয়ালদার কর্তৃক তার ফটো তোলার কথা জানায়। আমি নসরুল্লাহকে সাহস দিয়ে বলি ওতে কিছু হবে না। এরপর পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো যখন ঢাকায় আসে ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে থাকে তখন শাহেদ নসরুল্লাহসহ ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে একটি ছাত্র ও গণবিক্ষোভ মিছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পৌঁছে এবং ভূট্টোকে নিন্দা করে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। ঐ মিছিলে শাহেদ নসরুল্লাহর শ্লোগান দেওয়া ফটোটি ‘দি পিপল’ পত্রিকায় দেখা যায়। পিপল পত্রিকায় নসরুল্লাহর ফটো দেখা মাত্র মেজর মনোয়ার হোসেন আমাকে ডেকে বলেন, যে ছেলেটি তোমার নিকট আসে ও তোমার আত্মীয়, সে তো একজন ছাত্রনেতা সে ছেলেটি মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিনি পিপল পত্রিকাটির কপি এনে আমাকে দেখান। তখন আমি মেজর মনোয়ার হোসেনকে জানাই যে আমি সঠিক কিছু বুঝতে পারছি না, সে তো কোনদিন ছাত্ররাজনীতি করতো না। এর থেকে মেজর মনোয়ার হোসেন আমাকে আরও বেশী সন্দেহের চোখে দেখেন।

এরপর ১৫ই মার্চ থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার অগ্রগতির কথা শুনে আমরা কিছুটা আশাবাদী ছিলাম যে তারা সম্ভবত আওয়ামী লীগকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। আমরা বাঙ্গালী অফিসাররাও পাঞ্জাবীদের মতিগতিকে তেমনভাবে লক্ষ্য করতাম না আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পাবে মনে করে (আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীনের প্রেসনোটের উপর ভিত্তি করে)।

২৩শে মার্চ প্রদেশব্যাপী ছাত্র ও গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বাংলাদেশের পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলিত হয় এবং ২৪শে মার্চ সকালে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রেসিডেন্ট

ওয়ালী খানসহ আরও কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতার ঢাকা ত্যাগ করে যাওয়ায় আমাদের মনে সন্দেহ হয় এজন্য যে, হয়তবা আলোচনা মোটেই ফলপ্রসূ হয় নাই।

২৫শে মার্চ আমি আকস্মিকভাবে বিকেল চারটায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাইরে চলে যাই আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে। দুর্ভাগ্যবশত শহর থেকে আমার মেসে ফিরতে রাত প্রায় ৯টা বেজে যায়। আমি ক্যান্টনমেন্টে এসে সোজা আমার কক্ষে না গিয়ে ডাইনিং হলে যাই। খাওয়ার টেবিলে পাঞ্জাবী অফিসাররা উপস্থিত ছিল। খাবার পর সাড়ে ন'টায় আমার কক্ষে যাই। সেখানে সিপাই মোশাররফ হোসেন (বাঙ্গালী) আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই সে আমার নিকট ছুটে আসে এবং জানায় যে, সে আমার জন্য বিকেল ৪টা থেকে অপেক্ষা করেছে। একথা বলেই সে সঙ্গে সঙ্গে তার পকেট থেকে ছোট এক টুকরা কাগজ বের করে আমার হাতে দেয়।

উক্ত চিঠিখানা লিখেছিলেন ৩১-ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারীর ক্যাপ্টেন (বর্তমান মেজর) খুরশীদ আলম চৌধুরী। তিনি লিখেছিলেন, ৩১-ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারীর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জাহেদ হাসান ঐদিন (২৫শে মার্চ) বেলা আড়াইটায় নির্দেশ দিয়েছেন অদ্য রাতে (২৫শে মার্চ) তার রেজিমেন্টকে শহরে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শহরে আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে জানান এবং আরও বলেন যে যদিও শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করার জন্য শহরে যাওয়া হবে তবু একটা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সঙ্গে নিতে হবে। আরও বলেছিলেন যে, তার নির্দেশের পর কোন বাঙ্গালী অফিসার বা জোয়ানরা রেজিমেন্ট এলাকা থেকে কোনক্রমেই বাইরে যেতে পারবে না (তখন থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত রেজিমেন্ট শহরের উদ্দেশ্যে বের না হয়)। উক্ত ক্যাপ্টেন খুরশীদ আলম চৌধুরীর পক্ষে আমার নিকট চিঠিখানা এজন্যই পাঠানো সম্ভব হয়েছিল যে, তাঁর রেজিমেন্ট এলাকা ও আমার মেস পাশাপাশি জায়গায় ছিল, মাঝখানে শুধু কাঁটাতারের বেড়া।

চিঠিখানা আমার হস্তগত হওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ অস্বস্তি বোধ করি। এমতাবস্থায় কি করা কর্তব্য সে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ি এবং আমার সমস্ত শরীর ঘামতে থাকে। গভীর চিন্তার পর আমার পাশের কক্ষের বন্ধু ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুস্তাফিজুর রহমান (তিনি আর্মি ইঞ্জিনিয়ার্সের ক্যাপ্টেন এবং বিমান বাহিনীর সঙ্গে ডেপুটেশনে ছিলেন এবং সেখানে সহকারী গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করতেন) এর নিকট যাই। মুস্তাফিজুর রহমান আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং আমরা দু'জনে মাঝে মাঝে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর আলোচনা করতাম। তাঁকে ক্যাপ্টেন খুরশীদ আলম চৌধুরীর চিঠিখানা সম্বন্ধে জানাই। দু'জনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে শহরে গিয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবর্গকে এ খবর পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নেই। শেখ কামালের বিশিষ্ট বন্ধু শাহেদ নসরুল্লাহকে (ধানমন্ডীর বাসায়) প্রথমে খবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কেননা শাহেদ নসরুল্লাহকে খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে শেখ কামালের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট এ খবর অতিশীঘ্র পৌঁছাবে। মুস্তাফিজুর রহমান বললেন, তাঁর কয়েকজন ভাই, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ও বিভিন্ন হলে রয়েছে, তাদেরকেও এ খবর জানালে ছাত্ররাও প্রস্তুতি নিতে পারবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই আমরা দু'জন তাঁর নিজস্ব টয়োটা গাড়ীতে শহরে রওনা হই (রাত প্রায় দশটা)। যখন আমাদের টয়োটা গাড়ী ৩১-ফিল্ড রেজিমেন্টের গেটে পৌঁছে তখন আমরা দেখতে পাই যে, ৩১-ফিল্ড রেজিমেন্টের গেট দিয়ে চীফ অব আর্মি স্টাফের পতাকাসহ ৪ তারকাবিশিষ্ট একখানা স্টাফ কার বের হচ্ছে। উক্ত গাড়ীতে জেঃ আব্দুল হামিদ খান, চীফ অব আর্মি স্টাফ, পাকিস্তান আর্মি এবং জেনারেল টিক্কা খান, কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ড ছিলেন। উক্ত গাড়ীর পিছনে প্রায় ৫০/৬০ খানা খোলাগাড়ী ছিল। কয়েকটি গাড়ীতে ভারী মেশিনগান লাগানো, কয়েকটি গাড়ীতে রিকয়েললেস রাইফেল লাগানো, কয়েকটি বড় বড় ট্রাকে পুরো যুদ্ধের পোষাক ও অস্ত্রসহ সৈন্য ছিল। আমরা রাস্তা নির্দেশের উল্টোপথ দিয়ে তাদেরকে পিছনে ফেলে আগে চলে যাই। তখন শহরে লোকজন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছিল। প্রথমে আমরা ধানমন্ডি ২৬ নং সড়কে শাহেদ নসরুল্লাহর বাসভবনে গিয়ে বিস্তারিত জানাই এবং শেখ কামালের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নিকট আমাদের খবর পৌঁছানোর কথা বলি। এছাড়া তাকে (নসরুল্লাহ) তার বাসা থেকে অন্যত্র চলে যাবার পরামর্শ দেই। কেননা

মেজর মনোয়ার হোসেনের নিকট তার তুলে নেওয়া ফটো ও দি পিপল পত্রিকায় প্রকাশিত ফটো ছিল। আমাদের কথা শুনে শাহেদ নসরুল্লাহর পিতা খুবই চিন্তায় পড়েন। কিছুক্ষণ পর আমরা মুস্তাফিজুর রহমানের ভাই ও আত্মীয়স্বজনকে খবর দেয়ার জন্য মোহাম্মদপুরে যাই। তাদেরকেও আমরা বিস্তারিত খবর জানাই এবং সতর্ক হওয়ার জন্য অন্যান্য বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনকে খবর পৌঁছাতে বলি। সেখান থেকে আমরা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসার পথে ফার্মগেট ছাত্রদের একটা বিরাট মিছিলের মাঝে পড়ি। ছাত্ররা ফার্মগেটে প্রতিবন্ধকতা (ব্যারিকেড) সৃষ্টি করেছিল যেন শহরে সৈন্যবাহিনীর যে সমস্ত গাড়ী গিয়েছে তারা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসতে না পারে। আমরা যখন মিছিলের মাঝে পড়ি তখন কয়েকজন ছাত্র আমাদের পরিচয় জানতে চায়। আমি সেনাবাহিনীর পরিচয় না দিয়ে বাঙ্গালী ও সাধারণ মানুষ, গুলশানে বাসা আছে বলে জানাই। তখন তারা আমাদের গাড়ী চলার জন্য একটু জায়গা পরিষ্কার করে দেয় (তখন রাত প্রায় এগারটা)। ব্যারিকেড অতিক্রম করার পরই আমরা দেখলাম সেনাবাহিনীর ৪ খানা মেশিনগান লাগানো গাড়ী (বাতি নিভানো) কয়েকজন সৈন্য ফার্মগেটের দিকে ঠেলে নিচ্ছে। আমাদের গাড়ী একটু থামলাম। গাড়ী কয়েকখানা ফার্মগেটের কাছাকাছি গিয়েই ছাত্রদের উপর গুলি চালাতে শুরু করে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু ছাত্র ও সাধারণ মানুষ সেখানেই মারা যায়। তারপর আমরা ক্যান্টনমেন্টে আমাদের মেসে ফিরে আসি। কিছুক্ষণ পর আমি আমাদের চট্টগ্রামের বাসায় আমার পিতার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি এবং জানতে পারি যে চট্টগ্রামেও পশ্চিমা সৈন্যরা শহরে নিরীহ জনসাধারণের উপর নির্মমভাবে গুলি করছে এবং হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে। আমার পিতার সঙ্গে কথা শেষ করেই আমি ঢাকায় ধানমন্ডিতে আমার মামা এডভোকেট জনাব আবু তাহের চৌধুরীকে টেলিফোন করি তাঁকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যার খবর জানাই। রাত বারটা পর্যন্ত টেলিফোন যোগাযোগ ছিল, তার পরই আমাদের কানে অসংখ্য গুলির আওয়াজ আসে। মীরপুর, গুলশান ও এয়ারপোর্ট এলাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় গোলাগুলির আওয়াজ ও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখি। এসময় পুরোদমে পাঞ্জাবীরা ঢাকায় নিরীহ ঘুমন্ত জনসাধারণের উপর আক্রমণ করে মেশিনগান দিয়ে নির্মমভাবে গণহত্যা শুরু করেছে। এভাবে সারারাত গণহত্যা চালায়। শেষরাতে সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাঙ্ক নিয়ে শহরে আক্রমণ চালায় এবং অসংখ্য বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ পাই। এভাবে আমি, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুস্তাফিজ, ক্যাপ্টেন এনামসহ আরো কয়েকজন সারারাত চিন্তিত থাকি ও অনিদ্রায় রাত কাটাই।

আমাদের বিল্ডিং-এ পাঞ্জাবী মেজর পীর কমরউদ্দিন (জি-এইচ-কিউ ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটের অফিসার কমান্ডিং ছিলেন) সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাঁর বিছানাপত্রসহ সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, তিনি অফিসে যাচ্ছেন এবং অফিসেই থাকবেন। মেজর কমর পাঞ্জাবী হলেও আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু এবং একই সাথে ইনটেলিজেন্স কোর্স করি। আমার আত্মীয়স্বজনের অনেকেই তাকে চিনতেন। তিনি চলে যাবার সময় অকথ্য ভাষায় আমাদেরকে কতগুলি কটুক্তি করেন ও আওয়ামী লীগকে গালিগালাজ করেন। আমাদেরকে সন্দেহ করে কিংবা ভয় করেই হয়তবা তিনি চলে যান। তাঁর এরূপ কটুক্তি ও গালাগালিতে আমরা সবাই ধারণা করি যে অন্যান্য পাঞ্জাবী অফিসারও বোধ হয় বাঙ্গালী অফিসার ও সৈন্যদের সঙ্গে অনুরূপ দুর্ব্যবহার করছে।

২৬শে মার্চ সকাল সাড়ে সাতটায় আমি আমার অফিসে যাই। সেখানে মেজর মনোয়ার হোসেনসহ মেজর ফারুকী ও মেজর মীর্জা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা খুব আনন্দ ও হাসাহাসি করছিলেন এবং অতি খুশীতে মিষ্টি খাচ্ছিলেন। মেজর মনোয়ার হোসেন আওয়ামী লীগের পতন ও বাঙ্গালীদের দমন করার কথায় মেতে ছিলেন। তাঁরা আমাদেরকেও মিষ্টি খেতে বলেন। তখন আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও একটা মিষ্টি খেলাম, তারপরই আমি শহরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য মেজর মনোয়ার হোসেনের নিকট কয়েক ঘন্টার জন্য বাইরে যাবার অনুমতি চাই। কিন্তু তিনি আমাদেরকে বাইরে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করেন এবং বলেন, শহরে অনেক বাঙ্গালী দুষ্কৃতিকারী মারা গেছে। যেহেতু তুমি বাঙ্গালী, কাজেই তাদের মৃতদেহ দেখে তুমি স্বাভাবিকভাবেই সহ্য করতে পারবে না, কাজেই তোমাকে এখন বাইরে বা শহরে যাবার

অনুমতি দিতে পারি না। আমি অফিসেই বেলা প্রায় দু'টা পর্যন্ত বসে রইলাম। এসময় ইউনিটের বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী সৈন্য আমার নিকট এসে শহরে ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর জানায় এবং এমতাবস্থায় তাদের কি কর্তব্য তা আমার নিকট থেকে জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। আমি তাদেরকে কিছুটা সান্ত্বনা দেই ও আরও কিছু সময়ের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে বলি। তারপর আড়াইটার সময় আমি আমার মেসে খেতে যাই এবং খাবার পর কক্ষে প্রবেশ করলে আমার সিপাই মোশাররফ (যার নিকট একটা স্টেনগান থাকত) আমাকে জানায় যে তার নিকট থেকে পাঞ্জাবীরা স্টেনগানটি নিয়ে নিয়েছে। সিপাই মোশাররফের কাছ থেকে স্টেনগান কেড়ে নেয়ায় আমার একটু ভয় হয় এবং অত্যন্ত চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ি। তার পরই আমাদের পাশের বাড়িতে মেজর মওলার (বাংলা-১৪৯ ইনফ্যান্ট্রি ওয়ার্কশপের কমান্ডিং অফিসার) নিকট গিয়ে স্টেনগান কেড়ে নেয়ার কথা জানাই এবং আমরা যারা বাঙ্গালী ছিলাম সবাই নিরাপত্তার কথাও বলি। আমার কথা শুনে মেজর মওলা বলেন, বাঙ্গালীদেরকে পাঞ্জাবীরা মারবে না- মারতে পারে না। কিন্তু তবু আমরা তিন-চারজন অফিসার রাতে তার বাসায় থাকা ও ঘুমানোর কথা বলি এবং আরও জানাই যে আমাদের ঘুমের সময় একজন অফিসার রাতে সব সময় পাহারা থাকবে। তিনি রাজী হলেন। আমি, ক্যাপ্টেন এনাম এবং মুস্তাফিজ ও মেজর ইকবাল তার বাসায়ই থাকি। কিন্তু সারারাত গুলির আওয়াজ এবং মীরপুর, গুলশান এলাকায় আগুন লাগানো দেখে আমাদের মোটেই ঘুম হয়নি।

২৭শে মার্চ, সকাল সাড়ে সাতটায় আমি অফিসে গেলে দেখতে পাই যে, তিনটা ই-পি-আর ট্রাক অসংখ্য রাইফেল ও অস্ত্রশস্ত্র (অস্ত্রগুলোতে অনেক লাল রক্ত লাগানো দেখতে পাই) নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ঢুকছে। আমার অফিসের অনেক বাঙ্গালী সিপাই আমাকে জানায় যে, ই-পি-আর ক্যাম্প এবং রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প পাঞ্জাবীরা নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে এবং বহু ই-পি-আর ও পুলিশকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এ সময় আমি আমার শহরের আত্মীয়স্বজনের কোন খবর না পেয়ে খুবই চিন্তায় পড়ি এবং আমি মেজর মনোয়ার হোসেনকে কঠোরভাবে জানাই যে, যে কোন প্রকারে হোক আমাকে অন্তত আধ ঘন্টার জন্য শহরে যেতে হবে। পরে মেজর মনোয়ার হোসেন আমাকে শহরে যাবার অনুমতি দেন। অনুমতি পাওয়ার পর আমি সকাল দশটার সময় মেজর এম, এম, দৌল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারকে (জি-২ ইনটেলিজেন্স হেড কোয়ার্টার, ইস্টার্ন কমান্ড) সঙ্গে নিয়ে জীপে শহরে চলে যাই।

সেদিন সকাল দশটা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত কোনো কারফিউ ছিল না। আমরা যাবার পথেই দেখলাম অসংখ্য নরনারী শহর ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট এলাকা পার হবার পর আমরা স্বচক্ষে যা দেখলাম তা হলোঃ

ফার্মগেটের পরে আওলাদ হোসেন মার্কেটের সমস্ত কাঁচা ঘরবাড়ি এবং দোকানপাট (কমপক্ষে ৬০/৭০ টি) জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ইস্কাটন রোডে আমার ভগ্নিপতি জনাব এস, আর, খান (সেকশন অফিসার, মিনিষ্ট্রি অব ইনফরমেশন)-বাসায় যাই। সেখানে তাদের মুখে শুনে পাই যে ঐ এলাকায় পাঞ্জাবীরা ২৫শে ও ২৬শে মার্চ রাস্তায় বাঙালী যাদেরকেই পেয়েছে তাদের সবাইকে জঘন্যভাবে হত্যা করে রাস্তার আশেপাশে মাটিতে চাপা দিয়েছে। ইস্কাটন রোড থেকে বের হয়ে যখন আমরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের কাছে পৌঁছলাম তখন ডানদিকে দি পিপল পত্রিকার অফিসে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং অসংখ্য মৃত লাশ পড়ে রয়েছে এবং অনেক লাশ আগুনে জ্বলছে। ঐ রাস্তা দিয়ে রাতে ট্যাংক চালানো হয়েছে। ট্যাংকের চেইন-এর ছক তখনো রাস্তায় ছিল।

সেখান থেকে আমরা হাতিরপুলে মেজর দৌল্লাহ সাহেবের বাসায় যাই। সেখানে মেজর দৌল্লাহ সাহেবের ছোট ভাই জনাব আসফউদ্দৌলাহ (বর্তমান জয়েন্ট সেক্রেটারী, ওয়ার্কস) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকবাল হল, জগন্নাথ হল ও স্টাফ কোয়ার্টারে ঢুকে পাঞ্জাবীরা কিভাবে জঘন্যভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের হত্যা করেছে তার

বিবরণ দেন (২৫শে ও ২৬শে মার্চ জনাব আসফউদ্দৌলাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টারে তার শ্বশুর ভূগোল বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ নফিজ আহমদের বাসায় ছিলেন)। জনাব আসফউদ্দৌলাহকেও পাঞ্জাবীরা হত্যা করার চেষ্টা করে কিন্তু ডঃ নফিস তাঁকে রক্ষা করেন। হাতিরপুল এলাকায়ও আমরা কিছু কিছু বাড়িঘর ভস্মীভূত দেখি এবং কয়েকটি লাশ রাস্তায় দেখতে পাই।

হাতিরপুল থেকে আমরা ধানমন্ডি ১৪ নং সড়কে আমার মামা এডভোকেট জনাব আবু তাহের চৌধুরীর বাসায় যাই। মামার মুখে শুনতে পাই যে সেখানেও পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনীর সৈন্যরা বহু লোককে গুলি করে হত্যা করেছে এবং নারী ধর্ষণ করে, কতিপয় মেয়েকে গাড়ীতে তুলে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে।

মামার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নিউ মার্কেট হয়ে ইকবাল হলে রওনা হই। নিউ মার্কেটে বাজার সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অবস্থায় দেখি। আজিমপুর হয়ে যখন আমরা রেল ক্রসিং-এ পৌঁছি তখন সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক লাশ দেখতে পাই। ইকবাল হলের গেটে ঢোকান পর মাঠের মধ্যে আমরা ১১ জনের মৃতদেহ একই লাইনে পড়ে রয়েছে দেখতে পাই। প্রত্যেকের চেহারাই ছাত্র বলে ধারণা হলো। হলের সমস্ত দরজা জানালার কাঁচ ভাঙা অবস্থায় দেখি এবং দেয়ালে ট্যাংকের গোলা দাগ ও গর্ত দেখা যাচ্ছিল। হলের মধ্যে ঢুকে কয়েকটি কক্ষে তাজা লাশ পড়ে থাকতে দেখি।

এ সময় বহু লোক হলের ভেতর ঢুকে মৃত লাশগুলি দেখছিল। হল থেকে বের হবার সময় মাঠের মধ্যে কয়েকটি বিরাট গর্ত দেখতে পাই। জনসাধারণের মুখে শুনতে পাই যে, বহু ছাত্রকে হত্যা করে ঐ সমস্ত গর্তে কবর দেয়া হয়েছে। ইকবাল হল থেকে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এস এম হলের দেয়ালেও ট্যাংকের অনেক গোলার দাগ দেখতে পাই। এরপর আমরা জগন্নাথ হলের ভিতরে প্রবেশ করি। সেখানেও ইকবাল হলের মত একইভাবে মৃত লাশ ও গর্ত করা কবর দেখতে পাই। সেখানে কয়েকজন ছাত্র ও লোকের মুখে ডঃ জি সি দেবসহ শিক্ষক, ছাত্র ও রোকেয়া হলে নারী ধর্ষণের করণ কাহিনী শুনতে পাই।

জগন্নাথ হল থেকে বের হয়ে রোকেয়া হলের পাশ দিয়ে রেসকোর্স অতিক্রম করার সময় রেসকোর্সের মাঝখানে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস অবস্থায় দেখি। হিন্দু মন্দিরে যে সমস্ত হিন্দু নরনারী ছিল তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের কয়েকটি মৃতদেহ আমরা রাস্তা থেকেই দেখতে পাই।

রেসকোর্স থেকে হাইকোর্ট হয়ে গুলিস্তান এলাকায় যাই। গুলিস্তান থেকে নওয়াবপুর রোডে অনেক বাড়িঘরে আগুন জ্বলতে দেখি। আমরা গভর্নর হাউস (বর্তমান বঙ্গভবন) দিয়ে দৌল্লাহ সাহেবের এক ভাইয়ের বাসায় (উয়ারী) যাই। সেখানেও তার নিকট পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও গণহত্যার কাহিনী শুনি। সেখান থেকে ইত্তেফাক অফিসে আগুন জ্বলতে দেখি। তারপর আমরা পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগ অফিসের সম্মুখে অফিসের সমস্ত কগজপত্র রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখি এবং কিছু কিছু কাগজ বা অন্য কিছু পোড়া দেখতে পাই। আওয়ামী লীগ অফিস থেকে মতিঝিল হয়ে আমরা রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পের সম্মুখে যাই। তখন প্রায় বিকেল তিনটা বাজে। সেখানে ইঞ্জিনিয়ার্স-এর মেজর এনামের মুখে আমরা রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পের যে বিস্তারিত ঘটনা জানতে পারি তা হলোঃ

২৫শে মার্চ রাত বারোটার সময় বর্বর পাক হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা পুরা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পের চতুর্দিক থেকে অতর্কিত হামলা করে এবং গুলি চালায়। পুলিশরাও বীরত্বের সাথে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায়। এভাবে সারা রাত উভয় পক্ষ যুদ্ধ চালায়। এবং যুদ্ধে যখন পাক বাহিনী কোনক্রমেই পুলিশ দলের সঙ্গে জয়লাভ করতে পারছিল না তখন ভোর চারটার সময় পাক হানাদার বাহিনী ট্যাংক নিয়ে আক্রমণ চালায়। ট্যাংকের আক্রমণও বীর পুলিশ ভাইয়েরা প্রতিহত করে। ২৫শে মার্চ সারারাত ২৬শে মার্চ বিকাল ৪টা পর্যন্ত এক নাগাড়ে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে পুলিশ ভাইয়েরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে।

বিকাল চারটার পর পুলিশ বাহিনীর গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে যায় এবং প্রায় সাতশ পুলিশ ভাই শহীদ হন। প্রায় সাড়ে তিনশ আত্মসমর্পণ করেন। বাকী সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। যে সমস্ত পুলিশ ভাই শহীদ হন তাদের লাশ পাঞ্জাবীরা পুলিশ ক্যাম্পের মাঠে একটা বিরাট গর্ত করে কবর দেয়। মেজর এনামের মুখে বিস্তারিত খবর নিয়ে আমরা পিলখানা ইপিআর ক্যাম্পে যাই। সেখানে পাক হানাদার বাহিনী পিলখানার চতুর্দিকে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখায় আমরা কিছুই দেখতে পারিনি। সেখান থেকে আমরা বিকাল চারটার সময় ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসি।

ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছে আমি গোছল করি। বিকাল ৫টার সময় আমার নায়েক সুবেদার ফজলুল করিম আমাকে জানায় যে, সেক্রেটারিয়েট অফিসের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী ৩টা বাসে পরিবারসহ ময়মনসিংহ সড়ক দিয়ে ময়মনসিংহ যাবার সময় (তাদের অধিকাংশই ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের অধিবাসী) পাঞ্জাবী ১৩-এফ-এ রেজিমেন্টে সৈন্যরা কুর্মিটোলা রেল স্টেশনের সম্মুখে যেখানে আর্মি ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিল সেখানে উক্ত ৩টা বাস থামিয়ে বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবতী মেয়েদেরকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখে এবং যুবক ও বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষদের মারধর করে তাদের বাস ছেড়ে দেয়। পরে যুবতী মেয়েদেরকে ক্যান্টনমেন্টে ১৯-সিগনাল ব্যাটালিয়নে নিয়ে যায়। এবং পরস্পর শোনা যায় যে সেখানে মেয়েদেরকে ধর্ষণ ও অত্যাচার করছিল। এ খবর পাবার পর আমি লেঃ কর্নেল তাজ মোহাম্মদকে জানাতে যাই। লেঃ কর্নেল তাজকে না পেয়ে লেঃ কর্নেল সিনওয়ারীর (জিএসও-১ ইনটেলিজেন্স, জেড কোয়ার্টার, ইস্টার্ন কমান্ড) নিকট যাই। তাকে না পেয়ে ১৪ ডিভিশন হেড কোয়ার্টার অফিসার মেসে যাই। সেখান থেকে টেলিফোনে মেজর হাজী মোঃ কেয়ানীকে (জি-২ ইনটেলিজেন্স ১৪ ডিভিশন) নারী ধর্ষণ ও অত্যাচারের কথা জানাই। আমার কথা শুনে মেজর হাজী কেয়ানী সাহেব অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে তার করার কিছু নেই। কেননা ইতিপূর্বেও তিনি অনুরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা শুনেছেন। তিনি বলেন, এ সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপের জন্য কয়েকজন অফিসারই দায়ী। এবং বর্তমানে পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়েছে যা তাঁর পক্ষে বা অন্য কোনো অফিসারের পক্ষেও আয়ত্তে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা কতিপয় অফিসারের দোষেই সৈন্যরা বেশী প্রশ্রয় পেয়েছে। তিনি আমার কঠোর মনোভাব বুঝতে পেরে আমার নিকট তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে ক্ষমা চান এবং আরও বলেন যে, আমি যেন লজ্জাজনক কথা বলে তাঁকে গুনাহগার না করি। মেজর হাজী মোঃ কেয়ানী সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা শেষ করে আমার মেসে ফেরার পথে শহীদ আনোয়ার বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের এক ব্যাটালিয়ন কমান্ডার উপস্থিতিতে লেঃ জেঃ টিক্কা খানের ভাষণ শুনতে পাই। তখন বিকাল সাড়ে ছটা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমার নায়েক সুবেদার ফজলুল করিম দুজন পাঞ্জাবীসহ জীপে আমার মেসে আসে। ফজলুল করিম আমাকে জানায় যে পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। তাকে নির্দেশ দিয়েছে সার্ভে অব পাকিস্তান-এ (বর্তমান সার্ভে অব বাংলাদেশ) গিয়ে চট্টগ্রামের মানচিত্র আনতে। আমি তাক চুপে চুপে বললাম আমার ইউনিটে যে সমস্ত বাঙালী রয়েছে তাদের সবাইকে পালিয়ে যেতে। এবং ফজলুল করিম আমাকে জানাল যে তার সাথে দুইজন পাঞ্জাবী রয়েছে কাজেই সে কি করে পালাবে। আমি তাকে মানচিত্র নিয়ে আসার পর সুযোগ মত দেখা করতে বললাম। ফজলুল করিম চলে যাবার পর আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে হঠাৎ এক ব্যাটালিয়ন কমান্ডার একত্রে উপস্থিত হওয়ার কারণ কি থাকতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত এই ধারণা হলো যে, তাদেরকে হয়তো বা কোথাও পাঠানো হচ্ছে এবং সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারপর চট্টগ্রামের মানচিত্র সংগ্রহের কথা শুনে পুরোপুরি বিশ্বাস হলো যে, চট্টগ্রামের যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যরা বোধহয় আমাদের বাঙালীদের নিকট পরাজিত হয়েছে এবং সে জন্যই মানচিত্রের সাহায্যে রাতে প্যারাসুটে তাদেরকে চট্টগ্রাম পৌঁছাবে। ইতিপূর্বে সন্ধ্যা সাতটার সময় ক্যান্টন এনামের কক্ষে রেডিওতে আমরা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে মেজর জিয়াউর রহমান (বর্তমান ব্রিগেডিয়ার)-এর ভাষণ শুনতে পাই। বেতারে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর পক্ষ থেকে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সমস্ত বাঙালী সেনাবাহিনীর সদস্য, ইপিআর, বিমান বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও জনসাধারণকে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে চিরতরে এদেশ থেকে নির্মূল ও খতম করার আহবান জানান। এবং তিনি নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের সিইনসি ঘোষণা করেন। এ খবর শোনার পর আমরা কয়েকজন অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং অনেক

মনোবল ফিরে পাই। আমরা বুঝতে পারলাম যে চট্টগ্রামে পাক বাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং আমাদের পুরোপুরি দখলে রয়েছে। এর পর থেকে আমি কিভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব এবং কিভাবে ক্যান্টমেন্ট থেকে বের হয়ে গিয়ে যুদ্ধ করব সে চিন্তাই করতে লাগলাম। রাত ৯টার সময় ক্যাপ্টেন এনামের মারফত একটি ভীতিজনক খবর শুনতে পাই। সেটা হচ্ছে : ৭ই ডিসেম্বর '৭০ আমি এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুস্তাফিজ আমাদের মেসে পাঞ্জাবী অফিসারদের উপস্থিতিতে টেলিভিশনে দেশের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখছিলাম। আওয়ামী লীগের পক্ষে সন্তোষজনক ফলাফলে পাঞ্জাবী অফিসাররা সকলেই কক্ষ থেকে কেটে পড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে সবাই কক্ষ ত্যাগ করলেও আমি এবং মুস্তাফিজ শুধু কক্ষে থাকি। রাত বারোটোর সময় নায়েক পয়া খান (পাঠান) আমাদেরকে জানায় যে, মেস কমিটির সভাপতি মেজর রানার (পাঞ্জাবী) নির্দেশমত রাত বারোটোর পর টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখা বন্ধ করতে হবে। আমরা তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, সারা দেশের লোক টেলিভিশন দেখছে এমন কি প্রেসিডেন্ট স্বয়ং টেলিভিশনে নির্বাচনের খবরা খবর নিচ্ছেন সেখানে আমরা রাত বারোটোর পর খবর শুনলে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। তাকে আরও বললাম যে, তার যদি কোনো অসুবিধা হয় তবে আমরা অন্য বেয়ারা রেখে তাকে তার কর্তব্যের অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে দেব। কিন্তু আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে উক্ত নায়েক পয়া খান নিজেই টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই লেফটেন্যান্ট মুস্তাফিজ টেলিভিশন অন করে। নায়েক পয়া খান দ্বিতীয়বার টেলিভিশন বন্ধ করলে লেফটেন্যান্ট মুস্তাফিজ পুনরায় অন করে। কিন্তু পয়া খান আমাদের তোয়াক্কা না করে তৃতীয়বারও টেলিভিশন বন্ধ করে। এবারেও মুস্তাফিজ টেলিভিশন অন করতে উদ্যত হলে পয়া খান মুস্তাফিজের হাত ধরে ফেলে। তখন আমি রাগান্বিত হয়ে পয়া খানের জামার কলার চেপে ধরে উত্তম-মাধ্যম দিয়ে কক্ষ থেকে বের করে দিলে সে দৌড়ে গিয়ে একটা ছোড়া নিয়ে এসে আমাদের গালাগালি করতে থাকে যে ‘শালা বাঙ্গাল লোককো খতম করেঙ্গে।’ এ সময় সেন্টি দৌড়ে এসে তাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরদিন আমি আমার অফিসার কমান্ডিং মেজর মনোয়ার হোসেনকে লিখিতভাবে এবং মেজর রানাকে মৌখিকভাবে জানাই। পরে ঘটনার তদন্ত চলে। লেঃ কঃ শরিফের সভাপতিত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির বিস্তারিত বিবৃতিতে আমাকে এবং মুস্তাফিজকেই দোষী করা হয় এবং আমাদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল হওয়ার কথা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত, দেশের পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে আমাদেরকে হত্যা করার হুমকি দেখায়। মেজর রানা ক্যাপ্টেন এনামকে আরও বলেছিলেন যে, যেহেতু আমার আত্মীয়স্বজনের অনেকে এমএনএ ও এমপিএ এবং অনেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থক সেহেতু আমি এবং মুস্তাফিজ দুজনই আওয়ামী লীগের সমর্থক সুতরাং আমাদের দুজনকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাত ৯টার সময় (২৭শে মার্চ ১৯৭১) ক্যাপ্টেন এনামের মুখে উপরোক্ত কথা শুনে আমি খুবই ঘাবড়ে যাই। কিছুক্ষণ পর আমি ক্যান্টমেন্ট থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নেই এবং ক্যাপ্টেন এনামকেও আমার সঙ্গে পালানোর ইঙ্গিত দেই। কিন্তু সে নেতিবাচক জবাব দেয় এবং আমার কক্ষ থেকে তার নিজ কক্ষে চলে যায়। আমি চুপ করে মুস্তাফিজের কক্ষে গিয়ে তাকে আমার সঙ্গে পালানোর কথা বলি। সে পালানোর কোনো সিদ্ধান্ত রাতে নিতে পারলো না।

ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরের কিছু কথা

সাক্ষাৎকারঃ এয়ার কমান্ডার এম, কে, বাশার

২৫শে মার্চ বিকেল চারটার সময় বিশেষ বোয়িং তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরী নিয়ে বিমান বন্দরে অবতরণ করে। বিমান বাহিনীর দুইজন অফিসার (তন্মধ্যে একজন আমিও ছিলাম) এবং একজন টেকনিশিয়ানকে বোয়িংটির কাছে যেতে দেয়া হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সেনানিবাস থেকে টেলিফোনে নির্দেশ দেয়া হয় বোয়িং স্টার্ট করার জন্য। রাত আটটায় একটা প্রাইভেট গাড়ীতে করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান (এ গাড়ির ড্রাইভার ছিল একজন কর্ণেল) ঢাকা সেনানিবাস থেকে সোজা বোয়িং-এ উঠে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমান চলে যায়। ঐ

বিমানে প্রেসিডেন্ট একা যান। প্রেসিডেন্টের এভাবে চলে যাওয়াতে আমার ধারণা হল যে, হয়তো জেনারেল হামিদ খান ক্ষমতা দখল করেছেন এবং ইয়াহিয়া খানকে বোয়িং-এ করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জেনারেল হামিদ তখন ঢাকায় ছিলেন।

২৫শে মার্চ রাতে আমি বনানীতে আমার বাসায় ছিলাম। রাত বারটার পরে ভীষণ গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভোর রাত থেকে জনসাধারণ বনানীর ঐ পথ দিয়ে গ্রামের দিকে পালাচ্ছে।

২৭শে মার্চ আমি অফিসে আসি। সেই সময়কার বেস কমান্ডার ছিলেন এয়ার কমান্ডোর জাফর মাসুদ, যিনি মিঠঠি মাসুদ হিসাবে বিমান বাহিনীতে পরিচিত ছিলেন। আমরা বাঙ্গালী অফিসাররা তাঁর সাথে দেখা করলাম এবং দেশের এই পরিস্থিতিতে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, নো ওয়ান উইল টাচ মাই মেন অর অফিসারস বিফোর দে কিল মি'। আমরা তাঁকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন সবাইকে ডেকে সান্তনা দেন। এর মধ্যে ২৯শে মার্চ সেনাবাহিনী বিমান বাহিনীর কাছে বিমান সাহায্য চেয়ে পাঠায়। তিনি সে সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন।

৩০শে মার্চ তিনি বেসের সবাইকে ডেকে ভাষণ দেন। তিনি বললেন, “তোমরা সবাই জান যে সেনাবাহিনী তৎপরতা চালাচ্ছে। আমি বিমান সাহায্য দিতে অস্বীকার করেছি। কিন্তু আমি কতদিন এটা ঠেকিয়ে রাখতে পারব বলতে পারছি না। সমস্ত বাঙ্গালী পাইলটকে এসব মিশনে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি এবং যে সমস্ত বাঙ্গালী টেকনিশিয়ানরা এ সমস্ত বিমানে কাজ করতে চায় না তারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটিতে যেতে পারে।”

এপ্রিল মাসের ৩/৪ তারিখে প্রথম বিমান হামলা চালানো হয় পাবনার আশেপাশে। এয়ার কমান্ডোরের নির্দেশ ছিল যদি কোথাও লোক জমায়েত দেখা যায় প্রথমে যেন ওয়ার্নিং শট করা হয় যাতে করে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অপরদিকে সেনাবাহিনীর নির্দেশ ছিল ম্যাসাকার করার জন্য। এ জন্য এয়ার কমান্ডোর জাফর মাসুদকে বদলি করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

এর মধ্যে সমস্ত বাঙ্গালী অফিসারকে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়। আমরা ছুটি নিলাম। আমরা কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। জিয়াউর রহমানের ভাষণ আমরা শুনেছিলাম। লোকমুখে শুনলাম যে, ময়মনসিংহ এলাকায় প্রতিরোধ চলছে। তখন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মির্জাকে খবর আনার জন্য পাঠানো হয়। সেও ঠিকমত কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি-তবে একটা থমথমে পরিবেশ সে লক্ষ্য করেছিল। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদেরকে আগরতলাতে পাঠানো হয়। সে ভারতে গিয়েছিল এবং খালেদ মোশারফের বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। যখন সে ফিরে কুমিল্লা আসে তখন পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১২ই মে আমরা ঢাকা ত্যাগ করলাম। নরসিংদী হয়ে লঞ্চ রওনা হলাম। লঞ্চ থেকে আমরা দেখলাম যে পাকবাহিনী একটা গ্রাম জ্বলিয়ে দিয়েছে। পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের সাথে আমাদের দেখা হয়। সে তার গ্রামের বাড়িতে আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল।

ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরের আরও কিছু কথা

সাক্ষাতকারঃ আবদুল করিম খন্দকার

ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ বাংলাদেশ ফোর্সেস

(জুন ৭১- ডিসেম্বর ৭১)

২৩শে মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে ঢাকাতে এক আন্তঃসার্ভিসেস কুচকাওয়াজের আয়োজন করার কথা হয়েছিল। আমাকে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ বাহিনীর ঐ প্যারেডের প্যারেড কমান্ডার-এর

দায়িত্ব দেওয়া হয়। জাকজমকের সঙ্গে এই প্যারেড অনুষ্ঠানের কথা ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখে হঠাৎ খবর পেলাম যে প্যারেড বাতিল করা হয়েছে। আমি একটু আশ্চর্য হলাম। আমি আর্মি ডিভিডে কোয়ার্টারে এসে কর্ণেল গীলের সাথে দেখা করলাম। সেখানে আরও কয়েকজন উচ্চ পদস্থ অফিসার ছিলেন, সবাইকে কেমন যেন এক অস্বস্তিকর আবহাওয়া দেখলাম।

২৮শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটা বোয়িং ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। সেটাতে বেসামরিক পোশাকে সেনাবাহিনীর লোকজন ছিল।

১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রত্যেক দিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনীর লোকজন আসতে থাকে এবং প্রত্যহ এর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

ঢাকা বিমান বন্দরে যেদিন থেকে বাঙ্গালী কর্মচারীরা কাজে যোগ দিতে বিরত থাকে সেদিন থেকে পাক সেনাবাহিনী বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রন নিজেদের কাছে রাখে এবং বিমানবন্দরে পজিশন নিয়ে থাকে।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দেওয়ার কথা শুনে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা এক উদ্বেগজনক অবস্থায় ছিল-তিনি কি বলবেন, কি করবেন। মিটিংয়ের পরে কোন গন্ডগোল সৃষ্টি না হওয়ায় তারা একটু আশ্বস্ত হয়। সেদিন সমস্ত সেনাবাহিনীর লোকজনকে জরুরী অবস্থা মোকবেলার জন্য সজাগ বা সতর্ক রাখা হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পর তারা তাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগলো এবং বিমানবন্দর ও সেনানিবাসের চারদিকে এনট্রেন্সড পজিশন নিতে শুরু করে। এবং বাঙ্গালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস সৃষ্টি হতে শুরু হলো।

বিমান বাহিনীতেও শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কমান্ডোদের আনা হচ্ছিল। এয়ারফিল্ডের বিভিন্ন জায়গায় বাঙ্গালীদের সরিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়োগ করা হয়।

২৮শে মার্চ আমি এমওডিসি কমান্ডারকে ডেকে যদি পারে ছুটি নিয়ে এবং অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যেতে বললাম। বেশ কয়েকজন এমওডিসি অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

২৮/২৯শে মার্চে বিমান বাহিনীর স্যাবর জেটগুলোতে রকেট লাগানো শুরু হয়- কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং যে সমস্ত জায়গায় প্রতিরোধ চলছে ঐ সমস্ত এলাকায় বোমা বর্ষণ করার জন্য। রকেট গান ফিট করার কাজে সে সময় বাঙ্গালীরা ছিল। কিন্তু ঐ দিন ঐ কাজে পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়োগ করা হয়। ২৯/৩০শে মার্চ বিমান বাহিনীর চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে বোমা বর্ষণের জন্য যায়। সেখান থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

২৫শে মার্চের ত্র্যাক ডাউন- এর পর আমি নিজেকে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সদস্য বলে মেনে নিতে পারছিলাম না।

আমি ২৯শে মার্চ ছুটির জন্য দরখাস্ত করলাম। দুই সপ্তাহের ছুটি দেয়া হয়েছিল। আমি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মারগুভের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং ৩রা এপ্রিল স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যোগাযোগ ব্যাবস্থার দরুন যেতে পারিনি।

১২ই মে তারিখে আমি, উইং কমান্ডার বাশার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজা (অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইং অফিসার -বদরুল আলম আগরতলাতে পৌঁছি।)

ঢাকার পিলখানার কথা

সাক্ষাৎকারঃ মেজর দেলোয়ার হোসেন

১৯-১১-৭৩

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে ২২ বেলুচকে পিলখানাতে আনা হয়েছিল। তাদেরকে এখানে থাকার জায়গা দেয়া হয়েছিল। এবং পিলখানার ইপিআর-এর সাথে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারনাল সিকিউরিটি ডিউটি করার জন্য ভার দেয়া হয়েছিল। ওরা ওখানে আসাতে ইপিআরদের মাঝে সন্দেহ ও অবিশ্বাস আরো ঘনীভূত হয়। ওদের এখানে আসাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে হয়তো কিছু একটা ঘটতে পারে। ক্যাপ্টেন গিয়াসের সাথেও আমার এব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছিল।

২৫শে মার্চ বেলা একটার সময় মেজর জামিল (পশ্চিম পাকিস্তানী), জেনারেল স্টাফ অফিসার, হেড কোয়ার্টার ইপিআর আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠান। তিন ঘন্টা পর্যন্ত আমি তাঁর অফিসে বসে অফিশিয়াল কথাবার্তা বলেছি। তারপর তিনি আমাকে বললেন যে, তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রহরী এসে আমাকে নিয়ে যায়।

রাত আনুমানিক বারোটোর দিকে চারিদিকে থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। আমি অনুমান করেছি যে, ২২ বেলুচ বাঙ্গালী ইপিআরদের উপর আক্রমণ করেছে। আমাকে ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেদিকেও গুলি এসে পড়ছিল। রাত তিন-চারটার দিকে গোলাগুলি একটু কমে যায়। আমাদের যে সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল তারা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে গুলি ছুঁড়ছিল। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম তারা অনেককে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। ২৬শে মার্চ ঠুসঠাস গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

২৭শে মার্চ সকালে ক্যাপ্টেন আরেফ (পাঞ্জাবী), যে এই হেডকোয়ার্টারে কাজ করতো, আমাকে এসে বলল, “ইউ আর এ গান্দার, ইউর আংকেল ক্যাপ্টেন রফিক ইজ অলসো এ গান্দার। উই আর গোইং টু শট ইউ আউট বোথ।”

১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত আমাকে এখানে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। বন্দী অবস্থায় আমাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু কোন নির্যাতন চালানো হয়নি। পরে আমাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঐ রাতে বহু বাঙ্গালী ইপিআরকে হত্যা করা হয়। বন্দী অবস্থাতে অনেককে হত্যা করা হয়।

মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পিলখানার বাঙ্গালী ইপিআররা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঝখানে দন্ডায়মান বটবৃক্ষের শীর্ষে। বাংলাদেশের সেনানিবাস সমূহের মধ্যে প্রথম জাতীয় পতাকা এখানে উত্তোলন করা হয়েছিল। ল্যান্স নায়ক বাশার এ পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। পরে তাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। পিলখানায় অবস্থিত প্রায় ২৫০০ বাঙ্গালী সৈন্যের ৬ শতাধিক রাতের অন্ধকারে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। বাকি সবাই বন্দী হয়। আর তাদের পাঠানো হয় নৃশংস অত্যাচার ও হত্যার বধ্যভূমি মোহাম্মদপুর বন্দী শিবিরে। পরবর্তী কালে জিসিও/এস সি ও এবং সুশিক্ষিত প্রায় ৭ শতাধিক বাঙ্গালী সৈনিককে হত্যা করা হয়েছিল বুলেট বেয়নেটের নির্মম আঘাতে। ঐ রাতে যারা পালাতে পেরেছিল তাদের অনেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। তারা প্রতি এলাকায় অমিতবিক্রমে পর্যুদস্ত করেছিল পাকিস্তানীদের প্রত্যক্ষ সম্মুখ যুদ্ধে।

বাংলাদেশের দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বাহিনীর ১০০০-এর মত মূল্যবান জীবন স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছিল। অনেকে পঙ্গু অবস্থায় দিন যাপন করছেন।

স্বাক্ষরঃ দেলোয়ার হোসেন

১৯-১১-৭৩

পিলখানার আরও কথা

সাক্ষাতকারঃ মোঃ আশরাফ আলী সরদার

১২-৪-১৯৭৪

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস ছিল। ঐ দিন আমরা প্রস্তুত ছিলাম কোন একটা নির্দেশ পাবার অপেক্ষায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন নির্দেশ পাইনি। তারপর ২৪শে মার্চ আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে পিলখানার প্যারেড গ্রাউন্ডের বটবৃক্ষের শীর্ষে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এবং সে পতাকার উর্দুতে লেখা ছিল, “পশ্চিমারা আবি বাংলা ছোড়কে ভাগ যাও, নেহি ত এধারই তোম লোগ কো কবর বানায়েগা।”

পশ্চিম পাকিস্তানীরা এ পতাকা দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং ঐ পতাকা নামিয়ে ঢাকা সেনানিবাসে পাঠিয়ে দেয়। ঐ পতাকা উত্তোলনের সংবাদ সিগনাল-এর বেতার মারফত সমস্ত সেক্টর, উইং এবং চৌকিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবং তারাও বিকেলে খবর দিল যে তারাও পতাকা উত্তোলন করেছে। যশোর থেকে বেতারে খবর আসল যে সেখানকার বাঙ্গালী ইপিআররা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সামরিক সালাম (গার্ড অব অনার) দিয়ে পতাকা উত্তোলন করেছে।

২৪শে মার্চ রাতে পিলখানায় অবস্থিত সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে নিরস্ত্র করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদেরকে বলে যে, শেখ সাহেবের ৭ই মার্চের ঘোষিত চার দফা ইয়হিয়া খান মেনেছে এবং শিগগিরই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। দেশে এখন শান্তি বিরাজ করছে। সুতরাং সবাই অস্ত্র জমা দিয়ে বিশ্রাম করুন।

২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপরোক্ত ভয়া আশ্বাসে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু যখন গুনতে পারলাম যে নরঘাতক ইয়াহিয়া তার দলবল নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই ঢাকা ত্যাগ করেছে তখন আমি নায়ক সুবেদার শহীদ শমসুল হক সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি সেদিন কোয়ার্টার গার্ড ডিউটি অফিসার ছিলেন। তিনি আমাকে বাইরে গিয়ে সংবাদ নিতে নির্দেশ দিলেন। তখন রাত প্রায় আটটা। আমি সরাসরি ইকবাল হলে যাই। কিন্তু সেখানে কোনো ছাত্রনেতাকে পেলাম না। আমি সেখান থেকে সুবেদার শহীদ জহীরউদ্দিন মুন্সীর বাড়িতে যাই। তাঁকে সমস্ত বিষয় অবগত করাই। তিনি আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করে নায়ক নূর হোসেনের সঙ্গে শেখ সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হন। তিনি আমাকে কি করতে হবে না হবে পরে জানাবেন বলে বললেন। আমি এবং হাবিলদার শহীদ বেলায়েত হোসেন রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষায় সিগনাল ওয়র্কশপে বসে থাকি। আমরা দুজন আমাদের সিগনাল-এর লোকজনকে কিছু একটা খবর আসবে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। এবং ১৫ শাখার জনৈক সিপাহীকে এ সংবাদ পৌঁছে দেই। এছাড়া আমরা উভয়ে আমাদের অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত এনসিও শহীদ নায়ক হাসেমকে জিজ্ঞাসা করি যে, অস্ত্রাগারের কোনো ডুবলিকেট চাবি তৈরি হয়েছে কিনা যা আগে আপনাকে বলা হয়েছিল। তিনি বললেন যে, তার কাছে ডুবলিকেট চাবি আছে। ঐ সংবাদ আমরা শহীদ নায়ক সুবেদার শামসুল হক সাহেবকে কোয়ার্টার গার্ডে গিয়ে জানাই। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে কোন রকম হামলা হলে প্রত্যেকে অনতিবিলম্বে অস্ত্রাগারে চলে আসবে। এখানে আমি উপস্থিত থাকব, তোমরা লাইনে গিয়ে বিশ্রাম নাও এবং দুজন প্রহরী নিয়োগ কর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সে সুযোগ আসেনি।

২৫শে মার্চ দিনগত রাত ১টা পাঁচ মিনিটে প্রথম গুলির আওয়াজ হয়। আমরা প্রত্যেকেই সামরিক পোশাকে ব্যারাকে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। আমাদের প্রহরী আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলে যে পশ্চিমারা আমাদেরকে আক্রমণ করেছে। তখন আমরা সবাই পূর্ব নির্দেশ মতো অস্ত্রাগারে যাবার জন্য বের হয়ে পড়ি। কিন্তু দেখতে পেলাম গুলির আগেই তারা সমস্ত পিলখানাকে অস্ত্রাগারসহ দখলে নিয়ে নিয়েছে। আমরা যখন বাইরে আসলাম তখন চারিদিক থেকে এলএমজি/ এসএমজি ব্রাশ ফায়ার আমাদের উপর আসতে থাকে। তখন আমরা

অনন্যোপায় হয়ে এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকি। অল্প সংখ্যক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাকি সবাই বন্দী হয়ে যায়। রাত ৪টার সময় আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করায়।

৩ নং গেটে কর্তব্যরত কয়েকজন বাঙ্গালী ইপিআর পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। একজন লেফটেন্যান্ট সহ ৬ জন পশ্চিম পাকিস্তানী বেলুচ রেজিমেন্টের লোক নিহত হয়। এই খন্ড যুদ্ধে বাঙ্গালীদের সঙ্গে কর্তব্যরত একজন পাঞ্জাবী ইপিআর মোহাম্মদ খানকেও হত্যা করা হয়। এই খন্ড যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল গার্ড কমান্ডার নায়েক জহিরুল হক। সে তার সহকর্মীদের নিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঢাকায় অবস্থিত সিগনাল- এর প্রধান বেতার কেন্দ্রে খবর পৌঁছে দেয়া হয় যে, উইং কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আবদুর রহমান আওয়ান আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে সমস্ত বেতার যোগাযোগ বন্ধ রাখার জন্য। আমাদের কর্তব্যরত অপারেটররা সংকেতের সাহায্যে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বাইরে কর্তব্যরত সেক্টর/উইং/বিওপি পর্যন্ত সমস্ত ইপিআরকে জানিয়ে দেন। ২৬ শে মার্চ সকাল দশটা পর্যন্ত আমাদের এইচ-এফ (হাই ফ্রিকোয়েন্সি সেট) চালু থাকে যার মাধ্যমে ২৬শে মার্চের ঘটনা নায়েক শহীদ বাশার বাইরের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার শেষ সংবাদে চট্টগ্রামকে বলেছিলেন যে, আমাদের সবাই বন্দী হয়ে গেছে। হয়তো কিছুক্ষণ পর আমিও বন্দী হয়ে যাব এবং আর নির্দেশ দেবার সময় পাবনা। তোমরা সমস্ত পশ্চিমাদের খতম কর। চট্টগ্রাম থেকে হাবিলদার বাহার উক্ত সংবাদ সীমান্তের চৌকি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং আমাদের লোকজনকে অনুপ্রাণিত করার জন্য সে বলেছে যে, আমি ঢাকা থেকে বলছি। সম্পূর্ণ ঢাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন চলে এসেছে এবং ইপিআর- এর ডাইরেক্টর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নেসার আহমদ বন্দী হয়েছেন। তোমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়। এবং সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানীদের বন্দী করে আমাদের রিপোর্ট দাও।

প্রতিরোধ যুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ বাহিনী

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ আসমত আলী আকন্দ*

এস, আই অব পুলিশ, রমনা থানা, ঢাকা

১০-১-৭৪

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি রাজারবাগ রিজার্ভ অফিসে কাজ করছিলাম। আমাদের রিজার্ভ অফিসের বাইরে সহস্র বিক্ষুব্ধ জনতা বড় বড় গাছ ও ইট পাটকেল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করেছিলো। সন্ধ্যার সময় এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, পাক হানাদার বাহিনী রাজারবাগ পুলিশের রিজার্ভ অফিস আক্রমণ করবে। এ সংবাদ শোনার পর আমি রাত সাড়ে নটার সময় তেজগাঁও থানায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তাকে ঢাকা সেনানিবাসে পাক হানাদারদের মনোভাব কি তা জানাবার জন্য টেলিফোনে অনুরোধ করি। তিনিও পাক হানাদার কর্তৃক রাজারবাগ রিজার্ভ অফিস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার কথা শুনেছেন বলে জানান। এরপর আমি তেজগাঁও আবার টেলিফোন করে জানতে পারি যে তখন পাক হানাদারদের প্রায় ৮০/৯০টি সশস্ত্র ট্রাক ও জীপ তাদের থানার রাস্তা ধরে রাজধানীতে প্রবেশ করতে তারা দেখেছেন। রাজারবাগ রিজার্ভ পুলিশের ওপর পাক হানাদারদের এমন উলঙ্গ হামলার সংবাদ শুনে আমাদের আরআই একেবারে হতবাক হয়ে যান। এরপর আমরা পুলিশ রিজার্ভের অস্ত্রাগার থেকে প্রয়োজন মতো অস্ত্র নিয়ে হানাদারদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করার জন্য রাজারবাগ পুলিশ রিজার্ভ অফিসের চারিদিকে পজিশন নিয়ে শত্রুর অপেক্ষা করতে থাকি। আমরা পুলিশ লাইনের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে সমস্ত পরিবেশ একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলি। আমরা বাইরে অনেক দূর থেকে পাক হানাদারদের বিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণের শব্দ শুনিছিলাম। আমরা শুধু পজিশন নিয়ে শত্রুর অপেক্ষা করছিলাম। অয়ারলেস ও টেলিফোনের সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

* ১৯৭১ সালের পূর্বে রাজারবাগ পুলিশ রিজার্ভ অফিসের প্রোসিডিং সেকশনে এ-এস-আই হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

সারা শহর অন্ধকার, নীরব, নিথর ও নিস্তব্ধ। আনুমানিক মধ্যরাতে পাক হানাদাররা প্রথম রাজারবাগ পুলিশ লাইনের হাসপাতালের গেট (দক্ষিণ দিক) থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। আমরা তার পাল্টা জবাব দেই। এবং পাক পশুদের প্রাণপণ প্রতিহত করার চেষ্টা করি। ওরা আমাদের লৌহকঠিন মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ভারী অস্ত্র, শেল, কামান ও ট্যাংক ব্যবহার করে। আমাদের ওপর সাংঘাতিকভাবে বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ হতে থাকে। আমরা প্রথমে আত্মসমর্পণ করিনি এবং আত্মসমর্পণ করার মতো কোনো দুর্বলতাও আমরা দেখাইনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের উদাত্ত আহবান অনুযায়ী আমরা আমাদের যার হাতে যে অস্ত্র ছিল তা দিয়ে সমস্ত পাক হানাদারদের প্রাণপণ প্রতিহত করার চেষ্টা করি। এবং এভাবে আমাদের সামান্য অস্ত্র নিয়ে পাক হানাদারদের প্রাণপণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে করতে আমরা জীবনদান করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে তখন পাক পশুদের মোকাবেলা করছিলাম। আমাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ওরা গভীর রাতে রিজার্ভ অফিসের উত্তর দিকে টিনশেড ব্যারাকে লাইট বোম ও পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেখানে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল আমাদের এমন কতিপয় বীর সিপাহী নিদারুন ভাবে দক্ষীভূত হয়ে শহীদ হন। অনেকে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে সেখানেই মৃতবৎ পড়ে থাকেন। আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকে এবং সমস্ত ব্যারাক পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। আমরা উপায়ান্তর না দেখে ছাদের উপর গিয়ে অত্মরক্ষা করতে থাকি। এবং পাক হানাদারদের প্রাণপণ প্রতিরোধ করতে থাকি। আমরা ব্যারাকের চারিদিকে লেলিহান আগুনের শিখায় কিছুমাত্র দমে যাইনি। আর আমাদের মনোবল কোনো সময়ই দুর্বল হয়ে পড়েনি। ওদিকে কামান, শেল আর ট্যাংকের গর্জন ও বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ চলছিল। কামান ও শেলের প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের কয়েকটি পাকা ব্যারাকের প্রাচীরঘেরা মটর ওয়ার্কশপ মাটিতে ধসে পড়ে। ফলে আমাদের বীর সিপাহীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নিজ নিজ সুবিধামত স্থান গ্রহণ করে চারদিকে জুলন্ত আগুন, অবিরাম শেলিং ও কামানের গর্জনের মধ্যে প্রাণপণ প্রতিরোধ করছিল পাক পশুদের। আমাদের অনেক বীর সিপাহীকে প্রতিরোধ করতে করতে শহীদ হতে আমি দেখেছি স্বচক্ষে। এমনি ভাবে পাক হানাদারদের প্রতিহত করতে করতে রাতের অন্ধকার কেটে যায়। ভোর হয়ে যায় এবং বেলা উঠে যায়। এরপর আমাদের গুলি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায় দেখে আমরা আর কোন উপায়ান্তর পাই না। ইতিমধ্যে পাক হানাদারদের হাজারো হুমকির মুখেও আমাদের মনোবল এতটুকু দুর্বল হয়ে পড়েনি। তারা ব্যারাকে ঢুকে আমাদেরকে বন্দী করে এবং ছাদের উপর থেকে আমাদেরকে নিচে নামিয়ে এনে বুটের লাথি এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে সজোরে এলোপাতারি আঘাত করতে শুরু করে। আকস্মিক এক হানাদার পাক পশু হাতের বন্দুক দ্বারা আমার মাথায় সজোরে আঘাত করলে আমার মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। তিন ঘন্টা পড় আমি জ্ঞান ফিরে পাই। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এমআই, এএসআই, হাবিলদার, সুবেদার, নায়ক, সিপাহীসহ আমরা প্রায় দেড়শত বীর যোদ্ধা পাক হানাদারদের হাতে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়। ২৯শে মার্চ বিকাল সাড়ে চারটায় ঢাকার তৎকালীন পুলিশ সুপার জনাব ই.এ. চৌধুরী রাজারবাগে আমাদের পুলিশ লাইনে আসেন এবং পাক হানাদারদের মেজরের সাথে কথোপকথনের পর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়- “আব তুমলোগ চালা যাও, আয়েন্দা কাল ভোর ছয় বাজে মিল ব্যারাকমে তোমলোগ রিপোর্ট করোগা, আগর উহাই তোমলোগ রাহোগা- ইদার হামলোগকা জোয়ান রাহোগা।”

সাক্ষাৎকারঃ আঃ গণি তালুকদার *

অফিস সহকারী (পুলিশ), রমনা থানা, ঢাকা (সদর)

৯-১-৭৪

সিপাহী আবদুল খালেক, মোজাম্মেল হক, মুখলেসুর রহমান, মির্জা মহিউদ্দীন এবং আরও অন্যান্য বন্ধু ও সহকর্মীসহ আমরা ২৫শে মার্চ রাত দশটার সময় খাওয়া- দাওয়া করে ১৪ নং ব্যারাকে বসেছিলাম। রাত পৌনে

* ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রাজারবাগ (রিজার্ভ) পুলিশ লাইনে ওয়ারলেস অপারেটর ছিলেন।

এগারোটার সময় ঢাকা পিলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টার থেকে টেলিফোনে পাক হানাদার কর্তৃক রাজারবাগ পুলিশ রিজার্ভ ও ইপিআর হেড কোয়ার্টার আক্রমণের সংবাদ পাই। টেলিফোনে ইপিআর হেড কোয়ার্টার থেকে আমাদেরকে সশস্ত্রভাবে পাক হানাদারদের মোকাবেলা করার জন্য তৈরী থাকতে বলা হয়। আমরা আমাদের ১৪নং ব্যারাকে মোট পঞ্চাশজন সিপাহী এসআই, হাবিলদার ও সাধারণ সিপাহী উপস্থিত ছিলাম। এ সংবাদ দ্রুত রাজারবাগ রিজার্ভ পুলিশের আরআই ও এসপি হেডকোয়ার্টারকে জানানো হয়। এ সংবাদ পেয়ে রিজার্ভ পুলিশের সকল অফিসার ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সবাই ডিউটিতে এসে সকল সিপাহী, সুবেদার, এসআই, এসআই, হাবিলদার সবাইকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে পাক হানাদারদের মোকাবেলা করার জন্য তৈরী করেন এবং প্রত্যেককে ডিউটিতে মোতায়েন করেন। তৎকালীন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ সুপার মিঃ শাহজাহান ও আরআই মিঃ মফিজউদ্দিন আমাদের এই সশস্ত্র প্রস্তুতিতে নেতৃত্ব দান করেন।

পুলিশ সুপার ও আরআই উভয়েই শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দান করে নিজ নিজ দায়িত্বে চলে যান। এরপর রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। আমরা সকল সিপাহী, হাবিলদার, সুবেদার, এসআই, এসআই সবাই সশস্ত্রভাবে পজিশন নিয়ে হানাদার পাক বাহিনীর অপেক্ষা করতে থাকি। এসময় অয়ারলেস এবং টেলিফোন সব কিছু অচল করে দেয়া হয়েছিল। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বাইরে সহস্র ছাত্র-জনতা বড় বড় গাছ, লাইটপোস্ট, ইট- পাটকেল ফেলে ব্যারিকেড তৈরী করে। রাজারবাগে প্রবেশ করার পথে পথে বহু প্রশস্ত ড্রেন কাটা হয় হানাদার বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্য। এভাবে প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ তৈরী করার মধ্য দিয়ে সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। পাক হানাদাররা রাত সাড়ে এগারোটার সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইনে চারিদিক থেকে লাইট বোম মারতে মারতে অগ্রসর হয়। এর মধ্যে চলছিল বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ, কামান ও ট্যাংকের গর্জন। পাক হানাদারদের হামলার সাথে সাথে আমরা সবাই আমাদের সামান্য রাইফেল বন্দুক নিয়ে ওদের হামলার প্রাণপণ জবাব দিতে থাকি। ওরা আমাদের দৃঢ় মনোবল দেখে এরপর যুগপৎ কামান ও ট্যাংক ব্যবহার করে। আমরা টিকতে না পেরে ক্রমে পিছু হটতে থাকি। আমাদের আধিকাংশ বীর যোদ্ধা লড়তে লড়তে শহীদ হন। অনেকে দারুণভাবে আহত হয়ে মৃতবৎ সেখানেই পড়ে থাকেন। আর অনেকে আহত দেহ নিয়ে প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হন। পাক হানাদার পশুরা আমাদের লৌহকঠিন মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এরপর রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল ব্যারাকে লাইট বোমা ও প্রেট্রোল দ্বারা আগুন লাগিয়ে দেয়। আমাদের বহু আহত যোদ্ধা ঐ সকল ব্যারাকে আটকা পড়ে জ্বলন্ত আগুনে দক্ষীভূত হয়ে শাহাদাৎ বরণ করেন। আনুমানিক রাত তিনটার সময় অবিরাম গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে আমি আমার অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করার জন্য ঢাকা শহরের বাইরে চলে যাই।

সাক্ষ্যকারঃ শরীফ খান মোহাম্মদ আলী *

আর্মড সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ

বিআরপি, রাজশাহী

৩-২৭৪

১৯৭১সালের ২৫শে মার্চ সকাল থেকে আমাদের পুলিশ লাইনে নীরব, নিস্তব্ধ ও থমথমে ভাব বিরাজ করছিলো। স্পেশাল আর্ম ফোর্স-এ আমার লাইনে রাত আটটার বাইরের কর্তব্যরত সিপাহী বাদে আমি নাম ডাকার সময় মাত্র ত্রিশজন বাঙ্গালী সিপাহীকে উপস্থিত পেয়েছি। আমি কোন অবাঙ্গালী সিপাহীকেই লাইনে উপস্থিত পাইনি। ওরা সন্ধ্যার পরপরই আমার লাইন থেকে ডিউটি ত্যাগ করে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল তার কোনো হদিস পাইনি। নাম ডাকার সময় বিপুলসংখ্যক সিপাহীর এভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ইতিহাসে আর ঘটেনি। ঢাকা জেলা রিজার্ভ লাইনের এ অবস্থা ছাড়া কেন্দ্রীয় লাইন থেকেও

* ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হাবিলদার মেজর হিসেবে কর্মরত ছিল।

সেদিন সকল অবাকালী সিপাহী তাদের পদস্থ অফিসারদের নির্দেশ ও মর্যাদা একেবারে উলঙ্ঘ্যভাবে, পুলিশের ইতিহাসে এই প্রথম, অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে সম্মিলিতভাবে একযোগে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। অবাকালী সিপাহীদের রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে এভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার পর আমরা আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে পারি এবং আমার অধীন বাঙ্গালী সিপাহীদের হাতে অস্ত্র দিয়ে পুলিশ লাইনের সকল প্রবেশপথে তাদেরকে কড়া প্রহরায় নিয়ুক্ত করি। পুলিশ লাইনের চারটি প্রবেশপথে চারজন হাবিলদারের সাথে ছয়জন করে সশস্ত্র সিপাহী মোতায়েন রাখি। আমি খুব চিন্তাযুক্তভাবে পুলিশ লাইনে টহলরত ছিলাম। আমি এক সময় দোতলা থেকে অস্ত্রাগারের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলাম। এমন সময় অস্ত্রাগারের ভিতরের টেলিফোনটি বেজে উঠলে আমার কর্তব্যরত নায়ক চীৎকার করে আমাকে টেলিফোন ধরতে বলে। আমি দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম। অস্ত্রাগারের সেই টেলিফোনে এব ভীতসন্ত্রস্ত কাঁদো কাঁদো কম্পিত কণ্ঠ চাপাচাপা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলছিল “মিলিটারী হেডকোয়ার্টারে বহু সশস্ত্র আর্মি ট্রাক লাইন হয়ে দাড়িয়ে আছে। ওরা এফুনি রাজধানী আক্রমণ করতে যাচ্ছে”। সেই ভীত কণ্ঠ আরো বলছিলো- “ওদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ই-পি-আর হেডকোয়ার্টার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল।” এ কথা বলেই সেই কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেলো। “কে বলছেন? কোথা থেকে বলছেন”? আমি চীৎকার করে এসব প্রশ্ন করার সাথে সাথে টেলিফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সিপাহীরা টেলিফোনের এ মারাত্মক সংবাদ লাইনের সর্বত্র চীৎকার করে ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। এ সংবাদে সকল সিপাহী অস্ত্রাগারের দিকে ছুটে এসে টেলিফোনের সংবাদ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। এ সময় আমি লাইনে বসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের তৎকালীন আর-আই মিঃ মফিজউদ্দীনের সাথে তার বাসায় টেলিফোনে যোগাযোগ করে ঢাকা সেনানিবাস থেকে বাঙ্গালী কণ্ঠ ভেসে আসা পাক সেনাদের রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দিকে সদন্তে ধেয়ে আসার সংবাদ বিস্তারিত জানালে তিনি তৎকালীন পুলিশ সুপার ই,এ, চৌধুরী সাহেবকে সব কিছু জানাচ্ছেন বলে টেলিফোন ছেড়ে দেন। এদিকে আমার সিপাহীরা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনের চারশত বাঙ্গালী সিপাহী বলছিলো “অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও। আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দাও, আমরা ওদের প্রতিরোধ করবো, প্রতিহত করবো।” শেষ পর্যন্ত অস্ত্রাগারের সামনে দাঁড়িয়ে আমার হাবিলদার সহকর্মীরা বুকফাটা চীৎকারে রাজারবাগ কাঁপিয়ে তুলে বলছিলো “আমাদের হাতে অস্ত্র দাও, আমরা লড়বো, লড়তে লড়তে মরবো, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করবো ঐ বেঙ্গলমানদের বিরুদ্ধে কিন্তু পিছু হটবো না, হটবো না।” এরপর আমি রিজার্ভ ইন্সপেক্টর সাহেবের বাসায় গিয়ে তাকে না পেয়ে আমাদের ফোর্সের সুবেদার আবুল কাসেমকে এ সংবাদ জানালে তিনি লাইনে ছুটে আসেন। এর পরপরই আমাদের আর-আই সাহেব পুলিশ সুপার ই,এ চৌধুরীর সাথে আলাপ-আলোচনা করে লাইনে এসে বলেন, “তোমরা ওদের রুখতে পারবে না কোন প্রকারেই, দেখ আমাদের নীরব থাকাই ভালো-।” কিন্তু তখন নীরব থেকে প্রাণ বাঁচাবার কোনো উপায় ছিল না। পুলিশ লাইনের সকল বাঙ্গালী সিপাহীই তখন অস্ত্র নিয়ে ওদেরকে প্রাণপণ প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাকুল ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। সিপাহীরা বলছিলো, “আর-আই সাহেব আপনি অস্ত্রাগার খুলে দিন, আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিন, আমরা ওদের প্রতিরোধ করবো।” এরপর আর-আই সাহেব অস্ত্রাগারের চাবি দিয়ে দিলে বাঙ্গালী সিপাহীরা সবাই পাগলের মতো অস্ত্রাগারে প্রবেশ করে যার যার প্রয়োজন মতো রাইফেল ও গুলি হাতে তুলে নেয়। এ সময় চারিদিক থেকে হাজারো জনতা রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রবেশ করে আমাদের অস্ত্রাগার থেকে বিনা বাধায় অস্ত্র নিয়ে যায়। এসময় আমাদের অফিসাররা বাইরে কর্তব্যরত ছিলেন। এ সময় সুবেদার ফোর্স আবুল কাসেম, আর-ও হাফিজুর রহমান, সার্জেন্ট মুর্তজা হোসেন, সুবেদার আবুল হাসেম, নায়ক মোহাম্মদ আলী (ফুটবল খেলোয়াড়) সবাই সশস্ত্রভাবে আমাদের সিপাহীদের সাথে মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তৈরী ছিলেন। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে সমস্ত সিপাহী লাইনের চারিদিকে মাটিতে শুয়ে, ছাদের উপর বসে থেকে, দাঁড়িয়ে থেকে, গাছের আড়ালে থেকে পজিশন নিয়ে পাক পশুদের অপেক্ষায় ছিলো। সেদিন হাবিলদার তাজু আহমেদ, হাবিলদার আবুল হোসেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল খেলোয়াড় নায়ক মোহাম্মদ আলী, হাবিলদার আতাউর রহমান, সিপাহী মোহাম্মদ আলী, আরও কতিপয় হাবিলদার, নায়ক ও

সিপাহী এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ ফোর্সের সুবেদার খলিলুর রহমান মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করে সবার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ লাইনের সবাইকে এ প্রতিরোধে বীরের মতো নেতৃত্ব দিয়েছেন। ওদের সকলকে সালাম।

আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে পজিশন নিচ্ছিলাম ওদের প্রতিরোধ করার জন্য। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোনে এক ভীতসন্ত্রস্ত কম্পিত বাঙ্গালী সিপাহী কণ্ঠ বলছিলো, “ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ফাঁড়ি থেকে বলছি একশত সশস্ত্র পাক আর্মির ট্রাক সেনানিবাস ছেড়ে সদর্পে রাজধানীর দিকে এগোচ্ছে-”। এরপরই আরেক বাঙ্গালী পুলিশের কণ্ঠ টেলিফোন থেকে ভেসে আসলো, সেই মার্জিত কণ্ঠ বলছিলো, “তেজগাঁ থানার সামনে দিয়ে সশস্ত্র আর্মি ট্রাক রাজধানীর দিকে এগোচ্ছে।” এরপর আমাদের ওয়ারলেসে এক পুলিশ কণ্ঠ বলে উঠলো, “ময়মনসিংহ রোড থেকে টহলরত অফিসার বলছি, পাক আর্মির বহু ট্রাক রমনা রেসকোর্স মাঠে এসে জড়ো হয়েছে।” কিছুক্ষণ পরই দেখলাম পাক পশুর একটি দল হাতে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান নিয়ে সশস্ত্রভাবে চোরের মতো টিপে টিপে পা ফেলে আমাদের পুলিশের লাইনের উত্তর দিকের ব্যারাকের রাস্তা ধরে কিছুদূর এসেই আমাদের ব্যারাকের দিকে গুলি বর্ষণ করে। সাথে আমাদের রাইফেল গর্জে ওঠে। ওদের গুলিবর্ষণের জবাব দেই আমরা সম্মিলিতভাবে। পাক পশুদের প্রথম অগ্রগামী দলের কিছু সেনা মারা যায়। রাস্তায় ওদের লাশগুলো পড়ে থাকে। অবশিষ্ট পাক পশু বিপদ বুঝতে পেরে সেই অন্ধকারে আবার চোরের মতো পিছু হটে যায়। এ ঘটনা ঘটে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দক্ষিণ- পূর্ব কোণে হাসপাতালের দিক থেকে অবিরাম শেলিং করতে থাকে পাক পশুরা। এরপর তারা উন্মত্তের মতো শেলিং করতে থাকে আমাদের পুলিশ লাইনের বিল্ডিং-এর উপর, উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে। এভাবে তারা অবিরাম শেলিং করতে করতে পুলিশ লাইনের পূর্ব দিক থেকে ঢুকে পড়ে আমাদের এলাকার অভ্যন্তরে। আমাদের রাইফেলধারী বাঙ্গালী পুলিশ প্রহরী তখন প্রাণপণ প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল পাক পশুদের অবিরাম শেলিং- এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমাদের বহু সিপাহী পুলিশ লাইনের পূর্ব দিকে ওদের প্রাণপণ প্রতিরোধ করতে করতে শহীদ হন। অবশিষ্ট সিপাহীরা রাইফেল নিয়ে পিছু হটে আমাদের ব্যারাকের বিভিন্ন নিরাপদ জায়গায় পজিশন নিয়ে ওদের প্রতিরোধ করতে থাকে। আমাদের সিপাহীদের প্রতিরোধ ও দৃঢ় মনোবলের সম্মুখে ওরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের পুলিশ লাইনের পূর্ব দিকের ব্যারাকে লাইট- বোম বৃষ্টির মত বর্ষণ করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করছিল। ওদের অবিরাম গোলাবর্ষণে আমাদের ব্যারাকের চারিদিকে আগুন ধরে যায়, অস্ত্রাগারের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে যায়। দোতলার দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়তে থাকে আস্তে আস্তে। ওরা আমাদের আওতার বাইরে থেকে শেলিং করছিল, আর লাইট- বোম মারছিল আমাদের পুলিশ লাইনের একেবারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ওরা তখনও সাহস পায়নি। রাত আনুমানিক আড়াইটার সময় ওরা মরিয়া হয়ে আমাদের ব্যারাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। অবিরাম শেলিং হচ্ছিল, আগুনের ভয়ংকর ফুলকি নিয়ে লাইট- বোমগুলি একের পর এক পড়ছিল আমাদের দিকে। চারিদিকে আমরা ট্যাংক ও কামানের কান ফাটা ভীষণ গর্জন শুনছিলাম। পাক পশুরা এভাবে অজস্র শেলিং ও কামানের গোলাবর্ষণ করতে করতে আমাদের আওতার ভিতর এসে গেলে আমাদের সিপাহীদের রাইফেলগুলো আবার গর্জে ওঠে। পশুদের কতিপয় আমাদের বীর নায়ক বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়ারের নেতৃত্বে, আমাদের সিপাহী কয়েস, সান্তার, হাফিজ, নায়ক আঃ সুবহানের রাইফেলের গুলিতে মাটিতে পড়ে যায়। আর অবশিষ্ট পশুর দল পিছু হটে যায়। আমাদের বীর সিপাহীরা অবিরাম প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল, প্রাণপণে ব্যারাকের সেই জ্বলন্ত আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের বীর সিপাহীরা বীরবিক্রমে প্রতিহত করছিল। উন্মত্ত সেনাদের অগ্রগতিকে রুখে দিচ্ছিল নির্ভিক ভাবে। আগুন ক্রমে ক্রমে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উত্তর দিকের ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়ছিল। আগুনের লেলিহান শিখায় সেই ধৈর্যে আসা ভস্মের মধ্যে আমাদের কতিপয় বীর সিপাহী প্রতিরোধ সৃষ্টি করার সময় অকস্মাৎ আটকা পড়ে নিদারুণ ভাবে শহীদ হন। আর অবশিষ্ট সিপাহী আগুন ও শেলিং- এর মুখে আস্তে আস্তে পিছু হটে হটে আমাদের প্রধান বিল্ডিং-এর দিকে আসতে থাকে- আমাদের বীর সিপাহীরা তখনও প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল বীর বিক্রমে। মাইক্রোফোনে ওদের উন্মত্ত গর্জন শুনছিলাম, “তোমলোগ সারেভার করো, হত্যার দে দাও, নাই তো খাতাম কার দিওঙ্গা, তামা হো যায়েগা।”

আমাদের বীর সিপাহীরা ওদের মিথ্যা ভাঁওতায় কান না দিয়ে প্রাণপণ প্রতিরোধ করছিলো ওদের। কিন্তু আমাদের বীর সিপাহীরা ও আমাদের সকলের গুলি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আমাদের অস্ত্রাগারেও তখন প্রবেশ করার কোন উপায় ছিলো না। সেখানে ওরা গোলাবর্ষণ করছিলো উন্মত্তভাবে। আমি উপায়ান্তর না দেখে পিছু হটেতে হটেতে পুলিশ লাইনের দক্ষিন দিকে অবস্থিত ঘোড়ার আস্তাবলের পিছনের রাস্তা দিয়ে আমিনবাগের মধ্যে দিয়ে চলে এসে প্রাণ বাচাই। এরপর আমি গ্রামের দিকে গিয়ে বাংলার মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ঢাকার মিরপুরে প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মোহাম্মদ আঃ সোবহান*

ইন্সপেক্টর অব রিজার্ভ পুলিশ

বি-আর-পি, রাজশাহী

২৯-১-৭৪

আমার ওয়ারলেস সেটটি কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রাজারবাগ অয়ারলেস কন্ট্রোল রুম থেকে আর এক বাঙ্গালী পুলিশের কণ্ঠ ঘোষণা করলো, “অল অফিসার্স অফ এন্ড অ্যাবভ র্যাংক অফ ইন্সপেক্টরস উইল প্রোসিড টু দেয়ার কোয়ার্টার্স।” হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালের পশ্চিমের গেটে প্রহরারত বাঙ্গালী পুলিশের ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠ আমার অয়ারলেস সেটে বেজে ওঠার পর এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কন্ট্রোল রুমের অয়ারলেস থেকে সতর্কবাণী পাওয়ার পর আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পরেছিলাম। এরপর বিএসপি, ইন্সপেক্টর সহ সকল পদস্থ বাঙ্গালী পুলিশ অফিসার যারা মিরপুর ও অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন সেকশন ও সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন, অয়ারলেস মারফৎ রাজারবাগ কন্ট্রোল রুম থেকে উপরোক্ত নির্দেশ পাওয়ার পর সবাই হেড কোয়ার্টারে চলে গেলে আমি আমার এক প্লাটুন (৩৭জন পুলিশ) নিয়ে মিরপুর থানায় গিয়ে উঠি। সেখানে আমি মিরপুরের বিভিন্ন সেকশনে কর্তব্যরত সকল ফোর্সকেই জমায়েত দেখতে পাই। সারা মিরপুরে এ সময় থমথমে ভাব বিরাজ করছিলো। হঠাৎ পুলিশ (কমিশনার বিল্ডিং) কন্ট্রোল রুম থেকে আবার অয়ারলেস সেটে বাঙ্গালী পুলিশের কম্পিত কণ্ঠ বেজে উঠলো। সেই কণ্ঠ বলেছিলো- “পাক আর্মি ভারি কামান, ট্যাংক ও মেশিনগান নিয়ে আমাদের কন্ট্রোল রুম ঘেরাও করে ফেলেছে। ওরা গোলাবর্ষণ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য- ওরা ভীষণভাবে ধৈর্যে আসছে- তোমরা যে যেখানে থাক এগিয়ে এসো, আমাদের রক্ষা করো, বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও।” সেই কণ্ঠ বলে যাচ্ছিল- “রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকপশুদের হামলা হয়েছে, সেখানেই গোলাগুলি চলছে, আমাদের বীর পুলিশরা লড়াই, সেখানকার অয়ারলেস বেইচ থেকে আমরা কোন শব্দ পাচ্ছি না, সব নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।” পরক্ষণেই আমরা ঢাকার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আকাশে বৃষ্টির মতো লাইট-বোম উড়ছে। কামান, ট্যাংক আর গোলাবর্ষণের ভীষণ গর্জন শুনছিলাম, অসংখ্য মানুষের বুকফাটা অসহায় কান্নার রোল ভেসে আসছিলো। অস্থির অধীর ছাত্র জনতা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই অসংখ্য কামান, ট্যাংক ও গোলাবর্ষণের আগুনের মধ্যে। চোখের সামনে দেখলাম আগুন আর আগুন, জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলছে, রাজধানী ঢাকা জ্বলছে। চোখ ফিরিয়ে মোহাম্মদপুরের আসাদ গেটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানেও ভীষণ গুলি আরম্ভ হয়ে গেছে, বাড়ি ঘর জ্বলছে। সেই ভয়াল ও ভয়ংকর গোলাবর্ষণও আগুনের লেলিহান শিখা আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো, আমাদের ফোর্স সবই মিরপুর থানায় জমায়েত হয়েছিল। অর্ধেকের হাতে ছিল লাঠি আর অর্ধেকের হাতে ছিল সাধারণ রাইফেল আর বিশ রাউন্ড গুলি। মিরপুর থানায় এভাবে বসে থাকলে সব এক সাথে ওদের ঘেরাওর মধ্যে পড়ে কুকুর-বিড়ালের মতো মরতে হবে ভেবে আমরা আমাদের ফোর্সকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পজিশন নিতে বলি আর আমার সিপাহীদের যাদের হাতে শুধু

*মোহাম্মদ আবদুস সোবহান ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আর্মড সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মিরপুর দশ নম্বর সেকশনে জরুরী টহলে গিয়েছিলেন।

লাঠি ছিল তাদের চলে যেতে বলি আত্মরক্ষার জন্য। আমি আমার ফোর্স নিয়ে মিরপুর ইটখোলার ভিতরে পজিশন নিয়ে পাক পশুদের অপেক্ষা করতে থাকি। আমরা পালাই-নাই। কারণ পালাবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দৃঢ় শপথ নিয়েছিলাম। সামান্য রাইফেল নিয়েই আমরা পশুদের প্রতিরোধ করবো। প্রতিহত করবো, লড়াইবো কিন্তু পিছু হটবো না। সারারাত আমি আমার সশস্ত্র ফোর্স নিয়ে সেই ইটখোলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে পজিশন নিয়ে বসেছিলাম। আর ঢাকার আকাশে দেখছিলাম আগুনের লেলিহান শিখা, সকল নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার সহিত পাক পশুদের কামান ও ট্যাংক যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা। রাত তিনটার সময় আমরা দেখছিলাম আমাদের চোখের সম্মুখে চারটি সশস্ত্র পাক সেনাদের ট্রাক চলে গেল। ট্রাকের পিছনে পিছনে যাচ্ছিল কামান বসানো 'ডজ'। মিরপুর ইপিআর বাহিনীর সাথে আমরা পাক আর্মিদের এক ঘন্টা তুমুল সংঘর্ষ দেখলাম। কামান ও ট্যাংকের কানফাটা গর্জনে আমরা সবাই বিমূঢ় হয়ে পড়ছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম পাক আর্মি সেই সশস্ত্র ট্রাকগুলো নিয়ে ফিরছে তার পিছনে আরও তিনটি ট্রাক আসছিল। ঐ অতিরিক্ত ট্রাকে ছিল সংঘর্ষে পর্যুদস্ত বাঙ্গালী ইপিআর বন্দীরা। আমাদের সম্মুখ দিয়েই পাক পশুদের সশস্ত্র ট্রাকগুলি ইপিআর বন্দীদের নিয়ে সদর্পে এগোচ্ছিল। আমি আমার সিপাহীদের ওদের ওপর গুলি বর্ষণ করতে নিষেধ করেছিলাম। ওদের গাড়ীগুলো এগোচ্ছিল-সবাই চলে গেল। পিছনে দুটি গাড়ী থাকতেই আমার এক সিপাহী হঠাৎ ওদের প্রতি গুলিবর্ষণ করতেই ওরা সবাই ট্রাক থামিয়ে নেমে পড়ে কুকুরের মতো। ভীষণ ব্রাশ ফায়ার শুরু হয়ে যায় আমার সিপাহীদের উপর। আমাদের উপর পড়ছিল অসংখ্য গ্রেনেড, আরোও পড়েছে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান থেকে বৃষ্টির মতো অসংখ্য গুলি। আমরা আমাদের সামান্য রাইফেল নিয়েই পশুদের প্রাণপণ প্রতিরোধ করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর আমাদের গুলি শেষ হয়ে গেলে আমরা গুলিবর্ষণ করতে করতে আস্তে আস্তে পিছু হটে যেতে থাকি-আমাদের হাতে সামান্য রাইফেল থাকলেও ওরা রাতের কালো অন্ধকারে সেই ভারী কামান, ট্যাংক বহর ও অসংখ্য মেশিনগান, গ্রেনেড ও সশস্ত্র সৈন্য নিয়েও আমাদের সামনে সদৃশ্যে এগিয়ে আসতে সাহস পায় নাই। আমাদের দুর্জয় মানসিক শক্তির সামনে ওরা প্রথমত আসতে সাহস পায় নাই। সামান্য রাইফেল দিয়েই ওদেরকে প্রায় এক ঘন্টা প্রতিরোধের পর আমি আমার ফোর্স নিয়ে পিছু হটছিলাম। আমার ফোর্স সব পিছনে চলে গিয়েছিলো। আমি আমার দুর্জয় সিপাহী নিয়ে একাই ওদের বিরুদ্ধে ফাইট দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ওরা নীরব-ওদের নীরবতা দেখে আমি ওদের ঘেরাওয়ার মাঝে পড়ে যাওয়ার ভয়ে পিছু হটে চলে আসি। পিছনে এসে দেখলাম এক প্রাসাদের ছাদের উপর এক বিদেশী দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তার গেটের সামনে যাওয়ার সাথে সাথে সেই বিদেশী ভদ্রলোক এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বিল্ডিংয়ের পিছনে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু সে জায়গা নিরাপদ মনে না করায় আমরা সেই ভদ্রলোকের পরামর্শ অনুযায়ী তার বিল্ডিংয়ের পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার এক সিপাহীর কথামত আমরা সবাই নিকটবর্তী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মান্নান সাহেবের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেই। তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট যত্ন করেন। আমরা তার বাড়িতে চা-নাস্তা খেয়ে তার ছাদের উপর গিয়ে দেখলাম পাক আর্মির ইটখোলার ভিতর ঢুকে আমাদেরকে সার্চ করছে,- তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার তার বাসা থেকেই ধৈর্যে আসতে থাকা পাক আর্মিদের বিরুদ্ধে ফাইট দিতে বলেন কিন্তু আমার সিপাহীদের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং আমরা রাতের ফাইটে সাংঘাতিকভাবে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ায় কল্যাণপুরের বাঙ্গালী এলাকায় চলে গিয়ে পুলিশের পোশাক ফেলে দিয়ে কলোনীর বাঙ্গালী ভাইদের দেওয়া ছেঁড়া লুঙ্গি গেঞ্জি পরে কল্যাণপুর কলোনীর ছাত্র-জনতার সাথে মিশে গিয়ে সেখানকার বাঙ্গালী জনতাকে সর্বতোভাবে সাহস দিতে থাকি। সকাল তখন দশটা বেজে গিয়েছিল। আমি আমার হাতে রাখা অচল অয়ারলেস সেটটা মেরামত করে সচল করে দিয়ে ঢাকার সব পুলিশ সেক্টর ডেড দেখলাম। মিরপুর থানার সহিত লাইন দিলাম, সেখান থেকে এক বাঙ্গালী কণ্ঠ ভেসে আসছিল- জোর করে স্বাভাবিক করা সেই কণ্ঠ বলছিলো, "মিরপুর থানা," পরক্ষণেই এক অবাঙ্গালী পাকসেনা অয়ারলেস সেটে বলে ওঠে-কোন শালা কাহা তোম বোলতা হায়।" আমি বেশ বুঝতে পারি অয়ারলেসে বাঙ্গালী কণ্ঠ শোনা গেলেও

সেখানে পাক সেনাদের প্রভুত্ব বহাল রয়েছে। আমি এরপর আমার অয়ারলেস সেটটি অচল করে কল্যাণপুর কলোনীর এক বাঙ্গালীর বাসায় রেখে পার্শ্ববর্তী মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম। মসজিদে জনতার ব্যাকুল চাহনী কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। নামাজ শেষে বের হয়ে এসে পাশের এক ছোট ঘরে বসে আছি এমন সময় দেখলাম অসংখ্য দাঙ্গাবাজ বিহারী লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে, পিছনে পাকসেনাদের গাড়ী। বিহারীরা সেখানে এসেই বাঙ্গালী কলোনীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে লুটপাট শুরু করে দিল। ইতিমধ্যে পাক সেনাদের গাড়ী দুটো বিহারীদের বাঙ্গালী কলোনীতে লুণ্ঠনে লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলো। আমরা বিহারীদের তাড়বলীলা আর সহিতে পারলাম না- আমি আমার সিপাহীদের পজিশন নিয়ে বিহারীদের উপর ফায়ার করার নির্দেশ দিলে দুজন বিহারী গুলি খেয়ে পড়ে যায়- আর সব বিহারী দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখনকার মত কল্যাণপুর বাঙ্গালী কলোনী বেঁচে যায় বিহারী লুণ্ঠন থেকে। আমাদের গুলিবর্ষণে বাঙ্গালী কলোনীতে আসন্ন পাক ও বিহারীদের হামলা ও লুণ্ঠনের আশংকায় সবাই ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পাগলের মতো পালাতে থাকে চারিদিকে। এরপর আমি মিরপুরের রাস্তার সামনে নদী পার হয়ে গ্রামের দীর্ঘ রাস্তা ধরে আমাদের সিপাহীদের নিয়ে অজানার পথে অদৃশ্য হয়ে যাই।

ঢাকা শহরে সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ (অবঃ) আনোয়ার হোসেন

অসহযোগ আন্দোলনে আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। আমি ঢাকা সেনানিবাসে দ্বিতীয় বেঙ্গলে ছিলাম।

২৫শে মার্চের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। আমার বাঙ্গালী অফিসারদের সাথে কথা বললে তারা আমাকে নিরুৎসাহিত করেন। তারপর আমরা ১৬জন যুবক আলাপ-অলোচনা করে ২৭শে মার্চ সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যাই। তেজগাঁ ড্রাম ফ্যাক্টরীর কাছে এসে দেখি মুক্তিবাহিনী গঠন হয়েছে। সেখানে ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক সবাই ছিল। আমি দলের নেতৃত্ব হাতে নেই। আমরা ৩৫০ জনের উপরে ছিলাম। তেজগাঁ রেল লাইনের অপরদিকে ডিফেন্স নিয়ে ২৯শে মার্চ পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই। ১২৬ জন পাক সেনা হতাহত, ৩টি গাড়ী ধ্বংস এবং অনেক আহত হয়। বহু অস্ত্রও আমরা উদ্ধার করি। অস্ত্র দ্বারা আমরা পুনর্গঠিত ও নববলে বলীয়ান হই। ৩০শে মার্চ ঢাকার মহাখালীতে আমরা ১০জন রেকি করতে বের হই। আগে থেকে আমরা বুঝতে পারিনি যে পাকসেনারা এ্যামবুশ করে আছে। আমরা এ্যামবুশে পড়ে যাই। শামসুল আলম নামক একজন ইপিআর ওখানে শহীদ হন। বাকী নয়জন কোন রকমে বেঁচে আসি। সময় ছিল রাত সাড়ে দশটা। ৩১শে মার্চ সেকেন্ড ক্যাপিটালে আসাদ গোটের নিকটে হাসপাতালের কাছে পাক সেনাদের অবস্থান ছিল। আমরা রাত ৩টায় আক্রমণ চালাই। এতে ৫জন পাক সেনা খতম হয়। আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ভোর পাঁচটায় পাকসেনারা ব্যাপক সেনা ও অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। ওদের সামনে টিকতে না পেরে পালাবার চেষ্টা করি। সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বেশ কিছু শহীদ হন। আমি সহ সাতজন পাক সেনাদের হতে ধরা পড়ি। তারিখ ছিল ১লা এপ্রিল।

বংশাল ফাঁড়ির প্রতিরোধ*

১৯৭১সালের পঁচিশে মার্চের সেই ভয়ংকরী রাত্রি, যার কথা বাংলাদেশের মানুষেরা কোনো দিনই ভুলতে পারবে না। ওরা ঢাকা শহরকে রক্তবন্যায় ভাসিয়ে দেবার জন্য অতর্কিতে নেমে এলো। ওরা জানতো, এদেশে ওদের পক্ষে কেউ নেই। সরকারী কর্মচারী থেকে রাস্তার পুলিশ পর্যন্ত, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী থেকে শহরের

*শারদীয় কালাস্তর, সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত সত্যেন সেন রচিত “নাদির গুলি” শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

মেহনতী মানুষ আর গ্রামের কৃষক পর্যন্ত জনসাধারণের সমস্ত স্তর থেকে ওরা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। তাই পশ্চিমী শাসক চক্রের জঙ্গী বাহিনী কোন রকম বাছ-বিচার না করে সর্বগ্রাসী আক্রমণ নিয়ে নেমে এসেছিল।

রাত বারোটার পর ঘড়ি দেখে কাঁটায় কাঁটায় একই সঙ্গে ওরা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল, লালবাগ, পিলখানায় ইপিআর ব্যারাকে, পুলিশ ব্যারাকে এমনকি থানায় থানায় ফাঁড়িতে ফাঁড়িতে আক্রমণ করে বসলো। সবাই জানে, একমাত্র বাজারবাগ পুলিশ লাইন ছাড়া আর কোন জায়গা থেকে তারা কোনো প্রতিরোধ পায়নি, যেখানে গেছে সেখানেই অবোধে ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেছে। কিন্তু এর ছোট্ট একটা ব্যতিক্রমও আছে। এই খবরটা কিন্তু খুব কম লোকই জানে।

নবাবপুর থেকে বংশালের রাস্তায় ঢুকলে বাঁয়ে নিশাত সিনেমা হল, ডাইনে দৈনিক সংবাদ অফিস, সেখান থেকে একটুখানি এগিয়ে গেলে বাংশাল ফাঁড়ি। কিছুসংখ্যক সৈন্য মেশিনগান-রাইফেল নিয়ে এই ফাঁড়ি আক্রমণ করতে গিয়েছিল। তারা নিশ্চিত মনে রাত্রির নিঃশব্দতার বুকে আর্মি বুটের খট খট শব্দ হেনে ফাঁড়িটার দিকে এগিয়ে চলেছিল। এখানে কারু কাছ থেকে যে প্রতিরোধ আসতে পারে এমন কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। ভেবেছিল, অবোধে ও স্বচ্ছন্দে তাদের হত্যালীলা চালিয়ে যাবে, একটা প্রাণীকেও রেহাই দেবে না। কিন্তু ফাঁড়িটার কাছে যেতেই এক পশলা বৃষ্টিধারার মতো মেশিনগানের গুলি তাদের অভ্যর্থনা জানাল। ওরা ভীষণ চমকে উঠে পিছিয়ে গেল। এটা কি একটা বিশ্বাস করবার মতো কথা। এক সামান্য ফাঁড়ির জনকয়েক পুলিশ, তাদের এত বড় সাহস হবে! কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না, ওদের মধ্যে কয়েকজন সেই গুলিতে আহত হয়েছে। এরপর ফাঁড়ির ভেতর থেকে পরপর কয়েকবার রাইফেলের শব্দ শোনা গেল।

এবার দু’পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বংশালের পথে একটিও জনপ্রাণী নেই। ঘরে ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ। কারো কোন সাড়া-শব্দ নেই, শুধু ঘন ঘন মেশিনগান আর রাইফেলের শব্দে বংশালের পথ আর দুই ধারের বাড়িগুলি থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। সৈন্যরা বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো।

ফাঁড়ির ভেতরে কে কোথায় আছে, কারা কি করছে- কিছুই তারা দেখতে পাচ্ছিল না। অপর পক্ষে অন্ধকার ফাঁড়িটার মধ্যে উপযুক্ত জায়গায় পজিশন নিয়ে প্রতিরোধকারীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল। রাস্তার আলোয় সৈন্যদের তারা ভালো করেই দেখতে পাচ্ছিল। ফলে এইবার ওরা বেশিক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারলো না, তখনকার মতো সেখান থেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

ফাঁড়ির মধ্যে প্রতিরোধকারীরা উল্লাসে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি তুলল। আক্রমণকারীদের মধ্যে জনকয়েক সম্ভবত হতাহত হয়েছিল। কিন্তু পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদের তাদের কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি।

ফাঁড়ির পুলিশরা এভাবে একদল সশস্ত্র সৈন্যকে হটিয়ে দেবে, এটা সত্য সত্যই অভাবনীয়। আরও আশ্চর্যের কথা, তারা ফাঁড়ির মধ্যে থেকে মেশিনগান চালিয়েছিল। থানা বা ফাঁড়ির পুলিশদের হাতে কখনো মেশিনগান দেওয়া হয় না। একমাত্র বন্দুক ও রাইফেল তাদের সম্বল। এই সংকট মুহূর্তে এই মেশিনগান কেমন করে তাদের হাতে এলো?

বংশাল মহল্লার লোকের মুখে এর উত্তরটা আমি পেয়েছি। এটা শুধু ফাঁড়ির পুলিশদের কাজ নয়। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এই মহল্লারই সুপরিচিত নাদির গুন্ডা তার কয়েকটি সাগরেন্দ। যোগ দিয়েছিল বললে কথাটা সঠিকভাবে বলা হবে না। কার্যত এই নাদিরের নেতৃত্বেই নাকি এই প্রতিরোধকে সংঘটিত করে সৈন্যদের হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

নাদিরের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে ফাঁড়ির পুলিশেরা এ কাজ হাত দিতে সাহস করত না। আর মেশিনগানে? শুধু বংশাল মহল্লা নয়, পাশাপাশি মহল্লার অনেকেই এ কথা শুনেছিল যে সারা শহরের মধ্যে

একটিমাত্র লোক আছে যার হাতে একটি মেশিনগান আছে। সেই লোকটি হচ্ছে নাদির গুন্ডা নামে পরিচিত নাদির মিঞা। কি করে সে এই মেশিনগান সংগ্রহ করেছিল, একমাত্র সে-ই জানে।

প্রাক-স্বাধীনতার যুগে বিখ্যাত উর্দু লেখক কিষণচন্দর 'তিন গুন্ডা' নামে এক অপূর্ব কাহিনী লিখেছিলেন। কাহিনীর সেই তথাকথিত গুন্ডারা স্বাধীনতা আন্দোলন উপলক্ষে গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল। কিন্তু সত্য সত্যই এরা কেউ গুন্ডা ছিল না। সরকারী প্রচারণায় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই শহীদদের গুন্ডা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

নাদির গুন্ডার ব্যাপারটা কিন্তু সে রকম নয়। সত্য সত্যই সে গুন্ডামি করত। যেই পরিবেশে জন্মেছিল, বড় হয়েছিল, সেই পরিবেশই তাকে এই পথে টেনে আনে। বয়স আর কত? ত্রিশের কোঠার নিচেই ছিল। এই বয়সেই সে গুন্ডা নামে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। তবু সাধারণ গুন্ডাদের চেয়ে সে স্বতন্ত্র ছিল। তার পরিচিত যারা, এর কথাটা তাদের জানা ছিল যে, অনেকে বিপদে-আপদে নাদির গুন্ডার কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছে, ভালোবাসাও পেয়েছে।

এই সংসারে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা বিশ্বাস করা কঠিন অথচ সত্য। নাদির গুন্ডার জীবনে এমনি এক ঘটনা ঘটল। স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে লোকটা কেমন করে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। আর সব কথা যেন ভুলে গেল সে। কেমন করে বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্রের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে- এটাই তার ধ্যান, জ্ঞান, জপমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হলেও সে বিভিন্ন মহল্লায় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত।

একটা বিষয়ে সে নিঃসন্দেহে ছিল যে, সত্য সত্যই ওদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে হবে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সে এই মেশিনগান আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়েছিল। আর এই নাদির গুন্ডার প্রভাবে একই পথের পথিক আরও কয়েকটি ছেলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

পঁচিশে মার্চের সেই বিভীষিকা নাদিরের মনকে বিন্দুমাত্র দমিয়ে দিতে পারেনি। ওদের সেই পৈশাচিক হত্যা আর ধ্বংসলীলা তাকে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত করে তুলেছিল। সারা শহরে হতাশা আর আতঙ্কের আবহাওয়া। তার মধ্যে দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে সে প্রতিরোধের কৌশল ও সংগঠন গড়ে তুলেছিল। তার এই সাহস আর নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে মহল্লার লোকেরা তাকে আপন মানুষ বলে চিনে নিল।

তারা বলাবলি করত, এই শহরে নাদিরের মতো আরও গোটা কয়েক মানুষ যদি থাকত, তবে আমরা ওদের নাভিশ্বাস তুলে দিতে পারতাম। নাদিরের নামটা মিলিটারি গোয়েন্দাদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়নি। তারা তন্নতন্ন করে তার সন্ধান করে ফিরছিল।

পঁচিশে মার্চের পর থেকেই লুণ্ঠনরত সৈন্যের দল ঘরবাড়ি-দোকানপাট ভেঙ্গেচুরে ইচ্ছামতো লুণ্ঠপাট করে চলেছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শহরের গোটা কয়েক রেশনের দোকান লুট হয়ে গেল। শহরের মানুষ ভয়ে আঁতকে উঠল। এভাবে রেশনের দোকান যদি লুট হয়ে যায়, তবে খাবে কি তারা? শেষকালে কি না খেয়েই মরতে হবে? ভয়ে দিশেহারা মানুষ কি করবে পথ খুঁজে পায় না।

রেশন দোকানের মালিকেরা ভয়ে দোকান খুলতে চায় না। এই দুর্দিনে সর্বসাধারণের অবস্থা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠল নাদির। কিছু একটা করতেই হয়। ঐ শয়তানেরা এসে রেশনের চাল লুট করে নিয়ে যাবে আর তারা অসহায়ের মতো হাত গুটিয়ে বসে বসে দেখবে, এ কিছুতেই চলবে না। কিন্তু কি করতে পারে সে?

একদিন মহল্লার লোকেরা অবাক হয়ে দেখল নাদির আর তার দলবল তাদের রেশনের দোকান ভেঙ্গে বস্তা বস্তা চাল বের করে নিয়ে যাচ্ছে। শেষকালে নাদিরের এই কাজ! তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই তাদের আসল ব্যাপারটা বুঝতে বাকি রইল না। নাদির তাদের মুখের দিকে চেয়েই এই দুঃসাহসের কাজে হাত দিয়েছে। নাদির আর তার সঙ্গীরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেই চাল মহল্লার ঘরে ঘরে ভাগ করে দিল। পাড়ার লোকে তখনকার মত কিছুটা চাল পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হাতের কাজটা সেরে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল নাদির। তার মাথার উপর মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে। খবরটা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মিলিটারির জীপ তার সন্ধান নিয়ে ফিরছে।

এরপর দুঃসাহসী নাদির আর বেশীদিন কাজ করার সুযোগ পায়নি। এপ্রিলের মধ্যভাগে গ্যাদা নামে এক কুখ্যাত গুন্ডা তাকে মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দিল। গ্যাদা ইতিমধ্যেই মিলিটারীর দালালি করে আরো কয়েকজনকে ধরিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া নাদিরের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। একবার নাদিরের গুলিতে জখম হয়ে তাকে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। তখন রাত অনেক হয়েছে। নাদির একটি জীপে করে আসছিল। আর্মিনটোলা ময়দানের কাছে এসে তার জীপটা একটা বাড়ির পাশে দাঁড়াল। ওরা আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল। একটা সঙ্কেত পেয়ে মিলিটারীর লোকের বিদ্যুতগতিতে এসে তার জীপটাকে ঘিরে ফেলল। তারপর তারা তাকে ধরে নিয়ে তাদের আস্তানায় চলে গেল। নাদির সেই যে গেল, তারপর আর ফিরে আসেনি। ফিরে আসবে না কোনদিন।

নরসিংদীতে সশস্ত্র প্রতিরোধ*

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ।

ভারতীয় বেতার মারফৎ একটি সংবাদ প্রচারিত হলো- ঢাকা শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে কোন এক জায়গায় পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ চলছে। খবরটা চাঞ্চল্যকর, বিশেষ করে ঢাকা জেলার লোকদের কাছে। দিনের পর দিন বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে মুক্তিবাহিনীর সক্রিয়তার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ঢাকা জেলায় তাদের প্রতিরোধের চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য ২৫শে মার্চ তারিখে সামরিক হামলার প্রথম রাত্রিতে রাজারবাগের পুলিশ ভাইয়েরা বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দিয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই কাহিনী অবিস্মরণীয়। তার দুই দিন বাদে নারায়ণগঞ্জ শহরের সংগ্রামী ভাইয়েরা শুধুমাত্র গোটা কয়েক রাইফেলের উপর নির্ভর করে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত সৈন্যদলকে দুই দিন পর্যন্ত আটকে রেখেছিল শহরে ঢুকতে দেয়নি। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে উদ্যোগী ভূমিক গ্রহণ করেছিল তারা সবাই তরুণ ও কিশোর; অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে একেবারেই কাঁচা। আমাদের এই সংগ্রামী ভাইদের জন্য ঢাকা জেলার মানুষ সঙ্গতভাবে গর্ববোধ করতে পারে। কিন্তু তারপর?

তারপর থেকে সারা ঢাকা জেলায় মুক্তিসংগ্রামীদের কোন সাড়া শব্দ নেই। ঢাকা জেলার মানুষ দুঃখ করে বলে, সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, আমরাই শুধু পেছনে পড়ে আছি।

কুড়ি কিলোমিটার দূরের সেই জায়গাটা কোথায় তাই নিয়ে বিতর্ক ও বাদানুবাদ চলে। দূরত্ব সম্পর্কে অনেকের সঠিক ধারণা নেই। কেউ বলে সাভার,

কেউ বলে নরসিংদী, আবার কেউ বলে জয়দেবপুর। আবার এমন লোকও আছে যারা এই ভারতীয় প্রচারণাকে একদম গাঁজাখোরি বলে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ একে সত্যি বলে বিশ্বাস করে। শুধু যে

*সভেন সেন রচিত ‘প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ’ (আগস্ট ১৯৭১) নামক গ্রন্থের “ওরা বারো জন” শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

বিশ্বাস করে তাই নয়, নিজেদের কল্পনার সাহায্যে তাদের আরো দ্বিগুণ করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে। ইতিপূর্বে নরসিংদীর উপর পাকিস্তানী বোমারু বিমান বোমা ফেলেছে। এটা ভারতীয় বেতারের প্রচার নয়, প্রত্যক্ষদর্শীরা বোমাবিধ্বস্ত নরসিংদীর সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে এসেছে।

বাইরের লোকে এটুকুই শুধু জানল, কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় যুদ্ধ বেধেছিল এবং যুদ্ধের ফলাফল কি সেই সম্পর্কে কারো মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাছাড়া নিত্যনতুন এমন সব চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছে যে শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরের সেই সংঘর্ষ সম্পর্কে কে আর মাথা ঘামায়।

যারা বাইরের লোক তাদের কাছে ঘটনাটা ছোট হতে পারে। কিন্তু স্থানীয়ভাবে ঘটনাটা দারুণ উত্তেজনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। আমার এক বন্ধু তার নিজস্ব কাজে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্যই এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে পারছি। আজ সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই ধরনের যে সমস্ত ঘটে চলেছে, তার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি।

পাকিস্তানের বোমারু বিমান ৪ঠা এপ্রিল ও ৫ই এপ্রিল পরপর দুই দিন নরসিংদীর উপর বোমা ফেলেছিল। তারপর দিন সাতেক কেটে গেল, ইতিমধ্যে পাকিস্তানী সৈন্য বা মুক্তিবাহিনী কেউ নরসিংদীতে প্রবেশ করেনি। তারপর হঠাৎ একদিন শোনা গেল পাকিস্তানী সৈন্যরা নরসিংদী দখল করবার জন্য ছুটে আসছে। গুজব নয়, প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের দেখে এসেছে।

তাঁতের কাপড়ের হাট হিসেবে বিখ্যাত বাবুরহাট থেকে জিনারদী পর্যন্ত একটি রাস্তা চলে এসেছে। মাইল সাতকের পথ, জিনারদী থেকে নরসিংদী তিন মাইল। সৈন্যরা এই পথ ধরে এগিয়ে আসছিল। তাদের দলে কয়েকশ' সৈন্য। সৈন্যবাহিনীর ট্রাকগুলি একের পর এক মিছিল করে আসছিল। তাদের সঙ্গে মর্টার, রকেট, মেশিনগান- কোন কিছুই আভাব নেই। মুক্তিবাহিনীর 'দুষ্কৃতকারী' লোকগুলিকে তারা নিঃশেষে খতম করবে, চূর্ণ করে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।

বাবুরহাট থেকে জিনারদী, মাঝখানে পাঁচদোনা গ্রাম। এই পাঁচদোনা গ্রামের কাছে সংঘর্ষটা ঘটেছিল, সেইদিন ১৩ই এপ্রিল। প্রথমে গোটা পাঁচেক সৈন্যবাহী ট্রাক। এই ট্রাকের কনভয় থেকে সৈন্যরা কিছুটা সামনে এগিয়ে এসেছে। পথ জনশূন্য। তবে মাঝে মাঝে দুটি-একটি অতি সাহসী কৌতূহলী লোক ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। সৈন্যরা নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ এক সময় শান্ত পল্লী- প্রকৃতিকে চমকে দিয়ে গুডুম গুডুম-পরপর তিনবার কামানের গর্জন শোনা গেল। অতি পরিচিত মর্টারের আওয়াজ। শুধু আওয়াজই নয়, একটা গোলায় টুকরো ছিটকে এসে একটা ট্রাকের উপর পড়ল। ট্রাকের উপর সৈন্যদের মধ্যে ছড়োহড়ি পড়ে গেল। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হতে হবে এটা ওরা ভাবতে পারেনি। ওরা কি তার শত্রুপক্ষের কজির মধ্যে এসে পড়েছে? এই অচেনা-অজানা নির্বাকব দেশে তারা কি করে আত্মরক্ষা করবে? প্রতিপক্ষ সহজ নয়, ওরা মর্টার নিয়ে আক্রমণ করতে এসেছে। ওদের সঙ্গে কত লোক আছে কে বলবে? এরা সংখ্যায় বড় কম হবে না তা না হলে এরা এভাবে আক্রমণ করতে সাহস করত না। যারা আক্রমণ করছে, তারা ঝোপঝাড়ের আড়ালে এমন সুকৌশলে অত্মগোপন করে আছে যে, রাস্তা থেকে তাদের কোন মতেই দেখা যায় না। ট্রাক নিয়ে সেই দিকে এগোবার উপায় নেই, যেতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। কিন্তু সেটা কোনমতেই নিরাপদ নয়। ওদের সঙ্গে শুধু মর্টার নয়, মেশিনগানও আছে। একপশলা বৃষ্টির মত কয়েক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি ট্রাকের উপর এসে পড়েছে। প্রথম পর্যায়েই সৈন্যদের কয়েকজন মারাত্মকভাবে জখম হয়ে পড়েছে। সৈন্যরা আর দেৱী না করে আনুমানের উপর নির্ভর করে মর্টারের গোলাবর্ষণ করতে লাগল। তাদের মেশিনগানও অবিরাম কাজ করে চলেছে।

এইভাবে কয়েক ঘন্টা ধরে দুই পক্ষের গোলাগুলির বর্ষণ চলল, একে রীতিমতো যুদ্ধ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। এই কয়েক ঘন্টার যুদ্ধে পাক সৈন্যদের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মর্টার আর মেশিনগানের

গোলাগুলিতে তাদের তিন ট্রাক সৈন্য হতাহত হয়েছে। এদের সংখ্যা প্রায় একশো, অপরপক্ষে অদৃশ্য গেরিলা বাহিনীর কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না। তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, গেরিলা বাহিনীর লোকেরা বড় কম নয়। অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে ওরা যথেষ্ট শক্তিশালী। এরপর আরও কিছুদূর এগোতে গেলে ওদের ফাঁদের মধ্যে সবশুদ্ধ আটকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই অবস্থায় বাবুরহাটের দিকে ফিরে যাওয়াটাই ওরা সঙ্গত বলে মনে করল।

অদৃশ্য মুক্তিবাহিনী গোলাগুলি বর্ষণ করে নিঃশব্দ হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত এটা ওদের চাল। ওরা প্রলোভন দেখিয়ে আরও দূরে সম্পূর্ণ ওদের আয়ত্তের মধ্যে টেনে নিতে চাইছে। পাক-সৈন্যরা আপাতত বাবুরহাটে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। প্রথম তিনটা ট্রাক একেবারে অচল হয়ে গেছে। নিহত ও জখমী সৈন্যদের দেহ অন্যান্য ট্রাকে বোঝাই করা হলো। এবার ওদের এই শোকের মিছিল ফিরে চলল বাবুরহাটের দিকে। অচল ট্রাক তিনটি এই যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাস্তার উপর পড়ে রইল। বেশ কিছুদিন সেগুলি ঐভাবে পড়ে ছিল।

বেলা বেশী নেই, এই অবস্থায় আর বেশী দূর এগোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ওরা স্থির করল কাল বাবুরহাট থেকে আবার নতুন করে অভিযান শুরু করতে হবে। প্রতিপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবস্থা সুবিধাজনক বলে মনে হলে ঢাকা থেকে আরও বেশী সৈন্য আনবার প্রয়োজন হতে পারে।

এবার মুক্তিবাহিনীর কথায় আসা যাক। যাদের তীব্র আক্রমণে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত পাক-সৈন্যদল নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তারা সংখ্যায় ছিল মাত্র বারো জন। তাদের অস্ত্রের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র একটি মর্টার আর একটি মেশিনগান। এদের মধ্যে কেউ মারা যায়নি, শুধু দু'জন জখম হয়েছিল।

ওদের ঘাঁটি থেকে কয়েক মাইল দূরে। কোথায় সেই ঘাঁটি এই কথাটা একমাত্র তারাই জানে। ওরা সেই ঘাঁটি থেকে জোয়ান ছেলেদের নিয়ে বসল। আর তাদের পরিকল্পনাটা ওদের কাছে খুলে বলল। ছেলেরা শুনে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে বলল- আমরাও থাকব আপনাদের সঙ্গে। আমরাও এখানে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার কথা ভাবছিলাম। আপনাদের কয়জন লোক চাই বলুন।

না, না আমাদের যা প্ল্যান তাতে এই বারোজনই যথেষ্ট। তার বেশী লোক নিতে গেলে সবকিছু ভুগল হয়ে যাবে। আপনারা শুধু চারদিক লক্ষ্য রাখবেন। দেখবেন ওরা যেন হঠাৎ আমাদের চমকে দিতে না পারে। এমন আরও অনেক কাজ আছে, যা আপনারা করতে পারেন। করতে পারেন নয়, করতেই হবে আপনাদের। আপনারা না করলে কে করবে!

ওরা বলল, আপনারা যা বলবেন আমরা তাই করতে রাজী আছি।”

কিন্তু বুড়োদের মনে একটা খটকা লেগেছে। একজন প্রশ্ন তুলল, এরা যদি আপনাদের এখানে এসে এই সমস্ত গোলমাল বাধিয়ে বসে, তাহলে ওরা আমাদের উপর বদলা নেবে। আমাদের ঝড়ে-গুপ্তিতে শেষ করবে।

“এই অবস্থায় কি করতে বলেন আপনি” একজন প্রশ্ন করল।

বুড়ো আসল শয়তান! প্রথমেই মুখ খুলতে চায় না, পরে সবার চাপাচাপিতে বলে ফেলল। কথাটা ভাল শোনায় না। তাহলেও অনুপায় হয়ে বলতে হচ্ছে।

আমরা বাধা দিলে ওরা তা মানবে না, ওদের যা করাবার তা করবেই। এই অবস্থায় এদের ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া নিজেদের বাঁচাবার আর কোন পথ দেখছি না। শুধু আমার জন্য বলছি না। আমি এই অঞ্চলের সবাইর কথা ভেবেই বলছি। এমন একটা কথা কেউ মেনে নিতে পারে না। হাজার হোক, এরা তাদেরই দেশের ছেলে,

তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে চলেছে। এদের কি ধরিয়ে দেওয়া যায়! এদের কি শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া যায়!

ইতিমধ্যে খবরটা ছেলেদের কাছে পৌঁছে গেছে। ওরা দল বেঁধে বুড়োদের সামনে এসে চড়াও করল, কোনরকম ভূমিকা না করে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, যদি কোন বেঈমান ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তাহলে আমরা তাকে কেটে কুচোকুচো করে ফেলব। বুড়োরা সবাই চুপ। এবার আর কারো মুখে কোন কথা শোনা গেল না। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ছেলেদের সাহায্য নিয়ে সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করে দেখল। তার পরের দিন তাদের পরিকল্পনানুযায়ী তারা সেই দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই বারোজন বীর দেশপ্রেমিকের নাম আমরা জানি না। কিন্তু এই বারোজনের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানকার মানুষ এদের কথা ভুলতে পারবে না।

পরদিন পাক-সৈন্যদল তাদের পথের বাধা দূর করার জন্য বাবুরহাট থেকে দূরপাল্লার কামান দেগে এই গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিবর্ষণ করে চলল, কয়েক ঘন্টা ধরে এই গোলা বর্ষণ চলল। কিন্তু যাদের লক্ষ্য করে তারা গোলা ছুঁড়ছিল, তারা তখন থেকে বহু দূরে, তাদের ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরে নতুন অঞ্চলে নতুন খেলায় মেতে উঠেছে।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ চট্টগ্রাম

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২। চট্টগ্রামের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিররণ		...১৯৭১

সেদিন চট্টগ্রামে যেমন করে
স্বাধীনতা লড়াই শুরু হয়েছিল
সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান

৩রা মার্চ, ১৯৭১ সাল। সময় সকাল সাড়ে নয়টা। এই প্রথম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপারে প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা। এদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটছিল। সামরিক বাহিনীর অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসাররা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সবার মনেই একটি চিন্তাই পাক খেয়ে ফিরছিল- কি করা যায়? কি করবো? বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে তাঁরা বার-বার ছুটে আসছিলেন মেজর জিয়ার কাছে। মেজর জিয়া তখন ছিলেন ৮ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের বাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত।

এরপর এলো ৭ই মার্চ। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলেন। বজ্জেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।

৮ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের অফিসাররা একে অস্ত্র তুলে নেবার অহ্বান বলেই মনে করলেন।

পরদিন ৮ই মার্চ। আবার সেই সকাল। ওরা দুজন সবার অলক্ষ্যে আবার উঠে এলেন ছাদে। মেজর জিয়াউর রহমান আর ক্যাপ্টেন অলি আহমদ। বিদ্রোহ ঘোষণা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে দুজনে আলোচনা করলেন। ঠিক হলো বিদ্রোহ ঘোষণার জন্যে উপযুক্ত মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু কখন আসবে সেই উপযুক্ত মুহূর্ত? কখন? কবে? ওঁরা জানতেন এই বিশেষ মুহূর্তটি আসবে তখনই যখন তাদের বিদ্রোহের সমর্থনে পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসবে জনসাধারণ। এই মুহূর্তটি আসবে তখনই যখন শত্রু বর্বরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ সবার সামনে তুলে ধরা যাবে। এদিকে ইয়াহিয়া বসলো মুজিবের আলোচনায়। ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী অফিসাররা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন আলোচনার ফল কি হয়? আলোচনার অন্তরালে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের এক জঘন্যতম চক্রান্ত। সে চক্রান্ত বাঙ্গালীদের উপর হামলার। সে চক্রান্ত বাংলাদেশের উপর বর্বর অভিযানের।

আলোচনা চলছিল। আর এদিকে আসছিল জাহাজ বোঝাই সৈন্য। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ। জাহাজ বোঝাই যে সব সৈন্য আসছিল তাদেরকে দ্রুত বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করে পাঠানো হচ্ছিল।

এমনি সময় ডাক এলো লেঃ কর্নেল এম, আর, চৌধুরীর কাছ থেকে ১৭ই মার্চ রাত সাড়ে নয়টায় চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে সামরিক আইন সদর দপ্তরে তার ডাকে প্রথম গুপ্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল- চারজন সামরিক বাহিনীর

* ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ৮ বেঙ্গলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন, পরবর্তীকালে লেঃ জেনারেল এবং রাষ্ট্রপতি।
লেখাটি ২৬শে মার্চ, ১৯৭২ সংখ্যার 'দৈনিক বাংলা' থেকে সংকলিত।

বাঙালী অফিসারের মধ্যে। এরা চারজন হচ্ছেন লেঃ কর্নেল এম, আর, চৌধুরী, মেজর জিয়াউর রহমান, নোয়াখালীর মেজর আমীন আহমদ চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন অলি আহমেদ।

ঃ কি মনে করছো? বৈঠকের শুরুতেই কর্নেল চৌধুরী পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মেজর জিয়াকে।

ঃ ওদের ভাবগতি দেখে পরিস্কার মনে হচ্ছে ওরা হামলা চালাবে।

কর্নেল বললেন তাঁরও তাই ধারণা। কিন্তু কি করা যায়? সবারই মনে এই প্রশ্ন। এক- বিদ্রোহ। কর্নেল চৌধুরী সুস্পষ্ট ভাবে বল্লেন, সশস্ত্র অভ্যুত্থানই একমাত্র পথ। তিনি প্রথম বাঙালী সামরিক অফিসার যিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান জানালেন।

সশস্ত্র অভ্যুত্থান। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 'সিপাহী বিদ্রোহের' পর আর এক নতুনতর সিপাহী বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া বিকল্প কিছু আর নেই।

ওরা চারজন বাঙালী অফিসার বসলেন বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রণয়নে। ঠিক হলো ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার একমাত্র বাঙালী ব্রিগেডিয়ার এম, আর, মজুমদারকে এ পরিকল্পনা থেকে বাইরে রাখতে হবে। ঠিক হলো। লেঃ কর্নেল এম, আর, চৌধুরীর নেতৃত্বেই তারা বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেন।

এদিকে পাকিস্তানি হামলার প্রস্তুতি চলছিল পুরোদমে। বাঙালী অফিসারদের উপর তাদের সজাগ দৃষ্টি হয়ে উঠছিল আরও প্রখর। আর এরাও পাল্টা গোয়েন্দা বৃত্তি চালিয়ে সংগ্রহ করছিলেন পাক সেনাদের তৎপরতা। এরই মধ্যে কুমিল্লা থেকে বিস্তারিত খবর আসতে লাগল।

কমান্ড ব্যাটালিয়ানকে আনা হল চট্টগ্রামে। তাদেরকে রাখা হতে লাগল শহরের অবাঙালীদের বাড়ি বাড়ি। চট্টগ্রামের ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরাও প্রতি রাতে সাদা পোষাকে অসামরিক ট্রাকে করে বেরিয়ে যেত শহরে। তাদের কাজ ছিল অবাঙালীদের সাথে মিলে লুটপাট করা।

বাংলাদেশের উপর বর্বর হামলার প্রস্তুতি দেখতে এলেন পাক সেনাবাহিনীর জেনারেল হামিদ খান ২১শে মার্চ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে তাকে আপ্যায়িত করা হলো মধ্যাহ্ন ভোজের। এই মধ্যাহ্ন ভোজেই পশ্চিমা সামরিক অফিসারদের কানাঘুসা আর জেনারেল হামিদের একটি ছোট্ট উক্তি বাঙালী অফিসাররা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন দিন ঘনিয়ে এসেছে। হামলা অত্যাশঙ্ক।

মধ্যাহ্ন ভোজে জেনারেল হামিদ বাঙালী অফিসারদের যেন চিনতেই পারেননি। তার যত কানাঘুসা আর কথাবার্তা চলছিল পশ্চিমা অফিসারদের সাথে।

কি এত কানাঘুসা? কিসের এত ফিসফাস? সন্দেহ হয়ে উঠেছিল মেজর জিয়ার মন। কৌশলে একজনের সাথে কথা বলতে বলতে গিয়ে দাঁড়ালেন জেনারেল হামিদের ঠিক পিছনে। দাঁড়ালেন পেছন ফিরে। কথা বলতে লাগলেন সংগীটির সাথে আর দু'কান সজাগ রাখলেন জেনারেল হামিদের কথার দিকে।

জেনারেল হামিদ তখন কথা বলছিলেন ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল ফাতমীর সাথে। অনেক কথার মধ্যে একেটা যেন সামরিক নির্দেশের মতই কর্নেল ফাতমীকে বলে উঠলেন জেনারেল হামিদ- দেখ ফাতমী, অভিযান (এ্যাকশন) খুব দ্রুত ও কম সময়ের মধ্যে হতে হবে। আমাদের পক্ষে কেউ যেন হতাহত না হয়।

আঁতকে উঠলেন মেজর জিয়া। একি? কি হতে যাচ্ছে? ঐ দিনই বিকেলে তিনি সস্ত্রীক এক সৌজন্য সাক্ষাতে গেলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বাসায়। কথায় কথায় তিনি জানতে চাইলেন জেনারেল হামিদের সফরের উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সে তথ্য ছিল অজানা তিনি শুধু বলেন, ওরা আমাকে বিশ্বাস করে না। তিনি জানালেন, জেনারেল হামিদ যখন অপারেশন রুমে ছিলেন তখন তাঁকে সে ঘরে ঢুকতেই দেয়া হয়নি।

ঃ কি বুঝলেন? জানতে চাইলেন মেজর জিয়া।

ঃ মনে হচ্ছে সামথিং ফিশি।

জিয়া বলেন, ফিশি নয়- বিরাট কিছু। বিরাট এক চক্রান্তে মেতেছে ওরা। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার মেনে নিলেন সে কথা। পরদিন ২২শে মার্চ। রাত ১১টায় চট্টগ্রাম ই-পি-আর সেক্টর দফতরের এডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিক এসে দেখা করলেন মেজর জিয়ার সাথে তিনি সরাসরি বলেন, সময় খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করতেই হবে। আপনার প্রতি আমাদের আস্থা আছে। আপনি বিদ্রোহ ঘোষণা করুন। ই-পি-আরদের সাহায্য পাবেন। মেজর জিয়া তাঁকে তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানান। ই-পি-আর এর সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ২৫শে মার্চে ব্যাপক রদবদল ঘটে গেল ক্যান্টনমেন্টের প্রশাসণ ব্যাবস্থায়।

ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে এলেন জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা, জেনারেল আনসারি, মেজর জেনারেল মিঠা খান, লেঃ জেনারেল খোদাদাদ খান প্রমুখ। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে তারা জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন ঢাকায়। সেই সাথে নিয়ে গেলেন মেজর আমিন আহমদ চৌধুরীকেও। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের স্থানে আনসারী নিযুক্ত হলেন স্টেশন কমান্ডার। কর্নেল শিগারী দায়িত্ব নেন ই-পি-আর এর সেক্টর কমান্ডার হিসেবে।

এই রদবদলে আশংকিত হয়ে ওঠেন বাঙালী সৈনিক ও অফিসাররা। এই দিনই গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন লেঃ কর্নেল চৌধুরী।

এদিকে চট্টগ্রাম শহরে উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। অস্ত্র বোঝাই জাহাজ সোয়াতের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা হচ্ছিল প্রবল প্রতিরোধ। অস্ত্র খালাস করে যাতে পশ্চিমা সৈন্যদের হাতে পৌঁছতে না পারে তার জন্য রাস্তায় রাস্তায় তৈরী করা হচ্ছিল ব্যারিকেড। এই ব্যারিকেড সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে লাগানো হল। বাঙালী সৈন্যদের। রাত ১০টা পর্যন্ত চলল এই ব্যারিকেড সরাবার কাজ। রাত ১১টায় অফিসার কমান্ডিং জানজুয়া আকস্মিকভাবে মেজর জিয়ার কাছে নির্দেশ পাঠালেন এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে বন্দরে যাওয়ার জন্য। এই আকস্মিক ও রহস্য জনক নির্দেশের অর্থ তাঁর কাছে বোধগম্য হলনা। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় জানজুয়া নিজে এসে তাকে নৌবাহিনীর একটি ট্রাকে তুলে ষোল শহর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বন্দরের দিকে রওয়ানা করে দেন কিন্তু রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে সরিয়ে যেতে তার দেরি হচ্ছিল। আগ্রাবাদে যখন একটা বড় ব্যারিকেডের সামনে বাধা পেয়ে তার ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ে তখনই পেছন থেকে ছুটে আসে একটি ডজ গাড়ী ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান গাড়ী থেকে নেমেই আসেন মেজর জিয়ার কাছে হাত ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যান রাস্তার ধারে।

ঃ পশ্চিমা গোলাগুলি শুরু করেছে। শহরের বহু লোক হতাহত হয়েছে। খালেকুজ্জামানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর থেকে কথা কয়টি ঝরে পরে। কি করবেন জিয়া ভাই, এখন? মাত্র আধ মিনিট। গভীর চিন্তায় তলিয়ে যান মেজর জিয়া তারপর বজ্রনির্ঘোষে বলেন উঠেন- উই রিভোল্ট।

সাথে সাথে তিনি খালেকুজ্জামানকে তিনি ফিরে যেতে বলেন। বললেন, ব্যাটালিয়নকে তৈরি করার জন্য অলি আহমেদকে নির্দেশ দিতে। আর সেই সাথে নির্দেশ পাঠান ব্যাটালিয়নের সমস্ত পশ্চিমা অফিসারকে গ্রেফতারের।

খালেকুজ্জামান দ্রুত ফিরে গেলেন ষোল শহরের দিকে। আর মেজর জিয়া ফিরে এলেন ট্রাকে। যে পশ্চিমা সামরিক অফিসারকে তার সাথে দেওয়া হয়েছিল, তাকে বললেন, হুকুম বদলে গেছে। বন্দতে যেতে হবে না।

আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে ক্যান্টনমেন্টে। বাঙালী সৈন্য যারা তার সাথে যাচ্ছিলেন তাঁদেরকে ইশারায় বললেন। রাইফেল লোড করে রাখতে প্রয়োজন হতে পারে।

তাঁরা ফিরে আসেন ব্যাটালিয়নে। এসেই তিনি সাথের পশ্চিমা অফিসারকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দী। অফিসারটি আত্মসমর্পণ করলে তিনি ট্রাক থেকে নেমে ট্রাকের পশ্চিমা নৌ-সেনাদের দিকে রাইফেল তাক করে তাদেরকেও অস্ত্র ছেড়ে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। হকচকিত পশ্চিমা সেনারা সবাই অত্মসমর্পণ করে।

এরপর তিনি একাই গাড়ি নিয়ে ছুটে যান অফিসার কমান্ডিং জানজুয়ার বাড়ি। কলিং বেল টিপতেই ঘুম ভেঙ্গে উঠে আসেন জানজুয়া। আর সামনেই মেজর জিয়াকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে ওঠেন। তার ধারণা ছিল পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর জিয়া বন্দরে বন্দী রয়েছে। জানজুয়াকে গ্রেফতার করে নিয়ে ষোলশহরে ফিরে আসেন মেজর জিয়া। পথে অফিসার্স মেসে মেজর শওকতকে তিনি সব কথা বলতেই মেজর শওকত উৎফুল্ল হয়ে উঠেন এবং বিদ্রোহে তাঁর সাথে যোগ দেয়ার কথা ঘোষণা করে দ্রুত ব্যাটালিয়নে চলে আসেন।

এরপরই মেজর জিয়া টেলিফোনে স্থানীয় জননেতা ও বেসামরিক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ চেষ্টা করেন। কিন্তু কাউকেই পান না। তখন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটরকে জানালেন সবাইকে টেলিফোন করে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহ ঘোষণার কথা জানাতে। অপারেটর সানন্দে তাঁর সে নির্দেশ জানাতে রাজী হন।

তিনি লেঃ কর্নেল এম, আর, চৌধুরীকেও টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকেও পাননি। পরে শুনেছিলেন এই রাতেই পাকিস্তানী সৈন্যরা গুরুতর অসুস্থ এম, আর, চৌধুরীকে হত্যা করেছিলেন।

গুরু হয়ে গেল বিদ্রোহ। রাত তখন দুটো। ব্যাটালিয়নের আড়াইশোর মত বাঙালী সৈন্যকে একত্রিত করে তাঁদেরকে সব কথা বলেন মেজর জিয়া। সবাই একবাক্যে এই বিদ্রোহের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। তাঁরা জানান, দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা জান দিতে প্রস্তুত। কিছু সৈন্য ষোলশহরে রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে মেজর জিয়া বেরিয়ে পড়েন কালুরঘাটের পথে। এদিকে ই-পি-আর এর জোয়ানরাও লড়াই শুরু করেছিলেন। কালুরঘাটে পরদিন তাঁদের সাথে বেশকিছু পুলিশও যোগ দেন।

২৬শে মার্চ সকাল। আগের রাতে ঢাকা শহরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে রাজধানীর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল পাকিস্তানী বাহিনী। আর সেই আনন্দে সকাল হতেই পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতরে চলছিল মিষ্টি বিতরণ আর অভিনন্দন বিনিময়ের পালা। কিন্তু মুহূর্ত কয়েক পরেই তাদের মুখের হাসি ম্লান হয়ে যায়। মিষ্টি হয়ে যায় বিশ্বাস। চট্টগ্রামের যুদ্ধের খবর যখন তাদের কাছে পৌঁছলো তখন এক দারুন সন্ত্রাসে আঁতকে উঠলেন তারা।

চট্টগ্রাম। পাকিস্তানীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো চট্টগ্রাম। ২৭শে মার্চ সকালেই বিমান বোম্বাই হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে গেল পুরো দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন। চট্টগ্রামে যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরীর জন্য মিঠা খানকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হয় চট্টগ্রামে। বাঙালী সৈন্যরা গুলি করে, সে হেলিকপ্টারটি ফুটো করে দেয়। একই সাথে বিমানে করে নামানো হতে লাগলো দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে। নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বাবরকে নিয়ে আসা হয় বন্দরে। এতে ছিল দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য। ডেস্ট্রয়ার, এক স্কোয়াড্রন ট্যাঙ্কও লাগানো হয় এই যুদ্ধে। জাহাজের গান থেকেও গোলা নিক্ষেপ হতে থাকে শহরের দিকে।

এই বিরাট শক্তির মোকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না একথা বাঙালী সৈন্যরা বুঝেছিলেন। তাই শহর ছেড়ে যাবার আগেই বিশ্ববাসীর কথা জানিয়ে যাবার জন্য মেজর জিয়া ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান। বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা মেজর জিয়াকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কিন্তু কি বলবেন

তিনি? একটি করে বিবৃতি লেখেন আবার তা ছিঁড়ে ফেলেন। কি জানাবেন তিনি বিশ্ববাসী এবং দেশবাসীকে বেতার মারফৎ? এদিকে বেতার কর্মীরা বারবার ঘোষণা করছিলেন- আর পনের মিনিটের মধ্যে মেজর জিয়া ভাষণ দেবেন। কিন্তু পনের মিনিট পার হয়ে গেল। মেজর জিয়া মাত্র তিন লাইন লিখতে পেরেছেন। তখন তার মানসিক অবস্থা বুঝাবার নয়। বিবৃতি লেখার ঝুঁকিও ছিল অনেক। ভাবতে হচ্ছিল শব্দচয়ন, বক্তব্য পেশ প্রভৃতি নিয়ে।

প্রায় দেড় ঘন্টা মোসাবিদার পর তিনি তৈরী করেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি। নিজেই সেটা তিনি বাংলা এবং ইংরেজীতে পাঠ করেন।

১১ই এপ্রিল পর্যন্ত কালুরঘাটে থেকে তাঁরা চট্টগ্রামের যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁদের সাথে যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো ২০তম বালুচ রেজিমেন্ট, কুমিল্লা থেকে নিয়ে যাওয়া ৫৩-ব্রিগেড। আর নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো কমান্ডো, যারা অবাস্থালীদের ঘরে ঘরে ঘাঁটি গেড়েছিল।

এদেরকে ছাড়াও চট্টগ্রামের এই যুদ্ধে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছিলো কোয়েটা থেকে নিয়ে আসা ১৬শ ডিভিশন ও প্রথম কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে।

৩০শে মার্চ সকালে মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র) থেকে আর এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার ঘোষণা করেন।

এই দিনই দুটি পাকিস্তানী বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে বেতার কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

১১ই এপ্রিল কলুরঘাট এলাকা থেকে অবস্থান সরিয়ে নেয়ার পর যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এ যুদ্ধ চলে রামগড়, রাঙ্গামাটি এলাকায়। যুদ্ধ চলে কক্সবাজারের পথে, শুভপুরে। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই দলে দলে জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্ররা এসে যোগ দিয়েছে বাহিনীতে। অস্ত্র ধরেছে, ট্রেনিং নিয়েছে, বীরত্বের সাথে লড়াই করেছে।

৩০শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাবার পর ৩রা এপ্রিল রাত সাড়ে ন'টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন একটি গোপন এলাকা থেকে চালু করা হয় আর একটি বেতার কেন্দ্র। ‘আমার সোনার বাংলা’ দিয়ে করা হয় এই কেন্দ্রের উদ্বোধন। এই গানটি গাইবার জন্যে সে রাতে সেখানে এসেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন পুলিশ সুপার জনাব রহমানের তিন মেয়ে।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ঘটনা ও প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মেজর এনামুল হক চৌধুরী*

৭-১১-১৯৭৩

২৪শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, কর্নেল হামিদ হোসেন শিগরী, ক্যাপ্টেন মোহসিন (এডজুট্যান্ট) চট্টগ্রাম বন্দরে ‘এম, ভি, সোয়াত’ জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ খালাসের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে যোগ দিতে চলে যান। আমাকে নির্দেশ দিয়ে যান ব্রিগেডিয়ার আনসারী, হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা থেকে আসার পর তাঁকে জীপযোগে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠিয়ে দিতে।

*১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

হেলিকপ্টার যখন চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবতরণ করে তখন আশ্চর্যের সাথে দেখতে পাই লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবদুল হামিদ খান (সি-ও-এস, পাকিস্তান আর্মি), জেনারেল নওয়াজেশ, জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা (জি-ও-সি, ১৪-ডিভিশন, ঢাকা) এবং ব্রিগেডিয়ার আনসারী এরা সবাই হেলিকপ্টারে ঢাকা থেকে এসেছেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আনসার সেই হেলিকপ্টারে চট্টগ্রাম বন্দরে চলে যান। তাদেরকে দেখার সাথে সাথে আমরা সবাই আশ্চর্যাব্বিত হয়ে গেলাম কারণ তাদের আগমন অপ্রত্যাশিত ছিল।

জেনারেলদের আগমনের সাথে সাথে ২০-বালুচের সি-ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমী ই-বি-আর-সি 'তে আসেন। চা পানের পর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা ২০-বালুচের সি-ওর সাথে ২০-বালুচ অফিসে চলে যান। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই যে, স্টার-প্লট ছাড়াই তিনি গাড়িতে করে ছদ্মবেশে ২০-বালুচের অফিসে চলে যান। ই-বি-আর-সি অফিসার মেস-এ আমরা লাঞ্চ পার্টির ব্যবস্থা করি। সেখানে প্রায় ৩০/৪০ জন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও ব্রিগেডিয়ার আনসারীর জন্য আমরা প্রায় ১ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তিনটার সময় পোর্ট থেকে আমাদের টেলিফোনে পার্টি শুরু করার নির্দেশ দিলেন।

পার্টি হৈ-হুল্লোড় এবং আনন্দের সাথে শুরু হয়ে যায়। কথা প্রসংগে জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা মেজর মং কেও (এস-এস-ও) কে জিজ্ঞেস করেন যে অবসর জীবনে তিনি কি করবেন। তিনি বললেন, দেশের এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাইরের কিছু চিন্তা করা সম্ভব নয়। খাদেম হোসেন রাজা বললেন, থিংস আর গোইং টু বি নরমালাইজড ভেরী সুন। ডু-নট অরি। প্লান ফর ইওর ফিউচার।

খাদেম হোসেন রাজা আমাদেরকে বললেন। দিস আনসারটেইনটি ইজ গোইং টু বি ওভার ভেরী সুন। ওয়ার্ক হার্ড। ডিভোট ইওর টাইম ফর ট্রেনিং।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদারও বেলা পৌনে চারটার দিকে হেলিকপ্টার যোগে ব্রিগেডিয়ার আনসারী, ক্যাপ্টেন মোহসিনসহ ই-বি-আর-সিতে আসেন। খাওয়া শেষ করার পর ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমাদের বলেন যে বিশেষ কারণে তিনি ঢাকা চলে যাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, “লুক আফটার ইওরসেল্ফ”

তার সাথে ক্যাপ্টেন আমিন আহমদ চৌধুরী (এ-আর-ও-পি) মেডিক্যাল চেক আপ-এর জন্য ঢাকা আসেন। সব জেনারেল একই হেলিকপ্টারে ঢাকা রওনা হয়ে যান।

২৪শে মার্চ বিকেলে ই-বি-আর-সি তে থমথমে ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো। আমাদের পেরিমিটার গার্ড এর সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

২৫শে মার্চ সকালে কর্নেল এম, আর, চৌধুরী (চীফ ইন্সট্রাক্টর, ই-বি-আর-সি) আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জোয়ানদেরকে দিয়ে দিতে বললেন। সমস্ত জোয়ানদের বিভিন্নভাবে অরগানাইজ করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ষোলশহরে অবস্থিত অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিশেষ কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। ই-বি-সি থেকে দেড়শত রাইফেল তারা ধার চেয়েছিল। আমরা ঢাকা থেকে স্যাংশন পেয়ে তাদেরকে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেই। অষ্টম বেঙ্গলের কোয়ার্টার মাষ্টার ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আজ নেবেন কাল নেবেন বলে আর নেন নাই। অষ্টম বেঙ্গলের কিছু সৈন্য এ্যাডভান্স পার্টি হিসেবে পাকিস্তানে চলে যায়। যাবার প্রস্তুতি হিসেবে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ী জমা দিতে হয়েছিল। খুব কম অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ি বাকি সৈন্যদের কাছে ছিল।

২৫শে মার্চ সকাল থেকেই চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন জায়গায় জনসাধারণ ব্যারিকেড সৃষ্টি করতে শুরু করে। বায়েজীদ বোস্তাম থেকে ব্যারিকেড পরিস্কার করার জন্য ই-বিআর-সিকে নির্দেশ দেয়া হয়। সাথে বেলুচ রেজিমেন্টের একটি কোম্পানীও ছিল।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম,আর, চৌধুরীকে ব্যারিকেড পরিস্কার করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তার সাথে ক্যাপ্টেন আজিজ ব্যারিকেড পরিস্কারের কাজ তদারক করছিলেন।

সকাল ১১টা থেকে চারটে পর্যন্ত সকল সৈন্যসামন্ত নিয়ে মাত্র ২০০ গজ রাস্তা পরিস্কার করা হয়। বহু কষ্টে বায়েজিদ বোস্তামীর রাস্তার মোড় পর্যন্ত যান। সৈন্যদেরকে সেখানেই দুপুরের খাবার দেয়া হয়।

বেলা সাড়ে তিনটার দিকে বেসামরিক ট্রাক যেগুলো আমাদের সৈন্য নিয়ে ব্যারিকেড পরিস্কারের কাজে যাচ্ছিল সমস্ত ড্রাইভার ট্রাক ফেলে পলায়ন করেন।

বায়েজীদ বোস্তামের মোড়ে বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিলো। তারা ড্রাম দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল। এবং সেখানে দাড়িয়ে বক্তৃতা করছিল। শ্লোগানে শ্লোগানে সে এলাকাকে তারা মুখরিত করে তুলেছিল।

জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য বাধ্য হয়ে কর্নেল এম,আর, চৌধুরী নির্দেশে এক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। এতে তিনজন লোক আহত হয় একজনের অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আর সামনের দিকে অগ্রসর না হয়ে এম, আর,চৌধুরী সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেনানিবাসে ফিরে আসেন।

এরপর কর্নেল এম, আর, চৌধুরীর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেন যে, এই গুলিটি শুধু পাকিস্তানীদের দেখাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমাদের এক কোম্পানীকে জেটি এলাকায় যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। মেজর কামাল মেহের (পাঞ্জাবী) ক্যাপ্টেন আজিজ কোম্পানীকে নিয়ে জেটিতে রওনা হয়ে যান।

২১শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ই-বি-আর সির বাঙ্গালী অফিসারদেরকে ডেকে চট্টগ্রাম শহরকে পুরো নিয়ন্ত্রনে আনা এবং বাঙ্গালীদের যেন অযথা হয়রানি, দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে না হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিলেন। তদানুসারে আমরা সমস্ত অফিসার সৈন্যদের নিয়ে শহরে যাই। আমি নিজে অয়ারলেস কলোনীতে যাই। সেখানে ক্যাপ্টেন রফিকের (এডজুট্যান্ট, ই-পি-আর) সাথে দেখা হয়। তার সাথে চট্টগ্রামের ডি-সি এবং এস-পিও ছিলেন। রাত আটটার দিকে অয়ারলেস কলোনীতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। বহু কষ্টে ই-পি-আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। তার জন্য ডি-সি, এস পি খুব আনন্দিত হন এবং বলেন, যে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা থাকলে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করত।

পথে আমি নৌবাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানী জোয়ানদেরকে হাতে অস্ত্রশস্ত্রসহ দেখতে পাই। অয়ারলেস কলোনীতেও তাদেরকে দেখা গিয়েছিল। তা আমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে বলি। তিনি বললেন যে এরপর নৌবাহিনীর কোন লোককে শহরে দেখা যাবে না।

কর্নেল এম, আর, চৌধুরী সেদিন বড় অসুস্থ ছিলেন। তার দুদিন আগে হাতে ব্যাথা পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি বড় খারাপ আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে। এই সময় ঢাকা থেকে ক্যাপ্টেন আমিন আহমদ চৌধুরী টেলিফোনে চারদিকে খেয়াল রাখতে বলেন। টেলিফোনটি এম,আর, চৌধুরীকে দিতে বলেন। এম, আর, চৌধুরী টেলিফোনে কথোপকথনের পর আমাকে বলেন পরিস্থিতি বড় খারাপ, আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কের সাথে থাকতে হবে।

২৫শে মার্চ রাতে মেসে যাবার পর কর্তব্যরত অবস্থায় ক্যাপ্টেন মোহসিন আমাকে বললেন, তার মেয়ে বড় অসুস্থ। আমি যদি তার জায়গায় ডিউটি করি তাহলে রাতে তিনি বাসায় থাকতে পারেন। আমি তাতে সম্মত হলাম।

অফিসে আসার পর ক্যাপ্টেন মোহসীন সব বুঝিয়ে দেন। এই সময় মেজর বেগ আসেন, তিনি কড়া নির্দেশ দিয়ে যান যে আজকের পরিস্থিতি খুব খারাপ। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সারারাত ডিউটি করতে হবে।

কর্নেল এম, আর, চৌধুরীর সাথেও আমার দেখা হয়। তিনি বললেন আমি খাবার জন্য মেসে যাচ্ছি, এবং আমার কক্ষে থাকব। প্রয়োজন হলে আমার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করবে। তবে পরিস্থিতি খারাপ।

রাতে শহর থেকে অনেক টেলিফোন পাই। বন্ধুবান্ধবরা পরিস্থিতি কেমন জিজ্ঞেস করছিলেন। তাদেরকে বললাম যে, তারা যদি কিছু জানে তাহলে আমাকে যেন জানায়।

রাত সাড়ে এগারটার দিকে অষ্টম বেঙ্গল থেকে মেজর মীর শওকত আলী টেলিফোনে বললেন, ই-বি-আর সি-ও যত গাড়ি আছে সবগুলোই যেন তাদের জন্য সত্বর পাঠিয়ে দেয়া হয়। কারণ তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এমভি-সোয়াত থেকে সত্বর অস্ত্রশস্ত্র আনলোড করতে। কিছুক্ষণ পর তিনি টেলিফোনে বললেন। তার অধিনস্থ সকলে গাড়ির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

আমি বললাম, গাড়ির জন্য খবর দেয়া হয়েছে। দু'তিন মিনিট তিনি আবার টেলিফোনে বললেন। ব্রিগেডিয়ার আনসারী তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি পাঠাতে আমি দেরি করি তাহলে আমার অসুবিধা হবে।

আমি জবাব দিলাম। গাড়ি যাচ্ছে। এই সময় চট্টগ্রাম শহর থেকে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক-এর ভাইস চেয়ারম্যান এম, এ, কাদের আমাকে টেলিফোনে বললেন। ঢাকার কোন খবর পেয়েছেন। আমি বললাম না তিনি বললেন ঢাকায় পুলিশ ই-পি-আর এর উপর পশ্চিম পাকিস্তানীরা হামলা চালিয়েছে। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ঢাকার বাঙ্গালী সামরিক বাহিনীর লোকেরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অপারেটর সে সময়ে বাঙ্গালী ছিল, তাই কোন অসুবিধা হয়নি। আমি তাদের সবাইকে বললাম। আপনি কর্নেল এম, আর, চৌধুরীর সাথে কথা বলুন। কাদের সাহেব ও এম, আর, চৌধুরী যখন কথা বলছিলেন তখন আমি অপারেটর কে বলি তাদের কথোপকথন আমাকে মনিটর করতে।

কথা শেষ আমি বললাম, স্যার আমি সব শুনেছি। তিনি বললেন, বাকি যতসব অস্ত্রশস্ত্র আছে সমস্ত জোয়ানদেরকে দিয়ে দিতে। তিনি সত্বর অফিসে আসছেন বলে জানালেন। আমি সুবেদার মেজর, নায়েক সুবেদার, কোয়ার্টার মাস্টার ও অন্যান্যদেরকেও ডেকে অস্ত্রশস্ত্র কোটে থেকে নিয়ে নিতে নির্দেশ দেই। তারা নির্দেশ নিয়ে বাইরে যাবার সাথে সাথে দেখতে পাই ২০-বালুচ থেকে অনেক গুলো গাড়ি আসছে। গাড়িগুলো আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে শহরের দিকে যেতে দেখতে পাই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সব গাড়ি থেমে যায়। আমি বাইরে এসে দেখতে পাই গাড়ি থেকে সেনাবাহিনীর লোকজন নিচে নামছে। কোয়ার্টার গার্ড থেকে গার্ড কমান্ডার থেকে দৌড়ে এসে আমাকে বলে যে, ২০ বেলুচের সমস্ত লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাড়ি থেকে নামছে। আমি তাকে বললাম তুমি চলে যাও। সে যাওয়ার সাথে সাথে কোয়ার্টার গার্ডের লোকজনকে স্ট্যান্ড টু সতর্ক করা হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যে ২০-বালুচের লোকেরা কোয়ার্টার গার্ড-এর রক্ষীদের উপর হামলা চালায়। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়।

তখন হামিদ হোসেন শিগরী আমাকে টেলিফোন করে জানতে চান কোথা থেকে এ গোলাগুলি হচ্ছে বা কেন হচ্ছে। আমি বললাম, আমি কিছু জানি না। তবে বেলুচ রেজিমেন্টের লোকেরা আমাদের লোকদের উপর গোলাগুলি ছুড়ছে। তিনি বললেন, “ডু-নট ওরি। আই উইল ট্রাই টু কন্ট্রোল দি সিচুয়েশন ইফ নিডেড। আই

উইল শেড মাই ফর বেঙ্গল রেজিমেন্ট। দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন মাই সন এ্যান্ড ইউ ক্যাপ্টেন এনাম। আই উইল বি দি ফাস্ট ম্যান টু টেক ইউ আউট ফ্রম দি ডিউটি রুম।

চারিদিক থেকে রাইফেল, এল-এম, জি, ২" মর্টারের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। এ পরিস্থিতি চলতে থাকে দু-ঘণ্টার মত। তারপর গর্জে ওঠে ৩" মর্টারের আওয়াজ।

কর্নেল শিগরীর আবার টেলিফোন পাই। তিনি বললেন, কে যে আমার বাসার চতুর্দিকে গুলি ছুড়ছে কিছুক্ষণ পর দু-তিন মিনিটের বিরতি হয়।

তিনি পুনরায় টেলিফোনে বললেন, “ইজ ইউ এডভাইজ্যাবল ফর মি টু কাম টু অফিস এন্ড টেক ইউ আউট? আমি জবাব দিলাম গোলাগুলি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আসা উচিত নয়।” তার সাথে সাথে পুনরায় সবরকমের গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল। সাথে সাথে ট্যাংকের গর্জনও শোনা গেল। আমি যে ডিউটি রুমে ছিলাম, পাশে ৩" মর্টারের গোলা পড়ে। দরজা-জানালার চতুর্দিক দিয়ে অনবরত গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। আমি বাধ্য হয়ে টেলিফোনটি নিয়ে জমিনের উপর অবস্থান নিয়ে শুয়ে থাকি। কর্নেল শিগরী আবার টেলিফোনে বললেন যদি কোন অফিসার আসে তাহলে তাকে কর্নেল শিগরীর সাথে কথা বলতে দেয়ার জন্য। আমাকে বললেন, তোমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি সত্বর আসব। কিন্তু তারপর তার নিকট থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কিছুক্ষণ পর গোলাগুলি কিছুটা কমে যায়। বাহির থেকে কে যেন বলছিল আমার রুমে বহু লোক আছে সাথে সাথে আমি পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন আনোয়ারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে উচ্চকণ্ঠে বললাম আমার কাছে আসতে। আমাকে বলা হল বাইরে আসার সাথে সাথে হ্যান্ডস আপ করিয়ে তার নিকট যেতে বলা হয়। দেখা হওয়ার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন আনোয়ার বলে, ডু-নট ওরি। ইউ আর নট এ প্রিজনার অব ওয়ার। ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট ইউ আর আনডার মাই কমান্ড।

আমি তাকে কর্নেল শিগরীর সাথে কথা বলতে বলি। সে আমার কথামত কর্নেল শিগরীর সাথে আমার ডিউটি রুম থেকে কথা বলে। সে আমাকে সাথে করে ডিউটি রুম থেকে কথা বলে। সে আমাকে সাথে করে ডিউটি রুম থেকে কোট এ নিয়ে যায় আর বলে, ভাগতে চেষ্টা করলে বিপদ হবে সাথে সাথে তিনজন প্রহরী আমার জন্য মোতায়েন করা হয়।

সেখানে দেখতে পাই বাঙ্গালী সৈনিকদের মৃত্যুর আত্ননাদ। কেউ বাবারে মারে বলে চিৎকার করছে। কেউ পানির জন্য কাতরাচ্ছে। কেউ যন্ত্রনায় ছটফট করছে। আর সাথে সাথে দেখতে পাই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ সমস্ত লোকদেরকেও বেয়নেটের গুতো দিচ্ছে আর বলছে। বাঙালীকা জান বহুত হুখত হয়। আর ইয়ে শালা মরতা ভি নেহি হয়। মুমূর্ষ বাঙ্গালী সৈন্যদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্যাতন যথেষ্ট চলছিল। যারা মুমূর্ষ অবস্থায় ছটফট করছিল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের গলার উপর বুট দিয়ে চেপে ধরেছে, যাতে তাড়াতাড়ি তারা মারা যায়।

আমাকে প্রহাররত এক প্রহরী বলে আপ আগার অর্ডার দেতে হাম ভি ইয়ে করনে ছাকতা। লেকিন ইয়ে আছা নেহী হয়। এক মুসলমান দূসরা মুসলমানকো খামাখা মার রাহা হয়। খোদা কি কসম হাম অভিতক এক গুলি ভী নেহী মারা।” সাথে সাথে আমাকে বলে “লেফটেন্যান্ট আবু তালেব (বাঙ্গালী-আর্মি এডুকেশন কোর) সাব জিন্দা হয়। উসকো যব বেয়নেট কররা থা উস টাইম পর হাম উনকো বাচা দিয়া। উস দিন এমতেহানমে সাব নে হামে পাশ করায়। ইস লিয়ে হামনে ইয়ে কিয়া। আখের হাম কমান্ডো হয়। সাব নয় নয় সাদী কিয়া। হামনে উনকো বিবি পড় বড়া এহসান কিয়া।” এই সৈন্যটি আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছিল। আমিও তাকে অনুরোধ করেছি আমার কাছে থাকতে। সে বলে, “ছোবাহ তক হাম জিন্দা রাহেগা তো আপ ভী জিন্দা রাহেগা।”

ভোর হওয়ার সাথে সাথে ট্যাঙ্কের গর্জন বেশী বাড়তে থাকে। ব্যারাকের উপর ট্যাঙ্কের গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। চারিদিকে পাহাড়ের উপর তিন ইঞ্চি মর্টারের গোলা পড়তে থাকে আর চতুর্দিকে বাঙ্গালী আহত সৈন্যদের গোংড়ানি ও আতর্নাদ পুরো এলাকায় এক বিভীষিকা এবং বীভৎসতা সৃষ্টি করেছিলো। তারপর দেখা গেল বহু বাঙ্গালী সৈন্যকে চতুর্দিক থেকে বেয়নেটের মুখে ধরে আনা হচ্ছে আর তাদেরকে ই-বি-আর-সি স্কুল কক্ষে ঢুকানো হচ্ছে। একদল ভেতরে ঢোকানোর সাথে সাথে আর কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যকে বড় লাঠি নিয়ে ঢুকতে দেখি। আর সাথে সাথে তাদের বেদম মারপিট শুরু হয়ে যায়। তারা যখন ভীষণ আতর্নাদ শুরু করে তখন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাইরে আসে। বাহির থেকে ভেতরে দু-তিন রাউন্ড গুলি ছোড়ার সাথে সাথে আতর্নাদ বন্ধ হয়ে যায়।

আমার সামনে যে সব সিপাহীকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছিলো। তাদেরকে বাঁধা হয়। ভোর সাতটার দিকে একজন সুবেদার এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে “খাজানা (ট্রেজারী) কিধার হয়।” আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার সাথে সাথে সুবেদার আমার উপর স্টেনগান উঠিয়ে বলে, ছহি ছহি বাতাও কিধার হয়। কারন দুদিন আগে দেড় লাখ টাকা সিপাহীদের বেতন বাবদ ঢাকা থেকে ই-বি-আর-সি-তে পাঠানো হয়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুবেদার একটি হাবিলদারকে নির্দেশ করে বলে, সাব কো ভী বাঁধো। হাবিলদার একটা রশি নিয়ে আসে। আমি দুই হাত পিছু করার সাথে সাথে সে আমাকে বেশ শক্তভাবে বেঁধে ফেলে। আমি বলি, ওস্তাদ বহুত জেয়াদা টাইট হয়, সে বলে সাব আপকা বাজু বহুত মোটা হয়। আমি হাসতে হাসতে বলি, হামতো গামা নেহী হয়। যাক সে আমার বাঁধন একটু শিথিল করে, কিছুক্ষণ পর আমার কমান্ডো প্রহরীটি বাঁধন খুলে নামেমাত্র বেঁধে দেয়।

এই সময় আমাদের সুবেদার মেজর রুহুল আমিন, নায়ক সুবেদার কোয়ার্টার মাস্টার লুৎফুলকেও বেঁধে আনা হয়।

কিছুক্ষণ পরে সুবেদার রহমানকে বেঁধে আনা হয়। তাকে আমি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখলাম। একটা গুলি তার পেটে ঢুকে অপর দিকে বের হয়ে যায়। রক্ত পড়ছিল। তাকেও বেঁধে রাখা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে চা, পরাটা, হালুয়া, খাচ্ছিল। কমান্ডো প্রহরীটি আমার জন্য চা আনতে যাওয়াতে তাকে অপমান করা হয়। সে এসে বলে সময় সবকিছু করে।

আমার সামনের লোকদেরকে খালি চা দেওয়া হয়। তার বিষ মনে করে ক্ষেতে ইতস্ততঃ করে। আমি একটু মুখে নিয়ে বলি, খেয়ে ফেল, কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু সুবেদার মেজর ও নায়ক সুবেদার লুৎফর রহমান তাতেও চা স্পর্শ করলেন না।

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা ই-বি-আর-সি পাহাড়ের নিচে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় আর পাহাড়ের উপর ৩" মর্টার আর ট্যাংক দিয়ে অনবরত গোলাবর্ষণ করতে থাকে। উপর থেকে প্রত্যুত্তরে দু-চারটি গুলিও আসতে থাকে।

২৬শে মার্চ বেলা এগারটার দিকে আমাদের কোয়ার্টার গার্ড থেকে পলাতক একটি বাঙ্গালী সৈন্য ই-বি-আর-সি ফুটবল মাঠের ড্রেন থেকে অকস্মাৎ তিনটি গুলি ছুড়লে প্রায় ৬ জন পাকিস্তানী সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। প্রায় ১২/১৩ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। তারপর সে পালাতে শুরু করে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত সৈন্যটি তাদের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে।

২৬শে মার্চ ভোর ৭টার দিকে পাক সৈন্যরা যেসব লোকদেরকে রাড্রে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিলো তাদেরকে একটি ট্রাকে ভর্তি করতে দেখতে পাই। আমার সামনে দিয়েও শ'খানেকেরও উপর লাশ নিয়ে যেতে দেখতে

পাই। প্রত্যেক লাশকে চারজন সৈন্য হাত পা ধরে মরা কুকুরের মত নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সৈন্যকে কয়েকটি লাশ মাটিতে ছেঁচড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখতে পাই।

এই সময় কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী জুনিয়র অফিসারকে দেখতে পাই। তারা আমাকে বাঁধা অবস্থায় দেখে দুঃখ প্রকাশ করে। একজন ২০-বেলুচের লেফটেন্যান্ট কোয়ার্টার মাস্টার কেঁদে ফেলেছিল।

বেলা তিনটার দিকে কর্নেল ফাতমী (২০ বেলুচের কমান্ডিং অফিসার) ই-বি-আর-সি এলাকাতে আসেন এবং আমাকে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হন। তিনি এক হাবিলদারকে আমার বাঁধন খুলে দিতে নির্দেশ দিলেন। আমি লেফটেন্যান্ট আবু তালেবের কথা বলাতেও তিনি তার বাঁধন খুলে দিতে নির্দেশ দেন। অনুরোধ করাতে সুবেদার মেজর রুহুল আমীন ও নায়েক সুবেদার কোয়ার্টার মাস্টার লুৎফর রমানের বাঁধন খুলে দেয়া হয়। আর লুৎফর রহমানকে বলেন। তুমি একটি মেগাফোন নিয়ে যে সমস্ত লোক পাহাড়ের উপর বা অন্যান্য জায়গায় আছে তাদেরকে আত্মসমর্পন করতে আহবান জানাও। তারা যদি খালি হাতে হাত উঁচু করে আসে তাহলে তাদেরকে কেউ মারবে না। পরক্ষণে তিনি সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যের হাতের বাঁধন খুলে এক জায়গায় একত্রিত করতে নির্দেশ দেন। তাই করা হল। আমাকে বলেন যে তুমি গিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে পার। তবে তাদের উপর আর কোন অত্যাচার করা হবে না।

আমি গিয়ে সকলকে একত্র করে তাই বললাম। ৫০০/৬০০ জন বাঁধা অবস্থায় ছিল। পুনরায় কর্নেল ফাতমীর সাথে দেখা করলে তিনি আমাকে বলেন, “এ্যানি হয়ার ইউ ওয়ান্ট টু গো ইউ ক্যান গো। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টে ইন অফিসার মেস, গো এহেড। বেটার গো হোম।”

আমি অন্যদের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঢাকা থেকে নির্দেশ পেলে তাদেরকেও ছেড়ে দেয়া হবে।

আমি দুজন সিপাহী নিয়ে মেসে টাকা আনতে যাই। ওখানে প্রহরারত হাবিলদার পাঞ্জাবী ভাষায় আমার প্রহরারত সিপাহীদের বলল, সাহেব যখন ভেতরে যাবে তখন তাকে হত্যা কর। আমি শুনতে পেয়ে একটু সামনে যেয়ে আবার ফিরে এসে বললাম। ওস্তাদ আব লোগ কোকাকোলা ফান্টা পিয়া। হামারা নাম পর পিলে। হামে এক বাদ ইয়াদ আয়া, কর্নেল সাব নে বাতায়্যা সি-এম-এইচ ছে ডাক্তার লে কর জখমী কো পহেলা দেখনে কি লিয়ে। হাম ফের খোর বাদমে আয়েঙ্গে। এ যাত্রা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাই।

তারপর আবার কর্নেল ফাতমীর সাথে দেখা হয়। আমি তাকে বলি, আমার লোকজনের খাবারের কোন ব্যবস্থা আছে ? তিনি বলেন। আমাদের লোক নিয়ে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করুন। না হয় তারা কষ্ট পাবে।

তিনি আরো বলেন ই-বি-সি-র সামনে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী থাকবে না। রাত্রি তাদের কোন অসুবিধা হবে না। এখানে বলা যেতে পারে ই-বি-আর-সি-র সামনের জায়গাটা হল বায়েজিদ বোস্তাম ও বেসামরিক লোকদের বাড়িঘর। লোকজনকে একত্র করে পুনরায় আমি তাদের খাবারের ব্যবস্থার জন্য বলি। আর বলি, আমাকে, লেফটেন্যান্ট তালেব, সুবেদার মেজর রুহুল আমীন ও নায়েব সুবেদার কোয়ার্টার মাস্টার লুৎফর রহমানকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আমরা বাইরে যাচ্ছি। বাকিদেরকে ঢাকা থেকে ক্লিয়ারেন্স পেলে ছেড়ে দেয়া হবে। তবে ই-বি-আর-সি-র সামনে রাত্রি কোন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য থাকবে না।

ই-বি-আর-সি থেকে বের হওয়া কষ্টকর ছিল। চারদিক থেকে এখনো এলোপাতাড়ি গোলাগুলি চলছিল। মৃত্যুকে হাতে নিয়ে বহু কষ্টে ই-বি-আর-সি এলাকা থেকে বের হতে সক্ষম হই।

ই-বি-আর-সি-র বাইরে একটি ফ্লাটে আমাদের চারজন অফিসার ছিলেন। আসার পথে তাদেরকে বাইরে নিয়ে আসতে যাই। আমাকে দেখে তারা যেন আকাশ থেকে পড়ছেন বলে মনে হল। দেখার সাথে সাথে তারা

ই-বি-আর-সির ভেতরের অবস্থা জানতে চান। আমি উপরে বর্ণিত দু-একটি কথা বলার সাথে সাথে তাদেরকে আমার সাথে আসতে বলি। সেখানে ছিলেন মেজর রেজাউল রহমান (মেডিক্যাল স্পেশালিষ্ট) মেজর আশরাফ (রেডিওলজিস্ট), ক্যাপ্টেন বাশার (আর্মি সাপ্লাই কোর) ও ক্যাপ্টেন মোহসীন (এডজুট্যান্ট, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট)।

তাদের মধ্যে একজন বলেন, আমরা তো মনে করছিলাম। ই-বি-আর-সিতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ফাকা আওয়াজ করেছে। জবাবে আমি বলি, এক হাজারেরও অধিক লোককে তারা বেয়নেট বুলেট ও অন্যান্য মরনাস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

এ কথা শোনা মাত্রই মেজর রেজাউল রহমান সকলকে তৎক্ষণাৎ আমার সাথে শহরের দিকে চলে যেতে বলেন। পরিবারের সকলকে নিয়ে আমরা যাযাবারের মত শহরের দিকে রওনা হই।

চট্টগ্রাম শহরে আসার পর দেখি শহরবাসীরা ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মারমুখী হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। আমি আমার এক আত্মীয় বাড়িতে রাত দশটায় যাই এবং সেখানে রাতযাপন করি।

সকালে আওয়ামী লীগ অফিস থেকে জনাব এম, আর সিদ্দীকির সাথে কথা হয়। তিনি আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত ই-পি-আর এর কমান্ড নিতে বলেন।

আমি কয়েকজন ছাত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা হই এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে (চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র) যাই। সেখানে ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভূইয়া ই-বি-আর সি ছেড়ে চলে আসলে। সে জবাবে বলে, কোন উপায় না দেখে আত্মগোপন করছি। বেশী কিছু না বলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার কথা বললাম। সে আমাকে যাওয়ার জন্য বলল। আমি বললাম, আমি কোরবানির বকরা তাই যাচ্ছি। ছাত্রদের সাথে গাড়িতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। সেখানে ইপিআরদেরকে সংগঠিত করি।

আমি ইপিআরএর লোকদেরকে যুদ্ধ করার জন্য এক জুলাময়ী বক্তৃতায় ইবিআরসির ঘটনাবলীর কথা বলাতে তারা একযোগে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদের দৃঢ় শপথ ঘোষণা করল।

ই-পি-আর'দের নিয়ে কোথায় কি করতে হবে পরিকল্পনা করার পর আমি পুনরায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হয়ে মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করি। দেখা না পেয়ে বেতার কেন্দ্রে একদিনের মত কাজ করি। বাইরে যাবার পর দেখি চারদিকে লুটপাট, মারামারি চলছে। একজন ছদ্মবেশী ভূয়া ক্যাপ্টেন তার নাম নাসির। তার সাথে কোতয়ালী থানা থেকে অস্ত্রশস্ত্র বাহির করতে যাই। সেখানে প্রহরারত প্রহরীদের দেখি। নাসিরের হাবভাবে মনে হল যে সেনাবাহিনীর লোক নয়। তদুপরি থানা থেকে ১০/১৫ হাজার টাকা চাওয়াতে মনে আরো সন্দেহ হয়। চট্টগ্রামে আরো দুদিন ছোটখাটো অপারেশন করার পর আমি ফেনীর পথে রওনা হই এবং ফেনী, নোয়াখালী, মাইজদী, লাকসাম, কুমিল্লার মিয়ার বাজার, চৌদ্দগ্রাম এলাকার সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেই। ফেনীতে হেডকোয়ার্টার ছিল। পুলিশ ইপিআর, আর্মি মুজাহিদ ইউ-ওটি সি ও ছাত্রদেরকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হই। সেখানে জনাব খাজা আহমদ, জনাব জরুল কাইয়ুম এম-সি-এ কে ভারত থেকে আমাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে অনুরোধ করি। তারা তাদের চেষ্টা চালান। দুদিন পর বেলুনিয়ার এসডিও ও বি-এস-এফ কমান্ডারের সাথে আমাদের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে জনাব খাজা আহমদ, জনাব জরুল কাইয়ুম, জনাব আবদুর রশিদ, এম সি এ উপস্থিত ছিলেন। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন তাদেরকে জানাই এবং বিএসএফ কমান্ডার সবকিছু দিতে স্বীকার করেন।

আমরা বাংলাদেশ থেকে ভারত সীমান্ত রসদপত্র রাখার ব্যবস্থা করাই। সেদিন সব ব্যবস্থা করা হয়। তার সাথে সাথে বার্টার সিস্টেমে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস তারা দেবেন বলেও স্বীকার করেন।

আমরা আমাদের এলাকাটাকে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী থেকে মুক্ত রাখার জন্য চতুর্দিকে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরী করি। যে সব রাস্তা দিয়ে হানাদার বাহিনীর চলাচল করার সম্ভাবনা ছিল সেসব রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন, চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম রাস্তার ডাকাতিয়া নদীর উপর বড় সেতু হরিকোট পুল, ফেনী-লাকসাম রেলওয়ে রাস্তার বড় সেতু পরিকোট ব্রীজ। নোয়াখালীরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজ উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। পরিকোট ব্রীজের সতুর মেরামতের কাজ দেখার জন্য কুখ্যাত টিক্কা খান পরিদর্শনে এসেছিল।

লাকসামে আমাদের অবরোধ প্রতিহত করতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা মারমুখি হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় চারদিন অনবরত যুদ্ধের পর আমাদেরকে লাকসাম ছাড়তে হয়।

লাকসাম-নোয়াখালীর প্রবেশপথে খন্ড খন্ড বহু যুদ্ধ হয়। যার নেতৃত্ব করার জন্য সুবেদার লুৎফরকে ভার দেয়া হয়েছিল। বহুদিন খন্ডযুদ্ধ চলার পর ভারী আধুনিক অস্ত্রের অভাবে পিছু হটতে বাধ্য হই।

সামান্য কিছু অস্ত্র নিয়ে ভারত থেকে মাঝে মাঝে এম সি এ নুরুল হক যুদ্ধক্ষেত্রে আসতেন। তাকে দেখে আমাদের লোকজন দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধ করার মনোবল পেতে।

সমুদ্রপথে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে চারদিক দিয়ে বহু বাস্কার তৈরী করা হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের শক্তিশালী অবরোধ দেখে নোয়াখালী থেকে ফেনী না এসে লাকসাম থেকে ফেনীর পথে রেল পথে ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয়। পরিকোট পুলের নিকটে প্রায় একদিন যুদ্ধ চলে। তাদের ত্রিমুখি আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের লোকজন পিছু হটতে আসে। আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ঐ দিনই পাকিস্তানী সেনাদেরকে তিন দিকে আটক করে রাখে- নোয়াখালীর পশ্চিম দিকে, ফেনীর উত্তর দিকে ও বুরবুরিয়া ঘাট এলাকায়।

পশ্চিম পাকিস্তানীরা একদিন গুণবতীতে অপেক্ষা করার পর অতর্কিতে ফেনীর তিন দিক ঘিরে ফেলে। আমাদের লোক মারমুখি হয়ে বার ঘণ্টার মত তাদেরকে বহু কষ্টে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু তাদের ভারি আধুনিক অস্ত্রের মুখে টিকতে না পেরে ফেনী ছাড়তে বাধ্য হয় এবং ভারতের সীমান্তে গিয়ে একত্রিত হয়। তখন ছিল মে মাস।

একিনপুরে আমরা সবাই একত্রিত হই। একিনপুর থেকে ৪ কোম্পানী সৈন্য নিয়ে শুভপুর বুরবুরিয়া ঘাট মুহুরী নদী ও ছাগলনাইয়া ফ্রন্টে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাই। পাক সেনাবাহিনী একদিন অতর্কিতে ছাগলনাইয়ার বাস্কার তৈরী করে অপেক্ষা করছিল। তাদের কিছুসংখ্যককে মুহুরী নদী পার হতে দেই এবং অতর্কিতে তাদের উপর হামলা চালানো হয়। অনেক পাকসৈন্য নিহত হয়। এমনকি তাদের লাশ নেবার জন্য কোন লোক দেড় দিন পর্যন্ত আসে নাই। বাধ্য হয়ে সকল সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভারতে আসতে হয়। আমরা ১নং সেক্টরে প্রথম পর্যায়ে মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠিত হই। আমার কিছুসংখ্যক লোক খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করে।

স্বাক্ষরঃ এনামুল হক চৌধুরী

৭-১১-৭৩

ক্যাপ্টেন শমসের মুবিনের
দৃষ্টিতে চট্টগ্রামের প্রতিরোধ
সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন শমসের মুবিন চৌধুরী
২০-১০-১৯৭৩

মার্চের ২২ তারিখে ক্যাপ্টেন হারুন (এসিস্ট্যান্ট উইং কমান্ডার, ই-পি-আর) কাণ্ডাই থেকে এসে আমাকে বলল যে আমাকে মেজর রফিকের (এডজুট্যান্ট, ই-পি-আর) বাসায় যেতে হবে। ২২শে মার্চ রাতে আমি, ক্যাপ্টেন হারুন, মেজর খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন অলি মেজর রফিকের বাসায় গেলাম।

জনাব কায়সার এম-পি এ এবং ডাক্তার মাল্লান এই দুজন আওয়ামী লীগ কর্মীও সেখানে ছিলেন। আমরা স্থির করলাম যে, এখানে আলাপ-আলোচনা করা নিরাপদ নয়, তাই আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম। যাবার সময় আমরা খুব সতর্ক ছিলাম যে কেউ আমাদের অনুসরণ করছে কিনা।

আমরা আওয়ামী লীগ কর্মীদের তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললেন যে, শেখ সাহেব রাজনৈতিক সমাধানের আশা করছেন। আমরা বললাম যে, আমরা আপনাদের সাথে আছি। আপনাদের পক্ষ থেকে যদি ঠিক সময়ে কোন সাড়া বা আভাস পাই তাহলে আমরা কিছু একটা করতে পারি।

আমরা বুঝতে পারলাম যে তাদের কোন প্রস্তুতি নেই। আমরা বললাম যে আমরা মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত আছি। আপনারা ঢাকা থেকে খবরাখবর নিয়ে আগামীকাল আমাদের জানাবেন।

২৩শে মার্চ মেজর রফিক আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে বললেন। কিন্তু কিছু একটা হবে কিনা তিনি তখনও জানেন না। আমাদের আলাপ-আলোচনার কথা মেজর জিয়াউর রহমানকে জানলাম। তাকে আমরা আবার আশ্বাস দিলাম যে আমরা সবসময় তার সাথে থাকব। এর আগে লেঃ মাহফুজকে পরিস্থিতি অবগত করানোর জন্য মেজর জিয়াউর রহমান আমাকে বলেছিলেন। আমি তাকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম যে আমাদেরকে পাকিস্তানীরা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখছে। আমরাও তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছি না। মেজর জিয়াউর রহমান বলেছেন যে সিটিং ডাক-এর মত না থেকে নিরস্ত্র করতে আসলে তা প্রতিহত করবেন। মাহফুজ বলল যে পরিস্থিতি এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে কিনা? তারপর সে বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে।

২৪শে মার্চ মেজর রফিক আমাকে বলল যে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের কোন সিদ্ধান্ত এখনও আমাদেরকে জানাননি। ২৪শে মার্চ রাতে খবর পেলাম যে জনগণ রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করছে। এম ভি সোয়াত থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করতে জনগণ বাধা দিচ্ছে। জেটি থেকে সেনানিবাস পর্যন্ত রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সেনাবাহিনীর লোকজন চলাফেরা করতে না পারে। এখবরটা আমি জিয়াউর রহমান সাহেবকে পাঠালাম।

আমাদের সৈনিকদের মাঝে একটা আতংক দেখতে পেলাম। কি হবে? কি করতে হবে না হবে? বাইরের ঘটনাবলীতে সৈনিকরাও যথেষ্ট উদ্ভিগ্ন ছিল। আমি সারারাত সজাগ ছিলাম। ২৪শে মার্চ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দুইজন মেজর জেনারেল চট্টগ্রামে ইবিআর সি-তে এসেছিলেন। ঐদিন জানতে পারলাম দুজনের সাথে করে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে (ই-বি-আর-সি কমান্ডার মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর) ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ খবরটা জিয়াউর রহমানকে জানাই। আমাদের সি-ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া বললেন যে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়নি। তিনি বার বার বলছিলেন যে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের জায়গায় ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

২৫শো মার্চ ব্রিগেডিয়ার আনসারী আমাদের সি-ওকে নির্দেশ দিলেন যে আমরা যেন ব্যারিকেড পরিস্কার করি। “অল ব্যারিকেডস মাস্ট বি ক্লিয়ার এ্যাট এনি কস্ট”- এটা ব্রিগেডিয়ার আনসারীর ম্যাসেজ ছিল। এ্যাট এনি কস্ট শব্দটার উপর আমাদের সি-ও খুব এ্যামফ্যাসিস করছিলেন। ষোলশহর রেলক্রসিং এর উপর ওয়াগন দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছিল। ঐ ব্যারিকেড সরাতে পুরো একটা কোম্পানী ডিটেইল করা হল। সুবেদার খালেককে বললাম। যে এ ট্রেনের ওয়াগন যেন বিকেল চারটার আগে সরানো না হয়। কমান্ডিং অফিসার আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ডেকে ঐ ওয়াগনগুলোর চাকা ব্রেক ভাঙতে শুরু করলেন। জনসাধারণ খুব হৈ হুল্লোড় করছিল। বিকেল পর্যন্ত ঐ ব্যারিকেড সরানো হল। বায়েজীদ বোস্তামী পর্যন্ত সমস্ত ব্যারিকেড পরিস্কার করতে নির্দেশ দেয়া হল। আমরা আশা করছিলাম যে আওয়ামী লীগ হাই কমান্ড থেকে কোন নির্দেশ পাব। আমি মেজর রফিকের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করি। তিনিও বললেন যে কোন নির্দেশ তিনিও পাননি। তিনিও প্রস্তুত আছেন।

আমরা ব্যারিকেড পরিস্কার করতে গেলাম। ২৫শে মার্চ রাত ৯টা নাগাদ সমস্ত ব্যারিকেড পরিস্কার করা হল। জনসাধারণ আমাদেরকে খুব বাধা দিচ্ছিল। “আপনারা এসব করবেন না। আপনাদেরই ক্ষতি হবে।” জনসাধারণ এসব বলছিল। আমরা বললাম যে আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় আমরা কিছু করছি না। আমরা শুধু নির্দেশ পালন করছি। তদুপরি অন্য কোন নির্দেশও আমরা পাচ্ছি না। কমান্ডিং যে কোন উপায়ে হোক ব্যারিকেড ক্লিয়ার করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

ষোলশহর থেকে বায়েজীদ বোস্তামী পর্যন্ত ডিউটি দেবার জন্য আমাদের উপর নির্দেশ দেয়া হল। আমরা যখন ডিউটি করছিলাম। তখন বালুচ রেজিমেন্টের ৫টা গাড়ি আমাদের সামনে দিয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গেল। ঐ সব গাড়ীতে গোলাবারুদ ও এমুনিশনও ছিল।

রাত সাড়ে এগারটায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়ার সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে মেজর জিয়াউর রহমানকে চটগ্রাম পোর্ট এ ডিউটি করতে খবর দিতে বললেন। তিনি জিয়াউর রহমানের স্ত্রীকে বলতে বললেন যে ভয়ের কোন কারণ নাই। জিয়াউর রহমান ২৬শে মার্চ সকালে চলে আসবে।

রাস্তায় ছেলেরা একটা গর্ত করেছিল। সেই গর্তটা ভরাট করতে আমাকে বলা হল। আমি জিয়াউর রহমানের স্ত্রীকে এ খবর বললাম। জিয়াউর রহমানকেও এ খবর জানালাম।

রাত বারটায় আমি ষোলশহর ক্যান্টনমেন্টের গেটে গেলাম। সেখানে গিয়ে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। বৃষ্টির মত গুলি হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন অলিকে টেলিফোনে জানালাম যে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ভীষণ গোলাগুলি হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না সেখানে ঠিক কি হচ্ছে। ক্যাপ্টেন অলি আমাকে সঠিক খবর নেবার চেষ্টা করতে বললেন এবং তাকে জানাতে বললেন। এমন সময় কিছু বাঙ্গালী সৈন্যকে গেটের দিকে আসতে দেখলাম। তারা আমাকে বললেন যে, স্যার বেলুচ রেজিমেন্ট আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে এবং আমাদের অনেককে মেরে ফেলেছে। কর্নেল এম, আর, চৌধুরীকেও (ই-বি-আর-সি চীফ ইন্সট্রাক্টর) মেরে ফেলেছে। আমি সংগে সংগে তাদেরকে গাড়িতে উঠালাম এবং আমার সাথে ষোলশহরে এইটখ বেঙ্গলে নিয়ে আসলাম।

এইটখ বেঙ্গল-এ এসে শুনলাম যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মেজর জিয়াউর রহমানের নির্দেশে এটা করা হয়েছে। মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন যে এখন থেকে তিনিই হচ্ছেন ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার। তিনি আরো বললেন যে গোলাগুলির খবর তিনি শুনেছেন। এ খবর শোনার পর তিনি ব্যাটালিয়ন এর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়াসহ অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করেছেন। পরে ওদের সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তারপর মেজর জিয়াউর রহমান আমাকে ব্যাটালিয়ন এর সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করতে বললেন। সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করা হল। তার পর মেজর জিয়াউর রহমান টেবিলের উপর উঠে বক্তৃতা করলেন। তিনি

বললেন, “আজ থেকে আমি অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সংকল্প ঘোষণা করলাম। এবং আমার নির্দেশেই সবকিছু চলবে। আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন। এখন এখানে থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আমরা সবাই কালুরঘাটের দিকে যাব, সেখানে গিয়ে আমরা সবকিছু রিঅর্গানাইজ করব এবং আমাদের পরবর্তী কর্মসূচল নির্ধারণ করব।”

২৬শে মার্চ ভোরে আমরা কালুরঘাটের আর একটু দূরে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আমরা বিশ্রাম নিলাম এবং রিঅর্গানাইজেশন করলাম। ২৬শে মার্চ এভাবে কেটে গেল।

২৭শে মার্চ সন্ধ্যার সময় মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে গেলেন এবং ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন যে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত আছি। আপনারা যে যেখানে আছেন, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে বললেন। তিনি বিশ্বের শান্তিকামী দেশগুলোর সাহায্য এবং সহযোগিতা কামনা করলেন। দেশবাসীকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে বললেন।

২৮শে মার্চ সারা দিন আমি ঐ ভাষণ বেতার কেন্দ্র থেকে পড়ি।

চট্টেশ্বরী রোডে অপারেশনঃ পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের এ্যামবুশ করেছিল। আমরা ১০ জন ছিলাম। আমরা ওদের এ্যামবুশ কাউন্টার করেছিলাম।

২৯শে মার্চ আসকের দীঘি অপারেশনঃ প্রায় ১২ ঘন্টা এখানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের গোলাগুলি বিনিময় হয়।

৩০শে মার্চ বাকুলিয়া গ্রাম অপারেশনঃ এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুটো গেরিলা কমান্ডোকে হত্যা করা হয়।

এপ্রিল মাসের ১১ তারিখে কালুরঘাট ব্রীজ অপারেশন চালানো হয়। এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে আমি গুরুতররূপে আহত হই। আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ি। তারপর আমাকে ঢাকা নিয়ে আসা হয়। বন্দী শিবিরে রাখা হয়। এবং অশেষ নির্যাতন করা হয়। প্রত্যহ আমাকে মারধর করা হত। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আমাকে রাখা হয়। আমার সাথে আরো অনেক বন্দি ছিল। এদের কাউকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। জুন মাস পর্যন্ত আমার উপর অত্যাচার চলে। নভেম্বর মাসে আমার বিরুদ্ধে চার্জশীট আনা হয়। বলা হয়েছিল আমাকে কোর্ট মার্শাল করা হবে। কিন্তু ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আমি মুক্ত হয়ে যাই।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কালুরঘাটে এসে গ্রামে আমরা শপথ গ্রহণ করলাম। শপথবাক্য পাঠ করেছিলেন মেজর জিয়াউর রহমানঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। এমন কি যদি প্রয়োজন হয় দেশের জন্য আমরা প্রাণ দেব।

আমাদের ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার ছিল গ্রামে। ৩০শে মার্চ বাকুলিয়া গ্রামে অপারেশন চালিয়ে আমরা দুটো কমান্ডোকে হত্যা করি।

চকবাজারে আমরা প্রতিরক্ষা ব্যুহ তৈরী করেছিলাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পিছু হটে যাই।

চট্টগ্রাম কালুরঘাটের যুদ্ধঃ ১১ই এপ্রিল সকাল ৮টার সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভীষণ আর্টিলারি ফায়ার শুরু করে। আমি এবং মেজর হারুন আমাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিলাম। আমাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায়

৩৫ জন। ওদের সংখ্যা ছিল ১০০-এরও উপর। আমাদের একজন সিপাহী এই যুদ্ধে মারা যায়। মেজর হারুন ব্রীজের উপর আহত হন। আহত হবার পর অতিকষ্টে তাকে পুলের ওপর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে নির্দেশ দিলাম। আমাকে একজন সৈন্য চলে যেতে বলল। আমি বললাম যে তোমরা যাও আমি আসছি। আমি রয়ে গেলাম। হঠাৎ আমি নিজেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক ঘেরাও অবস্থায় দেখলাম। অন্য সবাই পুলের অপর পারে চলে যেতে সক্ষম হয়। আমি ট্রেঞ্চ থেকে বের হয়ে চারদিকে চাইনিজ স্টেনগান দিয়ে গুলি ছুড়তে দেখলাম। তারপর একটা গুলি এসে আমার কোমরে লাগে এবং আমি গুরুতররূপে আহত হয়ে পুলের উপর পড়ে গেলাম। আমি ভাবতে লাগলাম যে শত্রু আমাকে ধরে ফেলবে। আমি ওদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে স্থির করলাম। কিন্তু স্টেনগানটা দূরে ছিল। তাই এটা সম্ভব হল না। আমি ভাবছিলাম ওরা আমাকে ধরে মেরে ফেলবে কিন্তু শত্রু আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং বন্দী করে রাখে। তারপর আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দেয়।

স্বাক্ষরঃ শমসের

বাংলাদেশ আর্মি

চট্টগ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার হারুন আহমেদ চৌধুরী*

১৭-১-১৯৭৫

২২শে মার্চ আমি চট্টগ্রামে আসলে ক্যাপ্টেন রফিক আমাকে বললেন, ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অনেক বাঙ্গালী অফিসার আছেন, তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেশের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং বিদ্রোহ সম্পর্কে কথাবর্তা চালাও। আমি ক্যাপ্টেন রফিকের কথামত ২৩শে মার্চ ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেসে যাই এবং আমার কোর্স মেট ক্যাপ্টেন খালেদুজ্জামান চৌধুরী (বর্তমানে লেঃ কঃ) ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (বর্তমানে মেজর) লেঃ মাহফুজুর রহমান (বর্তমানে মেজর), লেঃ শমসের মুবিন চৌধুরী (বর্তমানে মেজর) এর সঙ্গে দেখা করে কথাবর্তা বলি। মেজর শওকত তখন মেসে ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সিনিয়র, সেহেতু তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পাইনি।

উপরে বর্ণিত তরুণ অফিসারবৃন্দকে নিয়ে আমি ক্যাপ্টেন রফিকের বাসায় সন্ধ্যা আসি এবং সেখান থেকে ক্যাপ্টেন রফিকসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এর অধ্যাপকের বাসায় পৌঁছাই-তখন রাত অনুমান সাড়ে ন'টা। আমার নিজের একটি ভর্তুকিগাওয়ান গাড়ি ছিল। ঐ গাড়িতে করে আমরা গিয়েছিলাম। ঐ সভাতে এমপিএ আতাউর রহমান কায়সার, ডাঃ মান্নানসহ আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশের সর্বশেষ অবস্থা, আমাদের ক্ষমতা, পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে আসা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। সামরিক বাহিনী গতিবিধি দেখে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, পাকিস্তানী সেনারা সত্তর বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে একটা কিছু করতে যাচ্ছে। সভায় ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তরুণ অফিসারবৃন্দের সঙ্গে আমাদের ই-পি-আর বাহিনীর অফিসারবৃন্দের (২জন) মাঝে সমঝোতা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যদি পাক বাহিনী আক্রমণ করে আমরা বাঙ্গালীরা একসঙ্গে প্রতিরোধ গড়বো এবং সমুচিত জবাব দেব।

২৪শে মার্চ সকালে আমি কাণ্ডাই চলে যাই। যাবার পূর্বে আমি এবং ক্যাপ্টেন রফিক আর একবার মিলিত হই। কথা হয় যে, পাকিস্তানীরা যদি আক্রমণ করে অথবা ইঙ্গিত দেয় তাহলে আমরা বিদ্রোহ করবো এবং ক্যাপ্টেন রফিক আগে বিদ্রোহ করলে সে আমাকে খবর দেবে। রফিক আরও বললো যে, আমি ইন্সপেকশনের

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন

নামে পাঞ্জাবীদের অস্ত্রের ফায়ারিং পিন অকেজো করে দিয়েছে এবং তুমিও তোমার উইং-এ তাই করো। আমি রাজী হলাম। আমাকে তিনি কোড ওয়ার্ড দিলেন, “ব্রিং সাম উড ফর মি”- অর্থ হলো চট্টগ্রামে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমাকেও বিদ্রোহ শুরু করতে হবে। এবং সমস্ত অবাস্তালীদের বন্দী করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন রফিকের সঙ্গে মিলতে হবে।

২৪শে মার্চ খুব ভোরে আমি কাপ্তাই চলে গেলাম। আমার উইং-এ সুবেদার মেজর ছিল (বাস্তালী) নজমুল হক। সুবেদার মেজর আমাকে সব খবরাখবর এনে দিত। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে অবাস্তালী এন-সিও এবং জে-সি-ওরা রাতে গোপনে মেজর পীর মহম্মাদের (উইং কমান্ডার) বাসাতে সলাপারামর্শ করতো। আমি সবসময় সতর্ক থাকতাম এবং বুঝতে পারতাম উইং কমান্ডার এবং অবাস্তালীদের মনে আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি চলছে। আমি ভিআইপি রেষ্ট হাউসে থাকতাম। ২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন ফারুক বান্দরবন থেকে উইং হেডকোয়ার্টারে আসে। ক্যাপ্টেন জায়দী আমার অনুমতি নিয়ে ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় কাপ্তাইতে আসেন। ক্যাপ্টেন ফারুক এবং ক্যাপ্টেন জায়দী আমার রুমে জায়গা নিলেন। আমরা তিনজন কথাবর্তা বলে রাত ৯-৩০ থেকে ১০টার দিকে ঘুমতে যাই। এমন সময় আমার অর্ডারলি দরজা ধাক্কা দেয় এবং আমার টেলিফোনের কথা বলে। আমি টেলিফোনে যেয়ে শুনলাম যে লাইন কেটে গেছে। তবে অপারেটর বলল, ক্যাপ্টেন রফিক কথা বলতে চেয়েছিলেন। আমি রুমে ফিরে যাই এবং মিনিট দশেক পর আবার টেলিফোন আসে। টেলিফোন ধরে জানলাম এম, আর, সিদ্দিকী। জনাব সিদ্দিকী বলেন, ২০-বালুচ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আক্রমণ করেছে। শহরে খুব গোলমাল, আপনি বিদ্রোহ করেন এবং চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন। আমি রফিকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। তিনি বললেন, “রফিক যুদ্ধ করেছে, সে এখানে নাই। এরপর আবার টেলিফোন পেলাম, করেছেন জনাব এম, আর, সিদ্দিকী। জনাব সিদ্দিকী বলেন, “রফিক যুদ্ধ ময়দানে তবে একটি কোড ওয়ার্ড পাঠাতে বলেছেন, সেটি হলো, ব্রিং সাম উড ফর মি।” তখন আমি অবস্থাটা বুঝলাম। তখনই আমার রুমে এসে পোশাক পরি এবং সিদ্ধান্ত নিই অবাস্তালীদের নিরস্ত্র করবো এবং চট্টগ্রামে রওয়ানা হব। পোশাক পড়ার সময় অবাস্তালী অফিসার জেগে যায় এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে আমি পোশাক ক্যান পরছি। “লাইনে কিছু গোলমাল, এখনই ফিরে আসবো, তোমরা ঘুমাও”- এই কথা বলেই আমি চলে যাই। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় এক অবাস্তালী এন-সিও আমার দিকে আসে, এবং বলে স্যার, লাইনে গোলমাল। তখন এনসিওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমি লাইনে যাই। লাইনে পৌঁছে আমি সুবেদার মেজরকে ডাকি এবং সমস্ত কথা বলি। তাকে বলি, “কোতে চাবি নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। বাঁশী বাজালে কোত খুলে দেবেন।” ঐ রাতে গার্ড কমান্ডার ছিলো একজন পাঞ্জাবী। তাকে ডেকে আমাদের দোতলায় সমস্ত এন-সিকে ডাকতে বললাম। আমার সাথে এনসিওকে তার আগেই উপরে পাঠিয়েছিলাম। গার্ড কমান্ডার উপর তলা থেকে নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমি বন্ধি করি এবং অস্ত্র কেড়ে নেই। আমার কথামত কোয়ার্টার গার্ডের বাস্তালী সৈনিকরা সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় সিঁড়ির মুখে পজিশন নিতে থাকে। হুইসেল দেই, সমস্ত বাস্তালী সৈনিকদের উপর হতে নিচে নেমে আসতে বলি এবং অবাস্তালীদের উপরে থাকতে বলি। কোন অবাস্তালী নামার চেষ্টা করলে গুলি করার হুকুম দেই। বাস্তালীরা প্রস্তুত ছিল, তাই হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাস্তালীরা নীচে নেমে আসে। কোত খুলে দেওয়া হয় এবং সকলের হাতে অস্ত্র-গোলাবারুদ তুলে দেওয়া হয়। আমি তখন উইং কমান্ডার মেজর পীর মহম্মাদকে নিরস্ত্র করতে গেলাম। কাপ্তাইতে তখন কতগুলো পয়েন্ট ছিল, যে পয়েন্টে আমাদের ই-পি আর বাহিনীর ৪/৫ জন পাহারায় থাকতো। উইং কমান্ডারের বাসার সামনেই একটা পয়েন্ট ছিল। সে পয়েন্টের গার্ড ছিল অবাস্তালী। আমি তখন পয়েন্টের গার্ডটিকে নিরস্ত্র করি এবং তারপর মেজর পীর মহম্মাদের বাসায় যাই। মেজর পীর মহম্মাদ তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ডাকাডাকিতে উঠলেন এবং তিনি আমাকে পোশাক পড়া দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি আসলে বললাম, “আপনি বন্দী। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমি উইং-এর দায়িত্ব নিয়েছি।” মেজর পীর মহম্মাদ অস্ত্র ধরার চেষ্টা করলেন। আমি হুঁশিয়ার করে দেই, “অগ্রসর হলে মৃত্যু।” তাকে বললাম, “ঘরে থাকেন, কোন অসুবিধা হবে না আপনার।” এই বলে বাইরে গার্ড রেখে আবার রুমের দিকে যাই। রুমে পৌঁছে দেখলাম ক্যাপ্টেনদ্বয় উঠে বসেছে। তাদেরকে বললাম, “তোমরা বন্দী। এদেশ স্বাধীন।” পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন জায়দী উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই তাকে বন্দী করে

ফেলি। ক্যাপ্টেন ফারুক পাঠান ছিল। সে খুশি হয়ে বললো। “ভালই হলো আমি তোমার অনুগত হয়ে বাংলাদেশের সেবা করবো।” রাত তখন সাড়ে এগারোটা হবে। হাজার হাজার জনতা পথে নেমেছে। আমি ই-পিআর কোম্পানীর ৪/৫ জনকে উইং হেডকোয়ার্টারের রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে রাত সাড়ে তিনটার দিকে চট্টগ্রামের পথে রওনা হই। যাবার পূর্বে অয়ারলেস মারফত আমার অবশিষ্ট কোম্পানীগুলোকে মেসেজ পাঠাই যে, সমস্ত অবাস্তাবাদীদের বন্দী করে কাপ্তাইতে একত্রিত হয়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হও।

২৬শে মার্চ আমি যখন চট্টগ্রাম শহর থেকে ৭/৮ মাইল দূরে ছিলাম তখন দেখলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্য পটিয়ার দিকে দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম পাক বাহিনী আক্রমণ করেছে এবং মেজর জিয়া সহ ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে। তারা পটিয়াতে একত্রিত হবে। আমি অগ্রসর হলে মেজর জিয়ার সাক্ষাৎ পাই। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বললেন, “ক্যাপ্টেন রফিক শহরে যুদ্ধ করছে আমরা ৮ম ইস্ট বেঙ্গল পটিয়াতে একত্রিত হবো তারপর আবার শহরে এসে পাল্টা আক্রমণ চালাবো।” আমাকে তার সঙ্গে থাকতে বললেন। আমি মেজর জিয়ার সঙ্গে থেকে গেলাম। এরপর মেজর জিয়ার কমান্ডে কাজ করতে থাকি। পটিয়াতে আমরা সবাই মেজর জিয়ার নেতৃত্বে শপথ নেই। কালুরঘাটে পাকবাহিনী ব্যাপকভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। ১১ই এপ্রিল পাকসেনারা চারদিক থেকে বৃষ্টির মত গোলা ফেলতে থাকে।

ঐ তারিখে আমি এবং শমসের মবিন চৌধুরী গুরুতররূপে আহত হই। আমাকে পটিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। ডাঃ নূর হোসেন (অস্ত্র বিশেষজ্ঞ) পটিয়াতে আমার অস্ত্রোপচার করেন। তারপর আওয়ামী লীগের লোকজন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিয়ে ফিরতে থাকে। ইতিমধ্যে কালুরঘাটের পতন ঘটে। মালুরঘাট নামক স্থানে খৃষ্টান মিশনারী হাসপাতালে পুনরায় আমার অস্ত্রোপচার করে সেখান থেকে কক্সবাজারের উখিয়া নামক স্থানে সমসের আলম চৌধুরীর বাড়িতে রাখেন। সমসের আলম চৌধুরী সাহেব আমাকে ওষুধপত্র দিয়ে এবং সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলেন। ফকরুদ্দিন (আমার ব্যাটসম্যান) সব সময় সঙ্গে ছিল। খামারবাড়ি নামক স্থানে থাকা অবস্থায় পাঞ্জাবীরা আমাদের খোঁজে আসে। তখন আমাকে স্ট্রেচারে করে সবাই বার্মা চলে যায়। বার্মা রিফুইজি ক্যাম্পে সবাই আশ্রয় নিই। সেখানে চিকিৎসার পর আমি সুস্থ হয়ে উঠি। বার্মা থেকে পালিয়ে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে টেকনাফে আসি। টেকনাফে এসে বেশকিছু ই-পি-আর ছেলে পেলাম এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্যরাও ছিল। আমি ওখানে থেকে যাই এবং আবার যুদ্ধে নেমে পড়ি।

১১/১২ ই ডিসেম্বর কক্সবাজারে ভারতীয় সেনাবাহিনী নামলে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেই এবং দেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাই।

স্বাক্ষরঃ হারুন আহমেদ

১৭-১-৭৫

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ক্যাপ্টেন ভূইয়া

মেজর এম, এস, এ, ভূইয়া।*

২৬শে মার্চ দুপুরে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে আলাপের সময় আমি জানতে পারি যে, একটি বেতার-কেন্দ্র আমাদের দখলে রয়েছে। ২৮শে মার্চের সন্ধ্যা থেকে ২৯শে মার্চের রাত পর্যন্ত আমি এই বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে ছিলাম। আমার সে সময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রূপায়নই এ আলেখ্য।

বলা বাহুল্য বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র এবং পরে মুজিবনগর থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে পরিচিত এই ঐতিহাসিক বেতার কেন্দ্রটি গোড়াতে খোলা হয়েছিল চট্টগ্রামে।

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। বিবরণটি রচিত ‘মুক্তিযুদ্ধে নয়মাস’ গ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৭৪- থেকে সংকলিত

বেতার-কেন্দ্রটি খোলা হয়েছিল চট্টগ্রামের কালুরঘাটে। ২৮শে মার্চ সকালে কালুরঘাটে মেজর জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে চট্টগ্রাম শহরে ফেলার পথে আমি প্রথমবারের মতো বেতার কেন্দ্রটিতে প্রবেশ করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ বেতার কেন্দ্রে কর্মরত স্টাফের সাথে আমার পরিচয় হয়। সেখানে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট শমশেরের সাথেও আমার দেখা হলো লেফটেন্যান্ট শমশের সে সময়ে বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের লিখিত ভাষণ বারবার প্রচার করছিলেন।

সেদিন পশ্চিম কমোডোর মমতাজের বাসা আক্রমণের পর আমি বেতার কেন্দ্রে ফিরে আসি এবং লেফটেন্যান্ট শমশেরের স্থলাভিষিক্ত হই। মেজর জিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট শমশের সে সময়ে কালুরঘাটে ফিরে যান।

বেতার কেন্দ্রে অবস্থানকালে সেখানে আমার কাজ ছিল ঐ বিপ্লবী বেতার-কেন্দ্রের চারদিকে মোতায়ন প্রতিরক্ষা বাহিনীকে কমান্ড করা ঐ কেন্দ্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং বেতার কেন্দ্র প্রচারিতব্য সংবাদ, বুলেটিন ও নানা কথিকা পড়ে সে-সব এ্যাপ্রুভ করে দেওয়া। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বেতার-কেন্দ্রে থাকাকালীন আমাদের সাথে যারা কাজ করতেন তাদের বেতার কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আসা যাওয়ার অনুমতি দিয়ে আমি ৭টি ‘পাস’ ইস্যু করেছিলাম। প্রথমে ৬টি এবং পরে ১টি পাস ইস্যু করা হয়েছিল। মেজর জিয়ার নির্দেশ ছিল কোন সংবাদ বা কথিকা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার করার আগে অবশ্যই তা কোন অফিসারকে পড়ে চেক করে দিতে হবে। লেফটেন্যান্ট শমশের বেতার কেন্দ্র থেকে কালুরঘাট চলে যাবার সময় মেজর জিয়ার এই নির্দেশের কথা আমাকে বলে গিয়েছিলেন। সে সময় বেতার-কেন্দ্র থেকে আমি যেসব সংবাদ এবং কথিকা পাঠ করেছি তার সবগুলোতেই আমি আমার ইনিশিয়াল দিয়েছি। বলা বাহুল্য, এসব কাজ করার সময় আমার মনে এক অসাধারণ বিপ্লবী চেতনার জন্ম হয়েছিল। বলতে দ্বিধা নেই, সে সময় আরব জাহানের প্রখ্যাত গেরিলা নেতা ইয়াসের আরাফাতের কর্মধারা ও জীবন-চেতনা আমাকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। তাঁর কথা তখন আমার বারবারই মনে পড়তো, মনে পড়তো তাঁর বিপ্লবী-সংস্থা ‘প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট’-এর কথাও। মনে আছে, একটি কথিকায় লেখক-প্রদত্ত নামটি কেটে দিয়ে তার ওপর আমি লাল কালিতে আমাদের সংগ্রামী-সংস্থার নাম দিয়েছিলাম ‘বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট’। পরবর্তীকালে সাংবাদিকরা এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন ‘মুক্তিফৌজ’।

২৮শে মার্চ সন্ধ্যায় লেফটেন্যান্ট শমশের ও আমি অনেক্ষণ আলাপ আলোচনার পর ব্লাক আউট ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিই। সে অনুসারে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে ব্লাক আউট পালনের ঘোষণাও প্রচারিত হয়। বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা অনুযায়ী যথারীতি ব্লাক আউট পালিতও হয়েছিল। বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশে সবাইকে নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে ক্যাপ্টেন মুহসিন, ক্যাপ্টেন মুখলেস, ক্যাপ্টেন ইনাম, ক্যাপ্টেন ওয়ালী, ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া ও অগ্যান্যের কাছে রিপোর্ট করার আহবান জানানো হয়েছিল। অবশ্য এই ঘোষণায় কোনো জায়গার নাম উল্লেখিত হয়নি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় বলা হয়েছিলঃ ‘নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদীঘির ময়দানে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার কাছে রিপোর্ট করুন। এই ঘোষণায় রিপোর্ট করার স্থান হিসাবে লালদীঘির ময়দান এর উল্লেখ ছিল কারণ ২৯শে মার্চ সকালে দেখা গেল যে চট্টগ্রাম কক্সবাজার, চট্টগ্রাম-কাপ্তাই রোড ধরে হাজার হাজার লোক নিজ নিজ বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, ২৮-২৯শে মার্চ রাতে পি, এন, এস, জাহাঙ্গীর যুদ্ধজাহাজ থেকে পাঞ্জাবীরা চট্টগ্রাম শহরে অত্যাধিক শেলিং করেছিল। শেলিং এর দরুন কয়েক জায়গায় আগুন ধরে যায়। আগুনের ফুলকিতে মনে হয়েছিলো চট্টগ্রাম শহরে বুঝি পাইকারী ধ্বংসলীলা চলছে। এ অবস্থা দেখে বেসামরিক লোকেরা যার হাতে যে বন্দুক বা অন্য অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে তখন নেতৃত্ব দেওয়ার মত কেউ ছিল না, তাই তারা অসংঘবদ্ধভাবে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছিল। এসব লোকদের আবার একত্রিত করে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিপ্লবী বেতার থেকে অস্ত্র নিয়ে লোকদের আবার একত্রিত করে

পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিপ্লবী বেতার থেকে অস্ত্র নিয়ে লালদীঘির ময়দানে ক্যাপ্টেন ভুঁইয়ার কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ প্রচারিত হয়েছিল। সত্বর তাদের এক জায়গায় জমায়েত করতে হলে এ-ধরনের ঘোষণা প্রচার ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণা এ-সময়ে বেতার-কেন্দ্রে উপস্থিত কয়েকজনের সাথে আলোচনা করেই প্রচারিত হয়েছিল।

ঘোষণাটি কয়েকবার প্রচারিত হবার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর এ, আর, মল্লিক আমাকে টেলিফোন করেন। লালদীঘির ময়দানে একত্রিত হওয়ার এই ঘোষণা সম্পর্কে তার সাথে আমার অনেক আলাপ হয়। তিনি আমাকে অবিলম্বে এই ঘোষণা প্রচার বন্ধ করতে বলেন। তিনি যুক্তি দেন যে, এই ঘোষণামতে যদি সবাই গিয়ে লালদীঘির ময়দানে একত্রিত হয় তাহলে হানাদাররা নিশ্চয় এই জমায়েতের ওপর পি,এন,এস জাহাঙ্গীর জাহাজ থেকে শেলিং করবে, এমনকি হাওয়াই হামলাও করতে পারে। ডক্টর মল্লিকের এই যুক্তিপূর্ণ উপদেশে আবার আমাকে বেতার মারফত ‘লালদীঘির ময়দানে’ একত্রিত হওয়ার ঘোষণাটি বাতিল করে দিতে হয়।

দুনিয়ার ইতিহাসে যেসব সশস্ত্র বিপ্লব হয়েছে তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রথমে অর্গানাইজ করা হয়েছে এবং পরে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ, হয়েছে বিপ্লব। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ব্যাপারটি ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এক্ষেত্রে প্রথমে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ, পরে হয়েছে সংগঠন- আমরা প্রথমে বিদ্রোহ করেছি, পরে শুরু করেছি বিদ্রোহীদের সংগঠন। ২৬শে মার্চ ভোরে যে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে তা আমরা অনেকেই ২৫শে মার্চের মধ্যরাতেও জানতাম না।

কুমিরার লড়াই*

মেজর এম, এস, এ ভুঁইয়া

ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যার আগেই ক্যান্টনমেন্ট দখল করব; কিন্তু শত্রুর শক্তি বৃদ্ধির জন্যে কুমিল্লা থেকে যে ২৪নং এফ, এফ (ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) এগিয়ে আসছে, তাকে বাঁধা দেওয়াই প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো।

তখন বিকেল ৫টা। ২৪নং এফ, এফ-কে প্রতিহত করার জন্য কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হলাম। বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর ই-পি-আর এর মাত্র ১০২ জন যোদ্ধা সমবায়ে সংগঠিত দল নিয়ে এই অভিযানে আমরা বের হলাম। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিমা হানাদার সৈন্যদলের মোকাবিলা করার জন্যে আমাদের সম্বল মাত্র একটি এইচ-এম-জি কয়েকটি এল-এম-জি আর বাকিসব রাইফেল। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে পুরো একটি সুসংগঠিত ব্যাটালিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়ার ঝুঁকি যে কি বিরাট এবং তার পরিণাম যে কি মারাত্মক হতে পারে সেদিন তা আদৌ উপলব্ধি করতে পারিনি তা নয়; আসলে মনটা ছিল তখন প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত : দেশের মুক্তি কামনায় উত্তপ্ত; ক্ষোভে, ক্রোধে, আবেগে উত্তেজিত। সুতরাং ঠান্ডা মাথায় অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে পরিকল্পনা করার আদৌ অবসর ছিল না তখন। অন্য কিছু সম্বল না থাকলেও যুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে জিনিসের প্রয়োজন হয় সেই সাহস, সেই উদ্দীপনা, সেই উদ্দীপ্ত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের সম্বল। আমাদের এই অপরিমেয় মনোবল ও দুর্জয় আত্মবিশ্বাস সেদিন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছিল। এছাড়া ছিল পরম করুনাময়ের অপার করুণা যা বারবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে আমাদেরকে সাফরল্যের স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। আজ আমার এ প্রত্যয় দৃঢ়তা লাভ করেছে যে, সত্য ও ন্যায়ের সেই পবিত্র চিরদিনই অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে এভাবেই সাহায্য করে থাকে।

* ‘মুক্তি যুদ্ধের’ নয়মাস গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

আগেই খবর পেয়েছিলাম, শত্রুবাহিনী ফেনীর কাছে শুভপুরের ব্রীজ পেরিয়ে এগিয়ে এসেছে। অতএব, যত দ্রুত তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করা যায় ততই আমাদের জন্য মঙ্গল। আমার কথামত আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী ৫টি সাধারণ পরিবহণ ট্রাক এনে হাজির করলেন। তখন আমার সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের প্রত্যেকেই যেন একটা যুদ্ধাংদেহী ভাব। তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন অনেকদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা বঞ্চনা, ক্ষোভ, আক্রোশ বিদ্রোহের আওনে ফুঁসে উঠেছে এবং তা দুর্জয় সংগ্রামের মাধ্যমেই যেন স্ফুরিত হতে চায়। চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের শাসন শোষণ ও অত্যাচার-উৎপীড়নের জগদল পাথরকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলতে আজ সবাই যেন বদ্ধপরিকর।

আমি আমার ক্ষুদ্র দলের ১০২ জন যোদ্ধাকে ৪টি ট্রাকে উঠালাম এবং বাকি ট্রাকটিতে কয়েকটি গুলির বাস্র উঠিয়ে দিলাম। আমি নিজে একটি মোটর সাইকেলে চড়ে সবার আগে চললাম। উদ্দেশ্যঃ এগোনোর সাথে সাথে পথের দুপাশে এমন একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে নেওয়া যেখান থেকে শত্রুর উপর সাফল্যের সাথে প্রচণ্ড আঘাত হানা যায়। শুভপুরে সেদিন আমাদের যাত্রাপথের দৃশ্য অবিস্মরণীয়। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার মানুষ ভীড় জমিয়েছে। তাদের মধ্যে কল-কারখানার শ্রমিকই বেশী। মুখে তাদের নানান শ্লোগান। হাজার কণ্ঠের সেই শ্লোগান আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল। গত রাতে শহরের বিভিন্ন স্থানে ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেওয়া বর্বর বাহিনী কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণ, নির্মম হত্যা, পাশবিক অত্যাচার, বিশেষতঃ বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানদেরকে পাশবিকভাবে হত্যা করার খবর এরই মধ্যে প্রতিটি মানুষের কানে পৌঁছে গেছে। যে কোনোভাবে এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত। সুতরাং যখনই তারা দেখতে পেল খাকি পোশাক পরা বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর এর জওয়ানরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। মুহূর্মুহু তার শ্লোগান দিতে লাগল। জয় বাংলা, বেঙ্গল রেজিমেন্ট জিন্দাবাদ, ই-পি-আর জিন্দাবাদ। এদিকে তাদের কেউ কেউ সৈন্যদেরকে কি দিয়ে এবং কিভাবে সাহায্য করতে পারবে তাই নিয়ে মহাব্যস্ত।

আমাদের সৈন্য বোঝাই ট্রাকগুলো তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। এমন সময় একজন বুড়ো লোক তার পথের পাশের দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিল। বললোঃ স্যার আমি গরীব মানুষ কিছু দেওয়ার মত আমার ক্ষমতা নাই। এই নিন আমার দোকানের সিগারেট (সিগারেট ৩ কার্টুন ছিল); আপনার জওয়ানদের মধ্যে বিলিয়ে দিন। বৃদ্ধের এই সহানুভূতি ও আন্তরিকতায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠল। আর একজন একটি ট্রাকে করে প্রায় এক ড্রাম কোকাকোলা নিয়ে এল। কেউ কেউ খাদ্যসামগ্রীও নিয়ে এলো।

আন্তরিকতা ও ভালবাসার সেই উপহার আমাদের মনকে আনন্দে উদ্বেল করে তুলেছিল। কেমন করে কি ভাবে তারা সেসব জিনিস যে সেদিন সংগ্রহ করেছিলেন তা ভাবলে আজও বিস্মিত হই।

সন্ধ্যা তখন ৬টা। আমরা কুমিরায় পৌঁছে গেলাম। শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য স্থানটি খুবই উপযুক্ত বিবেচিত হল। পথের ডাইনে পাহাড় এবং বামদিকে আধ মাইল দূরে সমুদ্র। শত্রুর ডানে এবং বামে প্রতিবন্ধকতা আছে এবং শত্রুকে এগুতে হলে পাকা রাস্তা দিয়েই আসতে হবে। তাই সেখানেই পজিশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি যেখানে পজিশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। তার পিছনে একটি খাল ছিল। ঐ খাল থেকে ৫০০/৬০০ গজ সামনে অর্থাৎ উত্তর দিকে আমি পজিশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। খালটি একটি পদাতিক বাহিনীর জন্য তেমন একটা বাধা নয়। তবু এটা পিছনেই রাখলাম। উদ্দেশ্য ছিল যদি বর্তমান পজিশন শত্রু আমাদেরকে ছাড়তে বাধ্য করে তখন খালের পারে পজিশন নিতে পারব। এটা ছিল আমার বিকল্প পরিকল্পনা। জমিনের স্বরূপ দেখে কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিকল্পনা তৈরি করে নিলাম। আমার তিনজন প্লাটুন কমান্ডারকে ডেকে খুব সংক্ষেপে আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম এবং নিজ নিজ স্থানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পজিশন নেওয়ার নির্দেশ দিলাম। আমার নির্দেশ অনুযায়ী এইচ-এম-জিটা ডানে পাশে পাহাড়ের ঢালুতে ফিট করা হলো। স্বয়ং ই-পি-আর

সুবেদার সাহেব ভারী মেশিনগানটির সংগে রইলেন। কারণ এই ভারী মেশিনগানটিই আমাদের প্রধান হাতিয়ার এবং সবচেয়ে বড় সম্বল। আমি বামদিকের কয়েকটি এল-এম-জি'র পজিশন ঠিক করে দিলাম। আমার নির্দেশমত সবাই মাটিতে পজিশন নিয়ে নিল। পজিশনের অবস্থাটা হল অনেকটা ইংরেজী U (ইউ) এর মত। অর্থাৎ ডানে বায়ে এবং পিছনে আমাদের সৈন্য। যেদিক থেকে শত্রু এগিয়ে আসছে কেবল সেই সামনের দিকটা সাঁড়াশির হারের মত খোলা।

কুমিরা পৌঁছেই মোটর সাইকেলযোগে একটি লোককে আমরা পাঠিয়েছিলাম শত্রুর অগ্রগতি সম্পর্কে খবর নিতে। এই মধ্যে সে খবর নিয়ে এসেছে যে শত্রু আমাদের অবস্থানের আর বেশী দূরে নেই। মাত্র চার পাঁচ মাইল দূরে। তবে তারা ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে আসছে। যে লোকটিকে পাঠিয়ে ছিলাম সে পাঞ্জাবীদের নিকটে গিয়ে রাস্তার পাশের একটি দোকান থেকে সিগারেট কিনে ফিরে এসেছে। সে আমাকে জানালো যে পাঞ্জাবীদের পরনে কালো বেল্ট, কাঁধে কালো ব্যাজ এবং কি যেন একটা কাঁধের উপর তাও কালো। তখন আমার সন্দেহ রইল না যে ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সৈন্যরাই এগিয়ে আসছে।

আমাদের অবস্থানের ৭০/৮০ গজ দূরে বড় একটি গাছ ছিল। জনসাধারণের সাহায্যে গাছের মোটা ডালটা কেটে রাস্তার ঠিক মাঝখানে ফেলা হলো। গাছের ডাল দিয়ে আমাদের সুন্দর একটা ব্যারিকেড সৃষ্টি হয়ে গেল। জনসাধারণ রাস্তার আশপাশ থেকে কিছু ইট এনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখল।

এত অল্প সময়ে জনসাধারণ কিভাবে গাছের ঐ মোটা ডালটা কেটে ফেলল এবং ইট সংগ্রহ করে ব্যারিকেড সৃষ্টি করলো আজ তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সৈন্যদের জানিয়ে দেওয়া হলো যে শত্রুসৈন্য যখন ব্যারিকেড সাফ করার জন্য গাড়ী থেকে নামবে এবং সাফ করার জন্য একত্রে জমা হবে তখন সকলে একযোগে শত্রুর উপর গুলি ছোড়া শুরু করবে। বিশেষ করে ভারী মেশিনগান দ্বারা অবিরাম গুলি ছুড়বে।

প্রায় এক ঘন্টা সময় আমাদের প্রতীক্ষার মধ্যে কেটে গেল। সন্ধ্যা তখন ৭টা। আমরা শত্রুবাহিনীর অপেক্ষায় উৎপেতে রইলাম। আমাদের সামনে শত্রুবাহিনীর উপস্থিতি প্রায় আসন্ন বলে মনে হলো। আরো কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পরই সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ এলো। শত্রুবাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ব্যারিকেড দেখে সামনের গাড়িগুলো থেমে গেল। কিছুসংখ্যক সিপাহী গাড়ী থেকে নেমে ব্যারিকেডের কাছে এলো। এবং কেউ কেউ ইটগুলো তুলে দূরে ফেলে দিতে লাগলো। পিছনের গাড়িগুলোও তখন সেই দিকেই এগিয়ে আসছিল।

সন্ধ্যা তখন সোয়া সাতটা। শত্রুবা যখন ব্যারিকেড সাফ করতে ব্যস্ত এমন সময় আমাদের ডানদিকের ভারী মেশিনগানটি গর্জে উঠল। শুরু হল শত্রুনিধন পালা। চারদিক থেকে কেবল গুলির আওয়াজই শোনা যেতে লাগল। ভারী মেশিনগানটি থেকে তখন মাঝে মাঝে ট্রেসার রাউন্ড বের হচ্ছে। উহ্ সে কি দৃশ্য। শত্রুকে এত কাছাকাছি অতর্কিত অবস্থায় পেয়ে আমার মন খুঁশিতে নেচে উঠল। মনে মনে বললাম- তোমরা (পাঞ্জাবীরা) এতদিন মনে করতে বাঙ্গালীরা যুদ্ধ করতে যানো না। এখন যুদ্ধক্ষেত্রেই বাঙ্গালীরা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবে তারা যুদ্ধ করতে যানো কিনা। হানাদার বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। আমাদের আকস্মিক আক্রমণে তারা তখন হতকচিত। তাদের সামনের সৈন্যগুলির অনেকেই আমাদের গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাদের মৃত্যুকাতর আর্তনাদ আমাদের কানে আসছিল। যারা দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল তাদের তাদের অনেকেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুদের পিছনের সৈন্যরা এ অবস্থা সামলে নিয়ে মেশিনগান, মর্টার এবং আর্টিলারি থেকে অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ শুরু করল। এবার উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই লেগে গেল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শত্রুবা আমাদের ব্যুহ ভেদ করতে পারল না। তাদের সৈন্য বোঝাই তিনটি ট্রাকে আগুন ধরে গেল। আমাদের মেশিনগান নিউট্রালাইজ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে আর্টিলারি গোলা নিক্ষেপ করল। কিন্তু অল্পার মেহেরবানীতে শত্রু সকল প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেল। প্রায় দু'ঘন্টা প্রাণপন লড়ে তারা শেষ পর্যন্ত দুই ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রণে ভঙ্গ দিল।

ঘন্টা দুয়েক এই লড়াই চলেছিল। উভয় পক্ষের গোলাগুলির শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। প্রথম দিনের লড়াইয়ে অর্থাৎ ২৬ তারিখের রাতেই শত্রুবাহিনীর ভীষন ক্ষতি হয়েছিল। শত্রুবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল ও একজন লেফটেন্যান্টসহ বিভিন্ন পক্ষের ১৫২ জন সাধারণ সৈনিক প্রাণ হারিয়েছিল। আমরা শত্রুদের দু'ট্রাক এম্যুনিশন কবজা করি; আমাদের পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের চৌদ্দজন বীর সৈনিক শাহাদাৎ বরণ করেন।

কুমিল্লায় লড়াই চলেছিল সর্বমোট তিনদিন। শত্রু এই সময়ের মধ্যে তাদের আটলারি ও মর্টার দিয়ে বারবার আক্রমণ চালিয়েছিল আমাদের বাহিনীর উপর। অবশেষে ২৮ তারিখে তারা ত্রিমুখি আক্রমণ চালায়। পিছন থেকে তারা নৌবাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ চালায়। সাগর থেকে গানবোট দিয়ে ফায়ার সাপোর্ট দেয়। রাতের আঁধারে শত্রুরা পাহাড়ের উপর অবস্থিত টি,বি, হাসপাতালের নিকটে মেশিনগান বসায়। ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে আমাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে ২৮ তারিখে কুমিরা পাকিস্তানী সৈন্যের দখলে চলে যায়। কুমিরা পতনের পর হানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়। তারা অগ্রসর হওয়ার সময় রাস্তার দুপাশে অবস্থিত সমস্ত গ্রাম ও হাটবাজার জ্বালিয়ে দেয় এবং সামনে যাকে দেখে তাকেই গুলি করে হত্যা করে। লোকমুখে শুনেছি কুমিরা পতনের পর রাস্তার দু'পাশে কয়েকদিন ধরে আগুন জ্বলছিল।

আমরা মনে হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কুমিরার যুদ্ধটাই একমাত্র প্রথম যুদ্ধ, যেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও তৎকালীন ই-পি-আর বাহিনী সম্মিলিতভাবে হানাদার বাহিনীর উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে ২৪ নং এফ-এফ'এর একটা পুরো কোম্পানী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একথা আমি জানতে পেরেছিলাম ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কাছে। তিনি কুমিরার যুদ্ধে ২৪ নং এফ-এফ'এ কর্মরত ছিলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিরোধ যুদ্ধ

সাক্ষাৎকার: লেঃ কর্নেল মাহফুজুর রহমান*

২৫-৮-৭৩

Thursday, the 25th March 1971. All offers of 8 E. Bengal were ordered by Lt Col Abdur Rashid Janjua, CO of the Bn, to clear the barricades made by the public in different areas of the city of Chittagong. A complete passenger train was brought by the public in the darkness of last night and put on the main road railway junction as barricade at Sholashahar near our battalion location. One of the full company under Capt (now Major Sadeq Hossain and almost all offers of the battalion incl Lt Col Janjua were there on the road railway junction to remove the train.

All civ public from around and labors of the local Indutrie9es assembled there and started shouting not to remove the barricade. Capt. Ahmed Din (one of the Pakistani offr) got annoyed and said-“the only medicine to stop these bastards is firing.” Lt Col Janjua was worried to the extreme to remove the barricades so that 20 Baluch from the Cantt can rush for the help in case of any danger. He probably could not believe his own battalion even.

With lot of efforts, however, the train was removed. It took us about 5-6 hrs to do that. More than hundred vehs got jammed on both side of the road because of the train-

* ১৯৭১ সালে লেফটেন্যান্ট পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

barricade. Public did not retaliate much with us probably thinking that we belonged to the E Bengal Regiment They were not very happy either with us. Some of the young students standing at a distance asked Maj (now Col) Shawkat- "Are not you in our group?" They probably expected E Bengal Regiment to join the public then and there, Major (now Col) Shawkat gave a little smile and replied-"Let the time come you will see."

We could smell the overall situation all around was getting worse. Public were shouting all over the city. Processions were marching, barricades were made to stop communication. Most of the shops were closed, Groups of people were sitting here and there and discussing god knows what. One of the company of 8E Bengal under Sub Abdul Quader was sent along with a company of 20 Baluch to Chittagong Jetty to unload the arms- ammunitions freshly brought by SHAMS form Pakistan. Army was trying to unload the ship. But the public did not allow him to do that. We felt that a serious incident will happen.

I myself with Lt. (now Captain) Shamsheer Mobin Chowdhury were detailed in the evening with a company to guard the Sholashahar Cantonment road by night so that no more barricades were put there. 2/Lt. Mohammed Humayun (Pak Offr) was also with me. Sometime at 11 o'clock night, while having rest with the coy at K-Rahman's COCA COLA factory, I received a tel call from the city. An unknown person in a panic and hurry was trying to pass an important message to some of his relative in the factory and asked my identity. I was no duty here, I replied. The man thought me as one of the Police guard there in the factory and said- "we have received a telephone call now from Dacca that firing has started there, Pakistanis have started killing the public en mass and all are trying to face them." I thanked the unknown man for giving me such an information in telephone and dropped the receiver.

As we approached a little towards our unit at Sholashahar I found Subedar Sabed Ali Sarkar rushing towards me and whispered in Bengali to reach the unit line immediately. I understood the rest. Rushed with my troops at sholashahar and found Major (now Brig) Ziaur Rahman getting all of our troops closed together in the line.

It took about an hour to get all the scattered troops from different places together. Maj (now Brig) Ziaur Rahman took over the Command of 8E Bengal and addressed the troops for few minutes- Tigers, Pakistanis have started killing Bengalis en mass they have already disarmed some of the E Bengal battalions, they have decided to kill all of us. They already trapped me but luckily I was saved. We will have to organize quickly and face them at any cost to save the country, are you all ready to do that with me? We all agreed and promised by the name of Allah to do that.

One company of 8E Bengal had already moved few days ago as advance party to Kharia Cantt. In Pakistan. One company had to come from 5th, 6th and 7th E Bengal battalions in Pakistan. About a company strength troops had gone on privilege leave before they were proceeding to kharia; and a total of about 250 troops were available with 8E Bengla at that moment. Few months ago. On 30th October 1970 the battalion was born at sholashahar. As the unit was due for moving to kharia, all arms

ammunitions, equipments. Stores, vehicles etc were kept ready there. This battalion borrowed some 150 rifles of 303 type from EBRC, one 106 mm RR and two 3 inch mortars from 20 Baluch without any ammunition for the training purpose only. Which luckily remained with the battalion. The sholashahar market where the battalion got raised was not an ideal place at all to defend it by staying there. Moreover, it was not possible for the battalion to operate conventionally at that very moment without having anything. So the decision was taken to leave the area for the time being to organize somewhere outside the city and operate unconventionally

At 2 O'clock morning, we left the unit line with all troops and arms-ammunitions available with the unit, crossed the Kalurghat road railway bridge and made a temporary hide-out in the village. Next morning we got Capt. (now Major) Harun Ahmed Chowdhury who escaped along with maximum of his IPR troops, arms, ammunitions from 17 wing Captain and joined us. It was God's mercy that we got such a huge number of arm-ammunition and readymade troops. Many MCAs, leaders, well wishers met us there. A rough plan was made and in the darkness of the evening we kicked off for the city again.

I took a temporary shelter with my company in a village on the other side of the Kalurghat railway bridge. Entered the city in complete disguise of a street beggar along with one of my sepoy and located the important positions held by the enemy in the city. Some of the high hills and the buildings were under enemy's hand where they had been continuously firing from. Many of the high hills and buildings were still unoccupied by anyone. Students were driving the hoodless vehicles at the maximum possible speed pointing their shot guns, 22guns outside. They were collecting food etc in Awami league offices and distributing them to many student fighters. Ansars Plices, Mujahids, Ex-defence personnel's etc.

On 29th March 71, I was ordered to take defence on both sides of the Kalurghat bridge and it was complete by that day. In the afternoon, one of the Pakistani C-130 flew over the bridge giving a doubtful look. We heard at night that some of the commando paratroopers were brought from Comilla and landed at Chittagong airport. At 8 O'clock night a motor launch approached our defence towards the bridge with a very powerful searchlight on. I told my troops not to open fire unless they were ordered. The steamer after having an overall look from a distance for half an hour got a side of the bank of the river and after sometime left the place. We did not know what had happened. Whole night the troops remained awake in a suspense. Early in the morning at 0430 hrs we heard some firing sound very close to my defence.

Early in the morning on 30th March 71, a civilian named Mohammed Asaf approached me and started shouting 'En' 'En' Major (now Brig) Ziaur Rahman was with me, looked at my face and told to take a pl and face them. Having a big commander with me, I felt much courage to go for the first operation myself. Took a mixed pl of E Bengal an EPR in an army vehicle and started. The civilian guide Mohammed Asaf led us to such a place where the whole pl of mine came straight under enemy fire. We jumped out of the vehicle and took shelter behind some cover of houses and bushes. After approaching

a little ahead we could locate the en posn. It was a triple storied big building of Agriculture department where the ends had taken shelter and started firing form.

En had located my pl and opened up with MG and LMGs. The whole pl of mine is now on the forward edge of the small built up area hardly 400-500 yds away from the en building. Once I tried to get a little more closer, the en MG opened up and I fell flat on the ground behind a small tree, it could not hit me. Sep Noor Mohammed of EPR with his LMG No. 2 started following me in the front behind the cover of the fold of te3h land. En now opened up with all of his weapons. Along with civilian Asaf I crawled a little more ahead behind a sand dump and now the building was under my SMGs. range. The building was now almost encircled from three sides at a distance of 100-200 yd. Exchange of fire started between my pl and the en. It was easy for us to locate the en inside the building through the glass panes form 1st floor to 2nd floor. Suddenly a Rocket Launcher was fired from the building and that below a small mango tree behind which Sepoy Noor Mohammed of my pl was firing from his LMG. Miraculously the LMG No.1 and No.2 were not hit immediately after that another Rocket Launcher was fired now on my position which, God knows how, slipped on the top of the sand dump and burst behind me. I fell back and now started using my Rocket Launcher towards the building and that became very effective. At 1030 hrs. Two en Sabre Jets arrived over my posn. Staffed and bombed the Radio Chittagong which was about 1000 yds in front of my present location and was occupied by our troops under sub sated Ali Sarker.

We could not capture the building during day time, immediately after the last night we encircled the building and started guarding it so that en cannot escape. No firing was there at night. Early in the morning nest day, I took the platoon and charged inside the building and found the following inside it:-

Five en dead bodies, a half- dying Lance Naik who died later on and an alive but severely injured sepoy named Mohammed Akbar. When asked he said that he belonged to Hamza Company of 3rd SSG (Command) battalion. A pl of 30 men under command Capt. Sajjad came at night and occupied the building with a view to blow up the Kalurghat railways bridge. The rest of the en fled a way in the darkness of the night leaving the following things behind:-

MG 1A3 one LMG 7.62 Chinese- One G-3 Rifles-two, SMG-one, SMG 7.62 Chinese- two, 40 mm Rocket Launcher-there with Rockets, Wireless set GRC-9 one, complete with all accessories, 7mm Walther pistol- one, vary light pistols-two, commando knife- one, commando belts-7 pairs, commando boots-7 pairs, commando barets-8, 7.62 ammunitions-2,000 in belts and magazines and huge quantity of explosives.

Thousands of public got together in the building and started cheering us. We collected all those captured arms and ammunitions and brought to my defence, unfortunately, en Sep Akbar also died on the way out of severe pain. The Chawkidar of the same agriculture building and the other public took those en dead bodies and buried them on the North-East corner of the building. In the afternoon Major (now Brig) Ziaur

Rahman paid a visit to my defense. He was very glad to know about our success in 1st operation and to see the huge number of captured arms-ammunitions.

Simultaneously, the battle was continuing in the city also. Capt. (now Major) Harun Ahmed Chowdhury and Lt. (now Capt.) Shamsheer Mobin Chowdhury had a toughest battle at Chawkbazar in the entrance of the city where the 20 Baluch had used the tanks also. Many important places were coming under our occupation one by one. I extended my defence line further ahead from front of Radio Chittagong upto the river Karnaphuli occupying Ispahani, Lever Bros, FIDC etc. on 2nd April 71, en first time used 3 inches mortar on my defence. They burnt hundred of houses, shops etc. by using the Phosphorus.

I was ordered to shift my defence and occupy the Chittagong-Kaptai road junction facing Chittagong Cantonment. A complete village covering about a mile-long distance was occupied by one of my company. Chittagong Cantonment was a mile in front and Radio Chittagong was behind my defence. This defence of mine was strong enough undoubtedly but the line of communication from the main defence at Kalurghat upto my position was too far and there was a big gap behind my position. I had been blocking the en from the front for two days alright, but I felt those were en's secondary attacks or false attacks. On 7th April en attacked Sub Sabed Ali's position at Radio Chittagong with a complete battalion and occupied it.

Major (now Col) Shawkat, Who had been guarding the longest coastal areas en's landing from the ship and approaching from behind, fell back today and took over the command of half lost Kalurghat defence. I contacted him and asked for the help He gave me a new plan to take main defence at Madanaghat Bridge on the road Chittagong- Kaptai and to operate 2 miles ahead of the main defence in front of the enemy. One of the Ex Corporal Karim, a brave man, joined me with about a company strength of mixed troops. I made my permanent and strong defence on both sides of the Madanaghat bridge and started pushing the en from the front. Side and the rear.

Major (now Col) Shawkat gave me a task to raid the en's one of the strong post at Montee tannery 2 miles ahead of my defence at 1st night on 9th April 71, with which he wanted to coordinate a mortar fire support to me and one of his operation over the en's position at Kalurghat. There was a village named Baniapara and Chowdhurypara very closed to the en defence which had to be used as hide-out and forming up place. The village was about 500 yds long and 200 yds wide and all around it was big open gap which was covered by en's fire from Montee tannery. It was not possible to cross that open gap and occupy the village during day time. I took a strong platoon and occupied it before 1st night on 8th April 71 and kept sitting for the whole day and praying for the evening to come. Thank god, en could not locate us, otherwise he could easily have encircled and killed us. In the evening we got closed to the tgt at a distance of 50-100 yds. We saw a military car arrived with some 10-12 soldiers and started disembarking. As it was not possible for me to recede the tgt during day time I could not correctly locate the en disposition and assess their strength. I did not enter the buildings for physical assault. But we opened up with all weapons at a time. I had a Bihari L/Nk Salahuddin, whom I

used to suspect, played an important role in that operation by using 83 mm Blendicide against that en mil dodge and the buildings. We fell back quickly within 4-5 minutes. Immediately after that our Morter opened up and started firing from Kalurghat. We came to a safety distance and observed the shells bursting more or the Kalurghat Bridge on en position and recaptured it. L/Nk Naib Ali became first Shahid of 8 E Bengal in that operation at Chittagong.

En tried his best to capture both Kalurghat and Madanaghat on 9th and 10th April 71 with more than a bn str but failed. On 11th. PNS JAHANGIR and a regiment of field artillery started tremendous pounding from morning simultaneously on both the bridge. A Coy of 31 Punjab was pushing me frontally from the main rd Chittagong-Kaptai axis. It become very difficult to hold them anymore. I had to bring a pl from the depth, other side of the bridge, and put in front. It cannot be expressed the amount of fear we had because of the en by shelling. En pressed harder on the Kalurghat bridge and captured it. Capt. (now Capt) Shamsheer Mobin Chowdhury fighting gallantly got hit and caught by the Pakistanis.

I was told to hold my position for sometime till the main bulk of our force could withdraw at a safer distance. I was now alone holding Madanaghat Bridge with 2 coy str. At 1400 hrs en started pounding again from JAHANGIR tremendously this time around the bridge and on my defence. More than a coy on the other side of the bridge and less than a coy was on the en's side of the bridge towards Chittagong city. I got another brave civilian of that area named abdas on the other side of the bridge and told him not to leave the place until I came back. Once IK crossed the bridge and came to my forward line, the en attacked the position and covered the bridge by fire.

If I had allowed the en to come a little more ahead, we would not have ever crossed the river then. En arty was shelling on our rear now to block the withdrawal. Many thanks to god, a furious storm started and I thought it an opportunity and let my forward troop fall back by country boats through river making a long detour. After two hrs we could come on the other side of the river and joined my main defence without any casualty. It was not possible to remain this side of the river bank also, as the bridge was intact and the en shelling was still continuing, so I decided to withdraw and take an alternate defence at a suitable place few miles in the rear. Suddenly, I remembered Abbas and thought, probably the area was shattered by the en shelling and he must have left long ago. But still I felt deeply to have a look to that area along with Ex-Corporal Karim and my batman Sep Manik Mia of 17 Wing EPR. It was beyond our imagination to see the brave man still standing like a solid rock by the side of main road with his vehicle and waiting for us. He was with me throughout the liberation war in many risky places. He accepted that as best award.

I took another temporary defence at Noapara College, few miles away from Madanaghat, by the 1st night same day. En did not cross the bridge at night Next

morning on 14th April, I received more troops from here and there who had been deserting from the battle and put them in my defence. One of them was Havilder Arab Ali who was the driver of Brig MR Majumder. He escaped from the Pakistani cell at Chittagong Cant. Was mercilessly beaten and half dead.

The greatest blunder I made there I left my troops under a senior JCO of EPR there and went to the rear at Kaptai with Ex Corporal Karim to know the location of our main bulk of force who left Kalurghat yesterday. After reaching at Kaptai I came to know the our forces had already left for Rangamati for onward proceed to Kahgrachhari. I found my troops running scatteredly. En had already attacked my position and shattered everything. Out of about 2 coy str I could collect hardly 2 scattered Pls and with that I started withdrawing in search of our main force in the rear.

I reached Khagrachhari on 13th April 71 and met with all officers and troops. Major (now Brig) Ziaur Rahman, who had been holding many en fronts like Shobhanpur-Chhagalnaiya rd, Karerhat-Chittagong rd, Nazirhat-Chittagong rd and also our front, came there at Khagrachhari and gave us a new plan to hold Rangamati front by the axis river Chengi. We all came back to Mahalchhari on 14th April and made our Tac HQ. Troops were reorganized and distributed for different places. Major (now Brig) Ziaur Rahman took Capt. (now Major) Khalequzzaman, Capt. Aftab Quader and a pl and left for Ghagra RH on 15th April 71. I took a pl along with Sub Khairuzzaman of EPR, Ex Corporal Karim, two civil offr-one was Mr. Ishaque a Chemical Engineer of KPM and the other was Mr. Murree of Chandraghona an International Football Player, two brave students-one was Farooque Ahmed and the other was Shawkat Ali (both of them Lt. now) and left for Burighat bazaar short of Rangamati Sub. Abdul Mutaleb with a pl left for Kutukchhari short of Rangamati by rd. For few days we had been raiding, ambushing and harassing the en around Rangamati. On 17th April, an en pl in motor launch bumped into Capt (now Major) Khalequzzaman and Capt. Aftab Quader's island blindly and suffered by casualty. On 18th en with a coy str in 2-3 launches encircled Capt: Khalequzzaman's island, pounded heavily and attacked. L/Nk Munshi Abdur Rob of 8 E Bengal died gallantly in that operation. En contacted Mizos and had complete control over them during last few days. They reached around Mahalchhari our Tac HQ and started operating. We were called back and asked to guard the Tac HQ.

On 27th April, en about 2 coy str along with more than thousand Mizos concentrated near our Tac HQ. Unluckily one of our recee patrol bumped into their hide- out. Finding on other alternative, en had to launch an unplanned attack on Capt. (now Major) Khalequzzaman's Coy, ahead of Tac HQ. Major Shawkat sent me with a pl to reinforce Capt. Khaleq. By the time I reached there found Capt. Khaleq's Coy was more or less encircle. I blindly dashed with my pl and occupied Capt. Khaleq's Coy left over trenches and opened up. My right sec under Sub. Saqbed Ali fell just on the nose of the en but made a good effort to let Capt. Khaleq to extricate safety with some of his troops. I

fell with two Secs under the direct frontal fire of the en. Hundreds of Mizos in green camouflaged uniform running in front towards us through jungle. Sep (now Nk) Razzaque LMG man of left Sec killed many in front but finished his all ammunitions and started shouting. Only one LMG of right sec now was still continuing. But still en was probing forward having lot of cas. I shouted for my left sec comd to pull back followed by right Sec. Once we fell a little back, Major Shawkat opened up the MG from Tac HQ on to the en. I pulled my pl intact luckily and joined Maj Shawkat. Sub. Loni mia of EPR one of my sec comd showed extraordinary bravery in this operation. En kept his momentum and now started pounding with 3 inch mortars heavily at our Tac HQ. We did not have a single 2 inch mortar even to retaliate. We could see the pak troops kicking the Mizos from the rear to advance. We had to hold a wider frontage to stop en advance by running from left to right and encouraging own troops. It was our misfortune Capt Aftab Quader got a burst on his left chest which pierced through the right and died with few seconds. We lost another of the bravest soldier. His dead body was sent along with two students (now Lt) Shawkat and Farooq through en hy fire to Ramgarh and buried respectfully in front of the post office. Immediately after the 1st night we pulled back. The Tac HQ. Which we had been holding for half a month, we saw burning.

On 28th April, we reached Guimara via Khagrachhari and took another defence. Next day, we got signal to fall back to Ramgarh, as because the en was pushing own forces from Karerhat-Nazirhat sides simultaneously towards Ramgarh. On 30th Col (now Gen-ret'd) MAG Osmany paid an honorable visit there, met our troops and ordered to hold Ramgarh for 24hrs. Capt (now Major) Oli Ahmed with his Coy was In defence at Chikanchhara 5 miles ahead of Ramgarh and I took my Coy and took defence as reserve at baganbari BOP a mile short of Capt Oli's position. En attacked Capt Oli's position with a bn supported by arty. He resisted the en with maximum of his effort effectively and fell back to Ramgarh. En now was in my front and started driving having a continuous interval, in the process he also suffered a good number of casualty. On 2nd May 71, from 10 o'clock morning till 3 o'clock evening, we had been vengaging and holding the en too right. Then they started using the arty heavily. Many of the en shells landed very close to us, but we were miraculously saved. Once at Mahamuni Buddha Mandir, 2 miles ahead of Ramgarh, one of my pl along what me got stuck and could not be extricated while falling back in leap frog manner, one of Sub Loni mia's, Sub Anwar of 8 E Bengal came out daringly with his LMG straightway on the road and gave me covering fire and by that only the pl come out. Now we were under observation of our own MG at Ramgarh. Once we got a side Major Shawkat opened up with MG for last. We left Ramgarh alos, last piece of land of Bangladesh, and crossed over to Sabrum in the evening.

স্বাক্ষরঃ

২৫-৮-৭৩

চট্টগ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও প্রাসঙ্গিক কথা \\ চরম আঘাতের সেই রাত \\

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। বৃহস্পতিবার।

অন্যান্য দিনের মতো সকাল ৭টায় আমি অফিসে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি পশ্চিম পাকিস্তানী মেজর ইকবাল বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, “মিঃ রফিক, আপনাকে দারুণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অনেক খাটুনি গেছে আপনার ওপর দিয়ে। কক্সবাজার গিয়ে কয়েকদিন বিশ্রাম নিন না কেন? ইচ্ছা হলে আজই যেতে পারেন। আমি কমান্ডিং অফিসারকে বলে দেব।”

এটা ঠিক, গত কয়েক বছরের মধ্যে আমি কোন ছুটি নেইনি। বিশ্রামের আমার খুবই প্রয়োজন ছিলো। তবু মেজর ইকবালের সেদিনের অস্বাভাবিক পীড়াপীড়ি আমার ভালো লাগলো না, বরং আমার সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করলো। তাঁকে আমি শান্ত গলায় জবাব দিলাম, “ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু স্যার, আপনি তো জানেন গত জানুয়ারী থেকে সব ছুটি বাতিল করা হয়েছে।”

“ওকথা বাদ দিন। আমি কমান্ডিং অফিসারকে বুঝিয়ে বলতে পারবো। আমার বিশ্বাস, তিনি ছুটি মঞ্জুর করবেন।” মেজর ইকবাল তবু বলে চললেন।

মেজর ইকবাল যে কমান্ডিং অফিসারের একজন প্রিয়পাত্র তা আমরা সবাই জানতাম। আমাকে চট্টগ্রাম শহরের বাইরে এবং আমার সৈন্যদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার জন্যে মেজর ইকবালের এ প্রচেষ্টা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। আমি তাঁর কথায় তাল না দিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বললাম, “আপনি বোধকরি জানেন, গতকাল পোর্ট এলাকায় জনতার ওপর সৈন্যরা গুলি চালিয়েছে অনেক লোক মারা গেছে।”

‘অনেক নয়’- যেন তেমন কিছুই ঘটেনি এমন ভাব দেখিয়ে তিনি বললেন, “মাত্র একজন কিংবা দু’জন আহত হয়েছে।”

এরপর তিনি মুখে কৌতুহলোদ্দীপক হাসি ফুটিয়ে বললেন, “শুনলাম শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক পদক্ষেপের প্রতিবাদে আগামী ২৭শে মার্চ হরতাল ডেকেছেন।”

“আমি এখনো শুনিনি তবে পোর্ট এলাকায় যে সৈন্যরা এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে তার শব্দ আমাদের অফিসে বসেও শোনা গেছে।”

সেদিন বেলা ২টায় আমি ই-পি-আর সদর দফতর ত্যাগ না করা পর্যন্ত মেজর ইকবাল সারাক্ষণ আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করলেন।

ইয়াহিয়ার সাথে মীমাংসায় পৌঁছা গেছে বলে এ সময়ে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তবে নির্ভরযোগ্য কোন মহল থেকে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলো না। সরকারী বেতারে একটা রাজনৈতিক ফয়সালার আভাস দেয়া হয়। কিন্তু এ খবরের ওপরও নির্ভর করা গেলো না। বাসা থেকে সেই মুহূর্তে আমি আমার সদর দফতরে টেলিফোন করে সকল সৈন্যকে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলাম। তারপরে বাড়ির লনে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম।

চট্টগ্রামে বেল ৪টা ৩০ মিনিটের দিকে ডাঃ জাফর আমার বাসায় এলেন। লনে বসে আমরা সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু তখনো ঢাকার কোন নির্ভরযোগ্য খবর আমরা পাইনি। রাত ৮টার দিকে ডাঃ

* মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম রচিত ‘লক্ষ প্রানের বিনিময়ে’ গ্রন্থ, ১৯৮১ থেকে সংকলিত। ১৯৭১ সালের মার্চে রফিক-উল-ইসলাম ক্যাপ্টেন পদে সাবেক ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন।

জাফর ঢাকার কোন সংবাদ এসেছে কিনা জানার জন্য আওয়ামী লীগ অফিসে দিকে গেলেন। আমি আমার এক বন্ধু ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দিনকে নিয়ে অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেই রাতের খাবার খেয়ে নেয়ার জন্য বাসার ভিতরে গেলাম। খাওয়া কেবল শুরু করেছি, এমন সময় একজন আওয়ামী লীগ কর্মীসহ ডাঃ জাফর আবার ফিরে এলেন। রাত তখন চটা ৩০ মিনিট।

“মনে হচ্ছে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গোপনে করাচী চলে গেছেন বলে শোনা যাচ্ছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্যাংক নিয়ে শহরের দিকে বেরিয়ে পড়েছে বলে খবর এসেছে।” তারা দু’জনই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় এতো উত্তেজিত ছিলো যে তাদের মুখ দিয়ে যেন কথা সরছিলো না।

“আপনি কি সত্যি সংবাদ বলছেন?” তবু আমি ডাঃ জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম।

“হ্যাঁ। ঢাকা থেকেই আমরা এ খবর পেয়েছি। খবর পেয়েই আমাদের দল জনাব সিদ্দিকীর বাসায় রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে জনাব সিদ্দিকী আমাদেরকে অবিলম্বে আপনাকে ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে বলেছেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এতগুলো কথা বলে উভয়ে একটু থামলেন এবং গভীর আশা নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। তাদের দু’জনকেই বিষন্ন দেখাচ্ছিল। আমি শুনতে পেলাম, কে যেন খুব নিচু গলায় বলল, “এবার আপনার পালা।”

তখনও আমরা হাত ভাতের খালায়। মুহূর্তের জন্য আমি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। ওদিকে আগ্রহী আগন্তুকদের স্থির দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ।

সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে শহরের দিকে বেরিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তারা ভয়ানক কিছু ঘটাবে। সব চাইতে খারাপ কিছুই এখন আমাদের ভাবা উচিত। ৩রা মার্চ থেকেই ওরা নির্বিচারে বাঙ্গালীদের হত্যা করেছে শুধু ২৪শে মার্চ চট্টগ্রাম পোর্টে ২০ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়েছে। আরো খবর পেয়েছিলাম বাংলাদেশের সর্বত্রই ওদের হত্যাকাণ্ড চলছে- ঢাকা, খুলনা, যশোর, রংপুর, সৈয়দপুর, রাজশাহীসহ আরো অনেক জায়গায় গুলি চলেছে। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায়ও এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম ই-পি-আর- এর দুটি ওয়্যারলেস সেটই ঢাকার পিলখানার সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলো না। এমন কোন দিন ঘটেনি। সন্দেহ আগে আগে থেকেই গভীরতর হয়ে উঠেছিল।

এসব দ্রুত আমার মানসপটে ভেবে উঠলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থেকে জেনেছি, ওদেরকে কোন জায়গায় একবার লেলিয়ে দেয়া হলে হেন নৃশংসতা নেই যা ওরা করতে পারে না। ইয়াহিয়ার আকস্মিক ঢাকা ত্যাগ, আলোচনা ব্যর্থ হওয়া এবং ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাবাহিনীর বের হওয়া- সবকিছু মিলিয়ে একটা বেপরোয়া হত্যালীলার সুস্পষ্ট আভাস পাচ্ছিলাম। আরো আশংকা করছিলাম, সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী সৈন্যরাও ওদের হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

এ সময় নিজের ভেতর থেকেই আমি যেন এক অলৌকিক সাহস অনুভব করলাম। মনে হলো আমার ভেতর থেকে কে যেন আমাকে বলছে আমার নিজের জীবন এবং আমাদের অন্যান্যের জীবন রক্ষার জন্য এ পশুশক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এর পর আমি ‘হয় স্বাধীনতা অর্জন, না হয় ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে মৃত্যু’ এ ধরনের এক চরম সিদ্ধান্ত নিলাম। ডাঃ জাফরকে বললামঃ “আমাদের ষোলশহর এবং ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে বাঙ্গালী সৈন্যদেরকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলুন। তারপর রেলওয়ে হিলে আমার সদর-দফতরে দেখা করবেন।”

খাওয়া থেকে উঠেই আমি হালিশহরে ই-পি-আর সদর দফতরে ফোন করলাম। সেখানে বাঙ্গালী জেসিও’রা আমার নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁদেরকে বললাম, “এক্ষুনি সব ফাঁড়িতে দ্বিতীয় সাংকেতিক বার্তাটি

পাঠিয়ে দিন। অস্ত্রাগার নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের রুম থেকে বের হতে দেবেন না। নৌ-বাহিনী সদর দফতরের দিক থেকে হামলা হতে পারে। সেদিকে প্রতিরক্ষামূলক কিছু সৈন্য মোতায়েনের ব্যবস্থা করুন। আমি আসছি।

রাত তখন ৮টা ৪৫মিনিট। আমি শেষবারের মত আমার সারসন রোডস্থ বাসভবন ত্যাগ করলাম। আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল অয়্যারলেস কলোনীর দিকে আমাদের গাড়ী ছুটে চললো। আমার পাশে ড্রাইভার কালাম এবং পেছনের সিটে দুজন রক্ষী। তীব্র উত্তেজনায় সবাই চোঁট কামড়াচ্ছিলো। রাস্তা জনমানবশূণ্য। আমাদের গাড়ী যতই অয়্যারলেস কলোনীর কাছাকাছি এগোচ্ছিলো, উত্তেজনা ততই বাড়ছিলো। একটা সরু রেল ক্রসিংয়ের ওপর আসতেই জীপ একটু লাফিয়ে উঠলে আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো। আমি সম্বিং ফিরে পেলাম। এখান থেকে আমি অয়্যারলেস স্টেশনের এ্যানটিনা দেখতে পাচ্ছিলাম। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অয়্যারলেস স্টেশনের চারদিক ছিল কাটা তারে ঘেরা। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে সেজন্য আমি ড্রাইভারকে গাড়ী আস্তে চালাতে বললাম। আমাদের এখানকার সাফল্য ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামূলক ডিউটিতে নিযুক্ত ই-পি-আর-এর একটি প্লাটনের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের ৪ জনকে ওদেরকে নিরস্ত্র করতে হবে। আমার রেকর্ড অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন হায়াত এবং সুবেদার হাসমত এই প্লাটনের কমান্ডে ছিলেন। বাকী সেনারা সবাই ছিলো বাঙ্গালী। আমাদের জানামতে এখানে আরো তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিলো। অনুরূপভাবে নগরীর অন্যান্য এলাকাতেও ই-পি-আর প্লাটুন অবস্থান করছিলো। তবে অয়্যারলেস কলোনীর এই প্লাটুনটিই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের কমান্ডে ডিউটিরত ছিলো।

গেটে পৌঁছতেই প্রহরারত শাস্ত্রী জীপ থামিয়ে দিলো। বাঙ্গালী শাস্ত্রী প্রহরারত ছিলো। সে আমার জীপটি ভেতরে যাবার অনুমতি দিলো। আমরা ক্যাপ্টেন হায়াতের রুমের সামনে গিয়ে জীপ থামলাম। সেখানেও একজন শাস্ত্রী পাহারা দিচ্ছিলো।

সাবধানে আমি হায়াতের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। কয়েক মূহূর্তের মধ্যে মারাত্মক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, হয় সফল হবো, না হয় আমার মাথা ভেদ করে একটা বুলেট বেরিয়ে যাবে। শেষেরটি সত্যি হলে চট্টগ্রামের ই-পি-আর সেনা পরিচালনা করতে আর কোন বাঙ্গালী অফিসার থাকবে না। এই চিন্তা আমাকে কিছুটা বিহবল করে তুললো ক্ষণিকের জন্য।

আমি খুব আস্তে দরজায় নক করলাম এবং বন্ধসুলভ গলায় বললাম, “হ্যালো হায়াত ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?”

এই কেবল শুয়েছি স্যার। আমার গলার স্বর চিনতে পেরে সে আলো জ্বালালো। জানালার পর্দার ফাক দিয়ে আমি দেখলাম বালিশের তলা থেকে কি যেন একটা নিয়ে সে তার শোবার পোশাকের নিচে রাখছে। দরজা খোলার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, “সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো।”

“সব ঠিকঠাক হ্যাঁ” জবাব দিয়েই সে দরজা খুললো।

“প্লিজ ভেতরে আসুন স্যার, এবং-”

তার কথা শেষ না হতেই আমি স্টেনগান তার বুকের ওর ধরে বললাম, আমি দুঃখিত হায়াত, তোমাকে গ্রেফতার করতে হচ্ছে। হঠাৎ সে তার পিস্তল বের করার উদ্যোগ নিতেই ড্রাইভার কালাম দ্রুত এগিয়ে আসে এবং দুজনেই হায়াতের মাথায় আঘাত করি। সাথে সাথে আমরা তার হাত ও মুখ বেধে ফেললাম এবং টেলিফোনের তার কেটে দিলাম। তারপর পাশের ব্যারাকে ঘুমন্ত সুবেদার হাসমতকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালাম। সুবেদার হাসমত চোখ মুছতে মুছতে উঠে এসে স্যালুট দিয়ে দাড়াতেই কালাম এবং অন্য প্রাহরীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাসমতকে আটক করে তার হাত ও মুখ বেঁধে ফেলা হলো।

হায়াতের রুমের সামনে দাড়ানো শাস্ত্রীটি এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে এইসব অদ্ভুত ঘটনা দেখছিল। হঠাৎ কি মনে করে সে একটি টিলার দিকে দৌঁড় দিলো। কালাম ফিসফিস কণ্ঠে বললে, ও পশ্চিম পাকিস্তানী এবং পর মূহুর্তেই একটি বুলেট সাঁ করে চলে গেলো। আমরা নীচু হয়ে বসে পড়লাম। ব্যারাকগুলো থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে পড়তে লাগলো। যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় আমি বললাম, শাস্ত্রী ভুল করে গুলি ছুঁড়েছে। তারপর সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাড়ানোর নির্দেশ দিলাম। অন্য তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পন করলো। যে শাস্ত্রী গুলি ছুঁড়েছিলো সে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেলো। এই প্লাটুন থেকে আমি ১০ জন সেনাকে রেলওয়ে হিলে আমার সম্ভাব্য সমর-দফতর রক্ষা করার জন্য পাঠালাম। অন্যদেরকে হালিশহরে আমার সঙ্গে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলাম। বিচ্ছিন্ন প্লাটুনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিভিন্ন দিকে কয়েকজন বার্তাবাহককে পাঠালাম এবং চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য সবাইকে অবিলম্বে হালিশহরে আমার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিলাম।

অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে একটি দুঃসাধ্য কাজ সমাধা হলো। ড্রাইভার কালাম এবং দুজন প্রহরীকে ধন্যবাদ, তারা জীবন বিপন্ন করে এ কাজে সহায়তা করেছে।

রাত সাড়ে নটায় আমরা হালিশহরে পৌঁছলাম। ড্রাইভার কালামকে সতর্ক করে আলো নিভিয়ে দিয়ে গাড়ী আস্তে চালাবার নির্দেশ দিলাম। হালিশহরে জেসিও এবং এনসিওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। তিনটি অস্ত্রাগারের সবকটিই আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলো। বাঙ্গালী সেনারা যার যার অস্ত্রাগারের সামনে অস্ত্র ও গুলির জন্য সমবেত হয়েছে। মাত্র একমাস আগে আমরা ত্রি-নট-ত্রি রাইফেলের পরিবর্তে বিপুল পরিমাণ চীনা হাতিয়ার ও গোলাগুলি পেয়েছিলাম। এগুলো মিলিয়ে আমাদের মজুত ছিলো উদ্বৃত্ত, যা পরে খুবই কাজে লেগেছিলো।

হালিশহরের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ছিল প্রায় ৩০০ পশ্চিম পাকিস্তানী-ই-পি-আর সৈন্য। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো সিনিয়র জেসিও এবং এনসিও। নিঃশব্দে এদের পরাভূত করতে হবে কেননা আমার সদর দফতরের চারপাশের এলাকায় ছিলো অবাস্তবিকদের ঘন বসতি। এছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক কমান্ডো সেসব অবাস্তবিকের সঙ্গে বসবাস করছে বলে আগেই খবর পেয়েছিলাম এবং কমান্ডো ও অবাস্তবিকরা সবাই ছিলো পুরোপুরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কাজেই এখানে কোন শব্দ হলে গোটা ব্যাপারটা পন্ড হয়ে যাবে।

অস্ত্রাগার আমাদের কজায় থাকায় আমরা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলাম। শুধু একটি মাত্র বিপদ ছিলো, কেউ যদি গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয় তাহলে চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে কিংবা নৌবাহিনী সদর দফতর থেকে পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের প্রচেষ্টা বানচাল করতে ছুটে আসতে পারে।

আমরা প্রথমে সমগ্র এলাকা ঘেরাও করে ফেললাম যাতে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী পালাতে না পারে। এরপর শুরু হলো শত্রুসৈন্যদের গ্রোফতারের পালা।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনেক বাঙ্গালী জেসিও এবং এনসিওকে সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে চট্টগ্রামের ই-পি-আর সদর দফতরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মোতায়েন করা হয়েছিলো। চট্টগ্রামের ই-পি-আর কমান্ডার ছিলেন লেঃ কর্নেল আবদুল আজিজ শেখ। নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ঢাকার নির্দেশে তিনি এই ব্যবস্থা করছিলেন।

এইসব বদলী ইত্যাদির ব্যাপারে প্রথমে আমি খুবই চিন্তিত হয়েছিলাম। পরে দেখলাম যে, এটা আমার পরোক্ষ উপকারেই লেগেছে। কারণ, এক জায়গায় এতগুলো শত্রুসৈন্য পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

আমি কৌশলে অস্ত্রাগারে বাঙ্গালীদের মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। দিনের বেলা আমি শুধু বাঙ্গালী সেনাদের চুলকাটা, পোশাক ও আচরণ পরীক্ষা করে দেখতাম। এদেরকে সংশোধনের অধিলায় শাস্তি হিসাবে অস্ত্রাগার প্রহরার অতিরিক্ত ডিউটি দিতাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাতের এই ডিউটি পড়তো। ফলে অস্ত্রাগারের কাছে আর কোন পশ্চিম পাকিস্তানীর থাকার দরকার হতো না। আমার এই ব্যবস্থা খুবই কাজে লেগেছিলো।

তখন রাত ১০টা। আমি আমার অফিসের বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছি। ভীষণ ক্ষুধা বোধ করছিলাম। উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। পানি পর পর দুগ্লাস খেয়ে দেখলাম। সৈন্যদের ইতিমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়ে গেলো। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর থেকে কোন হামলা হলে তা প্রতিরোধ করার জন্য দুটি প্লাটুন এর মধ্যেই সেদিকে পাঠানো হয়েছিলো। আমি পশ্চিম পাকিস্তানি সবচাইতে সিনিয়র জেসিও সুবেদার মেজর ইতবার-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কোনরূপ সন্দেহ না করেই সুবেদার মেজর আমার অফিস রুমে প্রবেশ করলেন। আমি তাকে বসতে বললাম। তারপর বললাম, “সুবেদার-মেজর সাহেব, আপনি তো ঘুমাচ্ছিলেন। শহরে কি ঘটেছে জানেন কিছু?”

“না স্যার”- সরলভাবেই তিনি জবাব দিলেন। আসলেও তিনি কিছু জানতেন না। তিনি শুধু দেখছেন যে, সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে এবং তিনি এটাকে আমার নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ গণহত্যা পরিকল্পনার কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করায় ব্রিগেডিয়ারের নিচের পদের খুব কমই এ ব্যাপারে জানতে পারে। মাত্র কয়েকজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ ব্যাপারে জানতে পেরেছিলেন। এ কড়াকড়ি গোপনীয়তা প্রকারান্তরে আমাদেরই কাজে লেগেছিলো।

সুবেদার-মেজর হঠাৎ চোখ কচলে দেখলেন পাশের বিশ্রাম কক্ষ থেকে চারজন সৈন্য বেরিয়ে এসে রাইফেলের বেয়োনেট তাঁর বুকের ওপর ধরেছে। আমি তখন দৃড়কণ্ঠে বললাম, “সুবেদার-মেজর সাহেব, আপনাকে গ্রেফতার করা হলো। চীৎকার কিংবা পালাবার চেষ্টা করলেই প্রাণ হারাবেন।”

তাঁর হাত বেধে বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। এভাবেই অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সকল পশ্চিম পাকিস্তানী জেসিওকে গ্রেফতারের পালা শেষ হলো। এ গোপনীয়তা রক্ষা না করলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেঙে যেতো। এ ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় হবার আগেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিংবা নৌবাহিনীর লোকেরা আমাদের আক্রমণ করে বসতো।

এর কিছু পরেই ই-পি-আর সিগন্যাল কোম্পানীর দায়িত্বে নিয়োজিত অবাঙ্গালী জেসিও সুবেদার মোবিনকে আমার কক্ষে ডাকলাম। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী ই-পি-আর সেনারা কিছু একটা ঘটেছে বলে আচ করে ফেলে। কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের আর কিছু করার ছিলো না। কেননা, গোটা এলাকা আমাদের সৈন্যরা আগেই ঘেরাও করে ফেলেছিলো।ঃ

সুবেদার অফিসে ঢুকতেই দেখি সে খুব অতঙ্কিত। ঠিক এ সময়ে মেজর ইকবালের টেলিফোন এলো। আমি রিসিভার তুলে ধরতেই ওপাশ থেকে তিনি বললেন, হ্যালো রফিক এতো রাতে ওখানে কি করছেন?

“এখানকার গার্ডরা সতর্ক আছে কিনা, দেখতে এসেছি।”

“আচ্ছা। মুহূর্তের জন্য তিনি থামেন, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করেন, সুবেদার মোবিন কোথায়?”

“তিনি হয়তো রুমে ঘুমাচ্ছেন। কথা বলবেন তাঁর সাথে?”

“হ্যা, দয়া করে টেলিফোনটা তাকে দিন না।”

“আমি এফুনি তার কাছে লোক পাঠাচ্ছি। তিনি এলেই আপনাকে ফোন করতে বলবো।” সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি আরো কিছুক্ষন তার সাথে আলাপ চালিয়ে যাই, সৈন্যরা ডিউটি দিচ্ছে কিনা তা কয়েকটি জায়গায় দেখে এসেছি, সবকিছু ঠিক আছে।”

এরপর হঠাৎ তার প্রশ্ন শুনে ধাক্কা খেললাম। “কিন্তু ক্যাপ্টেন হায়াতের টেলিফোন কেউ ধরছে না কেন?”

“ওহ! ওর টেলিফোনটা খারাপ। এইমাত্র ওর ওখান থেকে এলাম। সুন্দর এক কাপ চা খাওয়ালো।”

“ইয়ার! কভি হামকো ভি লে চলো চায়ে পিনে কে লিয়ে। মেজর ইকবাল বললেন।”

“কালকেই নিয়ে যাব।”

এরমধ্যে চারজন সিপাই সুবেদার মোবিনকে বেধে ফেললো। বাইরের কেউ জানতেও পারলো না আমার রুমে কি ঘটছে। মেজর ইকবাল টেলিফোন রেখে দিলেন। আমি একটি বেয়োনেট চেয়ে নিয়ে সুবেদার মেজরের গলায় ধরে বললাম, আমার অধীনে এতদিন কাজ করে নিশ্চয়ই বুঝেছেন আমি কেমন। এখনই মেজর ইকবালের সাথে আপনাকে কথা বলতে হবে- আমি যেভাবে বলবো ঠিক সেভাবেই জবাব দিয়ে কথা না বললে মেরে ফেলবো। বুঝতে পারছেন?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার কথায় তিনি সম্মতি জানালেন। আমি ইকবালের নম্বরে ডায়াল করে সুবেদার মোবিনের কানের কাছে রিসিভার ধরলাম। ওপাশের কথা শোনার জন্য আমি মাথা নীচু করে রিসিভারের কাছে কান রাখলাম।

“হ্যালো স্যার, আমি সুবেদার মোবিন বলছি।”

“মোবিন সাহেব, আপনার কাছে আর কেউ আছে কি? মেজর ইকবাল প্রশ্ন করেন। আমি মাউথ পিসে হাত চাপা দিয়ে মোবিনকে বলতে বললাম। বুলন এখানে কেউ নেই। সুবেদার আমার নির্দেশ মত তাই বললেন।

“কিন্তু ক্যাপ্টেন রফিক তো ওখানে ছিলেন, কোথায় গেলেন তিনি। এবারও আমি টেলিফোন চেপে ধরে তাকে যেভাবে বলতে বললাম তিনি সেভাবেই জবাব দিলেন, ক্যাপ্টেন রফিক এই মাত্র সুবেদার মেজর ইতবারকে নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।”

“কোই গড়বড়?”

“না স্যার। সব কুছ ঠিকঠাক হয়। সুবেদার মোবিন অত্যন্ত অনুগত জবাব দিলেন।

“বহুত আচ্ছা! আজ রাতের জন্য আপনিই ডিউটি অফিসার। টেলিফোনের পাশেই অপেক্ষা করবেন। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।”

“ঠিক হয় স্যার-”

বিরাত একটা দুশ্চিন্তা কেটে গেলো। বন্দী সুবেদার মোবিনের প্রহরায় একজন বাঙ্গালী জেসিওকে রাখা হলো যাতে সে আবার টেলিফোনে কিছু উল্টাপাল্টা বলতে না পারে।

রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে সিনিয়র বাঙ্গালী জেসিও সুবেদার জয়নাল খবর দিলেন যে, কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে আমরা চট্টগ্রাম শহরে ই-পি-আর এর সকল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আটক করতে সক্ষম হলাম। সীমান্ত ফাড়িগুলোতেও আমার সাংকেতিক বার্তা দুটি পৌঁছে গেছে বলে খবর পেলাম। বার্তা দুটি পেয়েই রাত ৮টা ৪০মিনিট থেকে ৯টা ৩০মিনিটের মধ্যে তারা সব ফাড়ির পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাভূত করা হয়। ২৪শে মার্চের রাতে যখন আমি দ্বিতীয় বার্তাটি স্থগিতে রাখতে বলি, সে নির্দেশ পাওয়ার আগেই প্রথম নির্দেশ অনুযায়ী কয়েকটি ফাঁড়িতে বাঙ্গালী সেনারা কাজ সমাধা করে ফেলে। পরে অবশ্য দ্বিতীয় বার্তাটি স্থগিত হয়ে গেলে তারা আর চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়নি।

২৫শে মার্চ রাতে দ্বিতীয় বার্তায় চূড়ান্ত নির্দেশ লাভের পর অনেক সেনাদলই চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়ে পড়ে।

এদিকে চট্টগ্রাম শহরের বিচ্ছিন্ন প্লাটুনগুলো খবর পেয়ে লড়াই কেন্দ্রগুলোর দিকে এগোচ্ছিলো। শুধু বিমানবন্দরের প্লাটুনটির সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না। এটা আমার জন্য খুবই বিপদের কারণ ছিলো। কেননা, পরিকল্পনা মোতাবেক শত্রু যাতে বিমান বন্দর ব্যবহার না করতে পারে তার দায়িত্ব ছিলো এই প্লাটুনের ওপর। এখান দিয়ে সৈন্য আনা-নেয়া বন্ধ করতে পারলে বিমান বন্দর, পোর্ট এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতরসহ সমগ্র এলাকায় আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজতর হতো। বিমানবন্দরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অপারেটরকে গোপনে চব্বিশ ঘণ্টা লাইন চালু রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু ২৫শে মার্চ সন্ধ্যার পরই নৌ-বাহিনীর সদর দফতরের সৈন্যরা গোপনে বিমানবন্দরে গিয়ে পুরো প্লাটুনের লোকদের গ্রেফতার করে ফেলে। ফলে এখানে আমাদের বড় একটা ক্ষতি হয়ে যায়।

উপকূলীয় বাধ বারবার শত্রু সৈন্যের চলাচল প্রতিরোধ করার জন্য দুটি প্লাটুনকে পাঠানো হলো। একটি কোম্পানী রেলওয়ে হিল প্রতিরক্ষার দায়িত্বে রইলো। প্রায় ১০০ সৈন্যকে দুই অথবা তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে আগ্রাবাদ রোড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকার মোড়ে মোড়ে লড়াইয়ের জন্য মোতায়েন কর হলো। বাকী সৈন্যদের হালিশহরেই সংরক্ষিত রাখ হলো- যাতে কোথাও বিপদ দেখা দিলে তারা সেদিকে যেতে পারে। রামগড়ের সৈন্যদের কাছে পাঠানো বার্তায় তাদেরকে ফেনী নদীর ওপর শুভপুর সেতু ধ্বংস করে সেখানে একটি কোম্পানীকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থায় অবস্থান গ্রহণ করতে এবং অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে প্রধান সড়ক দিয়ে চট্টগ্রাম চলে আসতে বলা হয়েছিলো।

হালিশহর ত্যাগের আগে বন্দীদের একটি ভবনে কঠোর প্রহরাধীনে রাখার এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে রাত ১১টা ৪৫মিনিটের মধ্যে আমি রেলওয়ে হিলের সদর দফতরে পৌঁছলাম। এখানে পৌঁছে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর, পোর্ট এলাকা এবং বিমানবন্দরের ওপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকার সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি ভেবেছিলাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার এবং ষোলশহরে মোতায়েন ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে সক্ষম হবে। রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ডে ছিলেন লেঃ কর্নেল চৌধুরী এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। এ দুজায়গায় বাঙ্গালী সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ২০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিলো আনুমানিক ৪০০।

রাত তখন ১১টা ৩০ মিনিট। হঠাৎ ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের বাঙ্গালী সৈন্যদের ওপর হামলা চালালো। অস্ত্রাগারের গার্ডদের হত্যা করে প্রথমে তারা সেগুলো দখল করে। অন্যান্য বাঙ্গালী সৈন্য তখনও ঘুমিয়ে ছিলো। অস্ত্রাগার দখলের পরই পাকিস্তানী সৈন্যরা নির্বিচার হত্যালীলায় মেতে ওঠে। সে রাতে তারা এক হাজারেরও বেশি বাঙ্গালী সৈন্যকে হত্যা করে। এরপর তারা বাঙ্গালী সৈন্যদের আবাসিক কোয়ার্টারগুলোতে ঢুকে পড়ে এবং অস্ত্রের মুখে যাকে পায় তাকেই হত্যা করতে থাকে। নারী ও শিশুদের বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়।

এই হত্যালীলা থেকে যেসব বাঙ্গালী সৈন্য জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলো তারা চারদিকে দৌড়াতে শুরু করে। কেউ কেউ আমার দফতরে এসে সেই লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ দেয়। অন্যরা ষোলশহরস্থ ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দিকে ছুটে যায়। এই রেজিমেন্টের অধিকাংশ অফিসার এবং সকল সৈন্য ছিলো বাঙ্গালী।

কিছুসংখ্যক সৈনিক ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে ষোলশহরে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে রাত প্রায় একটার দিকে যোগাযোগ করে সেনানিবাসে আক্রান্ত বাঙ্গালী সৈনিক এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রাণ রক্ষায় এগিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানায়। সেই ভয়াবহ রাতে বাঙ্গালী অফিসার ক্যাপ্টেন এনাম সেনানিবাস থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে রেলওয়ে হিলে প্রতিরক্ষায় আমার ই-পি-আর প্লাটুনগুলোকে সুসংগঠিত করে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে এই পাহাড়েরই একটিন আবাসিক ভবনের নিচতলায় আমার সদর দফতর স্থাপন করলাম।

এই ভবনে রেলওয়ে অফিসারদের কয়েকটি পরিবার বাস করতেন। রেলওয়ে হিলে অবস্থান নিতেই সেখানকার অফিসার এবং তাদের পরিবারবর্গ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তারা গাড়ি থেকে আমাদের জিনিসপত্র নামাতে পাহাড়ের উপর আত্মরক্ষামূলক ট্রেঞ্চ খুঁড়তে, নতুন টেলিফোন লাইন স্থাপন করতে এবং আমাদের সৈনিকদের খাবার তৈরীতে প্রভূত সাহায্য করেন।

আগেই কোথায় কোথায় ট্রেঞ্চ খুঁড়তে হবে তা দেখে রেখেছিলাম এবং কয়েকজন জেসিওকে স্থানগুলো গোপনে দেখিয়েছিলাম। সৈনিকরা যথাস্থানে ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে কিনা তা দেখার জন্যে রেলওয়ে হিলের চারদিক ঘুরলাম। পূর্বনির্ধারিত পাহাড়ের ঢালে ৩ ইঞ্চি মর্টার স্থাপন করা হলো। রেলওয়ে হিলে আরও কয়েকটি ভবনে বহুসংখ্যক অফিসার তাদের পরিবারবর্গকে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানালাম। আমাদের কথামত অফিসারদের পরিবারবর্গকে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হলেও অধিকাংশ রেলওয়ে অফিসার এবং তাদের বয়স্ক পুত্রসন্তান ও পুরুষ আত্মীয়রা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করার জন্যে পাহাড়েরই থেকে গেলেন। ইতিপূর্বে খবর পেয়েছিলাম চট্টগ্রামের সকল সীমান্তবর্তী ফাড়ির ই-পি-আর সৈনিকরা অবাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে আমার সঙ্গে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যে চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে কেবলমাত্র নৌ-সদর দফতর এবং সেনানিবাস ছাড়া সমগ্র চট্টগ্রাম শহর এলাকা, হালিশহরস্থ ই-পি-আর লাইন এবং ই-পি-আর সদর দফতর তখন আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আমি ভেবেছিলাম ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সৈনিকদের নিয়ে মেজর জিয়া এবং লেঃ কর্নেল চৌধুরী সেনানিবাস আক্রমণ করবেন এবং আক্রমণে নিশ্চয়ই তারা সফলতা অর্জন করবেন। পাক সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কায়ক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে যখন আমি সারসন রোডের বাসভবন ত্যাগ করি তখনই ডাঃ জাফর এবং জনাব কায়সারকে বলেছিলাম ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে তারা যেন খবরটি জানিয়ে দেন। তারা আমার যুদ্ধ শুরু করার কথা এই রেজিমেন্টকে জানিয়েছিলেন। বলা প্রয়োজন যে, ঐ রাতে প্রায় ২ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে হালিশহর এবং চট্টগ্রাম নগরীর অন্যান্য এলাকার ৫০০ অবাঙ্গালী সৈনিক, জেসিও এবং কয়েকজন ই-পি-আর অফিসারকে আমরা নিরস্ত্র করতে পেরেছিলাম। আমার অধীনস্থ ই-পি-আর সৈনিক ও জেসিওদের সাহসিকাপূর্ণ কার্যক্রমের পূর্ণ গোপনীয়তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্যই অবাঙ্গালী সৈনিক ও অফিসারদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়েছিলো।

প্রাথমিক সাফল্যের পর রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে দিকে আমি ৮ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সৈনিকদের সাফল্যের খবর শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম আর ভাবছিলাম নিশ্চয়ই তারাও ২০ বালুচ রেজিমেন্টকে ইতিমধ্যে নিরস্ত্র করতে পেরেছেন। প্রথমিক সাফল্যের পর পরই সদর দফতর এবং বিমানবন্দর দখলের জন্যে আমি আমার সীমান্ত ফাড়ির ই-পি-আর সৈনিকদের আগমন অপেক্ষায় উন্মূখ ছিলাম।

ইত্যবসরে আমি বেতার কেন্দ্র, টেলিফোন একচেঞ্জ আক্রমণ ও দখল করার উদ্দেশ্যে আমার সৈন্যদের পাঠালাম। আমার এই রেলওয়ে হিল দফতরের ঠিক উল্টোদিকেই ছিলো নৌ-বাহিনীর যোগাযোগ কেন্দ্র। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা গেলো কয়েকজন পাকিস্তানী নৌ-সেনা ওখানে ঘোরাফেরা করছে। ঠিক এই সময়ে নৌ-বাহিনীর একটি গাড়ি আগ্রাবাদের দিকে এগিয়ে গেলো। আমার মর্টার জেসিও সুবেদার আইজুদ্দিন গাড়ি দেখেই তাঁর অবস্থান থেকে দৌড়ে এসে বললো, “স্যার, গাড়িতে কয়েকজন নৌ-সেনা রয়েছে। দেবো নাকি শেষ করে?”

আমি বললাম, “না, এখন নয়। এটা বোধ হয় পর্যবেক্ষণ গাড়ী। রাস্তা পরিষ্কার আছে কিনা দেখার জন্য এসেছে। মনে হয় সৈন্যদের আরো বড় দল এই রাস্তায় আসবে। সেই লক্ষ্যবস্তুই হবে আমাদের জন্য উত্তম। একসঙ্গে অনেক লোককে পেয়ে যাবো।” একটু পরেই আরেকটি গাড়ি একই পথে চলে গেলো। কিন্তু সৈন্যদের বড় দলটি আর এলো না। মিনিট দশেক পর দু’টি গাড়ীই ফিরে এলো এবং ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গেলো।

পরবর্তীকালে জানতে পেরেছিলাম, প্রথম গাড়িতে করে মেজর জিয়া পোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন। তার কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে এম, ভি, সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ক্যান্টনমেন্টে আনার জন্য তিনি রওনা হয়েছিলেন। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের চট্টগ্রামস্থ নিউ মার্কেট শাখার ম্যানেজার জনাব কাদের যখন আমার বার্তা নিয়ে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দফতরে যান তার আগেই মেজর জিয়া তার কমান্ডিং অফিসারের আদেশে ষোলশহর থেকে বেরিয়ে পড়েন। রেজিমেন্টের ডিউটি অফিসার আমার বার্তাটি পান। খবর পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে থামানোর জন্য পোর্টের দিকে রওনা হয়ে যান। ২৫শে মার্চ রাত তখন প্রায় সাড়ে ১১টা। ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা এই মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ওপর হামলা চালায়। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য ও অফিসারবৃন্দ তখনো এ খবর জানতে পারেননি। পূর্বে উল্লেখিত দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান। আগ্রাবাদ পর্যন্ত গিয়ে মেজর জিয়াকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যারিকেড পরিষ্কার করছিলেন। খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা জানালে মেজর জিয়া ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট লাইনে ফিরে আসার এবং তার অফিসারদের সঙ্গে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন। মেজর জিয়াকে বহনকারী প্রথম গাড়িটি দেখেই নায়েব সুবেদার আইজুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে আক্রমণ করতে চেয়েছিলো। রেলওয়ে হিলের পাশের এই সড়কের অনেকখানি আমাদের এল-এম-জি এবং রকেট লাঞ্চারের সুনির্দিষ্ট আওতার মধ্যে ছিল। আমরা ধৈর্য্য না ধরলে মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে বহনকারী গাড়ি দুটি রকেট লাঞ্চারের গোলায় উড়ে যেতো। আরো বড় শিকারের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম বলেই অলৌকিকভাবে সেদিন তারা দুজন বেঁচে গিয়েছিলেন।

ইউনিট লাইনে ফিরে মেজর জিয়া এবং তার অফিসাররা কমান্ডিং অফিসারসহ অবাঙ্গালী অফিসারদের গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেন। অবাঙ্গালী অফিসারদের গ্রেফতার পর্ব শেষ হবার পরই তাদের কাছে ক্যান্টনমেন্টের হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছে।

৮ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন অফিসার পরে স্বীকার করেছিলেন, “ক্যান্টনমেন্টের ঘটনার ব্যাপারে মতবৈধতা দেখা দেয়। রেজিমেন্টের তরুন অফিসারদের কয়েকজন তখনই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সৈনিকদের জীবন রক্ষায় ছুটে যেতে চান। অন্যরা ২১০ বালুচ রেজিমেন্টকে আক্রমণ করাকে আত্মঘাতী হবে বলে মত প্রকাশ করেন। এই মতপার্থক্যের ফলেই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এই পর্যায়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাওয়া কিংবা ২০ বালুচ রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা বোকামি হবে। এরপর ঐ রাতেই আমরা ষোলশহর ত্যাগ করে পটিয়ার দিকে অগ্রসর হই।”

এদের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে আমি আগে কিছুই জানতাম না। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে যাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম সেই ডাঃ জাফর ফিরে এলে সব জানতে পারলাম। কিছুটা অধৈর্য্য হয়ে ডাঃ জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কি এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি?”

“আপনার খবর তো ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পৌঁছে দিয়েছি। তবু তারা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রেজিমেন্টাল সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি।”- ডাঃ জাফর জবাব দিলেন।

“দয়া করে এফুনি যান, গিয়ে ওদেরকে থামান। এখন সবকিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ওদের সাথে সম্মিলিতভাবে বাকী জায়গাগুলোও আমরা মুক্ত করতে পারবো। আজকের রাতই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।”

\ সশস্ত্র প্রতিরোধ \

চট্টগ্রাম, ২৬শে মার্চ। আমার দফতরে টেলিফোনে খবর এলো যে পাকিস্তানী সেনারা নৌ-ঘাঁটি থেকে অগ্রসর হয়ে হালিশহরে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ই-পি-আর ট্রাপস এই আক্রমণ প্রতিহত করে। শত্রুদের প্রচুর হতাহত হয়। পাকিস্তানীরা হালিশহরে কোন বাধা আশা করেনি। সংগঠিত প্রতিরোধ মোকাবিলার জন্য তারা প্রস্তুতই ছিলো না। তাদের অগ্রবর্তী দলটি হালিশহরের প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহের সম্মুখীন হতেই আমাদের সৈনিকরা পাকিস্তানীদের লক্ষ্য করে গুলি চালালো। পাকিস্তানীরা ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। বহু সংখ্যক হতাহত হলো। অবশেষে তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। এ সময়ে অপর এক টেলিফোনে জানলাম, ৮০ থেকে ১০০টি যানের বিরাট একটি কনভয় কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের পথে রওনা হয়েছে। কুমিল্লা থেকে মেজর বাহার চট্টগ্রাম টেলিফোন অপারেটরকে একথা জানালে সে তৎক্ষণাৎ আমাকে তা অবহিত করে। সংবাদ পাওয়ার পরপরই আমি পাকিস্তানী কলামটিকে এ্যামবুশ করার জন্যে একজন জেসিওর নেতৃত্বে হালিশহর থেকে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠালাম। হালকা মেশিনগান এবং ভারী মেশিনগান ছাড়াও কোম্পানীটির সাথে ছিলো ৩’’ মর্টার ও রকেট লাঞ্চার। অপারেশনাল কমান্ডার সুবেদার মুসা যাত্রার প্রাক্কালে আমাকে টেলিফোন করে বললেন। আমাদের সাফল্যের জন্যে দোয়া করবেন স্যার।

সকল দেশবাসী আপনাদের জন্যে দোয়া করছে। যুদ্ধ চালিয়ে যান, মাতৃভূমিকে মুক্ত করুন। আমার গলার স্বর ছিলো আবেগে উদ্বেলিত।

কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামগামী শত্রুপক্ষে ছিলো ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারদের একটি অংশ এবং তাদের সঙ্গে ১২০ মিলিমিটার মর্টারবাহী একটি দল। ২৬শে মার্চ রাত ১টার দিকে তারা চট্টগ্রামের পথে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করে। কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব একশ মাইলের কিছু বেশি। তাদের পথে বহুসংখ্যক কালভার্ট এবং ছোট ছোট সেতু ছিল। সৈন্য চলাচলে বাধাদানের জন্যে পূর্বেই জনসাধারণ এগুলোর অধিকাংশ ভেঙ্গে ফেলেছিলো। তাই পাকিস্তানী কলামটিকে অনেক ক্ষেত্রে মূল রাস্তা ছেড়ে ঘুড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। একই সাথে ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারের সৈনিকরা সেতুগুলো মেরামতও করে চলছিলো। যা হোক, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শুভপুরে সেতুর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে রাখা হয়েছিলো। কুমিল্লাস্থ ৫৩ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি নিজেই সমগ্র কলামের নেতৃত্বে ছিলেন। শুভপুর সেতু মেরামত করতে সময় লাগবে দেখে ব্রিগেড কমান্ডার পদাতিক সেনাদের নিয়ে নদী পার হয়ে চট্টগ্রামের পথে রওনা হলেন এবং পিছনে রেখে গেলেন মর্টার এবং ইঞ্জিনিয়ার ইউনিটকে। তাদের বলে গেলেন সেতু মেরামত করতে তারা যেন অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে যোগ দেয়। সূর্য তখন অস্তপ্রায়। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি এবং তার বাহিনী চট্টগ্রাম থেকে ১৪ মাইল দূরে কুমিরায় পৌঁছে গেলেন।

এদিকে ইপিআর সেনারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রাস্তার পূর্ব পাশের একটি উচু জায়গায় এ্যামবুশ করে বসেছিলো। রাস্তার পশ্চিমে কিছু দূরেই সাগর। উচু জায়গাটি থেকে রাস্তা এবং সাগর বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বড় সেতুগুলোর কষ্টসাধ্য বাধা পেরিয়ে আসতে পেরে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি খুব খুশী ছিলেন কারণ সেতুগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হলে তাদের পক্ষে সেতু পার হওয়া সম্ভব হতো না। সমস্যার মুহূর্তে কুমিরায় পৌঁছে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে আর মাত্র মিনিট পয়তাল্লিশের মধ্যেই চট্টগ্রামের পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন এবং তারপরই নামতে পারবেন বাঙ্গালীদের শায়েস্তা করতে। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি জীবনের সর্ববৃহৎ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। ইপিআর সেনাদের এ্যামবুশে তিনি এবং তার প্রায় অর্ধেক সৈন্য দিশেহারা হয়ে পড়লো।

এই এ্যামবুশে পাক সেনাদের হতাহতের খবর পরে পাওয়া গিয়েছিলো। লাইট মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক গুলির শিকার হয়েছিলেন ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল শাহপুর খানসহ প্রায় ৭০

জন পাকসেনা। ধ্বংসপ্রাপ্ত যানবাহনের সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি জীবন বাঁচাবার জন্যে তখন প্রাণপণে ছুটেছিলেন পাহাড়ের দিকে। কয়েকজন সঙ্গীও তাকে অনুসরণ করলো। ভীতসন্ত্রস্ত সৈনিকরা হাতিয়ার, যানবাহন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফেলেই প্রাণপণে ছুটছিলো। শত্রুশক্তির পিছনের অংশ যারা আমাদের অস্ত্রের আওতার বাইরে ছিলো তারা সঙ্গে সঙ্গেই সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নিয়ে পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করলো। এক ঘণ্টারও বেশী সময় এই গুলি বিনিময় চললো। ইতিমধ্যে পাকিস্তানীদের মর্টার বহর শুভপুর সেতু অতিক্রম করে তাদের অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে যোগ দিলো। এই সময় আমাদের সেনারা প্রায় ৩ মাইল সরে এসে পরবর্তী অবস্থানে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। এই ভয়াবহ সংঘর্ষে ইপিআর-এর ৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়।

কুমিল্লায় শত্রুর বিরুদ্ধে ইপিআর সেনাদের এই এ্যামবুশ ছিলো আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই প্রথম সরাসরি আক্রমণ। কুমিল্লার ঘটনার গুরুত্ব এতই সুদূরপ্রসারী ছিলো যে, এই ঘটনা পাকিস্তানী সৈন্যদের চট্টগ্রামে অবধে কিছু করার মূল পরিকল্পনা ব্যাহত করে দেয়। চট্টগ্রামে শত্রুদের লোকবল পর্যাপ্ত ছিলো না বলে কুমিল্লা থেকে লোকবল বৃদ্ধি ছিলো একমাত্র ভরসা। এই এ্যামবুশের পরে আমরা একটি অয়্যারলেন্স বার্তা শুনে ফেলি। চট্টগ্রামের জনৈক কমান্ডার ঢাকায় ৯৪ ডিভিশনের কর্নেল ষ্টাফ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমাদের অনেক লোক হতাহত হয়েছে। সীতাকুন্ডের দক্ষিণে বাকি সৈন্যরা আটকা পড়ে আছে। বিমানে সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ করছি। জরুরি ভিত্তিতে বিমানে করে হতাহতদের সরাবার ব্যবস্থা করা দরকার।

কুমিল্লায় আমারও কিছু লোক হতাহত হয়েছিলো। আমারও প্রয়োজন ছিলে নতুন সৈন্যের, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের। সেই মুহূর্তে সীমান্ত এলাকা থেকে যে সব ইপিআর সৈন্য আসছিলো তারাই ছিলো আমার প্রধান ভরসা।

২৬শে মার্চ ভোর নাগাদ ক্যাপ্টেন হারুন শহরের পাঁচ মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন। তাঁর সৈন্যরা উচ্চ কণ্ঠে “জয়বাংলা” শ্লোগান দিতে দিতে আসছিলো। কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে এসেই থামতে হলো তাদেরকে। কয়েকজন সৈন্যকে শহর ছেড়ে কালুরঘাট সেতুর দিকে যেতে দেখা গেলো। কিছুক্ষণের জন্য ক্যাপ্টেন হারুন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন “শত্রুরা কি তাহলে পুরোপুরি শহর দখল করে ফেলেছে?” এই ভাবনা তাঁকে কিছুটা হতবুদ্ধি করে দেয়। পরে দেখা গেলো যে, এরা বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক। তারা সবাই পটিয়ার দিকে যাচ্ছিলো। শহরে ঢোকার আগে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি কালুরঘাট ব্রিজ পেরিয়ে মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁকে কালুরঘাট এলাকাতেই থাকতে বলা হলো। ফলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরের যুদ্ধে আমার সঙ্গে যোগ দেয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না।

কক্সবাজারে ইপিআর কোম্পানীর কমান্ডার ছিলেন সুবেদার মফিজ। তিনি দুটি ইপিআর কোম্পানী নিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য কক্সবাজার ত্যাগ করেছিলেন। তাকেও কালুরঘাট এলাকায় থামিয়ে সেখানেই আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে বলা হয়। তিনি পরে আমাকে বললেন। আপনার সাথে যোগ দিতে পারিনি এটা আমার ত্রুটি ছিলো না। মেজর জিয়া আমাকে কালুরঘাটে থামিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাকে আপনার নির্দেশের কথা জানালে তিনি আমাকে জানান শহরে কেউ নেই। অবশ্য পরে দেখা গেলো আপনি তখনো শহরে যুদ্ধ করে চলেছেন।

আমরা তখনো শহর ছাড়িনি। বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছিলো। কিন্তু ঘটনাবলী শহরের পরিস্থিতিতে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছিলো তা মোটেই আমার জন্য অনুকূল ছিলো না।

কক্সবাজার এবং কাপ্তাই থেকে যে সৈন্যরা আসছিলো কালুরঘাট ব্রিজের কাছে তাদের থামিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। কুমিল্লার প্রধান সড়ক বরাবর প্রচণ্ড সংঘর্ষের দরুন রামগড়ের সৈন্যরা আসতে পারছিলো না। শহরে

যে ক'জন সৈন্য ছিলো শুধু তাদের সম্মল করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিলো না। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর এবং পোর্ট মুক্ত করার পরিকল্পনা ভেঙে গেলো।

বেলা ৯টা নাগাদ অনেক উঁচু দিয়ে শহরে হেলিকপ্টার ঘোরাঘুরি শুরু করলো। কয়েক জায়গায় জনসাধারণ সেগুলোর দিকে বন্দুকের গুলি ছুড়লো। বিরাটাকায় সি-১৩০ বিমানগুলো ঢাকা থেকে সৈন্য আনতে থাকলো। অসহায়ভাবে তবু আমরা সেই অবস্থান আকড়ে রইলাম। আমাদের প্রচেষ্টা ছিলো, ক্যান্টনমেন্ট এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর থেকে শত্রুদের বেরোতে না দেয়া। কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হওয়ায় এবং ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্ট শহর ত্যাগ করায় ওদিক দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের বেরোনো সহজতর হয়ে উঠেছিলো। ঘটলোও তাই। ট্যাংকের ছত্রছায়ায় ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লো।

নৌ-বাহিনী সদর দফতরের পাকিস্তানী সৈন্যরা অবশ্য তখনো আটকা অবস্থায়। সমগ্র আগ্রাবাদ রোডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ছিলো ইপিআর সৈন্যদের দখলে। হালিশহরের কাছে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম বলে শত্রুপক্ষের একটি লোকের পক্ষেও চলাচল করা সম্ভব ছিলো না। এমনভাবে ওদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা আমরা অনেকখানি ব্যাহত করতে পেরেছিলাম।

চট্টগ্রামে পাকিস্তানীদের সাহায্যার্থে বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য ২৬শে এবং ২৭শে মার্চ ঢাকা থেকে বিমানযোগে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে এসে পৌঁছায়। বিমানবন্দর থেকে পাকসেনারা আগ্রাবাদ এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাক সেনাদের অপর একটি গ্রুপ হালিশহর ইপিআর সদর দফতরের দিকে অগ্রসর হয়। হালিশহরে আমরা ইপিআর বাহিনী আগে থেকেই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে তুলেছিলো।

কুমিরার সংঘর্ষ মারাত্মক হয়ে পড়ে। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির সৈন্যদের মনোবল এতই ভেঙে পড়েছিলো। যে, তাদের পক্ষে আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলো না। এই সময় হেলিকপ্টার যোগে জেনারেল মিঠঠা খান কুমিল্লায় উপস্থিত হন এবং সৈন্যদের প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে এক জঘন্য মিথ্যা ভাষণে বলেনঃ “হিন্দুদের প্ররোচনায় বাঙ্গালীরা তোমাদের অফিসার, সৈন্য এবং তাদের পরিবার পরিজনকে হত্যা করে চলছে। তোমরা তাদের রক্ষা না করলে তারা সকলেই প্রাণ হারাবে। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তোমরা সামনে এগিয়ে যাও। খুনের বদলে খুন। ইসলাম এবং পাকিস্তানকে তোমরা রক্ষা কর।” প্রতিশোধ গ্রহণের এই তীব্র হলাহল পাকিস্তানী সৈনিকদের মনে ব্যাপক জিঘাংসা সৃষ্টি করে।

মূল সড়ক পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হওয়ায় ব্রিগেডিয়ার শফি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে একটি কলামকে সেনানিবাসে ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। অপর কলামকে উপকূল রেখা বরাবর অগ্রসর হয়ে বাধের উপর তরিত অবস্থান গ্রহনকারী আমাদের সৈন্যদের ঘিরে ফেলার নির্দেশ দেন।

সন্ধা হয়ে আসে। মাঝে মাঝেই উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় চলছিলো। সংঘর্ষ এলাকা থেকে জনসাধারণ ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকলেও এলাকার তরুনরা আমাদের সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে খাবার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে থাকে। এমনকি তারা হতাহতদের নিরাপদ স্থানে সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে থাকে। সৌভাগ্যের বিষয় ছিলো তাদের অনেকেই শত্রুসৈন্যদের কাছাকাছি থেকে তাদের প্রতিটি অবস্থানের খবরাখবর আমাদের সর্বরাহ করে চলছিল।

উপকূল বরাবর শত্রুসৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার খবর পেয়েই আমরা আরেকটি এ্যামবুশের আয়োজন করি। পাকিস্তানীরা আমাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। এই দ্বিতীয় এ্যামবুশেও শত্রুসৈন্যদের অনেকে হতাহত হয়। ভীত পাকিস্তানীরা তাদের মৃত সঙ্গীদের ফেলেই নানা দিকে দৌড়াতে থাকে। অনেকেই পথ ভুলে গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়লে নিরস্ত্র বিক্ষুব্ধ জনতার হাতেই প্রাণ হারায়।

ইতিমধ্যে ইপিআর কোম্পানীর গোলাবারুদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। অপরদিকে হালিশহর সদর দফতরেও বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করার মতো গোলাগুলি আর তেমন ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে আমি কুমিরার কোম্পানীকে পেছনে সরে শহরের উপকণ্ঠে নতুন প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিতে বললাম। স্থানটি হালিশহরে আমাদের অবস্থানের নিকটেই ছিলো। আমরা তীব্রভাবে গোলাগুলি এবং নতুন সৈন্যের প্রয়োজনীয়তার অভাব অনুভব করি। অথচ সেই মুহূর্তে এগুলো সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিলো। এদিকে রাঙ্গামাটি থেকে আগত ইপিআর সেনারা ক্যান্টনমেন্টের অদূরে বাধাগ্রস্ত হয় এবং রামগড় এলাকার অপর দুটি ইপিআর কোম্পানীও মূল সড়ক পথ ধরে অগ্রসর হতে পারছিলো না। এ সময় আমার সামনে দুটি বিকল্প পথই খোলা ছিলো। হয়, ক্যান্টনমেন্টের অস্ত্রাগার দখল করা অথবা সরবরাহের জন্য ভারতের সাথে যোগাযোগ করা। অন্যসব সম্ভাবনা ব্যর্থ হলে চূড়ান্ত পন্থা হিসাবে শেষেরটিই বিবেচনা করা যায় বলে মনে করলাম। আমি প্রথম পন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেই এবং তখনই রামগড়ের একটি কোম্পানীকে মাঠের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে ক্যান্টনমেন্টের পেছনে অবস্থানকারী আমাদের সেনাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলাম। অপর কোম্পানীটিকে শুভপুর সেতু এলাকায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে তুলতে বললাম যাতে সড়ক পথে কুমিল্লা থেকে নতুন কোনো পাক সৈন্য চট্টগ্রাম আসতে না পারে।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৮টার দিকে নৌ-বাহিনীর যোগাযোগা ঘাঁটিতে পাক সৈন্যদের আনাগোনা লক্ষ করা গেলো। রেলওয়ে পাহাড়ে আমার ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টার থেকে পাশের একটি মসজিদে তাদের আনাগোনা পরিস্কার দেখা যাচ্ছিলো। কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তিও তাদের সঙ্গে মসজিদে যোগ দেয়। এই সময়ই হালকা মেশিনগান নিয়ে অবস্থানকারী আমার একজন সিপাই যে মুহূর্তে ট্রেঞ্চ থেকে মাথা তুললো অমনি একটি বুলেট তাকে আঘাত করলো। গুলিটি আসে মসজিদের দিক থেকে। সাথে সাথে শত্রুরা আমাদের অবস্থানের ওপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে ব্যাপকভাবে গুলি চালাতে শুরু করলো। কামানের গোলা আমাদের চতুর্দিকে পড়তে থাকে। বিস্ফোরিত গোলার মারাত্মক টুকরোগুলো ভয়াবহরূপে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শত্রুদের একটি দল টাইগার পাস ঘাটি থেকে আক্রমণ চালায়। অবশ্য এই আক্রমণ সাথে সাথেই প্রতিহত করা হলো। কিছুক্ষণ পর অপরদিক থেকেও হামলা হতে থাকে। তবে দুটি হামলাই সামনের দিক থেকে আসছিলো বলে ওরা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। বরং পাকিস্তানিরা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। সামনে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে তারা পিছু হটে গিয়ে তাদের সুদৃঢ় ঘাটি থেকে আমাদের অবস্থানের ওপর অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে থাকলো।

অনুরূপভাবে আমাদের হালিশহর অবস্থানের ওপর কয়েক দফা হামলা হলো। কিন্তু প্রতিবারই শত্রুসেনারা হটেতে বাধ্য হলো। ২৬শে এবং ২৭শে মার্চের মধ্যবর্তী রাতকে মনে হচ্ছিলো এ রাত যেন আর পোহাবে না। গুলির শব্দে গোলার বিস্ফোরনে সমস্ত শহর কেঁপে কেঁপে উঠছিল বারং বার।

এ সময় আমার অবস্থানের পেছনেই ট্যাংকের আওয়াজ পেলাম। অন্য কোনো ভাবে আমাদের অবস্থান দখল করতে না পেরে শত্রুরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। রেলওয়ে হিলে আমাদের অবস্থান শত্রুদ্বারা ঘেরাও আসন্ন হয়ে উঠলো। অথচ কোনো ট্যাংকবিন্ধুংসী অস্ত্র আমাদের ছিলো না।

প্রায় দু'ঘন্টা পর কামানের গোলা বর্ষণ একটু কমে এলো। এ সময় আহত সৈনিককে আমার কমান্ড পোস্টে নিয়ে আসা হলো। সে ছিলো বয়সে তরুন। কাদামাটি লাগা কাপড়চোপড় রক্তে ভেজা। বুলেট তার বুকে বিদ্ধ হয়েছিলো। দারুন কষ্টে নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে আশ্ফুট কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলো “কখন আমার মৃত্যু হবে?” তার দৃষ্টিতে ছিলো সারা বিশ্বের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। এরপর সে আর কিছু বলতে পারে নি। আরো অনেকের মতই নিভৃত যন্ত্রনায় সেও আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেলো।

১ ঘেরাও ১

ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে নৃশংস অভিযানের প্রাথমিক সাফল্যে উৎফুল্ল ইয়াহিয়া তার বাহিনীকে ব্যাপক গণহত্যার ছাড়পত্র প্রদান করেন। পাকসেনারা তাদের অভিযান এলাকাগুলোতে প্রাণী বলতে যা কিছু পেয়েছে তাই নিধন করেছে এবং এসব স্থানে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে অবলিলাক্রমে। কিন্তু তবুও লোক এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু এই প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা ছিলো দুঃসাধ্য, কারণ অস্ত্র চালনায় জনসাধারণের একদিকে যেমন কোন ট্রেনিং ছিলো না। তেমনি তাদের অস্ত্রগুলোও ছিলো পুরোনো আমলের। এদিকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত আমাদের বাঙালী সৈনিকরা যেখানেই সংগঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন সেখানেই শুরু হয়েছে কামান, ট্যাংক আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দ্বারা শত্রু পক্ষের সম্মিলিত আক্রমণ। এই ধরনের বারংবার হামলার মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের গোলাবারুদের মজুতে টান পড়ে।

এই অবস্থায় রেলওয়ে হিলের অবস্থান ত্যাগ করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলো। তখন চারদিকেই শুষ্কসনা। ক্রমাগত ১ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে পাকিস্তান নৌবাহিনীর কামানগুলো আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদেরকে ব্যস্ত রাখে। এই সঙ্কটময় অবস্থায় আমি আমার সৈন্যদের কোতয়ালী থানা এলাকার দিকে সরে যেতে নির্দেশ দিই এবং সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্টের পেছনে সকলকে একত্র হতে বলি। গুলি বর্ষনের ছত্রছায়ায় যখন সকলেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায় তারপরই আমি ঘাটি ত্যাগ করার জন্য পা বাড়াই। একজন তরুন কলেজ ছাত্রও আমার সাথে ছিলো। আমরা চলছিলাম কিন্তু মুখে কোন কথা ছিলো না। সমস্ত সকালটি ছিলো কুয়াশাচ্ছন্ন। বিমূড় বিষন্নতায় সমস্ত শহর যেন আচ্ছন্ন। রাস্তাঘাট ছিলো জনমানবশূন্য, মনে হচ্ছিলো মৃতের নগরী। শত শত বছর পরে মাটির তলা থেকে খুঁড়ে যেন নগরটিকে আবিষ্কার করা হয়েছে। দূরে বন্দরে জাহাজের মাস্তুল, ক্রেন, ওধারে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম সবকিছুই একটির পর একটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। ভরাক্রান্ত হৃদয়ে পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই সা করে একটি বুলেট আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেলো। সাথে সাথে আমরা নীচু হয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দেই।

কদমতলী রেলক্রসিংয়ের কাছে নৌ-সেনাদের দুটি ট্রাক এ সময় অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা করছিলো। আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সামনে এগোচ্ছিলাম। কোন দেশ কি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না? বহির্জগতের কোন দেশ কি জানে না বাংলাদেশে এখন কি ঘটছে? আমাদের বেতার ঘোষণা কি তারা শুনেছে? এমনি নানা কথার ভীর আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কদমতলীর কাছাকাছি এসে এসব কথা ভাবতে ভাবতে যখনই রাস্তা পেরুতে গেছি তখনই দুটি গাড়ীর হেডলাইটের তীব্র আলোয় আমার চোখ ঝলসে যায়। দুটি গাড়ি থেকেই সৈন্যরা লাফিয়ে নামতে থাকে। আমি সামনে একটি প্রাচীর দেখে সেটি পার হওয়ার জন্য দৌড় দিই শত্রুসৈন্যরাও গুলি বর্ষণ শুরু করে। একটি গুলি এসে আমার ডান হাতে ধরা এস্টেনগানে লাগলে প্রচণ্ড ধাক্কায় সেটি ছিটকে পড়ে। আমি মুহূর্তে দেয়ালের উপর লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড বেগে ওপাশে গিয়ে পড়ি। তারপর লাফিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আবার কখনো দৌড়ে চলতে থাকি। পেছনে শুনতে থাকি নৌ-সেনাদের এলোপাথারী গুলিবর্ষণের শব্দ। তাদের দুঃখ, শিকার তাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো।

আমার বাম উরুতে তখন ভয়ানক যন্ত্রনা হচ্ছিলো, ভীষন রক্ত ঝরছিলো এবং ট্রাইজারের একটি অংশ হাটু পর্যন্ত ছিড়ে ঝুলছিলো। দেয়াল থেকে লাফিয়ে পড়ার সময়ই বোধ হয় কিছুতে লেগে এই জখম হয়েছে। কোতয়ালী থানায় পৌঁছে দেখি আমার লোকেরা সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে। ৩’’ মর্টারগুলো তখন আমাদের জন্য বোঝা হয়ে পড়েছিলো। কারন ওগুলোর কোনো শেল অবশিষ্ট ছিল না। পেট্রলের অভাবে আমাদের কয়েকটি গাড়িও ফেলে আসতে হলো। আমি টেলিফোনে জনাব সিদ্দিকীতে মর্টারগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িসহ কাউকে পাঠাতে বললাম এবং সৈন্যদেরকে পূর্ব পরিকল্পিত জায়গায় গিয়ে প্রস্তুত হওয়ার জন্য নির্দেশ

দিলাম। আমাদের আশা ছিলো সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্টের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রচুর গোলাগুলি উদ্ধার করতে পারবো।

আমাদের ভিন্ন রাস্তায় অগ্রসর হতে হলো। ক্যান্টনমেন্ট ও শহরের মধ্যবর্তী প্রধান শহরটি তখন শত্রুশক্তিবলিত। আমরা কিছু লোক গাড়িতে এবং কিছু লোক পায়ে হেটে গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হলাম। চকবাজারের কিছু সামনে শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছতেই দেখলাম আমার একজন ইপিআর সিপাই পায়ে হেটে শহরের দিকে ফিরছে। ওদিকে কোথায় যাচ্ছে? আমি চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম। বিষন্ন কণ্ঠে সে জবাব দিলো আপনার কাছেই স্যার। সে আরো বললো, আপনি ক্যান্টনমেন্টের পেছনের এলাকায় গিয়ে আমাদের একত্র হওয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু একজন অফিসার অন্যপথ দিয়ে সৈন্যদেরকে নিয়ে কালুরঘাট সেতুর দিকে চলে গেছেন। আমি আবার চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম। কোন অফিসার?

“আমি তার নাম জানি না স্যার।”

জনাব হান্নান এবং ডাঃ জাফরকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের সেনাদের কালুরঘাট সেতুর দিকে নিয়ে গিয়েছেন। আমি আওয়ামী লীগ নেতাদের অনুরোধ করলাম তারা যেন জিয়াকে বলেন, আমার সৈন্যদের ছেড়ে দিতে যাতে ওরা শহরে আমার সাথে যোগ দিতে পারে। তদনুসারে ডাঃ জাফর, জনাব হান্নান, নগর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব মাহান, জনাব কায়সার এবং আরো কয়েকজন কালুরঘাটের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। গোমদন্ডী স্টেশনের কাছে তারা মেজর জিয়া, মেজর শওকত এবং অন্য কয়েকজন অফিসারের সাক্ষাৎ পান। আমার সাথে শহরের লড়াইয়ে অংশ নেয়ার জন্য তারা জিয়াকে আমার সৈন্যদের ছেড়ে দিতে বলেন। মেজর জিয়া জবাব দেন যে, তার সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের পরই তিনি আমার সংগে যোগ দেবেন। আওয়ামী লীগ নেতারা ফিরে এসে আমাকে সব কথা জানালেন। অবশ্য মেজর জিয়া এবং তার সংগের অন্য অফিসাররা শহরের লড়াইয়ে আর আসতে পারেন নি।

ঢাকা থেকে তখনও বিমান বোকাই করে সৈন্য আনা হচ্ছিলো। প্রধানতঃ কুমিল্লার ৫৩ বিগ্রেড থেকে এবং অন্যান্য স্থান থেকেও পাক সৈন্যরা চট্টগ্রামের পথে এগিয়ে আসছিলো। শহরের ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার চক্র দিচ্ছিলো। এদিকে বাংলাদেশের পতাকার বিক্রি বেড়ে গেলো বহুগুণ। সর্বত্র নীল আকাশের নিচে নতুন জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা গেলো। কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট থেকে শত্রুসৈন্যরা বেরিয়ে সবাইকে সেগুলো নামিয়ে ফেলতে বাধ্য করতে লাগলো। যদিও প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে গ্রথিত বাংলাদেশের পতাকার ছাপ তারা কোন দিনই মুছে ফেলতে পারেনি।

ক্যান্টনমেন্টের অদূরে ইপি-আর সৈন্যরা আমার কথা অনুযায়ী নতুন সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমার সৈন্যদের কালুরঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ কথা তারা তখনো জানতে পারেনি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে ক্যান্টনমেন্টের ওপর যে হামলা পারিচালনার পরিকল্পনা আমি ইতিপূর্বে করেছিলাম তা ভেস্তে গেলো।

এমতাবস্থায় আমি অস্ত্র এবং গোলাবারুদের জন্য ভারতে যাবার নিদ্রান্ত নিলাম। ভাবলাম, ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে ভারতে একবার যেতে পারলে সেখান থেকে নিশ্চয়ই অস্ত্র, গোলাগুলি এবং জরুরী জিনিসপত্র সংগ্রহ করা যাবে এবং এরপর রামগড় থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে এসে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করতে পারবো। অস্ত্রের জন্য ভারতে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আমি সীমান্ত রক্ষীদের সাথে প্রাথমিকভাবে আলোচনা করে রাখার জন্য অয়্যারলেসে রামগড়ে একটি বার্তা পাঠালাম। আমার ভারত পৌঁছানোর পর আলোচনা শুরু করতে যাতে দেরি না হয় সেজন্যই আগে থেকে এ ব্যবস্থা করলাম।

\ সরবরাহের অভাব \

২৮শে মার্চ ভোর নাগাদ শত্রুসম্মুখ ক্যান্টনমেন্ট এবং নৌ-বাহিনীর ঘাটির মধ্যবর্তী প্রধান সড়কের টাইগার পাস এলাকা দখল করে নেয় এবং নগরীর কেন্দ্রস্থলে সার্কিট হাউসে তাদের সদর দফতর স্থাপন করে। কুমিরায় যে শত্রুদলটিকে আমরা প্রতিহত করেছিলাম তারাও এসে ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। আমাদের সেখানকার সৈন্যরা সরে এসে হালিশহরের প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহে অবস্থান নেয়। হালিশহরে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ দু'ভাবে কাজে লাগছিলো। প্রথমত, এই প্রতিরক্ষা ছিল বিমানবন্দর, নৌ-বাহিনীর সদর দফতর এবং পোর্ট এলাকায় শত্রুদের জন্য আসার পথে হুমকিস্বরূপ। দ্বিতীয়ত, শত্রুদের প্রধান অংশে আঘাত পরিচালনার জন্যও দৃঢ় ঘাঁটি হিসেবে এটা কাজে লাগছিলো। পশ্চিমঘাটে ইপি-আর সৈনিকদের কালুরঘাটে আটকানো না হলে পোর্ট, বিমানবন্দর এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর আক্রমণ এবং দখল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো এবং তাহলেই যুদ্ধের গতিধারা পাল্টে যেতো। পোর্ট এলাকা থেকে শত্রুসৈন্যরা দিনের বেলায় কয়েকবারই আগ্রাবাদ রোড পরিস্কার করে টাইগার পাস দিয়ে নৌ-ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু তীব্র প্রতিরোধের মুখে প্রত্যেকবারই তাদের পিছু হটতে হয়। শত্রু হাওয়া মরিয়া হয়ে অগ্রসর হলে সড়কটি দখল করতে পারতো। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় এই ধরনের সংঘর্ষে লোকক্ষয় ছিলো অবশ্যসম্ভাবী। লোকক্ষয় এড়ানোর জন্যেই তারা সাময়িকভাবে এই প্রচেষ্টা স্থগিত রেখে কুমিল্লা থেকে অগ্রসরমান সৈন্যদের দেওয়ান হাট উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

দামপাড়া পুলিশ লাইনের বাঙালী পুলিশরাও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুসৈন্যদের প্রতিরোধ করছিলো। কিন্তু যুদ্ধের পুরো ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা না থাকায় তারা বেশীক্ষণ টিকতে পারেনি। সংঘর্ষে বহু বাঙালী পুলিশ হতাহত হয়। শত্রুদের ক্রমাগত চাপের মুখে বাঙালী পুলিশদের স্থানটি পরিত্যাগ করতে হয়।

পরদিন ২৯শে মার্চ। সকালে শত্রুসৈন্যরা আগ্রাবাদ রোড অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং একটি দলকে তারা মাদারবাড়ী ও আইস ফ্যাক্টরী সড়ক হয়ে নিউ মার্কেটের দিকে পাঠিয়ে দেয়। নিউমার্কেটে অবশ্য আমাদের লোক ছিলো না তাকে আমি এক প্লাটুন শক্তিসম্পন্ন একটি দলকে (প্রায় ৩০জন) ঐ এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান কোর্ট ভবন দখলে রাখার জন্য পাঠিয়েছিলাম।

শত্রুদের আরেকটি দল ষ্টেডিয়ামের বিপরীত দিকের নৌ-ভবন থেকে বেরিয়ে পি, আই, এ অফিসের নিকটবর্তী একটি লেনের মধ্য দিয়ে ডিসি হিলের দিকে এগোতে থাকে। কয়েকজন পথচারী তাদের সামনে পড়লে পাকিস্তানীরা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর একস্থানে থেমে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় এবং দ্রুতগতিতে পাহাড়ের উপর উঠে সমগ্র এলাকাটি বিনা বাধায় দখল করে নেয়। কোর্ট বিল্ডিং-এ তখন আমাদের সৈন্যরা পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষমান। তারা গভীরভাবে সাহায্যের প্রত্যাশা করছিলো। এবং সাহায্য করলেই যে কোন মূল্যে তারা শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারতো।

এইদিন বিকালে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি জাকির হোসেন রোডে একটি এ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য মেডিকেল কলেজে ফোন করে। এ পর্যন্ত মেডিকেল কলেজ আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলো। কলেজের নিকটেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রবর্তক হিলে আমাদের কিছু সৈনিক মোতায়েন ছিলো। আমাদের আহত সৈনিকদের নিয়ে মেডিকেল কলেজের ডাক্তার, নার্স এবং ছাত্রছাত্রীরা সকলেই দিনরাত ব্যস্ত ছিল।

পূর্ব কথিত এ্যাম্বুলেন্সটি ফিরে আসতেই ডাক্তার এবং নার্সরা দ্রুত বেরিয়ে আসেন। কিন্তু এ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলতেই বেরিয়ে আসে একদল শত্রুসৈন্য, হাতে তাদের উদ্যত হাতিয়ার। ক্ষিপ্ততার সাথে তারা হাসপাতাল ভবনের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। সন্ধ্যা নাগাদ আরো একদল শত্রুসৈন্য এসে অবস্থান রত সৈনিকদের সাথে যোগ দেয়। কর্মচঞ্চল হাসপাতাল ভবন এবং পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকায় নেমে আসে এক বিষন্ন নীরবতা।

হালিশহর এবং কোট ভবন, এ দুটি স্থানে তখনো আমাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি ছিলো। তা ছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে আমাদের ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দলগুলো তখনো শত্রুসেনাদের মোকাবিলা করছিলো। কিন্তু শেষে কুমিল্লা থেকে নতুন শত্রুদল দেওয়ানহাট ক্রসিংয়ের কাছে পৌঁছে গেলে আগ্রাবাদ এলাকা থেকে আমাদের সৈন্যদের হালিশহর ঘাটিতে সরে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। শহরের অর্ধেক জনসংখ্যা ততক্ষণে গ্রামের দিকে চলে গেছে। অনেকে সরাসরি সীমান্তের দিকেও চলে যায়। সকলেই কেমন যেনো হতাশ হয়ে পড়ে। জনসাধারণ ঠিকই ভেবেছিলো যে, কোনোরূপ সাহায্য ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ আমাদের পক্ষে দেরি হবে। কারণ ইতিমধ্যেই তারা দেখছে আমাদের সৈন্যরা ভীষণ অসহায় অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করছিলো। আমাদের গোলাগুলির সরবরাহ ছিলো খুবই কম। একজন সৈনিকের হাতের অস্ত্র একেজো হয়ে গেলে তাকে নতুন অস্ত্র না দেয়া পর্যন্ত সেই সৈনিকটিই একেজো হয়ে পড়ে। কেউ আহত হলেও তার প্রাথমিক চিকিৎসা কিংবা তাকে অন্যত্র স্থানান্তরের তেমন কোন ব্যবস্থা আমাদের ছিলো না। এমনকি একপর্যায়ে প্রয়োজনীয় পানি ও খাদ্য সরবরাহেরও কেউ ছিলো না। আমার ট্যাকটিক্যাল হেডকোয়ার্টারে অয়্যারলেস কিংবা আধুনিক কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না থাকায় বিভিন্ন রনঙ্গনে যুদ্ধরত সৈনিকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে পারিনি। ফলে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত হওয়া এবং সে অনুসারে নতুন নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া যাতায়েতের জন্য যানবাহন সমস্যাও ছিলো প্রকট। আমরা যোগাযোগ এবং পরিবহনের অভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বেশী। কুমিরায় আমাদের অবস্থান বিপন্ন হওয়ার সংবাদ একজন সংবাদ বাহকের মারফত তিন ঘন্টা পর পাই। সংবাদ পাওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই আমি নতুন কিছু সৈন্য কুমিরার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা কুমিরার দুই মাইল দূরে পৌঁছানোর পূর্বেই কুমিরার পতন ঘটে। আমাদের সৈন্যরা ততক্ষণে হালিশহরের দিকে ফিরে আসতে থাকে। আরেকটি সংকট ছিলো ট্রেনিংপ্রাপ্ত শত্রু সৈন্যদের সাথে যখন অব্যাহতভাবে নতুন নতুন সৈন্য এবং অত্যাব্যশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ যোগ হচ্ছিলো, আমি তখন অসহায়ভাবে তা দেখছিলাম। একইভাবে দল বেধে আমাদের সামরিক লোকজনও শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো।

আমি যে কয়জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলাম তার সঙ্গে একজনও নতুন সৈনিক কিংবা একটি মাত্র বুলেটও যোগ করতে পারিনি। ক্রমাগত শত্রুসৈন্যর মোকাবেলা করে আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো। অনেকেই ২৫ তারিখের রাত থেকে এ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ বন্ধ করতে পারেনি। আমার রেলওয়ে হিলের ঘাঁটি সার্কিটহাউস এলাকা, মেডিকেল কলেজ, ডি সি হিল এবং হালিশহর ও কোট বিল্ডিংয়ের যুদ্ধে আমি নতুন সৈন্য ও অস্ত্র সরবরাহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় হতাশ হয়েছি বারববার। আর এই প্রত্যাশা যুদ্ধের সেই পর্যায়ে আমার সৈন্যদের অবসাদগ্রস্ত করে তোলে সাময়িকভাবে।

\ চট্টগ্রাম শহরে চূড়ান্ত লড়াই \

৩০শে মার্চ। শহরে তখন কারফিউ চলছে। খুব ভোরে এক ভদ্রলোক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে অস্থিরভাবে অনবরত টেলিফোন করছিলেন। একটু আগে জানালা দিয়ে তিনি নারকীয় দৃশ্য দেখেছেন। একটি গাছের ওপর বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল। কয়েকজন পাকসেনা কিশোর বয়সের একটি ছেলেকে সেই পতাকাটি নামিয়ে ফেলতে বলে। ছেলেটি অনিচ্ছাস্বত্বেও গাছ বেয়ে উপরে উঠে এবং পতাকাটি খুলে আস্তে আস্তে ভাজ করতে থাকে। ঠিক এ সময়ে নিচ থেকে সৈন্যরা অত্যন্ত সুস্থ মস্তিস্কে তার দিকে রাইফেল তাক করে গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ ছেলেটি বৃন্তচ্যুত ফুলের ন্যায় নিচে পড়ে যায়। সৈন্যরা হো হো করে হেসে ওঠে এবং সে স্থান ত্যাগ করে।

কোনো এ্যাম্বুলেন্স কিংবা অন্য কেউ কিশোরটির সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। হাসপাতালের সবকটি গাড়িই পাকিস্তানী সৈন্যদের বহন করছিলো। বসন্ত পুরো হাসপাতালটিই মিলিটারী ক্যাম্পে পরিণত হয়েছিলো। বাঙালী ডাক্তার, নার্স এবং অধিকাংশ রোগী ইতিমধ্যেই হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন। আর রক্তপিপাসু দানবদের হাত থেকে পালাতে যারা একেবারেই অসমর্থ তারা অসহায়ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

প্রতিদিনের ব্যস্ত বিপণী কেন্দ্র নিউমার্কেট এলাকা সেদিন একেবারে চূপচাপ। দুপুরের মধ্যে পাকসেনারা পোর্টের দিক থেকে বরফকল সড়ক হয়ে এখানে পৌঁছে যায় এবং সদরঘাট, রেলওয়ে স্টেশন এবং স্টেডিয়ামের দিকে তারা অগ্রসর হতে থাকে। ছোট একটি দল কোর্ট হিলের দিকেও পা বাড়ায়। কিন্তু হিলে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যদের বুলেট বৃষ্টিতে পাকিস্তানীদের পিছু হটে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হয়।

একই দিন হালিশহরেও সকাল ৮টা থেকে সংঘর্ষ চলতে থাকে পাকিস্তানিরা মরিয়া হয়ে কামান দেগে চলছিলো। নৌ-বাহিনীর সবগুলো কামানই তখন সক্রিয় ছিলো ক্রমাগত দীর্ঘ ৬ঘন্টা যাবত তারা হালিশহরের ওপর গোলাবর্ষণ করে। কামানের ছত্রছায়ায় শত্রুরা হালিশহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইপি-আর সেনাদের দুঃসাহসী পাল্টা আক্রমণের মুখে অগ্রগতি লাভে ব্যর্থ হয়ে শত্রুরা বিমান বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করে। আধ ঘন্টার মধ্যে দুটি বিমান চলে আসে। এবং বেলা সড়ে বারোটা থেকে আমাদের অবস্থানের উপর ক্রমাগত বিমান হামলা চালাতে থাকে। আমাদের কোন বিমানবিশেষায়ী হাতিয়ার ছিলো না। সেই সময় নিজেদের কোন বিমান থাকারও কথা নয়। তাই শত্রুবিমানগুলো আকাশে তাদের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নির্বিঘ্নে আমাদের ওপর বোমা বর্ষণ করতে থাকে। তারা তাদের ইচ্ছেমতো রণাঙ্গনের ওপর আঘাত হানতে থাকলো। পরিস্কার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে শত্রুর বিমানগুলো একটার পর একটা ট্রেঞ্চ দেখে দেখে স্ট্যাম্পিং করে চলছিলো। আমাদের বীর সেনানিরাও প্রাণপনে ঘাটি আকড়ে লড়াই করতে থাকলো। লড়াই করতে করতে অনেকেই ট্রেঞ্চের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলো। আহতও হলো অনেক। কিন্তু অবিরাম বোমা বর্ষণের ফলে তাদের অপসারণ করাও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যুদ্ধরত বাকী সৈন্যরাও বুঝতে পারলো তাদের আর বেশীক্ষণ হালিশহর রক্ষা করা সম্ভব হবে না। গোলাগুলির মজুতও নিঃশেষ প্রায়। তারা রাইফেলের ওপর বেয়োনেট লাগিয়ে নিচের শত্রুদের সাথে হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো।

বিকালের মধ্যে শত্রুরা হালিশহর দখল করে নিলো। হাতাহাতি যুদ্ধ চলছিলো আধঘন্টার মতো। শত্রুসৈন্য সংখ্যাধিক্যের ফলে চূড়ান্ত ফলাফল কি হবে তা বোঝা গিয়েছিলো। আমাদের সৈন্যরা পেছনে এসে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করলো। সহযোগীদের লাশও ফেলে আসতে হলো।

হালিশহর পতনের পর শত্রুদের পুরো দৃষ্টি পড়লো কোর্ট হিলের ওপর। এটাই ছিলো শহরে আমাদের সর্বশেষ ঘাটি, সর্বশেষ আশা। বিভিন্ন দিক থেকে অবস্থানটির ওপর কয়েকবারই হামলা হলো। কিন্তু প্রতিবারই আমাদের সৈন্যরা তা প্রতিহত করে। এরপর এলো ট্যাংক বহর। অগ্রবর্তী ট্যাংকটি পাকা রাস্তা বেয়ে ওপরের দিকে উঠতেই আমাদের সৈন্যদের ট্যাংকবিশেষায়ী শেলের আঘাতে তা অকেজ হয়ে পড়লো। ট্যাংকটি অকেজো হয়ে থেমে পড়লে পেছনে অন্যান্য ট্যাংক এবং পদাতিক সৈন্যরা কিছুটা থমকে দাড়াইলো। এ সময় সম্ভবত আমাদের শক্তির পরিমাপ করছিলো। ইতিমধ্যে অবশ্য শত্রুসৈন্য আমাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলো। আমাদের সৈনিকদের তখন গোলাবারুদ নিঃশেষ প্রায় এবং বাইরের সাথে সকল প্রকার সংযোগও প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলো। অদূর ভবিষ্যতে নতুন করে কোনো সাহায্য লাভের সম্ভাবনাও ছিলো না।

২রা এপ্রিল ভোরে শত্রুরা আবার হামলা শুরু করলো। হামলা ছিলো সুপরিকল্পিত। মাত্র ৩০জন সৈনিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো পাকিস্তানীদের পুরো একটি ব্যাটালিয়ন। দুটি কোম্পানী মিলে প্রথম আঘাত হানলে তা সাফল্যের সাথে প্রতিহত করা হয়। এরপর আরো জোরদার হামলা চলতে থাকে। দুটি সংরক্ষিত কোম্পানী এবার অন্য দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। মারাত্মক গুলিবর্ষণের ছত্রছায়ায় এরা একটু একটু করে পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এদিকে আমাদের প্রতিরোধকারী সৈন্যদের গোলাগুলি নিঃশেষ হয়ে যায়। একমাত্র ট্যাংকবিশেষায়ী অস্ত্রটিও অকেজো হয়ে পড়ে। পদাতিক বাহিনীর আগে আগে এ সময় দুটি ট্যাংক উপরে উঠে আসে। বলতে গেলে অলৌকিকভাবে সেদিন আমাদের সৈনিকদের প্রায় সবাই সে অবস্থান ত্যাগ করে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো। এভাবেই কোর্ট হিলের পতন ঘটলো এবং সাথে সাথে অনির্দিষ্টকালের জন্য চট্টগ্রাম নগরীও আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো। তখন সময় ছিলো বেলা সাড়ে ১২টা। মাত্র ৩০জন ইপি-

আর-এর দুর্জয় সৈনিক শত্রুপক্ষের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য শক্তির অব্যাহত শেলিং এবং উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে ৩ দিনেরও বেশী সময় তাদের অবস্থান আগলে রেখে ছিলো। কাজেই এই পরাজয় তাদের অদম্য সাহস ও বিক্রমের মহিমাকে স্মান করে দিতে পারে না।

\ ভারতের সাথে যোগাযোগ \

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই আমি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করার জন্য রামগড় যাই। সেখান থেকে সাবরুম গেলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বি এস এফ) অফিসাররা আমার সঙ্গে কথা বলেন এবং অবিলম্বে আগরতলার নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজনবোধে ভারতীয় রাজধানীতে যাওয়ার ব্যবস্থাও তারা করে রাখেন।

২রা এপ্রিল আমি আগরতলা পৌঁছালে সরাসরি আমাকে বিএসএফ-এর সিনিয়র অফিসার মিঃ কালিয়ার অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি তার কাছে আমাদের লড়াইয়ের অবস্থা বর্ণনা করে সামরিক সাহায্যের অনুরোধ জানালাম। মিঃ কালিয়া অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন বিধায় আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর ছিলো না। আমাকে আগরতলার এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেখানেই এক কক্ষে আমি সারাদিন রইলাম। সেখানে সাদা পোশাক পরিহিত কয়েকজন ভারতীয় অফিসার পর্যায়ক্রমে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা আমার কাছে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান, তাদের শক্তি, কোন ধরনের অস্ত্র তারা ব্যবহার করছে ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করলেন। তারা আমার অতীত জীবন এবং কি কারণে আমি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলাম সে বিষয়েও প্রশ্ন করলেন, ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, পাকবাহিনীর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং স্বাধীনতা অর্জনে আমরা কি কি উদ্যোগ নিয়েছি তাও জানতে চাইলেন।

এদের সঙ্গে আমার আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিকতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তারা খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তবে এদের আলোচনার ধারা থেকে আমি বুঝতে পারি, এরা সকলেই ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং বি এস এফ-এর গোয়েন্দা বিভাগের লোক। পরের দিন নেতৃস্থানীয় ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হলো। বিকালের দিকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন সিং-এর সঙ্গে আমি বৈঠকে মিলিত হলাম। তার আচরণও ছিলো বন্ধুসুলভ। তার কাছেও আমি অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু জরুরী জিনিসপত্রের জন্য অনুরোধ জানাই।

মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, দিল্লী থেকে জবাব এলেই তিনি আমার জন্য কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এ সময় আমাকে দরকার হলে দিল্লী যাবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে বলা হলো।

পরদিন চট্টগ্রাম জেলার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা আগরতলা পৌঁছলেন। তাদের নিয়ে আমি পুনরায় শ্রী শচীন সিং-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, ৯২তম বি এস এফ ব্যাটালিয়ন থেকে জরুরী ভিত্তিতে আমি কিছু অস্ত্রশস্ত্র পেতে পারি। আমার অন্যান্য জিনিসপত্রের চাহিদা সম্পর্কেও তাকে অবহিত করতে বললেন। আমি তার কামরার এক কোনায় বসে প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ফেলি। আওয়ামী লীগ নেতাদের হাতে সেটি তুলে দিয়ে আমি তখনই চট্টগ্রামের পথে আগরতলা ত্যাগ করলাম। পথে ৯২তম বি এস এফ এর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি ততক্ষণে আমাকে কয়েকটি লাইন মেশিনগান, রাইফেল, হ্যাণ্ডগ্রেনেড এবং কিছু গোলাবারুদ সরবরাহ করার জন্য তার ব্যাটালিয়নকে নির্দেশ দিয়ে ফেলেছেন এবং সেগুলো ইতিমধ্যেই সাবরুম থানায় পৌঁছানো হয়ে গিয়েছিলো। জিনিসগুলো আমাকে দেয়ার জন্যে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে বি-এস-এফ এর ক্যাপ্টেন মেহেব সিংকে আমার সঙ্গেই পাঠানো হয়।

চট্টগ্রাম শহরের ওপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানীরা গ্রামাঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানীদের একটি কলাম হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, নারায়ণহাট এবং হিয়াকু হয়ে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হয়। অপরদিকে রাজমাটি কাণ্ডাই, এবং কক্সবাজারের দিকেও একটি করে কলাম অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় আমরা গ্রামাঞ্চলের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রন বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত নিই। এ উদ্দেশ্য সাধন কেবল শত্রু সৈন্যদের শহরাঞ্চলে কোণঠাসা করে রাখার মাধ্যমেই সম্ভব ছিলো। এভাবে সুসংগঠিত গেরিলা যুদ্ধেও মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শত্রুর শক্তিক্ষয় করে তাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানাই হবে সঠিক পদক্ষেপ। এটা আমাদের কাছে পরিস্কার ছিলো যে, এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আমাদেরও হারাতে হবে অসংখ্য অমূল্য জীবন। আমাদের সামনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিলো না। এ জন্য অবশ্য জনসাধারণকে ও সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

রামগড় থেকে দুটি ইপি আর প্লাটুনকে চট্টগ্রাম শহরের প্রায় ছয় মাইল দূরে ভাটিয়ারি এবং ফৌজদার হাটের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছিলো। অন্য দুটি ইপি আর প্লাটুনকে ফটিকছড়ি হাটহাজারী হয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে সহযোদ্ধাদের সাহায্যে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন হারুন এবং আরো কয়েকজন অফিসার ৬টি কোম্পানী নিয়ে কালুরঘাট সেতুর নিকটেই প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিলো। ঠিক এ পর্যায়ে চোঁঠা এপ্রিল আমরা ভারত থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রথম সরবরাহ পাই। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এ সময় আমাদের পুরো বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালী সদস্যদের গুরুত্বহীন স্থান থেকে সরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ফ্রন্টগুলোতে পাঠানো হল। ক্যাপ্টেন মতিন এবং লেফটেন্যান্ট এজাজের নেতৃত্বে একরূপ দুটি কোম্পানী ভারতীয় এলাকা দিয়ে। শতাধিক মাইল দূরে চট্টগ্রাম সেট্টরকে শক্তিশালী করার জন্য সেখানে পৌঁছে। আমাদের দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ এদের একটি কোম্পানী ভাটিয়ারী অভিমুখে রওয়ানা হয়। এবং অন্য একটি কোম্পানীকে নিয়ে আমি হিয়াকু, ফটিকছড়ি হয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে অগ্রসর হই। এটা ছিলো এক কষ্টসাধ্য অভিযাত্রা। রাস্তা ছিলো অত্যন্ত খারাপ। যান্ত্রিক কনভয় বলতে ছিলো দ্বিতীয়। বিশ্বযুদ্ধকালের কয়েকখানী জীপ, আর এই জীপ গুলোকে প্রায় অর্ধেক পথই আমাদের ঠেলে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। আমাদের এই চলাচলের খবর গোপন রাখার উপায় ছিলনা। কারণ, যেমন দিনের বেলায় আমাদের চলতে হচ্ছিলো। তেমনি আবার ভারতের পথে পলায়নপর ভীতসন্ত্রস্ত অসংখ্য জনসাধারণ একই পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল। যদিও আমরা সবাই বেসামরিক পোষাকে ছিলাম। এবং অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলাম, তথাপি শত্রুবলিত একটি শহরের দিকে কিছুসংখ্যক লোকের সুসংগঠিত হয়ে চলার ভাব দেখে আশঙ্কা ও হতাশায় নিমজ্জিত লোকদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়। আত্মসমুষ্টি লাভের জন্য তারা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুন বাড়িয়ে শহরের দিকে তাদের যাত্রার কথা যেভাবে বলাবলি করছিলো সে খবর দ্রুত শত্রু ঘাঁটিতে পৌঁছে যায়।

নারায়ণহাটে পৌঁছে আমরা সন্ধান পরবর্তী যাত্রার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। রাতের সামান্য আহার গ্রহণ করি। নারায়ণহাট থেকে আমাদের মুক্তি সেনাদের নাজিরহাট পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কয়েকটি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়। আকাশ ছিলো মেঘাচ্ছন্ন অন্যদিকে নৌকাগুলোরও কোন ছই ছিলো না। ক্লান্তিতে অবসাদে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। কিছুক্ষণ পর মুঘল ধারায় বৃষ্টি নেমে আসে। আমরা বৃষ্টিতে ভিজে উন্মুক্ত আকাশের নীচে শীতে কাপতে থাকি। নাজিরহাট পৌঁছাতে ভোর হয়ে গেল। এখানেই খবর পেলাম ক্যান্টনমেন্টের নিকট আমাদের যে সেনাদল ছিলো শত্রুর আক্রমণে তারা পিছু হটে হাটহাজারীর দিকে চলে গেছে। নাজিরহাট পৌঁছেই আমাদের জন্য একটি সম্ভাব্য ঘাঁটি খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে দ্রুত পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করি। খোজাখুজির পর কয়েক মাইল দূরে উদালিয়া চা বাগানই উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারণ করি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দিকে রওয়ানা হলাম। বাগানের ম্যানেজার আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানালেন। সকল প্রকার সাহায্যের তিনি ব্যাবস্থা করেছিলেন।

সীতাকুন্ড পাহাড় শ্রেণীর একটি বিচ্ছিন্ন ছোট পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠেছে উদালিয়া চা বাগান। সৈন্যদের এখানে ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, খাবারের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজের ভার দেয়া হলো। এ্যাকশন গ্রুপকেও সদা প্রস্তুত রাখা হলো, যাতে তারা স্বল্পকালীন সময়ে শত্রুর মোকাবিলায় দ্রুত রওয়ানা হতে পারে। প্রয়োজনবোধে বিকল্প ঘাঁটি স্থাপনের স্থানটিও দেখে রাখা হয়। রক্ষাব্যুহ নির্মাণের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হলে এই স্থানের দায়িত্ব লেফটেন্যান্ট এজাজের ওপর ন্যস্ত করে আমি কালুরঘাটের দিকে অগ্রসর হই।

কালুরঘাটের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে অধিকাংশই ছিলো ইপিআর সৈনিক। প্রাথমিক পর্যায়েই আমি যখন চট্টগ্রাম শহরে পাকসেনাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। তখনই আমার সংগে যোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রামের সীমান্ত ফাড়িগুলো থেকে আগত ইপি-আর সৈনিকদের অগ্রযাত্রা মেজর জিয়া থামিয়ে দেন। ইপি আর সৈনিকদের তিনি কালুরঘাটে রেখে দিয়েছিলেন। ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কিছু সৈন্যকেও এখানে রেখে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে কালুরঘাটে তখন ৬টি কোম্পানী ছিলো যার সৈন্য শক্তি ছিলো প্রায় এক হাজার।

আমি যখন চট্টগ্রাম শহর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নতুন লোকবল ও অস্ত্রবলের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিলাম তখন আমারই নির্দেশে আগত ইপি-আর সেনাদের কালুরঘাটে আটকে রাখা হয়। আমাদের সৈন্যদের কালুরঘাটে না থামিয়ে আমার সঙ্গে শহরের যুদ্ধে যোগ দিতে দেয়া হলে আমরা সাফল্যের সাথে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর, বিমান বন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে পারতাম। এর ফলে পাকিস্তানীরা আর নতুন সৈন্য আনতে পারত না এবং আমরাও সেখানে তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারতাম। সে ক্ষেত্রে আমাদের যুদ্ধের ইতিহাস হতো সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

কি কারণে জানিনা, কালুরঘাট যুদ্ধ হয়েছিলো দুই সপ্তাহ পরে এবং এই দুই সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের এখানকার সৈন্যরা প্রায় কোন কাজেই লাগেনি। আমাদের তরুণ অফিসাররা দুর্জয় মনবল এবং অদম্য সাহসের সংগে এখানে লড়াই করলেও সৈন্যরা কিন্তু যোগ্য সিনিয়র অফিসারের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছিলো। অবশ্য আমাদের সিনিয়র অফিসারদের সংখ্যাও তখন খুব বেশী ছিল না। এদের মধ্যে আবার মেজর শওকত কব্বাজার চলে গিয়েছিলেন। ভুল খবরের ভিত্তিতেই এটা হয়েছিল। তারপর তিনি নিজেই কব্বাজার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে কালুরঘাটে আমাদের সৈন্যদের সাথে যোগ দেন।

এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র তেমন ছিলো না। ৩০৩ রাইফেল ছাড়া আর ছিল কয়েকটি হালকা মেশিনগান এবং দুটি ৩” মর্টার। ইপি-আর মর্টার জেসিও দুটি মর্টার দিয়েই অবিস্থাস্য কাজ করেছিলেন। মাত্র কয়েক রাউন্ড মর্টার শেল দিয়েই তিনি শত্রুসৈন্যদের একাধিক জায়গায় ব্যস্ত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি একাই দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে বিভিন্ন জায়গা থেকে মর্টার দাগতে থাকলে আমাদের মর্টারের সংখ্যা ঠিক কত পাকিস্তানীরা তা অনুমান করতে ব্যর্থ হয়। আমাদের প্রতিরোধের দুর্জয়তায় শত্রুরা বারবারই পিছু হটেতে বাধ্য হয় এবং পরিশেষে প্রায় দুসপ্তাহ পরে ১১ই এপ্রিল কালুরঘাটের যুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ নেয়। কালুরঘাট সংঘর্ষে আমরা কেবল সৈনিকই হারাইনাই দুজন অফিসারও সেই সংকটকালে আহত হয়েছিল। ক্যাপ্টেন হারুন গুরুতর অবস্থায় বার্মায় আশ্রয় নিলেন, আর লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন গুরুতর আহত অবস্থায় পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হলেন।

কালুরঘাট অবস্থান পরিদর্শনের পর আমি আবার রামগড় হয়ে ঘুরে কুমিরার দিকে অগ্রসর হই। কুমিরার সৈন্যদের জন্য আরো কিছু অস্ত্রশস্ত্র লাভের উদ্দেশ্যে রামগড়ে আমাকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। রামগড়ে মেজর জিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হলে তাকে আমি কালুরঘাট অবস্থানের আসারতার কথা বলি। তারপর কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে সোজা কুমিরার পথে রওনা হই। কুমিরায় তখনো আমাদের সৈন্যরা শত্রুর সাথে মরণপণ লড়ে যাচ্ছিল।

\ প্রথম বাংলাদেশ সরকার \

৪ঠা এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরের পতন ঘঠলে পাকিস্তানীরা ক্রমান্বয়ে কালুরঘাট সেতুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১০ই এপ্রিলের মধ্যে সেতুর নিকট তারা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে তোলে। এই সময় শত্রুরা ছিলো আক্রমণমুখী এবং আমাদের ভূমিকা ছিলো আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থাকতে থাকতে আমাদের সৈন্যরা উদ্যম হারিয়ে ফেলছিলো।

১১ই এপ্রিল সকাল ৮টায় শত্রুপক্ষের গোলান্দাজ বাহিনী কালুরঘাট অবস্থানের ওপর আক্রমণ শুরু করে। নৌ-বাহিনীর কামানগুলো থেকেও গোলাবর্ষণ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন হারুন এবং লেফটেন্যান্ট শমসের সেতুর পশ্চিম পার্শ্বে (শহরের দিকে) অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে ছিলেন। আমাদের প্রধান অবস্থান ছিলো সেতুর পূর্ব পার্শ্বে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুদের গোলাবর্ষণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই গোলাবর্ষণের ছত্রছায়ায় পাকিস্তানীরা সম্মুখযুদ্ধেও প্রস্তুতি নিয়ে সেতুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দ্রুত থেকে হারুন শত্রুপক্ষের অস্বাভাবিক তৎপরতা লক্ষ্য করে শমসেরকে বলল তোমার বাইনোকুলারটা দাও তো। ওদের অবস্থানটা দেখি। কথা শেষ না হতেই হারুন তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল। তীব্র যন্ত্রণায় হারুন কুকড়ে যাচ্ছিলো। লাইট মেশিনগানের এক ঝাক গুলি তাকে বিদ্ধ করেছে। দুজন ছাত্র তাড়াতারি হারুনকে ধরে সেতুর গোড়ায় নিয়ে এলে সে নিজেই প্রায় দৌড়ে সেতু পার হয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে যায়। তাকে একটি মাইক্রোবাসে পটিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর অল্পক্ষণ পরেই শমসেরের হাটুতে গুলি লাগলে সেও অচল হয়ে পড়ে। তখন তার প্রায় চারপাশেই লড়াই চলছিলো। শমসের শত্রুদের হাতে বন্দি হয়। দুজন অফিসারকে হারিয়ে আমাদের সৈন্যদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। তারা ঘাঁটি ত্যাগ করে পিছনে হটেতে শুরু করে। সেদিন বিকাল নাগাদ কালুরঘাটে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং আমাদের সৈন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পথ ধরে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

পথে মহালছড়িতে হঠাৎ পাকিস্তান বাহিনীর কমান্ডো কোম্পানীর সাথে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। পাক বাহিনীর সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদী মিজোরাও ছিল। পাকিস্তান সরকার এইসব মিজোদের আশ্রয় এবং ট্রেনিং দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতায় সহায়তা করতো।

উদালিয়া চা বাগানে আমাদের যে কোম্পানী ঘাঁটি স্থাপন করেছিলো পাকিস্তানীদের তীব্র আক্রমণে তাদের সে এলাকা পরিত্যাগ করতে হয়। ওদিকে চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের কুমিরায় তখন প্রচণ্ড লড়াই চলছিলো। চট্টগ্রামের দিকে শত্রু অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের যে সৈন্যরা সেখানে অবস্থান গ্রহন করেছিলো শত্রু বাহিনী পর্যবেক্ষণ বিমানের সহযোগিতায় তাদের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। গোলাবর্ষণে আমাদের পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আরো রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্য আমাদের সৈন্যরা সীতাকুণ্ডুতে সরে আসে। শত্রুসৈন্যের আগমন বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যেই সেখানে আমাদের অল্প কয়েকজন সৈন্য থেকে যায় এবং এই অবসরে বাঙালী সৈন্যরা তাদের সীতাকুণ্ডু ঘাটি সুদৃঢ় করে গড়ে তোলে। কিন্তু ১৬ই এপ্রিলের মধ্যে শত্রুরা আমাদের সীতাকুণ্ডু অবস্থানের ওপর আঘাত হানে। তারা গোলান্দাজ বাহিনীর সহায়তায় কয়েক দফা হামলা চালায়। নৌ-বাহিনীর কামানগুলো তখন ব্যাপক ভাবে গোলাবর্ষণ করছিলো। তবুও আমাদের সেনারা পাল্টা আঘাত হেনে শত্রুপক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে।

বাংলাদেশে প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে তখন ছড়িয়ে পড়েছে। এই সময়ে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় আমবাগানে বাঙালীর জীবনে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা ঘটে যায়। দিনটি ছিল এপ্রিলের ১৭ তারিখ। ঐদিন সকাল আনুমানিক ৮টায় জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কর্ণেল (অবঃ) এম,এ,জি ওসমানী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা বৈদ্যনাথ তলা এসে পৌঁছান। নেতৃবর্গের বসার জন্য

পাশের গ্রামগুলো থেকে কিছুসংখ্যক চেয়ার জোগাড় করা হলো। সেসব চেয়ারের অধিকাংশের হাতল ছিল না। বেলা ১১টার মধ্যে অন্যান্য নেতারা পৌঁছে গেলেন। পাশ্চাত্যী এলাকার লোকজন এবং জনা পঞ্চাশেক বিদেশী সাংবাদিকও সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা আত্মকাননে উপস্থিত হলেন। এদের সমানেই সেদিন গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শেখ মুজিবের নামানুসারে এ জায়গাটির নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। শেখ মুজিবর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম হন উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাক সামরিক জান্তার কারাগারে বন্দী। ইপিআর এর একটি প্লাটুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

এদিকে ১৮ই এপ্রিল শত্রু বাহিনী আমাদের সীতাকুন্ড অবস্থান ছত্রভঙ্গ করে দিলে এখান থেকে আমাদের সৈন্যদের মিরেশ্বরহাটে পশ্চাদপসরণ করতে হলো। আমরা জানতাম মিরেশ্বরহাটেও আমরা অল্প কিছু দিনের জন্য থাকতে পারবো, তারপর আবার সরে যেতে হবে। এই দুঃখজনক অবস্থা কতদিন চলবে তা কারো জানা ছিল না। সৈন্যরাও ক্রমে আস্থা হারিয়ে ফেলছিল। কোন অবস্থান প্রতিরক্ষায় নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে নিজেরাই সন্দেহান হয়ে উঠছিলো। লোকবল এবং বিপুল অস্ত্রবলের সাহায্যে শত্রুশক্তি প্রতিটি যুদ্ধেই ইচ্ছামতো ফলাফল নির্ধারণ করে চলছিল। এই সংকটময় দিনগুলোতে আমাদের সবচাইতে বেশী দরকার ছিল কিছু ভাল অস্ত্রের। চিরাচরিত পন্থায় যুদ্ধ হচ্ছিল। অস্ত্রবল বৃদ্ধি করতে না পারলে আমাদের জয়ের কোন আশাই ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বাংলাদেশ বাহিনীর কলকাতা হু সদর দফতরটি ছিল রণাঙ্গন থেকে বহুদূরে। সম্ভবতঃ এই দূরত্বের কারণেই যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের চাহিদা সম্পর্কে সদর দফতর কিছুটা উদাসীন ছিলেন। একদিকে আমাদের সামরিক দফতর থেকে বলা হতো ‘যেভাবেই হোক ঘাটি দখলে রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যুহ রচনা কর’। আবার উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র চাইলে জবাব পেতাম, ‘এটা তো গেরিলা যুদ্ধ, ভারী অস্ত্রের তেমন প্রয়োজন নাই।’ ওই জবাব গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কিত বই পড়া জবাব, না, ভারতের কাছে থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহে সরকারের অক্ষমতা তা আমরা জানতাম না। গেরিলা যুদ্ধে উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন নেই। এই উক্তিটি যে কত অসার, সে সময়ের পৃথিবীর অন্যান্য যেসব দেশে গেরিলা যুদ্ধ চলছিল, সেসব যুদ্ধ পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায়। তাছাড়া আমরা শুধু গেরিলা যুদ্ধ করছিলাম না। সাথে সাথে প্রচলিত ধারার লড়াইও আমাদের করতে হচ্ছিল। দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে আমাদের সৈন্যরা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শত্রুশক্তির অগ্রাভিযান প্রতিরোধেরও চেষ্টা করছিল। প্রচলিত প্রথার এই যুদ্ধের পাশাপাশি ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছোট ছোট গেরিলা দলকেও বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো হচ্ছিল।

একাত্তরের যুদ্ধের এই বৈশিষ্ট্য অনেকেই পরিস্কারভাবে বুঝতে পারেননি। তাই আমাদের সরকার এবং সামরিক হেডকোয়ার্টারের কাছে আমাদের সুবিধা অসুবিধাও বোধগম্য হয়নি। সবচাইতে নাজুক অবস্থা ছিল আমাদের- অর্থাৎ সমরক্ষেত্রের কমান্ডারদের, যাঁদেরকে সৈন্যও অফিসারদের কাছে যুদ্ধের ব্যাপারটা বুঝতে হতো। সে সময়ের একটি ঘটনার কথা বলছি। তখন আমি সৈন্য নিয়ে মিরেশ্বরহাট এলাকায় শত্রু সাথে যুদ্ধ করছিলাম। ৩’’ মটার গোলায় ঘাটিতে ছিল আমাদের এবং শত্রু। তখন আমাদের প্রতিরক্ষাব্যুহের ওপর কামান দেগে চলছিলো। শত্রু গোলায় আহত একজন সৈনিক আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি আমাদেরকে কামানের আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের কামান ব্যবহার করছেন না কেন?’ এ প্রশ্নের আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। তবু আমার আশা ছিল, শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য আমি পাবোই। এটা আমার দুরাশা ছিল কিনা বলতে পারিনা। পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করেই আমি যোদ্ধাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

শেষ পর্যন্ত যখন অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছিল না এবং যোদ্ধাদের পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র দেয়া যাচ্ছিল না সে অবস্থায় সৈন্যদের ঘাঁটি আগলে থাকার নির্দেশ দেয়া আমাদের জন্য খুবই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। এতদসত্ত্বেও, আমি আমার বাহিনীকে দৃঢ় মনোবল নিয়ে তাদের অবস্থান রক্ষা করতে বাধ্য করছিলাম। এ ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ ছিল না। কোন কোন সময় মনে হয়েছে সৈন্যদের আমরা গিনিপিগের মতো ব্যবহার করছি। ট্রেঞ্চ বসে

থেকে কেউই প্রাণ হারাতে চায় না। তারা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধই করতে চেয়েছিলো, কিন্তু প্রচলিত যুদ্ধের সুযোগ ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছিল।

২০শে এপ্রিল পাক-সেনাদের দুটি ব্যাটালিয়ন সর্বশক্তি দিয়ে মিরেশ্বরাইয়ের ওপর প্রচণ্ড হামলা চালায়। চূড়ান্ত আঘাত হানার পূর্বে প্রায় ২৪ ঘন্টাই পাক কামানগুলো আমাদের অবস্থানের উপর আঘাত হেনে চলছিলো। মাটি খোড়ার সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক জিনিসপত্র না থাকায় তেমন শক্তিশালি বাংকারও আমরা তৈরী করতে পারিনি। অনেক সময়ই সৈন্যদের বেয়োনেট দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখেছি। উপরের আচ্ছাদন তৈরীর জিনিসপত্রও ছিল না। তাই আমাদের ব্যাংকার এবং ট্রেঞ্চগুলো কামানের গোলায় ভেঙ্গে পরছিলো। খোলা জায়গায় আমাদের সৈন্যরা শত্রুর সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছিলো। যা আশংকা করেছিলাম, শত্রুরা এই সময় এয়ার বাস্ট শেল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। আমাদের সৈন্যরা এই ধরনের হামলার সাথে পরিচিত ছিল না। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় অবস্থান থেকে তারা হটতে শুরু করে। শত্রুশক্ষেও হতাহত কম হচ্ছিল না। পরপর তিন দফা আক্রমণে ওদেরকে শতাধিক সৈন্য হারাতে হয়। আমাদের ট্যাংকবিধ্বংসী গোলায় পাকিস্তানী সৈন্যবাহী আটটি যান প্রায় তিন ঘন্টা যাবৎ জ্বলতে থাকে। মটরযানে অবস্থানরত বেশকিছুসংখ্যক সৈন্যও জ্বলন্ত দগ্ধ হয়। সন্ধার অন্ধকারে আমাদের সৈন্যরা পরবর্তী অবস্থান মস্তাননগরে প্রতিটি রক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এই সময়ে শত্রুশক্ষেও আক্রমণকারী সৈন্যদের সাথে কয়েকটি ট্যাংক এসে যোগ দিলে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে ওঠে।

আমাদের সৈন্যরা মস্তাননগরে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার পূর্বেই সেখানে শত্রুর কামানের গোলা এসে পড়তে থাকে। বাঙ্গালী সেনাদের তখন খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা যাচ্ছিল না। এমনকি গোলাগুলির যোগান দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিলো। তবু তারা শেষ গুলিটি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘাটি আগলে থাকে। শত্রুরা তখন ট্যাংক সামনে নিয়ে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। মস্তাননগরের অবস্থান টিকিয়ে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠলে আমি করেরহাটের কয়েক মাইল দক্ষিণে হিংগুলী এলাকায় সৈন্যদের নিয়ে যেতে মনস্থ করি। এখানে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর একটি খাল থাকায় শত্রুদের দ্রুত আগ্রগমন সম্ভব ছিল না। অগ্রসরমান শত্রুর ট্যাংকের অগ্রযাত্রা থামাতে হলে খালের উপর প্রধান সেতুটি ধ্বংস করা দরকার।

তখন প্রায় মধ্যরাত। আমাদের সৈন্যরা সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন। তবু তারা দ্রুত হিংগুলীতে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গড়ে তোলে এবং পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাতে কারো চোখে ঘুম ছিল না। পাকিস্তানীরা সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল। হিংগুলীর অদূরেই আমরা তাদের যানবাহন এবং ট্যাংকের আওয়াজ পরিস্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমি সেতুটি ধ্বংসের কাজে হাত দিলাম। আমাকে সহায়তা করছিলো বি এস এফ এর মেজর প্রধান।

রাত ৭টা নাগাদ সেতুটি ধ্বংস করার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো এবং মেজর প্রধান সেই রাতেই সাবরুমের পথে রওনা হয়ে গেলেন। আমি তিরিশ সেকেন্ডের একটি ফিউজে আগুন ধরিয়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিই। এক এক করে সেকেন্ড অতিবাহিত হয়, তারপর মিনিট, কিন্তু বিস্ফোরণ আর ঘটলো না। আসলে ফিউজটি খারাপ ছিল। আমার সঙ্গে অতিরিক্ত যে একটি ফিউজ ছিল তাও দেখা যায় অকেজো। ভোর হতে আর মাত্র দুঘন্টা বাকী। এরই মধ্যে সেতু আমাদের ধ্বংস করতেই হবে। তখন আমার সামনে হিংগুলির ২৫মাইল দূরের রামগর থেকে ফিউজ নিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। ট্যাংক এবং অন্যান্য গাড়ি ক্রমশ নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছিল। রাত ৩টা। আমি তখন মরিয়া হয়ে ফিউজের জন্য খবর পাঠালাম। আমাদের নিজস্ব কোন বিস্ফোরকের মজুত ছিল না। ফলে সম্পূর্ণভাবে বি এস এফ এর উপর নির্ভর করতে হতো।

রাতে আমরা দ্রুত হিংগুলি ঘাটিতে অবস্থান করছিলাম। ভোরে আবার তার পুনর্বিন্যাস করার দরকার হবে। ভয় ছিল এই পুনর্বিন্যাসের আগেই শত্রুরা এসে না পড়ে। সেতু ধ্বংস করা যায়নি। ট্যাংক এসে পড়লে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে রামগড় ফেরার পথে মেজর প্রধান খবর পান যে, সেতুটি ধ্বংস করা

সম্ভব হয়নি। এই সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুত কয়েকটি ফিউজ নিয়ে পুনরায় আমাদের হিংগুলি অবস্থানে আসেন। রাত তখন পোনে ৪টা। এসময় রামগড়ের দিক থেকে আমার দিকে অগ্রসরমান একটি জীপের আলো আমার নজরে পড়ে। মেজর প্রধান জীপ থেকে দৌড়ে এসে আমাকে একটি ফিউজ দিয়ে বলেন, এটা আশা করি কাজ করবে। না সেটাতেও কোন কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ ফিউজ কাজ হলো। কর্ণবিদারী বিস্ফোরণের আওয়াজ কয়েকমাইল দূর থেকেও শোনা গেল। সেটুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়াতে আমাদের দুশ্চিন্তার অবসান হলো। আমরা দু'জনে আনন্দে বলে উঠলাম 'চমৎকার'।

শত্রুসৈন্যদের মূল দল তখন মাত্র মাইলখানেক দূরে। এদের পেছনেই ছিলো আর্টিলারী। দিনের প্রথম আলোয় আমরা তাড়াতাড়ি ঘাটি পুনর্বিন্যাসের কাজে হাত দিই।

এই সংকটময় মুহুর্তে কুমিল্লা সেক্টর থেকে পাওয়া আমাদের একটি নিয়মিত কোম্পানীকে অন্য এক যুদ্ধ ফ্রন্টে চলে যেতে হয়। আমার কাছে হিংগুলিতে তখন একশর বেশী লোক ছিল না, যাদের অধিকাংশ ইপি আর পুলিশ ও মুজাহিদ। আমাদের সৈন্যদের বেশীরভাগই মহালছড়ি এবং নরায়ণহাট এলাকার সংঘর্ষে ব্যাপৃত ছিল। আমাদের হিংগুলীর অগ্রবর্তী অঞ্চল ছিল প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল রক্ষা করা অপরিহার্য। কুমিল্লা সেক্টরের কোম্পানীর কাছে কিছু ভাল অস্ত্র ছিল তা তারা নিয়ে গেছে। আমাদের ছিল মাত্র দুটি লাইট মেশিনগান। বাকীগুলো ছিলো সবই সেকেন্ডে ৩০৩ রাইফেল। একটি ৩” মর্টার পাওয়া গেলেও সেটি আপন খেয়ালে চলতো। আমি বুঝতে পারছিলাম মাত্র একশ সৈন্য নিয়ে দুই ব্যাটালিয়ন শত্রুসৈন্যকে নিশ্চয়ই বেশীক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। নরায়ণহাটে সৈন্য চেয়ে আমি যে খবর পাঠিয়েছিলাম তাদের আসতে অন্তত দুদিন লাগবে। এখানে আমাকে এই দুইদিন শত্রুদের ঠেকাতে হবে। শত্রুরা আমার আসল শক্তি সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও আভাস পেলে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে বসতো। সেতুর পূর্বদিকে পাহাড়ী এলাকা পর্যন্ত প্রায় সমতল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঢিবি, টিলা। সৈন্য চলাচলে এগুলো আড়াল হিসেবে কাজে লাগছিলো। এই সমতল এলাকাটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় দুই মাইল। সেতুর পশ্চিম দিকের এলাকা একেবারে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত আমাদের অরক্ষিত রাখতে হচ্ছিল। সৈন্যসংখ্যা বেশি না থাকায় আমি জনা তিরিশের মত লোক নিয়ে তাদের দুভাগে ভাগ করি। এরপর দুদলকে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে পাঠাই। উদ্দেশ্য ছিল, তারা এমনভাবে চলাচল করবে যাতে দূর থেকে শত্রুরা বুঝতে পারে যে, দুটি অঞ্চল জুড়েই আমরা প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করছি। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সামনে এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গুয়ে পড়ে এবং এমনভাবে হামাণ্ডি দিয়ে কোন মাঠ কিংবা ঝোপের পেছনে চলে আসতো যাতে শত্রুরা তাদের পেছনে হটে যাওয়া দেখতে না পায়। এখান থেকে উঠে আবার একটু প্রকাশ্যভাবেই আরেক জায়গায় যেতে থাকে। গোপনে পিছন থেকে এবং প্রকাশ্যে সামনের দিকে যাওয়ার এই প্রক্রিয়া বিভিন্নস্থানে বেশ কয়েকবার করে চলে। এতে শত্রুদের ধারণা জন্মায় যে এক একটি স্থানেই পঞ্চাশ ষাটজন করে বাঙ্গালী সেনা রয়েছে। অথচ আমাদের ছিল মাত্র পনেরজনের মতো। বিকাল পর্যন্ত আমরা কাজটি চালিয়ে যেতে থাকি। দূর থেকে কেউ এ দৃশ্য দেখলে নির্যাত মনে করবে সেতুর উভয় পার্শ্বে আমাদের পনের শত থেকে দুই হাজার সৈন্য প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করছে।

এই অবস্থায় আমাদের বাদবাকী সৈন্যরা সেতুর নিকট রাস্তা কভার করে সুবিধাজনক স্থানগুলোতে প্রতিরক্ষাবৃহৎ গড়ে তুলতে থাকে। সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। পদ্ধতিটি কিছু সময়ের জন্য অবশ্যই কাজে লেগেছিলো। রাতে আমাদের সাড়া সম্মুখভাগ জুড়ে শত্রুর কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হয়। দুই দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে, তবু তারা এগিয়ে এসে আক্রমণ করলো না। এদিকে আমার দলেও নতুন সৈন্য এসে পৌঁছায়নি। এ সময় এক নতুন বিপদ দেখাদিলো। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুলসংখ্যক সৈন্য এসে পড়ায় শত্রুরা প্রতিটি রণাঙ্গনে আরো বেশী করে সৈন্য পাঠাতে লাগলো। ১২০ এম এম মর্টারসহ আধুনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি পুরো ব্যাটালিয়ন ফটিকছড়ি, নাড়ায়ন হাট দিয়ে হিয়াকুর দিকে এগোয়। এদের অগ্রাভিযানের ফলে হিয়াকু এবং করেরহাট হিংগুলী এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের সকল সৈন্য আটকা পড়ার আশংকা দেখা দেয়। এই অবস্থায় আমি নরায়ণহাট থেকে সৈন্য পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করি।

\\ রামগর ভস্মীভূত \\

২৫শে এপ্রিল পাকিস্তানীদের হাতে করেরহাটের পতন ঘটে। তারপর তিন দিক থেকে রামগড় অভিমুখে অগ্রসর হয়। করেরহাট রামগড় সড়কে একদল, নারায়ণহাট হিয়াকু রামগড় পথে দ্বিতীয় দল এবং মহালছড়ি রামগড় সড়ক ধরে তৃতীয় দল অগ্রসর হতে থাকে। করেরহাট থেকে রামগড় যাওয়ার পথে পাহাড়গুলো দখল করার জন্য পাকিস্তানীরা পূর্বদিকে এগুচ্ছিলো। ফেনী নদীর শুভপুর সেতুর দিকেও কিছুসংখ্যক শত্রুসেনা অগ্রসর হচ্ছিলো। পক্ষকাল পরে এই সেতুর কাছেই এক রক্তক্ষয়ী লড়াই সংঘটিত হয়।

করেরহাট এবং রামগড়ের মাঝামাঝি স্থানে ছোট বাজার হিয়াকু। শত্রুরা কিভাবে যেন জেনেছিলো আমরা রামগড়েই চট্টগ্রাম সেক্টরের সদর দফতর স্থাপন করেছি। কথাটি আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ নয়। এখানে আমাদের কিছু জ্বালানী এবং খাদ্য মজুদ ছিলো। আরো ছিল আমাদের আহতদের চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী একটি হাসপাতাল। এছাড়া ছিল ছোট্র একটি ট্রেনিং ক্যাম্প। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের এখানে আমরা অস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যবহারের ট্রেনিং দিচ্ছিলাম। তবে প্রয়োজনে এখান থেকেও সবকিছু সরানোর প্রস্তুতি আমাদের ছিলো। রামগড় অবশ্য আমাদের মান সম্মানেরও প্রতীক হয়ে উঠছিলো। কারণ এটাই ছিলো আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বশেষ মহকুমা সদর দফতর। তাই আমরা স্থানটি প্রতিরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সবরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করি। এজন্য আমরা কয়েকটি সেতু ধ্বংস করে ফেলি। সীমিত সম্পদ ও শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে যতদূর সম্ভব ব্যাপক এলাকা জুড়ে সম্ভাব্য শত্রু হামলার স্থানগুলোতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা গড়ে তুলি।

রণকৌশলগত দিক থেকে তখন হিয়াকু এবং করেরহাটের মধ্যে আমাদের কোন সৈন্য রাখার উপযোগিতা ছিলো না। সৈন্যদের এখানে শত্রুবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিলো। তাই সকল দিকের সব সৈন্য প্রত্যাহার করে হিয়াকু এলাকায় সমাবেশ করেছিলাম।

অন্য পথে আরো পূর্বে মহালছড়িতে আমাদের সৈন্যদের ওপর ইতিমধ্যে শত্রুরা হামলা চালিয়েছিলো। আমাদের বাহিনী তখন আরো সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে বারবার খবর পাঠাচ্ছিলো। কিন্তু আমরা তাদের কিছুই পাঠাতে পারিনি।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ সামরিক কমান্ডের মতো কিছু একটা গঠন করেন। রণাঙ্গণের কমান্ডাররা কিন্তু সর্বোচ্চ সামরিক কমান্ড থেকে কোন আদেশ পাননি। বস্তুত: অভিযান সংক্রান্ত কোন আদেশই তাদের ছিল না। যে কোন মূল্যে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। আমাদের প্রতি এটাই ছিল সেই বিমূর্ত হাই কমান্ডের একমাত্র নির্দেশ। যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব চিত্রের সাথে এই আদেশের কোন সম্পর্ক ছিল না। শত্রুর অগ্রাভিযান কিছু সময়ের জন্য হয়তো বিলম্বিত করা যায়। কিন্তু প্রাণঘাতী লড়াইয়ের ময়দানে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ছাড়া শত্রুকে দমন করার চিন্তা আকাশ কুসুম স্বপ্নমাত্র। কেউ কেউ এই যুক্তি অনুধাবন না করেই খামখেয়ালী এবং অসঙ্গত আদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অচিরেই আমাদের সৈন্যরা এই অদৃশ্য কমান্ডের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং এর আসল অস্তিত্ব সম্পর্কেই সকলের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়।

পাকিস্তানীরা মহালছড়ি আক্রমণ করেছিলো ২৭শে এপ্রিল। এখানে ছিলো প্রায় তিন হাজার সৈন্যের দুটি মিজো ব্রিগেড এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি নিয়মিত কমান্ডো কোম্পানী। আমাদের সৈন্যদের পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধের ট্রেনিং ছিল না। অস্ত্র ও রসদপত্রেরও অভাব ছিল। তাই মহালছড়িতেও আমাদের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। পাকিস্তানীরা মিজোদের সামনের সারিতে পাঠিয়ে দিয়ে একটির পর একটি হামলা চালাতে থাকে। প্রথমে প্রতিবারই তাদের সে হামলা ব্যর্থ হয়ে যায়। হামলায় মিজোরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেছন থেকে পাকিস্তানী কমান্ডদের চাপের ফলে মিজোরা পেছনেও সরতে পারছিলো না। এমন কি কমান্ডোরা অস্ত্র দিয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছিলো যে, কোন মিজো পালাতে চেষ্টা করলেই তাকে গুলি করা হবে। যুদ্ধ গড়িয়ে চলে

মিজোদের কয়েকটি ছোট ছোট দল কোনক্রমে কয়েকটি টিলা পেরিয়ে পাহাড়ের ওপর সুবিধাজনক স্থান দখল করে নেয়। এদের এই জায়গা থেকে আমাদের অবস্থান এবং রামগড় অভিমুখী সড়ক পরিস্কার দেখা যাচ্ছিলো।

যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। আমাদের সৈন্য সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুন বেশি শত্রুসৈন্য বাঙ্গালী সৈন্যদের প্রায় ঘিরে ফেলে। তরুন অফিসার ক্যাপ্টেন কাদেরকে আমরা এখানেই হারাই। প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে একটা সুবিধাজনক স্থান দখল করার জন্য সে এগিয়ে গিয়েছিলো যাতে বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরাপদ পশ্চাদপসরণে সে সাহায্য করতে পারে। কাদের সফল হয়েছিলো, কিন্তু তারপরই লাইট মেশিনগানের এক ঝাক গুলিতে তার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বীরের মত মৃত্যু বরণ করেছিলো ক্যাপ্টেন কাদের। এই যুদ্ধে প্রথম একজন অফিসার হারিয়ে আমাদের সৈন্যদের মনবল ভেঙ্গে পড়েছিলো। দু'জন মাত্র শওকত ও ফারুক (পরে দুজনই সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হয়েছিলেন। এবং সিপাই ড্রাইভার আববাস শত্রুদের গুলিতে বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই ক্যাপ্টেন কাদেরের দেহ উদ্ধার করে আনে। রামগড়ে আমরা যথাযোগ্য ধর্মীয় ও সামরিক মর্যাদায় কাদেরের মৃতদেহ দাফন করি।

এপ্রিলের ২৯ তারিখে হিয়াকুর কাছে যুদ্ধ শুরু হয়। আমাদের অবস্থানস্থলের সামনের জায়গাটি ছিলো খোলা, কিন্তু দু'পাশে ছোট ছোট টিলার ওপর ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গলের আড়াল দিয়ে শত্রু আমাদের পেছনে চলে আসতে পারতো। সে পরিস্থিতিতে সরবরাহ ঘাটি রামগড় থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হতো। আমাদের কাছে তখন রান্না করার মত কিছু ছিল না। অধিকাংশ খাবারই আসত রামগড় থেকে। দিনটি ছিল পরিস্কার। ভোর থেকেই আমাদের অবস্থানের ওপর মর্টার সেলিংয়ের মাধ্যমে কয়েক দফা হামলা হয়। বোমাবর্ষনের ছত্রছায়ায় আমাদের দিকে অগ্রসরমান শত্রুর অগ্রভাগে ছিলো প্রায় দুইশত স্থানীয় দালাল। খোলা মাঠ দিয়ে দুই কোম্পানী পাকসেনা এগিয়ে আসছিলো ওরা একশত গজের মধ্যে আসতেই আমাদের অস্ত্রগুলো গর্জে উঠলো। এই আকস্মিক হামলায় মুহূর্তের মধ্যে ওরা ভয় ও আতংকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। দীর্ঘ দুই ঘন্টার অবিরাম লড়াইয়ে আমাদের কয়েকজন হতাহত হবার পর অবশেষে আমাদের সৈন্যদেরকে চিকনছড়ার দিকে পশ্চাদপসরণ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

হিয়াকুর পতনের পর রামগড়ের পতন অবশ্যস্বার্থী হয়ে উঠলো। সবচাইতে বিপজ্জনক ব্যাপার ছিলো শত্রু আমাদের অসামরিক ব্যক্তিদের বিশেষ করে বড় বড় শরণার্থী দলের ভারত গমনের পথ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলো। সে সময়ে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক ধূলিময় রাস্তা ধরে নারায়ণহাট থেকে হিয়াকুর এবং তারপর রামগড় হয়ে ফেনী নদী পেরিয়ে সাবরুমে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল। কিন্তু হিয়াকুর পতনের পর সে পথ বন্ধ হয়ে গেলো।

করেরহাটের পতনের পর বুঝতে পারি বর্তমান ধারায় যুদ্ধ করে আমরা কিছুই করতে পারবো না। আমরা আমাদের বাহিনীকে সুসংগঠিত করে তুলতে পারছিলাম না। এই বাহিনীতে ছিলো বিভিন্ন ধরনের লোক ইপি আর পুলিশ আনসার, মুজাহিদ, সামরিক বাহিনীর লোক এবং মাত্র সপ্তাহ খানেকের ট্রেনিংয়ের পর রণাঙ্গনে নামিয়ে দেয়া নতুন মুক্তিযোদ্ধা। এইসব দলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলার অভাব ছিলো আমাদের বিপর্যয়ের একটি কারণ। আমাদের সকল সৈন্যকে একটা নিরাপদ শিবিরে নিয়ে তাদের জন্য বিশ্রাম ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। তাহলে তাদেরকে নিয়েই আবার একটা সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত বাহিনী গড়ে তোলা যেতো। আমাদের অধিকাংশ সৈন্যকেই ইতিমধ্যে অপুষ্টিরও শিকার হয়ে পড়তে হয়েছিলো।

সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সীমানার ছয় মাইল ভেতরে হরিনায় একটা গোপন শিবির স্থাপন করা হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের থেকে আমরা কয়েকটি তাবু পেয়েছিলাম। রামগড় থেকে কিছু কিছু জিনিস এখানে

নিয়ে আসা হলো। শিবিরের জন্য যে হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছিলাম। যুদ্ধে আহতদের সেখানে আনা হয়। এরপর যুদ্ধ থেকে একটু অবকাশ পেলেই নতুনভাবে আমাদের বাহিনী সংগঠনের কাজ পুরোদমে শুরু হয়।

মুজিব নগরে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার তখন অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। কাজটি ছিলো খুবই দুঃসাধ্য। বাংলাদেশ বাহিনী একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এলাকায় তাদের দখল প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে কেউ আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দেবে না। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশের যে কোন একটি অঞ্চলে যতদূর সম্ভব সৈন্যদের জড়ো করে সেই এলাকা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা যেত। সময় নষ্ট না করে সেই সময়ই এই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেছে কর্তৃপক্ষ সকল ফ্রন্টেই যুদ্ধ করতে আগ্রহী এবং যুদ্ধ করে জয়ী হতেও চাইছিলেন। আমাদের সৈন্যসংখ্যা এবং তাদের পরিমানের প্রেক্ষিতে রণকৌশলগত দিক থেকে এ ব্যবস্থা ছিলো অবাস্তব। সব জায়গায় যুদ্ধ করার দরুন সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের সেনাদের বিচ্ছিন্ন এবং স্থানীয়ভাবে লড়ে যেতে হয় এবং এই লড়ে যাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলো লক্ষ্যহীন। তাই একটির পর একটি এলাকা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে।

৩০শে এপ্রিল মহালছড়ির সৈন্যরা রামগড় এসে পৌঁছে। এখান থেকে সকালে ছোট ছোট দলে হরিনা শিবিরের দিকে অগ্রসর হয়। ওদের আসার আগে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে রামগড় ছেড়ে যেতে প্রস্তুত থাকার আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশে বোঝা গিয়েছিলো, হাই কম্যান্ড আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে অসমর্থ। তখন সাহায্য ব্যতিরেকে মাত্র তিনদিনের বেশী যুদ্ধ করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। কিন্তু অবাক কান্ড ৩০শে এপ্রিল রাতেই আরেকটি নতুন আদেশ পেলাম। বাংলাদেশ সরকারের জন্য রামগড় রক্ষা কর। ইতিমধ্যে চিকনছড়া থেকে আমরা সৈন্য সরিয়ে এনেছি। হরিনায় আমাদের নিরাপদ পশ্চাদপসরণের জন্য রামগড়ের বাইরে কিছু সৈন্য রেখেছি। যাতে শত্রুর অগ্রাভিযান কিছু সময়ের জন্য তারা বিলম্বিত করতে পারে। শত্রু বাহিনী রামগড়ের মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। আমাদের সৈন্যদের অর্ধেক তখন হরিণার রাস্তায়।

অবশ্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর রামগড় প্রতিরক্ষার জন্য উপস্থিত যাদেরকে পেলাম সবাইকে জড়ো করা হলো। পাকিস্তানী সৈন্য যাতে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে না পড়ে তা প্রতিহত করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দলও সাবরুমে চলে এল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিলো। গুজব রটেছিলো যে, রামগড় প্রতিরক্ষায় ভারতীয় সৈন্যরাও অংশ নিতে পারে। কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটেনি।

১লা মে থেকে শত্রুরা রামগড়ের আশপাশের এলাকার ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। একটি দল মূল সড়ক ধরে অগ্রসর হচ্ছিলো। অন্য একটি দল রামগড়ের পূর্ব-দক্ষিণে পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকে। এই পাহাড় এবং রামগড়ের মধ্যে কিছুটা জায়গা একেবারে খোলা এবং সমতল। ১লা মে দিবাগত রাতে এই পাহাড়ে গোপনে শত্রুসমাবেশ ঘটেছিলো।

২রা মে সকালে পাকিস্তানীরা মরিয়া হয়ে রামগড়ের ওপর আক্রমণ শুরু করে। কামানের প্রচণ্ড গোলায় ছত্রছায়ায় তারা সড়কপথে আমাদের প্রথম প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙ্গে দেয়। শেলের আঘাতে আমাদের বাংকারগুলো ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এদিকে সেই পাহাড় এবং রামগড়ের মধ্যবর্তী স্থানটিতে ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করা হয়। এবং ধোঁয়ার আড়ালে শত্রুদের দ্বিতীয় দলটি রামগড়ের মধ্যভাগের দিকে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যার ঘন্টাখানেক আগে শত্রুরা শহরটির মধ্যাঞ্চলের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালায়। এতে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এরপর এক ঘণ্টারও বেশী সময় আমাদের সৈন্যরা শত্রুর ওপর গুলিবর্ষণ অব্যাহত রাখে এবং পরিশেষে গুলি ফুরিয়ে গেলে তারা অন্ধকারের আড়ালে পশ্চাদপসরণ করে।

ওদিকে সাবরুমের সকল বেসামরিক বাসিন্দাকে ইতিপূর্বেই আরো অভ্যন্তরে নিরাপদ স্থানে অপসারণ করা হয়েছিলো। সারা তল্লাট জুড়ে বুলেট ছুটছিলো। ভারতীয় এলাকার বাড়িঘর এবং গাছপালায় গিয়ে গুলি লাগছিলো। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিনীও (বি-এস-এফ) ইতিমধ্যে যার যার ট্রেঞ্চের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। তবে তারা সবকিছু অবলোকন করছিলো মাত্র।

এ সময় শত্রুর একটি অয়্যারলেস বার্তা আমরা শুনতে পাই। ওতে বলা ছিল “রামগড়ের বিদ্রোহী হেডকোয়ার্টার দখল করেছি।”

২রা মে’র এই রাতে শত্রুরা রামগড়ের ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সমগ্র বাজার এলাকা জ্বলে ওঠে। উর্ধ্বমুখী ধোয়ার কুন্ডলী আর অগ্নিবলয়ের ভেতর দিয়ে দূরে তখন পাহাড় শ্রেণীর অস্পষ্ট রেখা চোখে পড়ছিলো সেখানেই আমাদের স্বপ্নের সেই দেশ যার জন্য আমরা যুদ্ধ করে চলেছি, অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাব। কিন্তু কতদিন এ যুদ্ধ চলবে তা আমরা কেউ জানতাম না।

\ শুভপুর সেতুর যুদ্ধ \

রামগড় হারানোর বিপর্যয়ে আমাদের তখন মনমরা অবস্থা। হরিনায় বিকল্প সদরদফতর স্থাপন করতে পারলেও ভারতের আশ্রয়ে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এ কথা যেনো কোনমতেই মনে নিতে পারছিলাম না। রামগড়ে আমাদের একটা সান্তনা ছিল যে, সেটা আমাদের নিজেদের দেশ। সেখানকার সবকিছুই আমাদের। কিন্তু হরিণা ভারতীয় এলাকা দুটির মধ্যে বিরাট পার্থক্য আমাদের সব স্বপ্ন বুঝি ভেঙ্গে গেলো। আমাদের কেউ কেউ শিশুর মত কেঁদেছিলো। মানসিক আঘাতে পাথর হয়ে যাওয়া অনেককে দেখেছিলাম একটা ঘোরের মধ্যে পা দুটি যেন টেনে নিয়ে হরিণার দিকে চলছে। কাধে ঝুলছে পুরনো দিনের হাতিয়ার এবং গুলিশূন্য থলে।

এরপর প্রধান সড়কে শুভপুর সেতুর কাছে মারাত্মক লড়াই আসন্ন হয়ে ওঠে। ভারতীয় বি এস এফ বাহিনীর সহযোগিতায় সেতুর একটি অংশ আমরা এর আগে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এখানে আমাদের দলে লোকসংখ্যা ছিল মাত্র একশর মত। এদের অধিকাংশই ছিল আবার সতদিনের ট্রেনিং প্রাপ্ত বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা। সেতু প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পড়েছিলো ই পি আর সুবেদার ফখরুদ্দিনের ওপর। আমাদের লক্ষ্য ছিল শত্রুরা যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতু ব্যবহারের সুযোগ না পায় এবং ঢাকা ও কুমিল্লার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে না পারে।

করেরহাটের পতনের পর সেতুর উত্তর দিক থেকে আমরা সৈন্য প্রত্যাহার করে সেতুর দক্ষিন দিকে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করি। আমরা জানতাম সেতুটি দখল করার জন্য শত্রুরা মরিয়া হয়ে উঠবে। করের হাটে তারা কামান মোতায়ন করেছিলো, কয়েকটি ট্যাংকও নদীর পার্শ্ব চলে এসেছিলো। দূর থেকে শত্রুপক্ষের কামানের গোলা এসে আমাদের ওপর পরছিলো। ট্যাংকগুলো অগ্রসর হয়ে আমাদের একটির পর একটি ব্যাংকার ধ্বংস করে চলছিলো। আমাদের ট্যাংক বিধ্বংসী কয়েকটি ছোট হাতিয়ার থাকলেও তখন তার কোন শেল আমাদের কাছে ছিল না।

ট্যাংক ও কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ছত্রচ্ছায়ায় পাকিস্তানীরা কয়েকবারই নদী পার হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। দুবার তাদের সৈন্যরা নদীপথে মাঝামাঝি পর্যন্ত এসে দু’দিকের গুলির মধ্যে পড়ে যায়। পরিষ্কার দিনের আলোয় তাদেরকে দেখে দেখে আমরা গুলিবিদ্ধ করতে থাকি। অনেকটা যেন বেশ আরামের সাথে টার্গেট প্রাকটিস করার মতো এভাবে দুকোম্পানীরও বেশী সৈন্য আমরা নির্মূল করি। তাদের লাশগুলো নদী দিয়ে ভাসতে ভাসতে সাগরের দিকে চলে যায়। এই ভাবে লোকক্ষয়ের পর শত্রুরা নদী পার হয়ে সেতু দখলের চেষ্টা ত্যাগ করে।

ওদিকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আগত পাকসেনাদের নিকট ফেনী শহরের পতন ঘটে। ১১ই মে'র মধ্যে তারা শুভপুর সেতুর কাছে এসে পড়ে।

পাকিস্তানীদের এই কলামে শত্রুদের আনুমানিক দুটি ব্যাটালিয়ন ছিলো। পক্ষান্তরে সেতুর কাছে একশ- এরও কমসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা তখন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। পরের দিন শুরু হয় যুদ্ধ।

১২ই মে সকাল থেকে করেরহাটের কমান্ডগুলো আমাদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। অপরদিকে নদীর পাড়ে শত্রুট্যাংকগুলোকে ও দেখা যায়। পাকিস্তানীরা আমাদের অবস্থানের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে ধূম্রজালের সৃষ্টি করে। সকাল ১১টায় পশ্চিম দিকের সেই ধোয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে দুটি কোম্পানী প্রথম হামলা শুরু করে। কিন্তু বেশকিছু পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করে তাদেরকে পিছু হটতে হয়। তারপর কিছু সময় সব চুপচাপ। বেলা ৩টার দিকে প্রচন্ড গোলাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার হামলা শুরু হয়। দুটি শত্রু ব্যাটালিয়নকেই হামলায় অংশ নিতে দেখা যায়। দিনের বাকী সময়টুকু আমাদের সেনাদেরকেও প্রচন্ডতম গোলাবর্ষণের মোকাবিলা করতে হয়। প্রায় অর্ধেক মুক্তিযোদ্ধাই তখন শেলের আঘাতে আহত। সরাসরি আঘাতে বাংকারগুলো ধসে পড়লে অনেকেরই জীবন্ত সমাধি ঘটে। আমরা হতাহতদের সড়াতে পর্যন্ত পারছিলাম না। নতুন সৈন্যও যোগ হচ্ছিলো না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা খাদ্য কিংবা পানির মুখ দেখেনি। বেলা ৫টার দিকে কামানের গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়। শত্রু তখন আমাদের অবস্থান থেকে আনুমানিক ৩০০ গজ দূরে। শুধু একটি মেশিনগান এবং দুটি লাইট মেশিনগান দিয়ে আমরা এদের মোকাবিলা করছিলাম। ট্যাংকের আঘাতে অস্ত্রগুলো ধ্বংস হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সমানে শত্রু নিধন করে চলে। এরপর আমাদের সৈন্যরা শুধু ৩০৩ রাইফেল দিয়ে গুলি চালাতে থাকে। অচিরেই হতাহতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানীদের তুলনায় সংখ্যায় আমরা ছিলাম খুবই কম। আমাদের যেসব সেনা ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থানে ছিলো তারা শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিলো। এদের অধিকাংশই ছিলো গুরুতর আহত, কিন্তু তবু তাদের মনোবল ভেঙে পড়েনি।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। শুভপুর সেতুর অদূরে ভারতের শ্রীনগর সীমান্ত ফাড়ি। এখান থেকে একটি কাচা রাস্তা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আগরতলা অভিমুখী প্রধান সড়কে গিয়ে মিশেছে। এই সন্ধ্যায় রাস্তাটিতে অন্য কোন লোক ছিল না। শুধু রনাজন ফেরত কিছু লোক নিঃশব্দে হেটে চলছিলো। এদের মধ্যে কেউ হাটছিলো লাঠিতে ভর দিয়ে, কয়েকজনকে আবার সহযোদ্ধা ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো। পথে আমাদের একজন অফিসারের সাথে তাদের দেখা হলে জনৈক মুক্তিযোদ্ধা তার বাম হাত তুলে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায়। তার বুলন্ত ডান হাত থেকে রক্ত ঝরছিলো। শেলের বিচ্ছুরিত টুকরোয় এটি প্রায় দু ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। শুধু কঁকড়ে যাচ্ছিল। তবু সে মুখে একটু হাসির ভাব ফুটিয়ে অফিসারকে “জয় বাংলা” বলে শুভেচ্ছা জানায়। তারপর সে অন্যদের সাথে সামনে অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে যায়।

চট্টগ্রামের প্রতিরোধ যুদ্ধঃ

সাক্ষাৎকার : লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী বীর উত্তম

প্রঃ কখন কিভাবে আপনি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন?

উঃ ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে আমাকে চট্টগ্রামের ষোলশহরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে পোস্টিং দিয়ে পাঠানো হয়। মার্চ ৭১ এর প্রথম ভাগে আমি ছুটিতে ছিলাম। ১৫ই মার্চ এর দিকে যখন অসহযোগ আন্দোলন খুব জোরদার হচ্ছিল এবং ইতিপূর্বে ৭ই মার্চ ৭১ এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিলেন, তখন থেকেই আমরা বাঙ্গালী সৈন্যরা চিন্তা করছিলাম যে একটা গন্ডগোল বাধাবে এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। চট্টগ্রামের ষোলশহরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিলেন তখন কর্নেল জানজুয়া। মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে লেঃ জেনারেল এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি ছিলেন এই ব্যাটালিয়ানের সেকেন্ড ইন কমান্ড। জেনারেল জিয়া এবং আমি ছাড়াও ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আরো কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন। ১৫ই মার্চ ৭১-এর দিকে আমি এই ব্যাটালিয়নে যোগদান করি। ২৫ শে মার্চ, ৭১ রাতে যখন হত্যাকাণ্ড শুরু হয়, তখন স্বভাবতই আমি বাঙ্গালী হিসেবে আমার যা কর্তব্য সেটাই করেছি। এতে জড়িয়ে পড়ার মত কিছুই নেই। একটা কর্তব্য ছিল। সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যরই কর্তব্য ছিল এটা। সবাই এতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিছু কিছু সৈন্য হয়তো সুযোগ পাননি কিংবা কিছুসংখ্যক সৈন্য আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। আমাদের যেহেতু বাঙ্গালী ব্যাটালিয়ন ছিল সেই জন্য আমরা ধরা পড়িনি। আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি মাত্র। ২৫শে মার্চ ৭১ রাতে যখন জেনারেল জিয়াকে চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে পাঠানো হলো মূলত সেই সময় থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের পক্ষ থেকে শুরু হয়।

উক্ত দুর্বোলের রাত প্রায় ১১-৩০ মিনিট সময়ে আমরা টেলিফোনে জানতে পারলাম যে ঢাকায় হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই আমরা ধরে নিলাম ঢাকায় যখন হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে, নিশ্চয় এটা সারা বাংলাদেশব্যাপী শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ সেনাবাহিনী তো মাত্র এক জায়গায় তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করে না; এ জাতীয় পরিকল্পনা সব জায়গাতেই একই সময়ে কার্যকর করাই স্বাভাবিক। আমাদের কর্তব্য আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। কারণ ২৫শে মার্চের আগে থেকেই আন্দোলন যে রূপ নিচ্ছিল, সে সবে যখনই আমাদের নিযুক্ত করা হতো ব্যারিকেড সরানোর জন্য কিংবা জনগণকে হটানোর জন্য, তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে কাজ কখনো ঠিকমতো করতাম না। কার্যত আমরা সেই চূড়ান্ত অসহযোগের সময় থেকেই আন্দোলনের প্রতি আমাদের সমর্থন জানাতে শুরু করি। কাজেই ২৫শে মার্চ ৭১ রাতে যখন হানাদার বাহিনী বাঙ্গালী হত্যাকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন আমাদেরও তাৎক্ষণিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বাদে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না।

বাঙ্গালী হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার খবর দিয়ে সম্ভবত আমাদের কাছে প্রথম টেলিফোন করেছিলেন চট্টগ্রামের হান্নান ভাই (চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি)। সম্ভবত তিনিই চট্টগ্রামে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, জেনারেল জিয়া এবং আমি একই ব্যাটালিয়নে ছিলাম। তিনি যেহেতু আমার চাইতে সিনিয়র ছিলেন, সেহেতু তিনিই আমাদের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমি তার দুনস্বর হিসেবে কাজ করেছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা পর্যায়ে আমরা যে একই ব্যাটালিয়নে ছিলাম, এটা অনেকেই হয়তো জানেন না। বেশীরভাগ জনসাধারণের ধারণা আমরা আলাদা ছিলাম। আমরা একই সঙ্গে ছিলাম এবং একই সঙ্গেই বিদ্রোহ করেছিলাম। জেনারেল জিয়াউর রহমানও তার বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেনঃ “আমি বিদ্রোহ করে পোর্ট থেকে ফিরে এসেই শওকতের কাছে এলাম, এবং শওকত আমার সাথে হাত মিলালো।”

প্রঃ এই যে দুঃসাহসিক কাজ আপনারা করলেন, এর পিছনে অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যদেরও পূর্ণ সমর্থন ছিল এবং তারাও আপনাদের মত এগিয়ে আসছিলেন, এটা আপনারা বুঝেছিলেন কি?

উঃ এটা আমি বলতে পারবো না। কারণ রাজনীতিতে আমি কখনো জড়াতাম না। কিন্তু এটা রাজনীতি ছিল না। এটা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ। এতে জাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া অন্যান্য সেক্টর থেকে বাঙ্গালী সৈন্যরা এগুচ্ছিলেন কিনা সে তথ্য আমাদের জানার উপায় ছিল না। সে তথ্য জানা না জানার গুরুত্ব দেয়ার সময়ও তখন আমাদের ছিল না। এমনকি তখন আমার বাবা মা ছিলেন আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে নিয়ে কুমিল্লায়। তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশও তখন আমাদের ছিল না। কাজেই

তাৎক্ষণিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি মাত্র। অবশ্য আমরা ভেবেছি অন্য সবাইও হয়ত আমাদের মত এগিয়ে আসছিলেন। শুধু ক্যান্টনমেন্টেই নয়, আমরা মনে করেছি সমস্ত বাঙ্গালীই এই যুদ্ধে ছিলেন। কারণ এটা ছিল বাঙ্গালী জাতির প্রশ্ন, বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন।

প্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বেতারে কখন প্রচারিত হয়েছে বলে আপনি বলতে চান?

উঃ এটা একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা যেটা নিয়ে সব সময় বিতর্ক চলতে থাকে যে জেনারেল জিয়া করেছেন, না আওয়ামী লীগ করেছেন। আমার জানামতে সবচাইতে প্রথম বোধ হয় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান ভাইয়ের কণ্ঠই লোকে প্রথম শুনেছিলেন। এটা ২৬শে মার্চ ৭১ অপরাহ্ন দু'টার দিকে হতে পারে। কিন্তু যেহেতু চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের প্রেরক যন্ত্র খুব কম শক্তিসম্পন্ন ছিল, সেহেতু পুরা দেশবাসী সে কণ্ঠ শুনতে পাননি। কাজেই যদি বলা হয়, প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল। তা'হলে আমি বলব যে, চট্টগ্রামের হান্নান ভাই সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ। তবে এটা সত্য যে পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ ৭১ মেজর জিয়ার ঘোষণা প্রচারের পরই স্বাধীনতা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়।

প্রঃ ২৭শে মার্চ ৭১ মেজর জিয়াউর রহমান কি পরিস্থিতিতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গেলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করলেন?

প্রঃ ২৫শে মার্চ ৭১ রাতে ঢাকায় হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার পরই আমরা চট্টগ্রামে আমাদের অধীনস্থ সমস্ত ব্যাটালিয়নকে হাতে নিয়েছিলাম। আমরা ভেবে দেখলাম যে, নতুন পাড়া ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তান বাহিনী নিয়ন্ত্রিত ট্যাংক ছিল। আমরা ছিলাম ষোলশহরে মাত্র দু'মাইল দূরত্বে। আমরা দেখলাম, আমাদের হাতে কোনও ট্যাংক ছিল না। এবং কোন অস্ত্রশস্ত্রও আমাদের অর্থাৎ ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাতে ছিল না। ইতি পূর্বেই ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানে চলে যাবে বলে অধিকাংশ অস্ত্রই পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমাদের হাতে শুধু ছিল কিছু রাইফেল এবং এল এম জি ধরনের স্বল্পসংখ্যক অস্ত্র। ভারী কোনও অস্ত্র ছিল না। আমার সাথেই জেনারেল জিয়া আলাপ করলেন। আমরা আলাপ করে দেখলাম যে আমরা যদি ষোলশহর বিন্দিং এর ভিতর অবস্থান করি এবং এই অবস্থায় যদি ট্যাংক আসে, তাহলে আমরা ট্যাংক ঠেকাতে পারব না। কারণ ট্যাংক ঠাকানোর মত কোন অস্ত্রই আমাদের হাতে ছিল না। ট্যাংক থেকে দু'তিনটা গোলা ছুড়লেই আমাদের অনেক সৈন্য মারা যাবে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের ঐ এলাকা থেকে বাইরে চলে যাওয়া উচিত এবং নিরাপদ দূরত্বে থেকে হেডকোয়ার্টার বেস বানানো উচিত। এ ছাড়া আমাদের অধীনস্থ জোয়ানতের শপথ নেয়া উচিত। শপথ নিয়ে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে তারপর যুদ্ধে যাওয়া উচিত। আমরা সোজা প্রথমে গেলাম কালুরঘাট। সেখানে ভোররাতের দিকে আমরা মার্চ করে গেলাম। তখন খুব কুয়াশা ছিলো এবং আল্লাহর কি ইচ্ছা সেদিন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ ৭১ এর সকার ৮টা কি ৯টা পর্যন্ত কুয়াশা ছিল। কালুরঘাটে পৌঁছে আমরা সবাই কনফারেন্স করলাম। এতে কিছু বি ডি আর অফিসার এবং জোয়ানও ছিলেন। এই কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে চট্টগ্রাম রক্ষার জন্য পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাব। আমাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল পোর্ট এবং ক্যান্টনমেন্ট। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছিলেন। এই তো গেল ২৬শে মার্চ ৭১-এর কথা। ঐদিন আমরা খোজখবর নিয়েছিলাম কোথায় কি ঘটেছিলো। আমি একখানা জীপ নিয়ে পুরা শহর ঘুরে দেখলাম। আমি টহল দেয়ার সময় আগ্রাবাদের মোড়ে আমার জীপের ওপর একটি এল এম জি বাস্ট ফায়ার এলো। আমি কোনও প্রকারে জীপ ঘুরিয়ে ফেরত গেলাম এবং জেনারেল জিয়াকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করলাম এবং সেভাবে আমাদের দলকে নিয়োজিত করলাম।

২৭শে মার্চ ৭১ মনে হয় জেনারেল জিয়া বুঝতে শুরু করলেন যে বেতারে একটা ঘোষণা প্রচার করা দরকার। ঐ তারিখেই সন্ধ্যায় কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে এটা করলেন তিনি। বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ

নেতাও ঐ সময় খুব তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম, আতাউর রহমান খান কায়সার, হান্নান ভাই এবং এম আর সিদ্দিকী। তারাও সম্ভবত: সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কিছু প্রচারিত হওয়া উচিত। অপরদিকে জেনারেল জিয়া কি বলবেন তার একটি খসড়াও প্রস্তুত করে নিলেন। ২৭শে মার্চ ৭১ সন্ধ্যার পর চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হল জেনারেল জিয়ার (তৎকালীন মেজর) ভাষণ।

প্রঃ আপনার কমান্ডে সবচাইতে ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় এবং কখন সংঘটিত হয়েছিল।

উঃ প্রথম ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল কালুরঘাটে ১১ই এপ্রিল, ৭১। ঐ সময় জেনারেল জিয়া আমার সাথে ছিলেন না। তিনি ৩০শে মার্চ ৭১-এর পরই রামগড় চলে গিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধ পরিচালনা আমার কমান্ডে হয়। সৈন্য ছিলেন অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট বি ডি আর এবং স্থানীয় কিছু স্বেচ্ছাসেবী যেমন ছাত্র, শ্রমিক এবং অন্যান্য যারা অস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এমন কিছু লোকজন। আমার পক্ষে ছিল পাকিস্তান বাহিনীর দুটি ব্রিগেড। এ ছাড়া কর্ণফুলীতে তাদের যে নৌ জাহাজ ছিল সেটি তারা শংখনদী হয়ে কালুরঘাটের কাছাকাছি নিয়ে এসে ওখান থেকে নেভাল গান দিয়ে আমাদের এলাকায় বসিং শুরু করে দিয়েছিল। তাদের ব্রিগেডের যে আর্টিলারী ছিল সেই আর্টিলারী দিয়েও তারা বসিং করতে থাকে ১০ই এপ্রিল, ৭১ থেকে। ১১ই এপ্রিল তাদের কিছু সৈন্য মহিলার পোশাক এবং কিছু সৈন্য সিভিল এর পোশাক পরে জয়বাংলা বলতে বলতে আমাদের দিকে অথাৎ কালুরঘাটের পুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। চট্টগ্রামে আমাদের পক্ষে এবং তাদের বিপরীতে ছিলেন ক্যাপ্টেন হারুন, শমসের মবিন চৌধুরী, লেঃ মাহফুজ এবং অন্য কয়েকজন অফিসার। এই অবস্থায় আমাদের লোকজন প্রথমে বুঝতে পারেননি তারা পাকিস্তানী। যখন শত্রুজয়বাংলা বলতে বলতে একেবারে কালুরঘাটের পুলের ওপর চলে এলো, তখনই মাত্র আমাদের লোকজন বুঝতে পারলেন যে তারা সিভিলিয়ান বা মহিলা কেউ নন। তখন আমাদের পক্ষ ফায়ার করতে শুরু করলেন। শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে ক্যাপ্টেন হারুন এবং শমসের মবিন আহত হলেন। মাহফুজ চলে আসতে পেরেছিলেন। কালুরঘাট ছেড়ে আমরা পটিয়ার দিকে চলে এলাম।

প্রঃ তখন আপনারা মোট কতজন ছিলেন?

উঃ আমরা প্রায় সাড়ে তিনশ'র মত ছিলাম। এই যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনী পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। ব্রিগেডিয়ার মিঠঠা খান হেলিকপ্টার থেকে ওদের পক্ষে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল (পরে জেনেছি)

প্রঃ এই যুদ্ধে আপনারদের প্রধান অস্ত্র কি ছিল?

উঃ আমাদের কিছু রাইফেল ছিল, কিছু এল এম জি এবং দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার ছিল। এই মর্টার দু'টির কোনও অবলোকন ব্যবস্থা aiming sight ছিল না। আন্দাজে ছুঁড়তে হত।

প্রঃ আপনারদের পক্ষে হতাহত কেমন হয়েছে?

উঃ আমাদের পক্ষে তেমন হতাহত হয়নি, ওদের পক্ষে কতজন হতাহত হয়েছিল তাও বলা মুশ্কিল, তবে সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। ইতিপূর্বে ৮ই এপ্রিল আর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তখন পাকবাহিনীর একটি দল কালুরঘাটের প্রায় এক মাইল উত্তরে একটি কৃষি ভবন দখল করে নিয়েছিল। পাকবাহিনীর শক্তি ছিল একটি প্লাটুন। পাকসেনারা ওখানে এসে পড়ায় শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আমি কয়েকজন অফিসারকে পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য বললে কেউ তখন এগুতে উৎসাহিত হলেন না। তবে আমার কথা মোতাবেক লেঃ শমসের মবিন চৌধুরী কিছু সৈন্য নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেননি। উপরন্তু এই আক্রমণ

পরিচালনাকালে নায়ক নায়ক আলী পাকবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। এমনি অবস্থায় আমি নিজে মাত্র ১০জন সৈন্য নিয়ে ৯ই এপ্রিল হাওলাদার হামদু মিঞা, নায়ক তাহের এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন বি-ডি-আরসহ সকাল ৮-৩০ মিঃ সময়ে কৃষি ভবনে অবস্থানরত পাক ঘাটি আক্রমণ করি। আমার আক্রমণে প্রায় ২০জন পাকসেনা (১জন ক্যাপ্টেন ও ১জন সুবেদারসহ) নিহত হয় এবং তারা ঐ পোস্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়।

প্রঃ তারপর?

উঃ তারপর আমি কালুরঘাট ব্রীজের চট্টগ্রামের দিক পুনর্দখল করেছিলাম। ১০ই এপ্রিল ৭১ খবর পেলাম পাক সেনাবাহিনী পটিয়ার কালাপুলের দিক থেকে আমাদের ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। আমি তখনই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীকে কিছু সৈন্য দিয়ে পটিয়ায় কালাপুলে পাঠালাম। ১১ই এপ্রিল ভোরবেলা আমি নিজে পটিয়ায় কালাপুলের অবস্থা যানতে পেলাম। ঐ তারিখ সকাল ৮-৩০ মিঃ সময়ে ক্যাপ্টেন ওয়ালি আমাকে খবর পাঠালেন পাক সেনারা প্রায় সাত থেকে আটশত সৈন্য নিয়ে কালুরঘাট আক্রমণ করেছে; ক্যাপ্টেন হারুন গুরুতররূপে আহত, লেঃ শমসের মবিন চৌধুরীর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এ সংবাদ পেয়ে আমি ওয়ালিকে বললামঃ “আমাদের লোকদের একত্রিত করবার চেষ্টা কর, পরিস্থিতি ভালভাবে জেনে নাও, আমি আসছি”। সকাল ৯টার দিকে আমি কালুরঘাট এসে পৌঁছাই। ওখানে গিয়ে আমি মেজর জিয়ার সাথে অয়ারলেসে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম।

পরে আমি তাদের সবাইকে পিছনে সরে আসতে বললাম। লেঃ মাহফুজকে মদনঘাট ডিফেন্সে অবস্থান করতে বললাম যতক্ষণ না আমার কালুরঘাটের ডিফেন্সের সবাই পিছু হটতে পারে। আমরা সবাই কালুরঘাট থেকে পটিয়াতে একত্রিত হলাম। এবং সেখান থেকে সবাই বান্দরবন রওনা হই। আমার সাথে সৈন্য ছিল প্রায় ৪৫০জন (তৎকালীন ইপি আর পুলিশ এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ)।

আমরা ১২ই এপ্রিল বান্দরবান পৌঁছেছিলাম। ঐ তারিখেই কাণ্ডাই হয়ে রাজমাটি পৌঁছি। রাজমাটিতে আমরা ডিফেন্স নেবার পর মহালছড়িতে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপন করলাম। লেঃ মাহফুজ শত্রু ওপর আঘাত হেনে চলেছিল। কিন্তু পাকবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ টিকে থাকা দুর্বল বুঝে পাশ্চাত্য নোয়াপাড়া নামক স্থানে ডিফেন্স নেয়। সেখান থেকে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে সার্থকভাবে ডিফেন্স নিয়ে শত্রু মোকাবিলা করলেন। শেষ পর্যন্ত আমার নির্দেশ মোতাবেক ১৪ই এপ্রিল লেঃ মাহফুজ তার ২০০ এর কিছু বেশী সৈন্য নিয়ে মহালছড়িতে আমার সঙ্গে মিলিত হন। ছুটি ভাগরত ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের (আর্টিলারী) আমার কাছে ঐ তারিখে আসেন। বঙ্গ সন্তান সাহসী বীর ক্যাপ্টেন আফতাব কাদেরকে মেজর জিয়া আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাকে আমার সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অফিসারের নেতৃত্বে ডিফেন্স নিতে পাঠালাম।

আমার রক্ষাব্যূহকে যেসব স্থানে অবস্থান দিলাম সেগুলি ছিলঃ

- ১। ক্যাপ্টেন আফতাব কাদেরের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ সৈন্য রাজমাটির খাগড়াতে।
- ২। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীর নেতৃত্বে ১০০ সৈন্য রাজমাটির মধ্যস্থলে বুড়িঘাটে।
- ৩। লেঃ মাহফুজের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ সৈন্য রাজমাটির বরকলের মধ্যস্থলে।
- ৪। সুবেদার মুন্সলিবের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ সৈন্য রাজমাটির কুতুবছড়ি এলাকাতে।

অপরদিকে ১৫ই এপ্রিল পাকবাহিনী রাজমাটি শহরে পৌঁছে যায়। রাজা ত্রিদিব রায় পাকবাহিনীকে আহবান করে আনলেন।

১৬ই এপ্রিল এর মধ্যে আমাদের সবাই নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নিলেন। ক্যাপ্টেন ওয়ালিকে মেজর জিয়ার নির্দেশানুযায়ী রামগড় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ঐদিন ক্যাপ্টেন কাদের তার বাহিনী নিয়ে খাগড়া রেষ্ট হাউজে

একজন অফিসারসহ এক প্লাটুন পাকবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ক্যাপ্টেন কাদের পাকবাহিনীর অফিসারসহ প্রায় ২০জন পাক সৈন্যকে নিহত করতে সমর্থ হন। বাকী সৈন্য পালিয়ে যায়। অপরদিকে আমাদের মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ক্যাপ্টেন কাদের নিরাপদে তার ঘাটিতে ফিরে আসেন। ১৭ই এপ্রিল পাকবাহিনীর প্রায় ২০জন সৈন্য একটি লঞ্চযোগে রেকি করতে বেরিয়েছিল। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ওত পেতে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরই পাকসেনারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা মুক্তিবাহিনীর রক্ষাব্যবহারে কাছাকাছি চলে এসেছে। পাক সেনারা গুলি ছোড়া শুরু করে। কিন্তু ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তবুও চুপ করেছিলেন। সম্পূর্ণ লঞ্চটি তার এলাকায় চলে আসা মাত্রই তিনি গুলি চালানো শুরু করলেন। এতে লঞ্চসহ অধিকাংশ পাকবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। কয়েকজন পালাতে সমর্থ হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ২জন মাত্র আহত হয়েছিলেন।

১৮ই এপ্রিল পাক সেনারা দু'টি লঞ্চ ও একটি স্পীডবোটে সৈন্য নিয়ে চিঙ্গী নদী দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। লেঃ মাহফুজের কিছু সৈন্য হঠাৎ গুলি ছুড়ে বসেন।

পাক সেনারা কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটে দূরে গিয়ে ডিফেন্স নিয়ে লেঃ মাহফুজের ওপর আর্টিলারী আঘাত হানতে থাকে। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে লেঃ মাহফুজের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে, পাক সেনাদের কিছু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তাদের চাপ আমাদের ওপর ক্রমে বাড়তে থাকে।

১৮ই এপ্রিল বিকেল ৩টায় সুবেদার মুত্তালিব তাঁর দল নিয়ে কুতুব ছড়িতে পাকবাহিনীর ৬ টি চলমান সৈন্যভর্তি ট্রাকের উপর গ্র্যামবুশ করে। এই গ্র্যামবুশ ৩০ থেকে ৪০ জন পাকসেনা নিহত ও দুই-তিনটি গাড়ী ধ্বংস হয়।

১৯ শে এপ্রিল ৩ টায় পাক সেনাদের একটি বড় রকমের দল ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীর ওপর বুড়িঘাটে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে। পাক সেনারা ঐ সময় একটি জীপ থেকে তিনটি মর্টার ছুড়েছিল। তাদের বাহিনী ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এমনি পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান কিছুতেই থাকতে পারছিলেন না। তখন ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রব (৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট) অটোমেটিক হাতিয়ার মেশিনগান হাতে তুলে নিয়ে বললেনঃ ‘আমি গুলি চালিয়ে যাচ্ছি আপনি বাকী সৈন্যদের নিয়ে পিছু হটে যান’। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান প্রায় ১০০ মুক্তিবাহিনী নিয়ে নিরাপদে পিছু হটলেন। কিন্তু ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রব পাকবাহিনীর শেলের আঘাতে প্রাণ হারালেন। সেদিন মুন্সী আবদুর রব মুন্সীকে সরকার বীর শ্রেষ্ঠ উপাধি দিয়েছিলেন। ২০শে এপ্রিল লেঃ মাহফুজ ঐ স্থানে যান এবং মুন্সীর ছিন্ন দেহের অংশবিশেষ এবং কিছু গোলাবারুদ নিয়ে ঘাটিতে ফিরে আসেন।

ঐ দিনই আমি লেঃ মাহফুজকে বরকলে পাঠিয়েছিলাম মিজো উপজাতিকে আমাদের স্বার্থে কাজ করার পক্ষে মত বিনিময়ের জন্য। লেঃ মাহফুজ বহু কষ্টে সুবলম পর্যন্ত পৌঁছে খবর পেলেন যে, পাকিস্তানীরা মিজোদের ইতিমধ্যেই হাত করে নিয়েছে। আমি আরো খবর পেলাম পাকবাহিনী মিজোদের নিয়ে মহালছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ২১শে এপ্রিল পাকবাহিনীর একটি কোম্পানী বন্দুকভাঙ্গা নামক স্থানে লেঃ মাহফুজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংঘর্ষে পাকসেনারা পিছু হটে চলে যায়। আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি।

২৩শে এপ্রিল পাকবাহিনীর প্রায় ২০০ সৈন্য রাজমাটি থেকে মহালছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি ক্যাপ্টেন কাদের এবং লেঃ মাহফুজকে পাঠালাম প্রতিরোধ করার জন্য। ২৪মে এপ্রিল কুতুবছড়ি নামক স্থানে অফিসারদ্বয় পাক বাহিনীর মুখোমুখি হন। এই যুদ্ধে পাকবাহিনী বেশ কিছু ক্ষতি স্বীকার করে।

২৫শে এপ্রিল খবর পেলাম চিঙ্গী নদী এবং নার্নিয়ার চর বাজার হয়ে পাকবাহিনী মহালছড়ি অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। মহালছড়ি আমাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার ছিল।

২৬শে এপ্রিল ক্যাপ্টেন কাদের, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ও লেঃ মাহফুজকে কিছুটা পিছিয়ে যেতে বললাম। ঐ তারিখেই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে নানিয়ারচর বাজারে বড় পাহাড়ের ওপর ডিফেন্স নিতে বলেছিলাম। কারণ ঐ পথই পাক সেনাদের অগ্রসর হওয়ার সম্ভাব্য এলাকা ছিল। লেঃ মাহফুজকে ডিফেন্স রাখলাম রিজার্ভে পাল্টা আক্রমণের জন্য এবং প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন জামানকে সাহায্যের জন্য। ক্যাপ্টেন কাদেরকে পাঠালাম সড়ক পথে পাকবাহিনীর গতিপথ রুদ্ধ করার জন্য।

২৫শে এপ্রিল ভোরবেলা হাবিলদার তাহের সিপাহী বারী এবং করপোরাল করিমের সংগে ৮/১০ জন লোক দিয়ে রেকি পেট্রোলে পাঠালাম। এই দলটি ভুলবশতঃ মিজোদের আড্ডায় ঢুকে পড়েছিল। সৌভাগ্যবশত মিজোরা তখন একটি হাতি কেটে খাওয়াতে ব্যাস্ত ছিল। রেকি পার্টি পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়। আমাদের দলটি পরে হেডকোয়ার্টার মহালছড়িতে পৌঁছে। ঐ তারিখ বেলা ১২-৩০ মিঃ সময়ে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীর অবস্থানের ওপর মিজোর আক্রমণ চালিয়েছিল। ফলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বেধে যায়। আক্রমণের চাপ বাড়তে থাকে মিজোদের পক্ষ থেকে। মিজোর ছিল সংখ্যায় অনেক। এই অবস্থায় আমি লেঃ মাহফুজকে প্রায় ১০জন সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের সাহায্যে পাঠিয়েছিলাম। লেঃ মাহফুজ ওখানে পৌঁছেই ডিফেন্স নিয়ে লক্ষস্থলে আক্রমণ চালাতে থাকে। কিন্তু ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তার সাথীদের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পথে পিছু হটে আসেন। আধ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ে লেঃ মাহফুজ ১৫০জন মিজোকে হত্যা করেছিলো। কিন্তু অপর পক্ষে সব বাধাকে অগ্রাহ্য করে অসংখ্য মিজো সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সমনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। লেঃ মাহফুজকে মিজোরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন কাদের এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান লেঃ মাহফুজকে উদ্ধার করে আনার জন্য অগ্রসর হলেন। আমরা তখন হেডকোয়ার্টারের চারপাশে ডিফেন্স পাকা করছিলাম। এমনি পরিস্থিতিতে ২৭শে এপ্রিল অপরাহ্ন ৩টায় পাকবাহিনীর ১১ এবং পাঞ্জাবের ২টি কোম্পানী সহযোগে প্রায় এগার শত মিজো ব্যাপকভাবে আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। পাকবাহিনী ৬টি মর্টার দিয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। চারদিকে শুধু আগুন আর আগুন। আমি ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন কাদের, ফারুক প্রমুখকে এলাকা ভাগ করে দিয়ে মহালছড়ি হেডকোয়ার্টার রক্ষা করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করলাম। পাক সেনারা মিজোদের নিয়ে ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে আধুনিক মারনাস্ত্র নিয়ে। অথচ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উপযোগী কোনও ভারী মর্টার আমার কাছে ছিল না। মাত্র ত্রি নট ত্রি রাইফেল ও সামান্য হালকা মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ চালালাম। ক্যাপ্টেন কাদের তার এলাকাতে যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর গুলিতে শহীদ হলেন। বৃষ্টির মতো গুলির মধ্যে সওকত ফারুক ও সিপাহী ড্রাইভার আববাস গাড়িতে ক্যাপ্টেন কাদেরের মৃতদেহ নিয়ে রামগড়ে ফিরে এলেন। ক্যাপ্টেন কাদেরের মৃতদেহ রামগড় রেখে বাকী সৈন্যরা আমার কাছে চলে আসেন। আমরা তখন এমনি এক অবস্থায় ছিলাম। যখন আমার সমস্ত বাহিনী নিয়ে ঐ পরিস্থিতিতে পিছু হটা সম্ভব ছিল না। তাই সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ঐ তারিখে রাতের আধারে মহালছড়ি ছেড়ে সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমরা খাগড়াছড়ি নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম এবং ডিফেন্স নিলাম।

২৮শে এপ্রিল খাগড়াছড়ি থেকে আমি মেজর জিয়ার সাথে অয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমাদের অবস্থার কথা বর্ণনা করলাম। ঐদিন পাকবাহিনীর একটি দল আমাদের অবস্থান দেখে গুইমারা হয়ে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি আমার বাহিনী নিয়ে গুইমারাতে ডিফেন্স নিলাম। আমাদের তখন শক্তি ছিল প্রায় ৪৫০জন। আমি মানিকছড়ির রাজার সংগে দেখা করলাম। রাজা আমাদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি আমার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে মগদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন বলে জানলেন। রাজা পাকিস্তানীদের খবরাখবর দিলেন। সমগ্র মগ উপজাতি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। চাকমা উপজাতিদেরও হয়ত আমাদের সাহায্যে পেতাম। কিন্তু রাজা ত্রিবিদ রায়ের বিরোধিতার জন্য তারা আমাদের বিপক্ষে চলে যায়। মিজোরা বেশ কিছু আগেই আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের ন'মাস মগ উপজাতি আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে।

২৯শে এপ্রিল রাতে মেজর জিয়া আমাদের রামগড়ে চলে আসতে বললেন। কারণ ইতিমধ্যে পাকবাহিনীর একটি দল করেরহাট-হিয়াকুল হয়ে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অপর দল শূভপুর ব্রীজে ক্রমাগত আঘাত হানছিল। আর একটি দল আমাদের পিছু পিছু আসছিল গুইমরা রামগড়ের পথে। মেজর জিয়া করেরহাটে ক্যাপ্টেন ওয়ালীকে পাঠালেন এবং আমাদের চলে আসতে বললেন। আমরা ২৯শে এপ্রিল রওয়ানা হয়ে রাত ২টায় সমস্ত সৈন্য নিয়ে রামগড়ে পৌঁছলাম। ৩০শে এপ্রিল মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল (পরবর্তী কালে জেনারেল) এম, এ, জি ওসমানী রামগড়ে আমাদের দেখে গেলেন এবং চট্টগ্রামের সমস্ত খবরাখবর নিলেন। কর্নেল ওসমানী খুব খুশী হলেন। আমাদের নির্দেশ দিলেন যে কোন প্রকারেই অন্তত: আরো দুদিন রামগড়কে মুক্ত রাখার জন্য, যাতে করে নিরীহ জনতাসহ সবাই নিরাপদে ভারতে আশ্রয় নিতে পারি।

আমি ক্যাপ্টেন খালেদুজ্জামান, সুবেদার মুত্তালেব এবং লেঃ মাহফুজকে তাদের বাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন ওয়ালীর সাহায্যার্থে হিয়াকুলে পাঠালাম পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে। উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয়। পাকবাহিনীর একটি ব্রিগেড তিন দিক থেকে রামগড় আক্রমণ করে। ২রা মে আমাদের রামগড় হারাতে হয়। ঐদিনই আমরা সবাই ভারতের সাবরমুখে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সময় তখন সন্ধ্যা ৬টা।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ কুমিল্লা-নোয়াখালী-ঢাকা

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩। ৪র্থ বেঙ্গল ও অন্যান্য বাহিনীর কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধ	সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৯৭৪-১৯৭৫	১৯৭১

১৯শে মার্চ ১৯৭১ আমাকে ঢাকা সেনানিবাস থেকে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেড অফিস কুমিল্লাতে বদলী করা হয়। আমি ২২শে মার্চ আমার পরিবারকে ঢাকার ধানমন্ডিতে রেখে কুমিল্লা চলে যাই। এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে যোগদান করি। ইউনিটে পৌঁছার সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম আমার সৈনিকরা বেশ উদ্বিগ্ন। আরো জানতে পারলাম পাঞ্জাবীদের কমান্ডো এবং গোলন্দাজ আর্টিলারি বাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে মেশিনগান লাগিয়ে অবস্থান নিয়েছে। নির্দেশ পেলেই সবাইকে হত্যা করবে। পাঞ্জাবীরা সেনানিবাস রক্ষার অজুহাতে এসব পরিকল্পনা নিয়েছে। পাঞ্জাবীদের কার্যাবলীতে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের মনে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল। আমি পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জানতে চায় এখন তাদের কি কর্তব্য? আমি সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে এবং আত্মরক্ষার্থে প্রহরী দিগুন করার নির্দেশ দিয়ে তাদের শান্ত করি। পরের দিনে ২৩শে মার্চ ছুটির দিন ছিল। ২৪শে মার্চ সকাল ৭টায় আমি প্রথম অফিসে রিপোর্ট করি লেফট্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত খানের কাছে। তিনি চতুর্থ বেঙ্গল কমান্ডিং অফিসার ছিলেন এবং পাঞ্জাবী ছিলেন। লেফট্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত খান আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে আমার পোষ্টিংয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। এবং ইউনিট সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। ঐদিনই আমি যখন আমার অফিসে সেকেন্ড ইন কমান্ড উপ-প্রধানের কাজ বুঝে নিচ্ছিলাম সকাল প্রায় সাড়ে দশটায় তখন খিজির হায়াত খান ডেকে পাঠালেন। আমি অফিসের ভিতর ঢুকে দেখি খিজির হায়াত খান উদ্বিগ্ন। তিনি আমাকে বসার জন্য বললেন এবং জানান যে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়ে আজই কুমিল্লা থেকে রওনা হতে হবে। আমি উত্তর দিলাম যে হুকুম যদি হয় আমি নিশ্চয়ই যাব। তবে আমি একদিন হয় এসেছি এবং আমার দায়িত্ব কেবল বুঝে নিচ্ছি, এমতাবস্থায় ইউনিট থেকে অন্য যায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়তো আপনার পক্ষে ভুল হবে। তাকে আরো বুঝাতে চেষ্টা করলাম ব্যাটালিয়ানে আরো অফিসার আছে, তাদেরকেও পাঠানো যেতে পারে। তাছাড়া ইউনিট প্রধানকে সাধারণতঃ এভাবে পাঠানো হয় না। আমার বক্তব্য শুনে তিনি বললেন ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে জন্য তোমাকেই যেতে হবে। আমি যানতে চাইলাম আমাকে কি ধরনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে। কর্নেল খিজির হায়াত খান বললেন যে খবর এসেছে সিলেটের সমসের নগর নামক জায়গায় নক্সালপন্থীরা বিশেষ তৎপর রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করছে আরো খবর আছে ভারত থেকে বেশ অনুপ্রবেশও হচ্ছে। এই সব কারনে আমাকে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী নিয়ে সেখানে যেতে হবে। এবং তাদের দমন করতে হবে। আমি জবাব দিলাম একটা কোম্পানী যখন যাবে তখন কোন জুনিয়র মেজরকে সেখানে পাঠানো যেতে পারে। সাধারণত উপ-প্রধান একটা কোম্পানী নিয়ে কখনও যায় না। আমার বক্তব্য খিজির হায়াত খান কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। এবং আমাকে বললেন, ঠিক আছে আপনি যান এবং আমি আপনাকে একটু পরে ডেকে পাঠাব। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে ইকবাল শফি এখনই আপনাকে ডেকেছেন। আমাকে নিয়ে কর্নেল খিজির হায়াত ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে গেলেন। ব্রিগেড কমান্ডার আমাকে দেখেই বললেন আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যা একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ সম্পন্ন করতে পারবে না এবং সেই জন্য আমি তোমাকেই নির্বাচিত করেছি। আশা করি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। তিনি আরো বললেন, তোমার মত একজন সিনিয়র অফিসাকে এই জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আমি ট্রপস ছাড়া শমসেরনগরে ইপিআর-এর একটি কোম্পানী আছে। এই বড় ফোর্স এর নেতৃত্ব

* খালেদ মোশাররফ একান্তরের মার্চে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসাবে মেজর পদে ছিলেন।

দেওয়ার জন্য একজন সিনিয়র বাঙ্গালী অফিসারের দরকার। তুমিই একমাত্র বাঙ্গালী অফিসার কুমিল্লাতে যাকে আমি এ ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারি।

আমি বুঝতে পারলাম যেতে আমাকে হবেই। উপায় যখন আর নেই তখন যতটুকু তাদের কাছে আদায় করে নেয়া যায় সেটুকুই আমার পক্ষে মঙ্গল। আমি ব্রিগেডিয়ার শফিকে বললাম, যে কাজের ভার আমাকে দিচ্ছেন শুধু একটা কোম্পানী দিয়ে তা হবে না। কোম্পানীর চেয়ে বেশী সৈন্য আমাকে দেয়া হোক। আর হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটা শক্তিশালী ওয়ারলেস দেওয়া হোক। এছাড়া যেহেতু আমি অনেক দূরে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছি। সেহেতু আমার ট্রপস এর জন্য স্বয়ংক্রিয় ভারী এবং হালকা অস্ত্রশস্ত্র এবং মর্টার ইত্যাদি এবং যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ দেয়ার অনুমতি দেয়া হোক। ব্রিগেডিয়ার শফি প্রথমে বললেন, তোমাকে যে কাজের জন্য পাঠান হচ্ছে, তাতে এসব ভারী অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে না। আমি উত্তরে বললাম যে, আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা চিত্রিত করেছেন তাতে আমার সামরিক জ্ঞান অনুসারে এই সমস্ত ভারী অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে বিশেষ করে যেখানে হেড কোয়ার্টার থেকে তাড়াতাড়ি সাহায্য পাবার আশা কম। আমার বক্তব্যে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি কনভিনসড হলেন এবং কর্নেল খিজির হায়াতকে নির্দেশ দিলেন আমার যা প্রয়োজন তা যেন আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়। আমরা ব্রিগেডিয়ার শফির কাছ থেকে ইউনিটে ফিরে এলাম। এসেই ব্যাটালিয়নের এডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন গফফারকে (এখন মেজর) ডেকে নির্দেশ দিয়ে দিলাম সমস্ত ব্যাটালিয়ন থেকে বেছে বেছে ২৫০ জনের মত সৈন্যকে আলফা কোম্পানীতে একত্রিত করার জন্য।

গফফারকে বলে দিলাম যে, ব্যাটালিয়নের ভারী অস্ত্রশস্ত্র যতো আছে সব নিয়ে নাও। গোলাবারুদ এমন ভাবে নেবে যাতে একমাস যুদ্ধ করা যায়। আমাদের ২৬টা গাড়ী ব্রিগেড থেকে দেওয়া হয়েছিল। সব বোঝাই করতে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকদের তৈরী করতে সক্ষ্য হয়ে গেল। এই সময় আমি একটা অস্বাভাবিক ঘটনা দেখতে পাই। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি এবং আমাদের লোকজন প্রস্তুত হচ্ছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত খিজির হায়াত এবং অন্যান্য ব্রিগেড স্টাফ এর অফিসাররা বসে লক্ষ্য করতে থাকলেন।

আমি ২৪শে মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যাওয়ার জন্য তৈরী হই। ব্যাটালিয়নে যে সমস্ত বাঙ্গালী অফিসার থেকে গেল তারা সবাই আমার যাবার পূর্বে মেসে এসে দেখা করে গেল। এদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমানে মেজর) তাকে আমি এই উপদেশ দিলাম যে আমি চলে যাচ্ছি, এতে ঘাবড়াবার কিছু নাই। এখন তুমিই সিনিয়র। যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে এই ৪র্থ বেঙ্গল এর বাকী ট্রপস এর নিরাপত্তার পুরা বন্দবস্ত করবে এবং যদি প্রয়োজন হয় যুদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসবে এবং আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি আমার কনভয় নিয়ে শমসেরনগরের পথে রওনা হলাম। রাত প্রায় ২টা আরাইটার সময় বি-বাড়িয়া শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলাম। সেখানে রাস্তায় অনেক ব্যারিকেড। এই প্রতিবন্ধকতার জন্য আমাদের এগোতে অসুবিধা হচ্ছিল। এই ব্যারিকেড ভাঙতে ভাঙতে শহরের দিকে এগোচ্ছিলাম। শহরের কিনারে যে পুল আছে (নিয়াজ পার্কের কাছে) সেখানে বি-বাড়িয়ার ছাত্র জনতা আমাদের বাধা দেয়। হাজার হাজার লোক এবং ছাত্র রাস্তায় শুয়ে পড়ে এবং বলে যেতে দেওয়া হবে না। আমি সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে কথা বলতে চাইলাম। ওখানেই আওয়ামী লীগের তদানীন্তন এমসিএ সাদু মিয়া এবং অন্য কয়েকজন আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রনেতারা আমাকে জানান যে, পূর্ব বাংলার অনেক যায়গায় পাকসেনারা আবার গুলি চালিয়েছে এবং মিলিটারী চলাচল কেন্দ্রীয় নির্দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা আরও বলেন আপনাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে কুমিল্লা থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং আমরা আপনাদের যেতে দেব না। এই ভাবে কয়েকঘণ্টা কথাবার্তা হয়। ইতিমধ্যে মেজর শাফায়াত জামিল (বর্তমানে লেঃ কর্নেল), যিনি ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর একটা কোম্পানীসহ বি-বাড়িয়াতে অবস্থান করছিলেন, তিনিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনিও তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলেন যাতে ব্যারিকেড এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তাতেও তারা আমাদের অনুরোধ রাখতে রাজী হয় না। তারপর তাদের নিয়ে মেজর শাফায়াত জামিলের ক্যাম্পে যাই। সেখানে আবার কথাবার্তা চলে এবং তাদের

আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিই যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশেরই রেজিমেন্ট, যখন দরকার পড়বে বাঙ্গালী জাতির জন্য পিছিয়ে থাকবে না। এমতাবস্থায় আমাদের বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। অবশেষে সকাল সাড়ে পাঁচটায় সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আামাদেরকে আর বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমরা শমসেরনগরের পথে আবার ২৫শে মার্চের সকালে রওনা দিলাম। যাওয়ার আগে মেজর শাফায়াত জামিলকে আলাদা ডেকে সতর্ক করে দিলাম এবং আমার সঙ্গে অয়ারলেস মারফত যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দিয়ে গেলাম। আমি সকাল দশটা এগারটার সময় শ্রীমঙ্গলে পৌঁছি। সেখান থেকে শমসেরনগর যাবার রাস্তা আমার জানা ছিল না। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার থেকে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, শমসেরনগর যেতে হলে মৌলভীবাজার হয়ে যেতে হবে। শ্রীমঙ্গলে কনভয় দার করিয়ে স্থানীয় কিছু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি শমসেরনগরে যাওয়ার রাস্তা সম্বন্ধে এবং জানতে পারি মৌলভী বাজার হয়ে যাওয়া যায় অথবা আর একটা রাস্তা আছে সোজা শ্রীমঙ্গল হয়ে জঙ্গল এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এই রাস্তা অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের আমি এই সোজা জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে শমসেরনগরের পথে রওনা হলাম। যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সে রাস্তা পরিত্যাগ করে পাহাড়ের পথ দিয়ে রওনা হলাম এই রাস্তা খুব খারাপ ছিল তাই অতি কষ্টে দুপুর ২টার সময় শমসেরনগরে গিয়ে পৌঁছি। সেখানে যেয়ে ডাকবাংলোতে আমি আমার ছাউনি স্থাপন করি।

দুপুরে খেয়ে আমি এবং লে. মাহবুব শমসেরনগরের চারদিকে ঘুরে দেখে আসি দেখি পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আর কিছু পেট্রোল পার্টি চতুর্দিকে পাঠিয়ে দিই। স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যানতে পারি কোন অঘটন সেখানে ঘটেনি। ইপিআর এর যে দুটো কোম্পানীর কথা আমাকে বলা হয়েছিলো। তাদের কোন পাত্তা নেই। ইপিআরএর একজন সুবেদার এবং আরো কয়েকজন সিপাই শমসেরনগর এয়ারপোর্টে অবস্থান করছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সঠিক কোন উত্তর পাইনি। শমসের নগরের টি গার্ডেন গুলো ঘুরে জানতে পারলাম। সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ম্যানেজার এবং অফিসাররা ঢাকায় চলে এসেছে। নক্সালপন্থী বা অনুপ্রবেশকারীদের কোন চিহ্ন আমি খুজে পেলাম না। ২৫শে মার্চের রাতটা এভাবে খবরাখবর নিয়ে এবং পেট্রোলিং করে কেটে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ঘোড়ালো মনে হলো। আমার মনে জাগল আমাকে এখানে কৌশল করে পাঠানো হয়েছে। এবং যা কিছু তারা বলেছিল, তা সবই মিথ্যা। আমি সমস্ত সকাল অয়ারলেসের মাধ্যমে হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি কিন্তু কোন যোগাযোগ হল না। এই ভাবে দুপুর পর্যন্ত চলে যায়। আমি এবং লে. মাহবুব ডাকবাংলোর বারান্দায় বসেছিলাম। হঠাৎ আমাদের এসে খবর দেয় এক পাঞ্জাবী অফিসার এবং বেশ কয়েকজন সৈন্য শমসেরনগরের বাজারে এসেছে এবং সেখানে কারফিউ জারি করে স্থানীয় জনসাধারণের উপর অত্যাচার করছে। সেই দলটি আমাদের ক্যাম্পের সম্মুখে দিয়ে মৌলভীবাজার যাচ্ছিল। আমাদের সেন্টিকে সেই দলটির অফিসারকে ডাকার জন্য পাঠাই। এরা যখন সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন সেন্টি তাদের আমাদের ক্যাম্পে আসার অনুরোধ জানায়। অফিসারটি ক্যাম্পের ভিতরে আসে এবং আমার সেখানে উপস্থিতি সম্বন্ধে আশ্চর্যবোধ করে। এমন ভাব দেখায় যে আমার এখানে আছি এটা সে জানত না। কথাবার্তায় আমি জানতে পারি যে ৩১ পাঞ্চব রেজিমেন্টের বেশ কিছু সৈন্য সিলেট থেকে মৌলভীবাজার এসে দুই দিন আগে ক্যাম্প করেছে। অফিসারের হাবভাব এবং কথাবার্তা আমাকে সন্দিহান করে তোলে। যতক্ষণ সে ডাকবাংলোয় বসেছিলো ততক্ষণ সে স্টেনগানটি কোথাও না রেখে নিজের হাতে রাখে। এতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। এদের আগমন সম্বন্ধেও আমাকে অবহিত করা হয়নি। এটাও অত্যন্ত অস্বাভাবিক কিছুক্ষণ পরে অফিসারটি তার দলবল নিয়ে চলে যায়। এবং যাওয়ার আগে আমাদেরকের পাঞ্জাব রেজিমেন্টে ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমি যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে অফিসারটিকে বিদায় করলাম।

সেই দিনই বিকেলে স্থানীয় জনসাধারণের মুখে আমি জানতে পাই ঢাকাতে কিছু একটা ভয়ংকর অঘটন ঘটেছে। কিন্তু কেউ সঠিক কিছু বলতে পারে না। আস্তে আস্তে লোকমুখে আরও শুনতে পাই যে, ঢাকায় পাক সেনাবাহিনীর হাজার হাজার লোক গুলি করে মেরে ফেলেছে এবং মারছে। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গাতেও পাক বাহিনী সেই রূপ নৃশংস অত্যাচার এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক ঢাকা ছেড়ে জান

বাঁচানোর জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে। পাক সেনাবাহিনী ট্যাংক, কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নির্দোষ, নিরীহ, নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর বর্বরচিতভাবে অত্যাচার করছে। ঢাকা শহর একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আমি অনেক্ষণ বসে থেকে চিন্তা করতে থাকলাম আমার এখন কর্তব্য কি। অয়ারলেস সেট খেলার হুকুম দিয়ে হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। অনেক চেষ্টার পরও কোন যোগাযোগ হল না। তবুও আবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে বললাম। অনেক্ষণ পর আমাকে লে. মাহবুব এসে খবর দিল যে হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে অতি কষ্টে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম অয়ারলেসে কথা বলার জন্য। যখন আমি কথা বলতে চাই, তখনই অপরদিক থেকে কর্নেল খিজির হায়াত কিংবা ক্যাপ্টেন আমজাদ পাঞ্জাবী জবাব দেয়। তাদের কাছে কোন কথাই খুলে বলা সম্ভব হচ্ছিল না। শুধু এটুকু বুঝতে পারলাম কর্নেল খিজির হায়াত এবং চতুর্থ বেঙ্গল এর বাকী অংশ কুমিল্লা থেকে ২৫ তারিখে বি-বাড়িয়া এসেছে। কর্নেল খিজির হায়াত আমাকে জানালেন সব কিছু স্বাভাবিক এবং তিনি আরো জানালেন যে অতি সত্বর তিনি একবার শমসেরনগর পরিদর্শনে আসবেন। আমি তাকে জানালাম এখানে সব শান্ত এবং আমার এখানে থাকার কোন প্রয়োজনই নাই এবং আমাকে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হোক। তিনি জবাবে আমাকে শমসেরনগরেই থাকতে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পর আমি আবার অয়ারলেসে কথা বলার চেষ্টা করি। এবার ক্যাপ্টেন গাফফারের (এখন মেজর) সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম যে ক্যাপ্টেন গাফফারের নিকটে কোন পাঞ্জাবী অফিসার আছে। সেজন্য সব কথা খুলে বলতে পারছিলাম না। আমি শুধু বললাম যখন সুযোগ পাবে তখন মেজর শাফায়াত জামিলকে (বর্তমানে লে. কর্নেল) আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে। আরো কিছুক্ষণ পরে মেজর শাফায়াত জামিল আমার সঙ্গে অয়ারলেসে কথা বলেন এবং জানালেন ঢাকাতে পাক সেনাবাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে এবং এখনো ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই কথা চলছিল ২৬শে মার্চের সন্ধ্যা বেলায়। শাফায়াত জামিল লোকমুখে শূনেছেন যে সব লোক ঢাকা থেকে পালিয়ে কুমিল্লার দিকে এবং ব্রাহ্মবাড়িয়ার দিকে আসছে। মেজর শাফায়াত জামিল এবং ক্যাপ্টেন গাফফার আরো জানান যে ব্রাহ্মবাড়িয়াতেও সাক্ষ্য আইন জারি করা হইয়াছে এবং ৪র্থ বেঙ্গলকে এটা কার্যকরী করতে বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মবাড়িয়ার জনসাধারণ সাক্ষ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করেছে। এমতাবস্থায় তাদের করণীয় কি তা আমার কাছে জানতে চাইলেন।

আমার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া কঠিন ছিল। আমি প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থান করছি। সমস্ত বাংলাদেশে আর কোথায় কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। ঢাকা শহরে পাক বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে এবং আরো অনেক জায়গাতেও করেছে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই যে তাদের কাছে কোন উপদেশ নেব। একদিকে সামরিক শৃঙ্খলা এবং কর্তব্যবোধ অন্যদিকে বিবেকের দংশন আমাকে পীড়িত করছিল। এই উভয় সংকটে পড়ে আমি আমার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলি। মেজর শাফায়াত জামিলকে বললাম, আমাকে কিছুটা সময় দাও, আমি কিছুক্ষণ পরে বলব এবং সঙ্গে সঙ্গে বললাম কোন মতেই যেন গুলি চালানো না হয়। লোকজনকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা কর। চিন্তায় আমি আমার কামরার চতুর্দিকে পায়চারি করতে শুরু করলাম এবং এমন অবস্থায় চিন্তায় মাথা ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি বসে পরলাম এবং লে. মাহবুবও (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) সেখানে বসে ছিল। আমার সঙ্গে যেসব বাঙ্গালী সৈনিকরা ছিল। তারাও উদ্ভিন্ন হয়ে আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল অবশেষে আমার বিবেক আমাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করল। এই অগ্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। যদিও কোন রাজনৈতিক নির্দেশ সেই মুহূর্তে ছিল না তবুও বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ই মার্চের ঘোষনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন “এবার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” আমি লে. মাহবুবকে ডেকে বললাম যে এই মুহূর্তে আমি স্বাধীন বাংলার আনুগত্য স্বীকার করলাম। এখনই সব সৈনিকদের বলে দাও আজ থেকে আমরা আর কেউ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত নই। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দাও। এখন থেকে আমরা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করবো। সব সৈনিকদের তৈরী হতে বল। এখান থেকে আমরা ঢাকার দিকে রওনা দেব এবং ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মবাড়িয়াতে একত্রিত করতে হবে। লে. মাহবুব যেন এই নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল।

সে দৌড়ে গিয়ে সবাইকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই আমি শুনতে পেলাম বঙ্গশার্ভুলদের শ্লোগান “জয় বাংলা”। আমি তাদেরকে প্রথমে শান্ত করলাম এবং বুঝিয়ে দিলাম আমাদের এখন থেকে যে সংগ্রাম শুরু হল সেটা কঠিন এবং বিপদসংকুল। সকলেই নিজেকে স্বার্থের উর্ধ্বে রেখে দেশ ওজাতির এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্য আত্মত্যাগ, আর্থিক কষ্ট এবং সব কিছু সুবিধা ত্যাগ করে আত্মবিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি দেখতে পেলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা সবাই দৃঢ় সংকল্পে থেকে আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রথমে অয়ারলেসে মেজর শাফায়াতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং তাকে নির্দেশ দিই যেন সেও তৈরী থাকে। তাকে আরো বললাম, কুমিল্লার রাস্তার দিকে খেয়াল রাখতে। তাকে আরো বললাম যে আমি অতি শিগগিরই ব্রাণবారిয়াতে পৌঁছব। ইতিমধ্যে আমার সমস্ত লোক ব্রাণবారిয়াতে রওনা হবার জন্য তৈরী হয়ে যায়। আমি লে. মাহবুবের সঙ্গে কিছুক্ষণ সংখ্যক সৈন্য দিয়ে শ্রীমঙ্গলে পাঠিয়ে দেই এবং সেখানে ডিফেন্স নিতে নির্দেশ দিই যাতে আমাদের যাওয়ার পথে মৌলভীবাজার থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এসে বাধা দিতে না পারে। শমসেরনগর থেকে জঙ্গলের পথে রাত বারোটায় আমি আমার কনভয় নিয়ে রওনা হয়ে যাই। রাস্তায় আমাদের অগ্রসর অনেক ধীর ছিল। কারণ সমস্ত রাস্তায় ব্যারিকেড এবং কোন কোন জায়গায় রাস্তা কেটেও দেওয়া হয়েছিল। জঙ্গলের অনেক জায়গায় বিরাট গাছ কেটে রাস্তার উপর ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই সব প্রতিবন্ধক আমাদেরকে কেটে কেটে বা মাটি ফেলে পরিষ্কার করে অগ্রসর হতে হবে। সব প্রতিবন্ধকের কাছেই অনেক লোক লুকিয়ে দেখছিল আমরা কি করি। যখনই তারা বুঝতে পারত আমরা বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ঢাকার দিকে বা ব্রাণবారిয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখনই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলতে এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে সাহায্য করত। তাদের সহায়তায় এবং সক্রিয়তায় আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল কম সময়ের মধ্যে এগিয়ে যাবার। এভাবে অতি মন্থর গতিতে এগোতে এগোতে আমি ভোর পাঁচটায় সাতছড়িতে পৌঁছলাম। এখানে আমার সৈনিকরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। এখানে এসে আমি আবার অয়ারলেসের মাধ্যমে ব্রাণবారిয়াতে যোগাযোগ করি। ঐ অবস্থাতে কর্নেল খিজির হায়াতের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে সেখানে সব কিছু ঠিকঠাক। মেজর শাফায়াত জামিলও আমার সঙ্গে কথা বলে। সে তার উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং জানতে চায় আমি কোথায় এবং আসতে কেন দেরী হচ্ছে। আমি বললাম ভয়ের কোন কারণ নেই কেননা আমি অনেক কাছে এসে গেছি। তাকে আশ্বাস দিয়ে আবার রওনা হই। সকাল ৬টায় ব্রাণবారిয়া থেকে দশ মাইল দূরে মাধবপুরে পৌঁছি। এবং মেজর শাফায়াত জামিলের সঙ্গে অয়ারলেসে কথা বলি। তিনি আমাকে জানান, সকাল দশটার সময় কর্নেল খিজির হায়াত একটা কনফারেন্স ডেকেছেন (আমি পরে জানতে পারি যে কুমিল্লা থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এর একটা কোম্পানী সেই সময়ে আসছিল।) কনফারেন্সের কথা যখন আমি শাফায়াতের কাছে শুনতে পেলাম তখন আমি যথেষ্ট উদ্ভিগ্ন হয়ে যাই এবং তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সন্দেহান হয়ে উঠি। আমি শাফায়াতকে তখনই নির্দেশ দিই আমার জন্য অপেক্ষা কর না। প্রয়োজন হলে সমস্ত পাঞ্জাবী অফিসারকে কর্নেল খিজির হায়াতসহ গ্রেফতার করে ফেল এবং যত পাঞ্জাবী সৈনিক আছে নিরস্ত্র কর। আমি আবার রওনা হয়ে গেলাম। পরে শুনতে পেলাম ব্রাণবাড়িয়াতে কি হয়েছে। দশটা বাজার দশ মিনিট আগে কর্নেল খিজির হায়াত মেজর নেওয়াজ, ক্যাপ্টেন আমজাদ কনফারেন্সে বসেছিল। এমতাবস্থায় মেজর শাফায়াত জামিল লে. কবির (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) লে. হারুন (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) হঠাৎ সেই কামরায় প্রবেশ করেন এবং পাঞ্জাবী অফিসারদের তাদের অস্ত্র সমর্পন করার নির্দেশ দেন। মেজর নেওয়াজ জিনি নিজে একজন কমান্ডো ছিলেন তিনি কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু লে. হারুন ত্বরিত প্রচেষ্টায় তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং সব পাঞ্জাবী অফিসারকে তারা বাংলাদেশের নামে গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যে বাকী বঙ্গশার্ভুলরা বাইরে যে সব পাঞ্জাবী সৈনিক ছিল, তাদের নিরস্ত্র করে এবং যারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তাদের চরম শাস্তি প্রদান করা হয়। ব্রাণবাড়িয়া শত্রুশূন্য করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়। দিনটি ছিল ২৭শে মার্চ। ইতিমধ্যে আমি ব্রাণবাড়িয়ার অতি সন্নিহিত এসে গেছি। আমার বাহিনী এবং শাফায়াতের বাহিনী বেলা ১১টার দিকে সম্মিলিত হয়। আমি বুঝলাম আমার প্রথম কর্তব্য হল যে সমস্ত এলাকা মুক্ত হয়েছে তা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। আমি প্রথমেই অফিসারদের নিয়ে একা বৈঠক

করি এবং এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে কার্যকরী করতে হবে তার সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনা জানাই। আমার এই পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমরা মেঘনা নদীকে উত্তরে রেখে পশ্চিম প্রতিরক্ষা লাইন তৈরী করব এবং দক্ষিণে ময়নামতি সেনানিবাস পর্যন্ত মুক্ত করে প্রতিরক্ষা লাইন তৈরী করব এবং দক্ষিণে ময়নামতি সেনানিবাস পর্যন্ত মুক্ত করে প্রতিরক্ষা বন্দোবস্ত করব। উত্তর-পূর্বে মৌলভীবাজার থেকে সিলেট পর্যন্ত মুক্ত করে প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করব। উত্তর-পূর্বে মৌলভীবাজার থেকে সিলেট পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করে সিলেটে আর একটি ঘাটি স্থাপন করব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভৈরববাজারে প্রথম দুটো কোম্পানী পাঠিয়ে দিই। আর একটা পার্টিকে কুমিল্লার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে অগ্রসর হতে বলি। মেঘনার পূর্ব পারে একটা প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করার ব্যবস্থা করি। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চতুর্দিকে তিতাস নদীর চতুর্দিকে একটা আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করি। ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে একটা কোম্পানী দিয়ে সিলেটের দিকে অগ্রসর হবার জন্য পাঠিয়ে দেই। শ্রীমঙ্গলে তাদের সাথে স্থানীয় সংগ্রামী আনসার, মুজাহিদ এবং আরো কিছুসংখ্যক সৈন্য কর্নেল রবের নেতৃত্বে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল) যোগ দেয়। এই দলটির সাথে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের যে সব সৈন্য মৌলভীবাজারে ছিল তাদের সাথে লড়াই হয় এবং পাঞ্জাবীরা অনেক হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরে মৌলভীবাজার থেকে পালিয়ে যায়। সিলেট শহর পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমি বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তখন মহকুমা প্রশাসক ছিলেন জনাব রকিব। তিনি অত্যন্ত উৎসাহী, সাহসী এবং সংগ্রামী ছিলেন। তিনি সব সময় আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বেসামরিক সাহায্যের যতটুকু প্রয়োজন ছিল যেমন রসদ সরবরাহ, যানবাহন যোগার, সৈনিকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসা, আর্থিক সাহায্য তিনি অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে করেছেন। তিনি পুলিশ অয়ারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত জেলা এবং মহকুমা প্রশাসকদের কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে, মেজর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট স্বাধীনতা যুদ্ধ করছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করেছে। ঐ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমার সাথে জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, সাচ্চু মিয়া প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয়। এবং তাদেরকে আমি আমার বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমার আনুগত্যের কথা বলি। তারা আমাকে সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করেন। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে এই যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করা যায়। আমি তাদের অনুরোধ জানাই, যে কোনো উপায়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে যদি কোনো অস্ত্রশস্ত্র আনার বন্দোবস্ত করতে পারেন তাহলে আমি আমার এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো সুন্দর ও শক্তিশালী করতে পারি। আমি তখন জানতাম যে, আমার কাছে যা গোলাবারুদ আছে তা নিয়ে বেশী দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তারা এই বার্তা নিয়ে আগরতলাতে চলে যান।

এই সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসরমান পাঞ্জাবী সৈন্যদের সাথে আমার অগ্রবর্তী সৈন্যদের কোম্পানীগণে লড়াই হয়। এতে পাকিস্তানীরা অনেক হতাহত হয়ে আবার কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। ২৯শে মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে শত্রুসেনা প্রথম বিমান হামলা চালায়। এতে আমার একজন সৈনিক শহীদ হন। সেদিনই সন্ধ্যায় পাকিস্তানীদের একটা রেকি পার্টি (তথ্য অনুসন্ধানী দল) একজন অফিসার এবং ৮ জন সিপাহী সহ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসে। এই দলটি আমাদের অগ্রবর্তী ঘাটির অ্যামবুশে পড়ে যায় এবং অফিসারসহ সব শত্রুসেনা এবং একখানা গাড়ী ধ্বংস করে দিই। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপর বিমান হামলা আরো চলতে থাকে এবং আমাদের প্রতিরক্ষা আরো অধিকতর শক্তিশালী হতে থাকে। আমি এই অবস্থাতে ভৈরব বাজার এবং নরসিংদীর ভিতরের রেলওয়ে লাইন অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে দিই এবং আর একটা দলকে নরসিংদী পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিই। আমার এই দলটির সঙ্গে ঢাকা থেকে আগত আর একটি সাবেক ইপিআর এবং দ্বিতীয় বেঙ্গলের কিছু সৈন্যের যোগাযোগ স্থাপন হয়। এই সম্মিলিত দলটি ঢাকা থেকে পাকসেনাদের অগ্রসরমান এক বিরাট বাহিনীকে অ্যামবুশ করে পর্যুদস্ত করে এবং ঢাকার দিকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে।

আমাদের তখনো বাইরে আর কোন প্রতিষ্ঠান বা বাঙ্গালী সেনাবাহিনীর আর কোন দলের সাথে যোগাযোগ হয়নি। অন্যান্য জায়গা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম।

আমি জানতে পাই যে মেজর সফিউল্লাহ (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জে এসে তার দ্বিতীয় বেঙ্গলকে একত্রিত করেছে। আমি আরো জানতে পারলাম যে, সে তার মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ঢাকা অভিযুক্ত যাবার পরিকল্পনা করেছে। এই সংবাদে আমি অতিশয় উদ্ভিগ্ন এবং চিন্তিত হয়ে পড়ি। কারণ আমি জানতাম ঢাকাতে পাকিস্তানীদের অন্ততপক্ষে দুটো ব্রিগেড সৈন্য আছে। তাছাড়া সাঁজোয়া বাহিনীর ট্যাংক, গোলান্দাজ বাহিনীর কামান এবং বিমান বাহিনী আছে। এসব অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আধুনিক মরনাস্ত্রে সজ্জিত। বিরাট পাক সেনার বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করার মানেই ছিল আমাদের শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। আমার সঙ্গে মেজর সফিউল্লাহর যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত কোন সরাসরি রাস্তা না থাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ তার সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে এ সর্বনাশকে কিছুতেই রোধ করা যাবে না। অনেক চেষ্টার পর আমি একটা খালি রেলওয়ে ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করলাম। ক্যাপ্টেন মাহবুবকে সেই ইঞ্জিনে বসিয়ে সোজা কিশোরগঞ্জ পাঠিয়ে দিলাম। তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলাম। কোন কিছু করার আগে তিনি যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এবং সম্ভব হলে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাই।

এরপর ক্যাপ্টেন মাহবুব ফিরে এসে জানায় মেজর সফিউল্লাহ এবং সমস্ত সেনাদল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। মেজর সফিউল্লাহ তার বাহিনীকে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন এবং তিনি আমার হেড কোয়ার্টার তেলিয়াপাড়াতে আসেন। আমাদের দুটো দলের যোগাযোগ হওয়াতে আমাদের শক্তি ও মনোবল বেড়ে যায়। এরপর আমরা বসে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করি। আমরা জানতে পারি যে, পাকিস্তানীরা আমাদের আক্রমণ করার যথেষ্ট প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আমরা পাকিস্তানীদের আক্রমণের কৌশল সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের উপর বিমান, হেলিকপ্টার এবং নদী পথে ঢাকার দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। নদী পথে আক্রমণ করার জন্য তারা মেঘনার পথে গানবোটে আসতে পারে এবং মেঘনার দক্ষিণ পাড়ে ল্যান্ডিং করতে পারে এবং সাথে সাথে হেলিকপ্টারযোগেও কমাঙে এবং শত্রুবাহিনী নামাতে পারে।

যে বিস্তীর্ণ মুক্ত এলাকা আমাদের আয়ত্তাধীন ছিল, সে সব এলাকাতে সৈন্য রাখার মতো আমার কাছে সৈন্য ছিল না। সেই জন্য আমি আমার ট্রুপসকে যেখানে পাক বাহিনীর অবতরণের এবং আক্রমণের বেশি সম্ভাবনা, সেই জায়গাগুলোতে ডিফেন্স নেওয়ার বন্দোবস্ত করি। এই সময়ে আমি জানতে পাই ৪র্থ বেঙ্গল এর জনা পঞ্চাশেক সৈন্য যারা কুমিল্লার দক্ষিণে জাঙ্গালিয়া ইলেকট্রিক গ্রীড স্টেশনে প্রহরায় ছিল সেই সব সৈন্যরাও ২৫শে মার্চের পর নিকটবর্তী একটা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে এবং আমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। আমি এই অবস্থাতে তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে দেই এবং তাদেরকে আরও দক্ষিণে যেয়ে লাকসাম এবং কুমিল্লার মধ্যখানে লালমাই হিলের মধ্য প্রান্তে টেম্পল পাহাড় নামক এক জায়গায় প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ার নির্দেশ দিই। তাদের উপর এই নির্দেশ দিলাম যে, কুমিল্লা থেকে পাক বাহিনী লাকসাম, নোয়াখালী কিংবা চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হলে তাদের যেন এ্যামবুশ করা এবং বাধা দেওয়া হয়। এর মধ্যে আমি খবর পাই আখউড়া, কসবা, বুড়িচংখেলাতে পাকিস্তানী সেনা ইপিআর পোস্টগুলোতে বাঙ্গালী ইপিআরদের বিরুদ্ধে এখনো লড়াই করে যাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে আমি ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে (বর্তমানে মেজর) পাঠাই কিছু লোকজন নিয়ে যাতে বাঙ্গালী ইপিআরদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে এই সব পোস্টগুলো পাঞ্জাবীদের কবল থেকে মুক্ত করা যায়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইপিআর এবং স্থানীয় জনসাধারণের সম্মিলিত হামলায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের পর পাঞ্জাবীরা এই সব অবস্থান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই সব খণ্ডযুদ্ধের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কুমিল্লার গোমতী পর্যন্ত আমি সমস্ত এলাকা মুক্ত করতে সমর্থ হই এবং কুমিল্লা শহরের বিবিরবাজার নামক একটা জায়গায় একটা প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি।

ইতিমধ্যে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং সাচ্ছু মিয়া'র প্রচেষ্টায় আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রের কিছু সাড়া পাওয়া যায়। সীমান্তে আমার সঙ্গে আগরতলার জেলা প্রশাসক মি. সাইগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তখনও তাদের কোন ধারণা ছিল না। আমার কাছে বিস্তারিত জানতে পেরে তিনি আমাকে জানানেন যে এ সম্বন্ধে তিনি তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। তাকে আমি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান। কয়েকদিন পর আবার সীমান্ত এলাকায় ভারতের সেনাবাহিনীর ৫৭তম ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল গানজালভেজ এর সঙ্গে দেখা হয়। তাকেও আমি ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিই। তখন পর্যন্ত আমরা কোনো সাহায্য পাইনি।

এপ্রিল মাসের ২/৪ তারিখে কুমিল্লার সীমান্তে মতিনগরের নিকট কর্নেল এম এ জি ওসমানী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) যখন ভারত সীমান্তে পৌঁছেন তখন আমার সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি প্রথম আমার কাছে সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন এবং তার পরই তিনি আগরতলাতে চলে যান। পরের দিন সন্ধ্যায় আমার হেড কোয়ার্টার তেলিয়াপাড়াতে কর্নেল ওসমানী আমাকে মেজর সফিউল্লাহ লে. কর্নেল রবকে (বর্তমানে মেজর জেনারেল) নিয়ে একটা বৈঠক করেন। এই বৈঠকে আমরা যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে তাকে জ্ঞাত করি। আমি তাকে আরও জানাই, আমাদের যে শক্তি আছে তা দিয়ে বেশি দিন পাকবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অতিসত্বর বন্ধুরাষ্ট্র থেকে বা অন্য কোন জায়গা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যাবস্থা করতে হবে। এছাড়া তাকে আরো অনুরোধ করা হয় আরো নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অতি শিগগির আমাদের বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হউক যাতে আমরা বহির্জগতের স্বীকৃতি পাই এবং যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাই। তিনি আমাদের বক্তব্য বুঝতে পারলেন এবং আগরতলা থেকে কলকাতা চলে গেলেন। কিছুদিন পর ১৭ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে স্বীকার করে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

এই সময় বন্ধুরাষ্ট্র থেকে বিএসএফ এর ব্রিগেডয়ার পাণ্ডে আমাদের হেডকোয়ার্টার আসেন এবং আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আপ্রান চেষ্টা করেন আমাদের সহায়তা করার কিন্তু সে সাহায্য ছিল নগণ্য। আমরা চাচ্ছিলাম হালকা এবং ভারী স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ার মর্টার। কিন্তু সে সময় আমাদেরকে খুবই সামান্য ৩০৩ রাইফেল এবং সামান্য গুলি সাহায্য দেওয়া হয়। তা ছিল আমাদের দরকারের চেয়ে অনেক নগণ্য। এই সময়ে ব্রিগেডয়ার পাণ্ডে আমাদেরকে মেজর জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে বিস্তারিত জানান এবং একদিন মেজর জিয়াউর রহমানকে (বর্তমানে ব্রিগেডয়ার) সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, পাক বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং যুদ্ধ করার জন্য তার কাছে অতি নগণ্যসংখ্যক সৈন্য আছে এবং তিনি আমাকে ও মেজর সফিউল্লাহকে মেজর জিয়াউর রহমানকে কিছু সৈন্য দেওয়ার অনুরোধ করেন। আমি এবং মেজর সফিউল্লাহ নিজ নিজ বাহিনী থেকে দুটো শক্তিশালী কোম্পানী গঠন করে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট প্রেরণ করি।

এই সময় পাকবাহিনী আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং পাশুবর্তী এলাকাসমূহে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর ওপর প্রবল বিমান আক্রমণ চালাতে থাকে। এই আক্রমণ এতই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে, মাঝে মধ্যে ৭ থেকে ৯ ঘন্টা অনবরত স্ট্রাইপিং রকেটিং এবং বোম্বিং করতে থাকে। এপ্রিল মাসের শেষে পাকবাহিনী বিমান বাহিনীর সহায়তায় হেলিকপ্টার এবং গানবোটের সাহায্যে আমাদের আশুগঞ্জ পজিশনে সৈন্য অবতরণ করায়। আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের বিমান বাহিনী এবং ছত্রীদের সম্মিলিত সাড়াশি আক্রমণের মুখে অসহায় হয়ে আশুগঞ্জ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পিছু হটে আসে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও শত্রুবাহিনীর সাথে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত আমরা শত্রুসেনাকে ঠেকিয়ে রাখি এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুদের সাজোয়া বাহিনী বিমান বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে আর টিকতে না পেরে আমরা দুই রাস্তায় পিছু হটে গেলাম। আমার সৈন্যরা ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে আখাউড়াতে এসে তিতাস নদীর উপর পুনরায়

প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। মেজর সফিউল্লাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে মাধবপুরের দিকে চলে যায়। পাক বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এক ব্যাটালিয়ন শক্তি নিয়ে আসে এবং আখাউড়া আক্রমণ করে কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহত স্বীকার করে তারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

আমি এই সময়ে কুমিল্লার দক্ষিণে যে দলটি ছিল অর্থাৎ ৪ বেঙ্গলের বি কোম্পানী তাদেরকে লে. মাহবুব এবং লে. দিদারুলের (বর্তমানে উভয়েই ক্যাপ্টেন) নেতৃত্বে আরও কিছু সৈন্য পাঠিয়ে জোরদার করি।

কুমিল্লা থেকে এপ্রিল মাসের ১৫/১৬ তারিখে পাক বাহিনীর বিরাট এক কনভয় প্রায় ৩০টি গাড়ীতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লাকসামের দিকে যাচ্ছিল। লে. মাহবুবের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বি কোম্পানীর সৈন্যরা শত্রুসেনারা এই দলটিকে দুপুর বারোটায় জাঙ্গালিয়ার নিকটে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে শত্রুসেনাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। সংঘর্ষ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। পাকসেনারা গাড়ী থেকে নেমে এ্যামবুশ পার্টিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের সৈন্যদের সাহসিকতা এবং কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষে লে. মাহবুব এবং লে. দিদার যথেষ্ট কৌশলের এবং যুদ্ধনিপুণতার পরিচয় দিয়েছিল। লে. মাহবুব তাঁর সৈন্যদের নিয়ে রাস্তার পূর্ব পাশে এ্যামবুশ করে ওঁৎ পেতে বসেছিল। যখন শত্রুদের কনভয় তার এ্যামবুশ-এর মাঝে পড়ে যায়, তখন সে তাদের উপর তার লোকজন দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকে। এতে কটা গাড়ী রাস্তা থেকে একসিডেন্ট করে পড়ে যায়। বাকী গাড়ীগুলো থেকে পাকসেনারা লাফালাফি করে নীচে নামার চেষ্টা করে। এতেও তাদের যথেষ্ট হতাহত হয়। যে সব পাকসেনা গাড়ী থেকে ভালভাবে নামতে পারে তারা রাস্তার উপরে (পশ্চিম দিকে) গিয়ে একত্রি হয় এবং লে. মাহবুবের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এদিকে লে. দিদারুল আলম রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈন্য নিয়ে তৈরী ছিল। সে পাকিস্তানীদের উপর আকস্মাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই ভাবে দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে এবং নিজেদের এত হতাহত দেখে শত্রুসেনাদের মনোবল একবারেই ভেঙ্গে যায়। মৃতদেহ ফেলে রেখে তারা কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধের ফলে লে. মাহবুব এবং লে. দিদারুল আলমের সম্মিলিত দলটি ২টি মেশিনগান ৬টি হালকা মেশিনগান এবং অজস্র রাইফেল আহত এবং নিহত শত্রু সেনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। যে বিধ্বস্ত গাড়ীগুলো শত্রুরা ফেলে গিয়েছিল তা থেকে কয়েক হাজার এ্যামুনিশন উদ্ধার করা হয়। এর তিন দিন পরে স্থানীয় জনসাধারণ আরও ২টি হালকা মেশিনগান, কয়েকটা রাইফেল এবং বেশ কিছু গোলাবারুদ যা শত্রুসেনা পালিয়ে যাবার সময় ধানক্ষেতে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে পৌঁছে দেয়। এই একশনের ফলে আমার এ্যামুনিশনের প্রয়োজনীয়তা সাময়িকভাবে মিটেছিল এবং পাক বাহিনী বেশ কিছুদিন কুমিল্লার দক্ষিণে অগ্রসর হবার সাহস দেখায়নি।

এই সময় আখাউড়াতে পাক বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিক থেকে আবার আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে তাদের ২৫ জনের মত হতাহত হয় এবং পাক বাহিনী আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পশ্চাদপসরণ করে। এপ্রিল মাসের শেষে পাক বাহিনী কুমিল্লা থেকে উত্তর দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাস্তায় অগ্রসর হয়ে ১২ নং ফ্রান্টিয়ার ফোর্স নিয়ে সাইদাবাদ দখল করে নেয়। পরে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে তারা নিয়ামতাবাদ, গঙ্গাসাগর দখল করে নেয়। আমি তখন কুমিল্লার বিবিরবাজার এলাকাতে যেখানে পাকবাহিনী প্রতিদিন আক্রমণ চালাচ্ছিল সেখানে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলাম। গঙ্গাসাগর, নিয়ামতাবাদ শত্রুবলিত গুনতে পেয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে নির্দেশ দিই ৪র্থ বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানী নিয়ে কসবার উত্তরে চন্ডিমুরা উচ্চ পাহাড়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ শক্ত করতে এবং সেই রাতেই কুমিল্লার দক্ষিণ হতে ৪র্থ বেঙ্গলের আলফা কোম্পানীকে উঠিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাসাগরের নিকটে দুটি কোম্পানীকেই একত্রি করি। সন্ধ্যায় যখন আমি চন্ডিমুরার নিকটে পৌঁছি তখনই শত্রুদের অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা বিবরণ ইপিআরদের কাছ থেকে অবগত হই এবং সেই রাতেই গঙ্গাসাগর এবং নিয়ামতাবাদে শত্রুদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিই। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন গাফফার এবং একজন সুবেদারের নেতৃত্বে আলফা, চার্লি এবং ডেল্টা কোম্পানী নিয়ে ভোর পাঁচটায় শত্রুদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেই। এই আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল যে ক্যাপ্টেন গাফফার এবং ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন পূর্ব দিক

থেকে শত্রুদের গঙ্গাসাগর পজিশনের পিছন দিক দিয়ে ইনফিলট্রেট করে ভিতরে ঢুকে গঙ্গাসাগরের উপর আক্রমণ চালাবে এবং এই সময়ে সুবেদার তার আলফা কোম্পানী নিয়ে নিয়ামতাবাদের উপর যে জায়গাতে আমরা শত্রুদের হেড কোয়ার্টার ভেবেছিলাম, সেখানে আক্রমণ চালাবে। এ দুই আক্রমণ এক সঙ্গে চারটায় শুরু হবে। আক্রমণের ঠিক দশ মিনিট আগে সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গলের মর্টার এই দুই পজিশনের উপর গোলা ছুঁড়বে। রাত বারোটায় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি এই তিন কোম্পানী নিয়ে শত্রুদের ঘাটিতে ঢুকে যাই। সেদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। চতুর্দিকে বেশ পানি জমছিল। আমাদেরকে হাটু পানি ভেঙ্গে ত্রাসের রাস্তায় অগ্রসর হতে হচ্ছিল। এক সয়ে আমার মনে হচ্ছিল আমরা যেন আমাদের ঠিক পথে যাচ্ছি না এবং এই সময়ে নিকটবর্তী একটা বাড়ির একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। সেও একজন পুরানা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তি ছিল। এই ব্যক্তি আমাদেরকে শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে দিনে দূরে থেকে যা দেখেছে সে সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত খবর দেয়। এই ব্যক্তির সাহায্যে আমি এবং আমার প্রত্যেকটি দল ভোর পাঁচটায় আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাই। আক্রমণ করার সময় নির্দিষ্ট ছিল রাত চারটা। যেহেতু আমরা দেবীতে পৌঁছি সেহেতু পাঁচটায় পরিল্পনামত আক্রমণ শুরু করে দিই। শত্রুসেনারা অকস্মাৎ তাদের অবস্থানে এবং পিছনে ভয়ংকর গোলাগুলির শব্দ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তারা গঙ্গাসাগর এবং নিয়ামতাবাদ ছেড়ে সাইদাবাদে পশ্চাদপসরণ করে। আমরা পরের দিন সকালে গঙ্গাসাগরে আবার প্রতিরক্ষাবূহ গড়ে তুলি। শত্রুসেনারা গঙ্গা সাগরে পর্যুদস্ত হয়ে কসবার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। তাদের প্রথম আক্রমণ আমরা ব্যর্থ করে দিই কিন্তু পড়ের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসেনারা টি, আলীর বাড়ি পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ঘাঁটি গড়ে তোলে। আমরা আমাদের কসবা পুরানা বাজারে পজিশন শক্তিশালী করে তুলি এবং শত্রুসেনাকে কসবার দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেই। টি, আলীর বাড়িতে শত্রুসেনাদের যে ঘাঁটি ছিল সে ঘাঁটিতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল-এ ডেল্টা কোম্পানী মর্টারের সহায়তায় ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন অকস্মাৎ আক্রমণ করে। এই আক্রমণে শত্রুদের চার পাঁচটা গাড়ীতে আগুন লেগে যায় এবং তাদের ২০/৩০ জন হতাহত হয় তারা টি, আলীর বাড়ী ছেড়ে আরো পেছনে হটে যায়।

ইতিমধ্যে কুমিল্লা বিবিরবাজার পজিশনের উপর পাক বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করতে শুরু করে এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কুমিল্লা শহরের সন্মিকটে দেড় মাইল পূর্বদিকে তারন্যপুর শত্রু দখল করতে সমর্থ হয়। আমি ইপিআর-এর একটি কোম্পানী এবং কিছুসংখ্যক বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈন্য দিয়ে বিবিরবাজার প্রতিরক্ষাবূহ আরও ইপি আর-এর একটি কোম্পানী এবং কিছুসংখ্যক বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈন্য দিয়ে বিবিরবাজার অবস্থানটির উপর পাকসেনাদের লক্ষ্য এ জন্য ছিল যে প্রতি রাতে এখান থেকে আমার ছোট ছোট কমাণ্ডো পার্টি গোমতী নদী অতিক্রম করে কুমিল্লা শহরে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর অতর্কিত হামলা চালাতো এবং ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। এখান হতে আমরা অনেক সময় তাদের অবস্থানের উপর মর্টার হামলাও চালাতাম। এতে প্রায়ই পাক সেনাদের অনেক লোক হতাহত হত। অবশেষে পাক বাহিনী একদিন সন্ধ্যার সময় অতর্কিতে এই পজিশনের উপর ৩৯তম বেলুচ রেজিমেন্টের সাহায্যে গোলন্দাজ বাহিনী এবং ট্যাংকের সহায়তায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রথমে শত্রুসেনা পূর্ব দিকে আক্রমণ চালনা করে। এই আক্রমণ আমার সৈনিকরা নস্যাত করে দেয় এবং শত্রুদের অনেক লোক নিহত এবং আহত হয়। এরপর শত্রুসেনারা দক্ষিণ দিক হতে আমাদের পজিশনের উপর পিছনে বাম পার্শ্বে ট্যাংক ও ৩৯তম বেলুচ রেজিমেন্টের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ অন্ততপক্ষে চার-পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে। আমাদের গুলিতে শত্রুদের অন্ত ১১০ থেকে ১৫০ জন নিহত বা আহত হয়। কিন্তু ট্যাংক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে এবং পিছন দিক হতে ঘিরে ফেলার আশংকা থাকায় আমাকে বাধ্য হয়ে এই অবস্থান ছাড়তে হয়।

এই যুদ্ধে ইপিআর জওয়ানরা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে মনে পড়ে এক নায়েকের কথা, যে শত্রুদের গুলি করতে করতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের নিহতের বিপুল সংখ্যা দেখে এক পর্যায়ে ‘জয় বাংলা’ হুংকার দিয়ে দাড়িয়ে পড়ে এবং সেই সময়ে হঠাৎ দুর্ভাগ্যবশত তার মাথায় গুলি লাগে এবং

সে মারা যায়। এ যুদ্ধে আমার ৬ জন সৈন্য মারা যায় এবং ৮/১০ জন আহত হয়। এই সব আহতদের আমরা পিছনে নিয়ে আসি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে পারি না। এ রকম একজন আহত তরুণ ছাত্রের কথা মনে পড়ে যায় পেটে গুলি লেগেছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপারেশন করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় সে মারা যায়।

এদিকে গঙ্গাসাগরে এবং আখাউড়ায় শত্রুসেনারা আবার তৎপর হয়ে ওঠে এবং বারবার আখাউড়া এবং গঙ্গাসাগরের উপর আক্রমণ চালায়। জুন মাসের প্রথমে পাকবাহিনীর ১২ তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ট্যাংক, কামান এবং বিমান বাহিনীর সহায়তায় আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন এবং গঙ্গাসাগরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৪র্থ বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানী কিছুটা পিছু হটে আজমপুর, আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে আধা মাইল পূর্বে আবার প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এই প্রতিরক্ষাব্যূহ সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা রেলওয়ে লাইনকেও শত্রুদের ব্যবহার থেকে বাধা দিতে সমর্থ। এই অবস্থানগুলির উপর পাক বাহিনী বারবার আক্রমণ চালায় এবং প্রতিবারই ৩০/৪০ জন করে সৈন্য হতাহত হওয়ায় তারা আক্রমণ থেকে নিরস্ত থাকে।

মে মাসে জেনারেল ওসমানী আমাদের হেড কোয়ার্টার-এ আসেন। সে সময় ভবিষ্যৎ যুদ্ধ পরিচালনা কিভাবে হবে সে সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। জেনারেল ওসমানী আমাকে নির্দেশ দেন যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলি। এই পরিকল্পনায় আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে দুই বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত করার পন্থা নিই। আমরা পরিকল্পনা করি যে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলে আমাদের শক্তিকে আরো বাড়াতে হবে। দুই রকমের বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত বাহিনী, যা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং অন্যান্য আর্মস ও সার্ভিসেস-এর একা ডিভিশন গড়ে উঠবে এবং কিছুসংখ্যক নিয়মিত সৈন্য নিয়ে প্রত্যেক সেক্টরেই কোম্পানী গঠন করা হবে এবং সেই সব কোম্পানী শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় কমাণ্ডো একাকশন চালিয়ে যাবে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর পুরানা এবং নতুন ব্যাটালিয়ান নিয়ে ব্রিগেড গঠন করে সেই সব ব্রিগেড শত্রুদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাবে এবং প্রয়োজন হলে দখলীকৃত অবস্থানগুলোতে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলবে। যেসব যুবক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে তাদেরকেও ট্রেনিং দিয়ে একটা অনিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই অনিয়মিত বাহিনী ছোট ছোট গ্রুপ এবং কোম্পানীতে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করে নিজ নিজ এলাকা শত্রুমুক্ত করবে এসব নিয়মিত বাহিনীর কোম্পানী এবং গ্রুপগুলো যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য তাদের পরিচালনার জন্য নিয়মিত বাহিনী থেকে জেসিও বা এনসিওদেরকে পরিচালনার জন্য পাঠান হবে। এই পরিকল্পনাতে আমরা আরো উল্লেখ করি যে নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত পাকিস্তানী নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গতের মতই হবে। কিন্তু অনিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত হালকা ধরনের হবে এবং এলএমজির চেয়ে ভারী অস্ত্র দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

জেনারেল ওসমানী আমাদের সাথে একমত হন এবং তিনি আমাদেরকে আশ্বাস দেন যে এই পরিকল্পনা যাতে তাড়াতাড়ি কার্যকর হয় তিনি তার চেষ্টা করবেন, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অনেক যুবক আমাদের কাছে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমি আমার হেড কোয়ার্টারে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করে দিই। এই ট্রেনিং ক্যাম্প বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং-এর প্রবর্তন করি। বিশেষ করে পাক বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে দেয়ার জন্য ডেমোলিশন ট্রেনিং-এর ভার ক্যাপ্টেন হায়দর (বর্তমানে মেজর) এবং হাবিলদার মুনিরের উপর ন্যস্ত করি। অতি সত্বরই আমার বেশ কিছু ডেমোলিশন টিম ট্রেন্ড হয়ে যায়। প্রথমই আমি এসব টিমগুলোকে ঢাকা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রেল লাইন এবং পাক সড়কে পাঠিয়ে দিই। তাদের এ কাজ দিই যে যতোটুকু সম্ভব পুল এবং রেলওয়ে লাইন ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। এসব কাজে আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধার সৃষ্টি হয় ডেমোলিশন-এর সরঞ্জামাদির অভাবে। আমরা হয়তো বারুদ পাই কিন্তু ফোটানোর জন্য ডেটোনেটোর পাই না

কিংবা অন্য কোনো সরঞ্জামাদি। এসব অসুবিধার মধ্যেও আমরা প্রত্যেকটি রেল এবং রাস্তাতে বেশ কিছুসংখ্যক পুল ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হই যার ফলে পাকিস্তানীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা- ঢাকার সঙ্গে এই সব প্রধান স্থানগুলোর- বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পাকিস্তানকে বিমান ও জলপথের সাহায্য নিতে হয়। এই রূপ অবস্থা শেষ পর্যন্ত চলে।

আমি আমার হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়া থেকে সরিয়ে কুমিল্লার কাছে মতিনগর নামক স্থানে স্থাপন করি। সেখান থেকে কুমিল্লা এবং ঢাকা কাছে হওয়াতে আমার পক্ষে এসব জায়গাতে গেরিলা তৎপরতা চালানো অনেক সুবিধাজনক হয়। আমার ট্রেনিং ক্যাম্প এ সময়ে অনেক বড় হয়ে যায় এবং হাজার হাজার ছেলেদের আমি ট্রেনিং দিতে শুরু করি। এসব ছেলেদের মধ্যে অনেককেই আমি নিয়মিত বাহিনীর শিক্ষা প্রদান করি। প্রথম অবস্থায় সৈন্যদের এবং অনিয়মিত বাহিনীর লোকদের থাকা খাওয়ার ও চিকিৎসার অত্যন্ত অসুবিধা হয়। আমাদের কাছে না ছিল রসদ, না ছিল টাকা পয়সা, না ছিল বাসস্থান। অনেক সময় এই সব হাজার হাজার লোককে খাওয়ানোর জন্য আমাকে বাংলাদেশের ভেতর বিভিন্ন রেশন ডিপো (এলএসডি) থেকে রসদ জোরপূর্বক আনতে হয়েছিল। কোন কোন সময় রসদের ব্যবস্থা হলেও হাজার হাজার লোকের খাবার তৈরীর হাড়ি পাতিল বাসনপত্র ছিল না। তেলের ড্রাম কেটে আমরা পাত্র তৈরী করে নিই। অনেক সময় এমন দিন যায় যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার ক্যাম্পের লোক খেতে পেয়েছে শুধু আধাসিদ্ধ ভাত, কোন সময় ডাল ছাড়াই। থাকার জন্য কোন আশ্রয় না তাকায় অধিকাংশ লোকজনকে বৃষ্টিতে ভিজতে হতো। কোন বিশুদ্ধ পানি ছিল না নালার পানি ব্যবহার করতে হতো। তবুও এত কষ্টের ভিতরে আমি ক্যাম্পে লোকজনের মুখে সব সময় হাসি এবং উৎফুল্ল ভাব দেখতাম। এরা সবাই নিয়মিত এবং গণবাহিনী মিলেমিশে সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে অব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। ভারত সরকার ইউথ ক্যাম্প তৈরী করার জন্য সাহায্য দেয়। আমি আগরতলার রিলিফ ডিপার্টমেন্ট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা ইউথ ক্যাম্পের অনুমোদন করিয়ে নিই। তাদের কিছুটা আর্থিক সহায়ের ব্যবস্থা করি এবং আমার লোকদের প্রচেষ্টায় আমরা মেলাঘর নামক স্থানে একটা ক্যাম্প গঠন করি। এ জায়গাটা পাহাড়ের উপর এবং জঙ্গলের ভিতর বেশ একটা সুন্দর জায়গায় অবস্থিত ছিল। পাকিস্তানী হামলার আশংকা থেকেও বিপদমুক্ত ছিল। এখানেই আমি আমার স্থায়ী হেড কোয়ার্টার স্থাপন করি। এ ক্যাম্পটিতে বেশী জায়গা ছিল বলে আমি তিন চার হাজার লোককে একত্রে থাকা-খাওয়া এবং ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত করতে পারি। এ ক্যাম্পে আমি নিয়মিত ও গণবাহিনীর উভয় প্রকারের মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং শুরু করি। এ সময় কুমিল্লার দক্ষিণে আমার যে সব সেনাদল ছিল তাদেরকে নিয়ে একা সাবসেস্টর গঠন করি। এ সাব সেস্টর হেড কোয়ার্টার আমি নর্ভয়পুরে স্থাপন করি। ক্যাপ্টেন আকবর (বর্তমানে মেজর) লে. মাহবুব এবং লে. কবির এই সাবসেস্টর থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এখান থেকে একটি কোম্পানী সুবেদার আলি আকবর পাটোয়ারীর অধীনে লাকসামের পশ্চিমবর্তী এলাকায় তাদের গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে এবং এখান থেকে নোয়াখালী, লাকসাম, কুমিল্লা, চাঁদপুরের রাস্তায় শত্রুসেনাদের উপর অনেক আক্রমণ চালাতে থাকে।

জুলাই মাসে শত্রুদের একটি শক্তিশালী দল এলাকাকে মুক্তি সেনাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য লঞ্চযোগে চাঁদপুর থেকে ডাকাতিয়া নদীতে অগ্রসর হয়। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী আগে থেকে এ সম্বন্ধে খবর পেয়েছিল। সে ছাতুরার নিকট একটি সুপারির বাগানে শত্রুসেনাকে এ্যামবুশ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। নদীর দু'পাশে হালকা মেশিনগান লাগিয়ে শত্রুদলের অপেক্ষায় ছিল। সকাল ১১ টায় শত্রুদল লঞ্চযোগে এ্যামবুশ অবস্থানের মধ্যে পৌঁছায় এবং নদীর দুই তীর থেকে আমাদের কোম্পানীর লোকেরা শত্রুসেনার উপর অতর্কিত গোলাগুলি চালায়। এতে লঞ্চের মধ্যে অনেক শত্রুসেনা হতাহত হয়। উভয় পক্ষের এ সংঘর্ষে শত্রুসেনারা পর্যুদস্ত হয়। উপায়ন্তর না দেখে শত্রুসেনারা পিছু হটে যায় এবং আবার লঞ্চ থেকে নেমে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এবারও তারা পরাস্ত হয়ে চাঁদপুরে ফিরে যায়। এ কোম্পানী পরে চাঁদপুর থেকে কুমিল্লার বেশ কয়েকটি সেতু ও রেলসেতু ধ্বংস করে দেয় পাক বাহিনী পরবর্তী পর্যায়ে অনেকবার আমাদের এ মুক্ত এলাকাকে দখল করার চেষ্টা করে কিন্তু তারা অসমর্থ হয় নর্ভয়পুর থেকে আমাদের সৈন্যরা এবং গেরিলা

বাহিনী লাকসাম-চট্টগ্রাম রেলওয়ে লাইনের লাকসাম ও চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণে রেলওয়ে সেতু এবং রাস্তার সেতু ধ্বংস করে দেয় এতে চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়।

উত্তরাঞ্চলে কসবা, মন্দভাগ, আখাউড়া শালদানদী প্রভৃতিতে যখন আমার সেনাদলের সাথে পাকবাহিনীর প্রত্যহ সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছিল, সে সময়ে কুমিল্লা দক্ষিণাঞ্চলে মিয়ার বাজার এবং চৌদ্দগ্রাম অঞ্চলেও আস্তে আস্তে পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। আমার ৪র্থ বেঙ্গল-এর বি কোম্পানীর একটি প্লাটুন এবং ইপিআর ও মুজাহিদদের নিয়ে গঠিত সম্মিলিত দলটি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মিয়ার বাজারে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়াকের উপর প্রতিরক্ষা অবস্থান গঠন করে ব্যূহকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। এর ফলে চট্টগ্রাম-ঢাকার মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পাকবাহিনীর মধ্যে এ অবস্থার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মিয়ার বাজারের নিকট যে রাস্তায় সেতুটি ছিল, সেটা ভেঙ্গে দেয়া হয়। এছাড়া কুমিল্লার ৬ মাইল দক্ষিণে বাগমারাতে যে রেলওয়ে সেতুটি ছিল, সেটাও উড়িয়ে দেয়া হয়। পাকবাহিনী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পুনরায় খোলার জন্য ৩০শে মে সকাল ছটায় দুই কোম্পানী সৈন্য নিয়ে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়। বেলা ১১টার সময় আমাদের একটি এ্যামবুশ দল মিয়ার বাজারের উত্তরে পাকসেনাদের উপরে অতর্কিত হামলা চালায়। শত্রু সেনাদল মিয়ার বাজারের এত আগে এ ধরনের হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে তারা সম্পূর্ণ হকচকিত হয়ে যায়। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে কুমিল্লার দিকে পলায়ন করে। এ যুদ্ধে শত্রুদের প্রায় ৫০ জন হতাহত হয় এবং আমাদের সেনা দল দুটি ৩ টনের গাড়ী গোলাবাবরুদসহ ধ্বংস করে দেয় এবং একটি গাড়ী দখল করে নেয়। আমাদের পক্ষে দুজন সৈন্য নিহত এবং একজন আহত হয় এরপর শত্রু কুমিল্লা বিমানবন্দর অবস্থান থেকে আমাদের মিয়ার বাজারের প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর ভীষণভাবে ভারী কামানের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থানের উপর পুনরায় আক্রমণ করার চেষ্টা চালায়। শত্রুদের একটি শক্তিশালী পেট্রোল পার্টি চেওরা হয়ে মিয়ার বাজারের পূর্বদিক দিয়ে আমাদের অবস্থানের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু লে. কবিরের নেতৃত্বে আমাদের একটা ছোট দল পাক বাহিনীর পেট্রোল পার্টিকে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে পাকবাহিনীর ১০ জন নিহত হয়। লে. কবির পাকবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

মিয়ার বাজারের অবস্থানটির উপর পাকসেনাদের চাপ বাড়তে থাকে। কামানের গোলা দিনে দিনে আমাদের অবস্থানের উপর তীব্র হতে থাকে। অবস্থানটি বেশী দিন আর টিকানো যাবে না ভেবে আমি লে. ইমামুজ্জামানকে একটু পিছু হটে চৌদ্দগ্রাম থানার বাজারের নিকট নতুন করে অবস্থান তৈরীর নির্দেশ দিই। ইমামুজ্জামান তাঁর দলকে নিয়ে চৌদ্দগ্রামে আবার এক নতুন প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এ প্রতিরক্ষাব্যূহ তিন দিকে মুখ করে গড়ে তোলা হয়। ৪র্থ বেঙ্গলের প্লাটুনটি মিয়ার বাজারে কুমিল্লার দিকে মুখ করে পজিশন নেয়। কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তায় মিয়ার বাজারের যে সেতুটি ছিল, সে সেতুটির দক্ষিণে অবস্থানটি গড়ে তোলে। এদের উপর দায়িত্ব ছিল কুমিল্লা থেকে পাক বাহিনীকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসরে বাধা দেওয়া। আরেকটি প্লাটুনকে পশ্চিম দিকে মুখ করে বাগমারা থেকে যে কাঁচা রাস্তা মিয়ার বাজারের দিকে আসে তার উপর প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করার নির্দেশ দিই। মুজাহিদ কোম্পানীর দায়িত্ব ছিল দক্ষিণ দিকে মুখ করে মিয়ার বাজার হতে আধা মাইল দক্ষিণে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা মহাসড়াকের উপর অবস্থান গড়ে তোলা এবং দক্ষিণ থেকে শত্রুসেনাদের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া। কিছু কিছু মাইন সরু বাঁশ কেটে আমার এ অবস্থানটির চতুর্দিকে পুঁতে দিই। দুই সপ্তাহ পরে শত্রুসেনারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ অবস্থানটির হেড কোয়ার্টার চৌদ্দগ্রাম থানায় স্থাপন করি। দুই সপ্তাহ পরে শত্রুসেনারা কুমিল্লার দিক থেকে এ অবস্থানটির উপর দুটি কোম্পানী নিয়ে আক্রমণ চালায়। কিন্তু শত্রুদের বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হওয়ার পরে তারা আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে। শত্রু আমাদের অবস্থানের উপর তাদের কামানের গোলা চালিয়ে যায়।

১৪ই জুন সকাল ৬টায় সময় পাকসেনারা নয়া বাজার হয়ে হয়ে চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তারা আমাদের একটা এ্যামবুশ পার্টির ফাঁদে নয়া বাজারের নিকট পড়ে যায়। শত্রুদের প্রায় ৩০ জন হতাহত হয় এবং

তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং পিছু হটে যায়। ১৯শে জুন সকাল ৬টায় পাকসেনারা অন্ততপক্ষে ২টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে দুই দিক থেকে (লাকসাম এবং ফেনীর দিক থেকে) প্রবল আক্রমণ শুরু করে। তীব্র কামানের গোলার মুখে আমাদের সম্মুখবর্তী সৈনিকরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। পাকসেনাদের আক্রমণ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পাকসেনাদের আক্রমণে আমাদের চৌদ্দগ্রামে অবস্থানটি সংকটময় হয়ে পড়ে। আর বেশিক্ষণ এ অবস্থানটিতে থাকলে রাতের অন্ধকারে শত্রুসেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার আশংকা ছিল। যদিও পাকসেনাদের সমস্ত দিনের যুদ্ধে অন্তত ২০০ জন হতাহত হয়েছিল এবং আমাদের পক্ষে ক্ষতির সংখ্যা ছিল ২ জন নিহত এবং ৪ জন আহত। তবুও চৌদ্দগ্রাম শত্রুদের প্রবল আক্রমণের মুখ থেকে আর রক্ষা করা যাবে না বলে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমাদের সেনাদল অবস্থানটি পরিত্যাগ করে।

মে মাসে যখন আমাদের শত্রুদের সঙ্গে সম্মুখসমর চলছিল, সে সময় আমার মুক্তিযোদ্ধারা শত্রু বাহিনীর পিছনে তাদের আক্রমণ চলিয়ে যাচ্ছিল। ২১ শে মে দুজন মুক্তিযোদ্ধা জামাল এবং খোকন একটি এ্যান্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে শত্রুবাহী একটি ট্রাককে কুমিল্লার নিকট উড়িয়ে দেয়। গেরিলাদের আর একটি পার্টি দেবীদ্বার থানা আক্রমণ করে ছয়জন দালাল পুলিশকে নিহত করে। গেরিলাদের হাতে হাজিগঞ্জ থানার একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ও দুইজন দালাল পুলিশ নিহত হয়। এ পুলিশদের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে পাকবাহিনীর একটি ছোট দল (দশজনের মত) হবিগঞ্জ থানা পাহারায় নিযুক্ত হয়। গেরিলারা একদিন আক্রমণ চালিয়ে তাদের চারজনকে নিহত করে।

এ সময়ে ঢাকাতে আমাদের কমাণ্ডো ছেলেরা নয়টি সরকারী অফিসে আক্রমণ চালিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেগুলো ছিল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, হাবিব ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সদরঘাট টার্মিনাল, পাকিস্তান অবজারভার অফিস প্রভৃতি। এসব আক্রমণে চারজন পাক সেনা অফিসার এবং দুজন সৈনিক নিহত হয়।

কুমিল্লার দক্ষিণে গৌরীপুর নামক স্থানে আমাদের কমাণ্ডোরা পাকসেনাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণেও পাকসেনাদের ৯ জন সৈন্য নিহত হয়।

পাকসেনারা ইতিমধ্যে শালদানদী এরিয়াতে বিশেষভাবে তাদের সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে থাকে। তাদের ১টা রেলওয়ে ট্রলি যা শত্রুদের জন্য রেশন এবং এমুনিশন নিয়ে যাচ্ছিল ২১ শে মে আমাদের একটা ছোট এ্যামবুশ দলের হাতে ধরা পড়ে। এর ফলে আমাদের হস্তগত হয় এমজিআইএ ৩, ৭৫ এম এম এবং ১০৬ আর আর এর শেল।

২২শে মে তারিখে মুজাহিদ ক্যাপ্টেন আবদুল হকের নেতৃত্বে একটি গেরিলা দল শালদানদী এলাকায় অবস্থানরত শত্রুদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির উপর অকস্মিক আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণটা শত্রুদের পিছন থেকে পরিচালিত করা হয়। শত্রুরা এ রকম আক্রমণের জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না। মুজাহিদ ক্যাপ্টেন আবদুল হকের প্লাটুন শত্রুদের অবস্থানটি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে। শত্রুরা তাদের অবস্থানের ভিতর এ অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণ হকচকিত হয়ে যায়। এ আক্রমণের ফলে পরে আমরা জানতে পারি যে, শত্রুদের প্রায় ১৫ জন হতাহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৪জন মারা যায়।

২৫শে মে রাত আড়াইটার সময় আমাদের এ্যামবুশ পার্টি বাটপাড়া জোড়কাননের নিকট শত্রুদের ১টা ট্রাক এবং ১টা আরআর রাইফেল-এর জীপ এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে শত্রুদের প্রায় ২০ জন সৈনিক ট্রাক এবং জীপসহ ধ্বংস হয়ে যায়। ২৯শে মে সকাল সাড়ে ৬টায় একটা এ্যামবুশ পার্টি সুবেদার আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ১৫ জন লোক নিয়ে কুমিল্লার উত্তরে রঘুরামপুর নামক স্থানে এ্যামবুশ করে বসে থাকে। শত্রুদের একটা পেট্রোল পার্টি ১ জন অফিসার ও ২৫ জন সৈন্য নিয়ে আমাদের এ্যামবুশের ফাঁদে পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ২৭ শে মে মন্দভাগ থেকে ১টি প্লাটুন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় কুট শাদানদীর সিএন্ডবি রাস্তার

উপর শত্রুদের এগামবুশ করে। এ এগামবুশের ফলে শত্রুদের ৯ জন লোক নিহত হয় এবং ১১টা জীপ ও ১টা ডজ ধ্বংস হয়ে যায়। শত্রুরা তাদের মৃতদেহগুলো রেখেই পালায়ন করে। পেট্রোল পার্টি ২ জন পাকসেনাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে সক্ষম হয়। মে মাসের মাঝামাঝি ফেনী এবং লাকসামের মাঝে রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া হয়। রেলওয়ে ব্রিজের উপর পাক সেনাদের ১০ জন পহারারত ছিল। তাদেরকেও সে সঙ্গে মেরে ফেলা হয়।

২৬ শে মে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে ১টি শক্তিশালী দল কসবার উত্তরে ইমামবাড়ীর নিকট ১৫০- পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস করে দেয়। এরপর এ দলটি শত্রুদের জন্য এগামবুশ করে বসে থাকে। শত্রুরা ব্রিজের দিকে অগ্রসর হয়। শব্দ শুনে আমাদের দল তৈরী হয়। ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছার আগেই পাক সেনারা এগামবুশ- এর ভয়ে সেখান থেকে ফেরত চলে যায়। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন পরে তার দলটিকে নিয়ে কর্নাল বাজারে শত্রু অবস্থানের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের সময় ৭৫-এমএম আর আর এর সাহায্যে শত্রুদের কয়েকটি ব্যাংকার ধ্বংস করে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে। এতে শত্রুদের ৮জন সেনা নিহত হয় এবং কয়েকটি ব্যাংকার ধ্বংস হয়।

আখাউড়া থেকে আমাদের অবস্থান পরিত্যাগ করার পর আমি আমার দলকে আখাউড়ার উত্তরে আজমপুর গ্রামে সিঙ্গারবিলে পজিশন নেওয়ার নির্দেশ দিই। লে. হারুনের নেতৃত্বে ১টি ইপিআর কোম্পানী এবং ৪র্থ বেঙ্গল-এর ১টি প্লাটুন আজমপুর রেলওয়ে কলোনী পছনে মাধবপুর সড়ক এবং রেল লাইনের উপর প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করে। এ জায়গাটা ছিল একটু উঁচু এবং এর ডান দিকে তিতাস নদী থাকতে এ অবস্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাকসেনারা প্রথমে বুঝতে পারেনি যে আমরা এ জায়গাতে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়েছি। শত্রুদল আখাউড়া দখল করার পর ভেবেছিল যে এবার তারা সিলেট আখাউড়া লাইনে ট্রেন যোগাযোগ পুনরায় চালু করবে। এ জন্য সিলেটের দিক থেকে ১টি লাইন ইঞ্জিন এবং কয়েকটি বগিসহ মাধবপুর থেকে দক্ষিণে পাঠায়। সিঙ্গারবিল স্টেশনের কিছু উত্তরে পুলের নিকট লে. হারুন কয়েকটি এ্যান্টি ট্যাংক মাইন রেল লাইনের নিচে আগেই পুঁতে রেখেছিল। এ ট্রেনটি লাইনের উপর দিয়ে আসার সময় মাইনের আঘাতে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এর কিছুদিন পরে পাকিস্তান বাহিনীর কিছু সৈনিক এবং রেলওয়ে কর্মচারীরা ট্রেন নিয়ে আসে এ ট্রেনটি তোলায় জন্য। কিন্তু পাক সেনাদের এ দলটি লে. হারুনের পূর্ব পরিকল্পিত এগামবুশে পড়ে যায়। এর ফলে প্রায় ২০ জন পাক সেনা নিহত এবং তারা রেলওয়ে কর্মচারীসহ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এর কিছুদিন পর লে. হারুন সিঙ্গারবিল রেলওয়ে ব্রিজ ১৪০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। পাকবাহিনী এ সেতুটি মেরামত করার জন্য রেলওয়ে কর্মচারী ও আরো সরঞ্জাম সিঙ্গারবিল রেলওয়ে স্টেশনে জমা করে। এরপর সেসব সরঞ্জাম তারা রেলওয়ে সেতুটির নিকট নিজেদের তত্ত্বাবধানে এবং পাহারাধীনে আনে। লে. হারুনের মর্টার প্লাটুন সুবেদার শামসুল হক (বর্তমানে সুবেদার মেজর) এ সময়েরই অপেক্ষায় ছিল। পাকবাহিনী কয়েকদিন পর সকালে যখন তাদের সেতু মেরামতের কাজ আরম্ভ করেছে, ঠিক সে সময় সুবেদার শামসুল হকের মর্টার তাদের লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে লে. হারুনও তার সৈন্যদের দিয়ে আক্রমণ চালায়। পাক বাহিনী এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তাদের সমস্ত সরঞ্জাম ফেলে সেখান থেকে পলায়ন করে এবং সে সঙ্গে সিলেট-চট্টগ্রাম রেলওয়ে লাইন তাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এ সংঘর্ষে পাকবাহিনীর দশজন লোক নিহত হয়।

কিছুদিন পর পাকবাহিনী আমাদের আজমপুর পজিশনের উপর কামান দিয়ে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে আজমপুর থেকে আমাদের অবস্থানটিকে দখল করতে না পারলে সিলেট ঢাকা রেলওয়ে লাইন তারা কখনো খুলতে পারবে না।

২৯ শে মে কিছু কিছু ফাইটিং পেট্রোল তারা আজমপুর পজিশনের পশ্চিম তিতাস নদী বরাবর পাঠায় আমাদের পজিশন বিস্তারিত জানবার জন্য। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এসব পাক দল আমাদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে

পলায়ন করে। আমরাও পাক সেনা বাহিনীর আখাউড়া অবস্থানে ছোট ছোট দল পাঠিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলি। আমরা জানতে পারি যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ট্রালি বা লাইট ইঞ্জিনের মাধ্যমে পাকবাহিনী তাদের রসদ এবং সরঞ্জাম আখাউড়াতে পাঠায়। এ খবর জানতে পেরে আমাদের ১টি দল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২ মাইল দক্ষিণে রেল লাইনের নিচে মাইন পুঁতে দেয়। কিন্তু পাকবাহিনী স্থানীয় দালালদের সহায়তায় এসব মাইন সম্মুখে জানতে পারে এবং সেগুলি উঠিয়ে নেয়। পাক বাহিনী এ সময়ে রেল লাইনের নিকটবর্তী গ্রামের লোকদেরকে কঠোর সতর্ক করে দেয় যে, কোন গ্রামের নিকটে মুক্তিবাহিনী যদি তাদের কোন ক্ষতিসাধন করে তবে সে গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হবে। এ সতর্কতার ঘোষণায় প্রতিদিন রাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো হতে লোকজন লাইন এবং সড়ক পাহারা দিত। এর ফলে আমাকে পাকবাহিনীর গতিবিধির উপর বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

এ রকমের বাধাবিপত্তির সম্মুখীন আরো অনেক জায়গাতে আমি হই। আমাদের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য যে সব জায়গায় আমার লক্ষ্যস্থল ছিল, সেখানে আমার সেনাদলগুলিকে সাক্ষ্য আইন (কারফিউ) জারি করার নির্দেশ দিই এবং এ নির্দেশ বহুলাংশে সফল হয়। যদিও গ্রামবাসীদের পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করার কোন ইচ্ছা ছিল না তারা তাদের ভয়ে এসব বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করতো। আমাদের সাক্ষ্য আইনের ঘোষণায় অনেক ফল হয় এবং গ্রামবাসীরা আর বাধা সৃষ্টি করে না। এরপর আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আখাউড়ার মাঝে ২টি রেল সেতু উড়িয়ে দিই। এর ফলে আখাউড়ায় পাকসেনাদের অবস্থানটির জন্য রসদ এবং অন্তঃস্থ সরবরাহে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। এরপর তারা আখাউড়াতে হেলিকপ্টারের সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতে বাধ্য হয়।

পাক বাহিনী আমাদের আজমপুর পজিশনের উপর তাদের চাপ বাড়াতে থাকে। তাদের ২টা কোম্পানী একদিন সকালে আজমপুরের আধ মাইল দক্ষিণে দরগার নিকট আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণ সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলে। আমাদের সৈন্যরাও আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রায় ৩০ জন শত্রুসেনা হতাহতের পর তারা আক্রমণ বন্ধ করে নিয়ে আবার পশ্চাদপসরণ করে।

বেশ কিছুদিন পর জুন মাসে পাকিস্তানী সৈন্য আবার মাধবপুরের রাস্তা এবং রেল লাইনের উপর আমার পজিশনের দিকে অগ্রসর হয়। এবার পাক সেনাদের ১২নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের অগ্রবর্তী দরগা পজিশন থেকে এ আক্রমণকে বেশ কয়েকদিন বিফল করে দেয়া হয় কিন্তু জুন মাসের শেষের দিকে আক্রমণ আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। পাক বাহিনী আখাউড়াতে ১২০ এম এম ভারী মর্টার এবং ১০৫ এমএম তোপ নিয়ে আসে। এসব কামানের গোলার আঘাতে এবং ১২ নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-এর প্রবল চাপে আমাদের অগ্রবর্তী পজিশন সংকটময় হয়ে ওঠে এবং শত্রুদের অন্তত ৫০ জন হতাহতের পর আমাদের পজিশন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়।

এর পর কিছুদিন পর জুলাই মাসে পাক বাহিনী আবার আজমপুরের দিকে মূল অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আবারও তারা মাধবপুরের সড়ক ও রেল লাইনের উপর ১২ নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং মিলিশিয়াসহ আক্রমণ চালায়। আক্রমণের পূর্বে প্রচণ্ড গোলাগুলি করতে থাকে। আমরা এ আক্রমণের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যখন পাক সেনারা সারিবদ্ধ লাইনে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আমাদের মর্টার এবং মেনিগান তাদের অন্ততপক্ষে ১০০/১২০ জনের মত লোককে হতাহত করে। তারা আমাদের অবস্থানের কোন কোন জায়গায় ঢুকে পড়ে কিন্তু আমাদের পাল্টা আক্রমণে আমরা পাক সেনাদের হটিয়ে দিই। এ সংঘর্ষ প্রায় দুই দিন চলে। আমরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, যেকোনো অবস্থাতেই আমরা আমাদের ঘাঁটি ছাড়বো না। শত্রুসেনাদের যথেষ্ট হতাহত হচ্ছিল প্রতিদিনই, কিন্তু তারাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমাদের এ অবস্থানটি দখল করার জন্য। তাদের কামানের গোলায় আমাদের পজিশনটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল কিন্তু তবুও আমাদের সৈনিকরা আত্মবিশ্বাস হারায়নি। আমাদের অবস্থানটি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাস্তার আগরতলা বিমানবন্দরের বেশ নিকটেই ছিল। এর ফলে পাকবাহিনীর কামানের গোলায় স্পিনটার মাঝে মাঝে বিমানবন্দরে

গিয়ে পড়ছিল। পাশ্চাত্য রাষ্ট্র আমাদের এ অবস্থাটি থেকে যুদ্ধ আরো চালিয়ে যাওয়ার আপত্তি করে। তাদের বিমানবন্দরে ক্ষতি হওয়ার আশংকায় এ আপত্তি করে। আমরা নিরুপায় হয়ে দেড় মাস যুদ্ধ চালানোর পর আজমপুর অবস্থান পরিত্যাগ করে সিঙ্গারবিলে নতুন অবস্থান গড়ে তুলি।

পাক বাহিনী মাধবপুর থেকে অগ্রসর হয়ে কমলছড়ি চা বাগান দখল করে নেয়। এই চা বাগানে তারা মিলিশিয়ার এক কোম্পানী এবং নিয়মিত বাহিনীর প্লাটুনসহ একটা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। লে. হারুন বুঝতে পারে যে, পাক সেনারা আখাউড়া থেকে (দক্ষিণ থেকে) এবং মাধবপুর থেকে (উত্তর থেকে) কমলছড়ি হয়ে তার সিঙ্গারবিল পজিশনকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করছে। লে. হারুন পাক বাহিনীকে পৃথকভাবে উত্তর এবং দক্ষিণে আঘাত হানার এ পরিকল্পনা নেয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কমলছড়ি চা বাগান প্রথম আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। জুলাই মাসে কমলছড়ি চা বাগান এবং চা বাগানে পাক বাহিনীর ঘাঁটি সম্মুখে সে বিস্তারিত খবরাখবর যোগাড় করে। একদিন রাত তিনটার সময় ৪র্থ বেঙ্গল-এর ১টা প্লাটুন এবং ইপিআর-এর ১টা কোম্পানী নিয়ে গোপন পথে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কমলছড়ি পাকবাহিনীর অবস্থানের ভিতর সাহসের সাথে ঢুকে পড়ে। এ অকস্মাৎ গোপন আক্রমণ পাক সেনাদলকে হতভম্ব করে দেয়। তাদের কিছু বুঝাবার বা বাধা দেয়ার আগেই লে. হারুনের দল পাক বাহিনীর অন্তত ছয়টা ব্যাংকার গ্রেনেডের সাহায্য ধ্বংস করে দেয়। এরপর সমস্ত রাত ধরে পাক বাহিনীর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই চলতে থাকে। পাকিস্তানী সৈন্যরা আকস্মাৎ আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে হকচকিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল। সে জন্য পরবর্তী পর্যায়ে যখন লে. হারুনের ছোট ছোট দলগুলি চা বাগানের সর্ব এবং গোপন রাস্তায় অগ্রসর হয়ে একটার পর একটা ব্যাংকার ধ্বংস করে যাচ্ছিল তখন উপায়ন্তর না দেখে পাক বাহিনীর সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে এবং এতে তাদের বেশ লোক গুলিতে নিহত হয়। সকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কমলছড়ি চা বাগানটি সম্পূর্ণ লে. হারুনের দখলে এসে যায়। এ যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানিদের ৫০ জন নিহত এবং আমাদের হাতে ৪টি মেশিনগান ও ৬টি হালকা মেশিনগান, বেশ কিছু রাইফেল এবং অজস্র গোলাগুলি ও প্রচুর রসদ এবং কাপড়-চোপড় হস্তগত হয়।

ক্যাপ্টেন গাফফার এবং ক্যাপ্টেন সালেকের নেতৃত্বে মুক্তিসেনারা মন্দভাগ এবং মালদানদীতে শত্রুসেনাদের উপর অনবরত আঘাত চলিয়ে যাচ্ছিল। ২৬শে মে রাত ৯টায় সুবেদার ভূইয়ার নেতৃত্বে দুটি সেকশন রকেট লাঞ্চার নিয়ে শত্রুর শালদানদীর পজিশনের ভিতর ঢুকে যায়। এরপর শত্রুদের ২টা ব্যাংকার তারা রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়। শত্রু তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালালে পেট্রোল পার্টি হালকা মেশিন গানের সাহায্যে শত্রুসেনাদের বেশ কিছু লোক নিহত করে এবং তারা পিছু হটে আসে। পরে জানতে পারা যায় যে, এ আকস্মিক হামলায় শত্রুদের ১ জন জেসিও এবং ৯ জন সৈন্য মারা যায়। ২৮ শে মে রাতে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডেরা কুমিল্লার নিকট কালিকাপুর রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেয়। ঐ দিনই সকালে পাকিস্তানী সেনারা কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের কাছে রঘুরামপুরে একটি কোম্পানী নিয়ে আসে। এ কোম্পানীকে আমাদের সেনাদল সকাল সাড়ে ৮টার সময় অতর্কিতে এগামবুশ করে এবং এগামবুশে পাকসেনাদের অন্তত একজন অফিসারসহ ৩৫ জন লোক হতাহত হয়। পাকসেনারা আঘাত খেয়ে মরিয়া হয়ে ভবনগর, শালুকমুড়া, খাড়েড়া, ফকিরবাজার প্রভৃতি গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয়। এ ছাড়াও শত্রুসেনারা তিন ইঞ্চি মর্টার এবং ১০০ এম এম ভারী মর্টারের সাহায্যে যথেষ্টভাবে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির উপর গোলা ছুঁড়তে থাকে।

২৮শে মে আর একটি পেট্রোল পার্টি নায়ক গিয়াসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে মনোহরপুর নামক গ্রামে শত্রুদের জন্য একটি এগামবুশ পেতে থাকে। পাকসেনাদের ১টি কোম্পানী জঙ্গলবাড়ীর দিকে যাচ্ছিল কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তা দিয়ে। সকাল সাড়ে ৮টায় পাকসেনাদের কোম্পানীটি নায়ক গিয়াসুদ্দিনের এগামবুশ-এর ফাঁদে পড়ে যায় এবং তাদের ২৫ জনের মত লোক হতাহত হয়। শত্রুসেনারা পিছু হটে এসে পুনরায় কামানের গোলায় সাহায্যে আক্রমণের চেষ্টা করে। তখন আমাদের এগামবুশ পার্টি তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে। শত্রু

পার্ব্বতী মাগুর, মনোহরপুর ইত্যাদি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় সাথে সাথে কামানোর সাহায্যে গোলা ছুঁড়তে থাকে।

শালদানদীর শত্রুঅবস্থানটির উপর আমাদের চাপ আরো বাড়াতে থাকি। ২৫ শে মে আমাদের আর একটি ছোট দল অতর্কিত হামলা করে পাকসেনাদের ১ জন জেসিও এবং ৫ জন সৈন্যকে নিহত করে। তাদের ২টি মর্টারও ধ্বংস করে দেয়া হয়। ২৭ শে মে শত্রুসেনাদের কুটি থেকে সিএন্ডবি রাস্তায় শালদা নদীতে আরো সৈন্য আনার চেষ্টা করে। সকাল ৭টায় মুক্তিবাহিনী পাকসেনাদের এ দলটিকে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশ-এর ফলে ১টা জীপ, ১টা ডজ ধ্বংস ও শত্রুদের ৯ জন লোক নিহত হয়। শত্রুরা সামনে অগ্রসর হতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়।

২৮ শে মে সকাল ৬টায় কুমিল্লার দক্ষিণে রাজারমার দীঘির শত্রুদের ১টা বাংকার আমাদের ২জন সৈনিক গোপনে গিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে ৪ জন লোককে নিহত করে এবং তাদের রাইফেলগুলি দখল করে নিয়ে আসে। ঐ দিন সকাল ৯টায় লাকসাম-কুমিল্লা রেল লাইনের উপর আলীশ্বরের নিকট মাইন পুঁতে ১টা রেলওয়ে ইঞ্জিন ও ২টি বগি লাইনচ্যুত করে। ২৬শে মে জগন্নাথদিঘী শত্রু অবস্থানের উপর লে. ইমামুজ্জামানের প্লাটুন রাত ১১টার সময় অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে ১টি প্লাটুন ২টি তিন ইঞ্চি মর্টার ২টি মিডিয়াম মেশিনগান ব্যবহার করে। আক্রমণের ফলে শত্রুদের ১৯ জন লোক হতাহত হয়। আমাদের ১টি পেট্রোল পার্টি ২৬শে মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা রোডের উপর উজানিরশা সেতুর নিকট পাকবাহিনীর পাহারারত সৈনিকদের ক্যাম্প আক্রমণের জন্য পাঠান হয়। আমাদের দলটির সঙ্গে কমান্ডো শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু লোকও ছিল। কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এ দুই জায়গাতেই পাকবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তা তাদের গতিবিধির জন্য বিশেষ জরুরী ছিল। উজানিরশা ব্রিজকে ধ্বংস করে পাকসেনাদের গতিবিধিকে ব্যাহত করা ছিল আমাদের লক্ষ্য। আমার দলটি রাত ১১টায় উজানিরশা ব্রিজটি অকস্মাৎ হামলা করে এবং সফলতার সাথে বিস্ফোরক লাগিয়ে ১টা স্প্যান ধ্বংস করে দেয়। এ অকস্মাৎ হামলায় শত্রুদের ১৩ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হয়।

ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গলের সি কোম্পানী ২৯ শে মে শালদানদীর পিছনে পশ্চিম শিবপুর, বাজার ও সাগরতলাতে শত্রুদের অবস্থানের পিছনে সকাল ৪টায় মেশিনগান এবং ৭৫ এম এমআর আরসহ ঢুকে পড়ে। শত্রুরা তাদের পিছনে হঠাৎ মুক্তিবাহীর অনুপ্রবেশে বেশ হকচকিয়ে যায়। সকাল ৫টা পর্যন্ত আমাদের দলটি শত্রুঅবস্থানের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে শত্রুদের বেশ কয়েকটা বাস্কার ধ্বংস হয়ে যায় বেলুচের মেজর দুররানিও নিহত হয়।

৩১ শে মে আমাদের ১টা পেট্রোল পার্টি কুটির নিকট শত্রুসেনাদের অবস্থান সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে যায়। কুটির নিকটে তারা দেখতে পায় যে পাকসেনাদের ১টি জীপ ৬জন সৈনিকসহ কুটি গ্রামে প্রবেশ করছে। জীপটি গ্রামের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে থেকে ৬ জন পাকসেনা জীপ থেকে বের হয়ে গ্রামের ভিতরে যায়। আমাদের ছোট দলটি বোমা ছুঁড়ে ড্রাইভারসহ জীপটি ধ্বংস করে।

৩১ শে মে-তেই আমাদের ৬ জন সৈন্যের একটি দল সুবেদার আবদুল হক ভূঁইয়ার নেতৃত্বে শালদানদী রেলওয়ে স্টেশনের নিকট অনুপ্রবেশ করে। তারা যখন তথ্যানুসন্ধান করছিল, সে সময় পাক সেনাদের দুইজন ও-পি যারা গাছের উপর বসে দূরবীণ লাগিয়ে আমাদের অবস্থান খুঁজছিল, তাদের দেখে ফেলে এবং গুলি করে মেরে ফেলে।

৪র্থ বেঙ্গল-এর আলফা কোম্পানী মেজর সালেকের নেতৃত্বে এবং চার্লি কোম্পানী ক্রাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে শালদানদী এবং মন্দভাগে পাকসেনাদের উপর বার বার আঘাত হেনে যাচ্ছিল। শত্রুরা প্রতিদিন কিছু না কিছু হতাহত হচ্ছিল। আমাদের এই দুই কোম্পানীর সেনা দল ৩ইঞ্চি মর্টারের সহায়তায় শিবপুর, বাগরা,

গৌরঙ্গলা প্রভৃতি জায়গা হয়ে শত্রুঅবস্থানটি প্রায় তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল এবং প্রতিদিন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হয়ে গিয়েছিল যে পাকসেনাদের পক্ষে তাদের বাংকার থেকে মাথা তোলাও সুযোগ ছিল না। গুলি এবং মর্টারের গোলার সাহায্যে আমাদের সৈনিকরা তাদের সে অবস্থানে থাকাকে সম্পূর্ণ বিপদজনক করে তুলেছিল। এছাড়া কুটি এবং শালদানদীর রাস্তায় আমাদের এ্যামবুশ পার্টি ২৪ ঘন্টা এ্যামবুশ পেতে থাকত। এর ফলে রশদ এবং অস্ত্র সরবরাহ করা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা রেলওয়ে লাইন ব্যবহারের বার বার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। এরপর শালদানদী দিয়ে রসদ সরবরাহ করার চেষ্টা করে। সেখানেও তারা আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় তাদের মনোবল সত্যিই ভেঙ্গে গিয়েছিল।

জুন মাসের ১ তারিখে আমাদের চাপের মুখে টিকতে না পেরে তারা মন্দভাগ এবং শালদানদীর অবস্থানগুলি পরিত্যাগ করে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট তাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপন করে। সম্মুখসমরে শালদানদী থেকে শত্রুসেনাকে জুন মাসের প্রথম দিকে পর্যদন্ত করে পিছু হটিয়ে দেওয়া আমাদের সৈনিকদের জন্য ছিল একটা বিরাট সাফল্য ও কৃতিত্ব। এতে আমার সেক্টরের সব সৈনিকদের মনোবল পুনরুদ্ধার হয়। মার্চ মাস এবং মে মাসের প্রথম দিকে যখন পাক বাহিনী অতর্কিতে বিপুল সৈন্য, কামান, বিমান বাহিনীর সহায়তায় আমাদের উপর আক্রমণ চালায় তখন আমাদের সৈনিকরা অতি সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে পাক সেনাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে কিন্তু অবশেষে বেশিরভাগ সময়ে পাক বাহিনীর বিপুল শক্তি ও সরঞ্জামের সামনে বাধ্য হয়ে পিছু হটেতে হয় এবং সর্বক্ষেত্রেই আমরা প্রতিরক্ষা অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করেছি এবং পাক বাহিনী বার বার আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। শালদানদী এবং মন্দভাগে প্রথম এক মাস পর আমরা পাকবাহিনীর উপর প্রতি আক্রমণ চালিয়ে তাদের শক্তিশালী অবস্থান থেকে বিতাড়িত করি। শত্রু সেনা চলে যাবার পর ক্যাপ্টেন গাফফারকে মন্দভাগে প্রধান অবস্থান গড়ে তোলার এবং শালদানদীতে তাঁর অগ্রবর্তী ঘাঁটি করার নির্দেশ দিই।

যখন আমি যুদ্ধ চালাচ্ছিলাম এবং যুদ্ধ আন্তে আন্তে যখন তীব্রতর হচ্ছিল, তখন আমার সেনাদলে আহত এবং নিহতের সংখ্যাও বেড়ে চলছিল। সে সময়ে আমার সৈনিক এবং গণবাহিনীর জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল না, শুধু আমার সঙ্গে সেনাবাহিনীর ১ জন ডাক্তার ক্যাপ্টেন আখতার ছিলেন। অফিসারের সল্পতায় তাঁকেও আমি একটা কোম্পানীর কমান্ডার বানিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করেছিলাম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন আখতার ডাক্তার হয়েও একজন যোদ্ধা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার আহতের সংখ্যা যখন বেশ বেড়ে যায় এবং অনেক সময় দ্রুত চিকিৎসার অভাবে অনেক সৈনিক বা গণবাহিনীর ছেলেরা রক্তক্ষয় হয়ে মারা যেতে থাকে তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার সেক্টরেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডেকে পাঠাই এবং অতি সত্বর আমার হেড কোয়ার্টারের নিকট একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করার নির্দেশ দিই। ঢাকা থেকে কিছু সংখ্যক ছেলে মেয়ে আমার সেক্টরে এসে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে দুই একজন চিকিৎসা শিক্ষানবিসও ছিল। তারাও আমাকে ১ টি হাসপাতাল গড়ার জন্য অনুরোধ জানায়। এসব ছেলেমেয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন আখতার কয়েকটি তাঁবুতে মতিনগরে আমার হেড কোয়ার্টারের নিকট মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রথম বাংলাদেশ হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। একটা সুন্দর বাগানের ভিতর উঁচু এবং শান্ত পরিবেশে এ হাসপাতালটি অবস্থিত ছিল। প্রথমে হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য আমাদের কাছে ওষুধপত্র বা অস্ত্রোপাচারের সরঞ্জাম কিছুই ছিলনা। কিন্তু তবুও আমাদের এই নবীন দলটি ক্যাপ্টেন আকতারের নেতৃত্বে সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে হাসপাতালটি গড়ে তুলতে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেগম সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে টুলু এবং লুলু মেডিকেল ছাত্রী ডালিয়া, আসমা রেশমা, ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, সবিতা, শামসুদ্দিন প্রমুখ। এসব ছেলেমেয়েদের দল নিজেদের সুখ ও আরাম ত্যাগ করে দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের এবং গণবাহিনীর ছেলেদের সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসা করে যাচ্ছিল। এরা রেডক্রস ও বন্ধু রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক কষ্টে ওষুধপত্র যোগাড় করত। মাঝে মাঝে আমি যতটুকু টাকা-পয়সা সেক্টর ফান্ড থেকে দিতে পারতাম তা দিয়ে ওষুধপত্র যোগাড় করত। জুন মাসের দিকে লন্ডন থেকে ডাঃ মবিন

(প্রবাসী বাঙ্গালী) আমাদের এই হাসপাতালের কথা শুনে এখানে এসে যোগ দেন। এর কিছু দিন পর ডাঃ মবিনের আর এক বন্ধু ডাঃ কাফরুল্লাহ সংবাদ পেয়ে লন্ডন থেকে এসে যোগ দেন। এরা দুজনেই লন্ডনে এফআরসিএস পড়ছিলেন। দেশে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ শুনে তারাও এসে অংশ নেয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তারা তাদের লন্ডনের সব সুখ ও আরাম ত্যাগ করে আমাদের এ হাসপাতালের নাম শুনে ছুটে এসেছিলেন মাতৃভূমিকে শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। তাদের সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলাপ হয় এবং আমার এই হাসপাতালটি গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা নিই। ডাঃ মবিন ও ডাঃ জাফরুল্লাহ আমাকে আশ্বাস দেন লন্ডনে অবস্থিত প্রবাসী বাঙালিরা তাদের মাতৃভূমির জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে এবং আমরা যদি বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের কাছে আহবান জানাই তবে এ হাসপাতালে সরঞ্জামের ব্যবস্থা তারা করতে পারবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি ডাঃ মবিন ও ডাঃ জাফরুল্লাহকে বিস্তারিত সরঞ্জামের তালিকা বানানোর নির্দেশ দেই। আর সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর একটু পিছে বিশ্রামগঞ্জে সুন্দর জায়গায় পাহাড়ের উপর অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা নিতে নির্দেশ দিই। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের প্রধান সেনাপ্রতি কর্নেল এম এ জি ওসমানীর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাকে আমি আমার সেনাদল ও ছেলেদের চিকিৎসার শোচনীয় অবস্থার কথা জানাই। তিনি আমাকে আমার হাসপাতাল তৈরীর পরিকল্পনায় উৎসাহ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর দেন। এক মাসের মধ্যে বাঁশ, কাঠ ও ছন দিয়ে আমরা বিশ্রামগঞ্জে ২০০ বেডের হাসপাতাল তৈরী করে ফেলি। ডাঃ জাফরুল্লাহ লন্ডনে চলে যান হাসপাতালের জন্য ওষুধপত্র ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে। আমাদের হাসপাতাল যখন তৈরি হচ্ছিল তখন আহতের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। ডাক্তারের যথেষ্ট অভাব ছিল। এছাড়াও ওষুধের অভাব ছিল আমাদের প্রকট। কিন্তু তবুও এসব অসুবিধার মধ্যেও আমাদের ছোট হাসপাতালটি আস্তে আস্তে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছিল। যদিও এগুলি বাঁশ এবং ছনের ঘর ছিল তবুও উৎসর্গিত ছেলেমেয়েদের প্রচেষ্টায় সমস্ত এলাকাটা শান্তিদায়ক হয়ে উঠেছিল। সকালে উঠেই সমস্ত হাসপাতালের বিভিন্ন কাঁচা ওয়ার্ডগুলি তারা নিজ হাতে লেপতো এবং পরিষ্কার করতো। হাসপাতাল রোগীর কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে তাদের রান্নাবান্না, সেবাশুশ্রূষা সব কিছু এরাই করতো। এদের সঙ্গে আরো ২০ জনের মতো ছেলেমেয়ে এসে যোগ দেয়। কিছুদিন পর ডাঃ জাফরুল্লাহ ও ডাঃ মবিনের প্রচেষ্টায় এবং লন্ডন প্রবাসী বাঙালি ডাক্তারদের সহায়তায় আমরা এ হাসপাতালটির জন্য অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদিসহ ওষুধপত্র পেয়ে যাই। ৯ মাসের যুদ্ধে এ হাসপাতালটি কয়েক হাজার আহতকে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হয়। এ হাসপাতালটির আর একটি অবদান ছিল যে এটি স্থাপনের পর আমার সেনাবাহিনীর ছেলেদের ও গণবাহিনীর মনোবল আরো বেড়ে যায়। তারা বুঝতে পারে যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয় তবে চিকিৎসার অভাবে মারা যাবে না। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং এটাকে আরো উন্নত করার জন্য উৎসাহ দেন। সেপ্টেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২৯ শে মে রাতে আমাদের একটা পেট্রোল পার্টি কুমিল্লার বাটপাড়ায় এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। শত্রুদের ২ টা গাড়ী রাত ২ টার সময় এ্যামবুশ এর ফাঁদে পড়ে। এ্যামবুশ পার্টি সাফল্যের সাথে ২ টি গাড়ী ধবংস করে দেয় এবং সেই সঙ্গে ৪ জনকে নিহত করে। শত্রুদের পিছনের গাড়ীটি ফাঁদে পড়ার আগেই পালিয়ে যায়। ২৯ শে মে রাত ৯ টায় ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে ২ টি সেকশন কসবার পশ্চিমে টি, আলীর বাড়িতে শত্রুদের অবস্থানের উপর অকস্মাৎ অণুপ্রবেশ করে এবং আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মর্টারের সাহায্যে আড়াইবাড়ী শত্রুঅবস্থানের উপর গোলা চালায়। এ আক্রমণে শত্রুদের ১ টা বাংকার ধবংস হয়ে যায় এবং তিনজন লোক নিহত ও ২ জন শত্রুসেনা আহত হয়। এরপর আমাদের সৈন্যরা আক্রমণ শেষ করে নিজ অবস্থানে চলে আসে।

৩১ মে রাত তিনটায় একটা প্লাটুন লে মাহবুবের নেতৃত্বে কুমিল্লার দক্ষিণে জহমোহনপুর নামক স্থানে শত্রু ঘাঁটির উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায় এবং শত্রু সেনাদের ১২ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা যখন কসবার

দিকে তাদের চাপ বাড়তে থাকে, আমি ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরকে একটা কোম্পানীসহ কসবার উত্তরে লাটুমুরায় অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিই।

৩০ শে মে সন্ধ্যা ৭ টায় আমাদের ১ টি ছোট গেরিলা দল ইকবালের (বাচ্চু) নেতৃত্বে বিবিরবাজারে শত্রুসেনাদের অবস্থানে আঘাত হানার জন্য পাঠান হয়। পাক সেনারা তখন তাদের অবস্থানের উপর বসে তাদের সাক্ষ্যভোজনে ব্যস্ত ছিল এবং এ সময়টি সম্বন্ধে আমাদের স্থানীয় লোকের দ্বারা খবর আগে থেকেই সংগ্রহ করা ছিল। পাক সেনারা যখন খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল, সে সময় আমাদের গেরিলা দলটি তাদের উপর হঠাৎ গোমতী বাঁধের উপর থেকে গোলাবর্ষণ করে। এতে শত্রুদের ১০ জন হতাহত হয়। ঐ দিন সাড়ে ৬ টার সময় আমাদের মর্টার প্লাটুন সিঙ্গারবিল শত্রুঅবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে। এর ফলে শত্রুদের ৬ জন নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। ২৯ শে মে চৌদ্দগ্রাম বারুচি রোডে হরিসদার বাজারের নিকট রাস্তার ব্রিজ সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়।

২৯ শে মে বিকাল ৪ টায় ৪র্থ বেঙ্গল এর পাইওনিয়ার পার্টিকে লাকসাম-চাঁদপুর রেলওয়ে লাইনে মাইন পুঁতে রেল গাড়ী লাইনচ্যুত করার জন্য পাঠানো হয়। এ দলটি মাইন পুঁতে লাকসাম এবং নোয়াখালীর মাঝে তিনটি রেলওয়ে বগী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। ফেরার পথে পাইওনিয়ার পার্টির ছোট দলটি চৌদ্দগ্রাম-চট্টগ্রাম সড়কের উপর একটি সদ্য মেরামত করা ব্রিজের উপর মাইন পুঁতে দেয়। রাত ৮টায় একটি জিপ ৫ জন পাকসেনা সহ ফেনীর দিক থেকে আসে। জিপটি যখন ব্রিজের উপর পৌঁছে তখন মাইন বিস্ফোরিত হওয়াতে ব্রিজটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর ফলে ১ জন অফিসারসহ তিনজন পাকসেনা নিহত এবং অন্য ২ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় তিনজন গেরিলাকে হ্যাড গ্রেনেডসহ চৌদ্দগ্রাম থানায় পাঠান হয়। থানার সন্নিহিত দিঘির নিকট শত্রুদের একটি বাংকার ছিল। গেরিলা দলটি গ্রেনেড ছুড়ে বাংকারটি ধ্বংস করে দেয়। ফলে ৩ জন শত্রুসেনা নিহত হয় এবং কিছু স্থানীয় লোকও আহত হয়। ৩০ শে মে চৌদ্দগ্রামের আধ মাইল উত্তরে চৌদ্দগ্রাম মিয়াবাজার রোডের উপর ৪র্থ বেঙ্গল এর বি কোম্পানীর একটি প্লাটুন হঠাৎ শত্রুদের ২৭ জনের একটি দলকে দূরে থেকে আসতে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এ্যামবুশ পাতে। শত্রু যদিও এ অতর্কিত আক্রমণে হকচকিত হয়ে যায় কিন্তু তারা ত্বরিত গতিতে রাস্তার পশ্চিম পাশে সরে পড়ে। এ্যামবুশের ফলে শুধু তিনজন শত্রুসেনা নিহত হয়। আমাদের গেরিলারা লাকসাম বাংগোড়া কাঁচা বাস্তার উপর ফেলনা গ্রামের নিকট মাইন পুঁতে রাখে। শত্রুদের একটি তিন টনের গাড়ী এ মাইনের সাথে সংঘর্ষে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ২৯ শে মে ৪র্থ বেঙ্গল এর 'ব্রাভো' কোম্পানীর একটি প্লাটুন ২টি ৩ ইঞ্চি মর্টারসহ সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম থানার উপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। অতর্কিত মর্টারের গোলার আঘাতে এবং হালকা মেশিনগানের আঘাতে তাদের যথেষ্ট হতাহত হয়।

জুন মাসের ৪ তারিখে রাত দুটোর সময় ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানীর ২টা প্লাটুন মর্টার নিয়ে শত্রুদের অবস্থানে গোপন পথে প্রবেশ করে শালদা নদীর দক্ষিণে বাগড়া বাজার নামক স্থানে অবস্থান নেয়। ভোর বেলায় পাকসেনারা যখন তাদের বাংকারের উপর অসতর্কভাবে ঘোরফেরা করছিল ঠিক সে সময় আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর অতর্কিত মর্টার এবং মেশিন গানের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। পাক সেনারা এ অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণ হকচকিত হয়ে যায়। আধ ঘন্টা পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোনো পাল্টা জবাব আসে না। এ আক্রমণের ফলে শত্রুদের প্রায় ১৭ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়। আমাদের একজন সৈন্য বৃকে গুলি লেগে গুরুতরভাবে আহত হয়। এ আক্রমণের তিন ঘন্টা পরে শত্রু যখন ভেবেছিল আমাদের সৈন্যরা অবস্থান পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের আহতদের পিছনে নিয়ে যাবার যখন ব্যবস্থা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের সৈন্যরা আবার তাদের উপর দ্বিতীয় দফা আক্রমণ চালায়। এতে শত্রুদের আবারও ৫ জন নিহত হয়। এরপর আমাদের পার্টি অবস্থান ত্যাগ করে চলে আসে। ঐ দিনই সকাল ৭ টার সময় আমার আর একটা পার্টি শত্রুদের রাজাপুর অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ৬ জন শত্রুকে নিহত করে এবং তিনজনকে আহত করে। আমাদের আরেকটি দল

রাত ১টার সময় কুমিল্লার দক্ষিণে সুয়াগাজীতে চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের ১টা সেতু উড়িয়ে দেয় এবং বাগমারার রেলওয়ে সেতু উড়িয়ে দেয়।

৬ই জুন একটি ডেমোলিশন পার্টিকে লাকসামের দক্ষিণে পাঠান হয়। এই দলটি খিলাতে লাকসাম নোয়াখালী মহাসড়কের উপর ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন পুতে রাখে। সকাল ৫টায় কুমিল্লা থেকে শত্রুর ২টি জীপ ও একটি ট্রাক নোয়াখালী যাবার পথে মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং সে সঙ্গে ৪জন পাক অফিসার এবং ৭জন সৈন্য নিহত হয়। পাক সেনাদের ২টি কোম্পানী কুমিল্লা থেকে শালদানদীর উত্তরে আসে এবং রেলওয়ে লাইনের সাথে সাথে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। ৪র্থ বেঙ্গল এর এ কোম্পানী শত্রুদের এ অগ্রগতিকে বাধা দেয় সকাল ৬টার সময় শালদানদীর পূর্ব দিক থেকে। শত্রুরা বাধা পাবার ফলে পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমাদের গুলির মুখে পাক সেনাদের ২৫জন লোক হতাহত হয়। সকাল ৬টায় পাক সেনাদের আর একটি দল কুমিল্লা থেকে একটি ট্রেনে করে নয়নপুর এবং শালদানদীর দিকে আসছিল। এ ট্রেনটি নয়নপুরের দক্ষিণে আমাদের অবস্থানরত সৈন্যদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের গোলাগুলির সামনে শত্রুরা টিকতে না পেরে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পর রাজাপুরে পশ্চাদপসরণ করে। এর ৪/৫ ঘন্টা পরে শত্রুরা কামানের গোলায় সহায়তায় আবার নয়নপুর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। কিন্তু নয়নপুর স্টেশনে যখন তারা ব্যাংকার তৈরীতে ব্যস্ত সে সময় আমাদের মর্টার তাদের উপর ভীষণ গোলাগুলি চালায় এবং শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষতি করে। শত্রুরা কিছু পিছু হটে নয়নপুর গ্রামে ভিতর অবস্থান নিয়ে তাদের ব্যাংকার তৈরী করতে শুরু করে। ঐদিনই শত্রুদের একটি পেট্রোল পার্টি কসবার দিকে অগ্রসর হয়, আমাদের ৪র্থ বেঙ্গলের ডি কোম্পানীর একটা প্লাটুন তাদেরকে অতিক্রম করে। পাকসেনারা এ এ্যামবুশ- এর ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের অন্ততপক্ষে ২০জন লোক হতাহত হয়। শত্রুদের দলটি আমাদের এ্যামবুশ পার্টির তাড়া খেয়ে তাদের অবস্থান আড়াইবাড়ির দিকে পালিয়ে যায়। আমাদের একটি দল কুমিল্লার দক্ষিণে ধানপুর বিওপির নিকট পাকসেনাদের জন্য এ্যামবুশ পেতে থাকে। সকাল ৯টায় পাকসেনারা দালালদের মারফতে এ খবর পায়। কুমিল্লা থেকে পাক সেনাদের একজন অফিসারসহ ১টা প্লাটুন গ্রামের ভিতর দিয়ে এসে আমাদের এ্যামবুশ পার্টিকে ঘিরে ফেলায় চেষ্টা করে। এ্যামবুশ পার্টি তৎক্ষণাৎ কিছু পিছু হটে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধ ঘন্টাখানেক স্থায়ী হয়। ইতিমধ্যে আমাদের ধানপুরের কোম্পানী খবর পেয়ে লে. মাহবুব ও লে. কবিরের নেতৃত্বে তৎক্ষণাৎ এ্যামবুশ পার্টিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে এবং তারা পাকসেনাদের দলটিকে ঘিরে ফেলে। পাকসেনারা দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের ভিতর লুকিয়ে পড়ে এবং দালালদের সাহায্যে এ ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ৫জন সৈন্য নিহত হয়।

ঐ দিনই বিকাল তিনটায় পচুয়াতে আমাদের আর একটা এ্যামবুশ পার্টির ফাঁদে শত্রুদের একটি দলের ১০ জন হতাহত হয়। ৪ ও ৫ই জুন রাতে লাকসাম চাদপুর রেল লাইনের মাঝে মধু রোডস স্টেশনের নিকটে জমজমা রেলওয়ে সেতুটি সুবেদার পাটওয়ারীর একটি দল উড়িয়ে দেয়। ঐদিনই রাতে আর একটি দল চাদপুর কুমিল্লা সড়কের মহামায়া বাজারের নিকটে একটি পুল ধ্বংস করে দেয়। এর দুই দিন পরে চাদপুরের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। এর ফলে সমস্ত চাদপুরের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। কলকারখানাগুলি ও বন্ধ হয়ে যায়। পরে শত্রুরা এসে পাশের গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটতরাজ ও মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে।

আমাদের ৪র্থ বেঙ্গল ডি কোম্পানীর একটা প্লাটুন ১১ই জুন সকাল ৬টায় কসবার উত্তরে চার্নল নামক জায়গায় এ্যামবুশ পেতে রাখে। শত্রুদের একটি কোম্পানী দুপুর ১২টার সময় আমাদের এ্যামবুশ এর মধ্যে পড়ে যায়। আমাদের গুলীতে তাদের ১২জন সৈন্য নিহত হয়। এতে আমাদের একজন আহত হয় এবং পরে মারা যায়। পাকসেনারা পর্যুদস্ত হয়ে ঐ জায়গা থেকে ইয়াকুবপুরের দিকে পলায়ন করে। পলায়নের পর শত্রুদেরকে আমাদের আর একটি এ্যামবুশ পার্টি দেখে ফেলে এবং তারাও ইয়াকুবপুরের নিকট তাড়াতাড়ি শত্রুদের আক্রমণ

করার জন্য এ্যামবুশ পাতে। শত্রু এ এ্যামবুশ এর ফাদে পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এ এ্যামবুশে শত্রুদের ৮জন লোক নিহত এবং ১৩জন আহত হয়। এ দুটি এ্যামবুশ এর অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয় এবং শত্রু এ এলাকা থেকে চলে যায়।

এই সময়ে শালদানদীর দক্ষিণে রেলওয়ে ব্রিজ কুটির রাস্তায় বাসারা গ্রামের সেতু মন্দভাগ গ্রামের সেতু সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়।

আমাদের হেড কোয়ার্টারে এ খবর আসে যে পাক সেনারা তলুয়াপাড়া ফেরী ঘাট তাদের যাতায়াতের জন্য সাধারণত ব্যবহার করে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে আমাদের একটি প্লাটুনকে ৯ই জুন রাতে তলুয়াপাড়াতে পাঠান হয়। এ প্লাটুনটি তলুয়াপাড়া ফেরী ঘাটের নিকট শত্রুদের জন্য এ্যামবুশ পাতে। ১০ই জুন রাত ১১টার সময় শত্রুদের একটি দল সেই ফেরীঘাটে আসে এবং নৌকাযোগে পার হতে থাকে। শত্রু যখন নদীর মাঝখানে এ্যামবুশ দলটি সে সময় তাদের উপর গুলি চালাতে শুরু করে। এর ফলে নৌকাটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। পাকসেনাদের ২০জন লোক হতাহত হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন লে. মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ই জুন রাতে মিয়াবাজারের দক্ষিণে রাজারমার দিঘী ও জগমোহনপুর কাচারীর শত্রু অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। পাক সেনারা এই সাহসী আক্রমণে হকচকিয়ে যায়। আমাদের সৈন্যরা পাক সেনাদের বাংকারে গ্রেনেড ছুড়ে ৮জন পাকসেনাকে নিহত ও ৫জনকে আহত করে। পাকসেনারা বাধ্য হয়ে তাদের অবস্থান ত্যাগ করে। এরপর আমাদের সৈন্যরা অবস্থানটি দখল করে বাংকারগুলি ধ্বংস করে দেয় এবং শত্রুদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে।

আমাদের ৩টি গেরিলা দল কুমিল্লা ও লাকসামে পাঠানো হয়। ১১ই জুন কুমিল্লাতে গেরিলা দলটি শত্রুদের বিভিন্ন অবস্থানের উপর দশটি গ্রেনেড ছোড়ে এতে পাক সেনাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং সমস্ত কুমিল্লা শহর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ঐ দিনই চারজন গেরিলার ডেমোলিশন পার্টি জাঙ্গালিয়ার নিকট মাইন পুতে একটি ডিজেল ইঞ্জিন লাইনচ্যুত করে।

লাকসামে যে গেরিলা দলটি পাঠানো হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিল আবদুল মান্নান। পাকসেনাদের একটি গাড়ীর উপর গ্রেনেড ছোড়ে এবং এতে ৫জন নিহত হয়। এ দলটি লালমাই এর নিকট পাকসেনারা যে ঘরে থাকতো তার ভিতর ২টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতেও পাক সেনাদের যথেষ্ট হতাহত হয়। এর ফলে পাক সেনারা লাকসামে ৭২ ঘন্টার জন্য সাক্ষ্য আইন জারী করে এবং অনেক নির্দোষ লোকের উপর অত্যাচার চালায়। আর একটি দল লাকসামে পাকসেনাদের উপর গ্রেনেড ছোড়ে। এর ফলে কিছু লোক আহত হয়। আমাদের দুটি এ্যামবুশ পার্টি ফুলতলি এবং মিয়ার বাজারের নিকট ঐ দিনই এ্যামবুশ পেতে রাখে পাক সেনাদের দুটি গাড়ী রাত সাড়ে চারটার সময় ফুলতলীতে এ্যামবুশ এর মধ্যে পড়ে যায়। এ্যামবুশ পার্টি একটা গাড়ীকে ধ্বংস করে। দেয় এবং একটা গাড়ীর ক্ষতিসাধন করে। শেষের গাড়ীটির ভিতর এ্যামবুশ পার্টি ২টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে শত্রুদের ৬জন লোক নিহত হয়। মিয়ার বাজারের এ্যামবুশেও পাকসেনাদের ৫জন লোক নিহত হয় এবং আমাদের এ্যামবুশ পার্টি একটি মর্টার দখল করে নেয়।

আমাদের কাছে সংবাদ আসে যে, ওয়াল্ডং ব্যাংক টিম জুন মাসে ঢাকাতে আসছে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরেজমিনে ঘটনাবলী অবগত হওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রচারযন্ত্র সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এ খবর পাওয়া মাত্র আমি ওয়াল্ডং ব্যাংক টিমটির অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ওয়াল্ডং ব্যাংক যদি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেয়, তাহলে সেই আর্থিক সাহায্যে পাকিস্তানের সমরাস্ত্র কেনার ও যুদ্ধ পরিচালনার

পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হবে। যে করেই হোক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিমকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। বরং বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই পাক বাহিনীর আয়ত্তাধীনে নেই।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি গেরিলার একটি দলকে ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো এবং পাকিস্তানীদের নিহত করার জন্য পাঠিয়ে দিই। এই দলটি ৪ঠা জুন ঢাকায় গোপন পথে রওনা হয়ে যায় এবং পর দিন সকালে পৌঁছে যায়। এই দলেরই ২ জন ছেলে ৮ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় জিন্নাহ এভিনিউর কলেজ সু স্টোরের সামনে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। আর একটি গ্রেনেড ছোড়ে পুরানা পল্টনে সন্ধ্যা আটটায়। ঐ দিনই আর একটি ছোট দল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর একজন পাকিস্তানী অফিসারের বাড়ীর ভিতরে দুপুর দুটোর সময় গ্রেনেড ছোড়ে। এতে অফিসারের গাড়ীটির ক্ষতিসাধিত হয় এবং একজন লোক আহত হয়। পরের দিন সন্ধ্যায় মর্নিং নিউজ অফিসের ভিতর গ্রেনেড ছোড়া হয়। এতে কয়েকজন পাকিস্তানী দালাল নিহত হয়। ইতিমধ্যে দলটি খবরাখবর নেয় যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করছে। এ খবর পাবার পর ২ জন গেরিলা ৯ই জুন সন্ধ্যা ৮-১৫ মিনিটে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রবেশ করে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম এ হোটеле ফেরার প্রতিরক্ষায় থাকে। তারা যখন তাদের গাড়ীতে করে আসেন এবং গাড়ী নিচে রেখে হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করেন সে সময় গেরিলা দলটি গাড়ী লক্ষ করে ৩টি গ্রেনেড ছোড়ে। এর ফলে গাড়ীটি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং নিকটবর্তী একজন পাঞ্জাবী সেনাও নিহত হয়।

এ সমস্ত ঘটনাবলীতে বিশ্ব ব্যাংক কর্মকর্তাগণ অতি সহজেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। ইন্টারকন্টিনেন্টালের বিস্ফোরণের তারা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) বর্তমান অবস্থা স্বাভাবিক নয়। এই ঘটনার পর বিশ্ব ব্যাংক টিম দেশে ফিরে গিয়ে তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ঘটনাবলী তুলে ধরেন। তারা তাদের রিপোর্টে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য না দেওয়ার সুপারিশ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে এক বিরাট পরাজয়।

রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট পাচড়া গ্রামে শত্রুদের একটি অবস্থান ছিল। এই অবস্থানটি শত্রুদের নয়নপুর এবং রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিছন থেকে সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হত। মতিনগর থেকে একটি রেইডিং পার্টিকে পাচড়া গ্রামে শত্রুঅবস্থানের উপর অনুপ্রবেশ করে আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়। ১৩ই জুন রাত নটার সময় এ দলটি গ্রামের গোপন পথে শত্রুঅবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ অতর্কিত আক্রমণে শত্রুদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমাদের দলটি বেশ কিছু পাকসেনাকে হতাহত করে শত্রুঅবস্থান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু এরপরেও শত্রুদের মধ্যে রাতের অন্ধকারে প্রায় ২ঘন্টা গোলাগুলি চলতে থাকে। পাকসেনাদের অয়ারলেস ম্যাসেজ আমাদের অয়ারলেসে ধরা পড়ে। এতে শোনা যায় পাকসেনারা তাদের উর্ধ্বতন হেড কোয়ার্টারকে জানাচ্ছে মুক্তিবাহিনী আমাদের উপর ভয়ংকর আক্রমণ চালাচ্ছে। আমাদের নির্দেশ দিন আমরা এখন কি করব। এছাড়াও শত্রুঅবস্থান থেকে বার বার শ্লোগান শোনা যায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আজিজ ভাট্টি জিন্দাবাদ, ১৭তম পাঞ্জাব জিন্দাবাদ ইত্যাদি। গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ তখনও চলতে থাকে। আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের দলটি সরে আসার পরও পাক বাহিনী নিজেদের মধ্যে কয়েক ঘন্টা গোলাগুলি করে বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ১১জন নিহত ও ১২জন আহত হয়। বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য তাদের নিজেদের গুলিতেই হতাহত হয়।

পাকিস্তানীরা সীমান্তের নিকটবর্তী থানাগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এবং মিলিশিয়া নিয়োগ করতে শুরু করে। এসব থানাগুলিতে তারা বাংকার তৈরী করে অবস্থানকে শক্তিশালী করতে তাকে। কুমিল্লার উত্তরে সবগুলো থানাকেই তারা এভাবে শক্তিশালী করে। আমি এসব থানাগুলোকে আক্রমণ করে পাকিস্তানীদের শাসনযন্ত্রকে অচল করে দেয়ার একটা পরিকল্পনা করি।

আমার অবস্থানের নিকটবর্তী বুড়িচং থানা আমার জন্য একটা বাধার কারণ হয়ে দাড়িয়ে ছিল। কেননা বুড়িচং এর ভিতর দিয়েই আমার গেরিলারা গোপন পথে ঢাকা কুমিল্লা এবং ফরিদপুরে যাতায়াত করত। এই থানাটির অবস্থানের গোপন পথগুলো মোটেই নিরাপদ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশরা পাক সেনাদের খবরাখবর পাঠাত। আমি বুড়িচং থানা আক্রমণ করার জন্য ১৬জনের একটি দলকে পাঠাই। ১৪ই জুন রাত ১টায় এই দলটি অতর্কিত বুড়িচং থানার উপর আক্রমণ চালায়। থানায় প্রহরারত ইপকাফ এবং পুলিশ যথেষ্ট বাধা দেয়। কিন্তু অবশেষে আমাদের রেইডিং পার্টির হাতে তারা পরাস্ত হয়। এই সংঘর্ষে শত্রুদের ৮জন নিহত হয়। আমাদের ১জন লোক গুরুতরভাবে আহত এবং একজন নিখোজ হয়। এর ফলে বুড়িচং থানা শত্রুশূন্য হয় এবং ঢাকা, কুমিল্লা যাবার গোপন পথ নিরাপদ হয়।

ঢাকাতে ৪ঠা জুন যে দলটিকে পাঠানো হয়েছিল সেই দলটি তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে যাতে স্বাভাবিক পরিবেশ পাকিস্তানীরা ফিরিয়ে আনতে না পারে। ঢাকার প্রশাসন ব্যবস্থা যাতে পাকিস্তানীদের সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে না আসে তার জন্য এই গেরিলা দল তৎপর ছিল। দলটি ১০ই জুন দুপুর ২টার সময় নিউ মার্কেটের প্রধান চত্বরে তিনটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে সমস্ত লোকজন নিউ মার্কেট থেকে পালিয়ে যায় এবং দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এর পরদিন বিকাল ৪টার যখন অফিস শেষ হচ্ছিল ঠিক সে সময় ওয়াপদা বিল্ডিং এর সামনে ২টি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে ওয়াপদা ভবনের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে নয়নপুর রেল স্টেশনের নিকট গোড়াউনের ভিতর শত্রুদের কিছুসংখ্যক সৈন্য তাদের ঘাটি গড়ে তুলেছিল। এই সংবাদ ৪র্থ বেঙ্গলের এ কোম্পানী জানতে পারে। মেজর সালেক একটি প্লাটুনের সঙ্গে আর আর রাইফেল ও মর্টার দিয়ে এ ঘাটিটি আক্রমণের জন্য পাঠায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এ দলটি শত্রুদের অবস্থানে দক্ষিণ দিক দিয়ে পিছনে অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিতে ঐ গোড়াউনটির উপর আক্রমণ চালায়। আর আর এবং মর্টারের গোলা গোড়াউনটির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে এবং কয়েকটি আর আর এর গোলা গোড়াউনের ভিতরে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। ঐ দিন রাতেই হাবিলদার সালামের নেতৃত্বে নয়নপুরের রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণে আশাবাড়ী থেকে রাত দেড়টার সময় শত্রুঅবস্থানের উপর আর আর রাইফেল ও মর্টারের সাহায্যে আবার আক্রমণ চালানো হয়। শত্রুরা এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা দ্বিতীয়বার আক্রমণ আশা করেনি। এ আক্রমণের ফলেও শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এ সময় শত্রুদের অবস্থান যেখানে যেখানে ছিল সে সব অবস্থানের কাছাকাছি এবং পাক সেনাদের চলাচলের রাস্তার উপর মাইন পুতে রাখা হয়েছিল। ১৪ই জুন রাতে ফকিরহাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৭০০/৮০০ গজ উত্তরে শত্রু একটি দল দুপুরে বখশিমাইল গ্রামে পেট্রোলিং এর জন্য গিয়েছিল। আর একটি দল গাজীপুরের নিকট আমরা যে কাঠের পুল জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম সেটি মেরামত করছিল। বখশিমাইল গ্রাম থেকে সন্ধ্যার সময় পাক সেনাদের দলটি ফকিরহাটে নিজেদের অবস্থানে ফেরার পথে আমাদের পুতে রাখা মাইনের মধ্যে পড়ে যায় এবং মাইনগুলি তাদের পায়ের চাপে ফাটতে থাকে। এতে তাদের অনেক লোক হতাহত হয় এবং তাদের মধ্যে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। এ মাইনগুলোর ফাটার শব্দ নিকটবর্তী অবস্থান থেকে পাকসেনারা শুনতে পায়। রাতের অন্ধকারে তারা ঠিক বুঝতে পারছিল না এ বিস্ফোরণের সঠিক কারণ কি? মুক্তিবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ভেবে পাক সেনারা প্রচণ্ডভাবে গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। এই গোলাগুলি রাত ৮টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত চলতে থাকে। শত্রুরা নিজেদের লোকের উপর শতে শতে মর্টার এবং কামানের গোলা ছুড়তে থাকে। আমাদের দূরে অবস্থিত পেট্রোল ইয়া আলী, ইয়া আলী, বাচাও বাচাও, প্রভৃতি ধ্বনি শুনতে পায়। পরে আমরা পাশ্চাত্য গ্রামের লোকমুখে শুনতে পাই যে আমাদের মাইনে এবং পাক সেনাদের নিজেদের গোলাগুলিতে অন্ততপক্ষে ৪০/৫০ জন পাক সেনা হতাহত হয়েছে। পরদিন সকালে পাকসেনারা একজন ব্রিগেডিয়ার ঐ অবস্থানটি পরিদর্শন করতে কুমিল্লা থেকে আসেন।

পাকসেনারা এই দুর্ঘটনার পর রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকে এবং ফকিরহাট পর্যন্ত তাদের পেট্রোলিং আরো জোরদার করে। মতিনগরে অবস্থিত আমাদের কোম্পানী শত্রুদের এই কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। ১৬ই জুন সকালে আমাদের একটি প্লাটুন পাকসেনাদের পেট্রোলিং পথের উপর এ্যামবুশ পাতে। সকাল ৯টায় পাক সেনাদের একটি দল রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে রওনা হয়। এই দলটি আমাদের এ্যামবুশ এর মধ্যে পড়ে যায়। অতর্কিতে আমাদের লোকেরা পাকসেনাদের উপর হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে গোলাগুলি চালায়। এই গোলাগুলিতে শত্রুদের ৮জন নিহত ও একজন আহত হয়। এছাড়া আমাদের লোকেরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, টেলিফোন সেট, ড্রাইসেল ব্যাটারি ও আরও অন্যান্য জিনিস হস্তগত করে।

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার কাছে খবর আসে যে, শত্রুদের গোলান্দাজ বাহিনীর একটি ব্যাটারি (দল) কুমিল্লা ব্রাহ্মনবাড়িয়ার সিএন্ডবি রোড তাদের কামানের অবস্থান হিসাবে ব্যবহার করছে। পাক বাহিনীর নয়নপুর, শালদা নদী, টি, আলীর বাড়ী (কসবায়) প্রভৃতি শত্রু অবস্থানের জন্য এই কামানগুলি থেকে সাহায্যকারী গোলা নিক্ষেপ হত। এই কামানগুলির জন্য পাক বাহিনীর উপরোক্ত অবস্থানগুলির উপর আক্রমণ অনেক সময় কার্যকরী করা যেত না। আমার কাছে আরও খবর আসে যে, প্রায় ১৫০ জন পাক সেনা এই কামানগুলিকে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র আমি লে. হুমায়ুন কবিরকে এই কামানের অবস্থানটি আক্রমণ করে ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ দেই। ৪০ জনের একটি দল (৪র্থ বেঙ্গলের ডি কোম্পানী) লে. হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে ১৬ই জুন রাত সাড়ে ১০টায় শত্রুঅবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। সমস্ত রাত চলার পর দলটি কুমিল্লা- ব্রাহ্মনবাড়িয়ার রাস্তার পশ্চিমে সাইদাবাদের চার মাইল উত্তরে ভোরে পৌছে এবং তাদের একটি গোপন অবস্থান তৈরী করে। ১৭ই জুন সমস্ত দিন এবং রাত লে. হুমায়ুন কবির তার সঙ্গে শুধু কয়েকজনকে নিয়ে পাকসেনাদের সাইদাবাদ অবস্থানটি সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করে। এই অবস্থানটি পাহারার কি কি ব্যবস্থা আছে, কারা পাহারাদার এবং কি কি অস্ত্রের সাহায্য পাহারা দেয়, অবস্থানটিতে পৌছার জন্য গোপন পথ কি, কামানগুলি রাতে কোন স্থানে রাখে, কোন সময়ে পাক সেনারা বেশী সজাগ এবং তাদের বাংকারগুলির অবস্থান কোথায় প্রভৃতি খবরাখবর সে সংগ্রহ করে। এরপর লে. হুমায়ুন কবির সকাল হবার আগেই তার গোপন ঘাটিতে ফেরত আসে। ১৮ই জুন সমস্ত দিন তার দলটিকে পাকসেনাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর বলে এবং পাক ঘাটিতে আক্রমণের পরিকল্পনা এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেয়। সমস্ত দিন দলটি আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়।

১৮ই জুন ভোর চারটায় লে. হুমায়ুনের নেতৃত্বে আমাদের দলটি পাক সেনাদের কামান ঘাঁটির উপর পিছন দিক থেকে অনুপ্রবেশ করে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাক সেনারা তাবুর মধ্যে শুয়ে ছিল। তারা এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সেদিনই কুমিল্লা থেকে পাক সেনাদের দুটি কোম্পানী যেগুলি সামনে শত্রুদের ঘাটিকে শক্তিশালী করার জন্য যাচ্ছিল তারাও রাতের বিশ্রামের জন্য অসতর্কভাবে এ অবস্থানটিতে শুয়ে ছিল। আমাদের দলের অতর্কিত আক্রমণে পাকসেনাদের ঘাটিতে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং অনেক শত্রুসেনা আমাদের গুলিতে প্রান হারাতে থাকে। আমাদের লোকেরা কয়েকটি জীপ ও ৩টনের ট্রাকে গ্রেনেড ছুড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাকসেনারা এত বেশী ভীত হয়ে পড়ে যে তারা তাদের হেড কোয়ার্টারে জঙ্গী বিমানের সাহায্যের প্রার্থনা জানায়। যুদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ ভয়ংকরভাবে চলে এবং আমাদের সৈন্যরা কামান, গাড়ি ইত্যাদি ধ্বংস করে। কিন্তু ইতিমধ্যে সকাল হয়ে যায় এবং শত্রুদের প্রতিরোধ শক্তি বাড়তে থাকে ও তাদের আবেদনে তিনটি জঙ্গী বিমান ঘটনাস্থলে পৌছে আমাদের রেইডিং পার্টির উপর আক্রমণ চালায়। লে. হুমায়ুনের দলটি তখন আটকা পড়ে যাবার ভয়ে আক্রমণ শেষ করে গ্রামের গোপন পথে মেঘনার দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এই পশ্চাদপসরণের সময় তারা বার বার পাকিস্তানী জঙ্গী বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবুও সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে তারা সাফল্যের সাথে শত্রুদের আওতার বাইরে চলে আসে। একদিন পর তারা অন্য পথে আবার কুমিল্লা ব্রাহ্মনবাড়িয়া প্রধান সড়কের উপর আসে এবং মতুরা সড়কের সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে নিজ ঘাটিতে নিরাপদে ফিরে আসে।

এ আক্রমণের ফলে যদিও লে. হুমায়ূনের দলটি পাকসেনাদের কামান দখল করে আনতে পারেনি কিন্তু তবুও এ আক্রমণের ফলাফল পাকসেনাদের জন্য ছিল ভয়াবহ। অন্ততপক্ষে ৫০/৬০ জন পাকসেনা এ আক্রমণে হতাহত হয়। মৃতদেহগুলি পাকসেনারা ২টি বেসামরিক বাসে লাল ঝাণ্ডা তুলে কুমিল্লার দিকে নিয়ে যায়। এ খবর স্থানীয় লোকেরা জানায়। তাছাড়া গাড়ি, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও এই অবস্থানে রাখা কামানের গোলা যেগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল তা ছিল তাদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষতিকর। আসার পথে দলটি যে সেতু উড়িয়ে দিয়ে আসে এতেও তাদের গতিবিধির উপর যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করে। এ হামলার পর শত্রুসেনারা প্রায় ২/৩ সপ্তাহ সমস্ত সেক্টরে তাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। পাকসেনারা এরপর নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালায় এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১৬ই জুন আমাদের কসবা অবস্থান থেকে একটি ছোট দল বগাবাড়ি নামক জায়গায় এ্যামবুশ পাতে। সকাল ৬টায় পাক সেনাদের একটি পেট্রোল পার্টি সবার দিকে তাদের টহলে আসে। পাকসেনাদের এই দলটি অসতর্কভাবে হঠাৎ আমাদের এ্যামবুশ পার্টির ব্যাংকারের নিকট চলে আসে। আমাদের এ্যামবুশ দলটি এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অতি নিকট থেকে তাদের সমস্ত অস্ত্র গুলী চালাতে থাকে। অতর্কিত গুলীর আঘাতে প্রায় ১০জন পাকসেনা নিহত ও ৫জন আহত হয়। শুধু ২জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পাকসেনারা ১৮ই জুন আমাদের অবস্থান কৈখোলার উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের অবস্থানকারী প্লাটুনটি কৈখোলা ত্যাগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের একটি দল কৈখোলা দখল করে নেয়। ঐ দিন রাতে মেজর সালেহ চৌধুরীর নেতৃত্বে আমাদের এ কোম্পানী ভোর রাতে কৈখোলায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালায়। হাবিলদার সালামের প্লাটুন শিবপুরের দিক থেকে এবং সুবেদার আবদুল হক ভূঁইয়ার প্লাটুন দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুসেনাদের অবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে যায়। হাবিলদার সালামের প্লাটুনের আক্রমণে পাকসেনাদের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং পাকসেনারা হাবিলদার সালামের সামনের অবস্থানটি পরিত্যাগ করে পিছনে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের ভিতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং শত্রু সমগ্র কৈখোলা এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করে। ২ঘন্টার মধ্যে প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে পাকসেনারা অবস্থানটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে। এ যুদ্ধের ফলে পাক সেনাদের একজন জেসিওসহ ৩১জন সিপাই হতাহত হয়। এবং অবস্থানটি থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দখল করা হয়।

১৯শে জুন লে. হুমায়ুন কবিরের হেড কোয়ার্টারে খবর আসে যে, পাকসেনাদের একটি প্লাটুন সাগরতলার ভিতর পেট্রোলিং করার জন্য যেতে দেখা গেছে। লে. হুমায়ুন তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন নিয়ে মন্দভাগের নিকট দ্রুত এ্যামবুশ পাতে। সন্ধ্যা ৭টায় পাকসেনারা ফেরার পথে তাদের দলটির শেষ অংশটিকে লে. হুমায়ুন এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে পাকসেনাদের ৯জন সৈন্য নিহত হয় এবং বাকি পাক সেনারা মন্দভাগ গ্রামের দিকে পালিয়ে তাদের জীবন বাঁচায়।

জুন মাসের মাঝামাঝি লে. মাহবুব ৪র্থ বেঙ্গলের বি কোম্পানী থেকে একটি প্লাটুনকে পাকসেনাদের যাতায়াতের রাস্তা ধ্বংস করার জন্য কুমিল্লার দক্ষিণে প্রেরণ করে। এ দলটি ১৮ই জুন সন্ধ্যা ৬টায় কুমিল্লা লাকসামের বিজয়পুর রেলওয়ে ব্রিজ, কুমিল্লা বাগমারা রোডের সেতু উড়িয়ে দেয়। এই সেতুগুলোর ধ্বংসের ফলে কুমিল্লার দক্ষিণে সড়ক এবং রেলওয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। ঐ দিনই দলটি বিজয়পুর এবং মিয়াবাজারের নিকট কয়েকটি ইলেকট্রিক পাইলন উড়িয়ে কাণ্ডাই থেকে ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। পাকসেনাদের একটি প্লাটুন সন্ধ্যার সময় চৌরা'র নিকট পেট্রোলিং এ আসে। এই পাকসেনার দলটিকে এ্যামবুশ করলে ২ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেয় এবং অত্যাচার চালায়। আমাদের পেট্রোল পার্টি খবর আনে যে, পাকিস্তানীদের প্রায় এক কোম্পানী সৈন্য মিয়াবাজারের উত্তরে একটি গোড়াউনের মধ্যে অবস্থান করছে। পেট্রোলটি এই গোড়াউনটিতে পৌছবার গোপন রাস্তা, পাকসেনাদের

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিস্তারিত খবর নিয়ে আসে। এ সংবাদ পেয়ে লেঃ মাহবুব ৩৩ জনের একটি কমাণ্ডো প্লাটুন ব্লাকসাইড ও মর্টারসহ রাত ১২টার সময় শত্রুঅবস্থানের নিকটে পৌঁছে যায়। তারা একটি ছোট দল পাঠিয়ে অবস্থানটির সর্বশেষ খবর নেয় এবং জানতে পারে পাকসেনারা অবস্থানটিতে বেশী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। রাত ১টায় আমাদের কমাণ্ডো প্লাটুনটি অতর্কিতে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের উপর হালকা অস্ত্রের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনারা অনেকেই গুলিতে হতাহত হয়। তারা আমাদের কমাণ্ডো প্লাটুনের উপর পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৮ই জুন রাত ৯টায় মিয়াবাজারের দক্ষিণে আমাদের আরেকটি প্লাটুন পাকসেনাদের ২টি বাংকারের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা এরপর সমস্ত রাত অবিরাম মর্টারের গোলা ছুড়তে থাকে। আমাদের এই দলটি খিলা রেলওয়ে স্টেশনের নিকট কয়েকটি ট্যাঙ্কবিন্ধুসী মাইন রাস্তায় পুতে রাখে। পাক সেনাদের একটি জীপ রাতে ঐ রাস্তায় যাওয়ার পথে মাইনের উপর পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় এবং ৫জন পাকসেনাও নিহত হয়।

জুন মাসেই পাকসেনারা কুমিল্লা শহরে শাসনকার্য পুনরায় স্বাভাবিক করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেয়। সরকারী অফিস ভালভাবে চলার জন্য তারা সরকারী কর্মচারীদের বাধ্য করে। শহরের দোকান ও যানবাহন চালু করার বন্দবস্ত করে। পাকিস্তানীদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য ৪জন গেরিলার একটি দলকে ৬ই জুন কুমিল্লার উত্তর দিয়ে গোমতী পার করে কুমিল্লা শহরে পাঠান হয়। এ দলটি গ্রেনেড ও স্টেনগান সঙ্গে নিয়ে যায়। তিনদিন পর্যন্ত শহরের ভিতর একটি গুপ্ত অবস্থানে দলটি নিজেদের ঘাটি গড়ে। কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাকসেনাদের টহলদার দলগুলি সম্বন্ধে তারা বিস্তারিত খবরাখবর যোগাড় করে। ১০ই জুন সন্ধ্যায় কমার্স ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জজকোর্ট প্রভৃতি স্থানে পর পর পাকসেনাদের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এর ফলে একজন পাকসেনা নিহত ও ৫জন আহত হয়। ঐ দিনই ৭জন রেঞ্জারের একটি দলকে তারা আক্রমণ করে। এতে ২জন মিলিশিয়া নিহত হয় এবং তাদের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কয়েকদিন পর ২১শে জুন সকালে একটি আর আর রাইফেল আমাদের সৈন্যরা কুমিল্লা শহরের নিকটে বয়ে নিয়ে যায় এবং কুমিল্লা বিমান বন্দরের ও শহরের উপকণ্ঠের উপর গোলাগুলি করে এবং পাকিস্তানীরা এতে পাগলের মত ছোটোছুটি করতে থাকে। এসব কার্যকলাপের ফলে কুমিল্লা শহর ও তার নিকটবর্তী এলাকার লোকেরা আবার তাদের সাহস ফিরে পায়। অনেকেই শহর থেকে বাইরে চলে যায়। এসব আক্রমণের ফলে পাকিস্তানীদের শাসন ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়।

শালদা নদীতে পাকসেনারা জুন মাসে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করছিল। পাকসেনাদের কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্য মেজর সালেক ৪র্থ বেঙ্গলের এ কোম্পানীর ১টি প্লাটুন মর্টারসহ শালদা নদীর পশ্চিম দিকে পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি রাত ৩টায় পাকসেনাদের অবস্থানটি ঘুরে পিছনে যেতে সক্ষম হয়। সকাল সাড়ে ৫টার সময় পূর্বনির্ধারিত স্থানে তারা নিজেদের ঘাটি স্থাপন করে। এরপর প্রত্যুষের সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে মেশিনগান ও অন্যান্য হালকা অস্ত্রশস্ত্র এবং মর্টারের সাহায্যে শত্রুঅবস্থানের ওপর অতি নিকট থেকে হামলা চালায়। পাকসেনারা দিনের বেলায় তাদের অবস্থানের পিছনে এত নিকট থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং এর ফলে তাদের অন্ততঃপক্ষে ১জন জেসিওসহ ৩২জন হতাহত হয়। পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল রাতে শালদা নদীর অবস্থান হতে কসবাতে টহলের জন্য গিয়েছিল। এই সংবাদটি আমাদের লোকের জানাছিল না। পাকসেনাদের সঙ্গে আমাদের প্লাটুনটি যখন ভয়ংকর সংঘর্ষ করছিল, সে সময় পাকসেনাদের টহলদার দলটি কসবা থেকে ফেরার পথে আমাদের প্লাটুনটির পিছনে অবস্থান নিয়ে আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। আমাদের প্লাটুনটি সঙ্গে সঙ্গে অতিকষ্টে পাকসেনাদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। আসার সময় আমাদের একজন লোক আহত হয়। পাকসেনারা এরপর শালদা নদী অবস্থান আরো শক্তিশালী করে তোলে।

আমরা খবর পাই যে, পাকবাহিনী প্রায়ই হোমনা থানার নিকট কাঠালিয়া নদী এবং গোমতী নদীতে লঞ্চে দ্বারা পেট্রোলিং করে। এ খবর শুনে আমি হেডকোয়ার্টার থেকে ১টি প্লাটুন হাবিলদার গিয়াসুদ্দিনের নেতৃত্বে হোমনা থানাতে প্রেরণ করি। এই দলটি অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দাউদকান্দি ৮মাইল উত্তরে ও ও গৌরীপুর হতে সাত মাইল উত্তর পশ্চিমে চড়কমারী গ্রামের নিকট তাদের গুপ্ত ঘাটি গড়ে তোলে। হাবিলদার গিয়াসুদ্দিন চড়কমারী গ্রামের নিকট পাকসেনাদের লঞ্চে এ্যামবুশ করার জন্য তার দলটিকে নিয়ে নদীর পাড়ে একটি অবস্থান গড়ে তোলে। পাকসেনারা নিত্যনৈমিত্তিক টহলে সকালে পশ্চিম হতে কাঠালিয়া নদী দিয়ে লঞ্চে অগ্রসর হয়। লঞ্চে যখন ৫০গজের ভিতর চলে আসে, তখন হাবিলদার গিয়াসুদ্দিনের পার্টি মেশিনগান, হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র হতে অতর্কিতে গোলাগুলি চালাতে থাকে। পাকসেনারা অনেকেই হতাহত হয়। লঞ্চেটির সারেং লঞ্চেটিকে একটা চরের দিকে নিয়ে ভিড়বার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। এরপর অনেক পাকসেনা লঞ্চে থেকে পানিতে ঝাপ দিয়ে পড়ে কিন্তু তাতেও তারা পানিতে গুলির আঘাতে মারা যায়। লঞ্চেটিও আমাদের মেশিনগানের গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় এবং বেশীর ভাগ পাকসেনা পানিতে পড়ে যায়। শুধু কয়েকজন সাতরিয়ে অন্য পাড়ে উঠে পালাতে সক্ষম হয়। এই লঞ্চে পাকসেনাদের অন্ততঃ ৭০/৮০ জন লোক ছিল এবং সঙ্গে ৩জন বেসামরিক লোকও ছিল। হাবিলদার গিয়াসুদ্দিনের লোকেরা লঞ্চে থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার করে। সেদিনই বিকেল ৫টার সময় পাকবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার তাদের এই লঞ্চেটি এবং লোকজনের খবরাখবর নেয়ার জন্য ঐ এলাকায় অনেক ঘোরাফিরা করে কিন্তু কোন খোজখবর না পেয়ে হেলিকপ্টারটি ফেরত চলে যায়। এ এ্যাকশন সকালে প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা চলে পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকার স্থানীয় লোকেরা দূর থেকে তা প্রত্যক্ষ করে। পাকবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখে স্থানীয় লোকের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। তারা মুক্তিবাহিনীর উপর আরো আস্থাশীল হয়। হাবিলদার গিয়াসুদ্দিন এখনও এই এলাকার লোকের কাছে কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে বিরাজ করছেন।

সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর অধীনে যে কোম্পানীটি লাকসামের দক্ষিণে নোয়াখালীর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল, সে কোম্পানীটি ও এ অঞ্চলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের কার্যকলাপ চালায়। চাঁদপুর থেকে পাকবাহিনী যে রাস্তা নোয়াখালী যাবার জন্য ব্যবহার করত, সে রাস্তায় লক্ষ্মীপুরের নিকট ৯০ ফুটের একটি সড়কসেতু বিধ্বস্ত করে দেয়। এর কিছুদিন পর পাকবাহিনী পশ্চাদপসরণ করলে সুবেদার আলী আকবরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী রায়পুর থানা আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ফলে দালাল পুলিশের সাহায্যে স্থানীয় লোকদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করত। এ থানা দখল করে নেয়ার ফলে সমস্ত এলাকা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

১৬ই জুন আমাদের ২টি গেরিলা পার্টি হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠানো হয়। ৬ জনের একটি কুমিল্লার দক্ষিণে ইলেক্ট্রিক পাইলন উড়ানোর জন্য এবং আরও ৬ জনের একটি পার্টিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরে তিতাস গ্যাসলাইন কাটার জন্য পাঠানো হয়। ২১শে জুন প্রথম পার্টিটি ২টি ইলেক্ট্রিক পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে নোয়াখালী বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দলটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরে তালশহরে ২৪শে জুন সন্ধ্যায় তিতাস গ্যাসের ৪ ফুট পাইপ উড়িয়ে দেয়। এর ফলে তিতাস গ্যাস ঢাকা নারায়নগঞ্জ আশুগঞ্জ এবং সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনগুলিতে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে এসব পাওয়ার স্টেশনগুলি হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এতে শিল্প এলাকাগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

মতিনগর থেকে একটি প্লাটুন রাজাপুর পাক অবস্থানের উপর হামলা করার জন্য পাঠানো হয়। এই প্লাটুনটি ২২শে জুন আমাদের ঘাটি থেকে রাজাপুরের দিকে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যায় রাজাপুর শত্রুঅবস্থানটি তারা পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে রেকি করে। তারা জানতে পারে যে পাকসেনারা বেশ অসতর্কভাবে তাদের অবস্থানে আছেন। ২২শে জুন ভোর ৪টায় আমাদের দলটি অতর্কিতে গোপনপথে শত্রুঅবস্থানের ভিতর প্রবেশ করে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের পাকসেনারা সম্পূর্ণ হকচকিত হয়ে যায়। এই আঘাতে আমাদের লোকদের হাতে তাদের

প্রায় ১৫জন লোক হতাহত হয়। আমাদের একজন আহত হয়। আক্রমণ প্রায় এক ঘণ্টা পর আমাদের লোকেরা পিছু হটে আসে।

আমাদের রেকি পার্টি খবর আনে যে পাকসেনারা কসবার উত্তরে চন্দ্রপুর এবং লাটুমুড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পাবার পর লেঃ হুমায়ুন কবির পাকসেনাদের চতুর্দিকে থেকে এ্যামবুশ করার জন্য ৪র্থ বেঙ্গলের ডি কোম্পানীর তিনটি প্লাটুন ইয়াকুবপুর, কুয়াপাইনা এবং খৈনলে পাঠিয়ে দেয়। এই তিনটি প্লাটুন নিজ নিজ জায়গায় ২৩শে জুন সকাল ৬টার মধ্যে অবস্থান নেয়। পাকসেনারা সমস্ত রাত অগ্রসর হওয়ার পর সকালে আমাদের অবস্থানের সামনে উপস্থিত হয়।

পাকসেনারা আমাদের উপরোল্লিখিত অবস্থানের ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে এসে পড়লে তিনদিক থেকে আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকসেনাদের ৮জন নিহত এবং তিনজন আহত হয়। পাকসেনারা একটু পিছু হটে যেয়ে আবার আক্রমণের চেষ্টা চালায় কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর সমস্তদিন উভয়পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে এবং সন্ধ্যার সময় পাকসেনারা পিছু হটে যায়। পাকসেনাদের পশ্চাদপসরণের সময়ও আমাদের ইয়াকুবপুরের প্লাটুন তাদেরকে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে বেশ ক্ষতিসাধন করে। পিছু হটে গিয়ে লাটুমুড়ার উত্তরে অবস্থান নেয় এবং প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করতে থাকে। ২৪শে জুন পাকসেনারা যখন লাটুমুড়াতে তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করতে থাকে। ২৪শে জুন পাকসেনারা যখন লাটুমুড়াতে তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরীতে ব্যস্ত ছিল, সকাল পাচটায় আমাদের কুয়াপাইনা ও খৈনাল এলাকা থেকে শত্রুদের বামে এবং দক্ষিণে আমাদের ৩টি প্লাটুন আবার অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ৯জন লোক নিহত হয়। আমাদের ১জন আহত হয়।

নোয়াখালীর উত্তর পাকবাহিনী ফেনী থেকে নোয়াখালী পর্যন্ত ট্রাকে টহল দিত। এ খবর আমাদের নোয়াখালী গেরিলা হেডকোয়ার্টার এ পৌছে। সেখান থেকে আমাদের ২টি এ্যামবুশ পার্টি বোগাদিয়া এবং বজরাতে পাঠানো হয়। ২১শে জুন এই দুই পার্টি সন্ধ্যায় উপরোক্ত দুটি স্থানে এ্যামবুশ পাতে। তারা রাস্তাতে একটি এ্যান্টি ট্যাঙ্ক ও এ্যান্টি পার্সোনেল মাইন পুতে রাখে। সন্ধ্যায় পাকসেনাদের দুটি ট্রাক ফেনীমুখে যাচ্ছিল। এই ট্রাক দুটি এ্যামবুশ স্থানে পৌছালে প্রথম ট্রাকটি এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যায়। পরের ট্রাকটি পিছু হটে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনারা উপায়ান্তর না দেখে ট্রাক থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। পলায়নপর শত্রুদের কিছুসংখ্যক গুলীতে মারা যায়, আর কিছু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ এ্যামবুশ এ পাকসেনাদের ২টি ট্রাক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১২জন নিহত হয়। আমাদের পার্টি অনেক অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে এবং বজরার এ্যামবুশ পার্টিও শত্রুদের একটি টহলদার দলকে আক্রমণ করে ২জনকে নিহত এবং ২জনকে আহত করে। আর একটি পার্টি ২৩শে জুন পাকসেনাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়ার জন্য নোয়াখালীর শাহেবজাদা ব্রীজ, চন্দ্রগঞ্জ এবং রামগঞ্জ জেলা কাউন্সি ব্রীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

পাকসেনারা লাটুমুড়াতে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে কিন্তু ৪র্থ বেঙ্গলের ডি কোম্পানী লেঃ হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে তাদেরকে সবসময় ব্যতিব্যস্ত রাখে।

পাকসেনারা তাদের শালদানদী অবস্থান থেকে সবসময় মন্দভাগ দখল করে নেয়ার চেষ্টা চালাত। আমাদের ৪র্থ বেঙ্গলের সি কোম্পানী মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন এবং জেলা বোর্ডের কাচা রাস্তা পর্যন্ত নিজেদের রেখে শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়েছিল। এ অবস্থানটির জন্য পাকবাহিনী চট্টগ্রাম-ঢাকা রেলওয়ে লাইন চালু করতে পারছিল না। সেজন্য সবসময়ই তাদের চেষ্টা ছিল মন্দভাগ থেকে আমাদের বিতাড়িত করা। এছাড়া এ অবস্থানটির জন্য তারা শালদানদী ছিটমহল যেখানে আমাদের মূল ঘাটি ছিল, তা তাদের দখলে আনতে পারছিল না। অনেকবার চেষ্টা করেও তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২৪শে জুন বিকেল ৩টায় তাদের শালদানী অবস্থান থেকে

পাকসেনাদের একটা কোম্পানী, কসবায় টি, আলীর বাড়ী থেকে একটা কোম্পানী-এই দুই কোম্পানী দুদিক থেকে এসে কায়ামপুরের নিকট মিলিত হয়। তারপর মর্টার মেশিনগান এবং কামানের সাহায্যে আমাদের মন্দভাগ অবস্থানে আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড গোলার সহায়তায় পাকসেনাদের এই শক্তিশালী দলটি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে ৩০০ গজ পশ্চিমে জেলা বোর্ডে সড়কের নিকট পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়। আমাদের সৈনিকরাও তাদের বাক্সার থেকে মেশিনগান এবং হাঙ্কা মেশিনগানের গুলীতে পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। দুঘন্টা চেষ্টার পর পাকসেনারা যখন অগ্রসর হতে পারছিল না তখন আক্রমণ বন্ধ করে দেয় এবং পিছু হটে চলে যায়। এ আক্রমণের সময় পাকসেনাদের ২৪জন হতাহত হয়। পাকসেনারা তাদের কায়ামপুরের অবস্থানও তুলে নিয়ে শালদানদীর মূল ঘাটিতে চলে যায়।

ঢাকায় আমাদের গেরিলারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে স্বাভাবিকভাবে না চলে সেজন্য তারা ২৯শে জুন বিকেল পাচটায় সিদ্ধিরগঞ্জ এবং খিলগাও পাওয়ার লাইনের একটি পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এই বিধ্বস্ত পাইলনটি অন্য দুটি পাইলনের তার নিয়ে ছিড়ে পড়ে যায়। এর ফলে কমলাপুর এবং তেঁজগাওয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনেকাংশে কমে যায়। বিস্ফোরণের ঠিক পরপরই পাকসেনাদের একটি হেলিকপ্টার তৎক্ষণাৎ উক্ত এলাকায় গেরিলাদের অনেক খোজাখুজি করে। আমাদের গেরিলারা নিরাপদে ফিরে আসে। আর একটি গেরিলা দল সিদ্ধিরগঞ্জের মাটির তলার পাওয়ার লাইন মাতুয়াইলে উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা নিকটবর্তী ঘাটি হতে জীপে করে এসে দলটিকে ধরার চেষ্টা করে এবং এদের উপর গোলাগুলী করে, কিন্তু গেরিলা গুলি নিরাপদে ফিরে আসে।

স্থানীয় লোকমুখে আমরা সংবাদ পাই যে, পাকসেনাদের একটি জীপ ও টহলদার দল প্রায়ই সাইদাবাদ থেকে কর্নালবাজার পর্যন্ত আসে। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন খোলাপাড়ায় এবং তুলাইশমলে একটি করে প্লাটুনের সাহায্যে এ্যামবুশ লাগায়। ২৭শে জুন সন্ধ্যার সময় পাকসেনাদের টহলদার দল খোলাপাড়ায় আমাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। এতে পাকসেনাদের ৮জন লোক নিহত হয় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এর পরদিন ২৮শে জুন সন্ধ্যা ৭টায় পাকসেনাদের একটি জীপ তুলাইশমলে আমাদের এ্যামবুশে পড়ে। এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে জীপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রাস্তা থেকে পড়ে যায়। জীপে পাঁচজন পাকসেনা ছিল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। আমাদের পার্টি অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়।

পাকসেনারা কুমিল্লা শহরের পূর্বে বিবিরবাজার এলাকায় যে ঘাটি গড়েছিল, আমরা প্রায়ই আক্রমণ করে তাদের ব্যতিব্যস্ত রাখতাম। লেঃ মাহবুব খবর পায় যে, পাকসেনারা সন্ধ্যার পর আর তাদের বাংকার থেকে বাইরে আসে না। রাতে যেসব পাহারাদার থাকে তারা বাংকারের মধ্যে বসে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে লেঃ মাহবুব দুটি প্লাটুনকে ২৪শে জুন রাতে শত্রুদের বিবিরবাজার ঘাটির কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়ে কুমিল্লার দক্ষিণ থেকে পাঠিয়ে দেয়। এ দলটি অরণ্যপুর হয়ে শত্রুদের বিবিরবাজার অবস্থানের পিছনে পৌছে এবং রাত তিনটায় অবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। প্রথমেই তারা তাদের সামনের একটি বাংকারে গ্রেনেড ছোড়ে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এরপর আরও ২/১টি বাংকার ধ্বংস করে তারা সকাল হবার আগেই শত্রুঅবস্থান ত্যাগ করে। এই অতর্কিত আক্রমণে পাকসেনাদের ২১জন নিহত ও ৭জন আহত হয়।

পাকসেনারা বিজয়পুরের যে রাস্তার সেতুটি আমাদের কমাণ্ডো পার্টি উড়িয়ে দিয়েছিল সেটি সাময়িকভাবে মেরামত করে ফেলে এবং সে রাস্তায় আবার তাদের চলাফেরা শুরু করে। লেঃ মাহবুব আবার একটি কমাণ্ডো প্লাটুন পাঠায় এবং এই প্লাটুনটি ২১শে জুন বিজয়পুর ব্রীজের নিকট এ্যামবুশ পেতে পাকসেনাদের অপেক্ষায় থাকে। রাত ২টার সময় পাকসেনাদের দুটি গাড়ী কুমিল্লা থেকে ঐ রাস্তায় আসে। গাড়ীগুলী যখন ব্রীজের উপর দিয়ে চলা শুরু করে ঠিক তখনই আমাদের পার্টি তাদের উপর গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ীগুলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজ থেকে নদীতে পড়ে যায়। এতে দুটি গাড়ীই বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ৮জন পাকসেনা নিহত হয়।

জুন মাসে প্রথম সপ্তাহে আমার হেডকোয়ার্টার থেকে গেরিলাদের ৬০জনের একটি দলকে আমি ফরিদপুরে পাঠাই। মাদারীপুর, পালং, রাজৈর, নড়িয়া প্রভৃতি থানায় গেরিলাদের বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছিল। এই দলগুলি তাদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে ঘাটি গড়ে তোলে। এরপর তারা কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী দালালকে হত্যা করে। এরপর তারা নিজ নিজ এলাকার থানাগুলি যেখান থেকে দালাল পুলিশরা পাকিস্তানীদের খবরাখবর যোগাত, সেই থানাগুলি ভালভাবে রেকি করে। প্রথমে তারা শিবচর অয়ারলেস স্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। এরপর গেরিলা কমাণ্ডার খলিলের নেতৃত্বে পালং থানার উপর ২৭শে জুন রাত ১১টার সময় আক্রমণ চালান হয়। এ আক্রমণে একজন দালাল সাব ইন্সপেক্টর ও দুজন পুলিশ নিহত হয়। গেরিলারা ৯টা রাইফেল দখল করে নেয়। তারা থানার অয়ারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। নড়িয়ার গেরিলাদল খবর পায় যে, মাদারীপুরের ডিআইবি ইন্সপেক্টর ও দালাল সি আই পুলিশ একটি স্থানীয় দালালের বাড়িতে গুপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত। এ সংবাদ পেয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারপরে নড়িয়ার অয়ারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। নড়িয়ার গেরিলাদল খবর পায় যে, মাদারীপুরের ডিআইবি ইন্সপেক্টর ও দালাল সি আই পুলিশ একটি স্থানীয় দালালের বাড়িতে গুপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত। এ সংবাদ পেয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারপরে নড়িয়ার অয়ারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়।

শত্রুদের একটি ছোট দল রাজৈর থানার টাহেরহাটে এসে অবস্থান নেয়। রাজৈরের গেরিলা দলটি তাদের অবস্থানটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খবর নেয়। ২৮শে জুন রাত ১১টার সময় ২০জনের একটি গেরিলাদল টাহেরহাটে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ১০জন নিহত হয় এবং পাকসেনারা টাহেরহাট অবস্থান থেকে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে ২৮শে জুন সন্ধ্যায় জেনারেল মোঃ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন এ সংবাদ জানতে পেরে আমি ইয়াহিয়া খানের ভাষণকে উপস্থিত সম্বর্ধনা জানানোর জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এসম্বন্ধে আমি আমার সাবসেক্টর কমাণ্ডারদের আমার হেডকোয়ার্টার এ ডেকে পাঠাই এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌছি যে ভাষণের সময় পাকিস্তানীরা সর্বক্ষেত্রেই রেডিও শোনার জন্য তাদের নিজ নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থানে একত্রিত হবে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হবে। এ সময় তাদের এ সতর্কতা আমাদের জন্য আনবে এক সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়া আমাদের অ্যাকশনও হবে ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সমুচিত জবাব। এ জন্য আমি সব সাব সেক্টর কমাণ্ডারকে নির্দেশ দিলাম, তারা সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পর থেকে যখন ইয়াহিয়ার ভাষণ আরম্ভ হবে, ঠিক সে সময়ে আমার সেক্টরের সব এলাকায় একযোগে পাকসেনাদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালাবে। এ নির্দেশ অনুযায়ী ৪র্থ বেঙ্গলের এ কোম্পানী নয়ানপুরের পাকসেনাদের অবস্থানের দিকে তিন দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং ভাষণ আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এ অতর্কিত আক্রমণে হকচকিত হয়ে যায়। এর সাথে সাথে আমাদের মর্টারের গোলা তাদের উপর পড়তে থাকে। পাকসেনারা তাদের অবস্থানের চুতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ী এবং চীৎকার করে বাংকারের দিকে যাবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেশিনগানের গুলিতে তাদের অনেকেই মারা যায়। আধ ঘণ্টা এভাবে গুলী চালানোর পর আমাদের সৈন্যরা শত্রু অবস্থান পরিত্যাগ করে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এ যুদ্ধে ১৮জন নিহত এবং বহু আহত হয়।

ঐ দিনই আমাদের একটি কোম্পানী মর্টারসহ লেঃ হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে ঠিক ঐ সময় লাটমুড়াতে শত্রু অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে শত্রুদের মধ্যে বেশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তখন তারা ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনছিল। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ৫জন নিহত ও ১০জন আহত হয়। আমাদের কোম্পানী শত্রুদের উপর আড়াই ঘণ্টা আক্রমণ চালিয়ে নিরাপদে পিছু হটে আসে।

ঢাকাতে ঐ সময়টিকে উদযাপন করার জন্য আমি ৫০জন গেরিলার একটি দলকে পাঠিয়ে দিই। এই দলটি ২৭শে জুন ঢাকায় পৌছে। তারপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঢাকা শহরের প্রধান স্থানগুলিতে যেমন জিন্নাহ এভিনিউ মতিঝিল, শাহবাগ, পুরানা পল্টন, সদরঘাট, চকবাজার প্রভৃতি স্থানে একযোগে সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সময় গ্রেনেড বিস্ফোরণ এবং মোটরগাড়ীতে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে পাকসেনারা

চতুর্দিকে ছোট্টাছুটি করে এবং সমস্ত ঢাকায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এ বিস্ফোরণগুলি ফলে ঢাকায় আমাদের বাঙ্গালীরা তাদের মনোবল আরো ফিরে পায় এবং তারা ইয়াহিয়ার ভাষণের সমুচিত জবাবে আনন্দিত হয়।

মতিনগর থেকে ২টি মর্টার দিয়ে একটি ছোট দলকে গোমতীর উত্তর পাড় দিয়ে কুমিল্লা শহরের দিকে পাঠানো হয়। এ দলটি কুমিল্লা শহরের নিকট গিয়ে ভাষনের ঠিক সময়ে কুমিল্লা সার্কিট হাউসের উপর মর্টার দ্বারা গোলাবর্ষণ করে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে পাকসেনাদের মার্শাল ল'র প্রধান অফিস ছিল। মর্টারের গোলা এসে অফিসে পড়ার পর, সেখানেও পাকসেনারা ছুটাছুটি করতে থাকে। কুমিল্লা শহরেও কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরবতা নেমে আসে।

কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানীদের একটি জীপ ও একটি ওটনের গাড়ি দক্ষিণে যাচ্ছিল। লেঃ মাহবুবের একটি এ্যামবুশ পার্টি এই দলটিকে সন্ধ্যার ফুলতলীর নিকটে আক্রমণ করে। এতে জীপটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এ এ্যামবুশে পাকিস্তানীদের ২৪জন সৈন্য ও ৩জন অফিসার নিহত হয় এবং ১জন অফিসারসহ ৪জন আহত হয়। অফিসারটি লেঃ কর্নেল ছিলো।

লেঃ মাহবুবের আর একটি প্লাটুন ঠিক ঐ সময় বিবিরবাজার শত্রু অবস্থানের ভিতর অতর্কিতে অনুপ্রবেশ করে ১টি মেশিনগানসহ কয়েকটি বাংকার করে দেয়। পাকসেনাদের ১১জন এতে নিহত হয়।

এ ছাড়া, মিয়াবাজার, ফেনী, বিলোনিয়া, লাকসাম, শালদানদী, চাদপুর ইত্যাদি স্থানেও মর্টার ও গ্রেনেডের সাহায্যে পাক অবস্থানের উপর একযোগে একই রূপে আক্রমণ চালান হয়।

ইয়াহিয়া খান মনে করেছিল যে, তার ভাষণ দিয়ে তিনি বাঙ্গালীদের শান্ত করবেন এবং আবার তার মিথ্যা আশ্বাসে বাঙ্গালীরা তাদের অত্যাচারকে ভুলে যাবে, কিন্তু আমাদের সমস্ত এলাকা জুড়ে সবগুলো এ্যাকশনে তিনি নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছিলেন যে, বাঙ্গালীরা তার জবাব কি দিয়েছে।

সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল শাফায়াত জামিল

১৯৭১ সনের ১লা মার্চ তারিখে আমি আমার চতুর্থ বেঙ্গলের এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাহ্মনবাড়িয়া চলে আসি আমার সাথে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর একটা কোম্পানী ছিল যার কমান্ডার ছিল একজন পশ্চিম পাকিস্তানী সিনিয়র মেজর। আমাদের পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য ব্রাহ্মনবাড়িয়াতে গিয়ে প্রতিরক্ষাব্যুহ তৈরী করা। এখানে বলে রাখা দরকার যে, চতুর্থ বেঙ্গলে আমিই বাঙ্গালীদের মধ্যে সিনিয়র মোস্ট ছিলাম। আমরা চলে আসার পর কুমিল্লা সেনানিবাসে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আরো দুই কোম্পানী সৈন্য থেকে যায়।

ব্রাহ্মনবাড়িয়া থেকে আমি সব সময় কুমিল্লা সেনানিবাসের বাকি দুই কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করতাম। এ ব্যাপারে আমি সুবেদার আবদুল ওহাবকে ব্যবহার করতাম।

মার্চের ১তারিখ থেকে ২৪তারিখ পর্যন্ত কুমিল্লা সেনানিবাসের অস্বাভাবিক ঘটনাবলীঃ

১। আমাদের ইউনিট লাইনের চারদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার এবং জেসিওদের বিশেষ করে আর্টিলারী বাহিনীর লোকদের অস্বাভাবিক গতিবিধি বা চলাফেরা।

২। রাতের বেলায় মেশিনগান আমাদের ইউনিট লাইন, অফিসারদের বাসস্থান, অস্ত্রাগার এবং কোয়ার্টার গার্ডের দিকে পজিশন করে রাখত। এবং দিনের বেলায় সেনানিবাসের বাহিরেরদিকে পজিশন থাকত। তাছাড়া আমাদের ইউনিট লাইনের চারিদিকে উঁচু পাহাড়ে পরিখা খনন করে। জিজ্ঞেস করলে বলত “আমরা ট্রেনিং করেছি”।

৩। ইউনিট লাইনে বিগ্রেড কমাণ্ডার ও বিগ্রেড কমাণ্ডার অন্যান্য অফিসারদের অপ্রত্যাশিত পরিদর্শন।

৪। আমাদের খেলার মাঠের চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট অফিসার ও জেসিদেরসাথে বিগ্রেডের অফিসার ও জেসিদের দৈনিক খেলাধুলা প্রতিযোগিতা (যেটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয় মাসে একবার, দুইবার হয়)। খেলার মাঠ রক্ষার জন্য অন্য রেজিমেন্টের প্রটেকশন পার্টিকে অস্ত্রশস্ত্রসহ নিয়োগ করা।

৫। যদিও সম্ভব্য ভারতীয় আক্রমণের জন্য আমাদের উপর ছুটির ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধআরোপ করা হয় নাই। বরং চতুর্থ বেঙ্গলের কমাণ্ডিং অফিসার ও বিগ্রেড কমাণ্ডার জোয়ানদেরকে বলেন, যার যার ইচ্ছানুযায়ী ছুটি নিতে পারে।

৬। মার্চ মাসের ১৮/১৯ তারিখে ইউনিট লাইনে রাত প্রায় বারোটোর সময় গোলন্দাজ বাহিনীর একজন বাঙ্গালী এসে খবর দেয় যে সেনানিবাসে আজ রাতে চতুর্থ বেঙ্গলের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিরা হামলা চালাবে। এ খবর পাওয়া মাত্র ক্যাপ্টেন গফফার, লেফটেন্যান্ট মাহবুব, লেফটেন্যান্ট কবীর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি(যারা সেনানিবাসের ভিতরে ছিল) নির্দেশ দেয় যে, সব জোয়ান নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র অস্ত্রাগার থেকে নিয়ে যেন নিজেদের কাছে রাখে। চতুর্থ বেঙ্গলের সৈন্যদের দেখাদেখি সেনানিবাসের অন্যান্য পাকিস্তানি ইউনিট অস্ত্রশস্ত্র সহকারে তৈরি থাকে। সে রাতে কোন হামলা হয়নি। ২০শে মার্চ ভোরে সবাই অবর অস্ত্র জমা দেয়। রাতে অস্ত্রাগার থেকে বাহির করার জন্য কারো কাছে কোন কৈফিয়ত চাওয়া হয়নি। চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমাণ্ডিং অফিসার নিজে জেনেও উপরোল্লিখিত অফিসারদের কাছে কোন কৈফিয়ত চান নাই।

৭। বিগ্রেড কমাণ্ডার, ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার সপ্তাহে একবার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতেন, যেটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

৮। ১০মার্চ, (১৯৭১) ১৭টি গাড়ি (রসদপত্র, তেল বোঝাই) কুমিল্লা থেকে সিলেট পাঠানো হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের একজন সুবেদার সামসুল হক এবং দশজন (বাঙ্গালী) লোককে এই কনভয়েকে প্রটেকশনে পাঠানো হয়। এই কনভয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যও ছিল। দুই দিনে এই কনভয় কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসে। রাস্তায় বেরিকেড ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এই কনভয়কে নিয়ে সিলেটের খাদিমনগরে পৌছাবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড অতিক্রম করে খাদিমনগরে পৌছাতে তিন দিন লাগে। ১৫মার্চ আমি খাদিমনগর পৌছি ও নির্দেশ মোতাবেক ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার প্রস্তুতি নিই। কিন্তু আমাকে বলা হয় যে, অনির্দিষ্টকালের জন্য আমাকে ৩১পাঞ্জাবের সাথে থাকতে হবে। এ খবর পাওয়া মাত্র আমি কুমিল্লায় টেলিফোন করলাম। বাঙ্গালি অফিসাররা বিশেষ করে ক্যাপ্টেন গফফার, লেফটেন্যান্ট মাহবুব, লেফটেন্যান্ট কবীর এবং জেসিওরা কমাণ্ডিং অফিসাররা আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেন। ১৭/১৮ তারিখে আমি ও আমার চতুর্থ বেঙ্গলের অন্যান্য সৈনিক ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমার কোম্পানিতে ফিরে আসি।

উপরোল্লিখিত আমি সন্দ্বিহান হয়ে পড়ি। আমি সুবেদার ওহাবের মাধ্যমে কুমিল্লা সেনানিবাসে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও জেসিদের কাছে খবর পাঠাতাম যে, কোন পরিস্থিতিতেই তারা যেন আত্মসমর্পণ না করে। যদি প্রয়োজন হয় অস্ত্র নিয়ে তারা যেন বেরিয়ে আসে।

এই সন্দেশ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি হবার পর আমার কোম্পানী এবং মেজর সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীর উদ্ধৃত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে আনা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমরা ওয়াপদা কলোনী সংলগ্ন স্থানে তাঁবুতে দুই কোম্পানী থাকি। আমার আশংকা ছিল, এই দুই কোম্পানী সৈন্যকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করবে। এই সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আমি আমার কোম্পানীর এবং সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীর জেসিওদের নির্দেশ দিই, যেন তারা আত্মরক্ষার জন্য আমাদের ক্যাম্পের চারিদিকে পরিখা খনন করে রাখে। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে এসব পরিখা থেকে আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে।

আমার এই সমস্ত কাজ খুব সাবধানে ও হুঁশিয়ারের সাথে করতে হয়। কেননা, মেজর সাদেক নেওয়াজ সব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখতো। সে প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করত, পরিখা খনন করা, পজিশন নেয়া- এগুলোর উদ্দেশ্য কি? আমি বলতাম, ডিগিং প্র্যাকটিস এবং পজিশন নেয়ার প্রশিক্ষণ রিভাইজ করা হচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন কাজ, এবং বিভিন্ন জেসিওদের সাথে যোগাযোগ, প্রভাবান্বিত করা, এবং সতর্ক করার কাজে লেফটেন্যান্ট হারুন আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। সে এসব কাজে উৎসাহী ছিল এবং অন্যান্য লোকদের প্রেরণা যোগাতো।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে কুমিল্লার সাথে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ক্যাম্পের যোগাযোগ ছিল একমাত্র টেলিফোনের মাধ্যমে এবং একটি সিগন্যাল সেট যেটা অস্বাভাবিকভাবে কুমিল্লা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ রাখত। এ সময় আমি খুব অস্বস্তিকর পরিবেশে ছিলাম। আমি সবসময় চিন্তা করতাম যে কুমিল্লাতে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সৈনিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় আমরা দেখতে পেলাম কুমিল্লার দিক থেকে ৮টা গাড়ির আলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের ক্যাম্পের প্রটেকশন পার্টি পরিখাতে অবস্থান নেয়। গাড়ি কাছাকাছি আসার পর বুঝতে পারি, মেজর খালেদ মোশাররফ তার কোম্পানী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১২০ মাইল দূরে সমশেরনগরে নকাশালপত্নী এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের অশুভ তৎপরতা বন্ধ করার জন্য আসছে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, মেজর খালেদ মোশাররফ যিনি আমার থেকে বাঙ্গলীদের মধ্যে সিনিয়র সেদিনই ব্যাটালিয়নে ঢাকা থেকে এসে যোগদান করেন এবং একই দিনে তাঁকে কুমিল্লা থেকে ১৭০ মাইল দূরে সমশেরনগরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর চতুর্থ বেঙ্গলের একটি রাইফেল কোম্পানী আর হেডকোয়ার্টার কোম্পানী কুমিল্লা থেকে যায়।

সেই রাতে মেজর খালেদ মোশাররফ লেঃ মাহবুবকে সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং তার কোম্পানী আমাদের ক্যাম্প থাকে। মেজর সাদেক নেওয়াজের সর্বক্ষণিক উপস্থিতির জন্য আমরা খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করতে পারি নাই। শুধু আভাষে, ইঙ্গিতে এটুকু বুঝতে সক্ষম হই, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে আমরা প্রস্তুত। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন আমি আর লেফটেন্যান্ট হারুন খুব খুশী হই এই ভেবে যে, আমাদের পরিচালনার জন্য একজন পুরোনো অভিজ্ঞ অফিসার চতুর্থ বেঙ্গলে যোগ দিয়ে কুমিল্লা থেকে আরো একটি কোম্পানীকে মরণ ফাঁদ থেকে কনফ্রন্টেশনের আগেই বের করে নিয়ে এসেছেন।

মেজর খালেদ মোশাররফের নিকট একটা সিগন্যাল সেট ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার দিয়ে দেয়। আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমার সেট এবং খালেদ মোশাররফের সেট যেন একই প্রিকুয়েন্সিতে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। ২৪/২৫ তারিখ সকালে তিনি তার কোম্পানী নিয়ে সমশেরনগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যাবেলায় কুমিল্লা থেকে নির্দেশ আসল যে, আরো লোক আসছে তাদের থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করেছি কিন্তু আমরা জানতাম না কারা আসছে। রাত আটটার সময় দেখলাম যে লেঃ কর্নেল মালিক খিজির হায়াত খান কুমিল্লায় অবস্থিত চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাকি কোম্পানীগুলো নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে উপস্থিত হয়েছেন। এসে তিনি বললেন যুদ্ধ আসন্ন। সেজন্য ব্রিগেড কমান্ডার তাঁকে কুমিল্লা থেকে চতুর্থ বেঙ্গলের প্রায় সব লোক নিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

খিজির হায়াত খানের আসার পর চতুর্থ বেঙ্গলের অবস্থান নিম্নরূপ ছিলঃ

(ক) এক কোম্পানী সমশেরনগরে- যার কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ।

(খ) তিন কোম্পানী- হেডকোয়ার্টার কোম্পানী আর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার- ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে।

(গ) ৭০/৮০ জন লোক কুমিল্লায় ইউনিট লাইন-এর প্রহরায় নিয়োজিত।

(ঘ) এক প্লাটুন কুমিল্লার জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎ গ্রীড স্টেশনের প্রহরায়। এর কমান্ডার ছিল নায়েব সুবেদার এম, এ, জলিল।

খিজির হায়াত খান ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেই ২৫শে মার্চ রাত এগারটায় আমাকে হুকুম দিলেন যে, আমি যেন আমার কোম্পানীর সৈন্য নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১৩ মাইল দূরে শাহবাজপুর পুলের কাছে প্রতিরক্ষাবূহ তৈরি করি। রাত দুটার সময় রওনা হয়ে তিনটায় শাহবাজপুরে পৌঁছি।

সকাল ছটার সময় (২৬শে মার্চ) আবার খবর আসল, কোম্পানী ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ফেরত যেতে হবে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।

সকাল সাতটায় রওনা হয়ে দশটায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছি। দশ মাইল আসতে তিন ঘন্টা লাগে, কেননা জনসাধারণ বড় বড় গাছ রাস্তার উপরেফেলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছে দেখি সেখানে সান্দ্য আইন জারী করা হয়েছে। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছার সাথে সাথে খিজির হায়াত খান আমাকে পুলিশ লাইনে গিয়ে তাদেরকে নিরস্ত্র করার নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে নিরস্ত্র করতে গেলে খামাখা গুলগোল, গোলাগুলী হবে। তার চেয়ে আমি নিজেই গিয়ে পরদিন ওদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার অঙ্গীকার করলাম। খিজির হায়াত খান প্রথমতঃ চেয়েছিলেন যে মেজর সাদেক নেওয়াজ গিয়ে প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করে পুলিশদের নিরস্ত্র করুক। আমি অনর্থক রক্তপাত এড়ানোর জন্য খিজির হায়াত খানের কাছে এক মিথ্যা অঙ্গীকার করলাম যে আমি নিজে গিয়ে পরদিন ওদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসব। তিনি আমার কথায় রাজী হলেন।

২৬শে মার্চ বেলা বারটার সময় চতুর্থ বেঙ্গলের সিগনাল জেসিও নায়েব সুবেদার জহীর আমাকে বললেন যে তিনি অয়ারলেস ইন্টারসেপ্ট করে দুটো স্টেশনের মধ্যে এই কথোপকথন শুনেছেন। তাকে খুব চিন্তিত ও উদ্ভিগ্ন দেখাচ্ছিল।

ইন্টারসেপ্টেড মেসেজগুলো ছিলঃ (1) Send tank ammunition, (2) Send helicopter to evacuate casualties (3) 50 boys of East Bengal Regimental Centre have deserted ...some with weapon and some without weapon.

এ সমস্ত মেসেজ পেয়ে আমার জুনিয়র অফিসারগণ লেঃ হারুন, লেঃ কবীর, লেঃ আখতার খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন আমি সিগনাল সেটে গিয়ে মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে যোগাযোগ করি এবং অল্প চেষ্টায় তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ হয়ে যায়। আমি তাঁকে চোস্ট ঢাকাইয়া বাংলায় ঐ মেসেজগুলো শুনাই এবং তাঁর

মতামত জানতে চাই। আমি তাঁকে বলি যে, আমরা তৈরি এবং তাঁকে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কোম্পানী নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করি। আমার সাথে যখন খালেদ মোশাররফের কথোপকথন চলে তখন সাদেক নেওয়াজ, লেঃ আমজাদ সাহিদ এবং খিজির হায়াত খান আমাকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল। সেই জন্য খুব বেশী কথাবার্তা চালানো সম্ভব হয়নি এবং তিনিও সমশেরনগর থেকে বেশী কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন যে, তিনি রাতের অপেক্ষায় আছেন।

তার পর থেকেই আমার জুনিয়র অফিসাররা তাড়াতাড়ি যেকোন সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করছিল। আমি ব্যাটালিয়নের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন জুনিয়র অফিসারের মতামতের অপেক্ষায় ছিলাম। কেননা, সামান্য ভুল সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী না হলে সবকিছু পণ্ড হয়ে যাবে এবং নিজেদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় হতাহত হবে। আমি অন্ততঃ একজন অফিসার এবং একজন জেসিওকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সারারাত সময় দিই। সন্ধ্যার সময় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সৈনিকদের ক্যাম্পের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। আমাকে দেখা মাত্রই বেশ কয়েকজন সৈনিক যাদের মধ্যে কয়েকজন এনসিও ছিলেন, আমাকে ঘিরে ধরেন এবং বলেন যে, “স্যার দেশের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন। আমরা অফিসারদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। আপনারা যেকোন নির্দেশ আমরা জীবন দিয়ে পালন করতে প্রস্তুত। আপনারা যদি বেশী দেরী করেন তবে হয়ত আমাদের কাউকে পাবেন না। আমরা আগামীকালের পরেই যে যার বাড়ির দিকে রওনা হব। কিন্তু সঙ্গে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাব। সৈন্যদের এই মনোবল ও সাহস দেখে আমি খুব গর্বিত ও আশান্বিত হলাম এবং দু’একজন অফিসার ও জেসিও’র দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমাকে সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা থেকে বিরত করতে পারে নাই। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, আমার চেষ্টা সত্ত্বেও দুপুরের পরে খালেদ মোমাররফের সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারিনি।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যার পরে ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শুনে আমার বাঙ্গালী জুনিয়র অফিসাররা আরো উত্তেজিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং আমাকে তক্ষুনি অস্ত্র হাতে তুলে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি রাতে আমার তাঁবুতে অবস্থান করলাম। সারারাত সাদেক নেওয়াজ এবং লেঃ আমজাদ আমার তাঁবুর ১০০/১৫০ গজ দূর থেকে আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। আমার অজ্ঞাতেই তিন চারজন এনসিও (শহীদ হাবিলদার বেলায়েত হোসেন, শহীদ হাবিলদার মইনুল, হাবিলদার শহীদ মিয়া এবং হাবিলদার ইউনুস) সারারাত আমাকে পাহারা দেয় যাতে ঐ দুজন পাঞ্জাবী অফিসার আমার উপর কোন হামলা করতে না পারে। পাঞ্জাবী অফিসাররাও সারারাত সজাগ ছিল।

২৭শে মার্চ সকাল সাতটায় আমি লেঃ আখতারকে সাদেক নেওয়াজের কক্ষে পাঠাই এবং তাকে বলা হয় যখন সাদেক নেওয়াজ মেসে আমাদের সাথে নাস্তা করতে আসবে তখন যেন তার স্টেনগান এবং ৮ ম্যাগাজিন গুলী অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল রক্তপাতহীন একটা এ্যাকশন পরিচালনা করা। কিছুক্ষণ পর আমি, লেঃ হারুন আর লেঃ কবীর দুইজন এন- সি- ও সাথে করে অফিসার মেসের দিকে যাই। অফিসার মেসে পাঞ্জাবী অফিসারদের সাথে আমরা ব্রেকফাস্টে মিলিত হই। এন- সি- ওদের নির্দেশ দিই যে, আমাদের রক্তপাতহীন এ্যাকশনের সময় যদি কোন বাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাকে যেন গুলী করে হত্যা করা হয়। আমরা সকাল ৭-২০ মিনিটে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আছি। এমন সময় একজন জেসিও খিজির হায়াত খানকে বলল যে, সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীতে একটু মনোমালিন্য হয়েছে সুতরাং খিজির হায়াতকে সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীতে এফ্রুনি যেতে হবে। একথা শোনা মাত্র খিজির হায়াত খান তক্ষুনি সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীর কাছে যেতে উদ্যত হল। আমি তাকে বাধা দিলাম এবং বললাম যে, পরিস্থিতি না জেনে এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না। সুতরাং প্রথমে আমরা অফিসে যাই। ওখানে আলাপ- আলোচনার পর আমরা সকলেই সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীতে যাব। খিজির হায়াত এতে রাজি হলেন। সাদেক নেওয়াজ তখন তার স্টেনগান

আনার জন্য তার কক্ষে যেতে উদ্যত হয়। আমি আবার বাধা দিই এবং বলি যে আমার স্টেনগানটা সে যদি চায় তবে সে সঙ্গে নিতে পারে। এতে সে আশ্বত হয় এবং আমরা সকলেই অফিসে যাই। একটা তাঁবুতে অফিস করা হয়েছিল। তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার তাঁবুতে ঢোকা মাত্রই লেঃ কবীর আর লেঃ হারুন তাঁবুর দুপাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং আমি আমাদের সকলের আনুগত্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ঘোষণা করি এবং বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে তাদেরকে বলি যে তারা আমাদের সকলের আনুগত্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ঘোষণা করি এবং বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে তাদেরকে বলি যে তারা আমাদের বন্দী। তদানুসারে তাদের জীবনের দায়িত্ব আমাদের এবং তারা যেন কেউ কোন বাঙ্গালী অফিসার, জে- সি-ও, এন- সি-ও সাথে কোন কথা না বলে। বলাবাহুল্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানী ১২/১৫ জন সৈনিক যারা চতুর্থ বেঙ্গল- এর সাথে ছিল আমার নির্দেশের অপেক্ষা না করেই প্রায় একই সময়ে তাদেরকে বন্দী করে এক জায়গায় জমা করে রাখা হয়। বিনা রক্তপাতে আমাদের এ্যাকশন সম্পন্ন হয় এবং চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় সব কটা কোম্পানী তার সম্পূর্ণ তার সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন, রসদপত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২৭শে মার্চ সকাল দশটার দিকে প্রায় ১০/১৫ হাজার উল্লসিত জনতা আমাদের ক্যাম্পে চলে আসে এবং ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি দিয়ে আমাদের স্বাগত জানায়। অস্ত্র ধারণ করার পর দেখতে পেলাম আমার বেশ কয়েকজন অফিসার, জেসিও এবং এনসিও একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ছিলেন এই অল্প সময়ের মধ্যে জীবনের এই বিরাট পরিবর্তনে। কয়েকজনের ক্ষণিকের মধ্যে ১০২ থেকে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর পর্যন্ত হয়েছিল। কয়েকজন আবোল- তাবোল বকছিল। দুইজন অফিসারকে বেশ কয়েকদিন আর চোখে পড়েনি। আমি নিজেও একটু অস্থির প্রকৃতির হয়ে পড়েছিলাম।

সকাল ১১টার দিকে আমি সব কোম্পানীকে নির্দেশ দিলাম তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের চার পাশের গ্রামগুলোতে যেন অবস্থান নেয় যাতে করে পাকিস্তানী বিমান হামলা থেকে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে আমাদের ব্যাটালিয়ন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারিপার্শ্বের গ্রাম গোপনে অবস্থান নেয়। বেলা আড়াইটার সময় মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁর কোম্পানী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন। রাস্তায় হাজার হাজার বেরিকেড অতিক্রম করে আসার ফলে তাঁর আসতে দেরী হয়েছিল। তিনি আসা মাত্রই আমি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুক্ত এলাকা তাঁর কাছে হস্তান্তর করি এবং তাঁর নির্দেশে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়।

কুমিল্লা সোনানিবাসে আমাদের যে সমস্ত লোক ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা আমাদের সম্ভব হয়নি। সুতরাং তাদেরকে ২৭শে মার্চ বলতে পারিনি যে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছি। যা হোক, কর্নেল খালেদ মোশাররফ ২৯শে মার্চ জাঙ্গালীয়াতে আমাদের প্লাটুনের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে আমাদের সংগ্রামের কথা জানান এবং নির্দেশ দেন জাঙ্গালীয়া থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাটালিয়নে যোগদান করতে।

আমরা পরে জানতে পেরেছি যে কুমিল্লা সোনানিবাসে আমাদের যে সমস্ত লোকজন ছিল তারা ২৯শে মার্চ আমাদের সংগ্রামের কথা জানতে পেরেছিল। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে তারা কোন এ্যাকশন নিতে পারেনি। ৩১শে মার্চ বিকাল চারটার সময় সোনানিবাসে অবস্থিত চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৭০/৮০ জন সৈনিকের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীরা চারিদিক থেকে হামলা করে এবং প্রায় ছয় ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইউনিট লাইন দখল করে। এই যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের ৮/১০ জন জোয়ান শহীদ হন। এই যুদ্ধে নায়ক সুবেদার এম, এ, সালাম অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

জাঙ্গালীয়াতে যে প্লাটুন ছিল সেটা ২৯শে মার্চ বের হয়ে মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেয় এবং কুমিল্লা- লাকসাম রোডে নায়ক সুবেদার এম, এ, জলিলের নেতৃত্বে কয়েকটি সাফল্যজনক এ্যামবুশ করে।

কুমিল্লা- নোয়াখালীতে সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মেজর গাফফার*

২১-৮-১৯৭৩

আমি মনে করছিলাম কুমিল্লা ব্রিগেডের ইকবাল মোঃ শফি আমাদের ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বিভক্ত এবং দুর্বল করে দিয়ে ধ্বংস করে দেবে। সেহেতু ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিনটি কোম্পানীকে বাইরে পাঠিয়ে সিলেটে অবস্থানরত ৩১ তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত ২৪তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স- এর ৩ কমাণ্ডো ব্যাটালিয়ন দিয়ে আক্রমণ ও ঘেরাও করিয়ে ধ্বংস করাই তারা শ্রেয় ভেবেছিল। তারা এ কাজ ভালভাবেই সম্পন্ন করেছিল, কিন্তু আল্লাহর রহমতে তাদের পরিকল্পনা সফল হয়নি। এ পরিস্থিতিতে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে অন্যান্য কোম্পানীর সাথে যোগ দেয়া শ্রেয় মনে করি। আমি ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম কমাণ্ড লেঃ কর্নেল খিজির হায়াতকে বুঝতে থাকি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে অন্যান্য কোম্পানীর সাথে মিলিত হবার জন্য। তিনি খুব ভালো লোক ছিলেন এবং আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন। তিনি আমার কথায় কনভিন্সড হন এবং নির্দেশ নেবার জন্য ব্রিগেড কমাণ্ডারের কাছে যান। ব্রিগেড কমাণ্ডার তাঁকে তাঁর বাহিনী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার নির্দেশ দেন। লেঃ কর্নেল খিজির হায়াত ফোনে আমাকে ২৩শে মার্চ ১টার মধ্যে বাকী কোম্পানী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। আমি দ্রুততার সঙ্গে ৩০টি ট্রেনের গাড়িতে বেশী পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং অতিরিক্ত লোক নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হই। আমি ১টা প্লাটুন জাঙ্গালিয়াতে রেখে যাই এবং আরেকটা প্লাটুনকে ভিতরে রেখে যাই ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত বাঙ্গালী অফিসারদের পরিবার- পরিজনদের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য। আমরা আমাদের পরিবার- পরিজনকে নিরাপদ জায়গায় সরাতে পারিনি, কেননা এটা করলে আমাদের উপর তাদের সন্দেহ হত এবং আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেত। যাবার আগে ক্যাপ্টেন উদ্দিনের (বর্তমান মেজর) সাথে কথা বলি এবং তাঁকে অনুরোধ করি আমাদের পরিবারগুলির প্রতি খেয়াল রাখার জন্য এবং পারলে নিরাপদ জায়গায় যেন সরিয়ে দেন। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে সে সময় চট্রগ্রামে নবম বেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলী করা হয়েছিল। আমরা তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে রেখে যাই। ২৭শে মার্চ শত্রুরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আমাদের পরিবারদের গ্রেফতার করে এবং তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। ১০ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে ফেলল শত্রুরা তাদের ছেড়ে দেয়। ২৮শে মার্চ ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের সাথে এসে যোগ দেন।

৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসার জন্য আমি লেঃ কর্নেল খিজির হায়াতকে নির্দেশ দেবার অনুরোধ করি। তিনি আমার কথামত সবাইকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসার নির্দেশ দেন। একমাত্র সমশেরনগরে অবস্থিত মেজর খালেদ মোশাররফের বাহিনী ছাড়া সবাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসে।

২৪শে মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম- সি- এ জনাব লুৎফুল হাই আমার সঙ্গে দেখা করে জানতে চান আমরা কি করব। আমি তাঁকে বলি ‘ঠিক সময়ে আমরা আমাদের কর্তব্য সাধন করব।’ তিনি চলে যাবার পর আমাদের ব্যাটালিয়নের পাঞ্জাবী অফিসাররা এসে জিজ্ঞেস করে লুৎফুল হাই কেন এসেছিল। আমি তাদের বলি, সে আমার আত্মীয় এবং আমার সাথে এমনি দেখা করতে এসেছে। মিথ্যা বলে তাদের সন্দেহ দূর করি। আমি মেজর শাফায়াত জামিলকে সমস্ত পরিকল্পনার কথা বলি। সেভাবেই তিনি সমস্ত বাঙ্গালী অফিসার, জে-সি- ও এবং এন- সি- ওদের নিয়ে একটা সভা ডেকে বলেন, পরিস্থিতি খুব খারাপ- সেহেতু সবাইকে সজাগ এবং প্রস্তুত থাকতে হবে। ২৫শে মার্চ রাতে আমি মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে অয়ারলেসে কথা বলি এবং সমস্ত পরিস্থিতি

* ১৯৭১ সালে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের হিসাবে ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

সম্মুখে জানাই। তিনি বলেন, আমরা সমশেরনগর থেকে আজ রাতেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পথে অগ্রসর হব এবং তোমরা যদি পার পাঞ্জাবী অফিসারদের প্রেফতার কর।

রাত ২টার সময় লেঃ কর্নেল খিজির খান, মেজর সাদেক নেওয়াজ, লেঃ আমজাদ সাইদ এবং অন্যান্য অবাকালী সৈনিকদের প্রেফতার করার পরিকল্পনা নিই। সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, কেননা মেজর সাদেক নেওয়াজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিএন্ডবি রেষ্ট হাউসে আমার রুমে আমার পাশে ভর্তি করা একটা চাইনিজ স্টেনগান নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল।

২৬শে মার্চ সকাল সাড়ে ৯টার সময় সভাকক্ষে সমস্ত অফিসারদের ১টা সভা ডাকা হয়। কিন্তু এর আগে ভোর সাড়ে চারটার সময় আমি অয়ারলেস সেটটি ধ্বংস করে দিই, কেননা এ অয়ারলেসের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে কুমিল্লা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের কথাবার্তা হত। সমস্ত টেলিফোন যোগাযোগও নষ্ট করে দেয়া হয়। আমাকে এটা করতে হয়েছিল, কেননা অয়ারলেস অপারেটরদের ৩ জনের মধ্যে ২ জনই পাঞ্জাবী ছিল। অয়ারলেসের মাধ্যমে শেষ যোগাযোগ করি মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে। তাঁকে অনুরোধ করি অতি সত্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য।

আমরা সবাই তাঁরুতে এসে জড়ো হই। সাড়ে ৯টার সময় মেজর শাফায়াত, লেঃ কবীর, লেঃ হারুন, আমিও জে- সি- ও'রা তাঁরু ঘিরে ফেলি। আমরা বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করি এবং মেজর শাফায়াত জামিল তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন, “আমরা আর পাকিস্তানী সৈন্য নই, আমরা এখন বাংলাদেশ সরকারের সৈনিক। আপনারা আমাদের বন্দী। পালাবার চেষ্টা করবেন না, করলে মারা যাবেন।” মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ঘটে যায়। ৭২ জন পাকসেনাকে হত্যা ও ৩ জন পাক অফিসারকে প্রেফতার করে ২৬শে মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করি।

মেজর খালেদ মোশাররফ এবং লেঃ মাহবুব রাত সাড়ে ১১টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌঁছেন। মেজর খালেদ মোশাররফের হাতে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দেয়া হয়। এরপর মেজর খালেদ আমাদের সবাইকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারপাশে অবস্থান নিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ার নির্দেশ দেন, কেননা, শত্রুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আক্রমণ করে আমাদের ধ্বংস করে দতে পারে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের হেডকোয়ার্টার করা হয়।

আমাকে ১৮ জন সৈন্য নিয়ে গোকনঘাটে পাঠান হয়। ঢাকা থেকে ভীতসন্ত্রস্ত জনতা পালিয়ে আসতে থাকে। আমি ২ দিনের মধ্যে ২৫০ জন পলায়নপর পুলিশ, ইপি- আর নিয়ে একটা কোম্পানী তৈরী করে ফেলি। তৃতীয় দিনে পাকবিমান বাহিনী ৪টা স্যাবর জেটের সাহায্যে আমার এলাকায় স্ট্রাফি করতে থাকে। এতে আমার বাহিনীর ১ জন আহত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্থলপথে কোন আক্রমণ তখনও শুরু হয়নি।

এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আমার কোম্পানীকে ৩০৩ রাইফেলের দ্বারা সজ্জিত করে ফেলি। ৫ই এপ্রিলের মেজর খালেদ মোশাররফ আমাকে আমার বাহিনী ক্যাপ্টেন মাহবুবের (পরে শহীদ হন) হাতে দিতে বলেন। তিনি ফ্রন্টিয়ার ফোর্স থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগ দেন। তার হাতে দায়িত্ব দিয়ে আমি ৫ই এপ্রিলে সকাল ৯টার সময় অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার তেলিপাড়া চা বাগানে মেজর মোশাররফের কাছে যাই।

মেজর খালেদ মোশাররফ আমাকে বলেন, ৩১তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট সিলেট থেকে নদীপথে ভৈরব হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। সেজন্য ৪র্থ বেঙ্গলের ১টা কোম্পানী নিয়ে আজবপুর ঘাট পজিশন নিয়ে শত্রুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা ঢাকা যাবার পথে বাধা দিতে হবে। সেইমত আমি তাড়াতাড়ি আজবপুর ঘাটে যাই এবং সন্ধ্যার মধ্যেই পজিশন নিয়ে নিই। এখানে এসে আমি ২য় বেঙ্গল-এর ক্যাপ্টেন নাসিমের (বর্তমান লেঃ কর্নেল) সাথে যোগাযোগ করি, যিনি আশুগঞ্জ এলাকায় অবস্থান নিয়েছিলেন। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর কাজী মোঃ শফিউল্লাহ'র নেতৃত্বে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে। ময়মনসিংহ হয়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে তিনি আমাদের সাথে যোগ দেন। আমরা সে সময় বিরাট এলাকা কোম্পানীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে সিলেটের খোয়াই নদী পর্যন্ত শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন রেখেছিলাম।

৭ই এপ্রিলে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। আমি ভেবেছিলাম, শত্রুরা বড় নৌকা ও লঞ্চের সাহায্যে পালাবার চেষ্টা করবে। সেহেতু আমি সমস্ত নৌকা তল্লাশি করার নির্দেশ দিই। অতি প্রত্যুষ্য ১টা মটার লঞ্চ আশুগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। আমি তাদের থামতে বলি। লঞ্চটি না থেমে বরঞ্চ আরও দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ওর ভিতর পাঞ্জাবী সেন্য আছে ধরে নিয়ে আমরা এম-এম জিও ৭৫ এম-এম-আর-আর-এর সাহায্যে গুলি ছুড়তে থাকি। লঞ্চটি থেমে যায় এবং আশ্চর্যের বোমার লঞ্চটি বেসামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা ভর্তি দেখলাম। একজন এতে আহত হয় ও তার প্রাথমিক চিকিৎসা করে সারেংকে সাবধান করে ছেড়ে দিই। এই সময় পাক বিমান আমাদের উপর অকস্মাৎ হামলা শুরু করে দেয়।

৩/৪ দিন পর ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমান মেজর) ১টি কোম্পানী নিয়ে এসে আমাদের অব্যাহতি দেন। আমি আমার বাহিনী নিয়ে তেলিয়াপাড়া যাই পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হয়। দুইদিন বিবিরবাজারে অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানীকে নিয়ে মনতলি যাবার নির্দেশ দেন মেজর খালেদ মোশাররফ।

১৪ই এপ্রিল প্রথম সাফল্যজনক আক্রমণ চালাই শত্রুর বিরুদ্ধে। ঐদিন রাতে গঙ্গাসাগরে ৪টা প্লাটুনও ১টা ৩ ইঞ্চি মর্টার সেকশনের সাহায্যে শত্রু অবস্থানকে ঘিরে আক্রমণ চালাই। মেজর খালেদ মোশাররফ মর্টার সেকশনে নেতৃত্ব দেন। তাঁর অবস্থিতি আমার সৈন্যদের মনোবল বাড়িয়ে তোলে। রাত ২টার সময় শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৩১ জন শত্রু সৈন্য ও ১৫/২০ জনকে আহত করি। আমরা সবাই নিরাপদে ফি আসি। ২ জন সামান্য আহত হয়।

চারদিন সেখানে অবস্থানের পর আমাকে কসবা-শালদানদী এলাকায় যেতে বলা হয়। ১৮ই এপ্রিল আমি কসবার পথে রওনা হই এবং সেখানে ঘাঁটি গড়ে তুলি। গঙ্গাসাগরে শত্রুদের মার দেবার পর কসবা-শালদানদীর গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। আমার পৌঁছতে একটু দেরী হয়। এর আগেই শত্রুরা কসবা বাজার ও কসবা রেলওয়ে স্টেশনে ঘাঁটি গড়ে ফেলেছে। আমি আমার ক্যাম্প ইয়াকুবপুর জাতুমুরা এলাকায় স্থাপন করি। আমি রেকি করে বুঝতে পারি আমার অবস্থান খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। ভারতে আশ্রয় না নিয়ে নিজ অবস্থানে থেকে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকি। পাকসেনারা কসবা এসে নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ চালাতে থাকে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক পাকসেনাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যাচ্ছিল।

১৮ই এপ্রিলের রাতেই আমি কসবা বাজার ও কসবা রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ করার পকিল্পনা করি। ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে হঠাৎ করে শত্রুদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিই। শত্রুরা যেহেতু প্রস্তুত ছিল না, সেহেতু তারা এ আক্রমণে হকচকিত হয়ে পড়ে। এ অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ দেড় ঘন্টা ধরে চলে এবং এর সাফল্য অপ্রত্যাশিত ছিল। শত্রুরা তখন পর্যন্ত কোন বাস্কার তৈরি করেনি। ফলে তারা গাড়ি বোঝাই অস্ত্র ফেলে রেখে বাজারের কুঁড়েঘর এবং দোকানে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

রাত সাড়ে চারটাকে আবার আক্রমণ করার সময় হিসাবে বেছে নিই। আমি একটা লম্বা গাছের উপরে উঠে শত্রুদের অবস্থান দেকে নিই এবং আমার সৈন্যদের প্লাটুনে ভাগ করে তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলি। একটি মাত্র পথ শত্রুদের জন্য খোলা থাকে। ৩.৫ ইঞ্চি রকেট লাঞ্চার এবং ছোট অস্ত্র ও মর্টারের সাহায্যে শত্রুদের উপর গোলাগুলি ছুড়তে থাকি। এই গোলাবর্ষণের ফলে শত্রুদের ৭টা গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। ৪৫/৫০ জন নিহত এবং ৭০/৮০ জন পাকসেনা আহত হয়। শত্রুরা এ আকস্মিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে কসবা ছেড়ে আড়াইবাড়ি কুটির

দিকে পালিয়ে যায় এবং সেখানে গিয়ে অবস্থান নেয়। যাবার সময় তারা বিধ্বস্ত গাড়ি ও অনেক মৃতদেহ ফেলে রেখে যায়।

এ যুদ্ধ জয়ের ফলে আমার সৈন্যদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। কসবা নতুন বাজার দখল করার পর আমার হেডকোয়ার্টার কসবাতেই স্থাপন করি। অবশ্য আমি জানতাম, শত্রুরা কসবা দখল করার জন্য আবার বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে।

জুন মাসে মেজর খালেদের নির্দেশে মুন্সিরহাট, ফেনী, নোয়াখালী এলাকায় যাই। যাবার পূর্ব পর্যন্ত তারা কসবা দখল করতে সক্ষম হয়নি। এই ব্যাপক বিপর্যয়ের পর শত্রুসেনারা স্থানীয় দালালদের সহযোগীতা ছাড়া বাংকার থেকে বের হতো না।

কুমিল্লার সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আইনউদ্দিন*

২৬-১০-১৯৭৩

একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাত ১২ টার দিকে কুমিল্লা পুলিশ ক্যাম্প পাঞ্জাবীরা আক্রমণ করে এবং গণহত্যা করে। ২৫শে মার্চ রাতে তারা এসপিও ডিসিকে গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসে। সে সময় আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম। ২৬শে মার্চ সকালে আমি যখন আমার বাসা বারান্দায় বসে ছিলাম, তখন গাড়িতে করে কিছু সাদা পোশাক পরা লোককে ধরে আনতে দেখি। ঐ দিন আমাকে মেজর জামিল (অবাস্তাবী) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমাকে রাতে অয়ারলেসে ডিউটি করতে হবে। আমি রাত ১১টার দিকে যখন ডিউটিতে ছিলাম ঐ সময় সিলেট থেকে পাঞ্জাবী বেলুচ রেজিমেন্ট-এর সি-ও অয়ারলেসে কথা বলেন। সে সময় আমি বুদ্ধি করে নিজের নাম ও পদ গোপন করে একজন পাঞ্জাবীর নাম করে অয়ারলেসে কথা বলি। বেলুচ রেজিমেন্টের সি-ও-র কথায় বুঝতে পারলাম যে শ্রীমঙ্গলে যে সমস্ত বাঙালী সৈন্য ছিল (খালেদ মোশাররফ সাহেব তখন শ্রীমঙ্গলে ছিলেন) তাদের আক্রমণ করবে, তার জন্য বেলুচরা রেকি করেছে। এ সংবাদ পেয়ে আমি কিভাবে এ সংবাদ শ্রীমঙ্গলে পাঠাবো তার চেষ্টা করি, কিন্তু ইতিপূর্বে বাঙ্গালীরা টেলিফোনের লাইন কেটে দেয়ায় ঐ জরুরী সংবাদটি শ্রীমঙ্গল পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। খালেদ মোশাররফ সাহেব খবর না পেলেও শ্রীমঙ্গল থেকে তার দলসহ সরে পড়েছিলেন।

২৭ তারিখে আমি সাধারণ পোশাক পরে আমার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে যাই যে, যদি আমি রাত ১২টার ভিতর ব্রাহ্মবাড়িয়া থেকে ফিরে না আসি তবে যেন তারা হাতিয়ার নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে একটি জায়গায় অপেক্ষা করে। নির্দিষ্ট জায়গাটি আমি ঠিক করে দিয়েছিলাম।

আমি সাধারণ পোশাক পরে একখানা সাইকেলে চড়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে রওনা হই। দুপুর একটার দিকে পথিমধ্যে পাঞ্জাবী সৈন্যরা ট্রেঞ্চ কাটছিল। কিন্তু তারা আমাকে চিনতে পারেনি। তবে পথিমধ্যে কুমিল্লা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তায় কংশনগর বাজারে কিছু বাঙ্গালী আমাকে আটক করে। তারপর আমি আমার পরিচয়পত্র দেখিয়ে তাদের বুঝাই যে, আমি বাঙ্গালী একজন ক্যাপ্টেন, বিশেষ কাজে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাচ্ছি। অনেক তথ্য-প্রমাণ দেয়ার পর তারা আমাকে মোটরসাইকেলে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছিয়ে দেয়। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রাত দেড়টার সময় পৌঁছাই। আমি গিয়ে দেখি সকল পাঞ্জাবী সৈন্যকে বাঙালীরা গ্রেফতার করে ফেলেছে এবং ছোটখাটো সৈন্যদের বাঙালী সৈন্যরা মেরে ফেলেছে।

* ১৯৭১ সালের মার্চ ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

আমি যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছাই তখন করোলা ব্রীজের কাছে দিয়ে জীপ যেতে দেখি। ঐ জীপটিকে আমি থামালাম। ঐ জীপে কয়েকজন বাঙালী সৈন্য এবং একজন ক্যাপ্টেন মাহমুদুল হাসান (পাঞ্জাবী) ছিল। আমি দূর থেকে বাঙালী সৈন্যদের ক্যাপ্টেন মাহমুদুল হাসানকে গ্রেফতার করতে বলি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালী সৈন্যরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ক্যাপ্টেন কৌশলে গাড়ি ব্যাক করে পালিয়ে যায়। কিন্তু ২৮ তারিখে ঐ ক্যাপ্টেন যখন বিকালে পুনরায় কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছিল তখন করোলা ব্রীজের নিকট ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। ঐ গাড়িতে তিনজন বাঙালী সৈন্য মারা যায় ও দুজন আহত হয়। ঐ ক্যাপ্টেন মুসলমান ছিল, তাই বাঙালীরা দায়পরবশ হয়ে তার মৃতদেহ মুসলমান কায়দায় রাত আড়াইটায় কবর দেয়। এ ধরনের কবর দেয়া প্রথম ও শেষ। তারপরে আর কোথাও মৃতদেহকে মুসলিম কায়দায় কবর দেয়া হয়নি। (শত্রুদের আনুষ্ঠানিকভাবে কবর দেয়া নাকি জেনেভা কনভেনশনে আছে)।

২৮ তারিখে আমি ৪ জন অফিসারসহ অন্যান্য সৈন্য নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডিফেন্স নিই। ২৭ তারিখে রওনা হয়ে খালেদ মোশাররফ সাহেব শ্রীমঙ্গল থেকে পুরা কোম্পানী নিয়ে ২৮ তারিখ সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছান এবং আমাকে বলে যান, যদি কোন এম-এন-এ বা কোন বুদ্ধিজীবী আসেন তাহলে তাদের আমার (খালেদ মোশাররফ) সাথে যোগাযোগ করার জন্য যেন সিলেট তেলিয়াপাড়া টি-এস্টেটে পাঠিয়ে চলে যান। খালেদ মোশাররফ সাহেব ২৮ তারিখেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট তেলিয়াপাড়া টি এস্টেটে চলে যান। তেলিয়াপাড়ায় খালেদ মোশাররফ সাহেব ক্যাম্প খোলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে এবং স্থানীয় প্রশাসন ঠিকভাবে চলে। ঐ সময় এস-ডি-ও ছিলেন রকিবউদ্দিন আহমেদ। তিনি তখন স্থানীয় প্রশাসক হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে রক্ষা করার জন্য গোকনঘাটে ক্যাপ্টেন আবদুল গাফফার, ক্যাপ্টেন শহীদ ও মাহবুবুর রহমানকে ঐ ঘাট দেখাশোনার জন্য মোতয়েন করা হয়েছিল; কারণ ঐ নদীপথে পাক সৈন্যরা জাহাজে করে সৈন্য আনতে পারত। গোকনঘাট চিল একটি লঞ্চঘাট। সৈন্যরা করোলা নদীর আশেপাশে ডিফেন্স নিয়ে ছিল। তাদের তত্ত্বাবধান করেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হারুনুর রশীদ।

২৯ তারিখে বিকাল ৪টার দিকে পাকবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিমান থেকে দেড়-দুঘন্টা ধরে বোমাবর্ষণ করে। এর ফলে একজন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য শহীদ হয়। কিন্তু বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে তেমন কোন অস্ত্র না থাকায় শুধু ট্রেঞ্চের ভিতর বসে থাকতে হয়।

৩১ তারিখে আখাউড়া থেকে তৎকালীন ইপি-আর (বর্তমানে বিডিআর) নায়ক সুবেদার গোলাম আহিয়া আমার সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি আখাউড়াতে ডিফেন্স নিয়েছিলেন। আখাউড়াতে ইপি আর- এর সৈন্যরা পাঞ্জাবীদের ঘেরাও করে রাখে। তারপর ৩১ তারিখে সারাদিন গোলাগুলি হওয়ার পর কিছু পাঞ্জাবী সৈন্য মারা যায় ও কিছু ধরা পড়ে। কিন্তু ৭ জন পাঞ্জাবী পালিয়ে যায়। তারপর ঐ ৭ জন পাঞ্জাবী সৈন্যকে গ্রামের ভিতর বাঙালীরা ধরে মেরে ফেলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যে সমস্ত পাঞ্জাবী অফিসার ধরা পড়ে তারা হলোঃ ১) লেঃ কর্নেল খিজির হায়াৎ খান, ২) মেজর সাদেক নেওয়াজ, ৩) লেফটেন্যান্ট আমজাদ সাইদ। তাদেরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নবীনগর, শাহবাজপুর, সরাইল হয়ে তেলিয়াপাড়া নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদেরকে ভারতীয় সৈন্যদের কাছে দিয়ে দেয়া হয়। তাদেরকে বাঙালীরা হত্যা করতে পারত কিন্তু ঐ পাঞ্জাবী অফিসাররা কোনদিন বাঙালীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি বা বেঈমানি করেনি।

১লা এপ্রিল ৭১ আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আখাউড়া যাই। ইপি- সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারা বলেন যে তারা আমার সাথে (মানে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে) একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করবে। তারা আমার কাছে কিছু অস্ত্র চাইলে আমি অস্ত্র সরবরাহ করতে রাজী হই। তারপর ইপি-আর-এর সৈন্যরা আখাউড়া, গঙ্গাসাগর ও উজনীসাহা ব্রীজের আশেপাশে ডিফেন্স নেয়। আমি আগরতলায় বিএসএফ-এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করি এবং তাদের কাছে কিছু অস্ত্র চাই। এবং তারা তা দিতে চান। লেঃ কর্নেল দাসের সাথে রাতে ফোনে যোগাযোগ করি।

১/২ তারিখে আমি আখাউড়ার আওয়ামী লীগের সহসভাপতিকে সংগে করে আগরতলায় বিএসএফ-এর লেঃ কর্নেল দাসের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। মিঃ দাস ১০ হাজার গুলি ও একশত ৩০৩ রাইফেল ও কিছু এক্সপ্রেসিভ দিতে অঙ্গীকার করেন এবং পরে তিনি তা দেন। এ অস্ত্র দেয়ার ব্যাপারে যে কন্ট্রাক্ট হয় সে কন্ট্রাক্ট করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম-এন-এ আলী আজম সাহেব। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম-এন-এ আলী আজম ও লুৎফুল হাই সাদু সাহেব বেঙ্গল রেজিমেন্টদের খাওয়া-দাওয়া, গাড়ি ইত্যাদি দিয়ে প্রচুর সাহায্য করেছেন যুদ্ধ চলা অবস্থায়। সৈন্য জনাব আলী আজম ৩০ তারিখের পূর্বেই আগরতলা গিয়ে অস্ত্রের ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মেজর হাবিবুল্লাহ বাহার (যিনি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে এসেছিলেন- ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার-কমান্ডিং অফিসার (তিনি কুমিল্লা থেকে পালিয়ে আসেন) এবং ক্যাপ্টেন সাইগলকে (যে পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে) তেলিয়াপাড়া ক্যাম্পে অন্য কাজে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমি যখন কুমিল্লা থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওনা দিই তখন যে প্রায় একশত সৈন্য রেখে আসি তারা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বেপরোয়া হয়ে পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এর ফলে প্রায় ৩-৪ শত পাঞ্জাবী সৈন্য মারা যায়। কিছু বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য শহীদ হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমি ১৫/২০ জন এম-পি-এ কে ভারতে পাঠিয়ে দিই। এপ্রিল মাসে আমি জানতে পারি যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ভৈরব এসেছেন। সৈয়দ সাহেবকে অবহিত করাই যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে আছে। আমি সৈয়দ সাহেবকে আনার জন্য স্পিডবোট পাঠাতে চাইলে তিনি আসতে রাজী হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আসেননি। এ সময়ের মধ্যে আমি বিভিন্ন জেলায় অয়ারলেসের মাধ্যমে খবর নিতে লাগলাম যে কোথায় বাঙালীরা রিভোল্ট করল। আমি জানতে পারলাম ময়মনসিংহে মেজর সফিউল্লাহ আছেন ও নরসিংদিতে একটি কোম্পানী আছে মেজর মতিউর রহমানের নেতৃত্বে। মেজর সফিউল্লাহ একটি পরিকল্পনা করেন যে, মেজর মতিউর রহমানের বাহিনীও তাঁর কোম্পানী মিলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করবে ও দখল করবে। এ সংবাদ আমি মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেবকে জানাই। তিনি এ খবর পেয়ে তেলিয়াপাড়া থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে চলে আসেন। এখানে একত্র হয়ে তারা সবাই মেলে যুক্তি করে ভালভাবে কাজ করতে পারবে। পরে সফিউল্লাহ সাহেব পুরো ব্যাটালিয়ন নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে চলে আসেন এবং মেজর মতিউর রহমান সাহেব ভৈরব ব্রীজের কাছে ডিফেন্স নিয়ে থাকেন।

এদিকে মেজর নাসিম এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে আশুগঞ্জ ডিফেন্স দিয়ে থাকেন ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ছিলাম আমি, ভৈরবে ছিলেন মেজর মতিউর রহমান এবং আশুগঞ্জে ছিলেন মেজর নাসিম। বাকি সবাই তেলিয়াপাড়া চলে যান।

মেজর সফিউল্লাহ ও মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একত্রিত হলেন তখন তারা সিদ্ধান্তে আসতে চাইলেন যে, তারা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করবেন কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলেন কুমিল্লা

ক্যান্টনমেন্টে বিপুলসংখ্যক পাকসৈন্য রয়েছে। এই পাকসৈন্যের সাথে যুদ্ধ করে পারা যাবে না, এর ফলে অনেক সৈন্য মারা যাবে। শেষ পর্যন্ত মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন পাকসেনাদের গেরিলা পদ্ধতিতে ঘায়েল করতে হবে।

১৪ তারিখে পাকসেনা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বিমান থেকে গুলি করে; ফলে কিছু পাবলিকসহ কিছু বাঙালী সৈন্য মারা যায়। এ সংবাদ খালেদ মোশাররফ সাহেব পেয়ে জানানলেন যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে যেন বেঙ্গল রেজিমেন্ট আখাউড়া চলে আসে। এই তারিখে পাকসৈন্য প্যারাট্রুপার ফেলে আশুগঞ্জের পিছনের দিক থেকে আক্রমণ করে। এর ফলে মেজর নাসিম সাহেবের কিছু সৈন্য শহীদ হয়। ১৪ তারিখ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত আশুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বিমান আক্রমণ চলে। এর পরে আশুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে কোন রকম টেলি-যোগাযোগ বা কোনরকম যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

১৪ই এপ্রিল আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্যাংক থেকে (ইস্টার্ন মার্কেটাইল ব্যাংক) ম্যানেজারকে বাড়ি থেকে ডাকিয়ে ব্যাংক খুলে ২ কোটি টাকা নিয়ে যাই। এই টাকা ঐদিন তেলিয়াপাড়ায় মেজর সফিউল্লাহ সাহেবের কাছে জমা দিই। ১৪ তারিখে সারাদিন বিমান আক্রমণ হচ্ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও আমি বীরত্বের সাথে এ কাজ সমাধান করি। আমি বিকালেই তেলিয়াপাড়া থেকে ফিরে এসে দেখি আমার বাহিনী কিছু কিছু আখাউড়া চলে এসেছে। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে দু'খানা মূল্যবান অয়ারলেস সেট নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সড়ক পথে তেলিয়াপাড়া হয়ে আখাউড়া চলে আসি।

১৫ই এপ্রিল মেজর খালেদ মোশাররফ আমাকে বলেন, আমাকে আখাউড়ায় সৈন্যদের দেখাশোনা করতে হবে। আখাউড়াতে ৩০/৪০ জন সৈন্য ছিল। আমি ১৫ তারিখে আমার বাহিনীকে বিকালে গঙ্গাসাগরের দিকে মুখ করে ডিফেন্স নেবার কলাকৌশল দেখিয়ে দিই। ১৫ তারিখ রাতে কুমিল্লা থেকে রেলের পাকসৈন্য গঙ্গাসাগর আসে এবং গঙ্গাসাগরের ব্রীজের দক্ষিণ পারে বাজারের দিকে তারা ডিফেন্স নেয় এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্রীজের উত্তর দিকে অর্থাৎ আখাউড়ার দিকে ডিফেন্স নেয়। ১৬ ই এপ্রিল সকালে যেখানে ব্রীজের নিকট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ডিফেন্স নিয়েছিল, সেখানে ঐ সৈন্যদের সাথে দেখা করার জন্য আমি ক্রলিং করে যাচ্ছিলাম। পাকসৈন্যরা আমাকে দেখে আমার দিকে অবিরাম গুলীবর্ষণ করতে থাকে, কিন্তু আমি ঐ ঝুঁকি নিয়ে ট্রেঞ্চ গিয়ে সৈন্যদের বলে আসি পাক বাহিনীকে হত্যা করে যখন তাদের সংখ্যা কমে আসবে এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ট্রেঞ্চের কাছে চলে আসবে ঠিক তার অল্প কিছুক্ষণ আগে যেন তারা বিওপিতে চলে আসে।

১৩ এপ্রিল গঙ্গাসাগরের এক পারে বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং অপর পারে পাকবাহিনী অবস্থান করছিল। ঐ দিন বিকালে ৪টা থেকে পাকবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনী আধ ঘন্টা বোমাবর্ষণ করে থেমে যায়।

বিকাল ৬টা থেকে পাকবাহিনী আবার গোলা ছুড়তে থাকে এবং আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে এবং বহু পাকসেনাকে খতম করে শেষে পাকসেনাদের সামনে টিকতে না পেরে সব বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈন্য পিছনের দিকে চলে আসে। বাকি ছিল মাত্র সিপাই মোস্তফা কামাল; সে আর ফিরে আসে নাই। তার হাতে ছিল একখানা এল-এম-জি ও ৮ হাজার গুলী। তার সাথে যে ২ জন সেনা ছিল তারাও চলে গেল। কামাল ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে যুদ্ধ করতে থাকে। তার গোলায় পাক বাহিনীর তিনজন অফিসার মরে ও ২ জন আহত হয়। সবসুদ্ধ প্রায় সাড়ে তিনশ' সৈন্য খতম হয়। কামালের গুলি যখন ফুরিয়ে যায় তখন শত্রুসেনারা মাত্র ৫০ গজ দূরে ছিল, তবু সে পিছনে ফিরে আসে না। দূর থেকে পাকসেনা চীৎকার করে কামালকে আত্মসমর্পণ করতে বলে, কিন্তু কামাল তা করে নাই। পরে যখন পাকসেনারা ক্রলিং করে কামালের ট্রেঞ্চের কাছে আসে, কামাল তার শেষ সম্বল দু'খানা গ্রেনেড দিয়ে কিছু পাকসেনাকে আহত করে। শেষ পর্যন্ত কামাল পাকসেনাদের কাছে ধরা পড়ে। পাকসেনারা তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। প্রায় সাড়ে তিনশ'

পাকসেনা মরা যায়। এ সংবাদ যখন পাকসেনারা অয়ারলেসে তাদের হেড অফিসে প্রেরণ করছিল তখন বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের অয়ারলেসের মাধ্যমে সঠিকভাবে জানতে পারল যে, বেঙ্গল পাকবাহিনীর সাড়ে তিনশ' সৈন্যকে হত্যা করেছে। এত সৈন্য মরার পর পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায় যার পরবর্তী ২/৩ মাস তারা আর আক্রমণ করে নাই।

এপর আমার বাহিনী আখাউড়া বি-ও-পিতে ডিফেন্স নেয়। পরে আমার অধীনে দু'জন লেফটেন্যান্ট নিয়োগ করা হয়। একজন ক্যাডেট অফিসার হুমায়ুন কবীর। তার এলাকা ছিল কসবা। তিনি কসবাতে সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন। অপরজন লেন লেফটেন্যান্ট হারুনার রশীদ। তিনি নসিঙ্গরে সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন। হারুন ও কবীরের কাছে এক কোম্পানী ও আমার কাছে দুই কোম্পানী সৈন্য ছিল। কোন সময় কসবা রেলস্টেশন ও কসবা নতুন বাজার পাকবাহিনী দখল করতে পারেনি। এবং নসিঙ্গরের কালাছড়া টি এস্টেট প্রায় সব সময় মুক্তিবাহিনীর অধীনে ছিল। আমি প্রত্যেক দিন একবার করে তিনটি ক্যাম্প পরিদর্শন করতাম।

১৭ই এপ্রিল রাত ১১/৩০ মিনিটে মেজর শাফায়াত পামিল ও আমিসহ পাঁচজন অফিসার ও ৬০ জন সৈন্য নিয়ে আখাউড়া পাকবাহিনীর সেনাদের দখলে ছিল। ব্রীজ উড়িয়েছিল ৬৫ জন বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈন্য। তারা অক্ষত অবস্থায় আখাউড়া বি-ও-পি' তে ফিরে আসে।

কর্নেল বাজার অপারেশনঃ জুন-১৯৭১: আখাউড়া পতন হওয়ার পর বাংলাদেশ বাহিনী কর্নেল বাজারে জড়ো হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল পাক সৈন্যদের হত্যা করে সংখ্যা কমানো। তাই তারা ওখানে রয়ে গেল। পাকবাহিনীর সৈন্য ছিল এক কোম্পানী আর বাংলাদেশ বাহিনীর ৩টি কোম্পানী ছিল। তার ভিতর একটি ছিল অনিয়মিত বাহিনী।

আগরতলা থেকে যে রাস্তা গঙ্গাসাগরের দিকে গিয়েছে ঐ রাস্তার উত্তর মুখ হয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর সেনারা ডিফেন্স নেয়। ঐ রাস্তার উত্তর দিকে একটি খাল ছিল। পাকবাহিনী আখাউড়া থেকে কর্নেল বাজারের দিকে অগ্রসর হয় উত্তর দিক থেকে। তারা খাল পার হয়। রাতের বলায় এসে পূর্বদিকে অর্থাৎ বাংলাদেশ বাহিনীর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে। এর ফলে বাংলাদেশ বাহিনীর সেনারা ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ে তারা ছিল অনিয়মিত বাহিনী। যা কিছু সৈন্য ছিল তাদের মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। ফলে বেয়নেটের আঘাতে বাংলাদেশ বাহিনীর ৭ জন সৈন্য শহীদ হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বাহিনীর অনিয়মিত সৈন্যদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারা যার যার মত নানা দিকে চলে যায়।

সশস্ত্র প্রতিরোধে কুমিল্লা

সাক্ষাৎকারঃ মেজর ইমামুজ্জামান*

১০-১-১৯৭৪

মেজর খালেদ মোশাররফ বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানী সৈন্য আমার নেতৃত্বে দিয়ে কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়কে (লাকসামের কাছাকাছি) এপ্রিল মাসের ১১ তারিখ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ৬৫টা কনভয় আমরা এ্যামবুশ করি। এতে ৫টা গাড়ি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়, বাকি গাড়িগুলো কুমিল্লাতে ফিরে যায়।

এপ্রিল মাসের ১৯ তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় (বাগমারায়)। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র তখনও প্রচুর ছিল না। ভারতও তখনো আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছিল না। দু'দিন

* ১৯৭১ সালের মার্চে কুমিল্লা সেনানিবাসে লেফটেন্যান্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

পর্যন্ত আমরা তীব্র প্রতিরোধ করলাম। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হলাম। ওদের প্রায় ২৭০ জন মারা গিয়েছিল- মৃত দেহগুলি গাড়ীতে (৭/৮ ট্রাক) উঠবার সময় আমরা দেখতে পেলাম।

এপ্রিলের ২১ তারিখে আমরা লাকসাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম। চাঁদপুরে তখন পাকিস্তান বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ শুরু করে। লাকসাম থেকে আমরা মিয়ার বাজারে চলে গেলাম। এপ্রিলের ২৭ তারিখ পাকিস্তান সেনাবাহিনী মিয়ার বাজারে আক্রমণ করে। ঐ যুদ্ধে ওদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছিল। ধানক্ষেতে পানির মধ্যে অনেক সৈন্যের লাশ পাওয়া গিয়েছিল।

এপ্রিলের ২৯/৩০ তারিখে ওরা আবার আক্রমণ চালায়। ওদের দুটো আক্রমণই বীরত্বের সাথে প্রতিহত করা হয়। আমাদের পক্ষে অনেকেই হতাহত হয়।

আমি কাদের চৌধুরী নামে মুজাহিদ বাহিনীর ক্যাপ্টেনকে মিয়ার বাজারের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে চৌদ্দগ্রামে চলে আসি এবং ডাকাতিয়া নদীর পারে পরিকোট নামক জায়গায় প্রতিরক্ষাবৃহৎ তৈরি করি।

মে মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নদীর ওপারে বাংগোড়া বাজারে আসে এবং বেশ গোলাগুলি করে। কিন্তু আমাদের শক্তিশালী ঘাঁটির কথা জানতে পেরে ওরা লাকসাম চলে যায়। মে মাসের ১৪ তারিখ পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় নদীর ওপার থেকে আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই।

আমরা চৌদ্দগ্রাম চলে আসি। গোলন্দাজ বাহিনীর ভারী গোলাবর্ষণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা ভারতের রাধানগরে চলে আসি। আমাদের কোন সরবরাহ ছিল না। ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। গুলির অভাব ছিল।

চৌদ্দগ্রাম থেকে মিয়ার বাজার পর্যন্ত সড়কে পাকিস্তানীরা যাতায়াতের চেষ্টা করে। ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঐ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারেনি। প্রায় সমস্ত পুল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। বন্ধুরা দৌলতপুর থেকে ছাগলনাইয়া পর্যন্ত জুন মাসের প্রথম দিকে মেজর জিয়ার সেনাবাহিনী এবং ২নং সেক্টরের সেনাবাহিনী সম্মিলিতভাবে একটা মজবুত প্রতিরক্ষাবৃহৎ তৈরি করেছিল।

কুমিল্লা- নোয়াখালীর সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান

১৮-৯-১৯৭৩

৩০শে অথবা ৩১শে মার্চ (১৯৭১) সুবেদার সিরাজুল হককে সঙ্গে নিয়ে আমি চৌমুহনী পৌঁছি। এখানে পরিষদ সদস্যদের সাথে দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। নূরুল হক ও অন্যান্য সদস্যগণ ঢাকাসহ প্রদেশের সমস্ত জায়গায় পাক পশুশক্তির বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেন এবং বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনি। তারা সবাই আমাকে যে কোন প্রকারে যোদ্ধা সংগ্রহ করে শত্রুর উপর পাল্টা আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে বলেন। তারা সর্বপ্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দেন এবং আমাকে মাইজদীতে নিয়ে যান। সেখানে তৎকালীন এম-এন-এ এমপিএ' দের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

২রা এপ্রিল অতঃপর আমি ফেনীতে গিয়ে মেজর জিয়াউর রহমান (বর্তমান ব্রিগেডিয়ার, ডেপুটি চীফ অব স্টাফ, বাংলাদেশ আর্মি) সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন পরামর্শ করি। মেজর জিয়াউর রহমান সাহেব আমাকে কালবিলম্ব না করে নোয়াখালীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং বাঘমারায় শত্রুকে বাধা দিতে নির্দেশ করেন। তিনি

সকল প্রকার অস্ত্র সরবরাহ করারও প্রতিশ্রুতি দেন। ফেনী থেকে ফিরে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপি-আর এবং ৭৬ জন প্রকৃত নিয়মিত সৈন্য সংগ্রহ করি ও নোয়াখালীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করি।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১-সর্বপ্রথম বাঘমারা পরিদর্শনঃ দয়াময়কে স্মরণ করে সর্বপ্রথমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য লাকসামের উত্তরে বাঘমারা পরিদর্শন করি এবং সুবেদার নজরুল ও সুবেদা জব্বারকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্থান নির্দিষ্ট করে দিই। এমন সময় নোয়াখালী জেলার ডেপুটি কমিশনার সাহেব এবং পরিষদ সদস্যগণ এসে আমাকে জানান যে, দু'খানা পাকসেনা বহনকারী জাহাজ রামগতির দক্ষিণ পাশের নদীতে অবস্থান করছে। এ খবর শোনার পর আমি তৎক্ষণাৎ রুহুল আমীন (শহীদ), পিটি-অফিসার সাহেবসহ চারজন বুদ্ধিমান জোয়ানকে তার সত্যতা প্রামাণ্য করতে উক্ত নদীতে পাঠালাম। তাঁরা নদী থেকে ফিরে এসে আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে জানান যে, সেখানে একখানা নৌকা ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। অতঃপর ৫ই এপ্রিল নোয়াখালীর অদূরবর্তী দৌলতগঞ্জের সেতুটি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিই। কেননা পাক সৈন্যরা তখন লাকসামের উত্তরে বাঘমারাতে অবস্থান করছিল। কয়েকজন মোজাহিদ ও আনসারকে হালকা অস্ত্র দিয়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করি। বিকেলে অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ফেনীতে যাই।

৬ই এপ্রিল, ১৯৭১: ফেনী থানা থেকে অতিকষ্টে ১৮ টি হ্যান্ড গ্রেনেড সংগ্রহ করে কোম্পানীতে ফিরে আসি। একদিনে রাতদিনের আরাম-আয়েশ হারাম হয়ে পড়ে আমার জন্য। শুধু যোদ্ধা, অস্ত্র আর এ্যামুনিশন সংগ্রহের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ি। য সমস্ত যোদ্ধা আমার সাথে ছিল তাদের হাইড-আউটের কথাও চিন্তা করি।

৭ই এপ্রিল, ১৯৭১: সারারাত যোদ্ধা, হাতিয়ার আর এ্যামুনিশন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হাঁটাচাঁটি করে ভোর ছটায় ক্যাম্পে ফেরামাত্র খবর পেলাম ফেনীতে ইপি-আর এবং অবাস্তাবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষের। পুরা কোম্পানী নিয়ে ফেনী যাবার সিদ্ধান্ত নিলে সুবেদার সিরাজ ফেনী যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন। কেননা আমাদের হাতে কয়েকটি রাইফেল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর কথামত কোম্পানী রেখে আমি নিজে স্বচক্ষে পরিস্থিতি দেখার জন্য ফেনী রওনা হই। ফেনীর পরিস্থিতি দেখে চৌমুহনীতে ফিরে আসি এবং নোয়াখালীর সমস্ত পরিষদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে জরুরী পরামর্শে বসি।

৮ই এপ্রিল, ১৯৭১: নোয়াখালীর ডেপুটি কমিশনার জনাব মঞ্জুর সাহেব সারা দেশের পরিস্থিতি আলোচনার জন্য আমাকে ডেকে পাঠান। নোয়াখালীর প্রতিরক্ষার জন্য তাগাদা দেন। বিকেলে ক্যাপ্টেন এনামুল হক সাহেব কোম্পানী পরিদর্শন করে আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

৯ই এপ্রিল, ১৯৭১: শত্রুর তুলনায় সামান্য অস্ত্র এবং যোদ্ধা নিয়ে ফরোয়ার্ড লাইনের প্রায় সবটাই কভার করে নিই। এ-দিন নাথের পেটুয়া স্টেশনের কাছে আরও একটি ফরোয়ার্ড ডিফেন্স স্থাপন করি।

১০ই এপ্রিল, ১৯৭১- লাকসামে প্রথম সামনাসামনি যুদ্ধঃ ১০ই এপ্রিল বর্ষের পশুশক্তির বিরুদ্ধে শুরু হয় মুখোমুখি যুদ্ধ। নোয়াখালীর পরিষদ সদস্যদের দেওয়া চারশত টাকা ফরোয়ার্ড ডিফেন্স বাহিনীতে ভাগ করে দিতে যাই লাকসামে সকাল ১০টায়। বেলা ১২টার সময় খবর পেলাম পাকবাহিনী বাঘমারা থেকে লাকসামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংকল্প নিই। লাকসামের সামান্য উত্তরে পশুশক্তিকে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে সেই অনুসারে পজিশন নেওয়া হ'ল। মাত্র ৭০ জন যোদ্ধা নিয়ে এই অভিযান চালাই। সঙ্গে দুটো এল-এম-জি ছাড়া বাকী সবই ৩০৩ রাইফেল ছিল। তাই নিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে রইলাম সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত। কিছুক্ষণ পর শত্রুপক্ষ যখন আমাদের রেঞ্জের ভিতরে চলে আসে তখনই একসঙ্গে গোলাগুলি শুরু করি। আমার এ অতর্কিত আক্রমণে পাকবাহিনীর দুজন লেফটেন্যান্টসহ ২৬ জন সৈন্য নিহত হয় এবং ৬০ জন আহত হয়। পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে পাকবাহিনীর সৈন্যরাও মেশিনগান, মর্টার ও আর্টিলারীর গোলাগুলি শুরু করে বৃষ্টির মত গুলীবর্ষণ শুরু হলো। প্রায় ৪ ঘণ্টা গোলাগুলি বিনিময় হয়। শত্রুপক্ষের দুটো ট্রাকে আগুন ধরে যায়। ক্রমেই আমাদের গোলাবারুদ শেষ হতে থাকে। সরবরাহ ও সাহায্যের

কোন আশা ছিল না। অপর পক্ষে পাকবাহিনী ময়নামতি থেকে সারবরাহ ও সৈন্য পেয়ে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের উপর। কাজেই অক্ষত সৈন্যদের নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হই। ফলে পাকবাহিনী লাকসাম দখল করে নেয়।

রাতে নূরুল হক সাহেব, নাগাবাবুসহ অপর দুজন পরিষদ সদস্য ২টা এল-এম-জি ও ৪টা এস-এল-আর আমার হাতে অর্পণ করেন। কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে দৌলতগঞ্জ সেতু উড়িয়ে দিই এবং লাকসাম-নোয়াখালী সড়কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হই।

২০শে এপ্রিল, ১৯৭১-নাথের পেচুয়ার মুখোমুখি যুদ্ধঃ ১০ই এপ্রিল সারারাত সেতু ধ্বংস করায় ব্যস্ত থাকায় ভোরে বিপুলাস্থরে পৌঁছামাত্র মাইজদী থেকে টেলিফোনযোগে খবর পেলাম যে, লাকসামে অবস্থানরত পাকসৈন্যরা নোয়াখালীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ কোম্পানীকে ফল-ইন করিয়ে সুবেদার সিরাজ সাহেবকে কে প্লাটুনের কমান্ডার নিযুক্ত করি এবং সুবেদা রজব্বার সাহেবকে দ্বিতীয় প্লাটুনের কমান্ডার নিযুক্ত করে দিই। আমি নিজে তৃতীয় প্লাটুনটি কোম্পানী হেডকোয়ার্টারসহ নিয়ে নাথের পেটুয়া অভিমুখে দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে স্টেশনের পূর্ব দিকের দায়িত্ব সুবেদার সিরাজ সাহেব ও জব্বার সাহেবের উপর অর্পণ করি এবং আমি পশ্চিম কি রক্ষার দায়িত্ব নিই। তাদেরকে এ কথাও জানাই যে, আমাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের যখন কোন ব্যবস্থা নেই, সেহেতু শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যেন কেউই পশ্চাদসরণ না করেন।

আমি নিজের প্লাটুনকে প্রত্যেক সেকশনের পজিশন স্বহস্তে দেখিয়ে দিই। খনন কার্য শেষ না হতেই হঠাৎ নায়ক সিরাজ সতর্ক সংকেত দ্বারা আমাকে দেখালেন যে শত্রুপক্ষ ক্রলিং করে আমাদের পজিশনের নিকটে এসে গেছে। আমি চেয়ে দেখি সত্য সত্যই শত্রুরা ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে প্রায় এক কোম্পানী ক্রলিং করে এমনভাবে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যা ধারণা করা যায় না। আমি তৎক্ষণাৎ এস-এল-আর'এর মাধ্যমে গুলি শুরু করি। নায়ক সিরাজও এল-এম-জি'র সাহায্যে শত্রুর উপর আঘাত করে। বলতে গেলে আমার সমস্ত প্লাটুনের সৈন্যরা একসাথে আগত শত্রুর প্রত্যেককে আহত বা নিহত করতে সক্ষম ছিল। এরপর তাদের ফলো-আপ কোম্পানী দ্বিগুণ বেগে তাদের সাপেটিং বা সাহায্যকারী অস্ত্রের দ্বারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়ে আহত ও নিহত সৈন্যদেরকে সরিয়ে নিয়ে পিছনে চলে যায় এবং তারপর আমাদের উপর আর্টিলারী এবং মর্টারের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। পূর্ব দিক থেকে যখন আমার দ্বিতীয় প্লাটুনের ল-এম-জি'র ফায়ার শত্রুপক্ষের উপর পড়ছিল তখন শত্রুরা তাদের উপরও (দ্বিতীয় প্লাটুনের উপর) অনবরত শেলিং করতে থাকে। পরিণামে আমার একজন সৈন্য তৎক্ষণাৎ শহীদ হন এবং একজন গুরুতরভাবে আহত হন। আমি বাধ্য হয়ে প্লাটুনকে ২০০ গজ পশ্চাতে একটা ডোবার পাশে দৌড়ে পজিশন নিতে আদেশ দিই। শত্রুর দুই প্লাটুনের মত সৈন্য আমার প্রথম পজিশনটি দখল করে ফেলে। এ সময় আমি আমার প্লাটুনকে আদেশের মাধ্যমে দ্বিতীয় ডিফেনসিভ পজিশনে নিয়ে যাই। এবং পুনরায় শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করেই গুলি আরম্ভ করি। এমন সময় হঠাৎ তিনখানা যুদ্ধ-বিমান সোজা আমাদের উপর ডাইভ করে পর পর তিনবার আক্রমণ চালায়। তারা প্রচুর পরিমাণ গুলি ছোঁড়ে এবং নাপাম বোমা ফেলতে থাকে। আমাদের সৌভাগ্য যে, সমস্ত গুলি এবং বোমাগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে। শত্রুদের আর এক ইঞ্চি অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা ছিল না তখন আমি পূর্বদিকে অবস্থানরত দুই প্লাটুনের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আমার একজন জোয়নকে তাদের খবর আনতে পাঠাই। এ সময় পূর্ব দিকের গ্রামগুলি আগুনে শুধু জ্বলতে দেখি। সংবাদদাতা ফিরে এসে জানালো যে, পূর্বদিকের দুই প্লাটুন তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সৈন্য তুলে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ কথা শোনার পর আমি বাধ্য হয়ে অলরাউন্ড ডিফেন্স করি। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত গোলাগুলি বিনিময় হয়। সন্ধ্যার পর পাকবাহিনী রেকি পেট্রলিং শুরু করে। তারা আমাদের উপর ফাইটিং পেট্রল পাঠায়। আমার সঙ্গে দু'ঘন্টা পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। তারা যাবতীয় অস্ত্র দ্বারা গুলি করতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর তারা চলে যায়।

সারাদিন ধরে যুদ্ধ করার পর অনাহার আর অবিশ্রামে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না আমাদের। এমতাবস্থায় পুনরায় যুদ্ধ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলি এবং রাত সাড়ে দশটার সময় আমি আমার যোদ্ধাদের নিয়ে সোনাইমুড়ি অভিমুখে রওনা হই। এ সময় রাত্তায় কোন জনগণের সাড়াশব্দ ছিল না। প্রত্যেক বাড়ির লোক ধন-সম্পদের আশা ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে চলে গেছে। সোনাইমুড়িতে পৌঁছে ড. মফিজ সাহেবের সাক্ষাৎ পাই। আমাদের বিশেষ করে আমাকে দেখে তিনি জড়িয়ে ধরেন। (ড. মফিজ খবর পেয়েছিলেন যে, আমরা পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মারা গিয়েছি)। তারপর তিনি আমাকে ও আমার সৈন্যদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

২১শে এপ্রিল ভোরে শত্রুদের পুনরায় অগ্রসর হবার খবর পেলাম। পূর্বদিন যুদ্ধে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাছাড়া এ্যামুনিশনও তেমন ছিল না। তবু শত্রুবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার সিদ্ধান্ত নিই। এবং সে অনুযায়ী সোনাইমুড়ি রেল স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছাকাছি এ্যামবুশ পার্টি বসাই। কিছুক্ষণ পর শত্রুবাহিনীর জোয়ানরা অগ্রসর হতে থাকে। প্রথমে আমরা গুলী চালাই। শত্রুপক্ষ ৩’’ মর্টার ও মেশিনগান থেকে গুলী চালায়। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলে। বেলুচ রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়। ইতিমধ্যে আমাদের এ্যামুনিশন শেষ হয়ে গেলে আমি আমার বাহিনীকে উইথড্র করে চলে আসি। পাকবাহিনী সোনাইমুড়ি দখল করে চৌমুহনীর দিকে অগ্রসর হয়।

আমি আবিরাপাড়ায় একটি গোপন বৈঠক দিই। এখানে কর্মীদের বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। নায়ক সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ ও ইসহাক মাতৃভূমি রক্ষার্থে আমার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

২৪শে এপ্রিলঃ আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মী জনাব আমীন উল্লাহ মিয়াঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বর্বর পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আমাকে সাহস দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা ও খাওয়ার নিশ্চয়তা দেন। তিনি প্রথমবারের মত ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনার জন্য এবং রাস্তা ঠিক করার জন্যে ভারতে চলে যান। এইদিনে সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে আমার কোম্পানীতে যোগদান করেন।

২৬শে এপ্রিলঃ হাবিলদার নূর মোহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে বিপুলেশ্বর স্টেশনের দক্ষিণে এক আড়ালে এ্যামবুশ করি। সকালে পাকবাহিনীর ৬জন সিগন্যালম্যানসহ দু’খানা গাড়ী যাবার সময় এম-এমজি দ্বারা ব্রাশ করলে তাদের একখানা গাড়ী নষ্ট হয়ে যায় এবং দু’জন আহত হয়। পাকবাহিনী আহত ব্যক্তিদ্বয়কে নিয়ে অন্য গাড়ীসহ পালিয়ে যায়। এখানে হাবিলদার নূর মোহাম্মদ অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন। এখানে দুটো রাইফেল উদ্ধার করি।

২৮শে এপ্রিলঃ সিপাই শাহজাহানকে সঙ্গে নিয়ে সোনাইমুড়িতে রেকী করি। ২৯শে এপ্রিল নায়ক সফি তার সেকশন নিয়ে সোনাইমুড়ি আউটার সিগন্যাল পুনরায় এ্যামবুশ করে। কিছুক্ষণ পর পাকবাহিনীর তিনখানা গাড়ী অগ্রসর হতে থাকলে সফি ফায়ার শুরু করে। ফায়ারে সম্মুখের গাড়ীখানা অকেজো হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষ পজিশন নিয়ে পাল্টা ফায়ার শুরু করে। দু’তিন ঘণ্টা যাবৎ গোলাগুলী বিনিময় হয়। কিন্তু এ্যামুনিশন শেষ হয়ে গেলে আমাদের জোয়ানরা গা-ঢাকা দেয়। শত্রুপক্ষের একজন গুরুতরভাবে আহত হয়। এখানে পাকবাহিনীর গুলীতে একটি ছেলে ও এক বৃদ্ধ মারা যায়।

১লা মে-বগদীয়ার যুদ্ধঃ নায়ক সিরাজ এক প্লাটুন যোদ্ধা নিয়ে বগাদীয়া সেতুর কাছে এ্যামবুশ করে। এ জায়গা দিয়ে একখানা জীপসহ তিনখানা ৩-টনী লরী কিছু দূরত্ব বজায় রেখে অগ্রসর হবার সময় নায়ক সিরাজ পাকবাহিনীর উপর চরম আক্রমণ চালায় এবং প্রথম ও শেষ গাড়ীখানার উপর অনবরত গুলী চালালে ৩-টনী একখানা গাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। এখানে ১৫/২০ জন খানসেনা সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়, কয়েকজন আহত হয়। পরক্ষণে পাকসেনারা ৩’’ মর্টার ও মেশিনগান হতে অবিরাম গোলাগুলী বর্ষণ করতে থাকে। দীর্ঘ সময় যুদ্ধের পর

নায়ক সিরাজ প্লাটুন উইথড্র করে। পাকসেনারা এখানে কয়েকটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে এবং একজন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এ যুদ্ধে হাবিলদার নুরুল আমীন ও অপর একজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতরভাবে আহত হয়। নায়ক সিরাজ অসীম সাহস ও বিরতের সাথে এ যুদ্ধ পরিচালনা করে।

৬ই মে-ফেনাকাটা পুলে সংঘর্ষঃ চৌমুহনী-চন্দ্রগঞ্জ রাস্তায় পাকবাহিনীর চলাচল শুরু হয়। কিন্তু এ্যামবুশ করার সুযোগ পাইনা। অবশেষে ৬ই মে নায়ক সফির সেকশন নিয়ে এ্যামবুশ পার্টি বসাই। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনখানা পাকসৈন্য বোম্বাই ট্রাক চন্দ্রগঞ্জ থেকে চৌমুহনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকলে আমরা অতর্কিত আক্রমণ চালাই। আমাদের এই অতর্কিত আক্রমণে পাক জোয়ানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের প্রস্তুতি নেয়ার পূর্বেই বেশ কয়েকজন খানসেনা ধরাশায়ী হয়। মুহূর্তের মধ্যে তারা ভারী মেশিনগান দ্বারা আমাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করে। পাকসেনাদের মেশিনগানের গুলীতে একই নামে আমাদের দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধা (ইসমাইল) শহীদ হন। তাদের একজনের বাড়ি আমিশাপাড়া বাজারের পশ্চিমে সাতঘরিয়া, অপরজনের বাড়ি নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জে। এরপর আমি আমার সৈন্য তুলে নিয়ে শহীদদ্বয়ের দাফনের ব্যবস্থা করি-আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মী চৌমুহনীর হোটেল জায়েদীর মালিক, পদিপাড়ার নূর মোহাম্মদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে পদিপাড়াতে সমাধিস্থ করা হয়।

৮ই মে আমি ভারত থেকে মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেবের আদেশক্রমে অস্ত্র আনয়ন করি।

৯ই মে-পুনরায় বগাদীয়াতে যুদ্ধঃ ফেনাকাটা যুদ্ধ ও অপারেশনের পর জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নতুন করে সাহসের সঞ্চার হয়। নায়ক সুবেদার ওয়ালীউল্লাহকে বগাদীয়াতে এ্যামবুশ করার নির্দেশ দিয়ে নায়ক সুবেদার জবেদকে সঙ্গে নিয়ে আমি শত্রুবাহিনীর কর্মতৎপরতা ও অবস্থান লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে চৌমুহনী রওনা হই। চৌমুহনীতে পাকবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করে বগাদিয়ায় ফেরার পূর্বেই নায়ক সুবেদার ওয়ালী উল্লাহ পাকবাহিনীর একখানা পিকআপ ভ্যানের একজন জেসিওসহ ছয়জন সৈন্যের উপর আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের দু'জন সৈন্য (জেসিও) নিহত হয়। গাড়ীখানা রাস্তায় পড়ে যায়। ইতিমধ্যে আমরাও লোহে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রুবাহিনীর আরও দু'খানা গাড়ী এসে পড়ল। আরম্ভ হয় উভয়পক্ষের আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণ। প্রায় ৪/৫ ঘণ্টা গোলাগুলি বিমিনয় হয়। অবশেষে শত্রু হতাহত সৈন্যদের নিয়ে চৌমুহনীর দিকে চলে যায়। এখানে শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এ যুদ্ধে নায়ক সুবেদার ওয়ালীউল্লাহর কপালে গুলী লাগে এবং তিনি সামান্য আহত হন। তিনি এ যুদ্ধে অসামান্য সাহস ও বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পাকবাহিনীর উক্ত একেজো গাড়ীখানা স্বাধীনতার পরও দীর্ঘ কয়েক মাস রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে থাকে।

তৎকালীন পাকিস্তান বাজারের পূর্ব দিকে যুদ্ধঃ পাকসেনাদের চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর সড়কে আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় সেই রাস্তায় এ্যামবুশ করার পরিকল্পনা করি। অবশেষে ১০ই মে এ্যামবুশ করে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একখানা সিভিল বাসে কিছু ছদ্মবেশে ও কিছু সামরিক পোশাকে খানসেনারা লক্ষ্মীপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই বাসের ২/৩ শত গজ পেছনে সামরিক গাড়ীতে আরও বহু পাকসৈন্য অগ্রসর হচ্ছিল। প্রথম গাড়ীকেই আমরা আঘাত করি। ফলে কয়েকজন সৈন্য প্রাণ হারায়। মুহূর্তে অন্য পাক সৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে মর্টার ও আর্টিলারীর সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ চালালে আমরা সেখান থেকে পালতে সক্ষম হই।

১১ই মে, ১৯৭১-মীরগঞ্জে পাকবাহিনীর পরাজয়ঃ এখানে রেকী করে সুবেদার ওয়ালীউল্লাহকে এ্যামবুশ করার নির্দেশ দেই এবং নায়ক আবুল হোসেনকে রাস্তায় মাইন পুঁততে নির্দেশ দিই। আবুল হোসেন মাইন বসিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। লক্ষ্মীপুরের প্লাটুন কমান্ডার হালিদার আব্দুল মতিন ও তার সেকশন নিয়ে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে। কিছুক্ষণ পর শত্রুবাহিনী মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে একখানা গরুর গাড়ী সামনে রেখে অগ্রসর হতে থাকে। গরুর গাড়ীখানা পুঁতে রাখা মাইনের উপর দিয়ে অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে

প্রচণ্ড আওয়াজে সেটি কয়েক হাত উপরের দিকে উঠে যায়। প্রচণ্ড আওয়াজে হানাদার খানসেনারা এতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা কয়েকজন অস্ত্র ফেলে প্রাণপণে পালানো চেষ্টা করে। অমনি শুরু হয় আমাদের গোলাগুলি। কয়েকজন হতাহতও হয়। জানা যায়, শত্রু পালিয়ে যাবার সময় জনসাধারণের হাতে দু'জন খানসেনা মাছ মারা রাকসা দ্বারা আহত হয়। শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া বেশ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। এখানেও সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন।

১২ই মে চৌমুহনীর দেড়মাইল উত্তরে মান্দারহাটে শত্রুদের উপর চরম আঘাত হানার জন্য আমি এক প্লাটুন মুক্তিসেনা নিয়ে এ্যামবুশ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। তখন চৌমুহনীতে পাকবাহিনীর বিরাট ঘাঁটি অবস্থান করছিল। এ সময়ে পাকবাহিনী গুপ্তচর দ্বারা খবর নিয়ে অতর্কিত এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলে আমরা সেখান থেকে কোন প্রকারে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই। কিন্তু পাকবাহিনী আমাদের ধরতে না পেরে মান্দারহাট বাজারটি পুড়িয়ে দেয়।

১৩ই মেঃ এদিন বিকেল দু'টায় খবর পেলাম নোয়াখালীর এস-ডি-ও দুই গাড়ী পাকসৈন্যসহ আজ লক্ষ্মীপুর পরিদর্শনে গেছেন। তাদের প্রত্যাগমনে বাধার দেওয়ার জন্য হাবিলদার নূর মোহাম্মদ এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে চন্দ্রগঞ্জের নিকট কোন এক জায়গায় এ্যামবুশ করেন। এ এ্যামবুশে এস-ডি-ও সহ কয়েকজন সৈন্য আহত হয়।

১৪ই মেঃ নায়েক আবুল হোসেন বিপুলেশ্বর স্টেশনের কাছে কয়েকটি মাইন পুতে রাখেন। কিন্তু পাকসেনাদের গাড়ী অতিক্রম করার পূর্বেই একখানা ইট বোঝাই ট্রাক সে স্থান অতিক্রম করার সময় ট্রাকটি পড়ে যায়। অন্যদিকে একই দিনে হাবিলদার নূর মোহাম্মদ তাঁর প্লাটুন নিয়ে চন্দ্রগঞ্জে এ্যামবুশ করেন। লক্ষ্মীপুর থেকে অগ্রগামী একখানা লরী বোঝাই খানসেনাদের এ্যামবুশ করে ৫/৬ জনকে খতন করতে সক্ষম হয়। অসমর্থিত খবরে জানা যায়, একজন কর্নেলও নাকি নিহত হয়। পরে তারা দোয়াইরা গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়।

১৫ই মেঃ নায়েক সুবেদার ইসহাক এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ৭ মাইল পায়ে হেঁটে খিলপাড়ার পশ্চিমে মইলকার দীঘিরপারে পাক হানাদার বাহিনীর ছোট একটি ছাউনী আক্রমণ করে সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। নায়েক সুবেদার ইসহাক এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দেয়।

১৮ই মে, ১৯৭১-সাহেবজাদার পুল ধ্বংসঃ ওয়ালীউল্লাহ মাইন দ্বারা সাহেবজাদার পুলটি ধ্বংস করে লাকসাম-নোয়াখালীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

১৯শে মে-বগাদিয়ায় পুনরায় সংঘর্ষঃ নায়েক আবুল হোসেনকে মাইন বসানোর নির্দেশ দিয়ে গোপনে এ্যামবুশ করে বসে থাকি। সকাল ৯টার সময় ৩জন পাকসেনা বেবী ট্যাক্সি করে লাকসাম যাবার সময় বগাদিয়ায় পৌঁলে পোঁতা মাইন বিস্ফোরণে বেবীট্যাক্সিটি কয়েক গজ দূরে উড়ে যায় এবং ৩জন খানসেনাই নিহত হয়। এ খবর শত্রু বাহিনীর কানে পৌঁছামাত্র এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে আমরা গা-ঢাকা দিই।

২৬শে মেঃ সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ দালাল বাজার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে ৩০ জন রাজাকারকে হত্যা করে এবং ৬টি রাইফেল উদ্ধার করে।

২৮ শে মেঃ পুনরায় সেক্টর কমান্ডারের আদেশক্রমে ভারতে কনফারেন্সে যোগ দিয়ে কিছু এ্যামুনিশন নিয়ে আসি।

২৯ শে মেঃ মীরের হাট থেকে ১৫ জনের একটি রাজাকার দল আসতে থাকলে হাবিলদার আব্দুল মতিন তাদেরকে আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত ১৫ জন রাজাকারই হাবিলদার মতিনের হাতে ধরা পড়ে এবং নিহত হয়।

সশস্ত্র প্রতিরোধে কুমিল্লা

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার সৈয়দ গোলাম আশ্বিয়া

২০-০৭-১৯৭৬

২৬শে মার্চ সকাল বেলা আখাউড়া কোম্পানী হেডকোয়ার্টার থেকে একজন নায়েক অপারেটর সিঙ্গারবিলে আসে এবং বলে যে, ঢাকার অবস্থা খুব খারাপ কুমিল্লাতেও আমাদের লোকজনকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ খবর পাবার পর আমি আমার লোকজনকে গোপনে ডাকি। কমাণ্ড আমি আমার হাতে নিই, আর কেউ সিনিয়র না থাকতে। সিদ্ধান্ত নেয়া হল, ৬টা বিওপিতে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরকে আজ রাতের মধ্যে শেষ করতে হবে। পরদিন সকালে খবর পাঠানো হল, সকল বিওপি ছেড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আখাউড়া সিমেলা হলের সামনে সমবেত হওয়ার জন্য। ২৮শে মার্চ সবাই আখাউড়াতে গিয়ে একত্রিত হয়।

২৯শে মার্চ সমস্ত বাঙালী ইপিআর আখাউড়ার জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে আখাউড়া কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ চালায়। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর ডব্লিউপিআররা রাতের অন্ধকারে দুটি লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। আখাউড়া থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে জনসাধারণ তাদেরকে ঘিরে ফেলে। দুইজন লোককে পশ্চিম পাকিস্তানী রাইফেল দিয়ে গুলী করে হত্যা করেছিল। তারপর আমার এক প্লাটুন ইপিআর সেখানে যাওয়াতে তারা স্থানীয় মসজিদে ঢুকে পড়ে। শত্রুর এক সুবেদার ও এক নায়েব সুবেদারসহ ১৪জনকে সেখানে হত্যা করা হয়।

কোম্পানী হেডকোয়ার্টার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, অয়ারেলস সেট, রেশন আমরা সরিয়ে সিনেমা হলের সামনে স্কুলে নিয়ে আসি। দুইজন হাবিলদারকে নায়েক সুবেদার দিয়ে ৩টা প্লাটুন খাড়া করি এবং আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনসহ ঐ এলাকায় ডিফেন্স তৈরি করি।

২রা এপ্রিল মেজর খালেদ মোশাররফ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলেন, তিনি আমাকে একটা প্লাটুন দিয়ে উজানিসার ও আর একটা প্লাটুন দিয়ে গঙ্গাসাগর রেলওয়ে স্টেশনে ডিফেন্স করার নির্দেশ দেন। ৪ঠা এপ্রিল দুটি প্লাটুন উল্লিখিত জায়গায় মোতায়েন করা হয়। ৫ই এপ্রিল আমি নিজেও উজানিসার চলে যাই।

১২ই এপ্রিল উজানিসার ও গঙ্গাসাগর ব্রীজ আংশিক নষ্ট করে দেয়া হয়-পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য যাতে কুমিল্লা থেকে সরাসরি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসতে না পারে।

১৪ই এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা বিগ্রেড কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হয়। উজানিসার ব্রীজের হাজার গজ দূর থেকে একটা কোম্পানী থেকে নেমে রাস্তার দুপাশে নালা দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। ব্রীজের নিচে আমাদের বাংকার ছিল। শত্রুরা আমাদের কাছাকাছি আসার পর তাদের উপর ফায়ার ওপেন করা হয়। আমাদের এই আচমকা আক্রমণে তাদের অনেকেই হতাহত হয়। নৌকাতে তারা সমস্ত লাশ বোঝাই করে নিয়েছিল। ঐ নৌকার মাঝি পরে আমাদেরকে বলেছিল যে, একজন অফিসারসহ ১৭৩ জন সৈন্য ওদের নিহত হয়েছিল।

তারপর পাকিস্তানী সৈন্যরা পেছনে গিয়ে আর্টিলারী ও মর্টাররের সাহায্যে আমাদের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের কাছে কোন আর্টিলারী বা মর্টার ছিল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আমাদের লোক ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে ৪র্থ বেঙ্গলের কাউকে পায়নি। জনসাধারণ বলেছে যে তারা নাকি আখাউড়ার দিকে চলে গেছে। পাকিস্তানীদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা (আমাদের দুই প্লাটুন সৈন্য) উইথড্র করে আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনে চলে আসি। এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও আমাদের কোন ডিফেন্স নাই। তাই বাধ্য হয়ে আমরা উইথড্র করি।

* বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত

উজানিসারে প্রচণ্ড মার খেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য গঙ্গাসাগর হয়ে আখাউড়া আসার চেষ্টা করে। আমাদের এক প্লাটুন ইপিআর হাবিলদার আসদুর আলীর নেতৃত্বে গঙ্গাসাগর ব্রীজে ডিফেন্স বানিয়েছিল। পাকিস্তানী সৈন্যরা সেখানে পৌছলে এক প্লাটুন ইপিআর তাদের উপর ফায়ার ওপেন করে। এই অতর্কিত আক্রমণে (১৫ই এপ্রিল) পাকিস্তানীদের ৩জন অফিসারসহ আনুমানিক ৭০/৭৫জন সৈন্য নিহত হয়েছিল। তিনজন অফিসারের কবর ও সৈন্যদের কবর সেখানে পাওয়া গিয়েছিল। প্লাটুনটির ডিফেন্স দুদিন সেখানে থাকে। পাকিস্তানী সৈন্যরাও তাদের ডিফেন্স মজবুত করে। পাকিস্তানী ব্রিগেড কমাণ্ডার ঐ ব্যাটালিয়নকে উইথড্র করে নতুন আর একটা ব্যাটালিয়ন গঙ্গাসাগরে পাঠায় এবং দুই দিনের মধ্যে গঙ্গাসাগরে মুক্তিফৌজদের ডিফেন্স ধ্বংস করে আখাউড়া পৌছার নির্দেশ দেয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের ডিফেন্সে চলে আসে। আর্টিলারী ও ৩” মর্টার দিয়ে তারা ওভারহেড ফায়ার অব্যাহত রেখেছিল। ইপিআর মোহাম্মদ সুফি মিয়া তখনও গুলী ছুঁড়ে চলছিল। পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংকারে ঢুকে তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। ল্যান্স নায়েক মোবাস্শের আলীকেও বাংকারে ঢুকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা হয়। ৭ জনকে গুরুতররূপে আহত অবস্থায় আগরতলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ১৮ই এপ্রিল প্লাটুন-এর অন্যান্য সৈন্য উইথড্র করে আখাউড়া চলে আসে।

১৯শে এপ্রিল পুরো ইপিআর কোম্পানীকে ক্লোজ করে আখাউড়ায় একত্রিত করা হয়। এখানে ৪র্থ বেঙ্গলের ১টা কোম্পানীও এসেছিল ক্যাপ্টেন আইনউদ্দীনের নেতৃত্বে।

২১শে এপ্রিল ঘয়েরকোট ও ইটনা গ্রামে আমরা মিলিতভাবে ডিফেন্স করি।

২২শে এপ্রিল গঙ্গাসাগরে এক এ্যামবুশে আমরা ৬জন পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করি ও বাইশ হাজার চীনা এ্যামুনিশন উদ্ধার করি ৫টা রাইফেল ও একটা স্টেনগানসহ।

২৮শে এপ্রিল আমাদের দুটো প্লাটুনকে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দীন আজমপুরে আসার নির্দেশ দেন।

১১ই মে আজমপুরে আমরা এক এ্যামবুশ তৈরি করি। পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি কোম্পানী সিলেটের মুকুন্দপুর থেকে আজমপুরের দিকে আসছিল। আমাদের দুটি প্লাটুন নরসিংদার নামক জায়গায় ওদেরকে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে তাদের ৬৩জন নিহত হয়।

১৩ই মে সিঙ্গারবিল এলাকায় এক এ্যামবুশে ৩ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

১৮ই মে এই এলাকায় এক রেইডে ৬ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। একজন আহত সৈন্যকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল।

২৭শে মে রাজাপুর এলাকায় এক রেইডে ৪ জন পাকসেনা নিহত হয়।

২৯শে মে সিঙ্গারবিল এলাকায় এক এ্যামবুশে ৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। ৩১শে মে সিঙ্গারবিলে আর এক এ্যামবুশে ১৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। ৪ঠা জুন দুটি এ্যামবুশে ৯ জন পাকসেনা নিহত হয় সিঙ্গারবিল এলাকায়।

কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধের আরও বিবরণ*
\\ বড় কামতার যুদ্ধ \

বর্ডার পেরিয়ে আগরতলা এসে পৌছেছি। তারপর ক’টা দিন কেটে গেছে। মুক্তিবাহিনীর ভাইদের স্বচ্ছ দেখবার জন্য আর তাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনার জন্য আকুলি-বিকুলি করে মরছিলাম। কিন্তু আমাদের

* সত্যের সেন রচিত ‘প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ’, কলিকাতা, আগস্ট ১৯৭১ থেকে সংকলিত।

মত লোকদের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি তাদের সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। অতিরিক্ত আগ্রহ দেখালে হয়তোবা সন্দেহভাজন হয়ে পড়ব! শুনলাম শহর থেকে মাইল পাচেক দূরে প,বি, হাসপাতালে মুক্তিবাহিনীর দশ-বারো জন আহত যোদ্ধা রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করলে আমাদের মনের আশা মিটতে পারে।

কিন্তু কাজটা কি এতই সহজ! আমরা যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের লোক নই তারই বা প্রমাণ কি? এখনকার অবস্থায় এই সন্দেহ তো জাগতেই পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখলাম, আমাদের খুব বেশী বেগ পেতে হোল না। আমরা যে পরিচয়সূত্রটুকু নিয়ে গিয়েছিলাম, তাতেই কাজটা সহজ হয়ে গেল। বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা তাদের মুখে তাদের নানা কাহিনী শুনলাম। আমার মনে হোল তারা যেন প্রথমত কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করছিল, পরে কথা বলাবলির মধ্যে দিয়ে আমাদের সম্পর্কটা সহজ হয়ে গেল।

সবসুদ্ধ চার জায়গার চারজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমরা আলাপ করেছি। তিনজের সাথে কথা শেষ করে চতুর্থ জনের সঙ্গে কথা শুরু করতেই চমকে উঠলাম। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কোন জায়গায় লড়াই করে জখম হয়েছেন। তিনি উত্তর দিলেন-সে জায়গার নাম বড়কামতা এই কথা শোনার পর আমার চমকে ওঠার কথাই তো। এই তো মাত্র ক’দিন আগে কড়কামতায় এক রাত্রি যাপন করে এসেছি। সে কথা কি এখনই ভুলে যেতে পারি!

বড়কামতা?

হ্যাঁ, বড়কামতা। আমার মানসচক্ষে সেই স্বল্পভাষী যুবকটির মুখ ভেসে উঠছিল। আর স্মৃতিপটে ভেসে আসছিল স্থলিত কণ্ঠে বৃদ্ধের সেই ব্যাকুল প্রার্থনা, দুর্গা, দুর্গা। তাহলে আমার সেই এক রাত্রির স্নেহঘন আশ্রয় বড়কামতা গ্রামটিও যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে?

ওরা কোন তারিখে হামলা করেছিল আর সেই সময় আপনারাইবা সেখান থেকে কতদূরে ছিলেন?

ওরা হামলা করেছিল ৩০-এ, অর্থাৎ ৩০-এ এপ্রিল তারিখে।

আমরা ২৫-এ তারিখে প্রথম সেখানে যাই। তার পর থেকে সেখানেই ছিলাম। কি আশ্চর্য কাণ্ড, আর কি অভূত যোগাযোগ!

আমি খুব তাড়াতাড়ি মনে মনে হিসেব করে দেখলাম আমরা চার বন্ধু সেই ২৫-এ এপ্রিল তারিখেই বড়কামতায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। এঁরাও আমাদের কাছাকাছি ছিলেন। কিন্তু আমরা বাইরের লোক, এঁদের কেমন করে জানব।

আপনার ক’জন ছিলেন?

আমরা মুক্তিবাহিনীর দশজন লোক সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ক’টি দিনের মধ্যে ঐ অঞ্চলে আরও পাঁচজন লোককে ট্রেনিং দিয়ে আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলাম বলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা দাঁড়াল পনের।

এই ক’দিনে বড়কামতার লোকেরা আমাদের, নিজেদের আপন জনের মত গ্রহণ করে নিয়েছিল। আমরা সবাই মিলেমিলে সংসার করছিলাম। আমরা এখান থেকে ওখান থেকে বড় বড় মাছ ধরে আনতাম। কখনো তাঁরা রান্না করতেন, কখনো বা আমরা। কিন্তু খাবার বেলায় সবাই ভাগাভাগি করে খেতাম। কিসের হিন্দু আর কিসের মুসলমান, আমাদের জাত-পাতের বালাই ছিল না।

উপর থেকে নির্দেশ পেয়ে আমরা ২৯শে এপ্রিল তারিখে চান্দিনার পূর্বদিকে ঢাকা-কুমিল্লা সড়কের একটা পুল উড়িয়ে দিলাম। ক’দিন থেকেই চান্দিনা অঞ্চলে মিলিটারিরা বেশ তোড়জোর চালাচ্ছে দেখতে পাচ্ছিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যে এরা একটা কিছু ঘটাবে সেটা মনে মনে অনুমান করেছিলাম। আমাদের এই ছোট দলটিও সেজন্য তৈরী ছিল। ওরা একটা কিছু অঘটন ঘটালে আমরাও একেবারে চূপ করে থাকব না। ওরা যাই মনে করে থাকুক না কেন, ব্যাপারটা একদম একতরফা হবে না।

২৯ তারিখে পুল উড়িয়ে দেবার পর ওরা কোথাও না কোথাও হামলা করবেই। কিন্তু ওদের সেই হামলাটা কোথায় হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

কিন্তু এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে হোল না। ওরা পরদিন সকালবেলা চারখানা সৈন্য বোঝাই গাড়ি সাজিয়ে এই বড়কামতায় এসে হানা দিল। ওরা কি তবে সন্দেহ করতে পেরেছে যে, আমরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়ে আছি? কিন্তু তখন বেশী ভাবার সময় ছিল না। ওরা প্রথমেই কতকগুলি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। ওদের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে ষাট। ইতিমধ্যে আমরা মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা ওদের দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে ষাট। ইতিমধ্যে আমরা মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা ওদের দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ পজিশন নিয়ে নিয়েছি। ওরা প্রথমেই কোন বাধা না পেয়ে নিশ্চিত মনে তাদের ধ্বংসের কাজে এগিয়ে চলেছিল।

আমরা প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র একই সঙ্গে চারটা গাড়ির উপর ‘ব্রাশ’ করে চললাম। আমাদের মিলিটারি ভাষায় ‘ব্রাশ’ কথার মানে একই সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুলির পর গুলি চালিয়ে যাওয়া। থামিয়ে না দিলে এইভাবে ক্রমান্বয়ে গুলির পর গুলি চলতে থাকে। এই একটানা গুলিবর্ষণের ফলে সৈন্য-বোঝাই চারটা গাড়িই লভভভ হোতে চলল। আমাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ওরা সহ্য করতে না পেরে প্রাণ নিয়ে পালাল।

৩০শে এপ্রিলের যুদ্ধের এটা প্রথম পর্ব। এরপরই যে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে যাবে সেটা বুঝতে বেশী বুদ্ধির দরকার করে না। এখানে ক্যান্টনমেন্ট কতই বা দূর। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বটা যে এত তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে তা আমরা ভাবতে পারিনি। এর এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদেই ওরা সৈন্য বোঝাই গাড়ির মিছিল সাজিয়ে চলে এল। ওদের আঠারটা ট্রাক বিকট আওয়াজে পথঘাট কাঁপিয়ে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে দ্রুতবেগে ছুটে আসছিল। অনুমানে বুঝলাম প্রতিপক্ষ দু’শ জনের কম হবে না। ওদের সঙ্গে মর্টার, মেশিনগান, রাইফেল কোন কিছুর অভাব ছিল না। ওরা এবার রীতিমত শিক্ষা দিয়ে যাবে। ওরা এসেই বেশ বড় একটা এলাকাকে ঘেরাও করে ফেলল।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চারজন সেই ঘেরাও-এর মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। আমাদের ঘেরাও-এর সুবিধা হচ্ছে এই যে, ওদের আমরা ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এত সমস্ত লোকের ভিড়ে মুক্তিযোদ্ধারা কোথা মিশে আছে এবং তারা কোথায় কোথায় পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পর্কে ওদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

বড়কামতা গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ বারুই বা বারুইজীবী শ্রেণীর লোক। সেজন্য গ্রামের এখানে ওখানে বহু পানের বরোজ আছে। এই বরোজগুলো সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল এগুলির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে তারা শত্রুদের বেছে বেছে তাক করে মারছিল।

একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার পাকসৈন্যদের বিরুদ্ধে শুধু যে আমরাই লড়াই করছিলাম তা নয়, গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ‘দুএকশ’ লোক নয়, আমার মনে হয় তাদের সংখ্যা দু-তিন হাজারের কম হবে না। লোকগুলি ক্ষিপ্তের মত ছুটে আসছিল। তাদের হাতে লাঠিসোঁটা, বর্শা-বল্লম থেকে শুরু করে বন্দুক পর্যন্ত। এই দুঃসাহসী লোকগুলি এই হাতিয়ার নিয়ে মর্টার আর মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ছুটে আসছে। এদের উন্মাদ ছাড়া র কি বলা চলে! কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাদের এই উন্মাদনা আমাদের মধ্যে নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে তুলেছিল। ওরা নানারকম জয়ধ্বনি আর বিকট গর্জন করতে করতে ছুটে আসছিল। সেই গর্জন শত্রুদের মনেও ভয়ের কাঁপন জাগিয়ে তুলেছিল। ওরা কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এ ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে এটা

আমরা কখনও আশা করতে পারিনি। অতি সাধারণ মানুষ যে দেশের ডাকে, স্বাধীনতার ডাকে এমন অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের আর কখনও হয়নি। এইভাবে ঘণ্টা দুই ধরে দুই পক্ষে যুদ্ধ চলল। আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুসৈন্যদের তাক করে করে মারছিলাম। আর এই ক্ষিপ্ত জনতা তাদের যত্নসামান্য হাতিয়ার নিয়ে তাদের পক্ষে যেটুকু সম্ভব তা করে চলেছিল। মর্টার গর্জন করছে, বোমা ফাটছে, মেশিনগান চলছে, গ্রামের পর গ্রাম আগুনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা যেন ভয় পাবার কথা ভুলেই গেছে। ভয় পেয়ে পালাবে দূরে থাক, ওদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এই দু'ঘণ্টার যুদ্ধে বহু সাধারণ মানুষ মারা গেছে। আমরা যে চারজন ঘেরাও-এর মধ্যে আটকা পড়ে গেছি তাদের মধ্যে দু'জন জখম হয়েছে। এই দুই ঘণ্টার যুদ্ধ ওদের অনেক হিসেবই ভুল করে দিয়েছে। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের এই নিভীক ও মারমুখো মূর্তি এবং তাদের মুহূর্মুহ গগনভেদী চীৎকারে ওরা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এমন অভিজ্ঞতা ওদের কখনও হয়নি। এমন দৃশ্য আমরা কোনদিন দেখিনি।

শেষ পর্যন্ত আমরাই সেদিন এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলাম। আমাদের সামান্যসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা সেদিন যে বীরত্ব ও রণচাতুর্জ দেখিয়েছিল সে কথা হয়তো কেউ কোনদিন জানবে না। কিন্তু এই অঞ্চলের সাধারণ কৃষক জনতা সেদিন যে শক্তি, সাহস আর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিল, আর কেউ জানুক আর না জানুক, আমরা তা কোনদিন ভুলতে পারব না।

শেষ দৃশ্য। পাকসৈন্যরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে যদিকে পারছে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। তাদের পেছন পেছন ক্ষিপ্ত, উন্মুক্ত জনতা যার যার হাতিয়ার উঁচিয়ে তাড়া করে চলেছে।

আমার কাছ থেকে বেশ কিছুটা সামনে তিনজন পাঞ্জাবী সৈন্য ওদের অজানা অচেনা পথে ছুটে চলেছে। একমাত্র আমি ছাড়া ওরা যে আর কারও নজরে পড়েনি, এটা ওদের জানা নেই। কেমন করে জানবে? একবার মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। আমি সেই সুযোগটাকে ভালভাবেই কাজে লাগালাম। আমি পরপর গুলি করে একজন একজন করে ওদের তিনজনকেই ভূপাতিত করলাম। সামনে গিয়ে দেখলাম, ওদের তিনজের মধ্যে একজন তখনও মরেনি। আমি এক গুলিতেই আমার সেই অসমাপ্ত কাজটিকে সমাপ্ত করে দিলাম।

এর পরের কাজ ওদের থেকে অস্ত্র নিয়ে নেয়া। সেই অস্ত্র নিয়ে বীর জনতার হাতে তুলে দিলাম। এতক্ষণ বাদে আমার নজরে পড়ল যে, আমি নিজেও অক্ষত নই। এই যে দেখুন, আমার হাতের এই জায়গায় একটা বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এতক্ষণ এত সমস্ত উত্তেজনার ঘটনার মধ্যে আমিও তা টের পাইনি। এরপর চিকিৎসার জন্য চলে এলাম এ হাসপাতালে।

যিনি এতক্ষণ এ কথা বলছিলেন, তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সুবেদার। এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। তার কথা বুঝলাম বড়কামতার যুদ্ধের ঐখানেই পরিসমাপ্তি।

কিন্তু আমার বোঝাটা যে কত বড় ভুল বোঝা সেটা বুঝলাম আরও কয়েকদিন বাদে। এবারকার এই 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায়' চলতে চলতে কি আশ্চর্যভাবে আর কি অপ্রত্যাশিতভাবে কতরকম লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে! একজনের মুখে শোনা অসম্পূর্ণ কাহিনী কি বিচিত্রভাবে আর একজন এসে সম্পূর্ণ করে দিয়ে যাচ্ছে। এই তো সেদিন হঠাৎ চান্দিনা কৃষক সমিতির আমার এক পরিচিত সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার মুখে শুনলাম, এই বড়কামতার যুদ্ধে শুধু মুক্তিযোদ্ধারাই নয়, তারা নিজেরাও ভালভাবেই জড়িত ছিলেন।

৩০শে এপ্রিল তারিখে পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন দ্বিতীয়বার বড়কামতা আক্রমণ করল তখন শুধু মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারাই তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেনি, বহু সাধারণ মানুষ সেদিন এ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল, এ কথা আমরা সেই মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধার মুখে আগেই শুনেছিলাম। আমাদের চান্দিনার সেই পরিচিত কৃষক কর্মীদের মুখে শুনলাম প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার কৃষক সেদিন এ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল।

পরদিন ১লা মে তারিখে গতদিনের পরাজয়ের ঝাল মেটাবার জন্য সকাল দশটায় প্রায় হাজারখানেক পাকসেনা পুনরায় এই অঞ্চলে আসে। গতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর বেশ বড় রকমের ঘাঁটি রয়েছে। তাদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে তারা বেশ বড়রকমের প্রস্তুতি নিয়ে এখানে এসে হামলা করল। তারা চান্দিনার দুই মাইল পূর্বে কোরপাই থেকে আরম্ভ করে চান্দিনার এক মাইল পশ্চিমে হাটখোলা পর্যন্ত সমস্ত পাকা রাস্তায় পজিশন নেয়। তাছাড়া কিছু দূরে মেশিনগান ও কামান পেতে রাখে। তিন-চার শ' পাকসেনা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে এবং বাড়িগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা তখন ঘটনাস্থল থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে হামলাকারীরা বুঝতে পারল যে, তাদের হাতের শিকার ফসকে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত চারদিককার গ্রামবাসীদের উপর মনের ঝাল মিটিয়ে এই রক্তখাদক মানুষশিকারীর দল তাদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরে চলে গেল।

॥ মুক্তিযুদ্ধে ফেনী ॥

এপ্রিলের প্রথমভাগেই নোয়াখালীর ফেনী শহরে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন এই বাহিনীর সংগঠক ও নায়ক। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই-পি-আর বাহিনীর জওয়ানরা, পুলিশ, আনসার, ছাত্র, সাধারণ মানুষ-এরা সবাই এই বাহিনীতে সামিল হয়েছিল। হাতিয়ার বলতে এদের কিছু রাইফেল আর বন্দুক। তাছাড়া বর্শা, বল্লম, লাঠিসোটা ইত্যাদিও ছিল। এই অস্ত্র সম্বল করে, সবকিছু জেনে শুনেও তারা কামান, মর্টার আর মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য তৈরী হয়েছিল। তখন তারা ভাবতেও পারেনি যে, এর চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে ওরা তাদের উপর হামলা করবে। কিন্তু যখন সে সময় এর, তখন তাতেও পিছ-পা হয়নি তারা।

মুক্তিবাহিনী প্রস্তুতি নেবার জন্য বেশী সময় পায়নি। এপ্রিলের প্রথম দিকেই আক্রমণকারী পাক-সৈন্যের একটি দল ফেনী শহর দখল করার জন্য মার্চ করে এগিয়ে এল। কিন্তু কাজটাকে যত সহজ বলে মনে করেছিল তা-ঠিক নয়, কার্যক্ষেত্রে সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল। ওরা ফেনী শহরে এসে পৌছবার আগেই মুক্তিবাহিনী তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। যাকে বলে মুখোমুখি লড়াই তা নয়, মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নিজেদের আড়ালে রেখে নানা দিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুপক্ষকে এমনভাবে অস্থির করে তুলল যে, শেষ পর্যন্ত ওরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পেছনে হটে যেতে বাধ্য হোল। এই গেল প্রথম রাউন্ড। কিন্তু প্রথম রাউন্ডেই জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হোল না। এরপর দু'পক্ষের মধ্যে পরপর কয়েকবার সংঘর্ষ ঘটল। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে আক্রমণকারীদের মুখ চুন হয়ে গেল। এই দুর্গম পথে, এই জীবনপণ করা দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ কথা নয়, তা করতে গেলে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এই সত্যটা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ওরা তখনকার মত স্থলপথে আক্রমণের কাজটা স্থগিত রাখল।

এইভাবেই মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ মেজর জিয়াউর রহমান এবং তাঁর সহযোদ্ধারা একথা ভালভাবেই জানতেন, যুদ্ধের এইখানে ইতি নয়, সূচনা মাত্র। ওরা শীঘ্রই শক্তি বৃদ্ধি করে ফিরে আসবে। আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই, এবার প্রবলতর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সেজন্য ভয় করলে চলবে না। শত্রুযতই প্রবল হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েই যেতে হবে, আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা এই দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছে। ফেনী শহর ও নিকটবর্তী

গ্রামাঞ্চলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড লাঠির ঘায়ে পিছিয়ে গিয়ে জঙ্গীবাহিনীর নেতারা ফেনী শহরকে আক্রমণ করার জন্য এবার এক নতুন পরিকল্পনা তৈরী করল।

এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ। একদিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দুটো বিমান প্রচণ্ড গর্জন তুলে সারা শহরটাকে প্রদক্ষিণ করে চলল। ওরা শুধু অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেই আসেনি, বোমারু বিমান দুটো ঘুরে ঘুরে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলে চলেছে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে সারা শহর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। সাধারণ মানুষ এমন একটা আকস্মিক ঘটনার জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না। তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। কিছু কিছু লোক হতাহতও হোল। এইভাবে কিছুক্ষণ বোমা ফেলে বিস্ফোরণ ঘটাবার পর সেই হিংস্র যন্ত্র-দানবগুলি স্বস্থানে ফিরে গেল।

পরদিন আবার ওরা এল। এসেই আগেকার দিনের মতই বোমা ফেলে চলল। কিন্তু একটি দিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শহরের সাধারণ মানুষ অনেক বেশী সাহস সঞ্চয় করেছে। বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়, সেই কৌশলটাও তারা কিছুটা আয়ত্ত করে নিয়েছে। তারা দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মত ছুটোছুটি করছিল না, অথবা বহু লোক এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে ওদের হাতে আক্রমণের সুযোগ তুলে দিচ্ছিল না, তারা ঠাণ্ডা মাথায় আত্মরক্ষা করে চলেছিল। আর মুক্তিযোদ্ধারা? মুক্তিযোদ্ধারা কি করছিল?

সেই ধবংশলীলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেজর জিয়া নির্ভীক কণ্ঠে হেঁকে উঠলেন, মুক্তিবাহিনীর জওয়ান ভাইরা, আমরা মরবার জন্য তৈরী হয়েই দুস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছি, তবে আর আমাদের ভয় কি! কুছপরওয়া নেই, আমরা ঐ বিমান দুটোকে পাল্টা আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে ছাড়ব।

মুক্তিযোদ্ধারা বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, আমাদের হাতে তো এন্টিএয়ারক্র্যাফট কামান নেই, আমরা কেমন করে এই বিমানগুলিকে ধবংশ করব?

হ্যাঁ, এন্টিএয়ারক্র্যাফট থাকলে আমরা আগেই ওদের দফা রফা করে দিতে পারতাম। কিন্তু নাই-বা থাকল তা, আমাদের রাইফেল তো আছে। এই রাইফেল দিয়েই আমরা ওদের এমন শিক্ষা দেব, যা ওরা কোন দিন ভুলতে পারবে না। জওয়ান ভাইসব, শহরে যে-সমস্ত উঁচু দালান আছে, তাদের উপর উঠে ওদের তাক করে গুলি চালাতে থাক। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধারা এইভাবে শত শত মার্কিন জঙ্গী বিমান ফেলে দিয়েছে, আমরাই বা কেন পারব না? এক মুহূর্ত দেরী নয়, জওয়ান ভাইরা, ছুটে চল সবাই।

শুধু নির্দেশ দেওয়া নয়, মেজর জিয়া সবার আগে নিজেই রাইফেল বাগিয়ে ছুটলেন। রাইফেলধারী যোদ্ধারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছুটে ছুটে শহরের উঁচু উঁচু দালানগুলির ছাদে গিয়ে উঠ পড়ল। এই দালানগুলি যেকোন সময় বোমার আগাতে ধসে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু সেজন্য মনে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই, বিন্দুমাত্র ভয় নেই। সবাই একমনে বিমান দুটোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে চলেছে। তাদের এভাবে আক্রান্ত হতে হবে, বিমান চালকরা একথা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই তারা নিশ্চিত মনে রাইফেলের নাগালের ভেতরে এসে গিয়েছিল। তারা জানত যে, সে ক্ষেত্রে তারা শুধু আক্রমণকারী। কিন্তু তারাও যে আক্রান্ত হতে পারে, এটা তাদের জানা ছিল না। কয়েকটা দালানের ছাদের উপর থেকে পায় একই সঙ্গে এক ঝাঁক রাইফেলের গুলি ছুটল। আর একই সঙ্গে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা তখনও গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। জলন্ত বিমানটার অবস্থা দেখে অপর বিমানটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল, দেখতে দেখতে আকাশপথে মিলিয়ে গেল। গুলিবিদ্ধ বিমানটা উল্কার মত জ্বলতে জ্বলতে পূর্বদিকে ছুটল। ওটা একটু বাদেই জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাবে, পরে জানা গিয়েছিল, জ্বলন্ত বিমানটার ধবংসাবশেষ ত্রিপুরার সীমান্তে গিয়ে পড়েছিল।

জয়, মুক্তিবাহিনীর জয়! জয়, স্বাধীন বাংলা জয়! বিজয়গর্বে উদ্দীপ্ত হাজার হাজার জনতার জয়ধ্বনিতে ফেনী শহর মুখরিত হয়ে উঠল। সবাই মেতে উঠল উৎসবে। মুক্তনগরীর বুকে স্বাধীন বাংলার পতাকা পতপত করে উড়ছিল।

\ চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধ \

মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের চর এসে সংবাদ দিল, সামরিক ভ্যান-বোম্বাই একদল পাকসৈন্য ফেনী থেকে চন্দ্রগঞ্জের দিকে আসছে। ওদের যখন চন্দ্রগঞ্জের দিকে চোখ পড়েছে, তখন ওরা সেখানে লুটপাট না করে ছাড়বে না। খবর পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন সুবেদার লুৎফর রহমান। বেঙ্গল রেজিমেন্টের লুৎফর রহমান, যিনি এই অঞ্চলে একটি মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন। সৈন্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট জনের মত হবে। এদের প্রতিরোধ করতে হলে দলে কিছুটা ভারী হয়ে নেওয়া দরকার। খোঁজ খবর করে অল্প সময়ের মধ্যে মাত্র ছয়জন মুক্তিযোদ্ধাদের জড় করা গেল।

সাতজন মানুষ সাতটি রাইফেল। এই সামান্য শক্তি নিয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাওয়াটা ঠিক হবে কি? মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন। কথাটা মিথ্যা নয়, এটা একটা দুঃসাহসের কাজই হবে। অথচ হাতে, সময় নেই, মুক্তিবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য যে-সময়ের প্রয়োজন, তার মধ্যে এই লুপ্তনকারী দস্যুরা এদের কাজ হাসিল করে সরে পড়বে। চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটে যাবে, আর তারা বসে বসে তাই দেখবে! না, কিছুতেই না, গর্জে উঠলেন সুবেদার লুৎফর রহমান, যেভাবেই হোক এদের প্রতিরোধ করতেই হবে। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ওরা অক্ষতভাবে হাসতে হাসতে চলে যাবে, এ কিছুতেই হতে পারে না। ওরা আমাদের অনেক রক্ত নিয়েছে, তার বিনিময়ে ওদেরকেও কিছুটা রক্ত দিতে হবে।

রাস্তার ধারে একটা বড় রকমের ইটের পাঁজা। কে যেন কবে একটা দালান তোলবার জন্য এখানে এই ইটগুলি এনে জড় করে রেখেছিল। অনেকদিন হয়ে গেল, সেই দালান এখনো তোলা হয় নি, ইটগুলি যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। চন্দ্রগঞ্জে ঢুকতে হলে সৈন্যবাহী গাড়ীগুলিকে এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। সুবেদার লুৎফর রহমান আর ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা সেই ইটের পাঁজার পেছনে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালেন। এখানে থেকেই তাঁরা সেই হামলাকারী দস্যুদের প্রতিরোধ করবেন, এটা খুবই দুঃসাহসের কাজ। তাঁরা জানতেন, তাঁরা তাঁদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চলেছেন। কিন্তু এমন এক একটা সময় আসে যখন জেনেশুনে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। অবস্থা বিশেষে বামন হয়েও তাঁদের দানবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে হয়। মুক্তিবাহিনীর নায়ক সুবেদার লুৎফর রহমান বললেন, এখনকার অবস্থা হচ্ছে তেমনি এক অবস্থা।

কিন্তু বেশি কথা বলার সময় ছিল না। দূরে থেকে অস্ফুট সামরিক ভ্যানের গর্জন শোনা গেল। ঐ যে, ঐ যে আসছে ওরা! তাঁরা সাতজন সাতটি রাইফেল নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়ালেন। সেই অস্ফুট আওয়াজ ক্রমেই স্ফুট থেকে স্ফুটতর হয়ে উঠতে লাগল। তারপর একটু বাদেই দেখা গেল সামরিক ভ্যান পথের ধুলো উড়িয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। উত্তেজিত প্রতীক্ষায় তাঁদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন ইস্পাতের মত দৃঢ় আর কঠিন হয়ে এল।

সামরিক ভ্যান দ্রুত আসতে হঠাৎ থেমে গেল। না থেমে উপায় ছিল না, কাদের অদৃশ্য হস্তের গুলিতে গাড়ির টায়ারের চাকা ফুটো হয়ে গেছে। একই সঙ্গে কতগুলি রাইফেলের আওয়াজ। বিস্ময়ে, আতঙ্কে সৈন্যরা ঝুপঝাপ করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। কিন্তু সেই অদৃশ্য হস্তের গুলিবর্ষণের যেন শেষ নেই। সৈন্যদের মধ্যে যারা সামনের দিকে ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে হতাহত হয়ে ভূমিশ্যা নিল। একটু বাদেই রাইফেলের আওয়াজ থেমে গিয়ে পল্লী-প্রকৃতির নিস্তব্ধতা আর শান্তি ফিরে এল।

সৈন্যরা সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তন্ন তন্ন করে চারদিক পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। অদৃশ্য শত্রুরা কি তবে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে? না, ওদের বিশ্বাস নেই, একটু বাদেই হয়তো ওরা আরেক দিক থেকে আক্রমণ করে বসবে। রাস্তার দু'পাশে অনেক ঝোপঝাড়-জঙ্গল। তাদের মাঝখানে ওরা কোথায় আশ্রয় নিয়ে বসে আছে কে জানে! তবে দলে ওরা ভারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা না হলে তাদের বিরুদ্ধে এমন করে হামলা করতে সাহস পেত না।

চন্দ্রগঞ্জ সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে এসে অবোধে লুটপাট করা যাবে, এই আশা নিয়ে তারা এখানে এসেছিল। এই অঞ্চলে তাদের একজন জামাতে ইসলামপন্থী দালাল ছিল। তার কাছ থেকে খবর পেয়েই তারা লুটের আশায় এখানে ছুটে এসেছে। তারা শুনেছিল এখানে তাদের 'বাধা দেবার মত কেউ নেই'। কিন্তু হঠাৎ কে জানে কোথা থেকে এই শয়তানের দল মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে! কে জানে, হয়তো ওরা ইতিমধ্যে তাদের চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে ফেলেছে! প্রতি গাছ আর প্রতিটি ঝোপঝাড়ের আড়ালে যে একজন করে শত্রু লুকিয়ে নেই এমন কথাই বা কে বলতে পারে! ওদের রাইফেলগুলি এইভাবে বহু গুলি অপচয় করার পর থামল।

কিছু সময় নিঃশব্দে কেটে গেল। সৈন্যরা ভাবছিল, তাদের অদৃশ্য শত্রুরা সম্ভবত পালিয়ে গেছে। এমন প্রবল গুলিবৃষ্টির সামনে ওরা কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকবে! কিন্তু তাহলেও ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করা দরকার। এবার বেশ হুঁশিয়ার হয়ে এগুতে হবে। যারা হতাহত হয়ে ভূমিশয্যা নিয়েছে, ওরা তাদের একজন একজন করে ভ্যানের উপর তুলছিল। ঠিক সে সময়ে আবার কতকগুলি রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠল। গুলির পর গুলি আসছে বিরতি নেই। সৈন্যদের মধ্যে এক অংশ আছে ভ্যানের উপরে, অপর অংশ রাস্তায়। অদৃশ্য হস্তগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। একটি গুলিও বৃথা যাচ্ছে না সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ হট্টগোল পড়ে গেল। তারা একটু সামলে নিয়ে আবার প্রবলভাবে গুলিবর্ষণ করে চলল। কিন্তু তাদের সামনে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। এইভাবে কিছুক্ষণ দুপক্ষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল। ইতিমধ্যে সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অপর পক্ষে অদৃশ্য প্রতিপক্ষের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তা বোঝার কোন উপায় ছিল না।

অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সৈন্যরা। কিন্তু একটু আগেই তাদের দালাল, জামাতে ইসলামীপন্থী সেই লোকটি, তাদের সাহায্যে করবার জন্য এসে গেছে। সে অত্যন্ত চতুর লোক, চারদিকে ভালভাবে নজর করে সে এই রহস্যটা বুঝতে পারল! দূরবর্তী ইটের পাঁজার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সে বলল, আমার সন্দেহ হয়, ওরা ঐ পাঁজার পেছনে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কথাই তো, এই সন্দেহটা সকলের মনেই জাগা উচিত ছিল কিন্তু এতক্ষণ এই কথাটা ওদের কারও মাথায় আসেনি।

এবার ওদের রাইফেলগুলি একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল। সৈন্যরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে অতি সন্তর্পণে তিন দিক দিয়ে এগিয়ে চলল। ইটের স্তূপটাকে ঘেরাও করে ফেলতে হবে। খুব সাবধান, ওদের একটাও যেন সরে পড়তে না পারে।

মুক্তিবাহিনীর জওয়ানরা ইটের পাঁজার আড়াল থেকে সবকিছুই দেখছিল। সৈন্যদের মতলব বুঝতে তাদের বাকী রইল না।

আর এক মুহূর্তে দেরী করার সময় নেই। এখনই তাদের সরে পড়তে হবে। এই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে তারা যতটা আশা করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হাসিল করতে পেরেছে। এবার তারা স্বচ্ছন্দে ছুটি নিতে পারে। একজন একজন করে সাতজন মুক্তিযোদ্ধা ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কিছুটা বাদে শিকার-সন্ধানী সৈন্যরা এসে সাফল্যের সঙ্গে সেই ইটের স্তূপটাকে ঘেরাও করে ফেলল। কিন্তু কি দেখল এসে? দেখল, পাখিগুলি তাদের একদম বোকা বানিয়ে দিয়ে মুক্ত আকাশে উড়ে চলে গিয়েছে। ইটের

পাঁজার পেছনে একটি জনপ্রাণী নেই। শুধু মাটির উপরে অনেকগুলি কার্তুজের খোল ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সেদিনকার যুদ্ধে সবসুদ্ধ ২৩ জন সৈন্য হতাহত হয়েছিল। আর মুক্তিবাহিনীর জওয়ান সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। যে দেশদ্রোহী দালালটি শত্রুদের সাহায্যে করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল, এর কয়েকদিন বাদেই মুক্তিযোদ্ধারা তাকেও খতম করল।

সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ঘা খেয়ে পাকসৈন্যদের চূড়ান্তভাবে নাকাল হতে হয়েছিল। চন্দ্রগঞ্জ লুটপাট করা দূরে থাক, হতাহত বন্ধুদের নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে ওরা মাথা হেট করে ফিরে এসেছিল কিন্তু এই অপমান আর লাঞ্ছনা ওরা ভুলে যেতে পারেনি। দিন কয়েক বাদে ওরা আবার নতুনভাবে তৈরী হয়ে চলল চন্দ্রগঞ্জের দিকে। তাদের মনের জ্বালাটা এবার ভাল করেই মিটিয়ে নেবে।

পাকসৈন্যরা আবার হামলা করতে আসছে, এই খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল চন্দ্রগঞ্জে। সুবেদার লুৎফর রহমান এখন সেখানে নেই, অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও কেউ নেই। এবার কে তাদের প্রতিরোধ করবে? ওরা সেদিন আচ্ছন্ন হতে ঘা খেয়ে ঘরে ফিরে গেছে, এবার ভাল করেই তার প্রতিশোধ তুলবে। চন্দ্রগঞ্জকে এবার ওরা ধবংসস্থাপে পরিণত না করে ছাড়বে না। যাকে পাবে তাকেই মারবে। ওদের হাতে কেউ কি রেহাই পাবে? সারা অঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। চন্দ্রগঞ্জের মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। ওরা ওদের যা করবার বিনা বাধায় করা যাবে।

কিন্তু চন্দ্রগঞ্জের একটি মানুষ এই কথাটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। না, কিছুতেই না, গর্জে উঠলেন তিনি, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। আর যদি কেউ না যায়, আমি একাই যাব, একাই গিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করব।

কে এই লোকটি? কি তাঁর নাম? না, তাঁর নাম আমার জানা নেই। কোন খ্যাতনামা লোক নন তিনি। একজন বৃদ্ধ প্রাক্তন সৈনিক। আর দশজন বৃদ্ধের মত তিনিও তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি ‘আল্লাহ আল্লাহ’ করে কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন সাধারণ মানুষ। কেউ কোনদিন তাঁর কোন অসাধারণত্বের পরিচয় পায়নি। কিন্তু আজ দেশের এক বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ অনুকূল মুহুর্তে তাঁর ভেতরকার সুপ্ত আগুনকে জাগিয়ে তুলিছে। যেখানে হাজার হাজার মানুষ ভয়ে অস্থির সেখানে এই একটি মানুষ দৃঢ় নিষ্কম্প কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যদি একা যেতে হয়, আমি একাই যাব, আমি একাই ওদের সঙ্গে লড়াই করব। মরবার আগে এই হিংস্র পশুগুলির মধ্যে একটাকেও যদি মেরে যেতে পারি, তবে আমার জীবন সার্থক হবে।

যারা তাঁর হিতৈষী, তারা তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, তুমি একা মানুষ, তার উপরে বুড়ো হয়েছ, তুমি কি করে ওদের সঙ্গে লড়াই করবে? কিন্তু কারও কোন বাধা তিনি মানলেন না, দৃঢ় মুষ্টিতে রাইফলটা আঁকড়ে ধরে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। তাঁর এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর তরুণ ছেলে তাঁকে ডেকে বলল, দাঁড়াও আব্বা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তোমার মত আমিও ওদের সঙ্গে লড়াই করব। ছেলের কথা শুনে বাপের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু’জনের হাতে দুটি রাইফেল পিতাপুত্র পাশাপাশি প্রতিরোধ সংগ্রামে যাত্রা করল।

আজও ওরা সেই ইটের পাঁজার পেছনে আশ্রয় নিল। ওরা পিতা-পুত্র পাশাপাশি বসে শত্রুদের আগমনের জন্য অধীর চিন্তে প্রতিক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে দূর থেকে মোটর ভ্যানের গর্জন শোনা গেল। হ্যাঁ, এইবার ওরা আসছে। দেখতে দেখতে সৈন্যবাহী গাড়ি একেবারে কাছে এসে পড়ল। সৈন্যদের মধ্যে অনেকের কাছেই এই ইটের পাঁজাটি সুপরিচিত। ঐটিকে ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়, কিন্তু আজও যে

কেউ তাদের আক্রমণ করবার জন্য এর আড়ালে ঝুঁ পেতে বসে থাকতে পারে, এটা তারা ভাবতে পারেনি। ভাবেত না পারা স্বাভাবিকও নয়। কিন্তু ওরা এই স্তূপটার বরাবর আসতেই পর পর তিনজন সৈন্য গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল। সবাই দেখতে পেল, কে বা কারা তাদের লক্ষ্য করে স্তূপটার আড়াল থেকে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যরা এর পাল্টা জবাব দিল। ইটের পাঁজাটাকে লক্ষ্য করে বাঁকে বাঁকে গুলিবর্ষণ চলল। এরপর সেই স্তূপের পেছন থেকে আর কোন গুলির শব্দ শোনা গেল না। সৈন্যরা একটু সময় অপেক্ষা করল, তারপর ছুটে গেল স্তূপটার সামনে। উদ্যত রাইফেল বাগিয়ে ধরে যখন তারা পায়ে পায়ে সেই স্তূপটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখতে পেল, সেখানে এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে। কিন্তু অস্ত্র বলতে কোন কিছু সেখানে নেই, শুধু কয়েকটা কার্তুজের খোল পড়ে আছে। ওরা বুঝল, এই বৃদ্ধের সঙ্গে আরও যারা ছিল তারা অস্ত্রসহ পালিয়ে গিয়েছে।

॥ সোনাইমুড়ি রেলস্টেশন ॥

চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধের পর সুবেদার লুৎফর রহমান নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিকারের সন্ধানে ছুটে চলেছিলেন। তাঁর এক মুহূর্তেও বিশ্রামের অবকাশ নেই। তিনি পাকসৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে দক্ষ শিকারীর মত তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ফিরছিলেন। মুক্তিবাহিনীর গুপ্তচররা নিত্য নতুন সংবাদ নিয়ে আসছে। আর সেই সূত্র অনুসরণ করে তাদের মুক্তিবাহিনী যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে, সেখানেই শত্রুদের উপর ঘা দিয়ে চলেছে।

এপ্রিলের শেষ ভাগ। খবর এল একদল সৈন্য কুমিল্লার লাকসাম থেকে ট্রেনে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছবে। লুৎফর রহমান এই খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। স্থির হোল, ওদের বিনা বাধায় এগুতে দেওয়া হবে না, সোনাইমুড়ি স্টেশনেই এই হামলাকারীদের উপর হামলা করতে হবে। রেলস্টেশনে চড়াও হয়ে আক্রমণ। হয়তো সেজন্য মুক্তিবাহিনীকে বেশ কিছুটা মূল্য দিতে হবে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে নিতে হবে। তা হোক, এই শিকারকে কিছুতেই ফস্কে যতে দেওয়া চলবে না।

কিন্তু এবার আর চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধের মত সাতজন মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে চলবে না। এবার আর আগেকার মত আড়াল থেকে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ বলবে দিবালোকে প্রকাশ্যে, মুখোমুখি। ওদের সৈন্যসংখ্যা বড় কম নয়, আক্রমণ করতে হলে বেশ কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করে নিতে হবে সেই অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্চাশজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাকে সোনাইমুড়িতে এনে জড় করা গেল। অবশ্য যতদূর জানা গিয়েছে, সৈন্যদের সংখ্যা এর চেয়েও অনেকটা বেশী। তাহোক, এই শক্তি নিয়েই ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে সৈন্যবাহী ট্রেনটা সোনাইমুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছল। মুক্তিবাহিনী কাছেই কোন একটা জায়গায় লুকিয়ে ছিল। ট্রেনটা এসে পৌঁছবার সাথে সাথেই রাইফেলধারী মুক্তিযোদ্ধারা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে ট্রেনটাকে ঘেরাও করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তারা ট্রেনের আরোহীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল। ওরা গাড়ির ইঞ্জিনটাকেও লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিল। ড্রাইভার ইঞ্জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ নিয়ে পালাল। ফলে ড্রাইভারহীন ট্রেনটা অচল হয়ে গেল।

প্রকাশ্য দিবালোকে এইভাবে আক্রান্ত হতে হবে, পাকসৈন্যরা তা কল্পনাও করতে পারেনি। তারপর ঘটনাটা এমন দ্রুত ঘটে গেল যে একটু সময় ওরা হতভম্ব আর স্তব্ধ হয়ে রইল। প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে পড়তে লাগল। ওদের মধ্যে কয়েকজনকে কামরা থেকে নামবার আগেই মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ দিতে হল।

এবার দু'পক্ষ গুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। এবারকার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে রেলস্টেশনের উপরে এ ধরনের লড়াই আর কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি রেলস্টেশন এজন্য স্মরণীয় হয়ে

থাকবে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই লড়াই চলল। এই যুদ্ধে পঁয়ত্রিশজনের মত পাকসৈন্য নিহত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছয়জন শহীদ হলেন।

ইতিমধ্যে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। খবর পেয়ে ঘণ্টা তিনেক বাদে আক্রান্ত পাক-সৈন্যদের সাহায্য করবার জন্য চৌমুহনী থেকে সামরিক ভ্যানে করে একদল সৈন্য ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল। এবার পাক-সৈন্যদের মোট সংখ্যা দাঁড়াল আড়াইশতের উপর। হতাহতদের বাদ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা তখন আনুমানিক চল্লিশ-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর মাত্র। মুক্তিযোদ্ধারা এমন ভুল কখনও করে না। তারা যেমন বিদ্যুৎ গতিতে এসে আক্রমণ করেছিল, তেমনিভাবেই ঘটনাস্থল থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকসৈন্যরা তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হল।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ঢাকা-ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪। জয়দেবপুর-তেলিয়াপাড়াব্যাপী সশস্ত্র প্রতিরোধে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্যান্য বাহিনী	সাক্ষাতকারঃ মেজর জেনারেল (অব) কে, এম সফিউল্লাহ* ১৯৭১	 ১৯৭১

১৪/১৫ই মার্চ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হবে। এ গুজবের মধ্যে কিছু সত্যতাও ছিল। আমাদের কাছে কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র ছিল। সেগুলো জমা দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। আমরাও সেই নির্দেশ মানার জন্যে তৈরী হচ্ছিলাম। এই গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ই মার্চ জনসাধারণ জয়দেবপুর থেকে টঙ্গী পর্যন্ত ৫০ জায়গায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এতে আমাদের খাদ্য সরবরাহে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় আমি প্রথম ব্যারিকেডে গিয়ে জনসাধারণকে বলি যে, আপনারা আমাদের উপর আস্থা রাখুন। আমি ১৭ বৎসর সামরিক বাহিনীতে চাকুরী করেছি অস্ত্র ব্যবহার করার জন্যে, ফিরিয়ে দেবার জন্যে নয়। এই জন্যে আমাদের উপর আপনারা আস্থা রাখতেই হবে। আপনারা যদি না রাখেন তবে আমাদের উপর আস্থা রাখার মত লোক আর কেউ নেই। এই কথা শুনে তারা বলল যে আমরা আপনার ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের সাথে দেখা করতে চাই। জনতার মধ্য থেকে চার-পাঁচজন গণ্যমান্য নেতা আমার সঙ্গে আসলেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার-এর সাথে দেখা করার জন্যে। সেখানে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার এই আশ্বাস দিলেন যে আমাদের উপর আস্থা রাখুন। আমাদেরকে বিশ্বাস রাখুন এবং এই প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলুন। এতে আপনারা সুবিধে হবে এবং আমরা কোন নাজুক পরিস্থিতিতে পড়ব না। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলবো বলে আশ্বাস দিয়ে তারা চলে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন প্রতিবন্ধকতা উঠানো হয় নাই। শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেরাই গিয়ে প্রতিবন্ধকতা উঠাচ্ছিলাম। কিন্তু একদিকে যেই আমরা ব্যারিকেড সরাচ্ছিলাম অপরদিকে জনসাধারণ আবার ব্যারিকেড সৃষ্টি করছিল। এর বিরুদ্ধে কোন কড়া ব্যবস্থা না নেওয়ায় পাক সেনাবাহিনীর চোখে আমরা সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছিলাম।

১৯শে মার্চ সকাল দশটার দিকে ঢাকা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের কাছে অয়ারলেসে এই মর্মে এক মেসেজ পাঠানো হয় যে “The Commander with his escort is coming to have lunch with you. He would visit Gazipur Ordnance Factory. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতেও এরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়। এবং সেখানে আমাদের ব্যাটালিয়ন-এর লোকজন গিয়ে গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর রেসিডেন্ট ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার করিমউল্লাহ (পশ্চিম পাকিস্তানী)-কে অস্ত্রস্তিকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করা হয়। (তাকে ফ্যাক্টরীর লেবাররা ঘেরাও করে রেখেছিল)। এ ঘেরাও থেকে উদ্ধার করতে আমাদের কোন বেগ পেতে হয়নি। ১২টার দিকে একটা মেসেজ আসে যে “I had cleared some barricade. Now I am at ‘Chowrasta’. I am using the civilians to open the barricade. You also clear the barricade from your side and meet me enroute. If there is any opposition use maximum force.” এ খবর পাবার পর আমরা আমাদের লোকজনকে নিয়ে জয়দেবপুর থেকে প্রতিবন্ধকতা সরাতে সরাতে অগ্রসর হই এবং ব্রিগেড কমান্ডার-এর সাথে রাস্তায় মিলিত হই।

* ১৯৭১ সালের মার্চে জয়দেবপুরে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন-কমান্ড হিসেবে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাতকারটি ১৯৭৫ সালে গৃহীত। উল্লেখ্য মেজর জেনারেল (অবঃ) কে, এম, সফিউল্লাহর পত্রিকাস্তরে প্রকাশিত সাক্ষাতকারে বর্ণিত জয়দেবপুর সেনানিবাসের ঘটনাবলীর ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করে ২য় বেঙ্গলের তৎকালীন অধিনায়ক লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী আবদুর রকীব ১৩ মে ১৯৮৩ সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রার’র ‘ভিন্নমত’ শীর্ষক কলামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তদন্তের পরবর্তী সময়ে ‘বিচিত্রার’একই কলামে মেজর জেনারেল (অবঃ) সফিউল্লাহর একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। এগুলি এখানে একই সঙ্গে সংযোজিত হলো।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, আমরা প্রতিবন্ধকতা নিজেরাই পরিষ্কার করি। কিন্তু বিগ্রেড কমাণ্ডার বিগ্রেডিয়ার জাহানজেব আরবাব এবং তার সঙ্গীরা জনগণকে দিয়ে প্রতিবন্ধকতা পরিষ্কার করে। প্রতিবন্ধকতা সরাবার সময় বেশ কিছুসংখ্যক লোককে মারধর করা হয়। বেলা প্রায় দেড়টায় বিগ্রেড কমাণ্ডার তার লোকজনকে নিয়ে জয়দেবপুর পৌঁছে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে বিগ্রেড কমাণ্ডারের সাথে যে সমস্ত লোক ছিল তাদের মধ্যে একজন লেঃ কর্নেল (আর্টিলারী), একজন ক্যাপ্টেন (আর্টিলারী), একজন মেজর (আর্মার), একজন ক্যাপ্টেন (ইনফ্যানট্রি), একজন ক্যাপ্টেন (কমাণ্ডো) এবং ৭০ জন জোয়ান চাইনীজ এলএমজিতে সজ্জিত ছিল। তিনি জয়দেবপুরে প্রবেশ করে গর্বিতভাবে বললেন, “Nobody can stop us. We can move to any direction wherever and whenever we want to move. তার উক্তি এবং ভাবভঙ্গীতে আমার মনে হলো যেন আলেকজান্ডার ভারত জয় করল। জয়দেবপুরে এসে শুধুমাত্র অফিসাররা জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে ঢুকল। কিন্তু ৭০ জন জোয়ান প্রাসাদের বাইরে রয়ে গেল।

বিগ্রেড কমাণ্ডার যখন ঢাকা থেকে জয়দেবপুরে আসছিলেন, তখন যাতে আমাদের উপর কোন অঘটন না ঘটে, সেজন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলাম। কেননা, আমাদেরকে নিরস্ত্র করা হবে বলে একটা আশংকা আমাদের মনের মধ্যেও ছিল। বিগ্রেড কমাণ্ডার প্রাসাদে ঢুকে সমস্ত জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং মন্তব্য করছিলেন যে এ রকমের প্রস্তুতি কেন? তখন আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে, এখানকার পরিস্থিতি এমন যে, যেকোন মুহূর্তে উত্তেজিত জনতা দ্বারা আমরা আক্রান্ত হতে পারি। এবং সীমান্তের পরিস্থিতি যা, তাতে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে সীমান্ত অভিমুখে রওনা দিতে হতে পারে। উত্তর যদিও মনঃপূত ছিল তবুও আমরা একে অপরের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছিলাম।

বিগ্রেড কমাণ্ডার প্রাসাদে ঢোকার সাথে সাথেই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করার জন্য ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী এসেছে। ফলে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ জনতা আবার অল্প সময়ের মধ্যে জয়দেবপুর রেলক্রসিং-এ এক বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। একটা ভর্তি মালবাহী গাড়ী, যেটা তখন ময়মনসিংহ থেকে জয়দেবপুরে এসেছিল, তা দিয়ে রেলওয়ে ক্রসিং-এর উপরে বিরাট এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। একথা শোনার সাথে বিগ্রেড কমাণ্ডার কর্নেল মাসুদকে নির্দেশ দেন যে ২০ মিনিটের মধ্যে এই প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হোক। যদি কোন বাধার সৃষ্টি হয়, তবে যেন ম্যাক্সিমাম শক্তি প্রয়োগ করা হয়। কর্নেল মাসুদুল হাসান এই নির্দেশ পাবার সাথে সাথে মেজর মইনুল হোসেনকে (বর্তমান লেঃ কর্নেল) নির্দেশ দিলেন যে তাঁর কোম্পানী নিয়ে যেন এই প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হয়। কোন সময় নষ্ট না করে মেজর মইন এই প্রতিবন্ধকতার সামনে পৌঁছান।

তিনি সেখানে গিয়ে জনতার কাছে আবেদন করেন যে, আপনাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। কারণ আমাদের সাথে এখনও অস্ত্র আছে। আমাদের কাছ থেকে এখনও অস্ত্র নেয়া হয় নাই। জনতা যখন শুনছিল না তখন তিনি ভীড় ঠেলে জনতার মধ্যে যারা নেতা তাঁদের সাথে আলাপ করেন। নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব হাবীবুল্লাহ এবং আর একজন ছিলেন শ্রমিক নেতা আবদুল মোতালেব। সেদিন ছিল শুক্রবার এবং জয়দেবপুরে হাটবার। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ ছিল সেখানে। কিন্তু জনতা প্রতিবন্ধকতার এ পাশে ছিল আর কিছু জনতা প্রতিবন্ধকতার অপর পাশে ছিল। নেতারা ছিলেন বাজারের দিকে। মেজর মইন ইতিমধ্যে নেতাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন যে আমাদেরকে এখনও নিরস্ত্র করা হয়নি। তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করেন। নেতারা জনসাধারণকে বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে তারা যেন আর কোন গুণ্ডাগোল না করে। জনতার মাঝে তখনও হৈ চৈ এবং গুণ্ডাগোল চলছিল। ইতিমধ্যে লেঃ কর্নেল মাসুদ, বিগ্রেড কমাণ্ডার জাহানজেব ও তার ট্রুপস সেখানে গিয়ে পৌঁছান।

ব্যারিকেড-এর বাজারের পাশের দিকে অধিকাংশ জনতার সমাবেশ ছিল এবং অপর পাশের দিকও বেশ জনসমাবেশ ছিল। কিন্তু এ পাশের লোক বেশ উত্তেজিত ছিল। কারণ তারা জানত না যে মেজর মইনের সাথে

ব্যারিকেড-এর অপর পাশের জনতার সাথে কি কথাবার্তা হয়েছিল। জয়দেবপুর পর্যন্ত যে রাস্তা স্টেশনের দিকে চলে যায় সে রাস্তার শেষপ্রান্তে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর ট্রুপস মোতায়েন ছিল। তার পিছনে হুকুম দেওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে বিগ্রেড কমান্ডার জাহানজেব আরবাব তার বাহিনী নিয়ে এসে যায়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর বাকী সৈন্য প্যালেসে থেকে যায়। বিগ্রেড কমান্ডার আসার সাথে সাথে মেজর মইনকে আদেশ দেয় সে যেন তার সেনাবাহিনীকে পেছনে সরিয়ে নিয়ে এসে রেলস্টেশনে যাবার পথের উপর জনতাকে সামনে রেখে মোতায়েন করে। মেজর মইন তখন বিগ্রেড কমান্ডারকে বললেন যে নেতারা আপনার সাথে দেখা করতে চান এবং এই উদ্দেশ্যে তারা এদিকে আসছেন। বিগ্রেড কমান্ডার উত্তেজিত হয়ে বললেন, “I do not want to see them. Tell them to get away and deploy troops.”

মেজর মইন নির্দেশ মোতাবেক সৈন্যদের মোতায়েন করার জন্য আদেশ দিচ্ছিলেন। এ আদেশ শুনে এবং সৈন্যদের গতিবিধিও বিগ্রেড কমান্ডার জাহানজেব আরবাবের ত্রুদ মূর্তি দেখে নেতারা পেছনে সরে যান। নেতাদের পেছনে সরে যেতে দেখে এপাশের জনতা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তখন বিগ্রেড কমান্ডার মেজর মইনকে নির্দেশ দেন জনতার উপর গুলি ছোঁড়ার জন্য। একদিকে তিনি নিজে মেজর মইনকে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিচ্ছিলেন কিন্তু অপর দিকে তিনি মেজর মইনকে কর্নেল মাসুদের নির্দেশ নিতে বলছিলেন। কর্নেল মাসুদ এখানে ছিলেন।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, টাঙ্গাইলে আমাদের যে কন্টিনজেন্ট ছিল তাদের খাদ্য নেওয়ার জন্য একটা ট্রাক (বেডফোর্ড) টাঙ্গাইল থেকে জয়দেবপুর আসছিল। ঐ গাড়ী বাজারের নিকট এসে এক বিরাট জনতার ভিড় দেখতে পায়। তারা ভেবেছিল যে আজ হাটবার তাই এত লোক। তারা এখানকার ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে কিছু লোক তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং বলে যে সামনে পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমাদের গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। তোমাদেরকে আমাদের সাথে যোগ দিয়ে পাঞ্জাবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। ট্রাকের মধ্যে ড্রাইভারসহ ৭ জন বাঙ্গালী সৈন্য ছিল। তারা হতবুদ্ধি হয়ে কি করতে হবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। জনতা পাঁচজনকে ধরে নিয়ে যায় এবং একটি ঘরে তাদেরকে বন্ধ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়। অস্ত্রের মধ্যে চারটি চাইনিজ রাইফেল এবং চাইনীজ এসএমজি ছিল। ড্রাইভার এবং কো-ড্রাইভার কোন রকমে পালিয়ে এসে বলে যে আমাদের পাঁচজন সৈন্যকে জনতা বোধ হয় মেরে ফেলেছে এবং আমরা মারধর খেয়ে কোন রকমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। তখন বিগ্রেড কমান্ডার হুকুম দেয়, “Fire and Clear the barricade” মেজর মইন এই হুকুম পাবার পর প্রথম বিউগল বাজালেন এবং পতাকা উঠিয়ে গুলি ছোঁড়া হবে বলে মাইকে ঘোষণা করলেন। এ ঘোষণায় জনতার মাঝে কোন ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়নি। তারপর তিনি জনতার মাঝে একজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেন। এ আদেশ শোনার পর জনতার মাঝে একটু ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয়। মেজর মইন যাকে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে বাংলায় বললেন যে নিচের দিকে গুলি ছুঁড়ে দাও। যেহেতু গুলিটা গিয়ে একটা গাছের মধ্যে লেগেছে সেহেতু বিগ্রেড কমান্ডার এটা দেখে খুব রাগান্বিত হলেন। এবং নির্দেশ দিলেন, “Fire for effect” এবারও জনতার মধ্যে একটু নড়চড় হচ্ছিল। এবারও তিনি বাংলায় বললেন উপর দিকে মেরে দাও। এবার যে গুলি করছিল, সে রাইফেলটাকে এমনভাবে উঠিয়ে ধরছিলো যে মনে হচ্ছিল সে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। তা দেখে বিগ্রেড কমান্ডার ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, “I want one dead body per bullet. If you cannot handle the situation I will employ my troops.” এই সময় জনতার মধ্য থেকেও গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল। পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করতে দেখে মেজর মইন এবার ঠিকভাবে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। গুলি একজন লোকের গায়ে লাগে এবং সে মাটিতে পড়ে যায়। এর ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। এ সময় জনতার মধ্য থেকেও ভীষণভাবে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল। জনতার গুলিতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর কিছুসংখ্যক সৈন্যও আহত হয়। এ সময় জয়দেবপুর বাজারে অবস্থিত মসজিদের উপর থেকে বিগ্রেড কমান্ডার জাহানজেব আরবাবকে লক্ষ্য করে এস-এমজি ফায়ার শুরু হয়। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বিগ্রেডিয়াদের গায়ে তা লাগেনি। এখন জনতা এবং সৈন্যদের মধ্যে বেশ

কিছুক্ষণ গুলি বিনিময় হয়। এবং সেনাবাহিনীর গুলিতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর বাকী সৈন্যসহ আমি তখন প্যালেসে ছিলাম এবং গুলির আওয়াজ শুনে কিছুসংখ্যক সৈনিককে জাহানজেব আরবাবের ট্রপস-এর পিছনে মোতায়ন করি। এর দুটো উদ্দেশ্য ছিল জনতার হাত থেকে সৈনিকদের বাঁচানো এবং যদি বিগ্রেড কমাণ্ডারের অশুভ উদ্দেশ্য থাকে তা প্রতিহত করা।

এ খণ্ডযুদ্ধ প্রায় পনের বিশ মিনিটের মত চলে এবং এরপর সম্পূর্ণ এলাকা জনতামুক্ত। জনতা চলে যাবার পর আমরা ব্যারিকেড খুলে ফেলি। এরপর বিগ্রেড কমাণ্ডার ঢাকার দিকে চলে গেলেন এবং যাবার আগে নির্দেশ দিয়ে গেলেন জয়দেবপুর ও গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকার মধ্যে সাক্ষ্য আইন জারী করার জন্য এবং আরো বলে গেলেন অয়ারলেসে তাকে জানাবার জন্য কি রকম এ্যামুনিশন খরচ হয়েছে এবং কতজন হতাহত হয়েছে। আমরা তারপর খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, দুইজন লোক নিহত হয়েছে এবং কিছুসংখ্যক আহত হয়েছে। বিগ্রেড কমাণ্ডার যাবার সময় চৌরাস্তায় কিছু লোক দেখতে পায়। তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য দূর থেকে গুলি ছোঁড়ে এবং এতে দুজন লোক মারা যায়। আহতদের সংখ্যা জানা যায়নি।

আমরা নির্দেশ অনুযায়ী সাক্ষ্য আইন জারী করি। সাক্ষ্য পাঁচটার দিকে পাঁচজন নিখোঁজ লোককে আমরা মসজিদের পাশের এক কক্ষ থেকে উদ্ধার করি। স্থানীয় নেতাদের সাহায্যে এবং আমাদের লোকদের সাহায্যে তল্লাশী চালিয়ে পরদিন দুপুর পর্যন্ত ৪টি রাইফেল উদ্ধার করতে সক্ষম হই। তিন-চারদিন পর গফরগাঁও থেকে এসমএমজিটি উদ্ধার করি। অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে বের করা পর্যন্ত ঐ বেলায় সাক্ষ্য আইন বলবৎ ছিল। যদি বিগ্রেড কমাণ্ডার সেখানে না থাকত তাহলে আমরা ব্যারিকেড খুলে ফেলতে পারতাম। কোন হতাহত হতো না। যেভাবে এ পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করা হয়েছে তাতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈন্যরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ঐদিনই রাতে ৫ জন বাঙ্গালী সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। এর মধ্যে ৪টি চাইনিজ রাইফেল এবং একটি এস-এমজি এ্যামুনিশনসহ ছিল। সাক্ষ্যের সময় অয়ারলেসে আমরা বিগ্রেড কমাণ্ডারকে জানালাম যে, আমাদের ৬৩ রাউন্ড গুলি খরচ হয়েছে এবং আমাদের কিছুসংখ্যক সৈন্য আহত হয়েছে। দুজন বেসামরিক লোক নিহত এবং বেশ কিছুসংখ্যক আহত হয়েছে। যদিও তিনি বললেন যে ভাল করেছ, কিন্তু তিনি মনে মনে খুশী হতে পারেননি। কেননা তিনি বলেছিলেন, why 63 round spent and only two dead?

ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার-এর কর্তব্য এবং দায়িত্ব তার ব্যাটালিয়নের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু এমন নাজুক পরিস্থিতিতে তিনি সুস্থ মস্তিষ্কে কিছুই করতে পারেননি। বিগ্রেড কমাণ্ডার-এর কাছ থেকে তাঁর উপর কারণ দর্শাও নোটিশ এলো কিভাবে ট্রাকের পাঁচজন সৈন্য থেকে অস্ত্র নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলো? এবং পাঁচজন কেন অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গেল? ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার এক্সপ্লানেশন-এর জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জবাবে বিগ্রেড কমাণ্ডার সন্তুষ্ট হননি। শেষ পর্যন্ত তিনি বিগ্রেড হেডকোয়ার্টারে নিজে গিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। যাবার পূর্বে আমার সাথে পরামর্শ করেন। আমি তাকে বলেছিলাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে ডাকছে ততক্ষণ আপনি ঢাকাতে যাবেন না। যেহেতু তিনি মানসিক অস্থিরতাতে ছিলেন সেহেতু তিনি সেই অস্থিরতা দূর করার জন্য ২৩শে মার্চ ঢাকা বিগ্রেড হেডকোয়ার্টারে আসলেন। সেখানে যাবার সাথে তাঁকে বিগ্রেড কমাণ্ডার জাহানজেব আরবাব বললেন, তোমাকে ব্যাটালিয়নে ফিরে যেতে হবে না। তুমি স্টেশন হেডকোয়ার্টারে এটাচড; ব্যাটালিয়নের ঘটনাবলী নিয়ে তদন্ত হবে। তার পর থেকে ঢাকাতে থেকে যেতে বলা হয়। সেহেতু তিনি আর ব্যাটালিয়নে ফিরে যেতে পারেন নি। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে কর্নেল মাসুদ স্টেশন হেডকোয়ার্টারে এটাচড; এবং তার অনুপস্থিতিতে আমি যেন ব্যাটালিয়ন-এর কার্যভার গ্রহণ করি।

২৫শে মার্চ বেলা ১১টার সময় আমাকে বিগ্রেড থেকে জানানো হয় যে, বিগ্রেডিয়ার মজুমদার, সেন্টার কমান্ড্যান্ট, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, চট্টগ্রাম ব্যাটালিয়নে আসছেন এবং সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। আরো জানানো হয় নতুন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল কাজী রকিব উদ্দিন নতুন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হিসেবে আসছেন এবং তিনিও আজ পৌঁছে যাবেন। কর্নেল মাসুদ আমাকে ১১টার দিকে টেলিফোনে বলেন যে, লেঃ

কর্নেল রকিব নতুন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার হিসেবে আসছেন। তিনিও ভালো লোক। আমার যা হয়েছে তার জন্য কোন আফসোস নাই। খোদা যা করেন, ভালোর জন্য করেন।

বেলা প্রায় ১টায় বিগ্রেডিয়ার মজুমদার ব্যাটালিয়নে পৌঁছান এবং আমার সাথে এক ঘন্টা পর্যন্ত আলাপ আলোচনা করেন। তাঁর কাছে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি তার পুরোপুরি জবাব দিতে পারেননি। আমার মনে হচ্ছিল তিনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু ঘোলাটে পরিস্থিতিতে মুখ খুলে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলেন না। বেলা প্রায় আড়াইটার দিকে লেঃ কর্নেল কাজী রকিব ব্যাটালিয়নে পৌঁছে যান। বেলা প্রায় তিনটায় বিগ্রেডিয়ার মজুমদার সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। ভাষণের মর্ম এই ছিল যে, আমরা সৈনিক, আমরা সরকারের নির্দেশ মোতাবেক চলি। এবং সরকার যা হুকুম দেন তা আমরা পালন করতে বাধ্য হই। ব্যাটেলিয়নে ঘন্টাখানেক এ পরিপ্রেক্ষিতে ভাষণ দেন। তারপর লেঃ কর্নেল রকিবকে ব্যাটালিয়ন-এর ভার বুঝিয়ে দেন। এবং সৈনিকদের বলেন, আজ থেকে লেঃ কর্নেল রকিব তোমাদের নতুন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার। বেলা প্রায় পাঁচটার দিকে তিনি ঢাকা রওনা হয়ে যান। কিন্তু যাবার আগে আমি তাঁকে বলেছিলাম, স্যার আপনি আমাদের ব্যাটালিয়নে নতুন এসেছেন। তাই আজ রাতটা এখানে থেকে যান। কিন্তু তিনি বলেন যে ঢাকাতে তিনি তার শ্বশুরবাড়িতে থাকবেন। এখন আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে যদি তিনি আমাদের ব্যাটালিয়নে থাকতেন, তাহলে হয়ত আজ আমাদের সাথেই থাকতেন।

বিগ্রেডিয়ার মজুমদার চলে যাবার পর আমি ব্যাটালিয়ন কমান্ডার রকিবকে দেশের তদানীন্তন গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের মনোভাব জ্ঞাত করাই। কিন্তু তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণরূপে না জানাতে তাঁর সাথে খোলাখুলি আলাপ করতে পারছিলাম না- যদিও আমার পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের মনোভাব তাঁকে জ্ঞাত করাই। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন কিভাবে মোতায়ন ছিল তাও তাঁকে বলি। ডেপুটিমেস্টার এই- এক কোম্পানী ময়মনসিংহ, এক কোম্পানী টাঙ্গাইল- এই দুই কোম্পানীর ভার ছিল আমার উপর। এক প্লাটুন ছিল রাজেন্দ্রপুর এ্যাম্বুনিশন ডিপোতে। সেখানে আরো তিনটি পাঞ্জাবী প্লাটুন ছিল-এক প্লাটুন পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, এক প্লাটুন বেলুচ রেজিমেন্ট, এবং এক প্লাটুন ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট। ব্যাটালিয়নের বাকি লোক সব জয়দেবপুর প্যালেসে ছিল।

২৫শে মার্চ রাত প্রায় ১০টার দিকে কর্নেল রকিবের ছেলে ঢাকা থেকে টেলিফোনে জানায় যে তাদের বাসায় কয়েকটা বেনামী টেলিফোন কল এসেছে এবং ধমক দিয়ে বলা হয়েছে যে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। ঐ দিন বিগ্রেড কন্ট্রোল রুমে আমাদের ব্যাটালিয়নের একজন পাঞ্জাবী অফিসার কর্তব্যরত ছিল। কর্নেল রকিব তাকে নির্দেশ দেন সে যেন ইপিআর হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন করে সেখান থেকে কিছু আমর্ড গার্ড তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তিনি ইপিআর থেকে মনে হয় এই ভরসায় সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন যে তিনি মাত্র কিছুদিন আগে ইপিআর থেকে এসেছেন। আমর্ড গার্ড তাঁর বাসায় পাঠানো হয়েছিল কিনা, তা পরে আর জানতে পারিনি।

২৫শে মার্চ রাত প্রায় ১২টায় জেনারেল টিক্কা খান ব্যাটালিয়ন কমান্ডার কর্নেল রকিবের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন এবং বলেন যে গাজীপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে গোলযোগ চলছে। একজন দায়িত্বশীল অফিসারের নেতৃত্বে যেন সেখানে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠানো হয়। গাজীপুর জয়দেবপুর থেকে নিকটবর্তী। সেখানে কোন গোলযোগ হলে নিশ্চয়ই আমরা খবর পেতাম। কিন্তু যেহেতু টিক্কা খান নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু ঐ রাতেই প্রায় তিনটায় এক কোম্পানী সৈন্য একজন অফিসারের নেতৃত্বে সেখানে পাঠানো হয়। সৈন্য পাঠাবার পর সেখানে দেখা গেল কোন গুপ্তগোল ছিল না। আমার মনে হয়, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাটালিয়নের সমস্ত সৈনিককে দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে রাখা যাতে আমরা একত্রিত হয়ে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের ২৫শে মার্চের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন বাধা সৃষ্টি না করতে পারি।

২৫শে মার্চ রাত প্রায় ১ টায় কর্নেল মাসুদুল হাসান খান ঢাকা থেকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করেন যে তোমাদের অবস্থা কি? ঢাকাতে তো বেশ গুলিগোলার আওয়াজ শুনছি। এই টেলিফোন পাবার পরপরই ঢাকার সাথে সামরিক-বেসামরিক সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঢাকায় যে তখন কি হচ্ছিল তার কোন খবরই আমরা পাচ্ছিলাম না। ২৬শে মার্চ সকাল বেলায় ব্যাটালিয়ন কমান্ডার রকিবকে বললাম যে গত রাতে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং চারিদিকে যে সমস্ত গুলি রটছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করেছে। এ মুহূর্তে এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। যেহেতু ঢাকার সাথে অন্য সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেহেতু আমি অয়ারলেস সেটে গিয়ে ঢাকার কি হচ্ছে তা শোনার চেষ্টা করি। ২৫শে মার্চ রাতে টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ইউনিটে অয়ারলেস সেটে যেভাবে কাজ চলছিল তার একটি বিস্তৃত বর্ণনা নিচে দেওয়া গেলঃ-

বিগ্রেড হেডকোয়ার্টারে- ৫৭ বিগ্রেডে ছিল কন্ট্রোল স্টেশন আর সাব-স্টেশন ছিল নিম্নলিখিত ইউনিটগুলোঃ ১। ১৮ পাঞ্জাব, ২। ৩২ পাঞ্জাব, ৩। ২২ বেলুচ রেজিমেন্ট, ৪। ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট, ৫। ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ৬। ৪৩ লাইট এন্টিএয়ারক্রাফট রেজিমেন্ট, ৭। ট্যাংকস স্কোয়াড্রন- এগুলো সব ঢাকায় ছিল, ৮। ২ ইস্ট বেঙ্গল, জয়দেবপুর, ৯। ২ ইস্ট বেঙ্গল, টাঙ্গাইল (এ সেটগুলো ঢাকা থেকে এসেছিল)। এর অপারেটর সব পাঞ্জাবী ছিল। অয়ারলেস সেট এবং অয়ারলেস নেট কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে যারা পুরোপুরি অবগত নন তাদের অবগতির জন্য বলছি যে, অয়ারলেস নেট-এ একই ফ্রিকোয়েন্সিতে যখন এক স্টেশনে কথা বলা হয়, তখন অন্য স্টেশনের লোকজন একই সময়ে ঐ সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পায়।

২৬ শে মার্চ সকাল ৭/৮ ঘটিকার সময় আমি এবং কর্নেল রকিব অয়ারলেস সেটে যাই। সেটটা জয়দেবপুর রাজবাড়ির অফিসার্স মেস-এর পূর্বদিকে বসানো ছিল। আমরা যখন সেটে যাই তখন সেটে কথা হচ্ছিল। আমরা সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে অপারেটর ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করে অন্য চ্যানেলে চলে আসে। ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তন করাতে অন্যান্য স্টেশনের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি অপারেটরকে (পাঞ্জাবী ছিল) জিজ্ঞেস করি যে তুমি ফ্রিকোয়েন্সি কেন চেঞ্জ করছ? আর বাকী স্টেশন কোথায়? সে উত্তর দিল যে ঢাকা থেকে নির্দেশ দিয়েছে গোলযোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য এবং এই নেটে অনেক স্টেশন হয়ে যাবার জন্য। জয়দেবপুর-ঢাকা-টাঙ্গাইল এক নেটে থাকবে বলে নির্দেশ পাওয়া গেছে। আমি তাকে বললাম কিছুক্ষণ আগে অয়ারলেস সেট যে ফ্রিকোয়েন্সিতে ছিল সে ফ্রিকোয়েন্সিতে ফিরে যাও। সে উত্তর দিল যে, স্যার আমার সেট আর কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে ছিল না। আমি তখন তাকে বললাম যে অন্যান্য ইউনিট যে ফ্রিকোয়েন্সিতে আছে সে ফ্রিকোয়েন্সিতে মিলাও বা সেট কর। সে উত্তর দিল “আমার সে ফ্রিকোয়েন্সি জানা নেই।” আমি তাকে আর কিছু না বলে কর্নেল রকিবের সাথে অফিসে ফিরে আসি। আসার সময় রাস্তায় কর্নেল রকিবকে বলি, “There must have something serious happened in Dacca. That is why Dacca station does not want us to hear the conversation” তারপর আমি একজন বাঙ্গালী অপারেটরকে গোপনে নির্দেশ দিই ঐ সেট এর উপর লক্ষ্য রাখার জন্য যে কি কথাবার্তা হয়। আমি অফিস যাবার সাথে সাথে আমাদের ব্যাটালিয়নের নিজস্ব অপারেটর আমাকে বলে যে ময়মনসিংহের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নুরুল ইসলাম আপনার সাথে জরুরী কথা বলতে চান। টেলিফোন যোগাযোগ ছিল না বলে তিনি অয়ারলেসে কথা বলতে চান। ময়মনসিংহে আমাদের নিজস্ব অয়ারলেস সেট ছিল। আমি সেটে যাবার পর মেজর নুরুল ইসলাম বলে যে, সে কয়েক হাজার লোক দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। তারা বলছে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের সাথে যোগ দিক।

এখানে বলে রাখা দরকার ময়মনসিংহ ইপিআর হেডকোয়ার্টারে মেজর নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে আমাদের এক কোম্পানী সৈন্য ছিল। ইপিআর-এর উইং কমান্ডার একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ছিল। ইপিআর উইংয়ে তাদের যে রিজার্ভ কোম্পানী ছিল তার প্রায় অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিল। উইং কমান্ডার ঢাকার নির্দেশমত সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদের (ইপিআর) বর্ডার থেকে উইথড্র করে উইং হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসে। তাদের সংখ্যা উইং হেডকোয়ার্টারে ছিল প্রায় ৫০/৬০ জন। জনতা যখন উইং হেডকোয়ার্টার ঘিরে ফেলল তখন

হেডকোয়ার্টার-এর আউটার পেরিমিটারে বাঙ্গালী সৈনিকরা পাহারারত অবস্থায় ছিল। মেজর নুরুল ইসলাম (বর্তমানে লেঃ কর্ণেল) মাইক্রোফোনে উচ্চস্বরে জনসাধারণকে এ এলাকা থেকে চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন এবং এও আশ্বাস দেন যে, সময় আসলে আমরা আপনাদের নিরাশ করব না। সারাদিন তারা এ অবস্থায় ঘেরাও ছিল। মেজর নুরুল ইসলামের আশ্বাস পেয়ে জনতা আস্তে আস্তে সরে যায়। আমাকে যখন সে এ সমস্ত ঘটনা জানায় তখন আমি তাকে বললাম ধীরেসুস্থে কাজ কর। সময় আসলে সব কিছু বলব। সে আমাকে সেখানে আরো কিছু সৈনিক পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিল। আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে আমি পাঠাতে চেষ্টা করব।

আমি অয়ারলেস থেকে অফিসে ফিরে আসার সাথে সাথে আমি যে একজন অপারেটরকে ঠিক করেছিলাম ঐ অয়ারলেস সেটে লক্ষ্য রাখার জন্য সে এসে আমাকে খবর দিল যে, স্যার, আপনারা চলে আসার কিছুক্ষণ পর সে আবার ফিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে অন্যান্য স্টেশনের কথা শুনছিল। আমি দূর থেকে শুধু এতটুকুই শুনতে পেরেছি কে যেন কতগুলো লোক মেরেছে। পাঞ্জাবী অপারেটর তার সম্বন্ধে নির্দেশ চাইলে ঢাকার অপারেটর ভীষণভাবে রাগান্বিত হয়, এবং বলে সে যেন আর কখনো এই ফ্রিকোয়েন্সিতে না আসে। তাকে গতকাল যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে যেন সেভাবে চলে।

এ খবর পেয়ে আমি ব্যাটালিয়ান কমান্ডার কর্নেল রকিবের অফিসে যাই এবং তাকে এ সমস্ত ব্যাপার (ময়মনসিংহের ব্যাপার এবং অয়ারলেস-এর ব্যাপার) সব খুলে বলি। এবং তাকে আমি বলি যে, স্যার, আমাদের এখন কিছু একটা করা দরকার। তা না হলে পরিস্থিতি আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। যদি চলে যায় আপনিও কিছু করতে পারবেন না, আমিও কিছু করতে পারবো না। তিনি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি করা দরকার? আমি এ পরামর্শ দিলাম যে ময়মনসিংহের পরিস্থিতি খারাপ। ঢাকার সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে ময়মনসিংহের সাহায্যের জন্য আমাদের সমস্ত সৈনিকদের নিয়ে সেখানে চলে যাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের সৈনিকদের ময়মনসিংহ গিয়ে কনসেন্ট্রেট করা। আর পরিস্থিতি লক্ষ্য করে যদি কিছু করতে হয়, তাহলে আমরা যেন এক সাথে হয়ে করতে পারি। তিনি তখন বললেন, ঢাকা থেকে নির্দেশ ছাড়া কি ভাবে এ পদক্ষেপ নিই। আমি তখন বললাম যে, আপনি ঢাকা থেকে নির্দেশ নেন যে ময়মনসিংহের পরিস্থিতি খুবই খারাপ, আমাদের সেখানে ইনফোর্সমেন্ট পাঠানো দরকার। তিনি আমার কথামত ঢাকাতে অয়ারলেস সেটে কথা বললেন। কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। আমি তাকে বললাম যে এখন আমরা যদি কিছু না করি তাহলে আমাদের সৈনিকদের নিরাপত্তার জন্য আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা হয়ত আমরা পালন করতে পারব না। এতে তিনি একটু ঘাবড়িয়ে পড়লেন। ২৬ শে মার্চ প্রায় দশটার দিকে জেনারেল টিক্কা খান তৎকালীন সারা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করেন এবং ঐ আইনের নির্দেশাবলী রেডিওতে প্রচার করতে থাকেন। সামরিক আইন জারীর কথা শুনে সৈনিকদের মধ্যে এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঢাকায় যে বেশকিছু একটা ঘটেছে তার একটা আভাস পাওয়া যায়।

২৬ শে মার্চ সকাল ১০/১১ টার দিকে দেখলাম একটা আর্মি হেলিকপ্টার রাজেন্দ্রপুরের দিকে একবার যাচ্ছে এবং আবার আসছে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম তারা রাজেন্দ্রপুর থেকে এ্যামুনিশন নিচ্ছে। তাতে বুঝা যাচ্ছে ঢাকাতে যে এ্যামুনিশন ছিল তা এত তাড়াতাড়ি কিভাবে তারা খরচ করল। এ খবর পাবার পর ব্যাটালিয়ান কমান্ডারকে আবার বললাম যে, স্যার, “There must have something serious happened in Dacca and that is why they are running short of ammunition is being lifted by helicopter.”

২৭শে মার্চ সকাল পর্যন্ত ঢাকাতে কি ঘটেছিল তার কোন খবর পাইনি। বিকেলের দিকে আমাদের একজন ড্রাইভার ঢাকা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। সে খবর দিল যে ঢাকাতে বেশ গোলাগুলি হয়েছে এবং বেশকিছু লোক মারা গিয়েছে। সে আরো বললো যে, বাঙ্গালী সৈনিকদের বেঁধে নিয়ে কোথাও নিয়ে মেরে ফেলা

হচ্ছে। সে ব্যাটালিয়নে পৌঁছার সাথে এক উদ্ভেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন আমি ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে বলি যে, ঢাকা থেকে আপনি কোন নির্দেশ পাচ্ছেন না। ব্যাটালিয়নের পরিস্থিতিও খারাপ। আমরা যদি কোথাও কনসেন্ট্রেন্ট না হই তাহলে পরিস্থিতি হয়ত আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আমি তাকে আবার বললাম যে, আমরা আমাদের সৈনিকদের নিয়ে টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ চলে যাই। তিনি উত্তরে বললেন যে আমার ছেলে পিলে আছে। বেলা প্রায় দু'টোর দিকে ঢাকা থেকে বিগ্রেড কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার জাহানজের আরবাব ব্যাটালিয়ন কমান্ডার-এর সাথে অয়ারলেসে কথা বললেন এবং বললেন, “our troops are facing some difficulties at Tongi, Send a company to do some shooting.” আমাকে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন, কি করা যায়? জয়দেবপুরে তখন শুধু একটা রাইফেল কোম্পানী ছিল, যার কমান্ডার মইনুল হোসেন চৌধুরী। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার রকীব বললেন এই কোম্পানীকে পাঠাবার জন্য। আমি তখন বললাম যে এখন এই কোম্পানীকে না পাঠিয়ে টংগীর খবর নিন। একজন পাঞ্জাবী অফিসার পাঠাতে বললাম। গাজীপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে আমাদের যে কোম্পানী ছিল তার কমান্ডার ছিল একজন পাঞ্জাবী অফিসার। আমি তাকে পাঠাতে বললাম। ড্রাইভার এবং বাকী লোক ছিল বাঙালী। ঐদিনই আমরা টঙ্গীতে বেশ কিছু বড় বড় গোলার আওয়াজ শুনি। অফিসারকে আর অন্যান্যদেরকে পৃথক পৃথক ব্রিফ করে টঙ্গী থেকে খবর আনার জন্য পাঠানো হয়। বিকেলে টঙ্গী থেকে ফিরে আসার পর ঐ অফিসার কমান্ডিং অফিসারকে খবর দেয় যে সেখানে তেমন কিছু হয়নি। কিছুসংখ্যক জনতা টঙ্গী পুলের কাছে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে কিছু গোলাগুলি হয়েছে। সে এও বলল যে, “Since there was a barricade near Tongi Bridge the troops from Dacca did some sporadic Firing. Incidentally I was also challenged by the Dacca troops.” ড্রাইভার বলল যে আমরা টঙ্গীতে যাবার সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের সবাইকে (আমাদের অফিসারসহ) দুই হাত উপরে উঁচু করে বেয়নেটের ডগায় অফিসারের কাছে নিয়ে যায়। আমাদের সৈনিকদের সবাই ইউনিফর্ম পরিহিত ছিল। অফিসারকে যখন তারা উঁচু করায় (হ্যাণ্ডস-আপ) তখন অফিসার পাঞ্জাবী ভাষায় তাদের তিরস্কার করছিল। তার কথা শুনে পাঞ্জাবী সিপাইগুলো বলছিল, “দেখ, শালা পাঞ্জাবী ভি সিখ লিয়া।” এখন মনে হয় তাকে বাঙালী অফিসার মনে করে হাত উঁচু করিয়েছিল। এইভাবে হাত উঁচু অবস্থায় তাদের অফিসারদের সামনে যাবার সাথে সাথে তারা (তাদের অফিসাররা) দুঃখ প্রকাশ করে। আমাদের অফিসার তাদের সাথে ঘন্টাকানেক আলাপ-আলোচনার পর ফিরে আসে।

আমি এই ঘটনা ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে বলি এবং এও বলি যে, “Sir, it is about time that we take some actions, otherwise it will be too late,” তিনি তখন বললেন আমি কি করতে পারি? আমি তাকে বললাম, “If you are so afraid of taking any action then I am going to take some actions. As far as your safety is concerned you can go to cantonment and tell them that thay (2 E Bengal pers) have all gone and no one listens to you. You will not be blamed for it as you have come only two days before. Neither you know the troops, nor they know you. If you want we will tie you and leave in one of the rooms and the Dacca authorities will not doubt you.” এ কথা বলার পর আমি উনাকে একটু চিন্তা করে দেখতে বললাম এবং বললাম আমি সমস্ত অফিসার জেসিও'দের এ ব্যাপারে ব্রিফ করছি। যে পাঞ্জাবী অফিসার টঙ্গীতে খবর নিতে গিয়েছিল সে গাজীপুর ফিরে না গিয়ে জয়দেবপুরে চলে আসে। জয়দেবপুরে আরো দুইজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার এবং কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য ছিল। তাদের মধ্যে গোপনে শলাপরামর্শ চলছিল। আমি এটা লক্ষ্য করেছিলাম। তাই এ অফিসারকে রীতিমত অর্ডার করে গাজীপুর পাঠিয়ে দিই।

২৭শে মার্চ সন্ধ্যার দিকে কিছু লোক ঢাকা থেকে আসে। তাদের মুখে শুনতে পাই যে ঢাকাতে বেশকিছু হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এর আগে ড্রাইভার ছাড়া আর কারো কাছে শুনতে পাইনি। ২৭শে মার্চ সকালে একজন লোক ধীরাশ্রম থেকে জয়দেবপুরে আসে। সে খবর নিয়ে আসে যে কর্নেল সালাউদ্দিন মোঃ রাজা ধীরাশ্রম রেলওয়ে

স্টেশনে ঢাকা থেকে এসেছেন এবং সেখানে বসে আছেন। তিনি আমার সাথে বা লেঃ কর্নেল মাসুদের সাথে দেখা করতে চান। আমি ঐ লোকটার সঙ্গে গোপনে দেখা করি এবং লেঃ কর্নেল মাসুদ ব্যাটালিয়নে নেই, উনি ঢাকায়। বর্তমান ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লেঃ কর্নেল রকিব। আপনি চলে আসুন, কোন অসুবিধা হবে না। বোধ হয় লেঃ কর্নেল রকিব ব্যাটালিয়ন কমান্ডার শুনে জয়দেবপুর আসতে সাহস পাননি। তাই তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

২৮ শে মার্চ সকালে ময়মনসিংহ থেকে মেজর নুরুল ইসলাম আমাকে খবর পাঠায় যে ২৭/২৮ শে মার্চ রাতে তার সেনাবাহিনীর উপর পাকিস্তানী ইপিআররা হামলা চালিয়েছে। লড়াই এখনো চলছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে বললাম যে, আমাদের শিগগিরই ময়মনসিংহ রিইনফোর্সমেন্ট পাঠানো দরকার। আমরা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নেই যে, যেহেতু ঢাকার সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং ময়মনসিংহে আমাদের সৈন্যরা আক্রান্ত হয়েছে, সেহেতু আমাদের এখন তাদের সাহায্যে যাওয়া উচিত। ময়মনসিংহে যে আমাদের সৈন্যরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে একথা আমরা কাউকে বলিনি। আমাদের একথা গোপন রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে জয়দেবপুর থেকে সবাইকে এক সাথে নিয়ে যাওয়া এবং পথিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও সৈনিকদের নিরস্ত্র করা। এ ব্যাপারে আমরা এক পরিকল্পনা তৈরী করি। রাতে যাবার পরিকল্পনা এ জন্য করা হয়েছিল যে গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে আমাদের যে সব সৈনিকরা আছে তাদেরকেও যদি সাথে নিয়ে না যাই তাহলে তারা হয়ত আটকা পড়বে। যেহেতু দিনের বেলায় তাদের সরাতে গেলে অসুবিধা হতে পারে সেহেতু রাতে তাদেরকে সরানোর সময় বেছে নেয়া হয়। কেননা, গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে যে সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্য আছে তাদেরকে গোপনে সংবাদ দিতে হবে। আমরা যে জয়দেবপুর থেকে যাচ্ছি এটা সবাই জানত। কিন্তু গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুর সৈন্য সরাতে গেলে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে এ জন্য রাতে যেন বাঙ্গালী সৈন্যরা গোপনে বের হয়ে আসতে পারে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। আরো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল যে, আমি সারপ্লাস অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং কিছুসংখ্যক সৈনিক নিয়ে সকাল দশটার দিকে ময়মনসিংহে যাত্রা করব। এবং লেঃ কর্নেল রকিব বাকী লোকদের নিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রওনা হবেন। এই সময়টা যেন গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরকে জানিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তারা যেন ঠিক ঐ সময় বেরিয়ে আসতে পারে। ওয়াপদার সাথে এটাও ঠিক হয়েছিল যে, ঐ সময় গাজীপুর, রাজেন্দ্রপুর ও জয়দেবপুরে বিদ্রোহ সরবরাহ বন্ধ করে দেবে- যাতে এ সমস্ত জায়গা থেকে আমাদের বের হতে কোন অসুবিধা না হয়। গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে লোক পাঠিয়ে ওদেরকে ঐ সময়ের মধ্যে বের হবার খবর দেওয়া হয়েছিল।

২৮ শে মার্চ সকাল দশটায় সমস্ত উদ্ধৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহন নিয়ে আমি ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা করি। যাবার সময় লেঃ কর্নেল রকিব এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ব্যাটালিয়নের বাকী লোকদের নিয়ে তিনি সন্ধ্যার সময় রওনা হবেন। আমি জয়দেবপুর থেকে বের হবার পর চৌরাস্তা থেকে সমস্ত বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়ন করি। সাথে সাথে সমস্ত জোয়ানদের মাঝে এক অভূতপূর্ব আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি হয় এবং সবাই উল্লাসে “জয় বাংলা” শ্লোগান দিতে থাকে। আমার কনভয় জয়দেবপুর থেকে বের হবার সাথে সাথে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং আমাদেরকে “জয় বাংলা” শ্লোগান দিয়ে অনুপ্রাণিত করে। তাদের মধ্যে কিছু লোক জানত আমরা কি করছি। যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় লোক আমাদের পরিকল্পনার কিছুটা আভাস পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জনাব আবদুল মোতালেব। তিনি একজন শ্রমিক নেতা ছিলেন এবং আমাদের ব্যাটালিয়নের বাকী লোকদের যাবার জন্য বেসামরিক ট্রাক, বাস, গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন।

টাঙ্গাইলের কাছাকাছি যাবার পর দেখতে পেলাম অপরদিক থেকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত একটা জীপ গাড়ী আসছে। ঐ গাড়ীটা আমাদের কনভয়-এর কাছে এসে দাঁড়ায় এবং আমাদের গাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা দেখে খুশী হয়। তারা বলে যে, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমাদের লোকজন পজিশন নিয়ে আছে। আমরা তাদেরকে খবর দিয়ে আসি, যেন কোন অঘটন না ঘটে। কিছুক্ষণ পর আমরা টাঙ্গাইল শহরে প্রবেশ করি। সেখানে ব্যাণ্ডপার্টিসহ এক উৎফুল্ল জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করে। জনতার এই উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে

আমি খুবই অনুপ্রাণিত হই। কিন্তু মনে মনে শুধু একটা চিন্তা করছিলাম যে, আমি যা করতে চলেছি এ কাজে আমি কি শুধু একা? না আরো কেউ আছে? যদিও একদিকে খুশী ছিলাম, অপরদিকে ভাবনাও কম ছিল না। কারণ আমি জানি আমি যা করতে চলেছি তা যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তাহলে মৃত্যুদণ্ডই সাজা। কিন্তু তবু জনতার উৎফুল্লতা দেখে মনে উৎসাহের সঞ্চার হতো। টাঙ্গাইলে যাবার পর কে একজন আমাকে বললেন যে মেজর জিয়া নামে একজন চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ কথা শুনে আমার সাহস দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বেড়ে যায়। কারণ, তখন আমার মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এ কাজে আমি একা নই।

টাঙ্গাইলের জনগণ আমাদেরকে যেভাবে সাহায্য করেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ্যামুনিশন বোঝাই একটা গাড়ীর অ্যাক্সেল ভেঙ্গে যাবার সাথে সাথেই সে অ্যাক্সেল তারা বদলিয়ে দেয়। আমি আমার সমস্ত সৈন্য এবং যানবাহন নিয়ে টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসে পৌঁছে যাই।

টাঙ্গাইলে আমাদের এক কোম্পানী সৈন্য ছিল, তার কমান্ডার ছিল একজন পাঞ্জাবী অফিসার। টাঙ্গাইল কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে পৌঁছার সাথে সাথেই কোম্পানীর জেসিও আমাকে বলে যে, সে গত রাতে কোম্পানী কমান্ডারকে নিরস্ত্র করে রেখেছে। আমি তখন সমস্ত কোম্পানীকে একত্রিত করে লেঃ মোরশেদকে তাদের কোম্পানী কমান্ডার নিয়োগ করি। আর সমস্ত কোম্পানীকে এই বলি যে তোমরা সবাই ময়মনসিংহে চলে আস এবং ময়মনসিংহ পৌঁছার পর তোমাদের বাকী নির্দেশ দেব। এখন থেকে লেঃ মোরশেদ (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) তোমাদের কোম্পানী কমান্ডার আর তোমাদের কাছ থেকে এ ওয়াদা চাই যে তোমাদের কাছে আমি তোমাদের পুরাতন কোম্পানী কমান্ডারকে আমানত হিসেবে রেখে যাচ্ছি! তোমরা তাকে তোমাদের সাথে নিয়ে আসবে। এবং আমার কাছে ময়মনসিংহ পৌঁছাবে। যেহেতু আমি ময়মনসিংহ যাবার জন্য তাড়াহুড়াতে ছিলাম সেহেতু বেলা দুটোর দিকে আমি ময়মনসিংহ অভিযুক্ত রওনা হই। তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে আসি যে, জয়দেবপুর থেকে লোক না আসার আগে তারা যেন টাঙ্গাইল ত্যাগ না করে।

টাঙ্গাইল থেকে কয়েক মাইল যাবার পর প্রথম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই। এখানে বলে রাখা দরকার, ঢাকার খবর পাবার পরপরই জনসাধারণ টাঙ্গাইল থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত রাস্তার মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখে। প্রথম যে প্রতিবন্ধকতা আমি দেখতে পাই সেটা ছিল একটা কাঠের পুল। জনসাধারণ সেটাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এবং আগুন তখনও জ্বলছিল। পুলটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার কনভয়কে অনেক দূর ঘুরে কোন কোন জায়গাতে নতুন রাস্তা করে যেতে হয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা খুলে অগ্রসর হতে আমার বেশ সময় লেগে যায় এবং রাত প্রায় তিনটায় আমি মুক্তাগাছা পৌঁছি। মুক্তাগাছায়ও টাঙ্গাইলের মত কিছু লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। তারা আমাদের উপর গুলি করার আগেই আমরা তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হই আমরা তাদের শত্রু নই। আমরা বাংলাদেশের সৈনিক। তখন বহু লোক বেরিয়ে আসে এবং রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ঐ রাত আমরা মুক্তাগাছা কলেজে কাটাই। আমাদের সাথে খাবার ছিল না। জনসাধারণ আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে।

ভোর হবার আগেই জয়দেবপুর এবং টাঙ্গাইলের লোকজন মুক্তাগাছায় পৌঁছে। মেজর মইন (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) আমাকে বলে যে সবাই এসে গেছে। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম ব্যাটালিয়ন কমান্ডার কোথায়। উত্তরে বলল সে আসে নাই। আমি জয়দেবপুর থেকে আসার পূর্বোল্লিখিত পরিকল্পনার কিছুটা রদবদল হয়েছিল। তা নিম্নরূপ আমাদের লোকদের জয়দেবপুর থেকে সরিয়ে আনার কথা ছিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। কিন্তু ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পরে মেজর মইনকে বলেছিলেন এ সময় বদলী করে ৮ টা করার জন্য। সময় ছিল বলে ঐ পরিবর্তিত সময় সবাইকে জানানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মত ঠিক করতে পারছিলেন না। সন্ধ্যা সাতটায় মেজর মইনকে আবার বললেন যে সময়টা পরিবর্তন করে সাড়ে সাতটা করে দাও। মেজর মইন তাকে বলেছিলেন যে, এখন আর সবাইকে এই সময় সম্বন্ধে বলার সুযোগ হলো না, তাই এই সময়টা

অপরিবর্তিত থেকে যায়। রাত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। বিদ্যুৎ বন্ধ ছিল। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। রাত ঠিক ৮টায় অয়ারলেস, যেটা অফিসার্স-মেস-এর পূর্বাংশে ছিল, সেখান থেকে একজন পাঞ্জাবী সৈনিক আমাদের একজন সিপাইকে লক্ষ্য করে গুলি করে। এই গুলির আওয়াজের সাথে সাথে চারিদিকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। যেহেতু আমাদের লোক একজন অপরজনের উপর মোতায়ন করা হয়েছিল এবং তারা সজাগ ছিল সেহেতু আমাদের লোকের বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এই গোলাগুলিতে কিছুসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিক মারা যায়। কথামত পৌনে ৮টায় প্যালেসের বাইরে যে জীপ গাড়ী দাঁড়ানো ছিল সে জীপে করে ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের যাবার কথা ছিল। কিন্তু সে সময় তিনি গাড়ীর কাছে না গিয়ে একজন পাঞ্জাবী অফিসারের সাথে অফিসার্স মেস-এর দ্বিতলে ব্যলকনিতে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। তাই হয়ত তিনি ঐ অফিসারের হাত থেকে সরে আসতে পারেননি। অথবা নিজে ইচ্ছে করে আসেন নি। কারণ ঐ সময় তাঁর ঐ জায়গাতে থাকার কথা ছিল না।

গোলাগুলির পর ব্যাটালিয়ন-এর লোকজন সময়মত বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। গাজীপুর থেকে যখন লোক বেরিয়ে আসে তখন পাঞ্জাবী অফিসার বাধা দেওয়াতে তারা তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হয়। জয়দেবপুরের লোক টাঙ্গাইল পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে এক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। গোলযোগের সূত্রপাত এভাবে হয়েছিল যে, জয়দেবপুর থেকে যখন বাঙ্গালী সৈন্যরা বেরিয়ে আসছিল তখন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। এ কথা বলার সাথে সাথে আমি যে অফিসারকে আমানত রেখে গিয়েছিলাম তার উপরে আক্রোশে গুলি চালানো হয় এবং সে মারা যায়।

এ সমস্ত ঘটনার পর আমি দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করলাম যে আমাদেরকে এখন মৃত্যু পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

২৯ শে মার্চ সকালে মুক্তাগাছা থেকে ময়মনসিংহ যাত্রা করি। যদিও দূরত্ব ছিল মাত্র ১০ মাইল তবুও এই পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় তিন ঘন্টা লেগেছিল। ময়মনসিংহ পৌঁছার সাথে সাথে মেজর নুরুল ইসলাম (বর্তমান লেঃ কর্নেল) বলল যে, গতকাল আড়াইটা পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরদের সাথে লড়াই করতে হয়েছে। এ লড়াইয়ে সবাই মারা গেছে, শুধু ছয়জন ছাড়া। আমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

মেজর নুরুল ইসলাম আমাকে ময়মনসিংহের ঘটনার যে বর্ণনা দেন তা উল্লেখ করছি। ২৬ শে মার্চ ময়মনসিংহে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর কোম্পানী ও ইপিআর-এর লোক জনসাধারণ কর্তৃক ঘেরাও হয়েছিল। তখন ইপিআর হেডকোয়ার্টারের পেরিমিটারের বাইরে বাঙ্গালী সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল। তারা জনসাধারণকে সরে যেতে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিল। এতে উইং কমান্ডার (পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার) চালাকি করে বাঙ্গালী ইপিআর লোকদের বলে যে গতকাল তোমরা অনেক কষ্ট করেছ। আজ তোমরা রেস্ট কর। আজকের ডিউটি দেবে অন্য কোম্পানী (সে কোম্পানীটা ছিল সমস্ত পাঞ্জাবীদের)। আজ রাতে তোমাদের আর কোন ডিউটি হবে না। তোমরা হাতিয়ার জমা দিয়ে রেস্ট কর। যেহেতু চারিদিকে একটা থমথমে পরিবেশ ছিল সে কারণে কেউ হাতিয়ার জমা দেয়নি। সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ে। রাত প্রায় ১২টার মধ্যেই পাকিস্তানী ইপিআর-এর সৈনিকরা ইপিআর-এর যত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ছিল তা তারা ছাদের উপর নিয়ে যায় এবং সমস্ত যানবাহন সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায় যাতে যখন সমস্ত গাড়ী স্টার্ট করতে হেড লাইট অন করে তখন যেন সমস্ত আলো ইপিআর-এর বাঙ্গালীর যে ব্যারাকে ঘুমাচ্ছে সে ব্যারাকের উপর পড়ে এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানীর তাঁবুতে পড়ে। রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় তারা টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মেজর নুরুল ইসলাম ও লেঃ মান্নান ইপিআর হেডকোয়ার্টার থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে সি-এও-বি রেস্ট হাউসে ঘুমাচ্ছিলেন। রাত সাড়ে বারোটায় রেস্ট হাউস-এর উপর তাদের কামরা লক্ষ্য করে অটোমেটিক গুলি ছোড়া হয়। প্রথমে তিনি টেলিফোনে কোম্পানীর সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে তিনি এবং লেঃ মান্নান পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে নদীর দিকে চলে যান। এবং সেখান থেকে ময়মনসিংহ শহরে যান। সকাল

না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারেননি। ভোরে যখন যোগাযোগ হয় তখন ভীষণভাবে দুই দলের মধ্যে গোলাগুলি চলছিল। এই গোলাগুলি বেলা দুইটা-আড়াইটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই গোলাগুলিতে ৬ জন পাকিস্তানী ছাড়া আর সবাই মারা যায়। অবশিষ্ট ৬ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে ময়মনসিংহ জেলে রাখা হয়। আমি ময়মনসিংহ পৌঁছার সাথে সাথে এ সমস্ত ঘটনা শুনতে পাই।

২৯ শে মার্চ বিকেল চারটা পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন-এর সমস্ত লোক কনসেন্ট্রেট হয়। রাজেন্দ্রপুর কন্টিনেন্টে রাতে পৌঁছে। আমি ময়মনসিংহে পৌঁছে আমার পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সীমান্ত থেকে সমস্ত ইপিআরকে ময়মনসিংহে এসে কনসেন্ট্রেট হতে অর্ডার দিলাম। তারপর আমি ময়মনসিংহ পুলিশ অয়ারলেসে গিয়ে বাংলাদেশের যত জায়গাতে পুলিশ অয়ারলেস কমিউনিকেশন আছে সবাইকে লক্ষ্য করে এই নির্দেশ দিলাম যে, আমি মেজর সফিউল্লাহ (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। বর্তমানে ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। আপনারা যে যেখানে আছেন, যদি বাঙ্গালী হন, যার কাছে যে অস্ত্র আছে তাই নিয়ে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং দেশকে পাকিস্তানীদের কবল থেকে স্বাধীন করতে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করুন। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেলাম। যে সমস্ত জায়গা থেকে আমি কনফারমেশন পেয়েছি যে তারা অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সেসব জায়গা হল- দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, ফেনী এবং চট্টগ্রাম।

২৯ শে মার্চ বিকেলে জেলা এডমিনিস্ট্রেশন-এর সমস্ত অফিসারবৃন্দ, জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত এম-এন এ এবং এম-পি এদেরকে নিয়ে এক বৈঠক করি। সেই বৈঠকে কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে তার পরিকল্পনা নিই। জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামরিক বাহিনীকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার ভার বেসামরিক প্রশাসন এবং এম-এন ও এম-পি দের উপর ন্যস্ত করা হল। তাঁরা বেশ আগ্রহের সাথে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমার হাতে রাখি। এই বৈঠকে এও সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, যুদ্ধ পরিচালনা করতে হলে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন। এবং সেটা পাবার জন্য আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কাছে আমাদের প্রস্তাব পেশ করা দরকার। তাই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, আমাদের একজন এম-এন-একে দিল্লী পাঠানো হবে আমাদের প্রস্তাব দিয়ে। আমরা এম-এন এ জনাব সৈয়দ আবদুস সুলতানকে বাংলাদেশের দূত হিসেবে দিল্লীতে আমাদের এ প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিই। এ সিদ্ধান্তও নেয়া হল যে তাকে সীমান্তের বাইরে পাঠাবার পূর্বে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করা দরকার যে তারা আমাদের গ্রহণ করবে কিনা। এই মর্মে আমি একজন অফিসারকে (ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান, বর্তমানে মেজর) হালুয়াঘাটে বিএসএফ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পাঠাই। সে ওখানে পৌঁছার পর বি-এস-এফ-এর একজন অফিসার ক্যাপ্টেন বালজিতের সাথে দেখা করে। সেখানে ক্যাপ্টেন ছাড়াও আরো দু'জন অফিসার ছিলেন। একজন লেঃ কর্নেল সিনহা। তিনি ছিলেন ইন্টেলিজেন্স-এর লোক এবং আর একজন ছিলেন সেখানকার বিএসএফ কমান্ড্যান্ট। তাদের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া মেলে। তাঁরা আমাদের সব কিছু দিয়ে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমি সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করি।

৩০ শে মার্চ সকাল পর্যন্ত ইপিআর, পুলিশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং কিছু আংশিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেসামরিক লোকদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তুলি। যার লোকসংখ্যা ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার। ময়মনসিংহে যখন পৌঁছি তখন আমার সাথে অনেক জেসিও এবং নিম্নলিখিত অফিসার ছিলেন : ১। মেজর নুরুল ইসলাম (বর্তমান লেঃ কর্নেল)। ২। মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরি (বর্তমানে লেঃ কর্নেল)। ৩। মেজর নাসিম (বর্তমানে লেঃ কর্নেল)। ৪। ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান (বর্তমানে মেজর)। ৫। ক্যাপ্টেন এজাজ আহমদ চৌধুরী। ৬। লেঃ গোলাম হেলাল মুরশেদ (বর্তমানে ক্যাপ্টেন)। ৭। লেঃ ইবরাহীম। এছাড়া ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (বর্তমানে মেজর) যিনি ময়মনসিংহে ছুটিতে ছিলেন তাকে আমি সাথে নিয়ে নিই। তাকে বলার সাথে সাথে সে আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত কাজী নুরুজ্জামান ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে যোগ

দেন। ময়মনসিংহ থেকে যাবার পথে দুইজন মেডিকেল কলেজের ডাক্তার নিয়ে নিই। তারা হচ্ছে ডাঃ আবদুর রহমান এবং ডাঃ আহমদ আলী।

ময়মনসিংহ পৌঁছে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোথায় কি করছ সে খবর নেওয়ার জন্য আমার অয়ারলেস দিয়ে মনিটরিং করি। এবং যে সমস্ত খবর পাই তন্মধ্যে ২৯শে মার্চের বিকেলের খবর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ দিন ১৪ ডিভিশন-এর হেডকোয়ার্টারের কর্নেল সাদুল্লাহ এবং যশোর বিগ্রেডের বিগ্রেড মেজরের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তার মধ্যে নিম্নলিখিত উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কর্নেল স্টাফ রীতিমত বিগ্রেড মেজরকে গালিগালাজ করে বলছিলেন, “You have been routed by rag-tags. You people have no shame, How could you be routed by unarmed people? You need kick. However, tell your commander, if he needs any help, we will send air sorties. We are in any way sending two air-sorties to Kushtia circuit house. We have been able to tackle Dacca which did not bother us much. We are really concerned about Kushtia now. We have captured 8.E.B.Hq. We are now proceeding towards Radio Station. In the process we have suffered a lot of casualties. Send a c-130 (Transport Aircraft) tomorrow to Chittagong, so that the dead and the wounded can be sent Dacca. If it cannot come then send an “Allwate” (Helicopter) to naval base at 10-30. If c-130 can come then. “Allwate” is not required.” এবং তারা এখন হয়ত ঢাকা থেকে এসব জায়গায় রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠাবে। আমার আরো চিন্তার কারণ হয়ে পড়ে যখন জিওসিএর মেসেজ শুনলাম যে ৮ ইস্ট বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার দখল করা হয়েছে তখন সাথে সাথে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি যে মেজর জিয়া (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) তার দলবল নিয়ে হয়ত ধরা পড়ে গেছে। এমতাবস্থায় সেখানে এমন কোন অফিসার জানামত ছিল না যে নেতৃত্ব দিতে পারবে। আমি তখন এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে অতিশীঘ্র ঢাকা আক্রমণ করা উচিত যেন ঢাকা থেকে কোন রি-ইনফোর্সমেন্ট বাইরে না যেতে পারে।

এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা নিলাম- নর্থ বেঙ্গল থেকে যাতে পাকবাহিনী ময়মনসিংহের দিকে না আসতে পারে সেই জন্য পুলিশ এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেসামরিক সৈনিকদের নিয়ে গঠিত এক কোম্পানী সৈন্য বাহাদুরবাদ ঘাটে পাঠাই। আর কোম্পানী ই-পিআর সিরাজগঞ্জ ঘাটে পাঠাই। এক কোম্পানী ইপিআর এবং আংশিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেসামরিক কোম্পানী গফরগাঁওয়ে পাঠাই। এক কোম্পানী ইপিআর পাঠাই টাঙ্গাইলে। ৩১ শে মার্চের মধ্যেই এরা এ সমস্ত জায়গায় পৌঁছে যায়। এ ছাড়া আরো দুই কোম্পানী লোক (ইপিআর) ঢাকার পশ্চিমাংশ মীরপুর, মোম্বদপুর এবং ঢাকা বিমানবন্দর এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ১লা এপ্রিলের মধ্যে আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়ে পাঠাই। আমি আমার ব্যাটালিয়ান এবং ইপিআর-এর একটি কোম্পানী নিয়ে ঢাকার পূর্বদিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা নিই। এ পরিকল্পনা আমি এ জন্য নিই যে, পাকবাহিনী প্রত্যাশা করছিল যে আমরা যদি তাদেরকে আক্রমণ করি তাহলে পশ্চিমাংশ দিয়ে করব। তাই তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য পূর্বাংশ দিয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা করি। এদিক দিয়ে আসার জন্য আমি যে রাস্তা ব্যবহার করেছিলাম তা ছিলো ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ-ভৈরব-নরসিংদী ট্রেনে। তারপর নরসিংদী থেকে পায়ে হেঁটে ভাংগা দিয়ে শীতলক্ষ্যা পার হয়ে ঢাকায় পূর্বাংশ দিয়ে আক্রমণ করব। এই পরিকল্পনাও যেন ১লা এপ্রিলে বাস্তবায়িত হয় তারও ব্যবস্থা করি।

৩০ শে মার্চ আমি যখন জায়গায় জায়গায় নির্দেশ দিয়ে লোকজন পাঠাচ্ছিলাম তখন গাজীপুর রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার সকাল সাড়ে এগারোটায় টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলেন এবং বলেন যে দু’খানা জেট জঙ্গী বিমান জয়দেবপুরের প্যালেস ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে এবং স্ট্রাফিং করছে। তার প্রায় ১৫ মিনিট পর আবার টেলিফোনে বললেন যে আর একখানা জঙ্গী বিমান জয়দেবপুর প্যালেসে বড় বড় বোমা ফেলছে। তাতে বিকট আওয়াজ হচ্ছে এবং প্রাসাদে আগুন লেগে গেছে। এ সংবাদ শুনে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম এই

ভেবে যে আমরা ঠিক সময় বেরিয়ে পড়তে পেরেছি। আমাদের মনে কোন দ্বিধা রইল না যে আমরা কোন ভুল করিনি। বরং ঠিকই করেছি।

আমরা পূর্বপরিকল্পনা মত লোকজন জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে দিই। আমি আমার বাহিনী নিয়ে ৩০ শে মার্চ ট্রেনযোগে নরসিংদীর দিকে রওয়ানা হই। অল্পসংখ্যক কম্পার্টমেন্টে আমরা এক সাথে সবাই যেতে পারছিলাম না। তাই অল্প অল্প করে গন্তব্যস্থানে পাঠাচ্ছিলাম।

ময়মনসিংহ থেকে চলে আসার পূর্বে আমি জনগণকে আশ্বাস দিলাম যে আমি আমার ব্যাটালিয়ন নিয়ে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে যাচ্ছি। ৩০ শে মার্চ আমি আমার হেডকোয়ার্টার ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ স্থানান্তরিত করি। কিশোরগঞ্জে ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমান মেজর) নামে আর একজন অফিসারের সাথে দেখা হয়। সে তখন বাড়িতে ছিল। তাকে বলার সাথে সাথে সেও আমাদের সাথে যোগ দেয়।

৩১ শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের লোক গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। যারা সর্বপ্রথম রওয়ানা হয়েছিলো ১লা এপ্রিল বিকেল পর্যন্ত ঢাকার পূর্বাঞ্চল বাসাবো, ডেমরা এ সমস্ত স্থানে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। সেদিন আমি কিশোরগঞ্জে অবস্থান করছিলাম। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে একটি খবর আসলো যে মেজর খালেদ মোশাররফ (বর্তমান কর্নেল) ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবডিভিশন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন রেখেছেন এবং তিনি আমার সাথে কথা বলতে চান। আমি যখন তাঁকে আমার পরিকল্পনার কথা বললাম তখন তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যে আমি যেন ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর না হয়ে তার সাথে যোগাযোগ করি। ঐ দিনই আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে চলে যাই। আমার সৈনিকরা যারা ঢাকার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল আমি তাঁদের আর বাধা দিইনি। মেজর খালেদ মোশাররফ কি বলতে চান তা জানার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর সাথে দেখা করতে চাই। আমি যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছি তখন খালেদ সেখানে ছিলেন না। তিনি তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর শাফায়াত জামিল (বর্তমানে লেঃ কর্নেল)-কে মেসেজ দিয়ে পাঠান। এরপর আমি ফিরে আসি। আমি যেদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই সেদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ফেরার পথে দু'খানা জঙ্গী বিমান আমাদের তাড়া করে। বেশ কিছুক্ষণ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে স্ট্রাফিং-এর পরে তিতাস গ্যাস ওয়েল ট্যাঙ্কার-এর উপর বোমাবর্ষণ করে এবং এতে আগুন ধরে যায়। আমাদের সৈনিকরা যারা ভৈরবে ছিল তাদেরকেও জঙ্গী বিমান দুটো খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু না পেয়ে তারা নরসিংদীতেও খোঁজাখুঁজি করে। আমাদের সন্ধান কোথাও পায়নি। দিনটি ছিল ১লা এপ্রিল।

মেজর খালেদ মোশাররফ মেজর শাফায়াত জামিল মারফত আমার নিকট যে মেসেজ পাঠান তা ছিল নিম্নরূপঃ “Do not go towards Dacca. You will be banging your head against wall. We have liberated an area whole of Brahmanbaria Subdivision and a part of Sylhet. Before taking any further action on Dacca, we should jointly liberate this whole area and then go for Dacca. I had already contacted Indian BSF officers and they have agreed to help us. I could not come and meet you today because I am going to meet Brigadier B. C. Panda of BSF who promised me to help us. ”

তার পরিকল্পনা আমার মোটামুটি পছন্দ হলো। কারণ, আমি জানি যে তখন ঢাকাতে পাকিস্তানের যে সমস্ত সৈনিক এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র আছে আমাদের তার ১০ ভাগের এক ভাগও নেই। তাই যাতে আমরা যুক্তভাবে একটা পরিকল্পনা নিতে পারি সেই চিন্তা আমি করছিলাম। এবং আমি এই সিদ্ধান্তে আসি যে, আমাদের এভাবে তাড়াহুড়া করে ঢাকা আক্রমণ করা ঠিক হবে না। আমি তখন আমার অফিসারদের নির্দেশ দেই যে যারা ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে তারা যেন নিম্নরূপ মোতামেন হয়ঃ এক কোম্পানী যেন ঢাকা-নরসিংদী রাস্তা পাহারা দেয়। এক কোম্পানী আশুগঞ্জ আর বাকী লোক যেন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে চলে আসে। ঢাকার পূর্বাংশ ও পশ্চিমাঞ্চলে যে সমস্ত সৈনিক গিয়েছিল তাদের সাথে পাকবাহিনীর ছোট ছোট সংঘর্ষ হয়। আমার সাথে পর্যাপ্ত অয়ারলেস

সেট না থাকায় সবার সাথে যোগাযোগ রাখতে কষ্ট হয়েছিল। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে যারা ছিল তাদের সাথে একমাত্র দূত (রানার) ছাড়া আর কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না।

খালেদ মোশাররফের সাথে আমার যখন দেখা হয় তখন পরিকল্পনা নেয়া হয় যে আমরা যুক্তভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সিলেট এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করব। এই পরিকল্পনাকে আমি বাস্তবায়িত করার জন্য আমার হেডকোয়ার্টার কিশোরগঞ্জ থেকে সিলেটের তেলিয়াপাড়া টি, গার্ডেনে ওরা এপ্রিল স্থানান্তরিত করি। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ বা ভৈরববাজার যাবার সময় আমাদের যানবাহনগুলি নেবার জন্য মালগাড়ীর ওয়ানগনকে ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে কেটে জায়গা করা হয় এবং গাড়ি পার করার ব্যবস্থা করা হয়। ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন থেকে সবাইকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার পর ১৫০০ রাইফেল, প্রায় ২০টা এল-এমজি, কিছুসংখ্যক স্টেনগান আর ৩ লক্ষ এ্যামুনিশন আমি আমার সাথে নিয়ে আসি। আমাদের ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া এই আর্মস এ্যামুনিশন ছিল আমাদের একমাত্র সম্বল।

১লা এপ্রিল আমাদের নিয়ন্ত্রণে যে এলাকা ছিল তা এরূপঃ মেঘনার পশ্চিম পাড়ে নরসিংদী-তারাবো-ঢাকা রাস্তা আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবডিভিশন মেঘনার পূর্বপারে যেখানে আমি আমার সৈনিকদের মোতায়েন করেছিলাম সে জায়গাগুলো হল উত্তরে আজবপুর, তারপর আশুগঞ্জ এবং সবচেয়ে দক্ষিণে লালপুর, উত্তরে সিলেটের শেরপুর, শাদীপুর এবং শেওলা করিমগঞ্জও আমার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পূর্ব এবং দক্ষিণাংশে মেজর (বর্তমান কর্নেল) খালেদ মোশাররফের সৈন্যরা ছিল। যে সব এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল তা ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর, গোকর্ণঘাট, উজানিসার পুল এবং গঙ্গাসাগর। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রেডিওর ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকার রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বেসামরিক যানবাহন, ট্রাক, বাস একত্রিত হয়। এই ট্রাক বাস দ্বারা দুই কলাম ফোর্স তৈরী করা হয় যার এক কলাম ২রা এপ্রিল টাঙ্গাইলের দিকে রওনা হয় এবং আর এক কলাম নরসিংদীর দিকে রওয়ানা হয়। যে কলামে টাঙ্গাইলের দিকে রওয়ানা হয়েছিল আমার টাঙ্গাইলে প্রেরিত কোম্পানী তাদেরকে রাস্তায় এ্যামবুশ করে। এই কলামে প্রায় ১০০টির বেশী গাড়ী ছিল। এ এ্যামবুশ এত সুন্দর হয়েছিল যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বেশকিছু লোক হতাহত হয়। হতাহতের সংখ্যা বলা যাবে না। তবে লোকমুখে শোনা যায় যে আহতদের নিয়ে যাবার জন্য ছয়খানা গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। এই অপারেশনে আমাদেরও কিছু লোক মারা যায়। এই খবর পাই মেসেজের মাধ্যমে। এই পশ্চিমাংশের লোকদের খবরাখবর ততদিন পর্যন্ত পাই, যতদিন তারা মধুপুর জঙ্গল থেকে যুদ্ধ চালাচ্ছিল।

যে কলাম সৈন্য ঢাকা থেকে নরসিংদী রওয়ানা হয়েছিল তারা আমাদের কোম্পানীর দ্বারা নরসিংদী এবং পাঁচদোনার মাঝামাঝি জায়গায় আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে পাকিস্তানের সৈন্যদের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তারা পিছে হটে যেতে বাধ্য হয়। এ ঘটনা ঘটে ২রা এপ্রিল। তারা ঢাকা থেকে বিমান বাহিনীর সাহায্য চায়। যেহেতু বিমান বাহিনী অন্যান্য জায়গায় ব্যস্ত ছিল সেহেতু বিমান বাহিনী সেদিন তাদের সাহায্যে আসতে পারেনি। কিন্তু পরদিন তাদের আর্টিলারি বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমাদের সৈনিকরা যে জায়গাতে ছিল সেই জায়গাতে পাঁচদোনা-নরসিংদীতে ভীষণভাবে আর্টিলারী গোলাবর্ষণ শুরু হয়। আমাদের নিকট দূরপাল্লার কোন অস্ত্রই ছিল না, রাইফেল এবং লাইট মেশিনগান ব্যতীত। তাই আমরা তাদের পাল্টা জবাব দিতে পারিনি। এভাবে তারা ৪৮ ঘন্টা যাবৎ আমাদের উপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ করে। ওরা এপ্রিল আর্টিলারী গোলাবর্ষণ ছাড়াও জঙ্গী বিমান ও আমাদের উপর ব্যাপকভাবে স্ট্রাফিং করে। শত্রুর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ এই ছিল আমাদের প্রথম। সৈনিকরা এ রকম গোলাবর্ষণের সম্মুখীন আর কখনো হয়নি। তাই তারা হতভম্ব হয়ে পেছনে সরে আসে। আমরা বেশকিছু সংখ্যক সৈনিককে ভৈরবে একত্রিত করতে সক্ষম হই এবং পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক ভৈরবের পূর্বাংশে রামপুরা ব্রীজের কাছে মোতায়েন করি-যাতে পাকিস্তানী সৈনিকরা বিনা বাধায় ভৈরব পৌঁছতে না পারে।

৩রা এপ্রিল এই পরিকল্পনা নিই যে, যেহেতু আমাদের সৈন্যদের কম সেহেতু পাকিস্তানী সেনাদের প্রতিরোধ করার জন্য ডিনায়াল প্লান গ্রহণ করি। এর উদ্দেশ্য, রাস্তাঘাট, রেলওয়ে ব্রীজ, রোড ব্রীজ ভেঙ্গে দেয়া যাতে শত্রু অতি সহজে সম্মুখে আসতে না পারে। ডিনায়াল প্লান-এর প্রথম আমরা ভৈরবের কাছে রামপুরের ব্রীজ ভেঙ্গে ফেলি। আর কিশোরগঞ্জের কাছে রোড এবং রেলব্রীজ দুটোই ভেঙ্গে দিই। ভৈরবের ব্রীজ ভাঙ্গারও পরিকল্পনা নিই।

৪ঠা এপ্রিল দেখা হয়ে গেল কর্নেল ওসমানী (বর্তমানে জেনারেল)-এর সাথে আমারই হেডকোয়ার্টারে তেলিয়াপাড়াতে। তিনি আগরতলা থেকে তেলিয়াপাড়াতে আসেন। আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি যে তিনিই সেই ওসমানী যাকে আমি ভালোভাবে চিনতাম। আমি তাকে চিনতে পারিনি এই জন্যে যে আত্মগোপন করার জন্য গোঁফ কেটে রেখেছিলেন। ঐ দিনই আমি খবর পেলাম যে জিয়াউর রহমান (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) চট্টগ্রাম থেকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমার কাছে আসছেন।

একটা কথা বলা দরকার, ৪ঠা এপ্রিল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মস্ত বড় দিন। সেদিন আমার হেডকোয়ার্টারে অনেক সিনিয়র অফিসার একত্রিত হয়েছিলেন। যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেনঃ ১। কর্নেল ওসমানী (বর্তমানে জেনারেল, বিমান ও নৌযান মন্ত্রী), ২। মেজর জিয়াউর রহমান (বিগ্রেডিয়ার), ৩। মেজর খালেদ মোশাররফ (কর্নেল), ৪। লেঃ কর্নেল সালাউদ্দিন মোঃ রাজা (রিটার্ডার্ড কর্নেল), ৫। মেজর কাজী নুরুজ্জামান (রিটার্ডার্ড লেঃ কর্নেল), ৬। মেজর নুরুল ইসলাম (লেঃ কর্নেল), ৭। মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী (লেঃ কর্নেল), ৮। লেঃ কর্নেল আবদুর রব (রিটার্ডার্ড মেজর জেনারেল, বর্তমানে এম-পি) এবং অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন আমরা কর্নেল ওসমানীকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। তিনি সে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। It was decided that day, that the operation for liberation war to be conducted under one command and the commander being colonel M.A.G. Osmany (now rtd. General osmany).

ঐ দিন আমরা কর্নেল ওসমানীকে এই অনুরোধ করি যে যত শীঘ্র হোক রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা যেন সরকার গঠন করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার গঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোন বৈদেশিক সাহায্য পাব না। ঐ দিন অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে এটাও সাব্যস্ত হল যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট এলাকার যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমার উপর ন্যস্ত থাকবে। কুমিল্লা-নোয়াখালী এলাকার যুদ্ধ পরিচালনার যুদ্ধ পরিচালনার ভার মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফের উপর ন্যস্ত করা হয়। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধ পরিচালনার ভার ছিল মেজর (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) জিয়াউর রহমানের উপর। এই সিদ্ধান্তের পর আমরা যার যার এলাকার সৈন্য মোতায়েন করি।

৪ঠা এপ্রিল আমার বাহিনী নিম্নলিখিত এলাকায় নিযুক্ত থাকেঃ প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য নরসিংদীতে, এক কোম্পানী আজবপুরে, এক কোম্পানী আশুগঞ্জে, এক কোম্পানী লালপুরে, এক কোম্পানী সিলেটের শেরপুরে ও শাদিপুরে, এক কোম্পানী সরাইলে (এই কোম্পানী আমার রিজার্ভ কোম্পানী ছিল)। তাদের উপর দুটো টাস্ক দেয়া হয়েছিল। প্রথম টাস্ক হল, যদি দরকার হয় ঢাকার দিক থেকে পাকসৈন্যরা আক্রমণ বৃদ্ধি পেলে লালপুর এবং আশুগঞ্জে যেসব সৈনিক আছে তাদের সাহায্যার্থে তালশহর এবং গোকনঘাট এলাকায় সৈন্য মোতায়েন করবে। দ্বিতীয় টাস্ক হল, যদি সিলেটের দিকে পাক সেনাবাহিনীর আক্রমণ বৃদ্ধি পায় তাহলে শেরপুরে সৈন্যদের সাহায্যার্থে যেন মৌলভীবাজারে সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়। এসব কোম্পানী ছাড়াও মেজর (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) জিয়াউর রহমানের অনুরোধে চট্টগ্রামের সৈনিকদের রি-ইনফোর্সমেন্ট-এর জন্য আমাকে এক কোম্পানী সৈন্য তাকে দিতে হয়। ৫ই এপ্রিল তারা আমার কাছ থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। এবং সে কোম্পানীর অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন এজাজ চৌধুরী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে যে রাস্তা কুমিল্লার দিকে চলে গেছে সে রাস্তার উপর নজর রাখার ভার ছিল মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশারফের উপর। তিনি সে দায়িত্ব পালন করার জন্য উজানিসা পুলের নিকট এক কোম্পানী, গংগা সাগরে এক কোম্পানী এবং গোকনঘাটে এক কোম্পানী সৈন্য মোতায়েন করেন।

যেহেতু আমার সুদক্ষ সৈনিকের অভাব ছিল সেহেতু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, প্রাক্তন ইপিআর, পুলিশ এবং আংশিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেসামরিক লোক নিয়ে এই সমস্ত কোম্পানী পুনর্গঠন করা হয়।

সৈন্যসংখ্যা আমাদের কম থাকায় ৪ঠা এপ্রিল থেকেই আমি আমার হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়াতে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলি। ঐ ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ যুবক ট্রেনিং নিচ্ছিল। অল্প সংখ্যক অফিসার এবং ইনস্ট্রাকটর নিয়ে আমি এই ট্রেনিং শুরু করি। আমার যে সমস্ত অফিসার ছিল তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব কোম্পানী নিয়ে ৪ঠা এপ্রিল নিম্নলিখিত জায়গাতে মোতায়েন ছিলঃ ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান নরসিংদীতে, ক্যাপ্টেন নাসিম আশুগঞ্জ, লেঃ মুরশেদ লালপুরে, ক্যাপ্টেন মতিন সরাইলে, ক্যাপ্টেন আজিজ শেরপুর কাদিপুর্নে, ক্যাপ্টেন এজাজ চৌধুরী চট্টগ্রাম অভিমুখে, মেজর মইন তেলিয়াপাড়াতে তার কোম্পানীর সাথে, মেজর নুরুল ইসলাম ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এবং লেঃ ইব্রাহীম আমার হেডকোয়ার্টারে স্টাফ অফিসার হিসেবে। ৫ ই এপ্রিল ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান আমার সাথে যোগ দেয়। (নুরুজ্জামান যোগ দিয়ে তার পরিবারকে আনার জন্য রায়পুরাতে চলে যায় এবং ২৬শে জুন পুনরায় যোগদান করে।)

আমাকে সিলেট থেকে ভৈরব এবং নরসিংদী পর্যন্ত সৈনিকদের তত্ত্বাবধান করতে হত। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, জয়দেবপুর থেকে যেদিন আমরা বেরিয়ে এসেছি ঐদিন থেকে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তা করতে হয়নি। কারণ, আমরা যখন যেখানেই ছিলাম ঐ জায়গার জনসাধারণ আমাদের খাবার ব্যবস্থা করত। তাই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তা করতে হয়নি। যাঁরা আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ নরসিংদীতে মিজানুর রহমান (একজন স'মিল ম্যানেজার), আশুগঞ্জে মোঃ শফিউদ্দীন, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে প্রাক্তন এমপিএ সাদু মিঞা, এবং সিলেটের সাবু চৌধুরী ও মোহাম্মদ আলকাস মিঞা।

৪ঠা এপ্রিল আমি সিলেট অভিমুখে যাত্রা করি আমার যে কোম্পানী সৈন্য শেরপুর, শাদিপুর্নে পাঠিয়েছি তাদের যুদ্ধের পরিকল্পনা দেবার জন্য। মৌলভীবাজার গিয়ে মেজর (বর্তমানে কর্নেল) চিত্তরঞ্জন দত্তের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে মেজর দত্ত এমএনএ মানিক চৌধুরী, কিছুসংখ্যক প্রাক্তন ইপিআর এবং আংশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বেসামরিক লোকজনকে নিয়ে এক বাহিনী গঠন করেন। আমি মৌলভীবাজারে গিয়ে তাদের কাছে আমার মনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। আমার সৈনিক এবং তাদের গঠিত বাহিনী নিয়ে সিলেট জেলাকে শত্রুমুক্ত করার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করি। সিলেটে তখন এক ব্যাটালিয়নেরও বেশী সৈন্য ছিল। আমার কাছে তখন আমার নিজস্ব এক কোম্পানী সৈনিক এবং কর্নেল দত্তের দ্বারা গঠিত আরো প্রায় দুই কোম্পানী সৈনিক ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের নিকট যে সৈন্য রয়েছে তাদের দ্বারা সিলেট শত্রুমুক্ত করতে হলে আমাদের দুই পর্যায়ে এই আক্রমণ চালাতে হবে। প্রথম পর্যায়ে সুরমা নদীর দক্ষিণাঞ্চলকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সুরমা নদীর উত্তরাঞ্চল মুক্ত করা।

এই প্রথম পর্যায় সম্পন্ন করার জন্য পাকিস্তানী যত সৈনিক সুরমা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে ছিল তাদের পরাজিত করতে তিনদিক থেকে আক্রমণ শুরু করি। এক কোম্পানী শেরপুর থেকে সিলেটের দিকে প্রধান সড়ক দিয়ে সিলেট অভিমুখে অগ্রসর হয়। এক কোম্পানী ফেঞ্চুগঞ্জ হয়ে রেললাইন ধরে অগ্রসর হয়, আর এক কোম্পানী শেওলা করিমগঞ্জের দিক থেকে সুরমা নদীর দক্ষিণ পার হয়ে সিলেটের দিকে অগ্রসর হয়।

এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখে সুরমা নদীর দক্ষিণ পারে এক খণ্ডযুদ্ধে পাকবাহিনী পরাজিত হয় এবং তারা পলায়ন করে শালুটিকার বিমান ঘাঁটিতে একত্রিত হয়। ৫ই এপ্রিল সুরমা নদীর সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং সুরমা

নদীর উত্তরে সিলেট শহর শত্রুমুক্ত হয়ে আমাদের হস্তগত হয়। প্রাক্তন ইপিআর-এর কিছুসংখ্যক লোক যারা সুনামগঞ্জে ছিলেন তারাও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সিলেটের দিকে অগ্রসর হয়। ঐ দিন পর্যন্ত আমাদের আয়ত্তাধীনে যে সমস্ত এলাকা ছিল তা হল : সমস্ত সুরমা নদীর দক্ষিণে এবং পশ্চিমে সমস্ত অঞ্চল, সিলেট শহর এবং খাদিমনগর। আমাদের কাছে সৈন্য ছিল মাত্র ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানী এবং প্রাক্তন ইপিআর-এর তিন কোম্পানী, যারা সমস্ত এলাকাকে ঘিরে রাখে। পাকিস্তানের যে সৈনিক ছিল তারা এক ব্যাটালিয়নেরও বেশী। তারা শালুটিকার বিমান ঘাঁটিতে একত্রিত হয়েছিল। পাকিস্তানীদের কাছে আধুনিক, মারাত্মক এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল। যে ব্যাটালিয়ন সেখানে ছিল সেটা হল ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট।

প্রথম পর্যায় শেষ করার পর আমি আমার সৈনিকদের নির্দেশ দিই, যে-এলাকা এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেখানে যেন শত্রুরা ব্যুহ ভেদ না করতে পারে। সে জন্য সজাগ দৃষ্টি রেখে সে এলাকাকে সুরক্ষিত রাখতে বলি। দ্বিতীয় পর্যায় অপারেশন আমি সাথে সাথে শুরু করতে পারছিলাম না, এজন্য যে, শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাই সবাইকে পরিখা খনন করে বৃহ প্রস্তুত করতে বলি।

পাক সৈনিকরাও তখন বেশ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ছিল। তাদের মনোবলও লোপ পেয়েছিল। আত্মসমর্পণের ইচ্ছা থাকলেও তাদের মনে আশংকা ছিল যে, আত্মসমর্পণ করলে তাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে। তাই আত্মরক্ষার জন্য তারাও চারিপার্শ্বে পরিখা খনন করে ব্যুহ তৈরী করল। আমি তখন চিন্তা করছিলাম যে অন্য কোথাও থেকে এখানে সৈন্য আনা যায় কিনা। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আশুগঞ্জ থেকে কোন সৈন্য সরাতে পারছিলাম না এইজন্য যে তখন নরসিংদীতে লড়াই চলছিল। পাকিস্তানীরাও তখন নীরব থাকেনি। তারা পিআইএ ফোকার ফ্রেণ্ডশীপ এবং সি-১৩০ বিমানের সাহায্যে সিলেটে রি-ইনপোর্সমেন্ট শুরু করে। আমাদের শুধু সৈন্যই কম ছিল না, অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব ছিল যথেষ্ট। আরো অধিক সৈন্য কিভাবে যোগাড় করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য মৌলভীবাজারে মেজর দত্ত (বর্তমানে কর্নেল দত্ত) এবং এমএনএ মানিক চৌধুরীর সংগে মিলিত হই। এই সাক্ষাৎকার ঘটে ৮ই এপ্রিল। ঐ দিন শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শত্রুকে খোঁকা দেওয়ার জন্য বেশকিছুসংখ্যক বেসামরিক লোককে একত্রিত করে পাকিস্তানীদের ব্যুহের পশ্চিমাংশ দিয়ে মহড়া দেখানো বা শো করানো যেন এই সুযোগে খাদিমনগরের দিক থেকে (পূর্ব দিক থেকে) জঙ্গলের ভিতর দিয়ে শালুটিকার বিমান ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাতে পারি। এ সমস্ত লোক একত্রিত করার দায়িত্ব নেন এমএনএ মানিক চৌধুরী। ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত লোক যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অন্যদিকে পাকিস্তানী রি-ইনফোর্সমেন্ট বেশ হয়ে যায় এবং ৯ই এপ্রিল দিবাগত রাত্রে পাকিস্তানীরা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে সারারাত লড়াই চলে এবং অবশেষে আমরা পিছনে হটেতে বাধ্য হই। এ লড়াইয়ে আমাদের দুজন সৈনিক শহীদ হন এবং পাঁচজন আহত হন। যারা শহীদ হয়েছেন তারা হলেন হাওলাদার কাজী মোসলেহউদ্দীন ও ল্যান্সনায়ক আবদুর রহমান। শত্রুপক্ষেরও বেশ হতাহত হয়। তাদের দূরপাল্লার কামানের গোলার মুখে আমরা টিকতে পারছিলাম না। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানও আমাদের উপর আক্রমণ চালায়।

সেখান থেকে আমরা পিছু হটে আবার শেরপুরে ব্যুহ নির্মান করি এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনার জন্য আবার মৌলভীবাজারে মিলিত হই। ঐদিন কর্নেল ওসমানী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল), মেজর কাজী নূরুজ্জামানও (অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল) মৌলভীবাজারে উপস্থিত হন। যেহেতু আমাকে সিলেট ও নরসিংদীতে যুদ্ধের পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান করতে হয়েছিল এবং নরসিংদীতে যুদ্ধ চলছিল সেহেতু মেজর কাজী নূরুজ্জামান এবং মেজর চিত্তরঞ্জন দত্তকে সিলেটের যুদ্ধের পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। মেজর নূরুজ্জামান সিনিয়র হওয়াতে তাকে অধিনায়ক করা হয়। যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধের জন্য আমি সিলেট নিয়েছিলাম তাদেরকে রেখে আসি। ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে এক কোম্পানী সৈন্য সিলেট এবং এক কোম্পানী সৈন্য চিটাগাং পাঠাবার পর আমার নিকট মাত্র ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানী সৈন্য থেকে যায়। তাদের দ্বারা আমাদের ঢাকা থেকে অগ্রসরমান এক ব্রিগেড পাকিস্তানী সৈন্যের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল।

আমি এই দুই কোম্পানী সৈন্য প্রাক্তন ইপিআর এবং আংশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বেসামরিক জনগণ দ্বারা এক ব্যাটালিয়নের মত সৈন্য আবার তৈরি করি। তাদের দ্বারাই আমি পাকিস্তানী সৈনিকদের মোকাবেলা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। এবং আজবপুর, ভৈরব, আশুগঞ্জ, লালপুর এবং গোকনঘাটে এক ব্যুহ তৈরি এবং শত্রুদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকি।

১১ই এপ্রিল থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ভৈরব এলাকায় পাকবাহিনী হেলিকপ্টার এবং জঙ্গী বিমানের সাহায্যে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। আমাদের নিকট কোন বিমানবিক্ষেপী কামান ছিল না বলে এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারিনি। পাকসেনাদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়াতে ১৩ই এপ্রিল আমি কিছুসংখ্যক যুবককে ট্রেনিং দিয়ে ভৈরব, আশুগঞ্জের দিকে পাঠাই যেন মেঘনা নদীর পূর্বপারের এলাকাগুলোতে আমরা বেশ শক্তিশালী থাকতে পারি। ঐ সমস্ত ছেলেরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পাক বাহিনীর জংগী বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে দুজন তরুণ শহীদ হয়। এর মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সৈনিক ছিলেন। তার নাম সিপাই মোহাম্মদ মোহসীন। ট্রেনিং প্রাপ্ত যে ছেলেটি শহীদ হয় তার নাম জানা নেই। ঐ দিন আমাদের অপারেশনাল কো-অর্ডিনেশনের জন্য মৌলভীবাজার যেতে হয়। আক্রমণের কথা শুনে আমি মৌলভীবাজার থেকে ১৩/১৪ই এপ্রিল রাত দুটোর সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে ভোরে প্রায় ৫টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে সেদিন কর্নেল রেজা ছিলেন। পাকবাহিনীর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়াতে আমি সরাইলে যে রিজার্ভ কোম্পানীকে রেখেছিলাম তিনি সেই কোম্পানীকে লালপুরে আমাদের লোকদের সাহায্যার্থে পাঠান। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছে এ খবর পাই যে সরাইলে আমার যে রিজার্ভ কোম্পানী ছিল, তারা লালপুর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে। অয়ারলেস সেট না থাকাতে যোগাযোগ রক্ষা করা আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর হচ্ছিল। কারণ, করো সাথে কিছু বলতে হলে আমাকে রানার দ্বারা অথবা নিজে গিয়ে যোগাযোগ করতে হত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই রিজার্ভ কোম্পানীকে ইচ্ছা থাকলেও ফিরিয়ে আনতে পারিনি। সরাইলে তাদের রাখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, যুদ্ধ যদি ব্যাপক আকার ধারণ করে তাহলে তারা যেন তালশহর ও গোকনঘাট এলাকায় ব্যুহ রচনা করতে পারে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শত্রু যদি মেঘনা নদীর পূর্বপারে আমরা যে ব্যুহ তৈরী করেছি সেটা ভেদ করে তা হলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছার পূর্বে তাদের যেন বাধা দিতে পারি। তাছাড়া মেঘনা নদীর পূর্বপারে আমার যেসব সৈন্য মোতায়েন আছে তাদের সাহায্যে যেন তারা আসতে পারে। এই রিজার্ভ কোম্পানী লালপুরে চলে যাওয়াতে আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

১৪ই এপ্রিল সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনে গিয়ে কিভাবে তাঁদের ফিরিয়ে আনা যায় সেই পরিকল্পনা করছিলাম। এমন সময় প্রায় সকাল সাড়ে পাঁচটায় পাক সেনাবাহিনী আমার বাহিনীর উপর ভীষণভাবে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈনিক রেল লাইন ঘেঁষে ভৈরবের দিকে অগ্রসর হয়। এক ব্যাটালিয়ন সৈনিক আইড্রিটিএ'এলসিটি এবং মোটর লঞ্চার সাহায্যে মেঘনা নদী দিয়ে লালপুরের দিকে অগ্রসর হয়। ঠিক এই সময় নরসিংদীর নিকটবর্তী কোন এক জায়গা থেকে দূরপাল্লার কামান দ্বারা লালপুর, আশুগঞ্জ এবং ভৈরবে ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, ছয়খানা এফ-৮৬ জঙ্গী বিমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আশুগঞ্জ, ভৈরব এবং লালপুর প্রভৃতি জায়গাগুলোতে ভীষণভাবে আক্রমণ করে এবং সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে দুপুর সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ক্রমাগত ছয় ঘণ্টা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। যখন জংগী বিমানের আক্রমণ চলছিল তখন ছয়খানা হেলিকপ্টার দ্বারা কয়েকবার তারা নরসিংদী থেকে প্রায় দুই কোম্পানী কমান্ডার আমাদের পিছনে মেঘনার পূর্ব পারে অবতরণ করায়। যুদ্ধ তখন তুমুলভাবে বেধে যায়। এই যুদ্ধে আমাদের নিকট কোন দূরপাল্লার কামান বা ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমানবিক্ষেপী কামান না থাকায় আমাদের সৈনিকদের মনোবল বেশ ভেংগে যায়। কারণ আমরা চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হই। এভাবে বেলা প্রায় ১২টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। এবং আমার সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের একত্রিত করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যেহেতু আমার নিকট কোন রিজার্ভ ফোর্স ছিল না, তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার

নিকটবর্তী শাহবাজপুরে একত্রিত করি। শাহবাজপুর এলাকাটা প্রতিরক্ষার জন্য উপযোগী না হওয়ায় আমি সিলেটের মাধবপুরে আমার প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ করতে শুরু করি। আশুগঞ্জের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ সুবেদার সিরাজুল ইসলাম, ল্যান্স-নায়ক আব্দুল হাই, সিপাহী কফিলউদ্দীন, সিপাহী আব্দুর রহমান সরকার।

১৪/১৫ই এপ্রিল রাত প্রায় দুটায় শাহবাজপুরে তিতাস নদীর উপরে যে পুল ছিল তা ভেংগে দিই এবং তিতাস নদীর পূর্ব পারে শাহবাজপুরের কাছে একটা ব্যূহ নির্মাণ করি। যদিও ১৪ই এপ্রিল আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে দিতে হয়েছিল কিন্তু তবুও পাকিস্তানী সৈনিকরা দুই দিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ঢোকেনি। এ দুদিন তারা অনবরত ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গোলাবর্ষণ করেছে। তারপর তারা আস্তে আস্তে শাহবাজপুরের দিকে অগ্রসর হয়। শাহবাজপুর দখল করার জন্য তারা স্থল এবং জল উভয় পথে আসে। ২১শে এপ্রিল তারা শাহবাজপুর দখল করে। যেদিন তারা শাহবাজপুর দখল করে সেদিন তারা আমাদের অবস্থানের উপর বেরোয়াভাবে দূরপাল্লার কামার দিয়ে এবং জঙ্গী বিমান দিয়ে গোলাগুলি করে। আমাদের কাছে বিমান আক্রমণ প্রতিহত করার কোন অস্ত্র না থাকায় এবং পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানের আক্রমণে আমাদের সৈনিকরা এতই আতঙ্কিত হয়েছিল যে তারা বিমান দেখলেই ভয় পেয়ে যেত।

পাক সৈন্যের শাহবাজপুর দখল করার সাথে সাথে আমি শাহবাজপুর থেকে তেলিয়াপাড়া পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য বেশ কিছুসংখ্যক পুল ভেংগে ফেলি। আমরা মাধবপুর বেশ বড় রকমের ব্যূহ তৈরী করি। মাধবপুর দখল করার জন্য পাকবাহিনী আমাদের উপর কয়েকবার আক্রমণ করে এবং শেষ পর্যন্ত ২৮শে এপ্রিল বেলা পাঁচটায় মাধবপুর দখল করে নেয়। এই আক্রমণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য মোতায়েন করে। লড়াই সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়। পাক সেনাবাহিনী মাধবপুর আক্রমণের জন্য দূরপাল্লার ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে এবং যে গোলাবারুদ তারা ব্যবহার করে, তা ছিল হাই এক্সপ্লোসিভ এবং আগ্নেয় ধরনের। কাজেই সেখানে তাদের গোলা এসে পড়ত সেখানেই আগুন লেগে যেত। পরিখা এবং বাংকার তৈরী করে আমরা যে ব্যূহ তৈরী করেছিলাম সেটাও ছিল বেশ মজবুত। কিন্তু আমাদের সাথে রাইফেল, এলএমজি এবং মেশিনগান ছাড়া আর কোন ভারী অস্ত্র ছিল না। বেলা প্রায় ১২টার মধ্যে আমাদের অবস্থানের চার দিকে শুধু আগুন জ্বলছিল। তবুও আমাদের জোয়ানরা কেউই তাদের ট্রেন্ডে এবং বাংকার ছেড়ে যায়নি। বাংকার এবং ট্রেন্ডে বসে শত্রু নিপাত করছিল। বেলা প্রায় সাড়ে বারটায় পাকিস্তানী সৈনিকরা মাধবপুর দখল করার জন্য আমাদের অবস্থানের দিকে দলে দলে অগ্রসর হয় এবং ভীষণ যুদ্ধ বেধে যায়। আমাদের মেশিনগান, এলএমজি, রাইফেল তাদের অগ্রসর হতে দিচ্ছিল না। তাদের যে দলই সামনে অগ্রসর হচ্ছিল সে দলটিকেই গুলি করে ভুলুপ্তি করা হচ্ছিল। মাধবপুরে যখন এভাবে মুখোমুখি যুদ্ধ চলছিল তখন আমি মাধবপুরে পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে অপর একটি ছোট সৈনিক দলকে লেঃ মুরশেদের নেতৃত্বে পাঠাই যাতে সে তাদের পিছন দিয়ে আক্রমণ করতে পারে। তার আক্রমণও বেশ ফলপ্রসূ হয়। সারাদিন যুদ্ধ করার পর আমাদের গোলাবারুদ প্রায় ফুরিয়ে যায়। এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের এক অংশের সৈনিকদের গোলাবারুদ এবোবোরেই ফুরিয়ে যায়। অয়ারলেস যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকায় তাদেরকে গোলাবারুদ পাঠানো সম্ভব হয় নাই, এমনকি তারাও কোন খবর দিতে পারেনি। এখানে একটা বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল। যখন আমাদের সৈনিকদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায়, ঐ মুহূর্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যারা ঐদিকে অগ্রসর হচ্ছিল তাদেরও গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায়। কারণ আমাদের সৈনিকদের যখন গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায় তখন তারা অবস্থান ছেড়ে পিছিয়ে আসে। অনুরূপ পাকবাহিনীও যারা আমাদের বাহিনীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তারাও গোলাগুলি না করে পিছনের দিকে চলে যায়।

এই অবস্থান সুরক্ষিত না থাকায় পরমুহূর্তে পাকবাহিনীর কিছু সৈনিক আমাদের ব্যূহের ভিতর ঢুকে পড়ে। এতে আমাদের অবস্থান রক্ষা করা আমাদের জন্যে বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। এখানে রীতিমতো হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। অবশেষে আমি তাদের হুকুম দিতে বাধ্য হই কারা যেন পেছনে চলে আসে। এই যুদ্ধে যারা অসীম সাহসের

পরিচয় দিয়েছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ ১। ক্যাপ্টেন নাসিম (বর্তমানে লেঃ কর্নেল), ২। ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমানে মেজর). ৩। সুবেদার করিম (বর্তমানে সুবেদার মেজর), ৪। হাবিলদার এরশাদ, ৫। সিপাহী সোলেমান, ৬। সিপাহী মান্নান, ৭। সিপাহী খায়ের (শহীদ)।

এই যুদ্ধে আমার অনুমান পাকিস্তানী সৈনিক খুব কম হলেও ২৭০ থেকে ৩০০ জন হতাহত হয়েছিল। মাধবপুরের যুদ্ধে সিপাহী খারে এবং সিপাহী শাহজাহান শাহাদত বরণ করেন। তাছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক আহত হয়। মাধবপুর থেকে সরিয়ে আমি তাদের সিলেটের মনতলাতে নিয়ে আসি এবং নতুন করে আবার ব্যুহ তৈরী করার নির্দেশ দিই।

মাধবপুরের যুদ্ধের পর যেসব এলাকা আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল সেগুলো হল, উত্তরে শ্রীমঙ্গল, শায়েস্তাগঞ্জ এবং দক্ষিণে তেলিয়াপাড়া, মুকুন্দপুর, সিঙ্গারবিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকার দিক থেকে শাহবাজপুর এবং মাধবপুরের দিকে আসছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল যত শীঘ্র হোক সিলেটের সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ করা। তাই তারা মরিয়া হয়ে সিলেট হাইওয়ে ও ব্রাহ্মবাড়িয়া-সিলেট হাইওয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

আমাদেরও চেষ্টা ছিল যাতে করে তারা এ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে। তাই সিঙ্গারবিল থেকে শাহজিজার পর্যন্ত এক প্রতিরক্ষাব্যুহ নির্মাণ করি। পাকিস্তানীরা কেবলমাত্র ঢাকা থেকে সৈন্য এনে সিলেটের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল না, তারা কুমিল্লার দিক থেকেও ব্রাহ্মবাড়িয়া ও সিলেটের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে। কুমিল্লার দিক থেকে যে সমস্ত সৈন্য অগ্রসর হচ্ছিল তাদের বাধা দেওয়ার জন্য মেজর খালেদ মোশাররফ কুমিল্লা-ব্রাহ্মবাড়িয়া হাইওয়ে এবং কুমিল্লা-ব্রাহ্মবাড়িয়া রেলওয়ে লাইনের উপর নিম্নলিখিত জায়গায় পুল ভেঙ্গে দিয়ে সৈন্য মোতায়েন করে, যাতে পাকিস্তানী সৈনিকরা বিনা বাধায় অগ্রসর হতে না পারে। যে সব পুল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো হলঃ উজানিসার হাইওয়ে ব্রীজ, গঙ্গাসাগর এবং আখাউড়া রেলওয়ে ব্রীজ।

আমরা নিম্নলিখিত কারণে পাকিস্তানী সৈনিকদের অগ্রগতি রোধ করতে পারছিলাম না : আমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল কম। তাছাড়া আমাদেরকে এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরক্ষাব্যুহ তৈরী করে পাকিস্তানী সৈনিকদের বাধা দিতে হচ্ছিল। অপরদিকে পাকিস্তানী সৈনিকরা এক জায়গায় কনসেন্ট্রেটেড ছিল এবং তাদের সৈন্যসংখ্যাও বেশী ছিল। ফলে আমাদের পক্ষেও অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাদের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। শুধু তাদের সৈন্যসংখ্যাই বেশী ছিল না, তাদের বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। যেহেতু আমরা সিলেট হাইওয়ের উপর তেলিয়াপাড়াতে প্রতিরক্ষাব্যুহ তৈরী করে রেখেছিলাম সেহেতু পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ ব্যুহ ভেদ করে অগ্রসর হবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল। কারণ সিলেটে অগ্রসর হতে হলে ঐ প্রতিরক্ষাব্যুহ ভেদ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

শেরপুর এবং শাদিপুর আমাদের যে ব্যুহ ছিল সেগুলোর পতন হয় ২৪শে এপ্রিল তারিখে। এই যুদ্ধে পাকিস্তানীরা প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্যসিলেটের রি দিক থেকে মোতায়েন করে। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য ছাড়াও তাদের জঙ্গী বিমানও বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে পাকিস্তানীদের বেশসংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল ক্যাপ্টেন আজিজ (বর্তমানে মেজর)। যুদ্ধ চলাকালে ক্যাপ্টেন আজিজ জেট জঙ্গী বিমানের গুলিতে আহত হয়। আমাদের যারা শহীদ হয়েছিলেন, তারা ল্যান্স নায়েক আবদুল হাই, সিপাহী মোহসীন, সিপাহী শাহাদত হোসেন, নায়েক সুরত আলী, সিপাহী রহিসউদ্দিন মোল্লা, মোজাহিদ সুরদন নমসুদ্র।

শেরপুর-শাদিপুর পতনের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সিলেটে আমাদের সৈন্যসংখ্যা পর্যাণ্ড ছিল না। তাই তারা অতি সহজে এবং শীঘ্রই সিলেটের দিক থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে।

তেলিয়াপাড়া তখনও আমাদের অধীন ছিল। পাকবাহিনী তেলিয়াপাড়াকে বাইপাস করে শাহজিবাজারের শায়েস্তাগঞ্জের দিকে চলে যায় এবং সিলেট থেকে আরো অগ্রসরমান পাকসেনাদের শ্রীমংগলে এসে যোগাযোগ করে। তখন থেকে ঢাকা-সিলেট থেকে আরো অগ্রসরমান পাকসেনাদের শ্রীমংগলে এসে যোগাযোগ হয়। তখন থেকে ঢাকা-সিলেট রাস্তা তাদের নিয়ন্ত্রণধীনে চলে যায়। কিন্তু তেলিয়াপাড়া আমাদের নিয়ন্ত্রণধীনে থাকায় পাকবাহিনী সহজে চলাফেরা করতে পারত না। কেননা তেলিয়াপাড়া থেকে চুনারুঘাট পর্যন্ত চা বাগানের ভিতর দিয়ে যে হাইওয়েটা চলে গিয়েছিল সেটা তাদের মরণ ফাঁদ ছিল। প্রায় প্রত্যেক দিনই পাকিস্তানী সেনারা এ্যামবুশের সম্মুখীন হতো এবং তারা বেশ হতাহত হতো।

সিলেট হাইওয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণধীনে থাকা পর্যন্ত আমরা যেভাবে যুদ্ধ করেছিলাম সেটা ছিল প্রথাগত যুদ্ধ। কিন্তু সিলেট হাইওয়ে পতনের পর আমাদের যুদ্ধের পদ্ধতি বদলিয়ে ফেলে গেরিলা ওয়ারফেয়ার শুরু করি। কিন্তু কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার একবারে বাদ দিয়ে দিইনি। তবে এখন থেকে আমাদের যুদ্ধের প্রধান পদ্ধতি ছিল গেরিলা ওয়ারফেয়ার। আমরা যে সমস্ত ক্যাম্প খুলেছিলাম তা ছিল প্রধানত গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য। তাছাড়া কিছুসংখ্যক ট্রেনিং ক্যাম্প কনভেনশনাল পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যে সমস্ত ক্যাম্প খোলা হয়েছিল সেগুলোতে আমাদের ইন্সট্রাক্টর ছাড়াও বন্ধুরাষ্ট্র ভারত থেকে আমরা বেশকিছুসংখ্যক ইন্সট্রাক্টর পেয়েছিলাম। কিন্তু যে সমস্ত ট্রেনিং ক্যাম্পে কনভেনশনাল যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো সে ক্যাম্পগুলোর ইন্সট্রাক্টর সমস্ত আমাদেরই ছিল।

গেরিলা বাহিনী সমন্ধে এখানে দু-চারটা কথা বলা দরকার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা মুক্তির জন্য সমস্ত জনগণ (নিয়মিত ও গেরিলা বাহিনী) মুক্তিবাহিনী হিসেবে পরিচিত ছিল। এই মুক্তি বাহিনীর দুটি অংশ ছিল। একটিকে নিয়মিত বাহিনী বলা হত। অপরটি গেরিলা-তাকে গণবাহিনী বলা হত। এ নামগুলো বাংলাদেশ সরকার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের কাছে আমাদের নিয়মিত বাহিনী “মুক্তি ফৌজ” নামে পরিচিত ছিল। এবং গণবাহিনী ফ্রিডম ফাইটার (এফ, এফ) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

এটা আমাদের জানা ছিল যে, গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ জয় করা সম্ভব নয়। দেশ জয় করতে হলে আমাদের নিয়মিত বাহিনীর দরকার। আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র কিন্তু এ ব্যাপারে একমত ছিল না। যদিও এটা তাদের অজানা নয় যে দেশ জয় করতে হলে রেগুলার ফোর্স-এর দরকার, শুধু গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ জয় করা যায় না। আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ভারত রেগুলার ফোর্স বা নিয়মিত বাহিনী গঠন করার বিরুদ্ধে এই জন্য ছিল যে তারা হয়ত মনে করত যদি পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান দখল করার সম্পূর্ণ সুনাম যেন তারা নিতে পারে। কিন্তু আমরাও পেশাদার সৈনিক ছিলাম। তাই তাদের এসব পরামর্শে আমরা কখনও কর্ণপাত করিনি এবং আমরা গেরিলা বাহিনীর সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনীও গড়ে তুলি।

তেলিয়াপাড়া-চুনারুঘাটের মরণফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য পাকবাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। আমি তখন তেলিয়াপাড়ার ব্যুহকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনার ব্যস্ত থাকি। কারণ এটা শুধু আমার ডিফেন্সই ছিল না এটা ছিল আমার হেডকোয়ার্টার।

পাকবাহিনী তেলিয়াপাড়া তাদের আয়ত্তে আনার জন্য ক্রমাগত ২১ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এই যুদ্ধ যখন চলছিল তখন আর একজন অফিসার আমার সাথে যোগ দেয়। তার নাম ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভুঁইয়া (বর্তমানে মেজর)। যেসব অফিসারের উপর তেলিয়াপাড়া রক্ষা করার ভার দিই তারা ছিলঃ ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমানে মেজর), ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভুঁইয়া, (বর্তমানে মেজর), লেঃ মোরশেদ (বর্তমানে ক্যাপ্টেন)। এ ছাড়াও আরো কিছুসংখ্যক কলেজের ছাত্রও ছিলেন। তাঁরা হলেন শহীদ সেলিম আহসান, আনিসুল হাসান, ফজল হোসেন, আনিসুর রহমান (পরবর্তীকালে এঁরা সবাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশন পান এবং অফিসার হন)। এদের মধ্যে সেলিম মিরপুর অপারেশনে শহীদ হন এবং আনিস তাঁর কলেজ জীবনে ফিরে যান।

তেলিয়াপাড়া ব্যূহ রক্ষা করার জন্য যে ২১ দিন হয়েছিল সেই যুদ্ধে এই সমস্ত অফিসার এবং সৈনিকরা মনোবল ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ২১ দিন লড়াইয়ে মধ্যে পাকবাহিনী তেলিয়াপাড়ার উপর প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য দিয়ে পাঁচবার আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে তাঁরা তিনবার আমাদের কাছ থেকে তেলিয়াপাড়া দখল করে। আমরা দুবার তাদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হই। কিন্তু তৃতীয় বারে তাদের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র এত বেশি ছিল যে তেলিয়াপাড়া ঐবার আর দখল করা যায়নি। ১৯ শে মে শেষ পর্যন্ত তেলিয়াপাড়ার পতন হয়। তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধে যারা শাহাদত বরণ করেন তারা হলেনঃ সিপাই মোবারক আলী, সিপাই রংগু মিয়া, নায়ক নিজাম উদ্দীন, ল্যান্স নায়ক আসলাম মিয়া, সিপাই আব্দুল গফুর মিয়া, সিপাই আলী আজম ভুঁইয়া, সিপাই জামাল উদ্দীন, সিপাই আবু মিয়া, মোজাহিদ গিয়াস উদ্দীন, মোজাহিদ আলকাস মিয়া।

এই পর্যায়ে নিম্নলিখিত গেরিলা অপারেশনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

মাধবপুর গ্রামবুশ, ১৪মেঃ মাধবপুরের পতনের পর পাক সেনাবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট সড়ক ব্যবহার করতে শুরু করে। যদিও ঐ সড়কের স্থানে স্থানে আমরা পুল ভেঙ্গে দিয়েছিলাম তবুও তারা বিকল্প পথ তৈরী করে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তাদের যাতায়াতে বাধা দেবার জন্য মাধবপুরের কাছে ঐ এক বিকল্প সড়কের উপর পাকবাহিনীকে গ্রামবুশ করার জন্য ১৪ই মে তারিখে লেঃ মোরশেদের নেতৃত্বে ১২ জন সৈনিকসহ একটি দল পাঠাই। এ দল ঐ জায়গাতে রাত প্রায় দুটায় পৌঁছে এবং বিকল্প সড়কের উপর দু'খানা ট্যাংকবিল্ডিংসী মাইন পেতে তারই পাশে ওত পেতে বসে থাকে। সারারাত বৃষ্টি হয়েছিল এবং সকাল প্রায় ৮টা পর্যন্ত এ সড়কে পাক সেনাবাহিনীর কোন গাড়ী না চলাতে তাদের এমনিই বসে থাকতে হয়। বৃষ্টিতে তারা সবাই ভিজে যাওয়াতে নিকটবর্তী এক গ্রামে আশ্রয় নেয়। গ্রামে এক নির্জন বাড়ীতে যখন তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন সিলেটের দিক থেকে প্রায় এক ব্যাটালিয়ন পাকবাহিনী ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। এই কনভয়ের সবচেয়ে প্রথম গাড়ীটি ছিল একটি জীপ গাড়ী। ঐ জীপ গাড়ীটি বিকল্প পথের দিয়ে যাবার সময় ট্যাংকবিল্ডিংসী মাইনের উপর গিয়ে পড়ে এবং সাথে সাথে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই গাড়ীটি ধ্বংস হবার পর আমাদের সৈনিকরা সেখানে (ঐ বাড়ীতে) নীরবে বসে থাকে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। প্রথম গাড়ীটি বিধ্বস্ত হবার পর তার পেছনের গাড়ীটি দ্রুত এগুবার চেষ্টা করে। ফলে সেটিও মাইনের উপর গিয়ে পড়ে এবং বিধ্বস্ত হবার সাথে সাথে পাক সৈনিকরা বিপদ দেখে গাড়ী থেকে দ্রুত নেমে পড়ে এবং ঐ পুরো গ্রামখানি ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। আমাদের গ্রামবুশ দলটিতে মোট ১২ জন লোক ছিল। আর শত্রুশক্তির খুব কম হলেও প্রায় ৪০০ লোক ছিল। আমাদের লোকজন যখন দেখল যে তারা প্রায় ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা শত্রুদের উপর গুলি ছুড়ে ট্যাংকক্যাল উইথড্র করে আসতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের পেছনে প্রায় তিন মাইল পর্যন্ত ধাওয়া করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এখানেই সর্বপ্রথম ট্যাংকবিল্ডিংসী মাইন ব্যবহৃত হয়েছিল। এই গ্রামবুশে দু'খানা যানবাহন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং ঐসব গাড়ীতে যারা ছিল তাদের অধিকাংশ হতাহত হয়। এই গ্রামবুশে যারা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ ১। লেঃ মোরশেদ (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) ২। সেলিম (ছাত্র) পরবর্তীকালে লেঃ (শহীদ) ৩। আনিস (বর্তমানে লেফটেনেন্ট)।

নালুয়া চা বাগানের গ্রামবুশঃ ১৫/১৬ই মে, ১৯৭১ সন-১৫/১৬ই ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ১২/১৩ জন সৈনিক নিয়ে নালুয়া চা বাগানে সিলেট সড়কের উপর এক গ্রামবুশ তৈরী করে। ঐ দিন প্রায় এক কোম্পানী পাকসেনা সিলেট থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে যাচ্ছিল। বিকেল প্রায় দুটায় দিকে তারা ঐ গ্রামবুশের ভেতরে চলে আসে এবং চারিদিক থেকে আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। ঐ গ্রামবুশে ট্যাংকবিল্ডিংসী মাইন ব্যবহৃত হয়। এ গ্রামবুশ এত কার্যকরী ছিল যে পাকসেনা বাহিনীর এক কোম্পানী সৈনিকের মধ্যে অধিকাংশই নিহত হয়। তিনখানা গাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং দু'খানা গাড়ী বিকল হয়ে যায়। আমাদের সৈন্য সংখ্যা বেশী না থাকাতে সে স্থান ত্যাগ করে পিছে চলে আসতে বাধ্য হয়। পরে চা

বাগানের শ্রমিকদের কাছ থেকে জানতে পারা যায় প্রায় ৬৫ জনের মত পাকসেনা নিহত হয়েছিল। এই এ্যামবুশে যাঁরা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ১। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (বর্তমানে মেজর) ২। হাওয়ালদার আবুল কালাম (বর্তমানে সুবেদার)।

তেলিয়াপাড়া এ্যামবুশ ১৬ই মে, ১৯৭১ সন- মতিন তখন তেলিয়াপাড়ায় নিযুক্ত ছিলেন। নালুয়া চা বাগানে এক কোম্পানী পাকসেনা এ্যামবুশ হবার পর তাদের বেশকিছুসংখ্যক হতাহত হয়। তাদের সাহায্যার্থে চুনাকুঁড়া থেকে আরো কিছুসংখ্যক সৈন্য একত্রিত হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তেলিয়াপাড়ার নিকট তারা পুনরায় এ্যামবুশ হয়। এই এ্যামবুশ-এর নেতৃত্ব দিচ্ছিল ক্যাপ্টেন মতিন। এ এ্যামবুশেও ট্যাংকবিন্ধুংসী মাইন ব্যবহৃত হয়। পাকসেনাদের একখানি গাড়ী ধ্বংস হয় এবং বেশকিছুসংখ্যক সৈনিক হতাহত হয়।

যেহেতু আমাদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ছিল “হি এণ্ড রান”-শত্রু নিপাত এবং নিজের কম ক্ষতি। তাই আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে শত্রুর উপর আঘাত হেনে পিছনে চলে আসত। কিছুদিন পর জানা গিয়েছে যে ঐ এ্যামবুশে প্রায় ৪০/৫০ জন পাকসেনা হতাহত হয়েছিল। তেলিয়াপাড়া এ্যামবুশঃ ১৯শে মে ১৯৭১ সন-তেলিয়াপাড়ার এই দিন পতন ঘটে। মুর্শেদ ছিলেন এর প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত। পাকসেনারা যখন সিলেট সড়কের উপর বার বার এ্যামবুশ হচ্ছিল এবং ১৬ তারিখের এ্যামবুশে যখন তাদের বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয় তখন বোধহয় তাদের সাহায্যার্থে পাকসেনাদের প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট অভিমুখে আসে। সেদিন রাতেই তেলিয়াপাড়ার চা বাগানের নিকটবর্তী এলাকার চারখানা ট্যাংকবিন্ধুংসী মাইন পুঁতে আমাদের সৈনিকেরা সিলেট সড়কের উপর ওত পেতে বসে থাকে। এই এ্যামবুশের নেতৃত্ব দিচ্ছিল লেঃ মোর্শেদ। দলে তার লোক ছিল ১৫ জন। কনভয়-এর প্রথম গাড়িটি মাইনের উপর দিয়ে চলে যায় কিন্তু মাইন ফাটেনি। যখন দ্বিতীয়, তৃতীয় গাড়ী মাইন অতিক্রম করছিল সাথে সাথে দুখানি গাড়ীই একত্রে বিধ্বস্ত হয়। পেছনের গাড়ীতে যে সমস্ত পাকসেনা ছিল তারা গাড়ী থেকে পিছনে বেশ কিছু দূরে এক খোলা ময়দানে একত্রিত হয়। পাকসেনাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ খোলা মাঠের নিকটবর্তী এলাকায় আমাদের একদল লোক মেশিনগান নিয়ে ওত পেতে বসেছিল। এবং পাকসেনাদের যারা এখানে একত্রিত হয়েছিল তাদের প্রায় সবাই মেশিনগানের গুলিতে হতাহত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সৈন্য এসে সে সব মৃতদেহ ও আহত ব্যক্তিদের নিয়ে যায়। এই যুদ্ধে আমাদের একজন মোজাহেদ পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়ে। পরে সে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ এ্যামবুশে পাকসেনাদের বিপুল পরিমাণ অস্ত্রমন্ত্র এবং একখানা গাড়ী আমাদের হস্তগত হয়। এছাড়া তাদের তিনখানা গাড়ী বিধ্বস্ত হয়। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা ১৩০ থেকে ১৫০ জনের মত ছিল।

লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী আবদুর রকীবের প্রতিবেদন

‘বিচিত্রা’

১৩ মে ১৯৮৩

২৫শে মার্চ ১৯৭১। সকাল ৯টা কি ১০টার দিকে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবার আমাকে আমার অফিস থেকে (আমি তখন ঢাকাতে ৩২ নং ব্যাটালিয়ন পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সি-ও ছিলাম) ডেকে হুকুম করলেন যে তোমাকে সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গলের সি-ও নিযুক্ত করা হল, কর্নেল মাসুদকে অপসারণ করা হয়েছে। ব্যাটালিয়নের দায়িত্বভার গ্রহণের সময় ব্রিগেডিয়ার মজুমদার (তদানীন্তন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার কমান্ডার, যাকে আগের দিন অর্থাৎ ২৪ শে মার্চ চিটাগাং থেকে আনা হয়েছিল) তোমাকে ব্যাটালিয়নের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। কর্নেল মাসুদ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে যাবেন না।

ঐ হুকুম অনুযায়ী আনুমানিক বিকাল ৩টা থেকে ৪টার কোন সময় ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সংগে জয়দেবপুরে যাই এবং ব্যাটালিয়নের সংগে পরিচিত হই এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করি। ঐসময় ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন কোম্পানী এবং প্লাটুনের অবস্থান নিম্নরূপ ছিলঃ

- (১) এক কোম্পানী ময়মনসিংহ-কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর নুরুল ইসলাম (পরে মেজর জেনারেল এবং অবসরপ্রাপ্ত)।
- (২) এক কোম্পানী টাঙ্গাইল-কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর কাজেম কামাল, অবাস্তালী।
- (৩) এক প্লাটুন রাজেন্দ্রপুর এমুনিশন ডিপোতে-গার্ড হিসাবে।
- (৪) এক প্লাটুন গাজীপুরে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে-গার্ড বা প্রহরী হিসাবে।
- (৫) ব্যাটালিয়নের অবশিষ্টাংশ জয়দেবপুরে। ঐ সময় জয়দেবপুরে নিম্নোক্ত অফিসারদেরকে পাইঃ

(ক) মেজর (বর্তমানে মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত) শফিউল্লাহ, সেকেন্ড ইন কমান্ড।

(খ) মেজর (বর্তমানে মৃত) আসজাদ লতিফ, কোম্পানী কমাণ্ডার-অবাস্তালী।

(গ) মেজর (বর্তমানে মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত) মইনুল হাসান, কোম্পানী কমাণ্ডার।

(ঘ) ক্যাপ্টেন (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) আজিজুল রহমান, এ্যাডজুট্যান্ট।

(ঙ) ক্যাপ্টেন (বর্তমানে কর্নেল) এজাজ আহমদ, কিউ, এম।

(চ) ক্যাপ্টেন (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) মোহাম্মদ নাসিম, কোম্পানী অফিসার।

(ছ) ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মৃত) মোহাম্মদ রিয়াজ, কোম্পানী অফিসার-অবাস্তালী।

(জ) ক্যাপ্টেন (বর্তমানে বোধ হয় পাকিস্তানে) নকভী, কোম্পানী অফিসার-অবাস্তালী।

(ঝ) সেঃ লেঃ (বর্তমানে কর্নেল) মোরশেদ, কোম্পানী অফিসার।

(ঞ) সেঃ লেঃ (বর্তমানে কর্নেল) ইব্রাহিম, কোম্পানী অফিসার, সিগন্যাল অফিসার।

(ট) একজন ডাক্তার-বাস্তালী।

- (৬) এই ব্যাটালিয়ানের সাথে জড়িত ২০/২৫ জন অবাস্তালী ছিল। এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাই, ১৯৫১সালে কমিশন পাওয়ার পরে পাঞ্জাব রেজিমেন্টে পোস্টিং পাই, এবং তার পর থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বিভিন্ন ব্যাটালিয়নে কয়েক বৎসর তদানীন্তন ইপিআর-এ এবং অন্যান্য স্টপ জবে চাকুরী করি। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে চাকুরীর অভিজ্ঞতা বা সম্যক পরিচয় ছিল না। ব্যাটালিয়নের লোকজনদের ভিতর আমার কিছুমাত্র পূর্ব পরিচয় ছিল মেজর শফিউল্লাহ এবং মেজর কাজেম কামালের (অবাস্তালী অফিসার) সঙ্গে। আর আমি যখন ব্যাটালিয়ানের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাই তখন আমার পাক সামরিক বাহিনীর প্ল্যান সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। ঐ দিন গভীর রাতে তদানীন্তন ইস্টার্ন কমান্ডের কমাণ্ডার জেঃ টিক্কা খান আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। তিনি প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঐ অঞ্চলের বিশেষ করে গাজীপুরের খবরাখবর কি। আমি উত্তরে জানাই যে অস্বাভাবিক কিছু পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি হুকুম করলেন গাজীপুরে ফ্যাক্টরীতে আমাদের সৈন্যসংখ্যা পুরো কোম্পানীতে উন্নীত করতে এবং অন্য কোম্পানীতে তৈরী অবস্থায় থাকতে। তদনুযায়ী, যেহেতু মেজর আসজাদ লতিফের কোম্পানীর এক প্লাটুন গাজীপুরে ছিল, তাকে তার কোম্পানীর অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ, দুই প্লাটুন গাজীপুরে পাঠিয়ে দিই এবং মেজর মইনের কোম্পানীকে জন্য কোন হুকুমের জন্য তৈরী থাকতে বলে দিই। অবশ্য পরে তাদের সম্বন্ধে আর কোন হুকুম আসে নাই। এ সময় আমার বা আমাদের কোন ধারণা ছিল না ঢাকা শহরে কি হচ্ছে। অবশ্য সন্ধ্যার দিকে

আমার বাসা থেকে (আমার ফ্যামিলির সবই তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ২৬/২ নং তোফায়েল কলোনী, বর্তমানে আজিজ পল্লীতে) কয়েকবার টেলিফোনে কোন অজানা লোক তাদেরকে বিরক্তিপূর্ণ টেলিফোন করে উত্ত্যক্ত করছে বলে খবর আসে।

২৬শে মার্চ ১৯৭১ঃ ঐ দিন সকালে রেডিও'র খবর জানতে পারি যে, ঢাকা শহরে “অনির্ধারিত সময়ের জন্যে” কারফিউ দেওয়া হয়েছে, এবং বিভিন্ন মার্শাল ল' নির্দেশবলী রেডিও মারফত শুনলাম। ঐ সব খবরে আমাদের নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া হলেও সমষ্টিগতভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা তখনও আমরা নিয়মতান্ত্রিক সৈনিক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছিলাম। আমি অয়ারলেস সেট-এর কাছে গিয়ে দেখি যে, আমাদের সেটের ফ্রিকুয়েন্সীতে শুধুমাত্র ঢাকা কন্ট্রোল জয়দেবপুর, টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ আছে। আমাদের প্রশ্নের কোন সদুত্তর অবশ্যই অপারেটর দেয় না। ঐ সময় আমি ব্রিগেড কমান্ডারের সঙ্গে অয়ারলেস-এ কথা বলে অবস্থা আঁচ করতে চাই, কিন্তু তিনি কোন মন্তব্য না করে এড়িয়ে গেলেন এবং বললেন যে, যখন দরকার হবে তখন তোমাদেরকে কাজের জন্যে ডাকা হবে। ঐ দিন ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ সবার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সমষ্টিগতভাবে কিছু প্রকাশ পায় না। যাহোক, ঐ দিন সকালে এবং বিকালে জয়দেবপুর সমস্ত অফিসার, জেসিও, এনসিও এবং সৈনিকদেরকে একত্রীভূত করে তাদেরকে সামরিক শৃঙ্খলা রাখার উপর গুরুত্ব দিই এবং বলি যে, অনেক সময় নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতির উর্ধ্বে উঠে সামরিক ডিউটি পালন করতে হয়। ঐ দিন দুপুরের পর থেকে লোক মারফত ঢাকার ঘটনার কিছু কিছু আমাদের কানে এসে পৌঁছায়। তাছাড়া, বিবিসি এবং আকাশবাণীর খবরে আমাদের ভিতরে কিছু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং সেই সময় আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। এক কথায় যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঐ দিন বিকালে কিছু অফিসার জেসিওদের সঙ্গে কথা বলার সময়-বিশেষ করে সুবেদার নূরুল হক (তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সুবেদার মেজর- পরে অনারারী ক্যাপ্টেন হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন-স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি বীরপ্রতীক পদক পান) সংশয় প্রকাশ করেন যে, আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা হতে পারে। আমি এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি এবং ঐ দিনই সন্ধ্যায় অতর্কিত হামলার মোকাবেলা করার মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, অর্থাৎ অবস্থান সুদৃঢ় করা, অধিকসংখ্যক প্রহরী নিয়োগ ইত্যাদি বন্দোবস্ত করি। সন্ধ্যার দিকে আমরা অয়ারলেসে খবর পাই যে, ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইলে গুপ্তগোলা শুরু হয়েছে এবং আরও সৈন্য পাঠিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এই অবস্থায় আমাদের দিন কাটে।

২৭শে মার্চ ১৯৭১ঃ ঐ দিন শেষ রাত্রে আনুমানিক ভোর তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে মেজর শফিউল্লাহ আমার কামরায় একজন এনসিও এবং একজন সিপাহীকে নিয়ে আসে, বলে যে, তারা আমাদের যে প্লাটুন রাজেন্দ্রপুর এম্যুনিশন ডিপোতে ডিউটিতে আছে সেই প্লাটুনের লোক। তাদের ভাষ্যমতে, পাকিস্তানীরা অতর্কিতভাবে আমাদের প্লাটুনের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় গুলি চালিয়ে মেরে ফেলেছে, এবং শুধুমাত্র তার দুজনই জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তাদেরকে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও তাদের বক্তব্য সম্বন্ধে আমি সন্দেহান্বিত হয়ে উঠেলাম। আমি স্থির করলাম যে, ঐ ঘটনা সরেজমিনে তদন্ত করা প্রয়োজন। আমি সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকে বললাম ক্যাপ্টেন রিয়াজের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন পাঠিয়ে ঐ ঘটনার তদন্ত করতে এবং সঙ্গে ঐ লোক দুটোকে পাঠাতে। তখন উপস্থিত সকলের একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখলাম। এবং মেজর শফিউল্লাহ আমাকে বললেন যে, আমরা হয়ত পর্যবেক্ষণের ভিতরে আছি, রাত্রে বেশ প্লেন চলাচল করেছে। দিনের আলো না বেরোন পর্যন্ত কিছু ‘মুভ’ করলে দুর্ঘটনা হতে পারে। তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, ক্যাপ্টেন রিয়াজের নেতৃত্বে প্লাটুন একটু পরে রওনা হয়ে টঙ্গী-জয়দেবপুর রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তায় গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি নিজে ফজরের নামাজের পর ঐ জায়গায় গিয়ে প্লাটুনের সঙ্গে মিলিত হবো এবং ঘটনার তদন্তে উপস্থিত থাকব। ঐ মত আমি প্লাটুন নিয়ে রাজেন্দ্রপুরে সকাল ৭.৮টার দিকে পৌঁছাই। রীতি পালন করে ভিতরে গিয়ে দেখি আমাদের প্লাটুন বহাল তবয়িতে আছে এবং শুধু ঐ দুজনই কোন ভয়ে পালিয়ে গেছে। এখানে পাক বাহিনীর আরও দুটি প্লাটুন ডিউতে আছে। যাহোক, ওখানে যাওয়ার পরেই ঢাকার আর্মি এ্যাকশনের হিংস্রতা এবং নগ্নতা কিছু

আন্দাজ করতে পারলাম। প্লাটুন কমাণ্ডার আমাকে জানালেন, গত দুই রাত এবং দিনে সমানভাবে হেলিকপ্টারযোগে গোলাবারুদ, এমনকি ১০৬ মিঃ মিঃ এন্টিট্যাঙ্ক গান এবং আর্টিলারীর গোলাবারুদ গেছে। আমরা ঐ অঞ্চলে উপস্থিত থাকতেই দেখলাম যে, একটি হেলিকপ্টার এতে নামল এবং তাতে গোলাবারুদ উঠানো হচ্ছে। ঐ ঘটনা আমার মনে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আমার মনে হল, পাকিস্তানীরা মিলিটারী এ্যাকশনে অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনছে না বরং মারণযজ্ঞে নেমেছে, কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অতিরিক্ত গোলাবারুদ সৈন্যদের প্রয়োজনে আসে না বা আসার কথা না। ১৯৫৩ সালে লাহোরের মার্শাল ল'এ আমাদের “ফাস্ট লাইন” বা “পাউচ এম্যুনিশনই” খরচ হয়েছিল না। মনের ভাব মনে চেপে রেখেই সঙ্গে নেওয়া প্লাটুন সমেত ওখান থেকে চলে আসলাম। ফেরার পথে ক্যাপ্টেন রিয়াজের নেতৃত্বে প্লাটুনকে জয়দেবপুর চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম এবং আমি গাজীপুর অর্ডিন্যান্স ডিপোতে আমার কোম্পানীকে দেখতে গেলাম। সেখানে যেয়ে দেখলাম যে ঐ কোম্পানীও বেশ কিছু শংকাজনিত চিন্তে আছে। ওখানে আরও দেখলাম যে, আমার কোম্পানী ছাড়াও দুই কোম্পানী মত এমওডিসি'র লোক রয়েছে। এদের কাছে অস্ত্র আছে এবং দুই-তিন সপ্তাহের স্বল্প সামরিক শিক্ষা এরা পেয়েছে। এরা সবাই বাঙালী। ওখানে সবাইকে দেখে, কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, কিছু গতানুগতিক ভাষণ দিয়ে বেলা এগার সাড়ে এগারটার দিকে জয়দেবপুরে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসলাম। রাস্তাঘাট, বাজার প্রায় জনশূন্য ছিল এবং সকলের ভিতরে একটা ভীতিজনক ভাব ছিল।

হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহের অবস্থার আরও অবনতির কথা জানতে পারলাম। এ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের কথাবার্তাও কানে আসতে থাকল। যেহেতু তখন পর্যন্ত ঐ এলাকার কোন অঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে নাই, আমি অফিসে এসে বসলাম। অফিসে বসার পর সুবেদার নূরুল হক প্রথমত ওখানকার সৈন্যদের সম্বন্ধে সমস্ত খবর দিলেন এবং অন্য দুই জায়গায় খবর আমাকে দিলেন। সকলের কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবও আমাকে জানালেন। তারা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন আজিজ আমার অফিসে এসে বললেন, “আমাদের নিরস্ত্র ভাইয়েরা গুলি খেয়ে শেয়াল-কুকুরের মত মরবে আর আমরা হাতিয়ার হাতে থাকা সত্ত্বেও নীরব দর্শক হয়ে থাকবো?” আমি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম এই যে, ধৈর্যহীন হয়ো না, সময়মত সব কিছুই করা হবে। তারা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে মেজর মইন আমার অফিস কামরায় ঢুকে একই ধরনের অভিব্যক্তি করলে আমি তাকে একই ধরনের কথা বলি। এর কিছুক্ষণ পরে মেজর শফিউল্লাহকে আমার অফিস কামরায় ডাকি এবং একথা সেকথার পরে তাকে বলি যে-আমাদের ‘ইয়ং ব্লাড’ বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে এবং এ অবস্থায় কি করা যেতে পারে। তিনি আমাকে বললেন যে আমাদের উত্তেজিত হওয়া শোভা পায় না; সবকিছু একটু ভেবেচিন্তে করতে হবে। (প্রসঙ্গত এটুকু বলছি যে, আমাদের উপরোক্ত কথোপকথন প্রচলিত ইংরাজী এবং বাংলা দুই ভাষাতে হয়েছে। কথোপকথনের বাংলা অনুবাদ যা দাঁড়ায় তা লিখেছি।) ঐ অবস্থায় দুপুর গড়িয়ে গেল। ঢাকার সঙ্গে কোন সংযোগ নাই বললেই চলে। আনুমানিক তিনটা সাড়ে-তিনটার সময় অয়ারলেসে ব্রিগেড কমাণ্ডার আমার সাথে কথা বললেন। প্রথমে জানতে চাইলেন যে আমাদের এদিকের অবস্থা কি। আমি উত্তরে জানালাম যে আমার নিকটবর্তী এলাকায় কোন অঘটন ঘটে নাই। তবে টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহে অবস্থার যথেষ্ট অবনতির খবর পাচ্ছি এবং সেখানকার কোম্পানী কমাণ্ডাররা আরও সৈন্য চাচ্ছেন তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে। তিনি বললেন যে ওখানে সৈন্য পাঠানোর দরকার নাই, তারা ঐদিকটা দেখবেন। তিনি আরও বললেন যে, “দুষ্কৃতকারীদের শায়েস্তা করা হচ্ছে”-টঙ্গী ব্রিজ বিনষ্ট করে ফেলেছে। ঐ দিন সন্ধ্যায় টঙ্গী এলাকা আর্মি অপারেশন করবে; এক কোম্পানী প্রস্তুত থাকবে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে উত্তর দিক থেকে এসে অপারেশনে সহায়তা করবে। এই খবর দেওয়ার পর যথেষ্ট সংশয় এবং শঙ্কার সৃষ্টি হয়। উদ্বেগাকুল চিন্তে আমরা সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকি।

ঐ দিন সন্ধ্যায় দূর থেকে অর্থাৎ জয়দেবপুর থেকে টঙ্গীতে আর্মি এ্যাকশনের প্রচণ্ডতায় আমি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ি। গুলি এবং তোপের আওয়াজ এবং গোলাগুলির শলাকা দেখে আমার মনে হয় পাক আর্মি আইন-শৃঙ্খলা উন্নতির জন্য সরকারকে সাহায্য করছে না, বরং পুরোপুরি বাঙালী হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। সারাদিনে বিভিন্ন

সূত্র থেকে পাওয়া খবর মিলিয়ে দেখলাম একই দিক নির্ণয় করছে। মনে হল আমরা বোধ হয় হব পরবর্তী টার্গেট, এবং এ অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক আনুগত্য নিরর্থক। টঙ্গীর গোলাগুলির আওয়াজ খেমে যাওয়ার পর আমি মেজর শফিউল্লাহ, মেজর মইন, ক্যাপ্টেন আজিজ এবং সবেদার নূরুল হককে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্যে আমার নিজের কামরায় ডেকে পাঠালাম। (এই সঙ্গে জয়দেবপুরের অবস্থান সম্বন্ধে একটু বলা দরকার যাতে সবাই জিনিসটা ভালভাবে বুঝতে পারেন। পুরো ব্যাটালিয়নের অবস্থান ছিল জয়দেবপুরের জমিদার বা রাজবাড়ীতে। প্রকাণ্ড চত্বরের ভিতরে অনেকগুলো বড় বড় দোতলা বিল্ডিং-এর সমষ্টি। বর্তমানে এগুলো মহকুমা প্রশাসক এবং মহকুমা পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। দক্ষিণে স্বল্প উঁচু পাঁচিল ও গেট। এই গেট দিয়ে ঢুকলে গোটা দুয়েক বাস্কেট বল/ভলিবল গ্রাউণ্ড সাইজের মাঠ। মাঠের পরেই বড় উঁচু দোতলা পুরানো কালের বিল্ডিং, নীচে অফিসার মেস এবং জুনিয়র অফিসারদের থাকার জায়গা। দোতলা মেসের ড্রয়িংরুম। পূর্বের দিকে টু-আই-সি এবং অন্য একজন মেজর থাকতেন। পশ্চিমের দিকে কামরা ছিল সিও'র জন্য। এ বিল্ডিং সংলগ্ন পশ্চিম এবং উত্তর কোনা থেকে শুরু করে উত্তর দিকে বিস্তৃত আর একটি বড় দোতলা বিল্ডিং 'এল'-এর মত দেখতে। ব্যাটালিয়নের সমস্ত অফিস এই বিল্ডিং-এ ছিল। প্রথম বিল্ডিং-এর সঙ্গে দ্বিতীয় বিল্ডিং এর সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। নীচে নেমে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে হত। ঐ দ্বিতীয় বিল্ডিং-এর উত্তরে আরও একটি বড় দোতলা বিল্ডিং পূর্বের দিকে বিস্তৃত ছিল। সেটা চিল ট্রুপস-এর বসবাসস্থান। পূর্বের দিকেও দেওয়াল এবং কিছু বিল্ডিং দিয়ে ঘেরা ছিল।) তারা এসে পৌঁছতেই আমি বললাম যে, পরিস্থিতি এখন অসহ্য, আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আপনাদের মতামত কি? কেউ কোন উত্তর দিলেন না। আমি ধরে নিলাম মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। আমার মনে চিন্তা খেলে গেল যে আমাদের ক্ষুদ্র এবং বিভক্ত শক্তি নিয়ে ঢাকার দিকে এগিয়ে যাওয়া আত্মহত্যার শামিল, এবং আমাদের প্রয়োজন সমস্ত ব্যাটালিয়নকে এক জায়গায় একত্রীভূত করা এবং সেটা ময়মনসিংহেই সম্ভব। এ ছাড়া জয়দেবপুর রাজবাড়ীর পিছনে কিছু সরকারী কোয়ার্টারে আমাদের কিছুসংখ্যক জেসিও এবং এনসিও এবং সেপাইদের ফ্যামিলি আছে এবং আমার মনে হল যে, আমরা চলে যাওয়ার পর পাক বাহিনীর প্রথম আক্রোশ এসব পরিবারবর্গের উপর পরবে। সেইজন্যে আমি সুবেদার নূরুল হককে জিজ্ঞাসা করলাম, “এইসব ফ্যামিলির কি হবে?” তিনি তার উত্তরে বললেন যে, তাদের জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা তাদেরকে আশেপাশের গ্রামে পাঠিয়ে দেব, এবং সেখানকার পাবলিক তাদের দেখাশুনা করবে। তখন আমি তাকে বললাম যে, পরের দিনের ভিতরেই যেন এ বন্দোস্ত হয়ে যায়। তারপর আমি ক্যাপ্টেন আজিজকে (এ্যাডজুটেন্ট) গাড়ীর ‘এভাইলিবিলিটি’ অর্থাৎ কয়টা জীপ, ডজ, লরী চালু অবস্থায় আছে জানতে চাইলাম। তিনি যে পরিসংখ্যান দিলেন, তাতে আমি আন্দাজ করতে পারলাম মর্টার প্লাটুন এবং কিছু সৈন্য-আন্দাজ এক রাইফেল প্লাটুন (২৫/৩০)নিজেদের হাতিয়ার এবং গোলা-বারুদসহ উঠানো সম্ভব হবে। তখন একটা প্রশ্ন থেকে গেল যে, অবশিষ্ট লোকজন এবং গাজীপুরে যারা আছেন তাদেরকে কি করে নেওয়া যাবে। তখন মেজর মইন স্বেচ্ছাকৃতভাবে বললেন যে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি নিজে ‘ক্রস-কান্ট্রি’ পায়ে হেঁটে গফরগাঁও হয়ে ময়মনসিংহে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব দেবেন। তখন আমি প্লান করে ফেললাম, আগামীকাল সকালে এক পার্টি গাড়ীতে টাঙ্গাইলে হয়ে ময়মনসিংহ যাবে এবং বাকীরা আগামীকাল সন্ধ্যায় রওনা হবে। গাড়ীর জন্য চেষ্টা করা হবে এবং যদি সম্ভব না হয় তাহলে পায়ে হেঁটে রওনা হবে। এটা স্থির করার পর, আমি তদানীন্তন মেজর শফিউল্লাহকে এই নির্দেশ দিই, যেহেতু তোমার ফ্যামিলি এখন ঢাকাতে নাই (তারা তখন কুমিল্লাতে তার শ্বশুরালয়ে ছিল), তোমার সমস্যা একটু কম। আগামীকাল সকালে অর্থাৎ ২৮শে মার্চে মর্টার প্লাটুন এবং এক রাইফেল প্লাটুন নিয়ে টাঙ্গাইল রওনা হয়ে যাবে। রাস্তায় যদি কোন রোড ব্লক পাও সেগুলো সাফ করবে। সেখানকার স্থানীয় লোকদের সঙ্গে ‘কনট্যাক্ট’ করে বলে যাবে এগুলো খোলা রাখতে এবং রাত্রে আমাদের অবশিষ্ট লোক চলে যাওয়ার পর এগুলো বন্ধ করে দিতে। টাঙ্গাইল পৌঁছে সেখানকার কোম্পানীর দায়িত্বভার বা অধিনায়কত্ব নিয়ে নিবে এবং ঐ কোম্পানী সমেত ময়মনসিংহে একত্রীভূত হবে। আমরা সবাই আগামীকাল, অর্থাৎ ২৮শে মার্চ ’৭১, সন্ধ্যার পর এখান থেকে রওনা হবে।”

মেজর মঈন, ক্যাপ্টেন আজিজ এবং সুবেদার নূরুল হককে স্ব স্ব দায়িত্বের কাজের নির্দেশ দিয়ে দিলাম। তাদের সবাইকে বলা হল যে আমাদের এই প্লানের গোপনীয়তা যেন বজায় থাকে, নেহাৎ প্রয়োজনীয় এবং নূন্যতম লোককে বলবে। কোনক্রমেই যেন অবাঙালীরা (২০/২৫ জন, যারা তখনও আমাদের সঙ্গে ছিল) যেন জানতে না পারে, কারণ যোগপনীয়তাই হবে আমাদের আপাতত কার্যসিদ্ধির একমাত্র পথ। এবং তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে আগামীকাল ২৮শে মার্চ সকালে সব ট্রুপসকে একত্রীভূত করবে যেকোনো আমি সমস্ত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্যে আমি আমার ‘টু-আই-সি’ মেজর শফিউল্লাহকে মর্টার প্লাটুন এবং একটি রাইফেল প্লাটুন দিয়ে সেখানে পাঠাচ্ছি।

এইসব করার পরে আমার নিজের ফ্যামিলির সম্বন্ধে একটু চিন্তা হল। তারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। চিন্তা করলাম যে কোনরকমভাবে ঢাকাতে গিয়ে তাদেরকে এদিকে নিয়ে আসা বা ছাউনী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় কিনা। সেইজন্যে পরের দিন অর্থাৎ ২৮শে মার্চ স্বল্পক্ষণের জন্যে ঢাকাতে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে এবং টঙ্গী ব্রিজে একটা জীপ রাখতে অণুরোধ করে অয়ারলেস সেটে একটা মেসেজ পাঠালাম। শেষক্ষণ পর্যন্ত আর কোন উত্তর আসে নাই।

ঐ রাতে নতুন আর কোন ঘটনা ঐ অঞ্চলে গটে নাই। অবশ্য দেশের বিশেষ করে ঢাকার ঘটনাবলীর বিভিন্ন বিবরণ বিভিন্ন সূত্রে আমাদের কাছে এসে পৌছাতে থাকায় সৈনিকদের মানসিক উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ঐ দিন আমাদের ব্যাটালিয়নের একটা গাড়ীর ড্রাইভারের (গাড়ীটা কতদিন আগে মেরামতের জন্যে ঢাকা ওয়ার্কশপে ছিল, এবং সে ঢাকাতে আটকা পড়েছিল। ২৭ মে মার্চে স্বল্পকালীন কারফিউ বিরতির সময় তাকে ওয়ার্কশপের কেউ হুকুম দেয় গাড়ীটা নিয়ে ইউনিটে চলে যেতে। গাড়ী নিয়ে আসার সময় টঙ্গী ব্রিজের ব্রকের জন্যে আটকে যায় এবং সেখানে আর্মি এ্যাকশন শুরু হয়ে যাওয়াতে গাড়ী ফেলে পায়ে হেঁটে জয়দেবপুরে এসে পৌছাই।) আর্মি এ্যাকশনের প্রাথমিক বিবরণে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে থাকে।

২৮ শে মার্চ ১৯৭১ঃঃ পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আমি আনুমানিক সকাল সাড়ে আট বা নয়টার সময় জয়দেবপুরের সমস্ত র‍্যাংকের ট্রুপসকে (বাঙালী, অবাঙালী সব) এক জায়গায় করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করি, এবং জানাই যে মেজর শফিউল্লাহ সাহেবকে মর্টার এবং একটি রাইফেল প্লাটুন দিয়ে টাঙ্গাইলে অবস্থার উন্নতির জন্যে পাঠাচ্ছি।

আনুমানিক সকাল ১০ টার দিকে যখন মেজর শফিউল্লাহ প্রায় তৈরী হয়ে গিয়েছেন রওনা হবার জন্যে, আমার মনে হল যে গাড়ীর বনোদবস্ত্র না হলে রাতে সি-ও হিসাবে ট্রুপসের সঙ্গে পায়ে হেঁটে রওনা হতে হবে, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার পক্ষে অতিরিক্ত ইউনিফর্ম নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই মেজর শফিউল্লাহকে ডেকে তার স্যুটকেসে আমার দুই সেট ইউনিফর্ম দিয়ে দিই। ঐ সময় সেঃ লেঃ মোর্শেদ উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময় অন্যান্য কাজের ভিতরেও টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহের খবরের জন্যে যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত ছিলাম। সকাল থেকেই ময়মনসিংহের সঙ্গে অয়ারলেস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।

প্রায় সাড়ে দশটার দিকে মেজর শফিউল্লাহ তার পার্টি নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। ওদের যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন ‘জয় বাংলা’ ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করছিল। আমার ধারণ হল যে, আমাদের প্ল্যান স্থানীয় লোকেরা জেনেছে এবং এই অবস্থায় আমাদের ট্রুপস গেলে অবাঙালীরা যারা তখনও আমাদের সঙ্গে আছে, মনে করবে যে, আমাদের টাঙ্গাইল রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠানো একটা ভাঁওতামাত্র। সেইজন্য সাধারণ পাবলিককে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেওয়া এবং ভয় দেখানো একটা নাটকের অভিনয় মত করতে হল। ওদের রওনা হয়ে যাওয়ার কিছু পরে সরকারীভাবে আমি ব্রিগেডে লিখিত মেসেজ পাঠিয়ে দিলাম এই বলে যে, টাঙ্গাইলের অবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে আমি মেজর শফিউল্লাহকে উপরোল্লিখিত সৈন্যসহ পাঠিয়েছি। এইজন্য করলাম যে, কোন সন্দেহ যাতে আমাদের উপর না আসে।

এরপর আমার চিন্তা হল গাজীপুরের কোম্পানীর সঙ্গে কিভাবে “কো-অর্ডিনেন্ট” করা যায়। আনুমানিক সাড়ে এগারটা-বারটার দিকে ঐ কোম্পানী সুবেদার চাঁদ মিয়া একটা গাড়ী নিয়ে আসলেন-দুই রাত্রি আগে যে দুই পলাট্টন জয়দেবপুর থেকে ওখানে যায় তাদের বিচানা নিয়ে যেতে। ক্যাপ্টেন আজিজ এবং সুবেদার নূরুল হত তাকে আমার কাছে নিয়ে আসলেন। আমি তাদেরকে বললাম যে, ওকে (চাঁদ মিয়াকে) প্লান বলে দিন। তাদের কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমি সুবেদার চাঁদ মিয়াকে নির্দেশের সারাংশ এইভাবে বলিঃ

- (1) সন্ধ্যার সময় থেকে তার কাছে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যে অয়ারলেস সেটের সংযোগ আসে সেটা খুলে রাখতে। যখন সংকেত যাবে “এখন সাড়ে সাতটা বাজে” তখন থেকে তোমরা রওনা হবার একশন শুরু করবে।
- (2) একশন শুরুর প্রথম কাজ হবে অর্ডিন্যান্স ডিপোতে যে অয়ারলেস সেটের ঢাকার সঙ্গে সরাসরি যোগ আছে তাকে নষ্ট করে দেওয়া যাতে আমাদের খবর ঢাকা অথরিটি সঙ্গে সঙ্গে না পায়।
- (3) অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে যত গাড়ী আছে এবং আশেপাশে যতটা সম্ভব গাড়ী দখল করে নিতে এবং ঐ গাড়ীসমূহ নিয়ে ময়মনসিংহের দিকে ‘মুভ’ করতে।
- (4) ‘মুভের’ সময় অর্ডিন্যান্স ডিপোতে রক্ষিত ব্যাটালিয়নের পুরানো হাতিয়ারসমূহ এবং গোলাবারুদ যতটা সম্ভব নিয়ে যেতে।
- (5) এম, ও, ডি, সি’র লোক যতটা সম্ভব সংগে নিয়ে যেতে এবং যারা যেতে পারবে না তাদেরকে নির্দেশ দিতে যে ঐ ডিপো থেকে দূরে সরে যেতে, কারণ পরে তারা আর্মি একশনের শিকার হবে।

সুবেদার চাঁদ মিয়া চলে যাওয়ার পর আমার খেয়াল হল যে মেজর আসজাদ লতিফ তার অবাঙালী কোম্পানী কামাণ্ডারকে ওখানে থেকে সরিয়ে আনার দরকার যাতে চাঁদ মিয়া নিরুপদ্রবে তৈরী হতে পারেন। তাই আমি তাকে আমার সঙ্গে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে লাঞ্ছ করার জন্যে ডেকে পাঠালাম। জয়দেবপুরস্থ সমস্ত বাঙালী অফিসার এবং জেসিওরা যে যার দায়িত্বমত প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছিল, এবং আইরের ভাবখানা ছিল যে সবকিছুই নর্মাল বা সাধারণভাবে চলছে। আমি মোটামুটিভাবে অবাঙালী অফিসারদেরকে গল্পচ্ছালে আমার আশেপাশে রাখছিলাম, যাতে তারা এ ব্যাপারে আঁচ করতে না পারে। আমি অবশ্য মাঝে মাঝে এদিকে-ওদিকে যেয়ে ছোটখাট নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাকে বলে সামরিক ভাষায় “টাইং আপ”। আমার নিজস্ব যথেষ্ট চিন্তা ছিল-অন্য জায়গায় কি হচ্ছে বা না হচ্ছে তা সঠিক জানা ছিল না- এই বিদ্রোহের পরিণতি কি হবে কে জানে, যদি সফল না হয় তাহলে নিজের ক্যামিলি এবং ছেলেরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে, তাদের পরিণতি কি হবে, ইত্যাদি।

(আজ ১২/১৩ বৎসর পরে ঐ দিনের কথা চিন্তা করলেও যথেষ্ট আতংকিত হয়ে পড়ি। ঐ দিনে ভবিষ্যৎ ছিল অজানা-দেশাত্মবোধই ছিল একমাত্র প্রেরণা।)

এসব ছাড়াও আমার জানা প্রয়োজন ছিল যে, গতকাল রাতে টঙ্গীতে ‘আর্মি একশনের’ পর কত সৈন্য আছে, কারা আছে, পজিশন তারা কতদূর পর্যন্ত নিয়েছে এবং আমাদের ‘মুভ’-এর সময় তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কতদূর আছে। দুপুরে খাওয়ার পরে আমি নিজেই যাবার মনস্থ করছিলাম, কিন্তু ক্যাপ্টেন আজিজের ইশারায় এবং পরামর্শে মেজর আসজাদ লতিফকে কিছু সৈন্য ‘এসকট’ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাকে বলে দেওয়া হল যে, টঙ্গীতে যেসব সৈন্য পৌছে গিয়েছে তারে সঙ্গে ‘মিলাপ’ করে এসো এবং বিশেষ আগের রাতে আমাদের ব্যাটালিয়নের একখানা ডজ গাড়ী যেটা টঙ্গী ব্রিজের কাছে ড্রাইভার ফেলে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিল, সেটা কি অবস্থায় আছে দেখবার জন্যে এবং সম্ভব হলে ‘রিকভার’ করার ব্যবস্থা করে আসতে। এই ব্যবস্থায় আমাদের দুইটা সুবিধা হল। প্রথমত ., এই অবাঙালী অফিসারকে তার কোম্পানী থেকে অধিক সময় সরিয়ে রাখা এবং টঙ্গীতে যদি কোন অঘটন ঘটে তা হলে প্রথম চোটটা অবাঙালী অফিসারের উপর দিয়ে যাবে। এ অফিসার

বেলা দুটো-আড়াইটার দিকে এবং সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসে। সে জানায় যে, টঙ্গীতে পাক আর্মি তাকে বিশ্বাসই করতে চায় না, তাকে এবং তার সঙ্গে সবাইকে ‘ডিস আর্ম’ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে, এমনকি তার পাঞ্জাবীতে কথা বলার উপরে সন্দেহ প্রকাশ করে।

যাই হোক, ঐ অফিসার জায়দেবপুর থেকে টঙ্গী রওনা হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে উপরে নিজের কামরায় গেলাম। কিছু সময় পরে মেজর মইন আমার কামরায় এসে বলেন যে, আমাদের প্ল্যান নাকি পাঞ্জাবী এবং অবাঙালীদের কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছে, অথবা তারা আঁচ পেয়ে গিয়েছে। কারণ হিসেবে বলল যে, আমাদের কোন সেপাই ক্যান্টিনের কিছু পাঠান সিভিলিয়ানকে প্রকারান্তরে বলে ফেলেছে ঐ রাত্রে সাবধান থাকতে, এবং সে কথা তাদের ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম আরও সাবধান হয়ে যেতে এবং আমি ভাবছি এ ব্যাপারে কি করা যায়। এর কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন আজিজ আমাকে এসে বললেন যে, একজন স্থানীয় ছাত্রনেতা আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চায় এবং দেখা করতে চায়। আমি অল্পক্ষণ পরেই আসছি বলে দিতে বললাম (প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, যদিও ঢাকার সঙ্গে আমাদের টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তবুও জয়দেবপুরে স্থানীয় এক্সচেঞ্জ কাজ করছিল এবং গাজীপুর ফ্যাক্টরী পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ ছিল) এই মনে করে যে ছাত্রনেতার সঙ্গে ‘ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখা করা হয়ত ঠিক হবে না এবং আমাদের ভিতরকার অবাঙালীদেরকে প্রকারান্তরে ভাব দেখানো যে কোন কিছু অঘটন ঘটতে যাচ্ছে না, আমি ‘ইউনিফর্ম’ না পরে একটা প্রাইভেট শার্ট এবং প্যান্ট পরে নীচে নেমে আসলাম। ঐ ছাত্রনেতার (তার নাম আমার এখন মনে নাই) সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে সন্ধ্যার সময় গেটের সামনে দেখা করার সময় দিলাম। নীচে নেমে আসার পর থেকে প্রাইভেট পোশাকেই সুবেদার নূরুল হক এবং অন্যান্য সকলের সঙ্গে ‘ডিটেলস টাই আপ’ অর্থাৎ খুঁটনাটি বিষয়ে নির্দেশাদি দিতে ব্যস্ত ছিলাম। এ সময় আমি যথেষ্ট চিন্তাকুল এবং উদ্ভিগ্ন ছিলাম। কারণসমূহ ছিল (১) মেজর শফিউল্লাহ টাঙ্গাইল পৌঁছেছেন কিনা এবং আগে কি করেছেন তার তখন পর্যন্ত পাই নাই, (২) ময়মনসিংহ কোম্পানীর সঙ্গে সকাল থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, (৩) আমাদের প্ল্যান যদি খোদা-না-খাস্তা সফল না হয়ে তাহলে পরিণতি কি, (৪) বিদ্রোহের ভবিষ্যৎ কি, এবং (৫) আমার ফ্যামিলি এবং ছেলেরা যারা ক্যান্টনমেন্ট আছে তাদের ভাগ্যে আগামীকাল থেকে কি পরিণতি ইত্যাদি। আমার এই চিন্তাযুক্ত ভাব দেখে হয়ত কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেন আমি তাদের সঙ্গে যাব কিনা। আমি তাদেরকে উত্তরে বললাম যে, সব কিছু প্ল্যান করে তো পিছনে থাকা যায় না, কারণ পরিব্রাণ পাওয়া যাবে না। যাক, বেলা প্রায় ৪টার দিকে খবর পাওয়া গেল যে, মেজর শফিউল্লাহ টাঙ্গাইল অতিক্রম করে ওখানকার কোম্পানী সমেত ময়মনসিংহের পথে রয়েছেন। কিছু আশ্বস্ত হওয়া গেল।

এখন আমাদের খেয়াল ‘লাস্ট মিনিট কো-অর্ডিনেশন’, বিশেষ করে রাজেন্দ্রপুরের প্লাটুন এবং গাজীপুরের কোম্পানীর সঙ্গে। ক্যাপ্টেন আজিজ যথেষ্ট জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজেন্দ্রপুরের প্লাটুনকে বলে আসলেন সন্ধ্যার সময় তাকে তাদের অয়ারলেস খুলে রাখতে এবং ‘সাংকেতিক বাক্য’ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তারা সেখানকার তার ডিঙ্গিয়ে নিজের বন্দোবস্তে বেরিয়ে পড়েন। এম্যুনিশন ডিপোতে ঢোকান উপর সব সময় কড়াকড়ি, এবং ঐ সময়ে খুব বেশী ছিল। ঐ জায়গার ও-সি বা অধিনায়ক ছিলেন এক অবাঙালী। ক্যাপ্টেন আজিজ তাকে যেয়ে বললেন যে, তিনি এসেছেন ‘সামারী অব এভিডেন্স’ রেকর্ড করতে। দুই রাত আগে যে দুইজন লোক আমাদের প্লাটুন থেকে পালিয়ে ছিল, তাদেরকে এ্যারেস্ট করে রাখা হয়েছে এবং সি-ও সাহেব আগামীকাল তাদের ‘সামারী কোর্ট মার্শাল’ করবেন। ভিতরে ঢুকবার অনুমতি পাওয়া পর্যন্ত ক্যাপ্টেন আজিজের উপর স্টেনগান তাক কার ছিল। এইসব ঘটনাপ্রবাহে ঐ দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার অফিসাররা উতলা হয়ে ওঠেন যাওয়ার সময় সংকেত দেওয়ার জন্যে। সন্ধ্যার সময় বা কিছু আগে খবর পেলাম আমাদের ময়মনসিংহ কোম্পানীর সঙ্গে অয়ারলেসে সংযোগ স্থাপন হয়েছে। ঐ কোম্পানী কমাণ্ডারকে নিজে সাংকেতিকভাবে জানিয়ে দিলাম যে মেজর শফিউল্লাহ তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে টাঙ্গাইল ছেড়ে আরও এগিয়ে গেছেন, এবং আমরাও রওনা হচ্ছি। আমি সন্ধ্যাটা একটু গাঢ় হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। ঐ দিন সন্ধ্যা থেকে ঐ অঞ্চলে

কারেন্ট ছিল না, অতএব ছিল গাঢ় অন্ধকার। (পরে জেনেছিলাম যে, টঙ্গী থেকে আর্মি ইলেকট্রিক কানেকশন অফ করে দিয়েছিল-বোধ হয় পরের দিন আমাদের উপর অপারেশন চালানোর জন্যে, এবং অবশ্য আমরাও লাইন কেটে দিয়েছিলাম।) দিনের ভিতর মেজর মইন, অন্যান্য অফিসার এবং জেসিও'রা মিলে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আমাদের সকলের উঠানোর জন্যে গাড়ী বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন। যাই হোক, রাত্রি আটটার সময় প্রয়োজনীয় লোকদেরকে আমার অফিসে একত্রিত করি-মিলিটারী ভাষায় যাকে বলে 'ও' গ্রুপ। আমি রাত ৮-৩০ মিঃ সময় নির্দেশ করি অর্থাৎ ঐ সময় থেকে আমাদের 'মুভ'-এর কার্যাবলী শুরু হবে। কিন্তু ঐ সময় আমাদের কোন একজন বলে উঠলেন সময়টা একটু পিছিয়ে দিতে, কেননা তার উপর যে একটা দায়িত্ব অর্পিত ছিল তার প্রস্তুতির জন্যে আর একটু সময়ের প্রয়োজন। আমি তখন রাত ৮টা ৪৫ মিঃ সময় নির্ধারণ করে দিলাম।

এর আগে ক্যাপ্টেন আজিজকে একটা নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, আমি আমাদের 'মুভ'-এর অর্থাৎ যাত্রা শুরুর সময় দেওয়ার পর পরই তিনি এক সেকশন (দুটি) মেশিনগান এবং এক সেকশন (দুটি) রিকয়েললেস এ্যান্টি- ট্যাংক গান নিয়ে জয়দেবপুরের চৌরাস্তায় গিয়ে টঙ্গীর দিকে তাক রেখে রোড ব্লক সৃষ্টি করেন, যাতে আমাদের মুভের সময় টঙ্গীর দিক থেকে পাক আর্মি কোন গুণ্ডগোল করতে না পারে এবং বাধা পায়। আমার 'অর্ডার' শেষ হওয়ার পর ক্যাপ্টেন আজিজ আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার নিজের কাজে চলে গেলেন।

বলাবাহুল্য যে, ঐ সময় পর্যন্ত দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময়কার প্রাইভেট জামাকাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলাম। অর্ডার শেষ করার পর নীচের মেসে এসে দেখি যে, অবাঙালী দু'জন অফিসার-ক্যাপ্টেন রিয়াজ এবং নকভী খাওয়ার টেবিলে বসে রাত্রে খাবার খাচ্ছেন। আমিও তাদের সঙ্গে বসে রাত্রে খাবার খেলাম এবং তাদেরকে কিছু কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখলাম। বুঝলাম যে, আমাদের প্লান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং আমাকে সিভিল কাপড়ে দেখে উৎকণ্ঠ। যদিও কিছু হয়েও থাকে-সরে গেল।

৮টা ৪০ মিঃ কি ৮টা ৪২ মিঃ-এর দিকে আমি উপরে নিজের কামরায় উঠে গোলাম পেশাক পরে তৈরি হবার জন্যে। উপরে অন্ধকার ছিল। নীচে মেসের গ্যাসের আলো থেকে উপরে উঠে অন্ধকারটা আরও বেশী লাগছিল। আমি মনে করলাম যে, একটু অপেক্ষা করি। কেননা একটু পরেই 'এ্যাকশন' শুরু হবে এবং অবাঙালীদের নিরস্ত্র বা কিছু করার পর আমার কাছে কেউ নিশ্চয় আসবে। তখন আমি তৈরী হয়ে নেব। আমাদের প্লান ছিল যে সঙ্গেকার পাকিস্তানীদেরকে নিরস্ত্র কবর, এবং যদি তারা বাধা দেয় তখন গুলি চালাতে হবে, তবে গুলি চালানো হবে যথাসম্ভব স্বল্প এবং ক্ষিণ-ভবিষ্যতের জন্য গোলাগুলি বাঁচাতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে বা ঐ সময়ের ৫-১০ সেকেন্ড আগে নীচে গুলি বিনিময় শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে এবং প্রচণ্ডতা বেশ বেড়ে গেল। আমি তখন উপরের তলায় একটু একটু সতর্ক হয়ে উঠলাম। আমার কাছে তখন কোন হাতিয়ার ছিল না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম যে কোন লোক সম্ভ্রান্তভাবে অথচ তাড়াতাড়ি পা টিপে সিঁড়ি বেয়ে উপরের তলায় উঠে আসল। আমি একটু আশাবিহীন ছিলাম আমাদের কেউ হবে। কিন্তু সিঁড়ি শেষ হওয়ায় তার পায়ের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। সংশয় বেড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আওয়ার পেলাম আর একজন লোকের জোর কদমে উপরে উঠে আসার। শেষোক্ত লোকটা যখন মাঝসিঁড়িতে তখন প্রথমোক্ত লোকটা তার উপর টর্চলাইটের আলো ফেলে। নীচের লোকটি তখন জিজ্ঞাস করে ওঠে "কোন হ্যায়?"। উপরের লোকটি বলে, "আমি ক্যাপ্টেন নকভী, কেন?" নীচের লোকটি বলে ওঠে, এয়া, নকভী বেঁচে, তারপরই সে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। আমি অনুভব করলাম যে, আগের লোকটা, অর্থাৎ যে উপরের তলায় রয়ে গিয়েছে, সে হল ক্যাপ্টেন নকভী-অবাঙালী এবং সশস্ত্র। এত কিছু করার পরেও নিজের জন্যে ভরাডুবি। পরিণতি কি আল্লাহ জানে। হঠাৎ খেয়াল হল, এমনিও শেষ, ওমনিও শেষ, ঘটনা অজানার একটু ভান করে দেখা যাক না। একটু সতর্ক থেকে, পিলারের আড়াল থেকে নকভীর সঙ্গে কথা বলে জিজ্ঞাসা করলাম "ব্যাপার কি, নীচে গোলাগুলি চলছে কেন?" সে বলল, "জানি না স্যার, ওরা আমাদের উপর গুলি করছে, দেখেন আপনি টেলিফোনে

এ্যাডজুটেন্টকে পান কিনা।” বুঝলাম যে, তার বিশ্বাস যে সমস্ত ঘটনা আমার অজ্ঞাতে। তার বিশ্বাসটা আর একটু পাকা করার জন্যে আমার নিজের কামরায় রাখা পল্টনের এক্সচেঞ্জের টেলিফোন ঘোরালাম। জানতাম কেউ জবাব দেবে না। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম যে, নীচের থেকে সবাই চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি যেতে পারছি না, আটকা পড়ে গেছি ক্যাপ্টেন নকভীর হাতে। ঐ অবস্থায় রাত কাটল।

২৯শে মার্চ ১৯৭১ঃ সকালে দেখলাম বহু লোকজন বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার নিয়ে রাজবাড়ী ঘিরে রেখেছে। আমাদের উপর কড়া প্রহরা। লোকজনও বদলী হতে থাকল, আমিও চিন্তা করতে থাকলাম কিভাবে ফন্দি বের করা যায় এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। কিন্তু বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। দিন বেড়ে চলছিল। প্রায় সাড়ে এগারটার দিকে প্লেনের আওয়াজ পেলাম। কিছুক্ষণ পড়ে দেখলাম যে, দু’টো এফ-৮৬ প্লেন রাজবাড়ীর যে অংশে সৈন্যরা থাকত এবং আমাদের গাড়ীসমূহ থাকত, সেই অঞ্চলে স্ট্রাফিং করছে। বুঝলাম ঢাকায় সব খবর হয়ে গিয়েছে এবং আর্মি শিগগিরই আসছে। বেলা দুটা- আড়াইটার দিকে দেখলাম রাজবাড়ীর সম্মুখ অংশ সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে এবং পোর্টেবল মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, “সেকেণ্ড বেঙ্গলের যারা যারা আছো, সারেঞ্জার কর।” আমার নাম ধরেও একই ঘোষণা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের মুখ দিয়ে শুনলাম। তখন ক্যাপ্টেন নকভী আগে এবং আমি পিছনে সারেঞ্জার করতে বাধ্য হলাম। ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব, ব্রিগেডিয়ার হাসানের সঙ্গে ৮-বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল। ব্রিগেডিয়ার মজুমদাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমি কোন বিদ্বেষ নিয়ে লিখি নাই। আমার বর্ণিত কোন ঘটনা কেও যদি অসত্য বলে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি মিথ্যাচারীর কালিমা নেব।

-
আবদুর রকীব
লেঃ কর্ণেল(অবঃ)

মেজর জেনারেল (অবঃ কে, এম, শাফিউল্লাহর প্রতিবাদ ‘বিচিত্রা’ ১৯৮৩

১৩ মে ১৯৮৩ সংখ্যা বিচিত্রায় ‘স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা পর্ব’ এই শিরোনামে লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কাজী আবদুল রকীবের লেখা একটি নিবন্ধ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি তার নিবন্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময় তাঁর নিজস্ব ভূমিকার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে সব অবাস্তব বক্তব্যের অবতারণা করেছেন। এই নিবন্ধে বর্ণিত অনেককেই আমার মত আশ্চর্যান্বিত না করে পারে না। সম্পূর্ণ নিবন্ধটিতেই তিনি তার মনগড়া কাহিনী ও বিভ্রান্তিকর তথ্যে ভরে রেখেছেন। তারা পুরা নিবন্ধটির ওপর আলোচনা করার আমার কোন ইচ্ছা নেই। শুধু দু-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় আমার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সাক্ষাৎকার কখনও কাউকে হীন করে তোলার বা নিজের কৃতিত্বকে প্রকাশ করার অভিপ্রায় ছিল না। সাধারণভাবে যা ঘটেছে তাই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি মাত্র।

লেঃ কঃ রকীব দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার তিনদিন পর এই ব্যাটালিয়ন জয়দেবপুর ছেড়ে ময়মনসিংহ চলে যায়। তার বক্তব্যানুযায়ী এই ব্যাটালিয়ন জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহ যাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তিনি একাই করেছেন এবং আমরা শুধু তার নির্দেশ অনুসারেই কাজ করে গিয়েছি। এর পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত এই ব্যাপারে নিজস্ব কোন উদ্যোগ বা পরিকল্পনাই ছিল না। তিনি ২৬শে

মার্চের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে লিখেছেনঃ ঐদিন বিকালে কিছু অফিসার, জেসিওদেও সঙ্গে কথা বলার সময়-বিশেষ করে সুবেদার নূরুল হক সংশয় প্রকাশ করেন যে, আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করতে পারে। আমি এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি এবং ঐদিনই সন্ধ্যায় অতর্কিত হামলার মোকাবেলার মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ অবস্থান সুদৃঢ় করা, অধিকসংখ্যক প্রহরী নিয়োগ ইত্যাদি বন্দোবস্ত করি।

রকীব সাহেবের এই বক্তব্যে অবাক না হয়ে পারছি না, কারণ তার এই মন্তব্য আমাদেও অদূরদর্শিতা ও সমরপ্রস্তুতির শৈথিল্যেরও ইঙ্গিত বহন করে বলে আমার মনে হয়। এই ব্যাটালিয়নকে যে নিরস্ত্র করার চেষ্টা হতে পারে তা জয়দেবপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসীদেও আলোচনা ও উদ্বেগের বিষয় ছিল। তাই ১৭ মার্চ এলাকাসীরা জয়দেবপুর থেকে টঙ্গির রাস্তার উপর ৩০ থেকে ৪০টিরও বেশী ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল। যেখানে ঐ এলাকার জনসাধারণ আমাদের নিরস্ত্র করা হবে ভেবে উদ্ভিগ্ন হয়ে তাদের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল সেখানে আমরা কোন বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়া ২৬ মার্চ বিকাল পর্যন্ত নীরব, নিশ্চেষ্ট ছিলাম এটা তিনি কিভাবে চিন্তা করতে পারলেন।

জয়দেবপুরের জনগন এর ব্যাটালিয়ন সমরপ্রস্তুতির কথা কখনও ভুলবে না। এমন কি রকীব সাহেবের ও ভোলাবাবের কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি ২৬ মার্চ বিকেলেই প্রথম শুনতে পান যে এই ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা হতে পারে আর তাই তিনি ঐদিনই তা প্রতিহত করার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

রকীব সাহেবের অবগতির জন্য লিখছি যে, ১৯ মার্চ ১৯৭১ শুক্রবার বিগ্রেডিয়ার জাহানজেব আরবার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সজ্জিত ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে এই ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার অভিপ্রায় ঢাকা থেকে জয়দেবপুর এসেছিলেন। সেদিন যদি এই ব্যাটালিয়ন সমরপ্রস্তুতিতে কোন ত্রুটি বা শৈথিল্য থাকত তা হলে ঐদিনই এই ব্যাটালিয়ন নিরস্ত্র করা হত। সেদিন বিগ্রেডিয়ার জাহানবেজ আরবাব রাজবাড়ীতে ঢুকেই ব্যাটালিয়নের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি দেখে আমাদেরও নিরস্ত্র করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকে। লেঃ কর্নেল মাসুদুল হাসান (তৎকালীন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার) বস্তুতঃ সেদিনই তার ব্যাটালিয়নের কমান্ড হারিয়েছিলেন।

২৭ মার্চ উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে লেখক এক জায়গায় লিখেছেন, টঙ্গীর গোলাগুলি আওয়াজ খেমে যাওয়ার পর আমি মেজর শফিউল্লাহ, মেজর মইন, ক্যাপ্টেন আজিজ ও সুবেদার নূরুল হককে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য আমার নিজের কামরায় ডেকে পাঠালাম। তারা এসে পৌঁছাতেই আমি বললাম যে পরিস্থিতি এখন অসহ্য, আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আপনাদের মতামত কি? কেউ উত্তর দিলেন না। আমি ধরে নিলাম মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ।

রকীব সাহেবের নিবন্ধের এইটুকুই সবচেয়ে বড় অসত্য উদ্ধৃতি। সঠিক কথা হল সন্ধ্যায় আমি তাকে প্রথমবার সরাসরি বলি যে আমাদের আর জয়দেবপুর থাকা উচিত নয়। তাকে আরও বলি যে ব্যাটালিয়নকে ময়মনসিংহে একত্রিত করার সমস্ত পরিকল্পনা করে ফেলেছি। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। আমার কথায় তাকে চিন্তিত ও উদ্ভিগ্ন হতে দেখি। যদিও এটা উদ্ভিগ্ন হওয়ার মত কথাই ছিল, কারণ আমরা যা করতে যাচ্ছি তা সহজ ভাষায় হচ্ছে বিদ্রোহ এবং তার পরিণতি কি হতে পারে তাও কোন সৈনিকের অজানা থাকার কথা নয়।

২৫শে মার্চ বিকালে যখন তিনি এই ব্যাটালিয়নের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন তখন থেকেই আমি তার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম এবং ব্যাটালিয়নের বিস্তারগোণনুখ পরিস্থিতি সম্পর্কে অর্থাৎ ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা যে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সম্পূর্ণভাবে মানসিক ও সামরিকভাবে তৈরি আছে তা তাকে আভাসে ও ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

২৭শে মার্চেই আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই যে জয়দেবপুরে বসে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং সেদিনই রকীব সাহেবকেও আমাদের পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলি। এ পরিকল্পনা আমাদের অনেক আগেই করা ছিল এবং তা বাস্তবে পরিণত করার সিদ্ধান্ত সেদিনই নিই। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাকে খোলাখুলিভাবে কিছু বলেত পারিনি, কারন রকীব সাহেব এমন এক সময় এবং এমন এক পরিস্থিতিতে আমাদের ব্যাটালিয়নে এসেছিলেন যে তখন তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং তার পক্ষেও হয়ত এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মনোভাব বোঝা সম্ভব ছিল না। তাই ২৭শে মার্চ যখন আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই তখনই আমি তাকে খোলাখুলিভাবে বলতে সাহস পেয়েছি। তার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে এই ব্যাটালিয়নের পরিস্থিতি ও আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্ক আলোচনা না করার কতকগুলি কারনও ছিল।

(ক) লেঃ কর্নেল মাসুদ অপসারণ করে, ২৫শে মার্চ বেলা ৪টায় লেঃ কর্নেল রকীবকে এই ব্যাটালিয়নের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য পাঠান হয়। লেঃ কর্নেল মাসুদকে আমরা যেভাবেই বিশ্বাস করতে পারতাম সেভাবে লেঃ কর্নেল রকীবকে বিশ্বাস করতে পারি নাই, কারন লেঃ কর্নেল মাসুদ এই ব্যাটালিয়নে প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তার মনোভাবও আমাদের সবার জানা ছিল। কিন্তু লেঃ কর্নেল রকীব কমিশন পাওয়ার পর থেকেই পাঞ্জাব রেজিমেন্ট চাকুরিরত ছিলেন এবং ব্যাটালিয়নের প্রত্যেকের নিকট তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তার মনোভাব বুঝবার অবকাশ বা সুযোগ আমার হয়নি এবং তিনিও তার মনোভাব আমার নিকট প্রকাশ করেননি।

(খ) ১ মার্চ কারফিউ জারি করে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ ঢাকার নিরীহ জনগনের উপর যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তাতে পাকিস্তানী যেসব ব্যাটালিয়ন অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে লেঃ কর্নেল রকীব সাহেবের ব্যাটালিয়ন ৩২ পাঞ্জাবও ছিল। ২৫ মার্চ যখন তিনি আমাদের ব্যাটালিয়নে আসেন আমি তাকে ১ মার্চের ঐ হত্যাযজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন এমন কিছু হয়নি; ব্যাটালিয়নের লোকজন দু’একটি ফাঁকা আওয়াজ করেছে মাত্র। এতে তার প্রতি আমার সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাই তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারছিলাম না। ঐদিন ঢাকা শহরে যে কি ঘটেছিল তা নিশ্চয়ই আজও কেউ ভোলেনি।

রকীব সাহেব লিখেছেন ২৭ মার্চে সন্ধ্যায় তিনি উপলব্ধ করেন যে আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি পাকিস্তানীদের পক্ষ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার বর্ণনা অনুসারে তার পরিকল্পার কার্যকারিতা শুরু হয় পরদিন সকাল ১০টা থেকে অর্থাৎ ২৮ মার্চ সকাল ১০টা থেকে।

তিনি নিজেই লিখেছেন এই ব্যাটালিয়নের একজন অবাস্তবী অফিসার কাজেম কামাল ও আমি ছাড়া বাকি সবাই ছিল তার কাছে অপরিচিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এমন একটি সম্পূর্ণ অজানা ও অচেনা পরিবেশে কি করে তিনি এত বড় পরিকল্পনা একাই করে ফেললেন! আর ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি আমাদের ডেকে বললেন-‘পরিস্থিতি এখন অসহ্য, আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।’ আর আমরাও তার কথা মেনে নিয়ে ময়মনসিংহের দিকে রওয়ানা দিলাম।

২৮ মার্চের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তার উপর মন্তব্য করা আমার পক্ষে ঠিক হবে না, কারণ ঐদিন সকাল ১০টায় আমি জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহের দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। সেদিনের ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণ তারাই দিতে পারবে যারা ঐদিন তার সঙ্গে ছিল। যেমন মেজর মইন, ক্যাপ্টেন নাসিম, ক্যাপ্টেন আজিজ, ক্যাপ্টেন এজাজ এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম প্রমুখ।

তিনি তার নিবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন-‘এ সময় আমি যথেষ্ট চিন্তিত ও উদ্ভিগ্ন ছিলাম। কারনসমূহ ছিল (১) মেজর শফিউল্লাহ টাঙ্গাইল পৌঁছালেন কিনা এবং আগে কি করছেন তার খবর তখন পর্যন্ত পাই নাই।...’এ অংশের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখতে হয় যে, ঐ সময় দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জয়দেবপুর, গাজীপুর, রাজেন্দ্রপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল। আমাদের শক্তি বৃদ্ধির

জন্য আমরা চাচ্ছিলাম ছড়িয়ে থাকা অংশগুলিকে সরিয়ে নিয়ে জায়গায় সংঘবদ্ধ হতে। ময়মনসিংহকেই সবাই একত্রিত হওয়ার উপযুক্ত জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম এবং সেখানে ব্যাটালিয়নের অন্যান্য অংশ কখন কিভাবে পৌঁছাবে তার একটা পরিকল্পনা গ্রহন করি এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাটালিয়নের কিছু অংশ নিয়ে আমি জয়দেবপুর থেকে সকাল ১০টায় ময়মনসিংহের দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। আর বাকী অংশ ঐদিনই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জয়দেবপুর থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। আমি বুঝতে পারছি না, চলে আসার পর রকীব সাহেব আমার জন্য কেন এত উদ্ভিগ্ন ছিলেন। ময়মনসিংহে আমি তো শত্রুশ্রম মোকাবেলা করতে যাইনি যে আমার জন্য তিনি উদ্ভিগ্ন থাকবেন। উদ্ভিগ্ন আমি ছিলাম যে ব্যাটালিয়নের অন্যান্যরা নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারল কিনা। তার উদ্বেগের প্রধান কারণ হওয়া উচিত ছিল কিভাবে ব্যাটালিয়নের বাকী সবাইকে নিয়ে নিরাপদে ময়মনসিংহে পৌঁছানো যায়।

২৯ মার্চ ভোরে যখন ব্যাটালিয়নের সবাই আমার সঙ্গে মুক্তাগাছায় মিলিত হয়, তখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি কমান্ডিং অফিসার সাহেব কোথায়? তখন অনেকে আমাকে এই কথাই বলেছে যে তারা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় অফিসার্স মেসের ব্যালকনিতে সি-ও সাহেব ও ক্যাপ্টেন নকভীকে (একজন অবাস্তবিক অফিসার) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। কি পরিস্থিতিতে রকীব সাহেব ঐ জায়গায় রয়ে গেলেন সে ব্যাপারে তিনি যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন সেটা কি সত্যের অপলাপ নয়? আমাদের পূর্ব পরিকল্পনামত ২৮ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জয়দেবপুর, গাজীপুর ও রাজেন্দ্রপুর থেকে একই সময় সবাইকে নিজ নিজ কর্মস্থল ত্যাগ করে ময়মনসিংহের দিকে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। রকীব সাহেব এই সময়সূচী পরিবর্তন করে সাড়ে আটটা কেন করেছিলেন তা তিনি লেখেননি।

তার নিজের কথা অনুযায়ী সাড়ে আটটায় রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা তখন পর্যন্তও তিনি যেখানে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং ৮ টা ৪২ মিনিটে তিনি তার কামরায় চলে যান এবং সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, যে কেউ এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। যেখানে তার ৮টা ৩০ মিনিটে জয়দেবপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা সেখানে তিনি ৮টা ৪২ মিনিটে তার কামরায় ফিরে গেলেন কেন? এটাই কি তার ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যাওয়ার লক্ষণ ছিল?

ক্যাপ্টেন নকভীর হাতে সারা রাত আটকে থাকার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেটাও কি গ্রহণযোগ্য? তার নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা যে সেই অনিশ্চিত দিনগুলিতে আমরা সর্বক্ষণই সশস্ত্র থেকেছি, কখনও নিরস্ত্র অবস্থায় থাকিনি। সেদিনের সে অনিশ্চয়তা ও সঙ্কটময় সময়ে তার সঙ্গে অস্ত্র না থাকাই কি অস্বাভাবিক ছিল না?

তার নিকট আমার আরও জিজ্ঞাস্য যে, গোলাগুলির মুখে যখন এই ব্যাটালিয়নের সবাই চলে আসতে পারল তখন কেন চলে আসতে পারলেন না ব্যাটালিয়ন কমান্ডার? পাকিস্তানীরা তো জয়দেবপুর রাজবাড়ি ঘেরাও করেছিল ২৯ মার্চ দুপুরের পর। আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ঐকান্তিকতা যদি সেদিন সত্যি তার থাকত তাহলে ২৮ মার্চের সারারাত ও ২৯ মার্চের দুপুর পর্যন্ত সময়টুকু কি যথেষ্ট ছিল না? ২৯ মার্চের ভোরে যখন রাজবাড়ীতে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী স্ট্রাফিং ও বোমাবর্ষণ করছিল তখনও কি তিনি পারলেন না এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে?

২৯ মার্চ দুপুরের পর ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী এসে জয়দেবপুর রাজবাড়ী ঘেরাও করে ও রকীব সাহেবকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসারদের ন্যায় তাকেও সেলে রাখা হয়। ঐ সময় সেলে থাকাকালীন সময়ে অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসারদের ভাগ্যে যখন নানা প্রকার লাঞ্ছনার শেষ ছিল না তখন তার প্রতি কর্তৃপক্ষের সদয় ব্যবহারের কারণ কি ছিল? অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসারদের যখন পশুর মত ছোট একটি সেলে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল তখন তার থাকার জন্য কেন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল? এসবের জবাব কি তিনি দিতে পারবেন?

রকীব সাহেব তো তার দীর্ঘ নিবন্ধে কোথাও এ কথা লেখেননি যে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে তাকে নিয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানীরা কি ব্যবস্থা নিয়েছিল? তিনি তো একথা লেখেননি যে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে আবার পাঞ্জাব ব্যাটালিয়নের কমান্ড দেয়া হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, লেঃ কর্নেল মাসুদ, লেঃ কর্নেল জলিল, লেঃ কর্নেল ইয়াসিন আরও অনেককেই তো কমান্ড থেকে অপসারিত করে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারা তো কেউ তাদের কমান্ড আর ফিরে পাননি। উপরন্তু যাদের উপর যে অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার চালান হয়েছিল তার চিহ্ন তো আজও তাদের অনেকের শরীরে রয়ে গেছে।

লেঃ কর্নেল রকীবের উপর আমার ব্যক্তিগত কোন ক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই। কিন্তু তার নিবন্ধের উপর কিছু আলোকপাত করতে গিয়ে আমাকে যেসব কথা লিখতে হল সেজন্য আমি দুঃখিত। একবার ভেবেছিলাম যে এ নিবন্ধের উপর কোন মন্তব্য করব না, করা উচিত নয় কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম যে প্রতিবাদ না করলে অসত্য সত্য হয়ে থাকবে। তাই আমাকে লিখতে হল।

জয়দেবপুর-তেলিয়াপাড়ার প্রতিরোধ যুদ্ধ

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মোরশেদ খান*

২৫ শে মার্চ সকালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এবং টঙ্গী টেলিফোনে এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং খবরাখবর নিই। জয়দেবপুরের জনসাধারণ তখন দারুণভাবে উত্তেজিত। তারা টেলিফোনে আমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য দারুণভাবে চাপ দিতে থাকে। দুপুর বারটার সময় টঙ্গী টেলিফোনে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে জানতে পারি যে, পাঞ্জাবী কমান্ডে ব্যাটালিয়নের কিছু সাধারণ পোশাকধারী সৈন্য টঙ্গী ব্রিজ দখল করে জনসাধারণের উপর গোলাগুলি চালাচ্ছে। তখন আমরা বুঝতে পারি এবং দখল করে জনসাধারণের উপর গোলাগুলি চালাচ্ছে। তখন আমরা বুঝতে পারি এবং ধারণা করি যে পরবর্তী আক্রমণ হয়তবা আমাদের উপর করবে।

রাত্রে আমরা পাঞ্জাবীদের দ্বারা আক্রান্ত হবো মনে করে জয়দেবপুর প্যালেসের চতুর্দিক পরিখা খনন করে পাহারা দিই। আমি কর্তব্যরত থাকাবস্থায় রাত প্রায় সাড়ে বারোটার সময় ঢাকা থেকে টেলিফোন গেল এবং সে টেলিফোন করেছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান স্বয়ং। তিনি আমার অফিসার কমান্ডিং লেঃ কঃ রকীবকে ডাকতে বলেন। আমি লেঃ কঃ রকীবের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করি এবং লেঃ জেঃ টিক্কা খানের টেলিফোনের কথা জানাই। লেঃ কর্নেল রকীব অফিসে আসবার পূর্বেই পুনরায় টিক্কা খানের এডিসি টেলিফোনে করেন। তিনি আমার কাছে জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর খবর জানতে চান। অর্থাৎ জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী জনসাধারণ আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিতে পারে। কাজেই তাকে রক্ষা করার জন্য আমরা কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি সে কথা জানতে চান। তার জবাবে আমি বললাম যে জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর খবর পুরাপুরি জানি না। তবে আমাদের সঙ্গে দু'টি অয়ারলেস সেট আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতির কথা জানাব। এমন সময় লেঃ কর্নেল রকীব আমার অফিসে চলে আসেন এবং আমি তাঁকে টিক্কা খান ও তার এডিসির টেলিফোনের কথা জানালাম। তিনি তখন আমাকে একজন অফিসারের নেতৃত্বে এক প্লাটুন সৈন্য জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে পাঠাতে বলেন এবং অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে খবর দিতে বলেন। আমি তার নির্দেশমত কাজ করলাম। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন অফিসার আমার ডিউটি কক্ষে আসলেন। তাঁদের সঙ্গে সারারাত পরিস্থিতির উপর আলোচনা হয়।

২৫শে মার্চ সকাল আটটায় রেডিওতে সামরিক আইনের ঘোষণা শুনি। এর পর থেকে আমরা সবাই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং কি করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা করি। এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে

*১৯৭১ সালের মার্চ ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টে লেফটেন্যান্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বাংলা একাডেমী দলিলপত্র থেকে সংকলিত সাক্ষাৎকারটি ১৯৭৩ সালে গৃহীত।

আমরা জয়দেবপুর থেকে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে আমরা অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে দুই প্লাটুন সৈন্য এবং রাজেন্দ্রপুর এম্যুনিশন ডিপোতে এক প্লাটুন সৈন্যের কথা চিন্তা করি এবং তাদেরকে কিভাবে আমাদের মাঝে আনতে পারি সে বিষয়ে চিন্তা করি। এভাবে ২৬শে মার্চ জয়দেবপুর কাটাই।

২৭শে মার্চ সকালে আমরা সবাই মিলে লেঃ কর্নেল রকীবকে কিছুটা জোর করে অয়ারলেসে ময়মনসিংহে অবস্থিত কোম্পানীকে জানাতে বললাম যে, তারা জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দেয় এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করে। লেঃ কর্নেল রকীব তখন অয়ারলেসে ময়মনসিংহে মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) নূরুল ইসলামকে আমাদের কথা জানাতে বাধ্য হলেন এবং তাদেরকে জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে বলেন।

২৮শে মার্চ ক্যাপ্টেন (বর্তমান মেজর) আজিজকে সকালে পাঠানো হল রাজেন্দ্রপুর "এম্যুনিশন ডিপোতে" এবং সেখানে তিনি গিয়ে আমাদের বাঙ্গালী কোম্পানীকে খবর দেবেন কিভাবে তারা বের হয় এবং আমাদের পাওয়া মাত্র যেন বের হয়। এ খবর নিয়ে ক্যাপ্টেন আজিজ চলে গেলেন।

সকাল দশটার সময় ৪টা ট্রাক ও ৩টা জীপ নিয়ে আমরা এক কোম্পানী অগ্রসর হলাম ময়মনসিংহের দিকে। আমি টাঙ্গাইল থেকে গেলাম। পুরা কোম্পানী নিয়ে মেজর শফিউল্লাহ ময়মনসিংহ চলে যান। যাবার পথে বহু লোক পথের মধ্যে হাত তুলে ও 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে আমাদেরকে স্বাগত জানায়।

আমি টাঙ্গাইল পৌঁছেই জানতে পারলাম যে টাঙ্গাইলে অবস্থিত বাঙ্গালী কোম্পানী পূর্বেই জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ শুরু করেছে। তখন আমার সঙ্গে কাদের সিদ্দিকী আলাপ করতে আসেন। কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর কয়েকটি গাড়ী সংগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি দিল।

আমি আমার কোম্পানীর সৈন্যদের নিকট গিয়ে তাদেরকে আমার আয়ত্তে নিলাম। উক্ত কোম্পানীর কোম্পানী কমাণ্ডার ছিলেন মেজর কাজেম কামাল (পাঞ্জাবী)। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম ভয় না করার জন্য। সন্ধ্যায় ডাকবাংলোতে কাজেম কামালের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করি। পরে আমি আমার ড্রাইভার ও গার্ডকে নিয়ে জীপে রাস্তায় বেরলাম জয়দেবপুর থেকে আমাদের কোম্পানী আসছে কিনা দেখবার জন্য। কিছুদূর যাবার পর অনেক দূরে একটি গাড়ীর আলো দেখতে পাই। মনে হল আমাদের সৈন্যরা জয়দেবপুর থেকে আসছে। আমি ডাকবাংলোতে ফিরে আসছি এমন সময় ডাকবাংলোতে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল। সোজা ডাকবাংলোতে না পৌঁছে আমি আমার সুবেদারকে ডেকে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করলাম। সুবেদার বললো, স্যার কিছু না, সব ঠিক আছে। গোলাগুলি শেষ হবার পর ডাকবাংলোয় গিয়ে দেখি মেজর কাজেম কামাল ও তার সাথে আরও ৫/৭ জন পাঞ্জাবী সৈন্য আহত ও নিহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মেজর কাজেম কামাল ও তার পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমার অনুপস্থিতিতে পালানোর চেষ্টা করে এবং গুলি শুরু করে। আমাদের সৈন্যরা পাল্টা গুলি করলে তারা আহত ও নিহত হয়। এমন সময় আমাদের জয়দেবপুরের সৈন্যরা টাঙ্গাইল পৌঁছে।

জয়দেবপুরের সৈন্যরা টাঙ্গাইল পৌঁছেল তারা আমাকে আমার কোম্পানীসহ ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হতে বলে এবং তারাও ময়মনসিংহের দিকে রওনা দেয়। আমি তখন নিহত পাঞ্জাবী সৈন্যদের সরিয়ে ফেলার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করি। আমার গাড়ী তখনও সংগ্রহ না হওয়ায় আমি নিজেই কয়েকটি গাড়ী তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করি। তখন রাত প্রায় তিনটা। আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হই। রাস্তায় অনেক ব্যারিকেড থাকায় বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলাম না।

২৯শে মার্চ ভোরে আমরা মুক্তাগাছার কাছাকাছি পৌঁছলাম। আমাদের পূর্বে জয়দেবপুর থেকে যে সেনাদলটি ময়মনসিংহ রওনা দিয়েছিল তারাও মুক্তাগাছায় পৌঁছেছিল। তারা ময়মনসিংহের দিকে রওনা দেয়। আমি মুক্তাগাছাই রয়ে গেলাম। মধুপুরেও কিছু সৈন্য ছিল। সকাল দশটার দিকে মেজর নূরুল ইসলাম ময়মনসিংহ

থেকে টেলিফোনে বললেন....আমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া কালিহাতী ব্রীজ উড়িয়ে দিতে। আমি মেজর নূরুল ইসলামকে বললাম ব্রীজ উড়ানোর মত তেমন কোন এক্সপ্লোসিভ নেই। কেননা তখন আমার নিকট আশি পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ ছিল। তা দিয়ে সম্ভব হলে আমি চেষ্টা করবো। আমি কালিহাতী ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য পিছনে ফিরলাম। কালিহাতী ব্রীজ উড়ানোর জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছিলাম। এমন সময় কাদের সিদ্দিকী সেখানে পৌঁছেন এবং তাঁকে আমরা টাঙ্গাইলে ফেলে আসাতে দুঃখ প্রকাশ করি। গ্রামের ও আশেপাশের লোকজন তখন অনেক জমা হয়েছে। তারা আমার ব্রীজ উড়ানোর কথা শুনে আপত্তি করেন। কেননা চতুর্দিকে গ্রাম ছিল। পাঞ্জাবীরা তাদের অত্যাচার করবে, এ জন্য গ্রামবাসী ব্রীজ উড়ানোর পক্ষে মত দেন নাই। আমার নিকটও অল্প এক্সপ্লোসিভ থাকায় ব্রীজ উড়ানো সম্ভব হলে না, কাদের সিদ্দিকী আমার কাছে একটা পিস্তল চাইলেন। কিন্তু পিস্তল না থাকায় তাকে দিতে পারলাম না। তারপর সেখান থেকে সোজা ময়মনসিংহ রওনা দিই। বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে ময়মনসিংহে পৌঁছলাম। ময়মনসিংহে চতুর্দিকে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল। আমরা পাঁচটা কোম্পানী তখন ময়মনসিংহে একত্রিত হয়েছি। সেখান থেকে আমাদের অপারেশন পরিকল্পনা শুরু করি। মেজর শফিউল্লাহ তখন আমাদের কমান্ডিং অফিসার। সেখানে জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করি।

৩০শে মার্চ ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈন্যরা ময়মনসিংহে ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় খবর পাঠাই ও যোগাযোগ করি। সীমান্ত এলাকার সমস্ত ইপিআরদের খবর দিই সীমান্ত এলাকা ছেড়ে ময়মনসিংহে পৌঁছার জন্য। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ময়মনসিংহ থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এ খবর বিভিন্ন জায়গায় পাঠাই। অয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের খবর পাই। চট্টগ্রামের ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর সঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্যদের যুদ্ধ চলছে, সে সমস্ত খবর আমরা পাই। রাজশাহী, পাবনা, বগুড়ার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। এবং জানতে পারি যে রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া পাঞ্জাবী সৈন্যরা দারুণভাবে মার খেয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বহু ইপিআর ও সাবেক সৈন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। একজন সুবেদারের কমাণ্ডে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠানো হল মধুপুর গড়ে-পাকিস্তানী সৈন্যরা ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা তার খোঁজখবর নিতে এবং অবলম্বন করতে। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমস্ত সৈন্য নিয়ে ট্রেনে নরসিংদী হয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হবো। এমন সময় খবর পেলাম কুমিল্লার ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেছে। তখন আমরা দুটি বেঙ্গল রেজিমেন্ট একত্র হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই এবং ঢাকার দিকে অগ্রসর না হয়ে ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনে ভৈরব রওনা হলাম ৩১শে মার্চ রাতে। পুরা ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভৈরব ও কিশোরগঞ্জ পৌঁছলাম ১লা এপ্রিল।

ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) মতিয়ুর রহমানের কমাণ্ডে ইপিআর-এর একটা কোম্পানী পাঠান হলো নরসিংদীতে। মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশররফ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে একজন অফিসার পাঠালেন ভৈরবে। ভৈরব থেকে তিনি কিশোরগঞ্জ চলে গেলেন মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে। সিদ্ধান্ত হলো আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার। আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছলাম। চট্টগ্রাম থেকে মেজর (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার এবং ডেপুটি চীফ অব স্টাফ, বাংলাদেশ আর্মি) জিয়াউর রহমানকে সিলেটের তেলিয়াপাড়া পৌঁছার কথা বলা হলো। এবং আমরা ২য় এবং ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমস্ত সৈন্য তেলিয়াপাড়ার দিকে অগ্রসর হবার কথা জানালাম।

আমরা ২য় বেঙ্গল এবং ৪র্থ বেঙ্গল তেলিয়াপাড়া পৌঁছলাম। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানী আশুগঞ্জ পাঠান হয়। অন্য আর এক কোম্পানী সিলেট চলে যায়। আমি আলফা কোম্পানী অর্থাৎ আশুগঞ্জে পৌঁছি ৩রা এপ্রিল। আমার সঙ্গে অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন নাসিম। ক্যাপ্টেন নাসিম ছিলেন কোম্পানী কমান্ডার, আর আমি ছিলাম সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এখানে আমরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি। জনসাধারণ আমাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। কিছু আনসার ও মোজাহিদ রিক্রুট করি। কিছু নিয়মিত সৈন্যসহ এক প্লাটুন সৈন্য পাঠাই লালপুরে (আশুগঞ্জ থেকে দেড় মাইল দক্ষিণ দিকে)।

আনুমানিক ৮ই অথবা ৯ই এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী নরসিংদী দখল করে নেয়। ১৬ই এপ্রিল ভোরে ৫টার সময় পাকিস্তানী বিমান বাহিনী হঠাৎ আশুগঞ্জে আমাদের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে ৬টা স্যাবর জেট দ্বারা। সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে আমাদের তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তানী সৈন্য ভৈরব ব্রীজের পশ্চিম দিকে ছিল এক ব্যাটালিয়ান। এক কোম্পানী প্যারাসুটে নামিয়ে দেয় আশুগঞ্জ শহরে। অন্য একটি ব্যাটালিয়ন পাঠায় লালপুর। সকাল আটটার সময় আমরা তিনদিক থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হই। তখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বেলা তিনটে পর্যন্ত যুদ্ধ অনবরত চলতে থাকে। আমাদের ১০/১২ জন সৈন্য ঐ যুদ্ধে শহীদ হন। ১৫/১৬ জন আহত হন। আমি এবং মেজর নাসিমও সামান্য আহত হই। অন্যপক্ষে পাকিস্তানী এক প্লাটুন সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয়।

মেজর কে এম শফিউল্লাহকে জানালাম আমাদের পরিস্থিতি। তিনি আমাদেরকে সৈন্য তুলে নেওয়ার কথা বললেন। আমরা সৈন্য তুলে নিয়ে তালশহরে যাই। তালশহরে পৌঁছবার পর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করি। এমন সময় একজন মুক্তিবাহিনীর ছেলে একটা হোণ্ডা নিয়ে আমাদের কাছে আসে। আমি উক্ত হোণ্ডায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যাই। কেননা আমি তখন আহত। মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে তেলিয়াপাড়া যাবার পরামর্শ দেন। আমি ঐদিন সন্ধ্যায় তেলিয়াপাড়া হেডকোয়ার্টারে পৌঁছি।

তেলিয়াপাড়ায় আমাকে জানানো হলো মাধবপুরে ডিফেন্স দেওয়ার জন্য। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও তেলিয়াপাড়ার মাঝখানে মাধবপুর। মাধবপুরে ২৫শে এপ্রিল আমরা আবার ডিফেন্স তৈরি করি। এবং শাহবাজপুর ব্রীজ ভেঙ্গে দিই। আমি অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় আগরতলা হসপিটালে চলে যাই। হসপিটালে দু'সপ্তাহ থাকতে হয়। ১লা মে আমি আবার তেলিয়াপাড়া পৌঁছি। তখনও মাধবপুরে আমাদের ডিফেন্স ছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তখন শাহবাজপুর পর্যন্ত পৌঁছেছে। তেলিয়াপাড়ায় মেজর শফিউল্লাহ আমাকে এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে শাহবাজপুর পাঠান পাকিস্তানী সৈন্যদের রেইড করার জন্য। তেলিয়াপাড়া থেকে মাধবপুর হয়ে শাহবাজপুর পৌঁছতে আমার এক রাত দুই দিন লেগে যায়।

ময়মনসিংহ-ঢাকা সিলেটের সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ

সাক্ষাৎকারঃ মেজর এম, এ, মতিন*

১২-৪-৭৩

২৯শে মার্চ ২য় বেঙ্গল জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহ হয়ে মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে কিশোরগঞ্জে আসে। মেজর মইনুল হাসান, মেজর নূরুল ইসলামও ছিলেন। আমি তাদের সাথে দেখা করে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে। তখনই বাড়ি গিয়ে মা-বাবা কে বলে চলে আসি। পাকবাহিনী কি করে আমাদের সবার খবর পেয়েছিল। বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে পাক বিমান এসে ভৈরবের ওখানে বোমা ফেলে এবং কিশোরগঞ্জের উপর দিয়ে উড়ে যায়।

রাত ১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার দিকে রওনা হই। আমরা সংখ্যায় ৮০০'র উপরে ছিলাম। সেকেন্ডে বেঙ্গলের পুরা ব্যাটালিয়নসহ বিস্তারিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাত্রা করি।

৩০শে মার্চ ভোরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌঁছাই। ওখান থেকে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে (সিলেট) যাই সকাল ৮টার দিকে। ওখানে মেজর খালেদ মোশাররফ আগে থেকেই ছিলেন। মেজর মোশাররফ চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে ছিলেন। ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ওখানে ছিলাম। দুটি বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টার ওখানে করি। দুটি

*১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত।

বাহিনী মিলে আলাপ আলোচনা করে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ তারিখে বিএসএফ-এর অফিসারবৃন্দ আমাদের হেডকোয়ার্টারে আসে এবং আশা-ভরসা দেয় সম্ভাব্য সব কিছু সাহায্য দেবার জন্য। কর্ণেল শফিউল্লাহ মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আলাপ করেন এবং ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বেঙ্গলের একটি কোম্পানীকে জিয়াউর রহমানের সাহায্যার্থে পাঠানো হয় চট্টগ্রামের দিকে। অপরদিকে ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সেকেন্ড বেঙ্গলের অপর একটি কোম্পানীকে সিলেট পাঠানো হয়।

এপ্রিল মাসের ১/২তারিখে কর্ণেল শফিউল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মেজর মতিউর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন ইপিআর বাহিনী নিয়ে নরসিংদী পাকবাহিনীর মুখোমুখি হয়। ব্যাপক যুদ্ধ হয়। পাক বাহিনীর বহু লোক মারা যায়। অপরদিকে মুক্তিবাহিনীও কিছু লোক হারায়।

ক্যাপ্টেন এ,এস,এম নাসিমের আর একটি দলকে কর্ণেল শফিউল্লাহ আশুগঞ্জ (কুমিল্লা) পাঠান পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্যে ১লা এপ্রিলের দিকে। ইপিআর বাহিনী ১০০ মত এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২৫/৩০ জন লোক নিয়ে একটি কোম্পানী গঠন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার সরাইলে পাঠানো হয় রিজার্ভ হিসাবে। সরাইলে গিয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্যে একটি ট্রেনিং সেন্টার খুলি।

১৩ই এপ্রিল আমার উপর হুকুম হলো আশুগঞ্জের সংলগ্ন লালপুরে যাবার জন্যে শত্রুর মোকাবিলা করতে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে পৌঁছে আমার বাহিনী নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এমন সময় পাক বাহিনীর ৪টি স্যাবর জেট দেড় ঘণ্টা যাবৎ আক্রমণ চালায়। আমার বাহিনীর অনেকে মেশিনগান নিয়ে বাড়ির ছাদে গিয়ে আক্রমণ চালায়। বিমান স্টেশন থেকে চলে যায়। ওখানে আমরা মহসিন নামে একজন সিপাইকে হারাই। রাতে আমরা রওনা হয়ে আশুগঞ্জ পৌঁছাই। মেজর নাসিমের সাথে আলাপ করে লালপুরে যাই। রাত ৪টার দিকে লালপুরে পৌঁছাই।

১৪ই এপ্রিল পাক বিমান আশুগঞ্জ ও লালপুরে গোলাবর্ষণ করে। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে পাক বাহিনী জলযানে করে গুলি করতে করতে আসে। ভারী অস্ত্র ব্যবহারের দরুন আমাদের বেশ কিছু লোক হারাতে হলো। পাক বাহিনী তীরে উঠে পড়লে আমরা পিছু হটতে থাকি। ঐদিন আশুগঞ্জ ও লালপুরে পাক বিমান ব্যাপকভাবে বোমাবর্ষণ করে। আমরা পিছু হটি, সেখানেও টিকতে পারিনি। ইতিমধ্যে আমাদের পেছনে হেলিকপ্টারে করে পাক বাহিনী সৈন্য নামায়। সামনে পিছনে বিমান আক্রমণে টিকতে না পেরে পিছু হটি। ওখানে বেশ কিছু লোক হারাই। ১৫ই এপ্রিল কুমিল্লা জেলার শাহবাজপুরে পৌঁছাই। আমাদের দুটো বাহিনীর প্রায় ৪০ জনের মত মারা যায়। আশুগঞ্জ ও লালপুরে অধিকাংশ বাড়িঘর পুড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। লোকজনকে হত্যা করে মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যেতে থাকে। শাহবাজপুরে তিতাস নদীর উপরে ব্রীজ ভেঙ্গে ওখানে আমি অবস্থান করতে থাকি কর্ণেল শফিউল্লাহর নির্দেশক্রমে। রাস্তাটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সিলেটের মধ্যে যোগ ছিল।

১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৭/৮টার দিকে পাক বাহিনী এক ব্যাটালিয়ন আর্টিলারী ও অন্যান্য সব কিছু নিয়ে আক্রমণ চালায়, গানবোটও তাদের ছিল। সামনে আমাদের উপর তারা আক্রমণ চালায়। অপর পাক দল অন্য দিক থেকে নদীর পার হয়ে আক্রমণ করে। সারারাত যুদ্ধ হয়। আমার ৫ জন মারা যায়। পাক বাহিনীর বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমরা পিছু হটে মাধবপুরে গিয়ে ঘাঁটি গড়ি। সেখানে ক্যাপ্টেন নাসিম তার দল নিয়ে ছিলেন। আমাদের ঘাঁটি দৃঢ় করি। কর্ণেল শফিউল্লাহ দেখাশোনা করেন।

২১/২২ এপ্রিল পাক বাহিনী এক ব্রিগেড সৈন্য নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় বেলা ১২টার দিকে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। আর্টিলারী মর্টার নিয়ে আক্রমণ চালায়। আমাদের ২৫০ মত ছিল। এক পর্যায়ে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। পাক বাহিনীর ৪০০/৫০০ জন মারা যায় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রধানতঃ যোগাযোগের অভাবে আমরা পিছু হটি সন্ধ্যা ৭টার দিকে। আমাদের ২০/২৫ জন মারা যায় ঐ যুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত দুই কোম্পানীসহ তেলিয়াপাড়া পৌঁছাই। আমরা সিলেট হারালাম।

ময়মনসিংহ ও অন্যান্য এলাকার সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ *সিপাই আফতাব হোসেন

২৪-৭-১৯৭৪

ময়মনসিংহে থাকডোরে ইপিআর-এর ২ নং শাখা ছিল। উইং কমাণ্ডার ছিল ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস (পঃ পাকিস্তানী), সুবেদার মেজর জিন্নত গুল (পাঠান), নায়েব সুবেদার খান বাহদুর, নায়েব সুবেদার হজরত খান, নায়েব সুবেদার রাজা বেলাল (পঃ পাকিস্তানী)।

২৬শে মার্চ ইপিআরকে আর্মস-এমুনিশন দেয়া হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য। এবং উইং হেডকোয়ার্টারের চারিদিকে পরিখা-মরিচা খনন করার নির্দেশ দেয়া হয়। ঐদিনই দুপুরের পর হাজার হাজার স্থানীয় ছাত্র-জনতা দা, লাঠি, বল্লম প্রভৃতি নিয়ে ময়মনসিংহ ইপিআর হেডকোয়ার্টার ঘেরাও করার চেষ্টা করে। বাঙ্গালী সুবেদার সি-কোম্পানী কমাণ্ডার ফরিদ আহমদ ছাত্র-জনতাকে উদ্দেশ্য করে মেগাফোনে বলেন যে, আপনারা চলে যান। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর নূরুল ইসলামের কোম্পানীও উইং হেডকোয়ার্টারের গ্রাউণ্ডে তাঁবুর মধ্যে ছিল। মেজর নূরুল ইসলামও মাইকে জনতাকে চলে যেতে বলেছিলেন। কিছুক্ষণ পর জনতা চলে যায়।

২৭শে মার্চ দুপুরের পর আমাদের উইং কমাণ্ডার কমর আব্বাস সমস্ত ইপিআরকে অফিসের সামনে মাঠের মধ্যে একত্রিত করেন। তারপর সমস্ত ইপিআর-এর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সামরিক আইনের কয়েকটি বিধিনিষেধ তিনি আমাদেরকে পড়ে শোনালেন এবং বলেন, এখন থেকে দুইজনের মধ্যে কোন আলাপ-আলোচনা করা চলবে না, যদি কেউ করে আমি নিজে গুলি করে তাকে মেরে ফেলব। কোন বাঙ্গালী যদি কোন অপপ্রচারে লিপ্ত হয় তাহলে 'মেরা পহেলা গুলি উসকা সিনাকে সিনাছে নিকাল যায়েগি।'

২৭শে মার্চ বিকেল বেলায় আমি, সিপাই ইদ্রিস রেডিওতে খবর শুনলাম যে ঢাকাতে পিলখানা, রাজারবাগ পাকিস্তানী সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে। তখন আমি সিপাই নাম্বুকে (১৪৩৬৮) বললাম যে ঢাকাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা বাঙ্গালীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমাদের নিকট থেকে হয়ত অস্ত্রশস্ত্র জমা নিয়ে নিতে পারে। এক বিন্দু রক্ত থাকতে অস্ত্রসমর্পণ করব না বলে নাম্বুকে বললাম। তার কিছুক্ষণ পর নায়েক সুবেদার খান বাহদুর (পাঠান) এবং পাকিস্তানী হাবিলদার আজিম আমাদের ৭নং প্লাটুনে আসলেন এবং স্বয়ংক্রিয় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবার নির্দেশ দেন এবং এরিয়ার বাইরে ডিউটিতে যেতে বলে। তখন আমি আর নাম্বু বললাম, দস্তখত করে হাতিয়ার এবং এমুনিশন নিয়েছি। এক বিন্দু রক্ত থাকতে তা জমা দেব না। তারপর তারা চলে যায়। সন্ধ্যার সময় খানা খাবার জন্য সবাইকে ৫ মিনিট সময় দেয়া হয়। কিন্তু আমি হালকা মেশিনগান নিয়ে বসে রইলাম এবং নাম্বু ও অন্যান্য সবাই খানা খেতে চলে যায়। হাবিলদার আজিমের সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। আজিম আমাকে "তোম তো আজকাল সাচ্চা কমাণ্ডার বন গায়া।" বলে ঠাট্টা-পরিহাস করে। তখন আমি আজিমকে বলি যে, আমি বাঙ্গালী ছেলে। এটা বাংলাদেশ। আমার হাতে হালকা মেশিনগান আছে। এক্ষুনি এক ব্রাশ মেরে দেব। তখন খান বাহদুর আমাকে অজুহাতে বন্দী করার চেষ্টা করে। তারপর সিপাহী নাম্বু খানা খেয়ে চলে আসে। দুইজন একত্রে হবার দরুন আমাকে বন্দী করতে পারে নাই। তারপর সন্ধ্যা থেকে রাত ৮/৯ টা পর্যন্ত পাকিস্তানীরা আমাদেরকে উইং হেডকোয়ার্টারের পেট্রল ডিউটি করায়। ডিউটি শেষে সমস্ত ইপিআরকে এক জায়গায় জমা করে। উইং কমাণ্ডার কমর আব্বাস এবং সুবেদার মেজর জিন্নাত গুল আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'জোয়ান লোগ রাত কো ডিউটি কাজ জরুরত নেহি হয়। তুম লোগ নিন্দ যাও।' তারপর সবাই ব্যারাকে চলে যায়।

* বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত।

রাত প্রায় ১০ ঘটিকার সময় আমার ওস্তাদ লোকাস কুইয়া (খ্রীষ্টান) আমাদের ৭নং প্লাটুনকে উদ্দেশ্য করে যার যার সেন্টি ডিউটি আছে তাদেরকে দাঁড়বার জন্য বলে। কিন্তু কেউ ডিউটিতে দাঁড়ালেন না। তখন আমি লোকাস কুইয়াকে বললাম আজ রাতে আমি ও নান্নু ডিউটি করব হালকা মেশিনগান নিয়ে। আমি আর নান্নু দুইজন দুই দরজায় ডিউটির জন্য দুইটা হালকা মেশিনগান নিয়ে দাঁড়ালাম। তর কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানী হাবিলদার সিকিউরিটি নজির বাদশাহ এবং এম,টি, প্লাটুনের হাবিলদার গোলাম হায়দার (পাকিস্তানী) দুইটা চীনা স্টেনগান নিয়ে আমার প্লাটুন হাবিলদার আজিমকে গোপনে কি যেন নির্দেশ দিয়ে যায়।

আমাদের ব্যারাকের সামনে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ১৪ নং ডিভিশনের (যারা ইলেকশন ডিউটিতে ময়মনসিংহ এসেছিল) এক প্লাটুন সৈন্য তাঁবুর মধ্যে ছিল। রাত প্রায় সাড়ে বারটার সময় হটাৎ একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। তখন লাইনের ভেতরে যে কয়েকজন অবাকালী ইপিআর ছিল তাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। নান্নু তখন সাথে সাথে তার হালকা মেশিনগান দিয়ে বারান্দা থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্লাটুনের উপর ফায়ার আরম্ভ করে দেয়। বিহারী সিপাহী মমতাজের নিকট থেকে আমি একটি হালকা মেশিনগান উদ্ধার করি। এই গান বাঙ্গালী সিপাহী (১৫২৭৯) হারুনকে দিই। হারুনকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্লাটুনের উপর ফায়ার করার জন্য নির্দেশ দিই। সিপাহী মোস্তফা (১২৫২৭)-কে একটি হালকা মেশিনগান দিই দোতলা-তেতলা থেকে সিড়ির পথ বন্ধ করার জন্য। তখন আমি উপরতলায় যত বাঙ্গালী ইপিআর ছিল সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, রাত্রি বেলায় বাঙ্গালী হোক বা অবাকালী হোক কেউ যেন নীচে নামার চেষ্টা না করে। যদি কেউ চেষ্টা করে তাকে গুলি করা হবে। তারপর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্লাটুনের সাথে আমাদের সারারাত গুলি বিনিময় হয়। ভোর পর্যন্ত (২৮ শে মার্চ) পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সমস্ত প্লাটুনকে ধ্বংস করা হয়।

২৮ মার্চ সকালবেলা আমি হারুনকে নির্দেশ দিলাম মেগাফোন দিয়ে শ্লোগান দেয়ার জন্যঃ নারায়ণ তকবির-আল্লাহু আকবর, জয় বাঙ্গালীর জয়। আরো বললাম সবাই এখন উপরতলা থেকে নিচে নামতে পারে।

তারপর আমি সিপাহী নান্নু, সিপাহী মোস্তফা, সিপাহী হারুন এবং আরো কয়েকজন সিপাহী নিয়ে সুবেদার মেজর জিন্নাত গুলের কোয়ার্টার আক্রমণ করি। সেই কোয়ার্টারে দু'জন হাবিলদারসহ চারজন পাকিস্তানী জেসিও ছিল। আমরা বাঙ্গালীরা সবাই মিলে তাদের উপর ফায়ার করছিলাম। এমন সময় উইং কমান্ডার তার পার্টি নিয়ে পেছন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা দেখে ফেলি। উইং কমান্ডার-এর পার্টির সাথে আমাদের গুলি বিনিময় হয়। তার পরই উইং কমান্ডার তার পার্টিসহ মুক্তাগাছার দিকে পালাতে চেষ্টা করে।

ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইলের বাস রোড রেল লাইনের ক্রসিংয়ে উইং কমান্ডারের পার্টি পজিশন নেয়। তখন সিপাহী নান্নু মিয়া ক্রলিং করে ক্যাপ্টেন কমর আব্বাসের নিকট চলে যায়। কমর আব্বাস নান্নুকে দেখে ফেলে এবং চীনা স্টেনগান নিয়ে নান্নুর উপর ব্রাশ ফায়ার করে। নান্নু পজিশন নেয়াতে তার গায়ে গুলি লাগে নাই। ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস আবার অন্য ম্যাগাজিন গানের মধ্যে লাগাবার চেষ্টা করে। তার আগেই নান্নু ক্যাপ্টেন কমর আব্বাসকে গুলি করে মেরে ফেলে। এইভাবে তার সাথে সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। তার সাথে সাথেই চারদিক থেকে জনতা এসে তাদের মৃতদেহ নিয়ে যায় এবং মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়ায়। তারপর আমরা আবার সুবেদার মেজরের পার্টিকে আক্রমণ করি। ২৮শে মার্চ বিকেল পাঁচটার সময় তারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারপর আমরা বাঙ্গালী ইপিআররা সুবেদার মেজরের পার্টিকে ময়মনসিংহ জেলে পাঠাই।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি-কোম্পানী (২য় বেঙ্গল) অধিনায়ক মেজর নূরুল ইসলাম ও লেফটেন্যান্ট মান্নান রাত্রিবেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের কিনারে সিএণ্ডবি'র ডাকবাংলোতে ছিলেন। যখন গোলাগুলি আরম্ভ হয় তখন আমাদের উইং কমান্ডার কমর আব্বাসের পার্টি মেজর নূরুল ইসলামের উপর ফায়ার

আরম্ভ করে দেয়। তখন তারা সেখান থেকে নদী সাঁতরিয়ে ওপারে চলে যান। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী গোলাগুলির সময় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং অনেকে শহরে চলে যায়। সামান্য কয়েকজন লোক ময়মনসিংহে আমাদের এরিয়ার মধ্যে পজিশনে থাকে এবং সকাল বেলায় আমাদেরকে সাহায্য করে।

সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর স্থানীয় জনসাধারণ আমাদের গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, জিনিসপত্র ময়মনসিংহ শহরের রাবেয়া স্কুলে নিয়ে যায় এবং আমাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে। ২৯শে মার্চ আমরা ময়মনসিংহ ডিফেন্স নিয়ে থাকি। ইতিমধ্যে মেজর শফিউল্লাহ (সি-ইন-সি, বর্তমানে) জয়দেবপুর থেকে তাঁর লোকজন নিয়ে টাঙ্গাইল হয়ে ময়মনসিংহ আসেন। ৩০শে মার্চ সমস্ত ইপিআর এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকজন নিয়ে মেজর শফিউল্লাহ, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (ঢাকার রূপগঞ্জ থেকে এসে যোগ দিয়ে ইপিআর-এর চার্জ নেন) বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। মেজর শফিউল্লাহর নির্দেশে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বে ট্রেনযোগে আমরা ঢাকার দিকে রওনা হই।

৩১শে মার্চ আমাদের দল ঢাকার নরসিংদী পৌঁছায়। নরসিংদী থেকে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান কয়েকশত ইপিআর নিয়ে ঢাকা জেলার ভাঙ্গা বাজারের নিকটে শতিলক্ষ্যা নদীর তীরে ডিফেন্স নেয় (১লা এপ্রিল); ২রা এপ্রিল আমাদের এক সেকশন (মুক্তিযুদ্ধের প্রথম গেরিলা পার্টি, ইপিআর-এর) নং ৩১৫৭ হাবিলদার আবদুল হাকিম, ১৪৩৬৮ সিপাহী নান্নু মিয়া, ১৫২৬৯ মোহাম্মদ আফতাব হোসেন, ১৫২৭৯ হারুনুর রশীদ, ১২৫২৭ নওয়াজ, ১৫৪৯২ মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, ১৭৩০৮ আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ মফিজউদ্দিন, সাইদুর রহমান, আবদুল সাত্তার প্রমুখ ক্যাপ্টেন মতিয়ুর রহমানের নির্দেশে ঢাকা পৌঁছে। শার্ট-লুঙ্গি পরে আমরা একটা চীনা স্টেনগান, হালকা মেশিনগান পাঁচটা, বাকি ৩০৩ রাইফেল, অনেক গ্রেনেড ও এমুনিশনের বাস্ক নিয়ে ২রা এপ্রিল রাতের বেলা ঢাকা শহরের নিকটে আমুলিয়া গ্রামে আসি।

যাত্রাবাড়ি প্রতিরোধঃ ৫ই এপ্রিল রাত আটটার সময় যাত্রাবাড়ি রোডে পাকসেনা বোঝাই একটা গাড়ীর উপর আক্রমণ চালাই। পুরো গাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। সাথে সাথে ঢাকা এবং ডেমরার দিক থেকে পাকসেনারা অনেকগুলি গাড়ী নিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সাথে প্লেন আসে এবং গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমরা আক্রমণ চালিয়েই সাথে সাথে আবার গ্রামে চলে যাই।

পাঁচদোনাতে প্রতিরোধঃ এপ্রিল মাসের ১১ তারিখ ঢাকার পাঁচদোনাতে আমাদের হেডকোয়ার্টার ডিফেন্স পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। এখানে তুমুল লড়াই চলে। এই লড়াই দু'দিন চলে। ক্যাপ্টেন মতিয়ার রহমান ও সুবেদার ফরিদের নেতৃত্বে যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে ৪০০/৫০০ পাকসেনা হতাহত হয়। ২০/২৫টা গাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তার পরদিন ঢাকা সেনানিবাস থেকে বিপুল সৈন্য পাঁচদোনাতে আবার আমাদের উপর হামলা চালায় এবং তিন দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। হেলিকপ্টার দিয়ে পেছনে ছত্রীসৈন্য নামাতে থাকে। পাকসেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধা ও ইপিআররা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা ভারতের আগরতলাতে চলে যায়। সেখানে তারা ৩নং সেক্টরে যোগদান করে।

মনোহরদীতে গেরিলা অপারেশনঃ আমাদের উপরে উল্লিখিত গেরিলা পার্টি ঢাকার মনোহরদী থানা এলাকায় যায়। প্রায় এক মাস মনোহরদীতে গেরিলা অপারেশন চালাবার পর এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা জেলার পাটুলী গ্রামে সিরাজ মিয়ার বাড়িতে হঠাৎ করে আমাদের পার্টির দু'জনের পায়ে গুলি লাগে (দুর্ঘটনায়)। এতে পুলিশের মোহাম্মদ আবদুল হক (গ্রাম-নিলক্ষীয়া, ডাকয়র-দুলালকান্দী থানা-রায়পুর ঢাকা) ও মুজাহিদ আবদুল সালাম (গ্রাম-দুলালকান্দী থানা রায়পুর) মরে যান।

কাটিয়াদী থানা অপারেশনঃ ১৯৭১ সনের মে মাসে আমার দল নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার কাটিয়াদী থানা অপারেশন করি। এর আগের দিন সেনারা কাটিয়াদী থানার আশেপাশে ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছিল এবং গ্রামের

বেশ কয়েকজন নিরীহ লোককে হত্যা করেছিল। তারা গ্রামে ঢুকে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগে লিপ্ত হয়েছিল। থানার বাঙ্গালী পুলিশদের কেউ কেউ খানসেনাদের সাথে সহযোগিতা করেছিল। তারও লুটতরাজে লিপ্ত ছিল। সিপাহী হারুনকে আমি রেকি করতে পাঠিয়েছিলাম। হারুন গিয়ে দেখে খানসেনারা লুটতরাজ-অগ্নিসংযোগ করে চলে গেছে। বাঙ্গালী পুলিশ ও অফিসাররা লুটতরাজ করে এক ধনী হিন্দুবাড়ি থেকে টাকা-স্বর্ণ নিয়ে যাচ্ছে। সিপাহী হারুন তাদেরকে বাধা দেয় এবং বলে যে আপনারা বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার করছেন। তখন হারুনের উপর তারা ওসি'র নির্দেশে ৭ রাউণ্ড ফায়ার করে। সে কোনরকমে তার সাইকেল ফেলে চলে আসে। তখন ঐ দিন রাতেই আমরা কাটিয়াদী থানার উপর আক্রমণ করি। ভোরবেলায় বাঙ্গালী ও-সি' কে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘাতক পুলিশ পালিয়ে যায়। এখানে থেকে ১৭টি রাইফেল ও প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করি।

সিপাই মোঃ আফতাব হোসেন, নং ১৫২৬৯
বাংলাদেশের রাইফেলস, সেক্টর হেডকোয়ার্টার
কুটিবাড়ি, দিনাজপুর।

শত্রুর প্রচণ্ড চাপে মনতলার পতন*

মেজর এম, এস, এ ভূঁইয়া

মে মাসের শেষের দিক। তেলিয়াপাড়া পতনের পর ক্যাপ্টেন নাসিম (বর্তমানে মেজর) সিলেটের পাকিস্তানী এলাকা মনতলায় প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন। মেজর মঈন প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করেন হরশপুর এবং মুকুন্দপুরে। ঐ দিক থেকে শত্রুর প্রবল হামলার আশংকা থাকায় আমাদের দু'ধারের পজিশন মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য পাঠানো হলো। আমার সাথে দেয়া হলো ৫০ জন জোয়ান। সঙ্গে অস্ত্র দেওয়া হলো একটি ভারী মেশিনগান, ৭টি হালকা মেশিনগান এবং বাকীগুলি রাইফেল। জায়গার তুলনায় আমার সাথে লোকসংখ্যা এবং অস্ত্রের পরিমাণ ছিল নগণ্য। এত অল্পসংখ্যক লোক দিয়ে আমাকে প্রায় আড়াই মাইল ফরোয়ার্ড লাইন কভার করতে হয়েছিল। আমাদের মিলিটারী ট্রেনিং অনুযায়ী এত বিরাট এলাকা কভার করা ছিল অকল্পনীয়।

যা হোক, এই অল্পসংখ্যক লোক নিয়েই আমি মনতলা থেকে গিলাতলী এবং তারপর ইখতেয়ারপুর গ্রাম পর্যন্ত কভার করলাম। অবশ্য আমার অসুবিধা টের পেয়ে আমাকে আরও ২০ জন লোক দেওয়া হয়। এই ২০ জনের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিমান বাহিনীর লোক। সুতরাং পদাতিক বাহিনীর ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে তাদের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। আমি যাওয়ার আগেই শত্রুরা সেখানে আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের আক্রমণ কার্যকর হয়নি। প্রত্যেক বারই তাদের আক্রমণ ব্যাহত হতে লাগল। বাধ্য হয়ে শত্রুরা তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে ব্যাপৃত হল। শত্রুবাহিনী দিনের বেলা কয়েকবারই আমাদের উপর আক্রমণ চালালো। প্রথমে তারা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের ডাক দিয়ে আক্রমণ চালায়। আমি এবং মেজর নাসিম প্রতিরক্ষা ব্যূহের ডান দিকে দুটি ভারী মেশিনগান রেখেছিলাম। ফলে শত্রুর পক্ষের আমাদের অবস্থান ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হল না। একদিন দিনের বেলায় আক্রমণের সময় শত্রুবাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হলো। শত্রুঅনেক মৃতদেহ পিছনে ফেলে রেখে হটে যেতে বাধ্য হলো।

আরেকদিন শত্রুবাহিনীর সাথে আমাদের লড়াই হলো মুখোমুখি। এ সময়ে শত্রুর সৈন্যসংখ্যা ছিল বিপুল। শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্যে আমাদের জোয়ানরা কিছুটা ভড়কে গিয়েছিল। তাদের কেউ কেউ আমাদের কোম্পানী

*“মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস” ১৯৭৪ গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

তুলে নেওয়ার জন্যে পর্যন্ত পীড়াপীড়ি করেছিল। মনতলা পতনের শেষ দিন সন্ধ্যায় শত্রুবাহিনী এক ব্রিগেড এবং এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে মেজর নাসিম, লেফটেন্যান্ট মোর্শেদ এবং আমার পজিশনের উপর ত্রিমুখী আক্রমণ চালাল। আমি সে সময়ে ছিলাম আমার কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে। আমি যাচ্ছিলাম মনতলা রেলওয়ে লাইনের ডান পার্শ্বে যে দুটো সেকশন ছিল সেগুলো চেক করার জন্যে। পথে জনৈক বে-সামরিক ব্যক্তির কাছে জানতে পারলাম মনতলা রেলওয়ে স্টেশনে আমাদের কোন লোক নেই। তার কথা আমার বিশ্বাস হল না, বরং পাল্টা তার প্রতি আমার বিশেষ সন্দেহের উদ্বেক হল। আমি ঐ লোকটির সঙ্গে আমার দু'জন দেহরক্ষীকে দিয়ে মনতলার পজিশন চেক করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। ওদিকে শত্রুবাহিনী ছয়টি কামানের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের উপর অনবরত গোলাবর্ষণ শুরু করে দিয়েছে। আমার পাঠানো দেহরক্ষী দু'জন ফিরে এসে জানালো, সত্যি সত্যিই ঐ পজিশনে আমাদের কোন লোক নেই। রাত তখন ৮টা বাজে।

সেদিনকার ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিচ্ছিঃ মেজর নাসিমের অবস্থানের উপর শত্রুবাহিনীর প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য আক্রমণ চালায়। এক ব্যাটালিয়নের সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৮০০ শত। এই বিপুল সৈন্যের আক্রমণের মুখে মেজর নাসিম ও তাঁর সৈন্যদের অবস্থানে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তিনি তাঁর কোম্পানী নিয়ে অবস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। মেজর নাসিম মেজর মঈনের কোম্পানীকে (পরে লেফটেন্যান্ট মোর্শেদের দ্বারা পরিচালিত) ফরোয়ার্ড লাইনে টেলিফোনের মাধ্যমে এই সৈন্য উঠিয়ে নেওয়ার সংবাদ জানান। আমার সাথে মেজর নাসিম এবং লেফটেন্যান্ট মোর্শেদ উভয়ের সাথেই কোন টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল না। বাধ্য হয়ে মেজর নাসিম দুজন জওয়ান মারফত আমাকে এই সংবাদ পাঠান যে, শত্রুবাহিনীর আক্রমণ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খবরে আরো বললেন যে, শত্রুত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়েছে। মেজর নাসিম এবং লেফটেন্যান্ট মোর্শেদের সৈন্যদের পজিশন ছিল আমার উভয় পার্শ্বে। তাদের পজিশনে শত্রুপ্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল। মেজর নাসিমের সৈন্যরা তুমুল লড়াই করে শত্রু অগ্রগতিকে ব্যাহত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। অবশেষে মেজর নাসিম নিজের ট্রুপস এবং আমার কোম্পানীর ২১ জন লোক ও সুবেদার মান্নানকে নিয়ে পঞ্চবটিতে অর্থাৎ কয়েক মাইল পেছনে সরে গেলেন। ওদিকে লেফটেন্যান্ট মোর্শেদও প্রাণপণ লড়াই করার পর তাঁর সৈন্যদের নিয়ে সরে পড়তে শুরু করেছেন। আমি এসবের কোন খবরই পাইনি। তদুপরি আমার প্রতিরক্ষা লাইন ছিল কোম্পানী হেডকোয়ার্টার থেকে আড়াই মাইল আগে।

আমার সে সময়কার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমি তখন বলতে গেলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। রাত দশটার দিকে আমার হেডকোয়ার্টারের উপর প্রায় দশটা কামানের গোলা এসে পড়ল। আমাদের সংগ্রামী সৈনিকরা অনেকেই একেবারে নতুন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে তারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের অনেকেই জীবনে এই প্রথম কামানের গোলার আওয়াজ শুনলো। শত্রুডান দিক দিয়ে আমাদের উপর প্রচণ্ড চাপ দিয়ে যাচ্ছে। অধিকন্তু ফরোয়ার্ড ডিফেন্স লাইনে যারা ছিল তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ এল। আমি হেডকোয়ার্টারে থেকে কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। ফলে ফরোয়ার্ড ডিফেন্স লাইনে অর্থাৎ ইখতেয়ারপুর ও গিলাতলীতে যারা ছিল তাদের খবরও জানা সম্ভব হল না। কাসিমপুর রেলওয়ে স্টেশনের ওখানে আমার একটি অবস্থান ছিল। সেখানকার জেয়ানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ জন। আমি তাদের ওখানে দু'জন রানার পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু শত্রুদের কামান থেকে তখন এমন অবিরামভাবে গোলা বর্ষিত হচ্ছিল যে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর তারা থেমে যেতে বাধ্য হল।

রাত তখন দশটা বাজে। আমিও অবস্থান ত্যাগ করাই মনস্থ করলাম। সব জায়গায় লোক পাঠিয়ে তাদের জানিয়ে দিলাম, পরবর্তী অবস্থান এবং প্রতিরক্ষাব্যূহ রচিত হবে চৌমুহনীতে।

শত্রু তখন তিন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। আমি হেডকোয়ার্টার নিয়ে চৌমুহনীর দিকে রওনা হলাম। আমরা সবাই নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সঙ্গে নিলাম। বাধ্য হয়ে আমরা সে সময়ে অনেক বেসামরিক লোককেও আমাদের অস্ত্রে বোঝা বহন করার জন্যে সঙ্গে নিয়েছিলাম।

আমার বহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার সময় অন্যান্য কয়েকটি দলও এসে আমার দলের সঙ্গে যোগ দিল। শত্রুর অগ্রগতিকে বিলম্বিত করার জন্য হালকা মেশিনগানের সাহায্যে আমরা গুলি করতে থাকলাম। রাত দুটোয় এসে আমরা পৌঁছলাম চৌমুহনীতে। আল্লাহর রহমতে আমরা সবাই সেখানে এসে একত্রিত হলাম। আমাদের কোম্পানীর সমস্ত সৈন্যই ছড়িয়ে পড়াতে আমি ভীষণ উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। সত্যি বলতে কি- আমার অবস্থা ছিল ঝড়ের সমুদ্রের ছিন্নপাল নৌকার মাঝির মত। এখন সবাইকে এক স্থানে পেয়ে আমি খোদার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

চৌমুহনীতে এসে আমি কোম্পানীর সবাইকে পেলাম সত্য, কিন্তু আবার নতুন বিপদের সম্মুখীন হলাম। হালকা মেশিনগান সজ্জিত আমার কয়েকটি সৈন্যদল গুলিবর্ষণ করে শত্রুসৈন্যদের অগ্রগতিকে বিলম্বিত করতে সক্ষম হলেও, শত্রুর পার্শ্ববর্তী অগ্রগতিকে বাধা দিতে সক্ষম হল না। আর শত্রুর সবদিকের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখাও ছিল অসম্ভব-কারণ আমাদের সংখ্যাল্পতা। সংখ্যায় শত্রুসৈন্য ছিল আমাদের তুলনায় দশগুণ। ভারতীয় সীমানা থেকে চৌমুহনীর দূরত্ব মাত্র দুই মাইল। কিন্তু এই দুই মাইল রাস্তা সেদিন রাতে আমাদের কাছে অন্তর্হীন বলে মনে হয়েছিল।

রাতের শেষের দিক তখন। তখন ভোর চারটা। শত্রুরা শুধু গুলি করতেই এগিয়ে আসছিল না, তারা এগিয়ে আসছিল ঘরবাড়ি, গাছপালা জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে।

ভোর সাড়ে চারটার দিকে তারা ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। শত্রুবাহিনী তখন আমাদের পশ্চাত্তাগের ব্যুহ প্রায় ভেদ করে ফেলেছে। আমাদের বাহিনীর তিন দিক বেষ্টিত করেছে তারা। সামনে, দক্ষিণে এবং বামে। তখন ঐ নিতান্ত ফাঁদে পড়া অবস্থার মধ্যেও আমরা মনোবল না হারিয়ে তিনদিকে হালকা মেশিনগানের সাহায্যে অবিরাম গুলি চালাতে লাগলাম। আমাদের প্রতিজ্ঞাঃ আমরা শত্রুদের কিছুতেই আমাদেরকে ঘেরাও করতে দেব না। আমাদের হাতে তখন ছিল মর্টার আর ৫৬টা গোলা। নিরুপায় হয়ে শত্রুসৈন্যের উপর আমি মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করলাম। গোলা সংখ্যা কম হওয়াতে প্রতি দু-তিন মিনিট অন্তর শত্রুর অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করছিলাম। সেদিন মর্টারটি আমাদের অবস্থান থেকে সরে আসতে বিধাতার আশীর্বাদের মত সাহায্য করছিল।

সূর্য ওঠার পর দেখতে পেলাম শত্রুরা আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। প্রায় ১৪ ঘন্টা ধরে আমাদের সঙ্গে তাদের গোলাগুলি বিনিময় চলল। অবশেষে সকাল ৯টার দিকে আমরা সিদাই খানায় পৌঁছাতে সক্ষম হলাম।

নরসিংদী-আশুগঞ্জ সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্রিগেডিয়ার মোঃ মতিউর রহমান বীর প্রতীক*

সুবেদার মেজর সুলতানের আমলে আমার পরিচয় হয় ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল নরসিংদীতে। আমি ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে যশের সেনানিবাসের ২৫ বেলুচ রেজিমেন্ট ছেড়ে ২৭শে মার্চ ময়মনসিংহ পৌঁছি। ময়মনসিংহে ইপিআর-এর এক কোম্পানী নিয়ে নরসিংদী হয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হই যুদ্ধ করার জন্য। ৩১শে মার্চ নরসিংদী পৌঁছি। সুবেদার মেজর সুলতান তখন ঢাকা থেকে সামান্য কয়েকজন লোকসহ নরসিংদী পৌঁছে এবং ১লা এপ্রিল আমার সাথে যোগ দেয়। ঢাকার লোকজন যখন মার খেয়ে দিশাহারা হয়ে শহর ছেড়ে পালাইতেছিল, তখন সুলতান সাহেব

* ১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। বিবরণটি দৈনিক 'সংবাদ' ৩ মার্চ ১৯৮৩-এ প্রকাশিত 'সুবেদার মেজর সুলতান আহমদ বীরবিক্রম' শিরোনামে তাঁর রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

আমার সাথে কয়েকজন ইপিআর-এর লোকজন এবং ছাত্র ও জনতার সাথে যোগ দিয়ে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঢাকা-নরসিংদী সড়কের বিভিন্ন এলাকায় সম্মুখ-সংঘর্ষে দুর্ধর্ষ সাহস এবং শক্তিতে যুদ্ধ করেন। এরপর থেকে পুরো নয়টি মাস তিনি আমার সাথে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করে যান। নয় মাসের তার এবং বাকী সহকর্মীদের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। সব লিখতে গেলে অনেক দীর্ঘ এক ইতিহাস হবে। আজকের এই লেখায়, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখব না। শুধু বাংলাদেশ রাইফেলস-এর একটি বীরযোদ্ধার সামান্য একটু বলছি, তাতেই বুঝা যাবে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সংগঠন কত তীক্ষ্ণ এবং জাগ্রত।

ঢাকা-নরসিংদী সড়কে করইতলী, বাবুরহাট, পাঁচদোনা এবং অন্যান্য স্থানে সম্মুখ যুদ্ধের পর আমাদের নরসিংদী ত্যাগ করতে হয়।

১৩ই এপ্রিল সকালে আমরা আশুগঞ্জে পৌঁছানোর পর ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানীর ওখানে যাই। ব্রিগেডিয়ার নাসিম (তখন ক্যাপ্টেন) কোম্পানী কমান্ডার। তিনি আশুগঞ্জে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেছেন। আমার সাথে তখন ৪০/৫০ জন লোকে এবং সাথে শুধু ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র আছে। তিনি আমাকে বললেন, আপনি ভৈরবের সামনে নরসিংদীর দিকে রামনগর রেলওয়ে ব্রীজের ওখানে যেয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করুন। পাকিস্তান আর্মির অগ্রগতিকে ওখানে রোধ করতে হবে। যতক্ষণ সম্ভব রুখতে হবে। অসম্ভব হয়ে পড়লে এখানে আসবেন, একসাথে মিলে যুদ্ধ করব।

আমরা ১৩ই এপ্রিল বেলা ৯টার দিকে রামনগর পুলের নিকট পৌঁছি। এলাকায় পৌঁছে লোকজনকে স্থান নির্ধারিত করার পূর্বেই দেখতে পেলাম রেল লাইন দরে পাকিস্তান আর্মি অগ্রসর হচ্ছে। বেলা ১০/১১টার দিকে তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়। তারা সমস্ত দিন চেষ্টা করল, কিন্তু আর অগ্রসর হতে পারল না। পুরা রাত গোলাগুলি চলে। পরদিন সকাল ৬টা ৩০মিনিটের সময় ৬টা পাকিস্তানী স্যাবর জেট প্রথমে একবার উপর দিয়ে ঘরে গেল। ফেরত আসার পথে আমাদের এলাকাসহ আশুগঞ্জ ও ভৈরব বোমা ফেলে এবং স্ট্রাইফিং শুরু করে। আমার সামনে তেকে যে পদাতিক বাহিনী এসেছিল তারা আরও একটু এগিয়ে এসে আমাদের উপর গুলিগোলা শুরু করে ব্যতিব্যস্ত রাখে। বাম দিকে মেঘনা নদীতে নৌবাহিনীর গানবোট থেকে নদীর পূর্বপার্শ্বে লালপুরে ব্রিগেডিয়ার আঃ মতিন (তখন ক্যাপ্টেন) ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১ প্লাটুন নিয়ে অবস্থান করছিল। আমাদের ওখানে আমাদের অবস্থানের উপর গোলাবার্ষণ শুরু করা হয়। তার সাথে ৬/৭টা হেলিকপ্টার দিয়ে সেনাবাহিনীর লোকজন আমাদের পিছনে ভৈরব, আশুগঞ্জের পিছনে এবং আমাদের ডান পার্শ্বের বিভিন্ন এলাকায় নামানো আরম্ভ করে। আমরা সম্মুখসমরে ব্যস্ত। তার সাথে দেখছি কি সুন্দর শক্তির প্রদর্শন। জলে, স্থলে এবং আকাশ থেকে আমাদের উপর আক্রমণ। দেখছি লোকজন বিমান বাহিনীর এবং সেনাবাহিনীর আক্রমণে ঘর ছেড়ে জীবন নিয়ে দিকশূন্য হয়ে পালাচ্ছে আর দাউ দাউ করে জুলছে বাড়ীঘর। আমরা সামান্য কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামী চারদিক থেকে শত্রুদ্বারা বেষ্টিত।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আক্রমণ ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলতে তকে। সাথে অন্যান্য বাহিনীর আক্রমণও চলতেই থাকে। আমাদের সাথে যা গোলাবারুদ ছিল তা দুই দিনের অনবরত যুদ্ধে শেষ হয়ে গেছে। ১৪ই এপ্রিল বিকেল ৩টার সময় ভাবছি কোন মতে ভৈরব পার হয়ে আশুগঞ্জে যেয়ে ২য় ইস্ট বেঙ্গল-এর কোম্পানীর সাথে মিশতে পারব কিনা। নিজেদের অবস্থান ঘুরে দেখলাম। কারো নিকট ২/৪ রাউণ্ড গুলি আছে। কেউ বা খালি হাতে বসা। কারণ যা কাঁধে করে আগের দিন নিয়ে এসেছিলাম তাই তো সম্বল ছিল, আর তো কেউ কিছুই দিয়ে যায়নি। বেলা ৩টা ৩০ মিনিটের সময় দেখতে পেলাম ইউনিফর্ম পরা একজন লোক পিছন থেকে আমার খুবই নিকট চলে এসেছে। তাকে মারতে মানা করলাম। উদ্দেশ্য, তাকে আত্মসমর্পণ করাবো। সে আত্মসমর্পণ করার পর দেখতে পেলাম সে আমাদের ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন জওয়ান। আশুগঞ্জের পিছনে হেলিকপ্টারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোক নামার পর এবং বিমান বাহিনীর আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পর কোম্পানী নিজেদের স্থান ছাড়তে বাধ্য হয়। সে রাস্তা না পেয়ে এই দিকে এসেছে। মনে করেছে এই দিক দিয়ে

বিপদের আশংকা কম। ভাবলাম ওদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার কথা ছিল, তা আর হলো না। এখন আমরা শেষ মুহূর্ত গুনছি। চারদিক থেকে পাকিস্তানী বাহিনী জাল গুটিয়ে আনবে আর আমাদের জীবিত ধরবে।

আরো যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মত গুলিগোলা বলতে কিছুই নেই। লোক ক্ষুধায় কাতর। ১১ই এপ্রিল নরসিংদীর পতনের পূর্ব থেকে ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে অনেকের বেলা সামান্য আহর জুটেছে। মানুষের জীবন তার অনুভূতির নিকট কত করুণ এবং কঠোর অনুভব হয় তখন হয়ত বুঝতে পেরেছি। আমি কমাগুর হিসেবে তাদেরকে গুলিগোলা দিতে পারছি না যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। খানা দিতে পারছি না ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে। কেউ আমাদের সাহায্য করবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এ রকম আশ্বাসও দিতে পারছি না। কারণ, তখনও জানি না কোথাও থেকে কেউ সাহায্য করবে কিনা, কে কোথায় যুদ্ধ করছে বা লোকজন যুদ্ধ করছে কিনা তাও জানি না।

বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে আমি মনস্থির করেছি এই স্থান আমাদের ছড়াতে হবে। খালি হাতে এখানে বসে মরার কোন অর্থ নেই। সুবেদার মেজর সুলতান (তখন নায়ক সুবেদার) সহ দু'জন আমার প্লাটুন কমাগুর ছিলেন। আমি ব্রহ্মপুত্র নদের রামনগর ব্রীজের পার্শ্বে যেখানে আমার অবস্থান ছিল আসতে বললাম। প্লাটুন কমাগুর আসার পর জিজ্ঞেস করলাম কি অবস্থা। তারা বলল, স্যার আপনি তো ঘুরে দেখে এলেন। জওয়ানরা প্রায় শূন্য হাতে বসা।

আমি বললাম, সুলতান সাহেব, মালেক সাহেব আমাদের এলাকা ছাড়তে হবে। খালি হাতে এখানে বসে মরার কোন অর্থ নেই। আমি কথাটা বলার সাথে সাথে দু'জনেই হাউমাউ করে শিশুর মত চীৎকার করে কেঁদে উঠল। বলল, স্যার কাপুরুষের মত পালিয়ে কোথায় যাব, দেশ কি স্বাধীন হবে না? তাদের কান্নায় আমারও দুচোখে অশ্রু নেমে এলো। তাদের কান্নায় এবং আবেগে প্রায় ১৫/২০ সেকেন্ডের মত মনে হল আমি আমার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলছি। মানুষের জীবনে অনেক স্মরণীয় মুহূর্ত থাকে। এই মুহূর্তটা আমার জীবনে কিভাবে মূল্যায়ন করব জানি না। অনেক সময় মৃত্যু বাঞ্ছনীয় হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু তখন জীবন মনে হয় রাবার ইলাস্টিকের মত দীর্ঘই হয়।

একটু সুস্থির হয়ে বললাম, এখান থেকে চলে যাওয়ার অর্থ এই নয় আমরা আর যুদ্ধ করব না। আজকে যদি এই হত যে আমাদের ৪০/৫০ জনকে গুলি করে মারলে তারা আমাদের স্বাধীনতা দিবে তাহলে আমি আপনাদের কমাগুর হিসেবে কথা দিচ্ছি আমিই প্রথম মরতাম। যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে যতদিন বেঁচে থাকব, যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে। এখান থেকে চলে যেয়ে আমরা গোলাগুলি সংগ্রহ করব, আবার যুদ্ধ করব। এখন এখানে খালি হাতে বসে থাকলে আস্তে আস্তে জাল গুটিয়ে আনবে এবং আমাদের জীবিত ধরবে আর গুলি করে মেরে ফেলবে। বুঝিয়ে বলার পর মেনে নিল। বলল, স্যার আপনি আমাদের কমাগুর, আপনি যা ভাল বোঝেন তা আমরা নিশ্চয় মেনে চলব। তবে স্যার, আপনি ছেলেদের বুঝিয়ে বলেন কারণ তারা মানসিকভাবে অতি জেদি হয়ে আছে। প্রত্যেকটা অবস্থানে যেয়ে জওয়ানদের বুঝিয়ে বলে ছোট ছোট গ্রুপে বিভিন্নভাবে অবস্থান ত্যাগ করতে বললাম। বলে দিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যাও, শুনেছি ওখানে ২য় ইস্ট বেঙ্গল এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আছে। ওখানে যেয়ে যোগ দাও। আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে আবার দেখা হবে। সুলতান সাহেব এবং মালেক সাহেবকেও তাদের লোকজনের পিছনে যাওয়ার হুকুম দিলাম। দু'জন আমার দু'কাঁধে মাথা রেখে শিশুর মত হাউ মাউ করে কাঁদল। একটা সৈনিকের এমনি এক পরিস্থিতির কান্না অনুভব করা যে কত হৃদয় বিদীর্ণকারী সে আমি বুঝেছি। যদিও এটা অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, তবু আমার জীবনের একটা বিশেষ ক্ষণ। দু'জন বলল, 'স্যার, আপনি যাবেন না? 'আপনারা গেলে'।

ওরা চলে গেলে সমস্ত এলাকাটা ঘুরে দেখলাম এখনও কেউ বাকী আছে কিনা। সুলতান সাহেব যাওয়ার সময় বলে গেল, 'স্যার আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

সবাই চলে গেলে নিঃসঙ্গতা আর অবসাদ মনটাকে ছেয়ে ফেলল। জীবনটা মনে হচ্ছিল সত্যি খুব দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এত গোলাগুলি হল, মরে গেলে তো রক্ষাই পেয়ে যেতাম। যাক আমি আমার কাহিনী লিখছি না, যাদের জন্য লিখছি ওখানেই ফিরে যাই। ১৪ই এপ্রিল রাতে যেয়ে কুলিয়ারচরে সুলতান সাহেব এবং তার সঙ্গী ১০/১৫ জন জওয়ানের সাথে দেখা। দেখে তাঁর কি আনন্দ। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হৈচৈ করে কিভাবে যে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন তা ঠিক বলতে পারব না।

তারপর থেকে কোনদিন সুলতান সাহেব আমার থেকে আর বিচ্ছিন্ন হননি। প্রতিটি অপারেশনে তিনি আমার সাথে ছিলেন। সিলেটের নলুয়া চা বাগানে দিনের বেলায় আমরা যে এ্যামবুশ করি তার উপর সুলতান বীরবিক্রমে পদক পান। আখাউড়া আক্রমণের সাথে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুদ্ধে আমার সাথে ছিলেন।

সাটিয়াচড়ার যুদ্ধ*

টাঙ্গাইল শহর তখনও মুক্ত অঞ্চল। পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায়, শহরে ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিরোধের সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় বেতার মারফত রক্তপিপাসু পাক-সৈন্যদের হিংস্র আক্রমণ আর বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষদের গৌরবময় প্রতিরোধের কাহিনী প্রচারিত চয়ে চলেছে।

হামলাকারীদের দল তখনও টাঙ্গাইল জেলায় এসে পৌঁছাতে পারেনি। টাঙ্গাইল শহরে মুক্তির উৎসব চলেছে। রাজপথের দু'ধারে প্রতিটি ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। 'জয় বাংলা' সংগীতে সারা শহর মুখরিত। কিন্তু সমস্ত আনন্দ-উৎসবের পেছনে আসন্ন বিপদের কালো ছায়া। শহরের মানুষ হাসতে গিয়েও প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে না। আকাশবাণী নিত্য নতুন দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে আসছে, মুক্ত শহরগুলি একের পর এক পাক-সৈন্যদের অধিকারে চলে যাচ্ছে। তারপর সেই হিংস্র জল্লাদের দল সেই সমস্ত শহরের অধিবাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করে চলেছে। এখনও ওরা ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলা থেকে দূরে আছে কিন্তু কতদিন তারা এভাবে থাকতে পারবে। দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক ওরা এখানে এসে হামলা করবেই। সেদিন? সেদিন টাঙ্গাইলের মানুষ কেমন করে ওদের প্রতিরোধ করবে? কেমন করে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করবে?

আজ সারা বাংলাদেশের মানুষের মন স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত। সারা প্রদেশের মানুষ কখনও এভাবে একতাবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। টাঙ্গাইলের মানুষ-অতি সাধারণ মানুষও তাদের বাইরে নয়, তারাও তাদের সঙ্গে একতালে পা মিলিয়ে চলবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু সেই সংগ্রামের প্রস্তুতি কোথায়? কোথায় অস্ত্র, কোথায় চালনার শিক্ষা ব্যবস্থা? কামান বন্দুকের বিরুদ্ধে তো আর লাঠি-সোঁটা বা বর্শা বল্লম নিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। প্রতিরোধের দায়িত্ব সামনে আসতেই এই প্রশ্নটা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে।

তবু তাদের যেটুকু সম্বল তাই নিয়ে তারা প্রতিরোধের জন্য তৈরী হচ্ছে। তাদের সামনের সারিতে আছে কিছুসংখ্যক ইপিআর বাহিনীর যোদ্ধা। স্থানীয় ছাত্র ও যুবকের তাদের কাছ থেকে রাইফেল চালানোর ট্রেনিং নিচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্র বলতে ই,পি,আর বাহিনীর সৈন্যদের হাতে কিছু রাইফেল আছে। আর আছে গুটিকয়েক পুরানো ধরনের মেশিনগান। এই নিয়েই তারা আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত পাক-সৈন্যদের সাথে লড়াই করবে। এই দুই অসব শক্তি-সংঘর্ষের পরিণতি কি হতে পারে, সেটা কি তারা অনুমান করতে পারে না? পারে বই কি। কিন্তু তার পরিণতি যাই হোক না কেন, প্রতিরোধে তারা তাদের

*সত্যেন সেন রচিত 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' আগস্ট ১৯৭১, কলিকাতা থেকে সংকলিত। জায়গাটি আসলে নাটিয়াপাড়া। ভুলক্রমে সাটিয়াচড়া বলে উল্লেখিত হয়েছে।

মাতৃভূমিকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারবে না। সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে প্রতিরোধের সংগ্রাম চলছে তারাও তার সঙ্গে সামিল থাকবে।

অবশেষে সেই আশঙ্কা একদিন সত্যসত্যই প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিল। নিছক জনরব নয়, প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শোনা গেল পাক-সৈন্যদল ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই করে টাঙ্গাইলের দিকে এগিয়ে আসছে। ঢাকা টাঙ্গাইল সড়কের দু'ধারে গ্রামগুলি তাদের হামলার ফলে বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত। পাকসৈন্যরা এই সমস্ত গ্রামের নিরীহ অধিবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়ে হানা দিচ্ছে, তাদের গরু-বাছুর কেড়ে নিয়ে এসে নিজেদের ভোজের উৎসব চালাচ্ছে। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে আসছে। ঘরের মেয়েরাও তাদের লুণ্ঠনরত হাত থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না।

গ্রামের মানুষ প্রাণের ভয়ে আর মান-ইজ্জতের ভয়ে যে যদিকে পারে পালাচ্ছে।

এইভাবে মানুষ নামধারী, এই হিংস্র পশুগুলি বিভীষিকা ছড়াতে চলে আসছে। ওরা ওদের রক্তাক্ত থাবা উদ্যত করে ছুটে আসছে টাঙ্গাইলের দিকে। টাঙ্গাইলের মানুষ হুঁশিয়ার। দেশপ্রেমিক সন্তানগণ, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য তৈরী হও-সংগ্রাম পরিষদের প্রচার-ভ্যান ঘুরে ঘুরে মাইকযোগে উদ্দীপনাময়ী বাণী ছড়াতে লাগল। আক্রমণকারী পাক-সৈন্যবাহিনী প্রথম বাধা পেল সাটিয়াচড়া গ্রামে।

ইপিআর বাহিনীর সৈন্যরা পাঁচটি ট্রেঞ্চ কেটে তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। পথের দু'ধারে ঝোপঝাড়ের আড়ালে রাইফেলধারী ছাত্র ও যুবকেরা পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকসৈন্যরা এর আভাসটুকুও পায়নি। তারা নিশ্চিত মনে এগিয়ে আসছিল। এখানে যে কোন ভয়ের কারণ আছে তা তারা ভাবতেও পারেনি। হঠাৎ তাদের চমকে দিয়ে কতকগুলি মেশিনগান ও রাইফেল গর্জে উঠল। বৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির ঘায়ে অপ্রস্তুত পাক-সৈন্যরা ধরাশায়ী হয়ে পড়তে লাগল। নির্জন ও শান্ত পল্লীপথ এক মুহূর্তে রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল।

প্রতিরোধকারী দেশভক্তরা বিপুলসংখ্যক শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই করে চলেছে। বেশ কিছুকাল এই লড়াই চলেছিল।

হামলাকারী পাক-সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে কঠিন প্রতিরোধ পেয়ে একটু পেছনে হটে গেল। ইতিমধ্যেই তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার পেছনে থেকে আরও অনেক সৈন্য পৌঁছে গেছে। এবার কামান-মর্টারের সম্ভিত ছাবিশটি ট্রাক-বোঝাই সৈন্য সামনে এগিয়ে এল। মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে লক্ষ্য করে তারা অবিরল ধারায় গোলাবর্ষণ করে চলল। তারা ভাবতেও পারেনি যে, মাত্র তেইশ জন ইপিআর-এর যোদ্ধা ট্রেঞ্চের ভিতরে থেকে তাদেরকে প্রতিরোধ করে চলেছে। তাদের সম্বল ছিল মাত্র দুটি হালকা মেশিনগান, আর কিছু রাইফেল। তাই দিয়েই তারা কামান আর মর্টারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

জীবন পণ করে তারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এই প্রবল গোলাবর্ষণের মুখে এরা তাদের কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবে। প্রতিরোধ যখন চূরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল, তখন ট্রেঞ্চের এই তেইশ জন যোদ্ধার মধ্যে একুশ জন নিহত হয়েছে। কোথায় ছিল এদের বাড়িঘর কে জানে। কোথায় ছিল এদের বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা! এরা কোথায় কিভাবে প্রাণ দিল, সেই বীরত্বপূর্ণ কাহিনী কোন দিন এদের কাছে পৌঁছাবে কিনা, তাই বা কে জানে!

লড়াই থেমে গেছে। এদের কামানগুলি কিন্তু তখনও গোলাবর্ষণ করেই চলেছে। এবার এদের আক্রমণের লক্ষ্য সাটিয়াচড়া, গোড়াই আর তার আশেপাশের গ্রামগুলি। তাদের রকেটের আগুনে সেইসব গ্রামের ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হতে লাগল। এরপর গোলাবর্ষণ থামিয়ে ওরা ঘরে ঘরে চড়াও হয়ে হত্যালীলা চালিয়ে যেতে লাগল।

সামনে যাদের পেল তাদের কাউকে রেহাই দিল না। তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামের লোকেরা যে যেরদিকে পারল প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাল।

সাটিয়াচড় গ্রামটি আমার কাছ অপরিচিত নয়। এই গ্রামেই আমার সহকর্মী ও বন্ধু বাকী সাহেবের (কৃষক নেতা খন্দকার আবদুল বাকী) বাড়ি। এই সাটিয়াচড়ে যারা সেদিন পাকসৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন বাকী সাহেব তাঁদের অন্যতম। হামলাকারীরা বাকী সাহেবের বাড়িতে ঢুকে তাঁর আশি বছর বয়সের বৃদ্ধ পিতাকে বন্দুকের কুঁদা দিয়ে এমন আঘাত করল যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

বাড়িতে আর যারা যারা ছিল, এরা তাদের সবাইকে হত্যা করল।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ময়মনসিংহ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫। ময়মনসিংহ ও অন্যান্য এলাকার সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	 ১৯৭১

ময়মনসিংহ শহর ও অন্যান্য স্থানের প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার এ,কে,এম ফরিদউদ্দিন
১০-১-১৯৭৫

বিগত ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে আমি আমার ইপিআর-এর ‘সি’ কোম্পানীসহ ২নং উইং হেডকোয়ার্টার ময়মনসিংহে ছিলাম।

২৫শে মার্চ তারিখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগ, টিক্কা খানের রেডিও ভাষন ও আদেশ এবং পাক সামরিক বাহিনীর পিলখানা, রাজারবাগ আক্রমণের খবর ময়মনসিংহে পৌঁছার সাথে সাথে ময়মনসিংহের ইপিআর-এর বাঙ্গালী যুবকরা তাদের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারে। অন্য দিকে তৎকালীন ২নং ইপিআর উইং-এর কমান্ডার ক্যাপ্টেন কমর আব্বাসের জোয়ানদিগকে আরাম করার আদেশ হইতে পরিস্থিতি আরও পরিস্কার হইয়া উঠে যে বাঙ্গালীদের ভাগ্যকাশে ঘনঘটাৎ ছায়া জুরিয়া বসিয়াছে।

২৭-৩-৭১ তারিখে সকাল বেলা ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস আমাকে অফিসে ডাকাইয়া আদেশ দেন যে, আপনারা প্রায় এক মাস যাবৎ স্ট্যাণ্ডবাই ডিউটি করিতেছেন, এখন স্ট্যাণ্ডাউন করিয়া আরাম করেন। তাহাতে আমি তার সাথে একমত না হওয়ায় দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। ঐ সময় একটি জীপে করিয়া বেশ কিছু এমুনিশন ক্যাপ্টেন সাহেবের বাসায় নিয়া যাওয়ার সময় আমার মনের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় যে, আমাদের উপর হামলা হইবে। তারপর আমি উইং হেডকোয়ার্টারের কয়েকজন বাঙ্গালী এনসিও, যথা হাবিলদার আরিফ, হাবিলদার সিরাজ, হাবিলদার আহম্মদ মিয়া ও হাবিলদার আঃ হাকিমকে নিয়া একটি গোপন বৈঠক করিয়া সিদ্ধান্ত নিই যে, হাতিয়ার দেব না। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কোত হইতে হাতিয়ার এমুনিশন আরও যাহা ছিল বাহির করিয়া জোয়ানদের মধ্যে বিতরন করিয়া দেই এবং যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য হুকুম দিই। সমস্ত বাঙ্গালী জোয়ানরা নতুন করিয়া শপথ নিয়া মরণ পর্যন্ত হাতিয়ার দিবে না বলিয়া আমাকে আশ্বাস দেয়।

সারা দিন দুই পক্ষের লোকদের মধ্যে একটা অবর্ণনীয় পরিস্থিতি বিরাজ করে। ইতিমধ্যে অবাঙ্গালী ফোর্স, যাহাদের মধ্যে ইপিআর, এয়ার ফোর্স, জিডি ট্রুপস, আর্মি সিগন্যাল, মুজাহিদ ইন্সট্রাক্টর এবং আর্মি সিকিউরিটি মিলিয়া প্রায় ১৩৮জন ছিল। তাহারা একটা গোপন বৈঠক করে। ইহার খবর পাইয়া বিকাল অনুমান ৪টার দিকে আমি দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের ‘সি’ কোম্পানী, যাহা খাগডহর ইপিআর ক্যাম্প ছিল, তাহার কমান্ডার তৎকালীন মেজর নূরুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করি। সমস্ত গোপনীয় সংবাদ, যাহা আমার জানা ছিল, তাহাকে অবগত করাই এবং আগে আমাদের অ্যাকশনের জন্য পরামর্শ করি এবং তাঁহার সহযোগীতা কামনা করি। তারপর অনুমান সাড়ে ছয়টার সময় ক্যাপ্টেন কমর আব্বাসকে সাথে নিয়া আসিয়া আমার বাঙ্গালীদিগকে ফল-ইন করিতে হুকুম দেন, কিন্তু আমি অল্প কিছু লোক যাহারা সামনে ছিল তাহাদেরকে একত্র করিয়া মেজর সাহেবকে আলাপ করিতে দেই। মেজর সাহেব বলেন যে একটি কোম্পানী বা একটি উইং কি করিয়া পাক আর্মির বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারে বা বাঁচার জন্য তৈরী হইতে পারে? যাহোক, মেজর সাহেব আমাদেরকে অভয় দেন যে কোন বিপদ হবে না, ভুল চিন্তা করিবেন না। কিন্তু ঐ সময় আমি দেখিতে

পাই যে, অবাস্তালী ২০/২৫ জন মুজাহিদ কোতে ঢুকিয়া ডিউটি শুরু করিয়াছে। অন্য দিকে, তাহাদের কিছু জেসিও মেসে, কিছু অফিসের ভিতর, কিছু ক্যাপ্টেন সাহেবের বাসায় এবং অন্যদিকে ২৫/৩০ জনের একটি গ্রুপ পেট্রোল ডিউটি আরম্ভ করিয়াছে। তখন কয়েকজন বাঙ্গালী জোয়ান দৌড়াইয়া আমার নিকট আসিয়া বলে যে, আমরা কি করিব। অবস্থা খুবই খারাপ দেখিয়া আমি ওদেরকে নিজের জায়গায় থাকিতে আদেশ দেই এবং যে কোন মূল্যে কোর্টার গার্ড নিজেদের আয়ত্রে রাখিতে আদেশ দেই।

অন্যদিকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী যাহা পুকুর পারে ছিল তাহাদের মধ্যে নায়ক সুবেদার বড়ুয়া এবং নায়ক সুবেদার মোশাররফ হোসেনকে (দুই জনই বাঙ্গালী) ডাকাইয়া অবস্থা তাহাদেরকে জানাই এবং তাহাদের মনোভাব অতি সতর্কতার সহিত অনুভব করি, যেহেতু তাহারাও আর্মি। এই ভাবে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে আমাদের উপর হামলা হইবে। তাই আমি পরিস্থিতি সম্বন্ধে মেজর নূরুল ইসলামকে ডাক বাংলায় খবর পাঠাই। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়ার আগেই রাত্রি প্রায়সাড়ে এগারটার সময় অবাস্তালীদের তরফ হইতে প্রথম ফায়ার আসে যাহাতে বাঙ্গালী একজন জোয়ান আহত হয়। অমনি দুই দিক হইতে তুমুলভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন শুরু হয়। এই যুদ্ধে ২৭ তারিখ রাত্রি সাড়ে এগারটা হইতে পরদিন বিকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্যন্ত ছিল। ইপিআর হেডকোয়ার্টারের দুই দিকের আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে সারা ময়মনসিংহ কাপিয়া উঠে। এই দীর্ঘ আঠার ঘন্টার যুদ্ধে বাঙ্গালীরা সংখ্যায় ছিল প্রায় ২২০ জন আর অবাস্তালীরা ছিল ১৩৮ জন। সারারাত যুদ্ধ চলে। সকালের দিকে শহর ও গ্রাম হইতে প্রায় ১০/১৫ হাজার বাঙ্গালী সিভিল লোক বাঙ্গালীদেরকে খাবার, পানীয় ও অন্যান্য যথাসম্ভব সাহায্য করে। অবাস্তালীদের মধ্য হইতে ১২১ জন মারা যায় এবং বাকী সতের জন আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সুবেদার মেজর জিন্নত খাঁ, নায়ক সুবেদার বোস্তান খাঁ, নায়ক সুবেদার খান বাহাদুর, হাবিলদার গোলাম হায়দার, হাবিলদার নাজির বাদশাহ প্রমুখ ছিল। যাহারা মারা যায় তাহাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস, একজন এয়ারফোর্সের অফিসারও ছিল।

প্রকাশ থাকে যে, আমি সকাল সাড়ে আটটার দিকে উক্ত উইং- এর অধীনে বর্ডারে থাকা কোম্পানীগুলিকে একটি অয়ারলেস মেসেজ দ্বারা হেডকোয়ার্টারের পরিস্থিতি জানাই। (১) কোম্পানীগুলি ছিল সুবেদার হাকিম সাহেবের সাথে নকশী, (২) সুবেদার জিয়াউল হক সাহেবের সাথে করইতলী এবং (৩) সুবেদার আজিজুল হকের সাথে লেংগুরায়। আমি মেসেজে তাহাদেরকেও জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ জানাই, যাহা তাহারা করেন।

এই যুদ্ধের পর আমি মোজাহিদ অস্ত্রাগার দখল করি এবং কোতে থাকা ১৪৭২টা রাইফেল, ২৮টি এলএমজি, বেশ কিছু স্টেনগান, এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ৩০৩ গুলি, প্রায় ছত্রিশ হাজার ৯ এমএম গুলি এবং আরও যুদ্ধসরঞ্জাম দখল করি, যাহা পরে তৎকালীন মেজর বর্তমানে মেজর জেনারেল কে,এম,শফিউল্লাহ সাহেবকে দেই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি-কোম্পানীর সাহায্য আমি চাহিলে সিনিয়র জেসিও বড়ুয়া বলেন যে মেজর সাহেবের বিনা ছকুমে সে আমাকে সাহায্য করিতে পারিবেনা। তারপর নায়ক সুবেদার মোশাররফ হোসেন সকাল প্রায় নয়টার দিকে কিছু লোক নিয়া আমার সাথে যোগ দেয়, কিন্তু ঘন্টাখানেক পর আবার বিরত হইয়া যায়। অন্যদিকে মেজর নূরুল ইসলাম, তার সঙ্গী লেফটেন্যান্ট মান্নান সাহেবের কোন খোজ পাওয়া যায় নাই। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টার দিকে যখন আমি উইং-এর লোকেশন বদলী করার জন্য পুলিশ লাইনের ভিতর দিয়া যাইতে ছিলাম তখন আমার ৪/৫ জন লোক মেজর সাহেবকে আমার সঙ্গে ঐ জায়গায় দেখা করাইলে জানিতে পারি যে মেজর সাহেব ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি মেজর সাহেবকে

ঘটনা পুরাপুরি বলিলে তিনি আমাকে বলেন যে, তাহার ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার জয়দেবপুরে অয়ারলেসে আলাপ করার পর আবার আমার সঙ্গে দেখা করিবেন।

রাত্রিতেই আমি পুলিশ, সিভিল ও আওয়ামী লীগের লোকজনের সাহায্যে আমার উইং-এর লোকেশন বদলী করিয়া রাবেয়া হাই স্কুলে নিয়া যাই, কারন আমি অনুমান করি যে পরের দিন পাক বাহিনী খবর পাইলে হয়তো কোন এয়ার একশন নিতে পারে। সিভিল লোকদের মধ্যে যাহারা অগ্রভাগে কাজ করিয়া আমাকে সাহায্য করেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন এম-এন-এ (বর্তমান আওয়ামীলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট) জনাব রফিক উদ্দিন ভূইয়া, বর্তমানে লগুনে এ্যাসোসেডর জনাব সৈয়দ সুলতান সাহেব, বর্তমান এমপি হাতেম আলী তালুকদার সাহেব প্রমুখ।

পরের দিন ২৯-৩-৭১ তারিখে সকাল বেলা আমি রাবেয়া হাইস্কুলে ইপিআর-এর লোক সহ বাংলাদেশ পতাকাকে গার্ড অব অনারের সাথে সালাম দিয়া পতাকা ছুঁইয়া নতুন করিয়া শপথ নিই যে আমরা যুদ্ধ করিব। উল্লেখযোগ্য যে, পতাকা তুলিয়াছিল হাবিলদার নিয়াজ। কারণ এখন আর গতান্তর নাই। অনুমান বেলা ১১টার দিকে যখন আমি খাগডহর-এর দিকে যাচ্ছিলাম নতুন বাজারের মোড়ে একজন লোক সাদা পোশাকে আমাকে পরিচয় দেয় যে তিনি বেলুচ রেজিমেন্টের একজন বাঙ্গালী ক্যাপ্টেন এবং আমার সঙ্গে যোগ দিতে চান। কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করিতে না পারায় পরে দেখা করিতে বলি, কারন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। একটু পরেই মেজর নূরুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বলেন যে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ময়মনসিংহের ইপিআর-এর যুদ্ধের কথা শুনিয়াছি। তাহারা বৈকালের দিকে ময়মনসিংহে পৌঁছাইতেছে যাহাতে কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার রহিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ময়মনসিংহের রাজবাড়িতে একত্রিত হয়। এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ লিডারসহ একটি গোপন বৈঠক করিয়া ময়মনসিংহের প্রতিরক্ষা এবং ঢাকা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি নকশী কোম্পানীকে জামালপুরের দায়িত্বে, করইতলা কোম্পানীকে সদর পশ্চিম দিকের দায়িত্বে এবং লেংগুরা কোম্পানীকে সদর দক্ষিণ দিকের দায়িত্বে দিয়া আমার হেডকোয়ার্টার কোম্পানী ও উইং হেডকোয়ার্টারসহ নরসিংদী হইয়া ঢাকার পূর্বদিক দিয়া আক্রমণ চালাইবার সিদ্ধান্ত নিই।

৩০-৩-৭১ তারিখে মেজর শফিউল্লাহ সকাল ৮ ঘটিকার সময় আমার ইপিআর ফোর্সের সাথে রাবেয়া হাইস্কুলে আলাপ করেন এবং তাহাদেরকে ঢাকার দিকে রওনা হওয়ার জন্য বলেন। ঐ দিন ঐ সময়ই আমি আমার নিকট ক্যাপচার করা ১৪৭০টি রাইফেল, ২৮টি এলএমজি, বহু স্টেনগান, এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার ৩০৩ গুলি, ছত্রিশ হাজার ৯ এমএম গুলি ইত্যাদি তাহার নিকট হস্তান্তর করি। অন্যদিকে, বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানীর তৎকালীন ক্যাপ্টেন (বর্তমান লেঃ কর্ণেল) নাসিম সাহেবের নেতৃত্বে ট্রেনে ভৈরব হইয়া ঢাকার পথে রওনা দিই। বেলা সাড়ে বারটার সময় এই স্পেশাল ট্রেন ময়মনসিংহ স্টেশন ত্যাগ করে। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান আমাদের দলে যোগ দেন। রাত্রি প্রায় ১১টার দিকে ভৈরব পৌঁছালে ক্যাপ্টেন নাসিম সাহেব তাহার কোম্পানী সহ ভৈরব স্টেশনে নামিয়া যাইতে থাকিলে আমি তাকে বলি যে, ঢাকা যাইবেন না? তিনি উত্তরে বলেন যে, সকালবেলা একটা কোম্পানী আপনি নরসিংদীতে পাবেন। আপনি গিয়া আগের দিকে ব্যবস্থা করেন।

আমরা সকালের দিকে নরসিংদীতে পৌঁছাইয়া সড়ক পথে ঢাকার দিকে রওনা হই। কিন্তু ডেমরা ঘাট পাক ফোর্সের দখলে জানিতে পারিয়া পাঁচ দোনা বাজার হইতে আমরা ঢাকা শহরের প্রায় ১২ মাইল দূরে ভাঙ্গা নামক স্থানে জঙ্গলে শীতালক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে সন্ধ্যার পর অবস্থান নিই। এই ঘটনা ৩১-৩-৭১ তারিখের। এখানে আলীজান জুট মিলের ম্যানেজার জনাব মিজানুর রহমান সাহেবের নিকট হইতে আমরা খুব সাহায্য পাই।

এদিকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী ক্যাপ্টেন সাইগলের নেতৃত্বে আমাদের সঙ্গে নরসিংদীতে ৩১-৩-৭১ তারিখে বেলা প্রায় দুইটার দিকে যোগ দেয়। ডেমরায় পাক ফোর্স যাহতে আমাদের ক্ষতি না করিতে

পারে তার দায়িত্ব বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানীকে দেওয়া হয়। এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, তাহার ঢাকা-নরসিংদী পাকা রাস্তায় ফোর্সের যে কোন অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করিবে। আমরা ঢাকার পূর্ব দিকে আক্রমণ করিব। সেই ভাবে ১-৪-৭১ তারিখ রাত্রিতে আমি ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান সহ ৩’’ মর্টার দ্বারা ঢাকায় ক্যান্টনমেন্ট এরিয়াতে ইপিআর-এর ৬০ জন লোক মিলিয়া আক্রমণ করি যাহাতে পাক ফোর্সের গাড়ী ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম ধ্বংস করি। এই যুদ্ধ চালাইতে আমাদের সাহায্য করেন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব লাল মিয়া সাহেব। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে পাক ফোর্স তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য ৩-৪-৭১ তারিখে রেডিওতে হুকুম জারি করে ঢাকার সমস্ত বাস ও ট্রাক রমনা মাঠে ড্রাইভার সহ রিপোর্ট করিতে। এর আগে আকাশবাণী কলিকাতা হইতে এই খবর প্রচার হইয়াছিল যে, একটি বিরাট মুক্তিবাহিনী দল নরসিংদী হইয়া ঢাকার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমরা ভাঙ্গা হইতে পরপর দুইদিন ও রাত্রিতে আক্রমণাত্মক এ্যাকশন চালাইলে পাক ফোর্স তাহার ডেমরা ঘাঁটির শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে বলিয়া সংবাদ পাই। আরও জানিতে পারি যে, আমাদের বেইসের উপর আক্রমণ করিবে। কিন্তু আমাদের ২২ জন লোকের একটি দল গেরিলা পদ্ধতিতে ঢাকার তৎকালীন পাক মোটর বর্তমান বাংলা মোটরে ৪-৪-৭১ তারিখের রাত্রিতে এবং ঢাকা-ডেমরা রোডে ৫-৪-৭১ এ রাত্রিতে দুই জায়গায় সরকারী গাড়ী সহ বেশ কিছু পাক ফোর্সকে মারে। এই দুইটা সফল অপারেশনে অংশ গ্রহন করিয়াছিল হাবিলদার হাকিম, সিপাই নান্নু মিয়া সিপাই আফতার, সিপাই ক্লার্ক মান্নান।

৩-৪-৭১ তারিখে বেলা অনুমান ১১/১২ টার সময় আমি একজন সিপাই-এর মারফত সংবাদ পাই যে, ঢাকায় বহু ইপিআর মারা পড়িয়াছে। এবং প্রায় ১০০ লোক ঢাকার জিজিরায় সুবেদার গণি সাহেবের সাথে আছে। আমি একজন লোক মারফত চিঠি দিয়া গণি সাহেবকে আমার সহিত যোগদানের অনুরোধ জানাই। ৬-৪-৭১ তারিখে আমি নায়ক সুবেদার সুলতান- এর মারফত জানিতে পারি যে, সুবেদার গণি সাহেব নরসিংদীতে লোক নিয়া পৌঁছিলে ঐ জায়গায় বিমান আক্রমণ হয়। এবং তাহারা আবার ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এবং অন্য দিকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী নয়া ক্যাপ্টেন সাইগল ঢাকা-নরসিংদী রাস্তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিয়া নরসিংদী পার হইয়া পূর্ব দিকে চলিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া আমার লোক জনের মনোবল কমিয়া যায়। আমার ২০/২২ জন লোক তখনও ভাঙ্গা বেইস হইতে ঢাকায় আপারেশনে ছিল। অন্যদিকে ২-৪-৭১ তারিখে আমি নায়ক সুবেদার সিরাজ-এর নেতৃত্বে ৪০ জন লোকের একটি প্লাটুন ঘোড়াশাল রেল স্টেশন এরিয়া প্রতিরক্ষার জন্য পাঠাই। ৬-৪-৭১ তারিখে বেঙ্গল রেজিমেন্ট চলিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়া আমি তাহাদেরকে আমার সঙ্গে পাঁচদোনায় ফেরত ডাকিয়া পাঠাইয়া নিজে ভাঙ্গার লোকজন সহ পাঁচদোনার শীলমন্দির নামক গ্রামে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করি, অর্থাৎ ডিফেন্স লাগাই। অন্য দিকে খবর পাই যে, পাক ফোর্স ডেমরায় জমা হইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতেছে।

৭-৪-৭১ তারিখে রাত্রে জানিতে পারি যে, পাক ফোর্স সকাল বেলা আমাদের উপর হামলা করিবে। তাই পাঁচদোনার আগে ১২-১৪ জন লোক দিয়া একটি এ্যামবুশ পার্টি লাগাই যাহাতে সিপাই নান্নু, মান্নান, হাকিম ছিল। ঠিক ৮-৪-৭১ তারিখ সকাল আনুমানিক সাড়ে সাড়ে ছয়টায় পাক ফোর্স অগ্রসর হইতে থাকিলে এ্যামবুশ পার্টি একযোগে ৪ টি এলএমজি দ্বারা আক্রমণ চালায় যাহাতে পাক ফোর্সের প্রায় ১৫৫ জনের মতলোক হতাহত হয় এবং কয়েকটি গাড়ীও নষ্ট হয়। পাক ফোর্স ঐ দিন আর অগ্রসর হয় নাই।

৯-৪-৭১ তারিখ অনুমান নয়টার সময় পাক ফোর্স এয়ার ও আর্টিলারী সমর্থনপুষ্ট হইয়া আমাদের ওপর হামলা চালায়। অনুমান এক হইতে সোয়া ঘন্টা যুদ্ধের পর পাক ফোর্স-যাহাতে ৩১ বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল-আক্রমণ ছাড়িয়া দিয়া পাঁচ হইতে পিছে চলিয়া যায়। যুদ্ধ কিছুটা স্থিমিত হইয়া পড়ে কিন্তু আর্টিলারী ফায়ার চলিতে থাকে। আমাদের তরফ হইতে চলিতে থাকে তিন ইঞ্চি মর্টার। বেলা অনুমান ৫ ঘটিকার সময় পাক ফোর্স আবার আমাদের উপরে এয়ার ও আর্টিলারী দ্বারা সমর্থন পুষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বার হামলা চালায়। এই যুদ্ধে পাক ফোর্সের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। আমাদের দুটি মেশিনগান খারাপ হইয়া যায়। পাক ফোর্স এইবারও যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া আক্রমণ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধ্যার সময় গোপালদী বাজারে চলিয়া যায়। এদিকে দুইবারের

আক্রমণে আমাদের কিছু হাতিয়ার খারাপ হইয়া যায়। যাহা হউক, সন্ধ্যার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা এই আবহায়া ছাড়িয়া ভৈরবের দিকে যাইয়া বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে মিলিব। আশুগঞ্জে গিয়া বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পাওয়া যায়। এবং সেখানে হইতে কিছু বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ ১৩-৪-৭১ তারিখে রামনগর পুলের নিকট আর একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয়। কিন্তু ১৪-৪-৭১ তারিখে সূর্যাস্তের আগে হইতেই এয়ার ও আর্টিলারী সমর্থনপুষ্ট হইয়া পাক ফোর্স হামলা চালায় এবং দুপুর ১২ টার আগেই ঐ ডিফেন্স নষ্ট হইয়া যায় এবং এখানকার লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। কিছু লোক মেঘনা পার হইয়া সিলেট জেলার ভিতর চলিয়া যায়।

আমি কিছু সংখ্যক লোকসহ কিশোরগঞ্জ হইয়া ময়মনসিংহে যাই, কারণ আমার ছেলেপেলে এখানে ছিল। তারপর ১৫-৪-৭১ তারিখ বিকালবেলা আমি মুক্তাগাছা হইয়া ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরে জিয়াউল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলে জানিতে পারি যে, টাঙ্গাইলের আগে জামুকী এলাকায় নায়ক সুবেদার হারিসের নেতৃত্বে ইপিআর দলের সঙ্গে পাক ফোর্সের তুমুল যুদ্ধ হয় এবং দুই দিকের ভীষণ ক্ষতি হয়। তাহাতে ২০/৩০ জন ইপিআর মারা যায়।

পরদিন ১৭-৪-৭১ তারিখে খুব সকাল হইতে পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের ৪টি জঙ্গী বিমান ভীষণভাবে ময়মনসিংহ শহর ও অন্যান্য এলাকায় আক্রমণ চালায় যাহাতে কিছু সিভিল লোক শস্ত্রগুঞ্জ ঘাটে মারা যায় এবং কয়েকটি বাস ও দোকানঘর পুড়িয়া যায়। অন্যদিকে গফরগাঁওয়ে বেশ কিছু সিভিল লোক মারা যায় এবং অনেক জায়গা পুড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া মধুপুর ও জামালপুরেও বিমান আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাই।

তারপর আমরা আমাদের অবস্থানে যে কয়েকজন লোক ছিল তাহাদের নিয়া বর্ডারে করইতলী হেডকোয়ার্টারে ফুলপুর ও হালুয়াঘাটের মাঝামাঝি সায়াচাপুরঘাটে ডিফেন্স তৈয়ার করি। কিন্তু ২২-২৩ তারিখে পাক ফোর্স আবার এয়ার ও আর্টিলারী দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হইয়া আক্রমণ চালায় সকালের দিকে। সেখানে আমরা অতি অল্প সময় টিকিতে পারি। ২৩-৭-৭১ তারিখে আমি আমার সঙ্গী লোকসহ করইতলী ক্যাম্পে থাকাকালীন সুবেদার হাকিম সাহেব আসিলে তাঁহাকে উইং-এর ভার দিয়া আমি আমার ফ্যামেলিসহ হিন্দুস্থানের ভিতর দিয়া গাছুয়াপাড়া হইতে ডালু হইয়া আমার বাংলাশে ঢুকিয়া বহু কষ্টে আমার ফ্যামেলি বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আগরতলা কোনাবন বর্ডার দিয়া ঢুকিয়া পুরানো ফোর্সের সাথে ৩ সেকটরের অধীনে বেলচরা সাবসেকটরে যাইয়া যোগদান করি। সেখানে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান সাহেব ছিলেন। তারপর ঐ সব সেকটরের ১৬-৫-৭১ হইতে যুদ্ধে লিপ্ত থাকি।

সশস্ত্র প্রতিরোধে ময়মনসিংহ

সাক্ষাৎকার : সুবেদার মেজর জিয়াউল হক

৮-৬-৭১

২৬শে মার্চ বেলা একটার সময় ঢাকা ইপিআর হেডকোয়ার্টার থেকে কমর আব্বাসকে অয়ারলেস সেটে এ কথা বলার জন্য ডাকা হয়। তখন ডিউটি অপারেটর ছিল নায়ক ফরহাদ হোসেন (বাঙ্গালী)। ঢাকা থেকে বলা হল, অয়ারলেস সেট অন করার পর সেখানে যেন কেউ না থাকে। তাই নায়ক ফরহাদ হোসেন ঝুঁকি নিয়ে পাশের ঘরে একটা জায়গা চুপি চুপি দাঁড়িয়ে থাকে। সৌভাগ্যবশত সে পাঞ্জাবী ভাষা বুঝত। ঢাকা থেকে উইং কমান্ডারকে বলা হচ্ছিল সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে নিরস্ত্র করার জন্য এবং কোতে, ম্যাগজিন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চাবি নিয়ে নিতে এবং বাঙ্গালীদের কোন ডিউটি না দেয়ার জন্য। ঢাকা থেকে ইপিআর-এর স্টাফ কর্নেল সিকান্দার খান তাকে আরো বলে যে, আজ রাতের মধ্যে মসস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে খতম করতে হবে এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় ইপিআরদের সমন্ধে তোমাকে পরে নির্দেশ দেয়া হবে।

নায়েক ফরহাদ হোসেন অয়ারলেস সেট-এর পেছনে চুপি চুপি এই কথাগুলো শোনে এবং সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে তা জানিয়ে দেয়। নায়েক ফরহাদ অয়ারলেস সেটে ২৭শে মার্চ আমাদের ভোর ছয়টার সময় উক্ত মেসেজ জানায় এবং বলে যে, আপনি আপনার বন্দোবস্ত করেন যদি বাঙ্গালী জোয়ানদেরকে বাঁচাতে চান।

সেই নির্দেশ অনুযায়ী সবাইকে নিরস্ত্র করা হয়। একমাত্র সি-কোম্পানীর এক প্লাটুন ইপিআর অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করে। নিরস্ত্রকরণের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় ইপিআর'রা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ঐ প্লাটুন-এর নেতা ছিল সুবেদার ফরিদউদ্দিন আহমদ।

এই ঘটনার পর থেকে স্থানীয় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্রবৃন্দ ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা আমাদেরকে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার আবদুল্লা-আল-মাহমুদ ও তার সহকর্মীবৃন্দ, আর ছিলেন এডভোকেট সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, অধ্যক্ষ মতিয়ুর রহমান (আলমগীর মিন্টু কলেজ) সৈয়দ আবদুস সুলতান (বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে হাই কমিশনার), জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়া, এডভোকেট মোশাররফ আকন্দ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। মোজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক আবদুল হান্নান ও অধ্যাপক দেওয়ান এবং ভাসানী সমর্থক ছাত্রনেতা আবদুল হামিদও ছিলেন।

২৭শে মার্চ ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস ঢাকায় নির্দেশ অনুসারে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী জেসিও-এনসিওদেরকে বাঙ্গালী ইপিআরদের খতম করার নির্দেশ দেন রাত এগারটার সময়। ট্রপস ব্যারাক, উইং কমাণ্ডারের বাংলো এবং কোয়ার্টার গার্ড কোতে এবং ম্যাগজিনের সমস্ত এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরদের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদসহ মোতায়েন করা হয়। উইং কমাণ্ডার-এর বাংলোতে সি-কোম্পানী এক প্লাটুনকে ডিউটির জন্য মোতায়েন করা হয়। গার্ড কমাণ্ডার শফি এবং অন্য দুই জনের কাছে করে ৩০৩ রাইফেল ছিল। বাকিদের কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না।

রাত এগারটার সময় হেডকোয়ার্টারের তিনতলা থেকে হাবিলদার মেজর হাসিব উল্লাহ এক রাউণ্ড গুলি ফায়ার করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জায়গা থেকে ফয়ারিং শুরু হয়ে যায়। হেডকোয়ার্টারে তখন ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী আবস্থান করছিল। গোলাগুলি শুরু হবার পর বাঙ্গালী ইপিআররা ওদের সাথে মিশে যায়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক সুবেদার বড়ুয়া এবং সুলতান আমাদের জোয়ানদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র বাঙ্গালী ইপিআরদের দিয়ে দেয়। গোলাগুলি চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ইপিআর-এর কিছু সাহসী বাঙ্গালী জোয়ান স্থানীয় কয়েকজন ছাত্রের সহযোগিতায় কোতে এবং ম্যাগজিন-এর ভেন্টিলেশন ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ে অস্ত্রশস্ত্র বের করতে সমর্থ হয়। ২৮শে মার্চ ভোরবেলায় জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়া, শামসুল হক এমপিএ, ছাত্রনেতা আবুল হাশেম ও হামিদের সহযোগিতায় ময়মনসিংহ জেল এবং পুলিশ লাইনের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এনে বাঙ্গালী ইপিআরদের দেয়া হয়।

২৮শে মার্চ বেলা ৮টা পর্যন্ত দুই পক্ষে তুমুল লড়াই চলে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৩/৯৪ জন। ১১ জন জেসিও-এসসিও জেসিও মেসে সারারাত ফায়ার করার পর ১৭ থেকে ১৯ বাব্ব গুলিসহ আত্মসমর্পণ করে সুবেদার ফরিদের কাছে। ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস সকালবেলা সিপাই নান্নু মিয়া এবং আফতাব হোসেনের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সিপাই নান্নু এবং আফতাব স্বাধীনতা সংগ্রামে কর্ণেল নুরুজ্জামানের অধীনে এবং ডালু সেক্টরে অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে।

১১জন জেসিও এনসিওকে সুবেদার ফরিদউদ্দিন ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় ময়মনসিংহ জেলে বন্দী করা হয়। অতঃপর ময়মনসিংহের সকল বাঙ্গালী জোয়ান এনসিও মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে ৪/৬ কোম্পানী গঠন করে জয়দেবপুর ও টুঙ্গী অভিমুখে যাত্রা করে।

এদিকে রংপুর সীমান্ত এলাকার মাদারচর বিওপি থেকে সিলেট সীমান্তের মহেশখোলা বিওপি পর্যন্ত ২৪টা বিওপি'র সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে (প্রত্যেক বিওপিতে তিনজন করে রেখে) দুই কোম্পানীতে সংগঠিত করে সুবেদার মেজর আবদুল হাকিম এবং আমার নেতৃত্বে মুক্তাগাছা, রসুলপুর, মধুপুর, জামালপুর, ঘাটাইল এলাকা পর্যন্ত মোতায়েন করা হয়। তখন আমাদের সঙ্গে ময়মনসিংহ শহরের শামসুল হক এম-পি, মুক্তাগাছার শহীদুল্লাহ এম-পি, রফিকউদ্দিন ভূইয়া, নাগরপুর কলেজের অধ্যক্ষ হুমায়ন খালিদ, লতিফ সিদ্দিকী এম-পি এবং কাদের সিদ্দিকী আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করেন। এই সময় ময়মনসিংহ সদরের এসডিও, মেজর শফিউল্লাহর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন মতিয়ুর রহমান এবং জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়া ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাপ্টেন বালজিৎ সিং ত্যাগী ও কর্নেল রাংগাজান (৮৩ বিএসএফ ব্যাটালিয়ন কমণ্ডার)- এর সাথে যোগাযোগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন সাহায্য না দিলেও ভবিষ্যতে কর্নেল রাংগাজান আমাদেরকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি আমাদের সামনে দিল্লীতে এ ব্যাপারে মেসেজ পাঠান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, রফিকউদ্দিন ভূইয়া, আবদুল মান্নান (বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী) ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমার কোম্পানী হেডকোয়ার্টার করইতলীতে (হালুয়াঘাটে) অবস্থান করছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে তাঁর বাড়ি থেকে জনাব আবুল হাশেম গাইড করে নিয়ে আসেন এবং আমাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাঁকে নেতা বানানো হয়। তাদেরকে কর্নেল রাংগাজানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় ভারতের গাচুয়াপাড়া রেস্ট হাউস ইন্সপেকশন বাংলাতে।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি কলকাতাতে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চলে যান। সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতার ভার রফিকউদ্দিন ভূইয়ার উপর অর্পণ করা হয়। অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র না পেলেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণ হ্যাণ্ড গ্রেনেড এবং ২৭টি এলএমজি বিএসএফ ক্যাপ্টেন ত্যাগীর নিকট থেকে পাই। তিনি ছদ্মবেশে রসুলপুর এলাকাতে আমার সাথে কাজ করতে থাকেন। এছাড়াও প্রত্যেক রাত ভারত থেকে (ডালু এবং মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে) ইঞ্জিনিয়ার আর্মি ইঞ্জিনিয়ার টিম পুল এবং রাস্তা ধ্বংস করার জন্য আসতেন এবং কাজ সমাধা করে রাট্রেই চলে যেতেন। ২৭শে মার্চ ময়মনসিংহের উইং হেডকোয়ার্টারে পশ্চিম পাকিস্তানীদের খতম করার পর সীমান্তের সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরদেরও খতম করা হয়।

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় কি তৃতীয় সপ্তাহে আমাদের উপর কালিহাতী, রসুলপুর, মধুপুর, জামালপুর, মুক্তাগাছা, শম্ভুগঞ্জ, গৌরিপুর ইত্যাদি স্থানে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী পর্যায়ক্রমে বিমান হামলা চালায়। তাদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে এবং ক্রমশ আমাদের বাঙ্গালীদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে থাকে বলে আমরা অনুমান করি। বিমান হামলার ফলে মেজর শফিউল্লাহর তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে চলে যান।

মধুপুরগড়ের যুদ্ধ*

বিক্রমপুরের সুদূর গ্রামাঞ্চলে বসে ভারতীয় বেতারের প্রচারিত সংবাদ শুনছিলাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে আকাশবাণী ঘোষণা করছে, ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরগড়ে পাক সৈন্যদলের আর মুক্তিবাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে।

শতাধিক বছর আগে এই মধুপুর গড় আমাদের দেশের রাজনৈতিক আবর্তনের ইতিহাসের পাতায় একটু স্থান করে নিয়েছিল। আজকের দিনে আমাদের কাছে সেই ঐতিহ্য হয়তো তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেদিন এই মধুপুর গড়ে একদল বিদ্রোহীর অভ্যুত্থান সারা বাংলার মানুষের মনে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল। সেই বিদ্রোহ আকারে ছোট হলেও তখনকার দিনের ব্রিটিশ রাজপুরুষরা তাই নিয়ে কিছুটা উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

ময়মনসিংহ শহর তথা ময়মনসিংহ জেলা তখনও মুক্ত অঞ্চল। কিন্তু তার উপর রাহুগ্রাসের ভয়াল ছায়া নেমে আসছে। দুর্দিন আসন্ন। হামলাকরী পাক-বাহিনী টাঙ্গাইল শহর হস্তগত করে ময়মনসিংহ শহর দখল করবার জন্য দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। তাদের এই অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করতে হলে পথের মাঝখানেই তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। এই প্রতিরোধের ঘাঁটি গড়ে তোলার পক্ষে মধুপুর গড়ই সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। মুক্তিবাহিনী স্থির করেছিল এইখানেই তাদের পথ রোধ করে দাঁড়তে হবে। কিন্তু প্রতিরোধ করবে কারা? প্রতিরোধের মূল শক্তি ইপিআর-এর যোদ্ধারা এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্য সেক্টরে চলে গেছে। তারা আসতে আসতে এই দুশমনরা মধুপুর গড় ছাড়িয়ে চলে যাবে। অতএব অবিলম্বে তাদের বাধা দেওয়া দরকার। এই অল্প সময়ের মধ্যেই যেটুকু শক্তি আছে তাই নিয়ে তাদের প্রতিরোধ দিতে হবে।

মুক্তিবাহিনীর সংগঠকরা বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের কাছে জরুরী ডাক পাঠালেন। সেই আহবানে সাড়া দিয়ে নান জায়গা থেকে ২২ জন ছাত্র মধুপুর গড়ে এসে পৌঁছল। এরা যুদ্ধ করবার জন্য তৈরী হয়ে এল বটে, কিন্তু এদের মধ্যে কেউ আগে থেকে অস্ত্র চালনায় অভ্যস্ত ছিল না। মাত্র দিনসাতেক আগে থেকে তারা ইপিআর-এর লোক বা প্রাক্তন সৈন্যদের কাছ থেকে রাইফেল চালনা শিখছিল। এইটুকু শিক্ষাই ছিল তাদের সম্ভল। আর সম্ভল ছিল অনির্বাণ দেশপ্রেম ও দুর্জয় সাহস। একথা শুনে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারবে যে মাত্র ২২ জন অস্ত্র চালনায় অনভ্যস্ত ছাত্র সেদিন সেই দুর্ধর্ষ পাক-বাহিনীকে মোকাবিলা করতে দাঁড়িয়েছিল? একথা সত্য সত্যই বিশ্বাস করা কঠিন। তাহলেও এটাই ছিল বাস্তব ঘটনা।

১৩ই এপ্রিল তারিখে প্রথম সংঘর্ষ ঘটল। দু'পক্ষের মধ্যে গুলিবর্ষণ চলল। ২২টি রাইফেল শত্রুপক্ষের মেশিনগানের জবাব চলেছে। ছাত্ররা বনের আড়ালে আত্মগোপন করে যুদ্ধ করছিল। শত্রুপক্ষের প্রবল গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একজনও নিহত বা আহত হয়নি। পরে জানা গিয়েছিল, এই দিনের যুদ্ধে ছাত্রদের গুলিতে প্রতিপক্ষের একজন ট্রাক-ড্রাইভার ও একজন জীপ ড্রাইভার মারা গিয়েছিল। বেশ কিছুটা দূর থেকে গুলি বিনিময় চলছিল। এইভাবে বাধা পেয়ে পাক-সৈন্যরা অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের অগ্রগতি সেদিনের মত স্থগিত হয়ে গেল। প্রতিরোধকারীদের পক্ষে এটা একটা বিরাট সাফল্য। মাত্র ২২ জন ছাত্রের এই বাহিনী শক্তিশালী শত্রুদের হাত থেকে এই সাফল্যকে ছিনিয়ে নিয়ে এল। এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা অত্যন্ত মূল্যবান। পরদিন ১৪ই এপ্রিল তারিখে এখান থেকে জরুরী ডাক দুই ট্রাকবোঝাই ৫০/৬০ জন মুক্তিদ্রোঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে গেল। এদের মধ্যে অস্ত্র চালনায় শিক্ষিত ও অভ্যস্ত যোদ্ধারা ছিল। তাদের সঙ্গে রাইফেল ও হালকা মেশিনগানও ছিল। এদের পেয়ে এখানকার প্রতিরোধ বাহিনী এবার এক শক্তিশালী বাহিনী হয়ে দাঁড়াল।

১৪ই এপ্রিল সারাদিন ধরে দু'পক্ষের পচণ্ড যুদ্ধ চলল। শেষ পর্যন্ত এদের প্রতি-আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে সুশিক্ষিত ও আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পাক-সৈন্যরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে পেছন দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতে তারা পেছনে ফেলে আসা কালিহাতী, ঘাটাইল অঞ্চলে গিয়ে থামল। প্রতিরোধকারী মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসর হয়ে পাক-সৈন্যদের পরিত্যক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে দেখল যে, সেখানে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মৃতদেহগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে। শত্রুরা প্রাণভয়ে পালাবার সময় কতকগুলি শস্ত্রশস্ত্র ফেলেই চলে গেছে। ফলে তাদের পরিত্যক্ত একটি ট্রাক, একটি জীব, ৪০টি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, ১৫০ বাস্ক মেশিনগানের, গুলি, কতকগুলি মর্টার শেল এবং কয়েক গ্যালন তেল মুক্তিবাহিনীর হাতে এসে গেল।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে এভাবে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসে পাক-সৈন্যদের পরিচালকরা নতুনভাবে চিন্তা করতে লাগল। তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। প্রতিপক্ষ তাদের চোখের আড়ালে। আক্রমণের প্রবলতা দেখে তারা মনে করেছিল এক বিরাট সৈন্যদল তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু কার্যত মুক্তিযোদ্ধাদের মোট সংখ্যা ১০০ জনও হবে না।

বেতার সংবাদ গিয়ে পৌঁছল ঢাকায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি বামার বিমান এসে বনের মধ্যে আত্মগোপনকারী মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বোমা ফেলতে লাগল। বোমারু আক্রমণের গর্জনে আর বিস্ফোরণের শব্দে রণক্ষেত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাতেও ভয় পেল না মুক্তিযোদ্ধারা। ভয় পেল না সেই সমস্ত সহায়তাকারী সাধারণ মানুষেরা যারা পিছনে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ যুগিয়ে চলেছিল। শত্রুশক্তিও অনেক চেষ্টা করেও প্রতিরোধ ব্যুহে ভাঙন ধরাতে পারল না। মুক্তিযোদ্ধারা জীবন পণ করে সঙ্কল্প নিয়েছিল যে তারা কিছুতেই ওদের পথ ছেড়ে দেবে না। তাদের এই সঙ্কল্প শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। তারা পথ ছেড়ে দেয়নি। পাক-সৈন্যরা বেগতিক দেখে এ পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ধরতে বাধ্য হয়েছিল।

এই মধুপুর গড়ের যুদ্ধের শেষ পরিণতি ঘটল।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ সিলেট

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬। সিলেট অঞ্চলে সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ	বাংলা একাডেমি দলিলপত্র	 ১৯৭১

সিলেটের প্রতিরোধ যুদ্ধ

সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত *

২৪-৩-৭৩

২৫শে মার্চ বড় বড় শহরে পাকিস্তানীরা যে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিল সে খবর আমরা জানতে পারলাম ২৬শে মার্চ। সঙ্গে সঙ্গে হবিগঞ্জের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিরোধ দুর্গ তৈরি করতে আরম্ভ করল। প্রতিটি হবিগঞ্জবাসী যেন তখন এক-একটা বহিঃশিখা।

২৭শে মার্চ ১৯৭১ সন আমার বাড়ীতে বসে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কয়েকজন মিলে নানা আলাপ আলোচনা চলছে। তখন কয়েকজন ছাত্র এসে আমাকে বলল, “দাদা, পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।” আমি বললাম, “আমিও তা চাই।” অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রদের মতানুযায়ী চলা ঠিক নয়। তাই আমি ওদেরকে বললাম কর্নেল রব (এমসিএ)- এর কথা, যিনি বর্তমানে জেনারেল রব। কিছুদিন আগে তিনি ঢাকাতে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে যোগদান করে এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জানা যাবে, এই ভেবে বললাম, কর্নেল রব যদি আমাকে বলেন তাহলে আমি এই মুহূর্তে প্রস্তুত।

২৭শে মার্চ শনিবার ১৯৭১ সন। বেলা প্রায় দু’টায় জেনারেল রব তার বাড়ীতে আমাকে যাবার জন্য খবর পাঠালেন। গিয়ে দেখলাম কামরার ভেতরে বসে আছে আনসার মুজাহিদের কয়েকজন, সামরিক বাহিনীর কয়েকজন যারা ছুটি কাটাতে এসেছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র। বাড়ির বাইরের খোলা জায়গায় বিরাট ভীড়। আমাকে দেখেই সকলে “জয় বাংলা” “জয় বাংলা” বলে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। দেখলাম হাতিয়ার নিয়ে প্রায় ১৫০ জনের মত লোক যাবার জন্য তৈরী। কয়েকটি বাস ও ট্রাক একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে শুধু ধ্বনি হতে লাগল “জয় বাংলা”। আমি হাত উঠিয়ে সকলকে অভিবাদন করলাম।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই জেনারেল রব সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আজই পাঁচটায় যে লোকবল আছে তাদের নিয়ে সিলেটকে মুক্ত করবার জন্য যাত্রা করব। যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমাকে দেয়া হল। আমি হাসিমুখে আমার সম্মতি জানিয়ে সকলকে অভিবাদন জানালাম এবং যাত্রাপথে গাড়ীতে আমাকে উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলাম।

জেনারেল রবের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র চারিদিকে “জয় বাংলা” জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। হাতজোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, শক্তি দিও যেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পারি।

২৭শে মার্চ বেলা পাঁচটায় একটা জীপ ও পাঁচটা বাস ও ট্রাক আমার বাসার সামনে এসে দাঁড়াল। চারিদিকে শুধু “জয় বাংলা” ধ্বনি। লোকে লোকারণ্য। আমি আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বললাম, স্বাধীনতার ডাক এসেছে। আমাকে এখনি যেতে হবে। “জয় বাংলা” বলে সকালের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

*১৯৭১ সালের মার্চে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন।

হবিগঞ্জ শহরটি যেন আনন্দে মেতে উঠেছে।

আমি, মানিক চৌধুরী ও জেনারেল রব একই গাড়ীতে বসেছিলাম। সবাই আমাদের হাত নেড়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানাল। গাড়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে শায়েস্তাগঞ্জের দিকে। সেদিন আমাদের গন্তব্যস্থান ছিল রশীদপুর চা-বাগান। কারণ, খবর পেয়েছিলাম পাকিস্তানীরা শ্রীমঙ্গলের ওপারে আছে। ভেবেছিলাম ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রশীদপুর পৌঁছে যাব এবং পরদিনের কর্মসূচী তৈরী করতে পারব, কিন্তু পথে চলতে গিয়ে আমাদের অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হলো। কিছুক্ষণ পর পরই রাস্তার উপরে বড় বড় গাছ, পাথর ইত্যাদি রেখে ব্যারিকেড তৈরী করা ছিল। বালা বাহুল্য, জেনারেল রব ও মানিক চৌধুরীর আদেশক্রমেই ওগুলি তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে সম্পন্ন হবে তা কেউই ভাবেনি। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর মন আজ জেগে উঠেছে। যাহোক, আমি বললাম অন্য আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত রাস্তাঘাট খোলা রাখতে। কারণ আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

রশীদপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় রাত ১১টা বেজেছিল। আমি জেনারেল রবকে বললাম, আজ রাত এখানেই থাকব এবং আগামীকাল ভোরে যারা আমাদের সংগে এসেছে তাদেরকে এবং তারা সংগে কি কি অস্ত্র ও হাতিয়ার এনেছে তা দেখে পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহন করব। রশীদপুর চা-বাগানের ম্যানেজার মোস্তাফা সাহেবকে বললাম, “আজ রাতের জন্য ওদের শ্রমিকদের সাহায্য যেন চা-বাগানটি সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এবং পাকিস্তানীরা কোথায় ঘাঁটি বানিয়ে বসেছে এ খরবটি জানাবার জন্য দু-চারজন বিশ্বস্ত লোক পাঠানো হয়। এ খরবটি আমাকে কাল দুপুরের মধ্যেই দিতে হবে।”

আমাদের সবারই আহরের ব্যবস্থা রশীদপুরেই হয়েছিল। এখানে একটা কথা বলতে চাই যে সিলেটের শমশেরনগরে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী ছিল। সেটার কমান্ডার ছিল মেজর খালেদ মোশাররফ (বর্তমানে কর্নেল)। হবিগঞ্জ থেকে রওনা হয়ে যখন আমরা পাইকপাড়া আসলাম তখন জানতে পারলাম মেজর খালেদ মোশাররফ শমশেরনগর থেকে রওনা হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে যাচ্ছে। সিলেট ছেড়ে এভাবে যাবার উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছিল না। জেনারেল রবকে বললাম, আমাদের গিয়ে ওকে ধরতে হবে এবং সম্মিলিত চেষ্টায় সিলেট মুক্ত করতে হবে।

আমরা তাড়াতাড়ি যেতে অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু পথঘাটে বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে যখন মীরপুরের পুলে এসে পৌঁছিলাম তখন আমি মনে মনে চিন্তা করেছিলাম যে খালেদ মোশাররফ ও তার সৈন্যসামন্ত এবং আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে সিলেটকে মুক্ত করব এবং সিলেটে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে সেখানে আমাদের প্রধান হেডকোয়ার্টার তৈরী করব। সিলেট থেকে সারা বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে সুবিধা হতো। সেদিন যদি কর্নেল খালেদ মোশাররফ আমার কথা মেনে নিতেন তাহলে আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যরমকভাবে লেখা হতো।

জানতে পারলাম গত রাতেই মেজর খালেদ মোশাররফ তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে মীরপুর অতিক্রম করে চলে গেছে। মেজর খালেদ মোশাররফ ও সৈন্যসামন্তদের পেলে সিলেটকে মুক্ত করে তারপর আমরা কুমিল্লার পথে গেলে সুবিধা হত। যাইহোক ওকে যখন পেলাম না তখন আমার নিজেকেই করতে হবে।

রাতে ঘুম হল না। চিন্তা করতে লাগলাম এ সামান্য অর্ধশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে কিভাবে কি করব। পরদিন ভোরে বেলা প্রায় সাড়ে সাতটার সময় আমি আমার স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী ছেলেদের দেখতে গেলাম। কারণ আমাকে জানতে হবে এদের কতখানি যুদ্ধ করবার ক্ষমতা আছে এবং ওদের সঙ্গে হাতিয়ার -গোলাবারুদ কি কি আছে। আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈনিকরা যারা ছুটিতে ছিল সব মিলিয়ে মোট ১৫০ জন মাত্র ছিল। তাদের কাছে আছে কেবল ৩০৩ রাইফেল এবং দশ রাউণ্ড করে গুলি। এই সামান্য সৈন্য ও হাতিয়ার নিয়ে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিতান্তই বোকামি।

যাইহোক, আমি সিলেটকে মুক্ত করবার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তা আমাকে যে ভাবেই হোক পালন করতেই হবে। মনে বিশ্বাস ও স্বস্তি পেলাম যখন সবাই বলল, স্যার আমরা তৈরী। যা আছে তাই নিয়ে নরপিশাচদের বধ করব এবং সিলেটকে মুক্ত করব। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম এই সামান্য হাতিয়ার ও সৈন্য নিয়ে কিভাবে কি করে পাকিস্তানীদের শাস্তা করব। ঠিক করে ফেললাম জনগনের শক্তিরই হল বড় শক্তি এবং তার জন্য স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্য আমাকে নিতে হবে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে যা যা আছে এবং আমার কাছে যা সৈন্য আছে তাই নিয়ে আমাকে সিলেট মুক্ত করতে হবে। তাই স্থানীয় গ্রামবাসীদের ডেকে বললাম, তোমরা আমার সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে এবং “জয় বাংলা” ধ্বনি উঠিয়ে চারিদিকের আকাশবাতাস কাঁপিয়ে তুলবে। এই আওয়াজ শুনে শত্রুরা মনে করে যেন অনেক সৈন্য নিয়ে আমরা এদের বিরুদ্ধে লড়াই এসেছি। মানিক চৌধুরীকে আমি বললাম যেভাবে হোক অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের ব্যবস্থা করতেই হবে।

২৮/২৯শে মার্চ আমার সৈন্যদের সংঘবদ্ধ করলাম। দুই প্লাটুন সাতগাঁ পাহাড়ের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। শ্রীমঙ্গল থেকে হবিগঞ্জ ও চুনাকঘাটে যদি শত্রুর আসতে হয় তাহলে সাতগাঁ পাহাড়ের মধ্য দিয়েই আসতে হবে। করণ, রেললাইন ও বড় রাস্তা সাতগাঁ পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই গেছে।

শত্রুরা কোথায় আছে সঠিক খবর পাচ্ছিলাম না। ভাসা খবর এসে পৌঁছাচ্ছিল। শ্রীমঙ্গল থেকে লোকজন আসা প্রায় বন্ধ ছিল। সঠিক খবর পাবার জন্য কয়েকজনকে শ্রীমঙ্গলের আশেপাশে পাঠালাম।

এদিকে রশীদপুর আমাদের প্রথম ক্যাম্প বানালাম। রশীদপুরের আশেপাশে চ-বাগান ছিল, সব বাঙ্গালী ম্যানেজাররা খুব সাহায্য করেছেন। সৈন্যদের খাওয়া-দাওয়া, থাকার ব্যবস্থা এবং ট্রেনিংয়ের জায়গা সবই তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন। চ-বাগানের ম্যানেজার মোস্তফা, আজিজ এদের নাম করতেই হয়। মানিক চৌধুরী অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বন্দোবস্ত করতে লাগল। বাস, ট্রাক যা পাচ্ছে আমাদের সাহায্যের জন্য এক জায়গায় করছে। আমরা আছি এ খবর জেনে নানা জায়গা থেকে যাদের একটু সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল আমাদের সৈন্য দলে যোগ দিতে লাগল।

এদিকে খবর পেলাম আমরুল চ-বাগানের দিকে পাকিস্তানীরা আসছে চুনাকঘাটে যাবার জন্য। ম্যাপে দেখলাম রাস্তাও একটা আছে এবং লোকজনের কাছ থেকে জানলাম এ রাস্তা দিয়ে শুধু মানুষই চলতে পারে, গাড়ী চলতে পারে না। যা কিছু সৈন্য ছিল, প্রায় দুই প্লাটুনের মত, পাঠিয়ে দিলাম আমরুল চা-বাগানের দিকে। ওরা পৌঁছার পর খবর পাঠাল যে পাকিস্তানীরা এসেছিল, আবার শ্রীমঙ্গলের দিকে চলে গেছে। আমি ওদের ফিরে আসকে বললাম, কারণ আমার উদ্দেশ্য হল যত তাড়াতাড়ি সিলেট অভিমুখে যাওয়া।

৩০শে মার্চ খবর পেলাম পাকিস্তানীরা শ্রীমঙ্গলে এসে অত্যাচার আরম্ভ করেছে। ৩০/৩১শে মার্চ রাতে শ্রীমঙ্গলের প্রায় দুই মাইল দূরে প্রতিরোধ গড়ে তুললাম এই উদ্দেশ্যে যে ৩১শে মার্চ সকালে আমি শ্রীমঙ্গল আক্রমণ করব।

৩০শে মার্চ সকালে আমি আমার চার প্লাটুনকে নিয়ে চারিদিকে শ্রীমঙ্গলে আক্রমণ করলাম। ভোর আটটায় শ্রীমঙ্গলে পৌঁছলাম। খবর পেলাম পাকিস্তানীরা শ্রীমঙ্গলে ছেড়ে মৌলভী বাজারের দিকে চলে গেছে। সময় নষ্ট না করে মৌলভীবাজার দখল করা শ্রেয় বলে মনে করলাম। চারধারে সৈন্য ছড়িয়ে পড়েছিল। ওদেরকে আবার একত্রিত করে মৌলভীবাজারের দিকে রওনা হলাম। রাস্তায় লোকজনের চলাচল এক রকম বন্ধ বললেই চলে। সৈন্যদের নিয়ে যখন মৌলভীবাজারের দিকে যাচ্ছিলাম জানতে পারলাম নয়নপুর চা-বাগানে পাকিস্তানীরা আছে। পেছনে দুটো প্লাটুনকে বললাম সোজা মৌলভীবাজার রাস্তায় না এসে নয়নপুর চা-বাগান শত্রুমুক্ত করে মৌলভীবাজার আসতে। নয়নপুর চা-বাগানটা শ্রীমঙ্গল থেকে ৭/৮ মাইল দূরে। নয়নপুরের কাছে আসতেই গোলাগুলির আওয়াজ শুনলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম আমার সৈন্যরা নয়নপুরের দিকে এগুচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দুদিকের গোলাগুলির আওয়াজ শুনলাম। বেলা প্রায় আড়াইটা হবে। “জয় বাংলা” আওয়াজে পুরো নয়নপুর যেন

মুখরিত হয়ে উঠল। বুঝলাম নয়নপুর আমাদের দখলে এসেছে। সংযোগের অভাবে কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। বাকি সৈন্যদের বললাম মৌলভীবাজারের দিকে অগ্রসর হতে। বিকেল হয়ে গেছে। পৌঁছলাম মৌলভীবাজারে। মনে হচ্ছিল মৌলভীবাজারে যেন শূন্য হয়ে গেছে। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। সার্কিট হাউসে এসে উঠলাম। আমার সৈন্যরাও আসতে লাগল। জয় বাংলা ধ্বনিতে সারা শহরটা মুখরিত হয়ে উঠল। লোকজন মনোবল না পেয়ে আমাদের কাছে আসতে লাগল।

রশীদপুর থেকে ক্যাম্প উঠিয়ে মৌলভীবাজারে ক্যাম্প করলাম। কারণ ওখান থেকে আমার সিলেট আক্রমণ করা সুবিধা হবে। জেনারেল রবকে একথা বলতে তিনি আমার কথা মেনে নিলেন। মৌলভীবাজারের অবস্থানটি এমনি জায়গায় যেখান থেকে দুটো প্রধান সড়ক, সিলেট থেকে একটা কুলাউড়া হয়ে, অন্যটি শেরপুর শাহীদপুর হয়ে মৌলভীবাজারে আসা যায়। যদি শত্রুরা স্থলপথে কুমিল্লা অথবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেতে চায় তাহলে মৌলভীবাজারে ওদের আসতে হবে। একথা ভেবে মৌলভীবাজারকে প্রাধান ঘাঁটি করে রাখলাম। খবর নিতে আরম্ভ করলাম শত্রুরা কোথায় এবং খবর পেলাম কুলাউড়ার দিকে শত্রুরা নেই। স্থলপথ সিলেট থেকে মৌলভীবাজার রাস্তাটা অনেক দীর্ঘ। তাই শত্রুরা শেরপুর-শাদীপুরের রাস্তাই বেছে নেবে। শত্রুরা এ রাস্তা বেছে নোবার আর একটা কারণ আমার সৈন্যদের সিলেটে যেতে হলে দুটো বড় বড় নদী পার হতে হবে। এই চিন্তা করে আমার কাছে যা সৈন্য ছিল তা নিয়ে শেরপুর-শাদীপুরের রাস্তায় সিলেট যাবার জন্য মনস্থ করলাম।

মৌলভীবাজারকে শক্ত ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য জেনারেল রব এবং মানিক চৌধুরীকে বললাম যে আমার আরো অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যের প্রয়োজন। শেরপুর-শাদীপুরের রাস্তায় সিলেট যেতে হলে দুটো বড় বড় নদী আমাকে পার হতে হবে। যে সৈন্য আমার কাছে এখন আছে তা দিয়ে দুটো নদী পার হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে সিলেট পৌঁছানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। জেনারেল রব এবং মানিক চৌধুরীকে এ কথা বলতে তারা আমাকে আশ্বাস দিলেন যে কিছু দিনের মধ্যে সৈন্য- গোলাবারুদ এসে যাবে।

পাকিস্তানীদের যুদ্ধের হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম ওরা বড় রকমের কোন যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা সিলেটে একত্রিত হচ্ছে। তবে শেরপুর-শাদীপুরে দুটো নদীতে ওরা ভালভাবে বাধা দেবে সেটা বুঝতে পারলাম এবং সেজন্য তৈরি হতে লাগলাম।

আস্তে আস্তে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য বাড়তে লাগল। জেনারেল রব সীমান্তে গিয়ে বিডিআর-এর বাঙ্গালী ছেলেদের একত্রিত করে মৌলভীবাজারে পাঠাতে লাগলেন। মানিক চৌধুরী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগলেন। আমার সৈন্য তখন প্রায় ৪৫০ জনের মত হয়ে গেল।

মৌলভীবাজার ও শ্রীমঙ্গলের জনগন আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। গিয়াসুদ্দিন সাহেব, তোয়্যাবুর রহীম, আজিজ, ডক্টর আলী, আলতাফ, ইলিয়াস এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। সৈন্যদের দেখাশুনা, খাওয়া-দাওয়ার সবরকমের ব্যবস্থা যদি মৌলভীবাজার ও সিলেটের জনগন না করতো তাহলে সিলেটকে শত্রুমুক্ত করা সম্ভব হত না।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম প্রায় দুই প্লাটুন পাকিস্তানী সৈন্য শেরপুরে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং এক প্লাটুন-এর বেশী সৈন্য শাদীপুর রক্ষা করছে। সৈন্যদের সমাবেশ দেখে বুঝলাম এরা বড় রকমের যুদ্ধ করবে না। আরো খবর পেলাম, পাকিস্তানীদের কাছে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান, তিন ইঞ্চি মর্টার, দুই ইঞ্চি মর্টার ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে। লোকের আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। শেরপুর-শাহীদপুরের দুটো ফেরী ওদের কাছে আছে। কোন নৌকা এদিকে চলাচল করতে পারছে না। ওদের সঙ্গে একজন অফিসারও আছে জানতে পারলাম। যেভাবে হোক সিলেট আমাকে জয় করতেই হবে।

৪ঠা এপ্রিল রাত আটটায় শেরপুরের কাছাকাছি প্রতিরক্ষারবৃহৎ তৈরী করলাম। পরদিন আক্রমণ করব স্থির করলাম।

শেরপুরের প্রায় দেড় মাইল ডানে ও দেড় মাইল বাঁয়ে দুটো করে প্লাটুন পাঠান স্থির করলাম। গ্রামবাসীদের বললাম যেন নৌকাগুলো ঠিক থাকে। রাতের অন্ধকারে সৈন্যরা চলল তাদের গন্তব্যস্থানে। বাকি সৈন্য নিয়ে মুখোমুখি আক্রমণ চালাব এই স্থির করলাম। রাত প্রায় দশটায় আমরা কিভাবে শেরপুর-শাদীপুর আক্রমণ চালাব তা সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম-ডানে ও বাঁয়ের সৈন্যরা নদী পার হয়ে শত্রুদের ঘিরে ফেলবে এবং বাকি সৈন্যরা সম্মুখযুদ্ধে শত্রুদের ব্যস্ত রাখবে।

সকাল পাঁচটায় শেরপুরের সামনে আসতেই শত্রুরা গোলাগুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। পাল্টা জবাব আমরাও দিতে লাগলাম।

৫ই এপ্রিল। যতই বেলা বাড়তে লাগল গোলাগুলির আওয়াজ ততই বাড়তে লাগল। শত্রুরা তিন ইঞ্চি ও দুই ইঞ্চি মর্টার ও মেশিনগানের সাহায্যে আমাদের সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। আমাদের দিকে দু-একটা বাড়ীতে আগুন ধরে গেল। গ্রামবাসীরা পালাতে আরম্ভ করল। সৈন্যদের বলেছিলাম, শত্রুরা যেন কিছুতেই নদী পার হয়ে এদিকে আসতে না পারে। বেলা প্রায় বারোটায় সময় ওপারে দু'দিক থেকেই “জয় বাংলা” ধ্বনি শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম আমার সৈন্যরা শত্রুর কাছাকাছি চলে এসেছে। মাঝে মাঝে “ইয়া আলী” আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল। তাতে বোঝা যাচ্ছিল হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এই আওয়াজ আসার সঙ্গে সঙ্গে এপার থেকে গোলাগুলি ছোড়া বন্ধ করে দেয়া হল। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম আমার সৈন্যরা পৌঁছে গেছে এবং আমাদের হাতের ইশারায় ডাকছে। “জয় বাংলা” ধ্বনিতে পুরো শেরপুর গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠল।

ফেরীটা ভালই ছিল, তাড়াহুড়ার মধ্যে নৌকা এবং ফেরীগুলো নষ্ট করার সময় এবং সুযোগ শত্রুরা পায়নি। আমরা সবাই ওখানে গেলাম, সমস্ত সৈন্যকে আবার সংঘবদ্ধ করলাম এবং বললাম শেরপুর যেভাবে আমাদের দখলে এসেছে ঠিক সেভাবে শাদীপুরও দখল করতে হবে।

শত্রুদের গোলাগুলি আমাদের উপর আসতে শুরু হল। সময় নষ্ট না করে শাদীপুর দখলের জন্য হুকুম দিলাম। কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। এদিকে পাকিস্তানীদের ১২টি মৃতদেহ এদিক-ওদিক থেকে পাওয়া গিয়েছিল এবং এদের সেখানই কবর দেয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের তিনজন দেশের জন্য প্রাণ দিল। মৃতদেহগুলো মৌলভীবাজারে পাঠিয়ে দেয়া হল।

এদিকে খবর পেলাম তিন চারটা ট্রাক শাদীপুরে এসেছে। এটার দুটো কারণ থাকতে পারে। এটার দুটো কারণ আরো পাকিস্তানী সৈন্য সিলেট থেকে এসেছে। দ্বিতীয় কারণ সিলেটে পালাবার বন্দোবস্ত করছে। যা টুকরো টুকরো খবর আসছিল তাতে সিলেটে পালাবার বন্দোবস্ত করছে বলেই মনে হচ্ছিল। যাহোক, মানিক চৌধুরীকে তখনই খবর পাঠালাম মনুর দিক দিয়ে একটি কোম্পানীকে মৌলভীবাজার থেকে ট্রাকে করে শাদীপুরে পাঠিয়ে দিতে। যদি সিলেট থেকে শত্রুদের আরো সৈন্য এসে থাকে তাহলে আমার সৈন্যরা ঠিকমত যাতে মোকাবিলা করতে পারে এই ভেবে আমি মানিক চৌধুরীকে খবরটা পাঠালাম। এতে আমার দুটো লাভ হয়- আমার সৈন্যসংখ্যা বাড়বে, দ্বিতীয়তঃ যদি শত্রুরা সিলেট থেকে সৈন্য পাঠায় তবে আমারও সৈন্যসংখ্যা এত বেশী হবে যাতে বরাবর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারব।

বেলা বাড়তে লাগল। শত্রুদের গোলাগুলির আওয়াজও বাড়তে লাগলো। অন্ধকার হয়ে আসল। দু'পক্ষে গোলাগুলি চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর শুনলাম “জয় বাংলা” বাংলা ধ্বনি। বুঝলাম আমার সৈন্যরা শত্রুর কাছে এসে গেছে। গাড়ীর আওয়াজ পেলাম। এত জয়ধ্বনি হচ্ছিল যে কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না কি হচ্ছে। গোলাগুলির আওয়াজ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবারও শত্রুরা ফেরী এবং নৌকাগুলো নষ্ট করার সময় পায়নি।

নৌকা করে লোক যাওয়া-আসা করতে আরম্ভ করল। শাদীপুর দখলে আসল। আনন্দে মনটা ভরে উঠল। খবরটা পাঠালাম মৌলভীবাজারে।

শত্রুদের পিছু ধাওয়া করা সমীচীন মনে করলাম না, কারণ ওরা ট্রাকে করে পালিয়েছে। পায়ে হেঁটে তাদেরকে ধরা সম্ভব নয়। তাই আমার সৈন্যদেরকে সংঘবদ্ধ করতে আরম্ভ করলাম। যে যেখানে আছে ওখানেই প্রতিরোধ গড়ে রাতের জন্য বিশ্রাম করতে হুকুম দিলাম। সুবেদার ফজলুল হককে ওর কোম্পানী নিয়ে শাদীপুরের প্রায় দুই মাইল আগে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বললাম। শত্রুরা কোথায় আছে খবর দিতে আরম্ভ করলাম।

এদিকে মৌলভীবাজারে মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে দেখা হয়। আমি তাকে বললাম যদি পারে একটা কোম্পানী পাঠিয়ে দিতে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী আমার কাছে পৌঁছল-সিলেটের মেজর আজিজ। তাকে আমি পাঠিয়ে দিলাম কুলাউড়া-শেওলা-সাঁতারকান্দী-গোলাপগঞ্জ হয়ে সিলেটের সুরমা নদীর দক্ষিণ পারে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। এদিকে আমি শাদীপুর-সিলেটের রাস্তা শত্রুশূন্য করে তার সঙ্গে সুরমা নদীর পারে মিলিত হব।

ক্যাপ্টেন আজিজের সৈন্য রাস্তায় বিনা বাধায় গোলাপগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছল। কিন্তু কদমতলীর (সিলেট থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে) কাছে যখন আসল তখন শত্রুরা তার উপর গোলাগুলি ছুঁড়তে শুরু করল। যাই হোক, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করাতে শত্রুরা কদমতলী ছেড়ে সিলেটের দিকে পালিয়ে গেল।

এদিকে খবর পেলাম বিশ্বনাথ এলাকায় রাস্তার দুপাশে শত্রুরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বিশ্বনাথ দখল করার প্রস্তুতি নিলাম। টুকরো টুকরো খবরে জানতে পারলাম বিশ্বনাথে শত্রুরা মাইন লাগিয়েছে এবং দু-একটা গরুও নাকি মারা গিয়েছে। এ খবরটা আমি আমার সৈন্যদের জানালাম না। যাই হোক সমস্ত শক্তি দিয়ে বিশ্বনাথের উপর আক্রমণ করলাম। এই যুদ্ধেও শত্রুরা সমস্ত শক্তি ব্যবহার করেছিল। তবে তাদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে আমাদের আক্রমণে ওরা টিকতে পারল না এবং বিশ্বনাথ ছেড়ে পালিয়ে একেবারে সিলেটে চলে গেল।

এদিকে ক্যাপ্টেন আজিজের সৈন্য শত্রুসৈন্যকে কদমতলী থেকে তাড়িয়ে সুরমা নদীর দক্ষিণ পারে প্রতিরক্ষাবৃহৎ তৈরী করল।

৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সন। সমস্ত সিলেট জেলা আমাদের দখলে আসল।

শত্রুরা এক জায়গায় একত্রিত হল। সিলেট বিমানবন্দর এবং লাক্ষাতুরা চা-বাগানের আশেপাশে একত্রিত হয়। বুঝলাম এখন আমার কাছে যা সৈন্য আছে তা দিয়ে শত্রুদের উপর হামলা করা ঠিক হবে না, তাই জেনারেল রব ও মানিক চৌধুরীর কাছে আরো সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র চাইলাম।

৮ই এপ্রিল সকালে বসে আমি ও ক্যাপ্টেন আজিজ জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম কি করে সিলেটকে মুক্ত করা যায়। এমন সময় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একজন লেঃ কর্নেল লিমাইয়া আসলেন এবং আমাকে বললেন শিলচরে যেতে। আমি বললাম, এক শর্তে আমি যাব যদি তিনি আমাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। তিনি বললেন, তাই হবে। আমি তখনই তাঁর সঙ্গে শিলচর রওনা হয়ে গেলাম। রাত বারটা পর্যন্ত কি কর্মপন্থা আমরা অবলম্বন করব তা ঠিকঠাক করা হল, কিন্তু সেটা কার্যকরী হবার আগেই পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের উপর আক্রমণ করল। ভারতীয় সৈন্য আসার সৌভাগ্য হয়নি।

৯ই এপ্রিল পর্যন্ত পুরো সিলেট আমাদের দখলে রইল। আমার পরিকল্পনা ছিল বিমানবন্দর এবং লাক্ষাতুরা চা-বাগান দখল করা। রাত প্রায় এগারটার সময় এক কোম্পানীকে পাঠিয়ে দিলাম খান চা-বাগানের দিকে। আর একটা কোম্পানীকে পাঠানো হল আখালিয়ার দিকে। আর দুই কোম্পানীকে নিয়ে লাক্ষাতুরা চা-বাগান দিয়ে শালুটিকর বিমানবন্দর দখলের জন্য রওনা হল। ক্যাপ্টেন আজিজের উপর ভার দেয়া হল সুরমা নদীর দক্ষিণ পার অবরোধ করে রাখার।

১০ই এপ্রিল আমাদের উপর শত্রুরা প্রচণ্ড হামলা করল। শত্রুরা ইতিমধ্যে অনেক সৈন্য যোগাড় করেছিল। পুরোদিন যুদ্ধ চলল। আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তানীদের আক্রমণের মুখে টিকতে পারল না। শত্রুরা সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করল। আন্তে আন্তে আমার সৈন্যরা পিছু হটতে আরম্ভ করল এবং নদীর দক্ষিণ পাড়ে আসল। খাদিমনগরের কোম্পানী আসতে পারলে না। ওরা তামাবিলের (শিলং) দিকে চলে গেল। ওদেরকে আগেই বলা ছিল যদি আক্রমণ কৃতকার্য না হয় তাহলে ওরা যেন ক্যাপ্টেন মুতালিবের সঙ্গে (সে তামাবিলের দিকে যুদ্ধ করছিল) মিলে যায়।

এসব যখন হচ্ছিল তখন আমি শিলচর থেকে অয়ারলেস যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছিলাম। তখন এক দুর্ঘটনায় আমার গাড়ী উল্টে গিয়েছিল। সেদিন খুব সম্ভব ছিল ৮ই এপ্রিল। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি গাড়ী চালাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে একজন সিগন্যালম্যান ছিল। যখন কুলাউড়ার কাছে আসি তখন দুটো লোক আমার দিকে লক্ষ্য করে অস্ত্র ধরে এবং গুলি করার চেষ্টা করে। আমি তখন গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু রাস্তা খুব পিচ্ছিল ছিল এবং গাড়ীতে স্পীডও বেশী ছিল। একটা আওয়াজ কানে আসায় পেছন দিকে তাকাতেই গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। গাড়ী উল্টে গেল। আমার পায়ে-বুকে খুব আঘাত লেগেছিল। পরে জানা গিয়েছিল দুর্বৃত্তরা মুসলিম লীগের লোক ছিল।

যাই হোক, খোঁড়া পা নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে আরম্ভ করলাম। তখনই একদিন জেনারেল ওসমানী এবং ব্রিগেডিয়ার পান্ডের সঙ্গে আমার মৌলভীবাজারে দেখা হয়। আমার এ অবস্থা দেখে লেঃ কর্নেল জামানকে সিলেট সেক্টরের ভার দেয়া হয় এবং আমাকে কিছু দিনের জন্য শেওলা-সুতারকান্দী-সিলেট এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীকালে যখন সবাই ভারতে চলে গেলাম তখন আবার সিলেট সেক্টরের পুরো দায়িত্ব আমাকে দেয়া হল। কর্নেল জামানকে উত্তর বঙ্গের একটা সেক্টরের কমান্ডার করে পাঠিয়ে দেয়া হল।

যাই হোক নদীর দক্ষিণ পাড়ে ভীষণ যুদ্ধ হল। দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ক্যাপ্টেন আজিজের নেতৃত্বে আশ্রয় যুদ্ধ করে যেতে লাগল। এদের উপর বিমান হামলা পর্যন্ত হয়েছিল। শত্রুদের এই আক্রমণের মুখে টিকতে পারল না। সৈন্যরা, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন আজিজ পায়ে গুলি লেগে আহত হল। এবং আন্তে আন্তে ওরা মৌলভীবাজারের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হল। বাকি সৈন্যরা গোলাপগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণের দিকে পিছু হটতে লাগল।

ইয়াকিনগঞ্জ-গোলাপগঞ্জে যা সৈন্য ছিল আমি প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করলাম। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ইয়াকিনগঞ্জের যুদ্ধে সিলেটের বাঙ্গালী এস-পি, যিনি পাকিস্তানীদের হয়ে কাজ করতেন, আমাদের হাতে ধরা পড়েন। পাকিস্তানীদের বাঙ্গালীদের প্রতি দরদটা এই দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝা যাবে। পাকিস্তানীরা জানত না আমরা কত সৈন্য নিয়ে ইয়াকিনগঞ্জে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। আমাদের স্ট্যান্ডিং পেট্রল ইয়াকিনগঞ্জের প্রায় মাইলখানেক আগে ছিল। পাকিস্তানীরা সিলেটের বাঙ্গালী এসপি সাহেবকে গোলাপগঞ্জে একটা অজুহাতে পাঠিয়েছিলেন। ইয়াকিনগঞ্জ-সিলেট সড়কে লোক চলাচল একেবারে বন্ধ ছিল। শত্রুরা জানত যে সিলেট থেকে যদি কেউ গোলাপগঞ্জের দিকে যায় তাহলে তার রক্ষা নেই। ফায়ার খুললে একটি বাঙ্গালী মরলে ওদের কিছু যায় আসে না। ওদের যা জানার দরকার তা জানতে পারলেই হল। এসপি সাহেব স্ট্যান্ডিং পেট্রল পার হয়ে যখন মূল ডিফেন্সের মধ্যে আসল আমাদের ফায়ার খোলা হল চারিদিক থেকে। তার জীপ দাঁড়িয়ে গেল। দেখালেন রুমাল। ফায়ার বন্ধ করে আমরা কয়েকজন গোলাম, ভাবলাম বড় শিকার পাব। কিন্তু আশ্চর্য! বাঙ্গালী এসপি, কি করব, গুলি করে মারতে মনটা চাইল না। নিয়ে আসলাম ধরে। কত কাকুতি-মিনতি করে বললাম, মশাই, পাকিস্তানীদের পা চাটছেন। ধরা পড়েছেন। তবে প্রাণে মারব না, কারণে আপনি বাঙ্গালী। হুকুম দিলাম ওকে আমার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে। ওকে জেনারেল ওসমানী সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠিয়ে দিই। ওর গাড়ীটা অবশ্য আমাদের লেগেছিল। আশ্চর্য, পরের দিনই রাতে শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ করল।

প্রচন্ড আক্রমণের মুখে টিকেতে না পেরে পিছু হটকে বাধ্য হলাম। এমনকিভাবে গোলাপগঞ্জ-শেওলা-সুতারকান্দী যুদ্ধ করতে করতে এপ্রিলের শেষের দিকে ভারতের করিমগঞ্জ এলাকায় এসে ট্রেনিং ক্যাম্প খুললাম। এদিকে দ্বিতীয় বেঙ্গল ও বাকি সৈন্যরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে আস্তে আস্তে মৌলভীবাজার-শ্রীমঙ্গল হয়ে ভারতের সীমান্তে জমা হতে লাগল।

সিলেটে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ডায়েরী

লেঃ কর্নেল আবদুর রব*

WAR DIARY OF SECTOR 4 BDF

Date	Time	Place	Remarks
1	2	3	4
02 Apr 71		Sheola ghat	C/9 pl of 3 wing EPR which was deployed in area Baragram/Gazukati BOP having direction from Teliapara HQ come at sheola Ghat.
05 Apr 71		-do-	Capt Aziz of EBR arrived and took over comd of C/9 pl.
05 Apr 71	2100 hrs	-do-	pl moved at Ranaping and joined EBR coy under comd of Capt Aziz. Tps adv towards Sylhet. Mr. Taymur, MPA met tps in area before between Golapgonj and Ranaping. He took over driving of veh of C/9 pl and met an accident on the way which caused minor injuries to 3 pers. Immediately after the accident Mr. Taymur left the place. EBR coy proceeded Ranaping and EPR stayed at the place of accident for the night.
06 Apr 71	0930 hrs	Ranakheli	EPR pl moved in a base sent by Capt Aziz and joined EBR Coy at Ranakheli. Tps sheltered there till next evening.
07 Apr 71		-do-	EBR Coy moved to Daka Dhakin and EPR PI took def posn in area Fullbari/Bhaitiker.
08 Apr 71		-do-	In the night EBR Coy advanced towards Sylhet.
09 Apr 71		Fulbari	N/Sub Motiur Rahman of C/8 pl of 3 Wing EPR took over C/9 PI at Fulbari as per order received from Teliapara.
10 Apr 71		Kadamtali	C/9 PI moved to Kadamtali bus-stand and on reaching there at about 1200 hrs took def

* ১৯৭১-এর মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন

			posn. At 1300 hrs enemy aircraft (ac) raided EBR Coy posn in Kin bridge area and EPR PI in Kadamtali. En inf tps also started firing with small arms/3 inch mortar/6 pdr. Exchange of fire continued for about 21hrs. En tried to cross Kin Bridge but could not do so and suffered heavy casualties.
11 Apr 71	1000 hrs	-do-	EPR PI when digging in area Kadamtali its str was 14 only. At about 1000 hrs en started interm ttant fire on EPR PI. After few minutes en was seen to adv through area KIN Bridge/Bhartakhola, where EBR Coy was deployed. This led the EPR PI to know that EBR Coy has withdrawn. En adv was obstructed by EPR PI till it was again fired upon with small arms/3 inch mortar 6 pdr, supported by air raid. EPR PI withdrew from def posn and reached Fulbari in a civil bus in the evening and halted there for the night.
12 Apr 71	0700 hrs	Sheolaghat	Moved to Sheolaghat and took def posn.
-do-	-do-	-do-	Maj C R Dutta arrived and took over Comd. 11 Mjd/Ansr joined at Sheolaghat, advanced and took def in area Ranaping when PI str was twenty five only. Again more 29 Mjd/Ansar joined the PI. Brig Panday and others arrived and carried out reccee in area Golapgonj and Fulbari/Bhaitiker. BSF unit under Brig panday arrived and dug def in the same area. EPR PI laid musk posn in Hatimgonj area and fired on a jeep which was advancing towards Hatimgonj carrying 3/4 uniformed persons. The jeep stopped and the uniformed pers including SP, sylhet, surrendered pers raising their hands. They were arrested and brought to def area.
20 Apr 71		Sheolghat	A party of 1/10 was sent to destroy the sheolaghat ferry. They Destroyed the ferry at night of 20 Apr 71 and killed 8 en by 2" Mor/LMG fire. N/Sub Motiur Rahman was left to destroy the ferry of, Kharglighat Baraigram in the night with a civilian by boat. Ferry of above ghats was destroyed by axe.
21 Apr 71		Sutarkandi	Capt A Rab joined.

সিলেটে সশস্ত্র প্রতিরোধ
সাক্ষাৎকারঃ ল্যান্সনায়ক সোনা মিয়া
৬-১১-১৯৭৪

২৫শে মার্চ আমি সিলেটের ১২নং শাখা খাদিমনগরে ছিলাম। আমি ইনটেলিজেন্স ইনচার্জ ছিলাম। ১৮ই মার্চ আমাদের উইং ব্যারাকের ভিতর পাকিস্তানীরা বাংকার করে। এই নিয়ে পাকিস্তানীদের সাথে আমার বচসা হয় এবং আমার বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করা হয়। ২২শে মার্চ আমাদের সম্পূর্ণ হাতিয়ার জমা নিয়ে নেয়। উইং কমান্ডার ছিল মেজর শওকত খান। সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিল দু'জন পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন। হবিগঞ্জে একজন কোম্পানী কমান্ডার ছিল সুবেদার বি, আর, চৌধুরী। তামাবিলে একজন কমান্ডার ছিল সুবেদার মজিবুর রহমান। সুনামগঞ্জে কমান্ডার ছিল সুবেদার নজিবুর রহমান এবং উইং হেডকোয়ার্টারে একটি করে কোম্পানী ছিল কমান্ডার ছিল একজন পাঞ্জাবী সুবেদার। হেডকোয়ার্টারে একটি সাপোর্ট প্লাটুনও ছিল। কমান্ডার ছিল আবুল ফজল মিয়া।

২২শে মার্চ তারিখে সকল অবাস্তালী ইপিআরকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়। আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নিলেও অবাস্তালীদের চাইনীজ অস্ত্র ইস্যু করে পাকিস্তানীরা গোপন বৈঠক করতো। এই অবস্থা দেখে আমরা ডাইরি ফার্মে গোপন আলোচনা করি। উপস্থিত ছিল উইং হাবিলদার মেজর ওয়াহিদুল ইসলাম, নায়ক হাফিজুল্লাহ চৌধুরী এবং আমি। আমরা সিলেট ডিসি এবং এসপি'র সাথে যোগাযোগ করি। ৩নং শাখার সাথেও যোগাযোগ করি। সমস্ত বিষয় অবগত করাই। সেক্টরে গিয়ে ক্যাপ্টেন আলাউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করি।

৩০শে মার্চ সকাল অনুমান ৬টার সময় ১১পাঞ্জাবী আমাদের উইং ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে। আমরা উইং থেকে পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিলাম। আক্রমণে হাবিলদার শরাফত ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। কোয়ার্টার গার্ড হাবিলদার মজিবুর রহমান শহীদ হন।

গায়াইন ঘাটে আমাদের ৬০/৭০ জন ইপিআর আশ্রয় নেয়। কিছু জনতা এবং কিছু মুজাহিদ আমাদের সাথে আসে। হাবিলদার মেজর ওয়াহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন, একটি নায়ক হাফিজুল্লাহ এবং আরেকটি প্লাটুনের নেতৃত্ব আমার ছিল। সার্বিক দায়িত্ব ছিল ওয়াহিদুল ইসলামের উপর। এই ৩ প্লাটুন নিয়ে আমরা সবাই জাফলং টি গার্ডেনের ম্যানেজার কায়েস চৌধুরীর কাছে যাই। কায়েস চৌধুরীর কাছে ৩১শে মার্চ পৌঁছাই। ওখানে গিয়ে বিএসএফ ক্যাপ্টেন রাওয়ের সাথে যোগাযোগ করা হয়। তারা আমাদেরকে কিছু অস্ত্র সাহায্য করে। আমরা সিলেটের পথে অগ্রসর হই। পথে সুবেদার মজিবুর রহমান তাঁর কোম্পানী নিয়ে আমাদের সাথে মিলিত হয়। সুবেদার মজিবুর রহমান গোয়াইন ঘাটে থকলেন আহর, বস্ত্র ইত্যাদির জন্য। আমরা ১৭৫ জনের মত ইপিআর ছিলাম এবং কিছু কিছু আনসার, মুজাহিদ ও ছাত্র ছিল।

আমরা খাদিমনগরে পৌঁছলাম ২রা এপ্রিল। ৩রা এপ্রিল আমরা সিলেটের দিকে অগ্রসর হই। সিলেট বেতার কেন্দ্রের কাছে পাক বাহিনী আমাদের উপর গুলি ছোড়ে। আমরা ওখানে ডিফেন্স নিই। পাক বাহিনীর সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। আমরা সিলেট শহর দখল করে নিই। কর্নেল চিত্তরঞ্জন দত্ত জকিগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের কাছে ডিফেন্স নিলেন। আমরা শহরের ভিতর, কর্নেল দত্ত শহরের বাইরে অবস্থান করছিলেন। সুবেদার বি, আর চৌধুরী ইপিআর, বাহিনী নিয়ে কর্নেল দত্তের সঙ্গে থাকেন। সুবেদার নজিবুর রহমান ইপিআর ফোর্স নিয়ে সুনামগঞ্জ থেকে সুবোধ বাজারে ডিফেন্স নেন।

এপ্রিলের ৮/৯তারিখে পাক বাহিনী আমাদের উপর কাউন্টার এটাক চালায়। কর্নেল দত্ত এবং সুবেদার নজিবুর রহমান তার কোম্পানী নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেননি। পাকসেনা স্থল ও বিমান হামলা করে। আমরা টিকতে ব্যর্থ হই ! পিছু হটে খাদিমনগর চলে যাই। ৯ তারিখেই রাতে সুবেদার বি, আর, চৌধুরী তাঁর কোম্পানী নিয়ে আমাদের সাথে মিলিত হন। সুবেদার নজিবুর রহমান সুবোধ বাজার থেকে টুকুর বাজারে ডিফেন্স স্থানান্তর করে। এখবর আমরা পেলাম ১১ই এপ্রিল

খাদিমনগরে পাক বাহিনী বিমান এবং স্থল আক্রমণ করে। পাক বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে আমরা টিকতে ব্যর্থ হই। সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। চিকনাগুলে আমরা আবার ডিফেন্স নিলাম। এখানে আবার বিএসএফ ক্যাপ্টেনের সাথে যোগাযোগ করি। বিএসএফ ক্যাপ্টেন রাও-এর অনুরোধে ৫২৫ জনের মত বিএসএফ সাহায্যে এগিয়ে আসে। তামাবিল সিএন্ড-বি রোডের (যেটি সিলেট থেকে শিলং গেছে) ডান দিকে ইপিআর, বাম দিকে বিএসএফ পজিশন নেয় এপ্রিলের ২০ তারিখে।

২৪ তারিখে বিএসএফ বাহিনী ডিফেন্স ছেড়ে ভারত চলে যায়। আমরা তা জানতে পারি না। ২৫ তারিখে ভোরে পাক বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে আমরা টিকতে ব্যর্থ হই। ২৫/৩০ জনের মত শহীদ হন বাংকারে। আমরা পিছু হটি। পালাবার পথে ট্রাকে রিক্সায় পলায়নরত ৭৫ জন ইপিআর এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার শহীদ হন।

আমরা বাকী সব মিলে ১২৫ জনের মত জৈন্তিয়াতে আশ্রয় নিই। ২৫শে এপ্রিল পাক বাহিনী এখানে পৌঁছায়। আমরা পিছু হটি এবং ভারতীয় সীমান্ত তামাবিলে আশ্রয় নিই। পাকসেনা সীমান্ত তামাবিলে পৌঁছায়। আমরা ভারতীয় বিএসএফ ক্যাম্প লাতাং-এ আশ্রয় নিই। আমাদের যাবতীয় অস্ত্র জমা দিই। এরপরই আমরা বিএসএফ-এর আওতায় যাই। তারা আহার ও আশ্রয় দেয় এবং আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ করি। কিছু দিন পর বিএসএফ-এর উর্ধ্বতন অফিসারের সাথে কথা বলি এবং আমরা অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত তামাবিল এবং মুক্তাপুরে ডিফেন্স করি। তামাবিলের দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন মুতালিব (অবসরপ্রাপ্ত) এবং সুবেদার বি, আর, চৌধুরী। সার্বিক দায়িত্ব ক্যাপ্টেন মুতালিবের উপর থাকে। দল পুনর্গঠন করে যুদ্ধ শুরু করি।

সশস্ত্র প্রতিরোধে সিলেট

সাক্ষাৎকারঃ সিপাই শফিক আহমেদ

৮-১১-১৯৭৪

আমি ২৫শে মার্চের পূর্ব থেকেই সেক্টর হেডকোয়ার্টার সিলেটে ছিলাম। সিলেটের অধীন তখন ৩টি উইং ছিল-১নং, ৩নং এবং ১২নং উইং। ১নং উইং কুমিল্লার কোটবাড়ীতে ছিল। ৩নং উইং এবং ১২নং উইং ছিল সিলেট শহরে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন লেঃ কঃ সেকান্দার খান (অবাস্তালী), সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মেজর করিম (অবাস্তালী), এ্যাডজুটেন্ট ছিল ক্যাপ্টেন নসির নাজির (পাঞ্জাবী)। কোয়ার্টার মাস্টার ছিল একমাত্র বাঙ্গালী অফিসার-ক্যাপ্টেন আলাউদ্দিন। মেজর এম, এ, কুদ্দুস সেই সময় এ, এম, সি ছিলেন। সিগনাল অফিসার ছিল আহসান কাদির ফয়েজ। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় বিমান হাইজ্যাকের পর থেকেই সিলেটের খাদিমনগরে একটি রেজিমেন্ট থাকতো। এখানে ৩১ পাঞ্জাব এবং এফ-এর একটি কোম্পানী থাকতো।

সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ইপিআর প্রায় ছিল না। সিগনালের একটি এবং সহকারী (কেরানী) সহ আমরা ৫০/৬০ জন ছিলাম। ১৯/২০ মার্চ থেকে ৩১ পাঞ্জাব-এর ১টি প্লাটুন ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে থাকা শুরু করে। ১২নং শাখার ১টি প্লাটুন ২৪শে মার্চ তারিখে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আসে। সেখানে মাত্র ৪/৫ জন বাঙ্গালা ছিল, বাকী সবাই ছিল অবাস্তালী।

২৬শে মার্চ বিভিন্ন গ্রাম থেকে ঢাল, সড়কি, ব্লম নিয়ে হাজার হাজার জনতা সিলেট শহরে আসতে থাকে। পাক সেনারা তাদের উপর গুলি চালায়, বহু বেসামরিক নিরীহ লোক নিহত হয়। শহরে তখন কারফিউ চলছিল। ২৬ তারিখে যে সকল ইপিআর অফিসে অনুপস্থিত ছিল তাদেরকে কর্তৃপক্ষ ডেকে আনতে বললেন। ২৬শে মার্চ আমাদেরকে একটি করে লাঠি দেয় আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

২৮শে মার্চ কিছু বাঙ্গালী ইপিআর অফিসে আসে। আমরা ঐ দিন অফিসে আসিনি। পরে আমাদের গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয়। ২৮ তারিখেই আলমারীর এবং অন্যান্য চাবি নিয়ে নেয় হয় এবং বলা হয় 'তোমরা অফিসে এসো না, দরকার হলে আসতে বলবো'। ক্যাপ্টেন নসির নাজির এটা বলেন।

৩রা এপ্রিল ৩১ পাঞ্জাব ১২নং উইং আক্রমণ করে সকালে। এই খবর এখানকার ইপিআররা আগে থেকেই জানতে পেরে ঐ দিন অস্ত্রশস্ত্রসহ পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঐ দিন ঐ উইংয়ে পাঞ্জাবীদের আক্রমণে ৩জন ইপিআর গার্ড শহীদ হন। আখালিয়াতে সেক্টর হেডকোয়ার্টারের একটি ৬ পাউন্ডের প্লাটুন থাকতো ট্রেনিং-এর জন্য। ৩নং শাখার একটি কোম্পানী আখালিয়াতে থাকতো।

৪ঠা এপ্রিল ভোরের দিকে ৩১ পাঞ্জাব আখালিয়া আক্রমণ করে। ১২নং শাখার হেডকোয়ার্টার এভাবে পাকবাহিনীর হাতে চলে যায়। আখালিয়াও পাক সেনার হাতে চলে যায়। ৪ঠা এপ্রিল সিলেট সেক্টর থেকে অবাঙ্গালী ইপিআররা চলে যায়। পাক সেনারা ঐ তারিখের পর থেকে খাদিমপুরে থাকা শুরু করে।

উল্লেখ্য যে, ২৭শে মার্চ ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল (১২নং শাখার সহকারী উইং কমান্ডার) বাঙ্গালী মিশিয়ে একটি প্লাটুন শমসেরনগর বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যায়। এই প্লাটুনের অগ্রবর্তী দলটি ১০/১২ জন ডজ গাড়ীতে করে শমসেরনগর ডাকবাংলোতে আসে। এই দলের ড্রাইভার অগ্রণী হয়ে বলে, দ্বিতীয় দলে ক্যাপ্টেন সাহেব আসলে আমাদের বন্দী করতে পারে। অতএব, এখনই ক্যাপ্টেনকে খতম করে দিই। সাথে সাথে বাঙ্গালী ইপিআররা ডাকবাংলোর ছাদের উপর উঠে যায় এবং লাইট মেশিনগান নিয়ে পজিশন নেয়। সাথে সাথে দু'জন পাঞ্জাবী সিপাই পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল দ্বিতীয় গাড়ীতে আসে। ইপিআর দলটি উপর থেকে ফায়ার ওপেন করে। সাথে সাথে ক্যাপ্টেনসহ প্রায় সবাই নিহত হয়। ২/১ জন আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়।

৩নং শাখা কমান্ডার জাবেদ বরকত চৌধুরী ঐ তারিখে একটি ইপিআর-এর দল নিয়ে শমসেরনগর রওয়ানা হয়েছিল। পথে ক্যাপ্টেন গোলাম রসুলের মৃত্যুখবর শুনে ফিরে আসে। ৪ঠা এপ্রিলের পর থেকেই পাকসেনারা গাড়ী করে শহরে মাঝে মাঝে টহল দিতে থাকে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই সামরিক অফিসারের পরিবারদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। কেবল জেসিও-এনসিওদের পরিবার ছিল।

৭ই এপ্রিল সকল পাকসেনা সিলেট শহরের খাদিমপুর ছেড়ে সালুটিকর বিমান বন্দরে ঘাঁটি গাড়ে। ঐ রাতে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১১ জন পুলিশকে পাকসেনারা হত্যা করে। সিলেট শহরে কিছু আনসার, মুজাহিদ, ইপিআর প্রবেশ করে।

পাকসেনারা সালুটিকর বিমান বন্দর থেকে গাড়ী করে সিলেট শহরে পেট্রোলিং করতে আসতো। ৯ই এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিলের মধ্যে পাকসেনারা সিলেট শহরে প্রবেশ করে। মুক্তিবাহিনীর সাথে খন্ড যুদ্ধ হয়। পাকসেনারা শহর দখল করে নেয়।

সুরমা নদীর দক্ষিণ পাড়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী ছিল। ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ মিলে একটি কোম্পানীও ওখানে ছিল। পাকসেনারা উত্তর দিক থেকে মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় ঐ তারিখে।

১২/১৩ এপ্রিল পাকসেনারা বিমান হামলাও চালায়। মুক্তিবাহিনী সব ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় পাকবাহিনীর প্রবল আক্রমণে। কিছু ইপিআর শেওরা নামক স্থানে আসে, সেখানে মেজর সি, আর দত্ত ছিলেন।

২৩শে এপ্রিল তারিখে ইপিআর-আনসার মিলে ৩০০ এবং ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর ৩০০ মত সৈন্য মিলিত হয়ে গোলাপগঞ্জ নামক স্থানে ডিফেন্স নেয়। ২৪শে এপ্রিল পাকসেনারা গোলাপগঞ্জের মুক্তিবাহিনীর

অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায় সকাল ৯/১০টার সময়। আমাদের পাঁচি পাল্টা আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ আধঘন্টা স্থায়ী হয়। পাকসেনারা পিছু হটে যায়। এরপর ভারতীয় বিএসএফ ভারতে চলে যায়। আমরা ইপিআর-রা শেওলাতে গেলাম।

২৭/২৮ এপ্রিল আমরা মাত্র একটি প্লাটুন ইপিআর ছিলাম শেওলাতে। আনসার ৪/৫ জন ছিল। পাকসেনারা আবার আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে শুনে আমরা টিকতে পারব না ভেবে বড়গ্রাম বিওপিতে চলে গেলাম। মেজর দত্ত ও ক্যাপ্টেন রব আমাদের ঐ ক্যাম্পে যান। আমাদের হেডকোয়ার্টার করলেন বাংলাদেশ চেকপোস্ট সুতারকান্দি চেকপোস্টে। আমরা তখন ৫০ জনের মত ইপিআর ছিলাম। আমরা ডিফেন্স নিলাম বড়গ্রাম, মনিরং, কোনাগ্রাম এবং সুতারকান্দি চেকপোস্টে। পাক বাহিনী ইতিমধ্যে শেওলা দখল করে নেয়।

মে মাসের প্রথম থেকে ক্যাপ্টেন রব থাকতেন সুতারকান্দি চেকপোস্টে। ক্যাপ্টেন রব আমাদের নির্দেশ দিলে 'হিট এন্ড রান' পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে। আমরা হঠাৎ করে পাক আর্মির উপর আক্রমণ করে আবার ঘাঁটিতে ফিরে আসি।

মে মাসের ২৩ তারিখে সব অবস্থান থেকে কিছু কিছু করে ইপিআর নিয়ে একটি প্লাটুন তৈরী করে হাবিলদার শামসুল হকের নেতৃত্বে লাভু নামক স্থানে যাই পাকসেনাদের আক্রমণ করতে। ঐ তারিখ রাতে আমরা পাক ঘাঁটির উপর ৩" মর্টার দিয়ে আক্রমণ করি। কিছু লোক ওখানে থাকে সকালে পর্যন্ত আক্রমণের ফলাফল দেখবার জন্য। আমরা ১৪ জনের মত রাতেই ফিরে আসি।

২৪শে মে ভোরে কয়েকশত পাকসেনা পুরা ভারী অস্ত্র নিয়ে আমাদের দিকে এগোতে থাকে। আমরা প্রথমে দেখতে পাইনি। আমাদের বড়গ্রাম, মন্দিরপোর্ট, কোনাগ্রাম পিছে ফেলে আমাদের চেকপোস্টে হামলা চালায়। আমরা তখন তিনটি ঘাঁটি থেকে একই সময় রাস্তার উপর দিয়ে অগ্রসরমান পাকসেনাদের আঘাত হানতে থাকি। চারিদিকের আক্রমণে বহু পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা পিছু হটে ফায়ার স্টপ করে। আমরা গুলির শব্দ না পেয়ে তিন পাঁচিই রাস্তার উপর উঠে পড়ি, এমন সময় পিছন দিক থেকে আবার গুলির শব্দ পেলাম। পিছে গিয়ে দেখলাম, সমগ্র বড়গ্রাম ৩০০ মত পাকসেনা ঘিরে ফেলেছে, অপর দিকে কোনাগ্রামও ঘিরতে চেষ্টা করছে পাকসেনাদের অপর দল। আমাদের তখন একটাই পথ খোলা ছিল। আমাদের তখন গোলাবারুদ প্রায় শেষ, অস্ত্রও অনেক অকেজো। আমরা পিছু হটে পালাতে চেষ্টা করি। পাকসেনারা আমাদের পিছু ধাওয়া করে। এই সময় বেসামরিক বেশ কিছু লোক পাকবাহিনীর হাতে নিহত হয়। আমরা ৯ জন রাস্তা ধরে ভারতের অর্ধ মাইল ভিতরে চলে যাই। পাকসেনা তখনও গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসছিল। আমাদের আর পিছু হটার ক্ষমতা ছিল না। ৭/৮ জন পাকসেনা গুলি করতে করতে ভারতে ঢুকে পড়ে। আমরা ভারতের ঐ স্থানে ৫টি এল-এম-জি পড়ে থাকতে দেখি একবারে প্রস্তুত অবস্থায়। আমরা তখনই ৫টি এলএমজি নিয়ে পজিশন নিই। আমাদের কাছাকাছি আসলে আমরা গুলি চালাই। একজন সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। বাকিরা সব পিছু পালাতে থাকে। আমরা পাকবাহিনীর পিছু ধাওয়া করি। যে পাক সেনাটি পড়ে যায় তাকে আহত অবস্থায় বন্দী করি। সে ছিল ৩১ পাঞ্জাবের হাবিলদার দোস্ত মোহাম্মদ। এই সময় ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর একজন কর্নেল এসে বন্দীসহ আমাদেরকে ভারতের ফকিরাবাজার নিয়ে যান। এরপর পাকসেনারা এই এলাকা দখল করে নেয়। আমরা সবাই ভারতে আশ্রয় নিই। আমি ৪নং সেক্টরে কর্নেল সি, আর, দত্তের নেতৃত্বে যুদ্ধ করি। আমার কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন রব।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭।	কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	 ১৯৭১

চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়ার প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম, এ, ওসমান চৌধুরী

৩১-১-১৯৭৪

আমি ইপিআর, ৪র্থ উইং-এর ভার গ্রহণ করার পূর্ব থেকেই ওখানে (চুয়াডাঙ্গায়) ছিলেন দুইজন ক্যাপ্টেন-সহকারী উইং কমান্ডার হিসাবে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বাঙ্গালী। নাম তার ক্যাপ্টেন এ, আর, আজম চৌধুরী (বর্তমানে মেজর), দ্বিতীয় জন ছিলেন অবাঙ্গালী, তার নাম ক্যাপ্টেন (মরহুম) সাদেক।

এই উইং-এর অধীনে ছিল ৫টি কোম্পানী। ১টি কোম্পানী চুয়াডাঙ্গা হেডকোয়ার্টারে, অন্য চারটি ছিল সীমান্ত এলাকায়। উইং-এর সীমান্ত এলাকা ছিল দক্ষিণে মাসলিয়া বিওপি থেকে উত্তরে মহেশকুন্ডি বিওপি পর্যন্ত। প্রত্যেকটি কোম্পানীর কমান্ডার ছিল একেকজন সুবেদার। মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫০। তার মধ্যে আনুমানিক অবাঙ্গালী সেনার সংখ্যা ছিল ১৫০।

২০শে মার্চ ১৯৭১ সন। চট্টগ্রাম থেকে আমার ব্যক্তিগত গাড়ীটি সড়ক পথে চুয়াডাঙ্গা এসে পৌঁছল। ২৪শে মার্চ সকাল ১০টায় ঐ গাড়ী করেই আমার স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে মেহেরপুরের পথে কুষ্টিয়া রওনা হই। আমার পরণে ছিল ইপিআর পোশাক। সাথে চলল ইপিআর জীপে চজে ৪ জন সশস্ত্র ইপিআর সৈনিক। উদ্দেশ্য ছিল, আমার সরকারী বাড়ী মেরামত করার খরচ হিসাবে কুষ্টিয়ার ডিসি'র কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করা। ইচ্ছা ছিল, ঐ দিনই কাজ সেরে কুষ্টিয়ায় রাত্রি যাপন করার পর ২৫শে মার্চের পূর্বাহ্নেই চুয়াডাঙ্গা ফেরত আসার। কিন্তু মেহেরপুরে গিয়েই গাড়ীটা আমার নষ্ট হয়ে গেল। কিছুতেই দোষ খুঁজে পেলাম না। জীপ ফেরত পাঠিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে মেকানিকস আনালাম। গাড়ী ঠিক হতে হতে বিকেল ৩টা বেজে গেল। আবার রওনা হলাম কুষ্টিয়া অভিমুখে। আরো ১৫ মাইল যাবার পর গাড়ী খারাপ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে আশে-পাশের বাড়ী থেকে পাটের রশি সংগ্রহ করে জীপের পেছনে গাড়ীকে বেঁধে কুষ্টিয়া পৌঁছলাম। উঠলাম কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে।

পরদিন ২৫শে মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় ডেপুটি কমিশনার সাহেবের অফিসে গেলাম। ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জনাব শামসুল হক। তাঁর অফিস ও বাসস্থান ছিল একই প্রাঙ্গণে। তিনি আসলেন, কথাবার্তা হল, চায়ের পর্ব শেষ হল। তারপর পিয়নের মারফত ডাকলেন ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন অফিসারকে। এল-এ-সাহেব আসলেন, সব শুনলেন, তারপর গেলেন অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও চেকবুক আনবার জন্য। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা সেরে আমাকে চেক ইস্যু করতে করতে বেলা দেড়টা বেজে গেল। তখনকার ন্যাশনাল ব্যান্ড বন্ধ হয়ে গেল, তাই টাকা আর উঠানো গেল না। চুয়াডাঙ্গায় এমন কোন জরুরী অবস্থা ছিল না তাই টাকা সাথে করে নিয়ে যাবো মনে করেই ২৫শে মার্চ রাতেও কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে রয়ে গেলাম।

২৬শে মার্চ ভোর ছটায় ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে দেখতে পেলাম অল্প দূরেই রাস্তার উপর মিলিটারী জীপে করে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর লোক টহল দিচ্ছে আর জানিয়ে দিচ্ছে ৩০ ঘণ্টার জন্য কারফিউ। কুষ্টিয়ার

*১৯৭১ সালে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন।

জনসাধারণ ঘরে বসেই দরজা জানারা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে মনে হল। ডি-সিকে টেলিফোন করে জেনে নিতে চাইলাম ব্যাপার কি ? কিন্তু টেলিফোন উঠিয়ে এটার কোন সাড়াই পেলাম না। বুঝতে পারলাম লাইন কেটে দিয়েছে। পিছনে চেয়ে দেখলাম সামরিক বাহিনী সার্কিট হাউসের ঠিক পিছনেই তথা জিলা স্কুলে করেছে তাদের সদর দপ্তর। কি করব বুঝতেই পারলাম না। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থাতেই কেটে গেল তিন ঘন্টা। রেডিও লাগান ছিল, ঢাকা বেতারের নিয়মিত প্রোগ্রামটা শুনে যাচ্ছিলাম। তা থেকে শুভাশুভ কিছুই বুঝতে পারলাম না। সাড়ে ৮টা কি ৯টার দিকে হঠাৎ ঘোষণা করা হল নতুন নতুন ‘মার্শাল ল’ আইন। লুফে নিল আমাদের ব্যক্তি ও বাক স্বাধীনতা। বুঝতে পারলাম, বোধ হয় এসেছে আমাদের সেই চরম ও পরম পরীক্ষার দিন। আর এক মুহূর্তও কুষ্টিয়ায় থাকা সমীচীন মনে করলাম না। জীপের পেছনে আবার গাড়ীটাকে বেঁধে এবার উল্টাদিকে অর্থাৎ ঝিনাইদহের দিকে যথাসম্ভব তীব্র গাড়ী চালিয়ে দিলাম। ভাগ্য ভাল কুষ্টিয়ার সার্কিট হাউস ছিল শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। কাজেই কুষ্টিয়া শহরের সীমা অতিক্রম করতে আমাদের এক মিনিটের বেশী সময় লাগেনি। দূর থেকে ইপিআর-এর পোশাক পরা অবস্থায় আমাদের দেখেও আমাদের কিছুই ওরা বলেনি। কেন বলেনি সেটা পরে যতবার ভেবেছি, ততবারই ওদের বোকামি ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারিনি। তবে আমি মনে করি এটা বোধ হয় আল্লাহরই মহিমা। বেলা ১১টায় ঝিনাইদহ পৌঁছে দেখি শহর লোকে লোকারণ্য। আমার জীপকে আসতে দেখে তারা রাস্তা ছেড়ে দিল।

এখানে একটু বলে রাখা ভাল যে, চুয়াডাঙ্গার ইপিআর-এর ৪র্থ উইং-এর ইতিহাসে আমি ছিলাম প্রথম বাঙ্গালী কমান্ডার। আমার বা আমার পরিবারের কারও গায়ের রং দেশে স্থানীয় লোক বিশ্বাসই করতে পারেনি যে আমরা বাঙ্গালী। তাছাড়া এই স্বল্প সময়ে জনসাধারণের সাথে পরিচয় করাও সম্ভব হয়নি। স্থানীয় লোকজনের সাথে পরিচয় করার ওটাই একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আমি গাড়ি থেকে নেমে বাংলা ভাষায় লোকজনকে ডাকলাম। লোকজন সবাই দৌড়ে আসল। পরিচয় পেয়ে উৎসাহিত হল। আমার আহবানে সমস্ত সহযোগিতার আশ্বাস দিল। আমি তাদেরকে প্রস্তুত থাকবার উপদেশ দিয়ে সেখান থেকে চুয়াডাঙ্গা অভিমুখে রওনা দিলাম।

আনুমানিক বেলা ১টায় চুয়াডাঙ্গা আমার সদর দপ্তরের সামনের রাস্তায় পৌঁছলাম। আমার গাড়ী দাঁড়াবার সাথে সাথেই আমার বাঙ্গালী উইং হাবিলদার-মেজর মজিবর রহমান এসে অভিবাদন করে ঢাকার ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিল। আরও জানাল যে, ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরীর কোনরকম নির্দেশ ছাড়াই উইং হেডকোয়ার্টারের সমস্ত অবাস্তালী সেনাদের সে আটক করে রেখেছে এবং অস্ত্রাগার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রেখেছে।

হাবিলদার মেজর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা দুরভিসন্ধির খবরও আমাকে জানাল। সেটা হল যে ২৫শে মার্চ বিকেল বেলা হঠাৎ করে যশোর থেকে তৎকালীন ইপিআর সেক্টরের উপ-অধিনায়ক অবাস্তালী মেজর সরদার আবদুল কাদের চুয়াডাঙ্গা এসেছিল যশোরে একটা অত্যন্ত জরুরী মিটিং-এর অজুহাতে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু যখন শুনল আমি চুয়াডাঙ্গায় নেই তখন সে ক্যাপ্টেন সাদেকের বাসায় রাত্রি যাপন করে ২৬শে মার্চ ভোর ৪টার সময় ক্যাপ্টেন সাদেক ও তার পরিবারবর্গকে নিয়ে যশোরে পালিয়ে যায়।

যাই হোক, হাবিলদার মেজরের কাছ থেকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে আমি মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে প্রায় পৌঁছতে পারলাম। তবুও তাদেরকে সর্বতোভাবে তৈরী থাকতে নির্দেশ দিয়ে আমি আমার বাসভবনে চলে গেলাম। সেখানে গিয়েই আমি আমার অফিসার ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় এম-পি ডাঃ আসহাবুল হক ও স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা, বেসামরিক কর্মচারী প্রমুখদের জরুরীভাবে তলব করে পাঠলাম। ডাঃ আসহাবুল বোধ হয় তৈরীই ছিলেন আমার অপেক্ষায়। খবর পেয়ে ৫ মিনিটের মধ্যে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য সবাই আসার পর আমি তাদেরকে নিয়ে একটা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলাম। ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর থেকে তখন পর্যন্ত ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গার আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা ও দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলাম। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করা গেল, এ অন্যান্য আমরা সহিবনা। শপথ নিলাম আমরা এর

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব, যুদ্ধ করব এবং যেমন করেই হোক নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও মাতৃভূমিকে এই পশুশক্তির কালো হাত থেকে রক্ষা করব। সবাই আমাকে সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক কার্যকলাপের প্রধান বলে মেনে নিলেন। আমিও নির্দেশ জারী করলাম যে, সেই থেকে আমার নির্দেশ মতই সবাইকে আপন আপন কাজ সমাধা করতে হবে। সমস্ত সিদ্ধান্তের পর আমি সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের সমভিব্যাহার আমার উইং-এর কোয়ার্টার গার্ডে বাংলাদেশের পতাকা সসম্মানে উত্তোলন করে ওটাকে জাতীয় অভিবাদন দিলাম। এটা যে একটা কত বড় জীবনের ঝুঁকি, বিশেষ করে যখন কোন রকম সংযোগবিহীন অবস্থায় বিনা নির্দেশে এবং আর কেউ বিদ্রোহ করেছে কিনা, সেটা না জেনেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চেতনায় পাণ্ডিত্য সেনাবাহিনীর মত একটা এতবড় শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যে কত বড় চ্যালেঞ্জ, বিজ্ঞজন মাঝেই তা অনুধাবন করতে পারবেন।

তারপর আমি আমার সৈন্য ও ভারী অস্ত্র নানা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থান করানো এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করা ইত্যাদি সামরিক ও বেসামরিক নির্দেশ দানে প্রায় অর্ধরাত অতিবাহিত করি। ইতিমধ্যে অয়ারলেস মারফত সীমান্তের আমার সৈন্যদেরকেও অবস্থা বর্ণনা করে সজাগ থাকতে নির্দেশ দিই। এই ভাবে অতিবাহিত হল ২৬শে মার্চ।

২৭শে মার্চ সকাল ৭ ঘটিকায় মাসলিয়া বিওপি কোম্পানী হেডকোয়ার্টার থেকে কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার আব্দুল মজিদ মোল্লা অয়ারলেস মারফত জানালেন যে ক্যাপ্টেন সাদেক তিনজন সৈনিকসহ যশোর থেকে সীমান্ত রাস্তা দিয়ে মাসলিয়া বিওপিতে প্রবেশ করেছে। আমি তাকে ক্যাপ্টেন সাদেকের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবার নির্দেশ দিলাম। খবরটা পেয়ে আমি অনুমান করেছিলাম যে, হয়তবা ২৬শে মার্চ ভোর ৪টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া থেকে আসতে পারিনি লক্ষ্য করেই বোথ হয় ক্যাপ্টেন সাদেক ভেবেছিল যে, সীমান্তের সৈন্যদেরকে নিশ্চয় কোন রকম সজাগ থাকার আদেশ দেওয়া হয়নি। তাই তার মাসলিয়া যাবার উদ্দেশ্য সৈন্যদেরকে চতুরতার সাথে নিরস্ত্র করা।

যাই হোক, প্রায় ১০ মিনিট পর সুবেদার মজিদ মোল্লা জানান যে, ক্যাপ্টেন সাদেক আদেশ পালন না করার অপরাধে একজন বাঙ্গালী সিপাই-এর উপর পিস্তলের গুলি করে যশোর অভিমুখে জীপে করে পালিয়ে যায়। অবশ্য, এরপর আমার নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী বিওপিতে খবর দিয়ে গুলির বিনিময়ে তাদের গতি রোধ করা হয়। গোলাগুলিতে ক্যাপ্টেন সাদেক ও তার সঙ্গীরা মারা যায়। কিছুক্ষণ পর সুবেদার মজিদ মোল্লা অত্যন্ত ভীতস্বরে অয়ারলেসে আমাকে এ খবর জানায়। আমি তাকে অভয় দিয়ে মৃদদেহগুলি পুঁতে ফেলার আদেশ দিই। এইখানেই শুরু হল আমার এলাকায় পদ্মার ওপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হনন পর্ব। এখানেই বুঝতে পারলাম- “I am in a point of no return. Either I have to kill the enemy or get killed.”

কুষ্টিয়া পুনর্দখলের পরিকল্পনাঃ ডাঃ আসহাবুল হক সাহেবকে খবর দিলাম। দুই কমরেড মিলে ছক আঁকলাম-কুষ্টিয়া আমাকে পুনরুদ্ধার করতেই হবে। পরিকল্পনা করলাম পুজানুপুজাভাবে। সীমান্তের সৈন্যবাহিনীকে জরুরী ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গায় জমায়েত হবার নির্দেশ দিলাম। ফিলিপনগর কোম্পানীকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কুষ্টিয়া শহরের অদূরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হবার পর পরবর্তী আদেশের অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিলাম। এই কোম্পানীর কমান্ডার ছিলেন সুবেদার মোজাফফর আহমেদ (বর্তমানে লেঃ ইপিআর)। দুই কমরেড মিলে ঐ এলাকার নামকরণ করলাম- “সাউথ ওয়েস্টার্ন কমান্ড দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গন।” কমান্ডার হলাম আমি মেজর মোহাম্মদ আবু ওসমান চৌধুরী (বর্তমানে লেঃ কর্নেল)।

এখানে কুষ্টিয়ার শত্রু সৈন্যসংখ্যা ও তাদের শক্তির উপর কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। যশোর ব্রিগেড থেকে ২৭ বেলুচ রেজিমেন্ট তথা রিকনাইসেন্স ও সাপোর্ট ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানী-অর্থাৎ প্রায় ২০০ সৈন্য কুষ্টিয়া অধিকার করে ২৫/২৬শে মার্চ রাত দেড়টায়। তাদের সাথে ছিল পর্যাপ্তসংখ্যক ১০৬ এম-এম আর-আর (জীপে সংস্থাপিত) চীনা এইচ-এম-জি, এলএমজি, এসএমজি ও অটোমেটিক রাইফেলসমূহ। তার সাথে

প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ, গাড়ী ও বেতারযন্ত্র ছিল। তুলনামূলকভাবে রেকি ও সাপোর্ট কোম্পানীর ফায়ার পাওয়ার একটা সাধারণ ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নের প্রায় সমপরিমাণ এই সত্য আমার ভাল করেই জানা ছিল। আমি জানতাম, যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আমি অন্ততঃপক্ষে সমান ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র নিয়ে তিনগুণ সৈন্যের কম হলে ওদেরকে আক্রমণ করতে পারি না। কুষ্টিয়ার শত্রুদের অধিনায়ক ছিলেন মেজর শোয়েব। তার সাথে উপ-অধিনায়করা ছিল ক্যাপ্টেন শাকিল, ক্যাপ্টেন সামাদ ও লেঃ আতাউল্লাহ শাহ।

আমার মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন ইপিআর সৈনিক। তাদের অস্ত্র বলতে ছিল ৩০৩ রাইফেল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ৩০৩ এলএমজি, এমজি ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মর্চে পড়া ৪টা ৩.৫ রকেট লাঞ্চার। গোলাবারুদের সংখ্যা একবারেই ছিল অপরিাপ্ত। তদুপরি ছিল আধুনিক যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকজন। অফিসার বলতে আমার সাথে ছিল একমাত্র ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী। তবে ভরসা ছিল এই যে আমার সাথে ছিল সমস্ত জনসাধারণ।

তবুও পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি কিছু সংখ্যক আনসার ও মুজাহিদকে একদিনের ট্রেনিং-এর পর আমার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করি। স্থানীয় পুলিশ ও আনসারদের ৩০৩ রাইফেলগুলো দ্বারা এই বাহিনীকে সজ্জিত করি।

আমার কাছে কোন রকম ফিল্ড অয়ারলেস বা ফিল্ড টেলিফোন কম্যুনিকেশনের ব্যবস্থা ছিল না। তাই টেলিফোন বিভাগের সাহায্যে পোড়াদহের খোলা প্রান্তরে ফিল্ড এক্সচেঞ্জ লাগিয়ে দেওয়া হয়। ডঃ আসহাবুল হক সাহেবের সাহায্যে ফিল্ড চিকিৎসা কেন্দ্র, ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। সেনাবাহিনীর ন্যায় খাদ্য সরবরাহের কোন রকম নিয়মিত পদ্ধতি না থাকায় ভলান্টিয়ার গ্রুপের কিছু লোকে কুষ্টিয়ায় পাঠিয়ে সেখানকার আওয়ামী লীগ দলের গণ্যমান্যদের সাহায্যে আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনীর খাদ্যের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়। আরও ব্যবস্থা হয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে প্রয়োজনমত যথাস্থানে ব্যবহার করার। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হাতিয়ার বলতে ছিল বাঁশের লাঠি।

২৮শে মার্চ দুপুর ১২টা পর্যন্ত সীমান্তের সমস্ত কোম্পানী আদেশক্রমে চুয়াডাঙ্গায় সমবেত হয়। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এক কোম্পানী সৈন্য আমি বিনাইদহে পাঠিয়ে দিই ও যশোর-বিনাইদহ রাস্তা অবরোধ করে রাখি, যেন যশোর থেকে কোন রকম সৈন্য বা অস্ত্র কুষ্টিয়াকে সরবরাহ করতে না পারে। আর এক কোম্পানী সৈন্যকে ঐদিন বিকেল বেলা ক্যাপ্টেন আজমের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা-পোড়াদহ কাঁচা রাস্তা দিয়ে আমি পোড়াদহ পাঠিয়ে দিই। ক্যাপ্টেন আজমের প্রতি নির্দেশ ছিল তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছাবার পরেই সে যেন সুবেদার মুজাফফরের কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে আমাকে রিপোর্ট দেয়। পরিকল্পনা ছিল সুবেদার মুজাফফরের কোম্পানী কুষ্টিয়ার পুলিশ লাইনের দিক দিয়ে আক্রমণ করবে, ক্যাপ্টেন আজমের কোম্পানী শহরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে-অর্থাৎ সার্কিট হাউসের দিক দিয়ে আক্রমণ করবে এবং একটা প্লাটুন ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক পূর্ব দিক থেকে মোহিনী মিল ও অয়ারলেস স্টেশনের উপর আক্রমণ চালাবে। আক্রমণ হবসংযুক্তভাবে একই সময়ে তিন দিক থেকে।

আক্রমণের সময় ও তারিখ ছিল ২৯শে মার্চ ভোর ৪টা। পরিকল্পনায় এটাও ঠিক করে রাখা হয়েছিল যে, আক্রমণ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আমার বাহিনীর পশ্চাদভাগে যেন কমপক্ষে ৫ হাজার বেসামরিক লোক আক্রমণের সাথে সাথেই জয়ধ্বনি দিতে দিতে আক্রমণকারী বাহিনীকে অনুসরণ করে। এ সময় বেসামরিক ব্যবস্থার ভার ছিল ডঃ আসহাবুল হকের উপর যিনি তাঁর দলীয় লোক, স্থানীয় ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে খুব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন।

আক্রমণের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, চলাচল অসুবিধার জন্য ও একটা গাড়ী দুর্ঘটনার কবলে পতিত হওয়ার দরুন সুবেদার মুজাফফরের কোম্পানী নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে

পারেনি। তাই বাধ্য হয়ে আমি আক্রমণের দিন ও সময় ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে দিই। অর্থাৎ আক্রমণের নতুন দিন ও সময় স্থির করি ৩০শে মার্চ ভোর ৪টায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ২৬শে মার্চ সকাল ১০টায় আমার মাসলিয়ায় অবস্থানরত কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মজিদ মোল্লা অয়ারলেসে খবর পাঠালেন যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ান, যারা সিনিয়র টাইগার নামে পরিচিত, তাদের সমস্ত সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সহকারে বাঙ্গালী কমান্ডার লেঃ কর্নেল রেজিউল জলিলের নেতৃত্বে চৌগাছায় অবস্থান করছে। এই ব্যাটেলিয়ান নাকি ২৪শে মার্চ তারিখে বাৎসরিক ফিল্ড এক্সারসাইজের জন্য চৌগাছায় এসেছিল যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে। খবর শুনে আমার মনে বিরাট একটা ভরসা আসল। আমি অয়ারলেসে সুবেদার মজিদ মোল্লাকে দিয়ে আমার তরফ থেকে লিখে পাঠালাম লেঃ কর্নেল জলিলের কাছে। ঐ খবরে আমি লিখেছিলাম যে, ‘দেশের ও দেশের লোকের নিরাপত্তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বিপর্যস্ত, মা বোনদের ইজ্জত লুপ্তিত, জ্ঞানী-গুণী ও ছাত্ররা হতাহত হচ্ছে। তাই এর বিরুদ্ধে আমি আমার ইপিআর বাহিনীকে নিয়ে বিদ্রোহ করেছি, বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছি। আর কে কি করেছে জানি না। কিন্তু আপনি সিনিয়র, আপনার কাছে সৈন্য আছে, হাতিয়ার আছে। আপনি আসুন অধিনায়কত্ব গ্রহণ করুন। আমরা সম্মিলিত ভাবে এদের হনন করতে সক্ষম হবো।’ সুবেদার মজিদ মোল্লা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ানে গিয়ে এ সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছায়। কিন্তু অনেক অপেক্ষা করেও তাঁর কাছ থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। আমাকে এ খবর দেয়ার পর ২৮শে মার্চ আবার এই মর্মে চিঠি লিখে দানেশ নামক এক বিশেষ মুক্তিযোদ্ধাকে তার মোটরসাইকেলে করেই লেঃ কর্নেল জলিলের কাছে পাঠাই। চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছানো হয়, কিন্তু নিষ্ফল সব আশা। তিনি কোন রকম আশ্বাস দেয়া দূরের কথা, আমার কার্যকলাপকে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে সেদিনই বিকেল বেলা যশোর ক্যান্টনমেন্টে তাঁর জীপে করে চলে যান এবং ২৯শে মার্চ পত্রবাহক মারফত ব্যাটেলিয়ানের কাছে সংবাদ পাঠান যে, যশোর ক্যান্টনমেন্টে কোন রকম গোলমাল নেই এবং তার আশঙ্কাও নেই, তার পুরো ব্যাটেলিয়ান যেন যশোর ক্যান্টনমেন্টে সেদিনই ফেরত আসে। তদনুযায়ী এই ব্যাটেলিয়ান ২৯শে মার্চ বিকেল পর্যন্ত যশোর ক্যান্টনমেন্টে ফেরত গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র জমা করে আপন আপন কাজে লিপ্ত হয়। শুনেছি, ব্রিগেডিয়ার সরদার আব্দুর রহিম দুররানী নাকি রাতেই তাদের অস্ত্রাগারের চাবি হস্তগত করে। পরদিন ৩০শে মার্চ সকাল ১০টায় এই ব্যাটেলিয়ানের অস্ত্রবিহীন সৈন্যদের উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ ও গোলাগুলি বর্ষণ করা হয়। এই আক্রমণে ইস্ট বেঙ্গল বেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ানের অধিকাংশ সৈন্যই নিরীহভাবে মারা যায়। শুধু লেঃ হাফিজউদ্দিন (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) ও ১৪৮ জন জেসিও এবং অন্যান্য সাধারণ সৈন্য জীবন নিয়ে পালিয়ে এসে আবার ঐ চৌগাছা এলাকায় সমবেত হয়। তাদের অস্ত্র নেই, খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই। তারা বহুকষ্টে সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে খাদ্য সংগ্রহ করে।

এদিকে কুষ্টিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা হলো, ২৮শে মার্চ রাত থেকে ২৯শে মার্চ রাত পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে আমাদের সৈন্যদের কুষ্টিয়া শহর থেকে অদূরে মাঠে ময়দানে ও জঙ্গলে অবস্থান করতে হয়। সুবেদার মুজাফফরের কোম্পানী নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে সক্ষম হয় ২৯শে মার্চ ভোরবেলা। নিয়মিত যোগাযোগ করে তাদেরকে আক্রমণের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং যথারীতি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, ঔষধপত্র ও বেসামরিক লোক সরবরাহ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০শে মার্চ সকাল ৪টায় তিন দিক থেকে অতর্কিত ভাবে কুষ্টিয়া আক্রমণ করি। আক্রমণের সাথে সাথে অনুসরণকারী জনগণের গগনবিদারী জয়ধ্বনিতে বোধ হয় শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙ্গে যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক তুমুল যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যরা পুলিশ লাইন ও অয়ারলেস কেন্দ্রের ভিতর ঢুকে পড়ে শত্রুহনন করতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখে সামান্য সংখ্যক শত্রুসৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে দ্রুতগতিতে তাদেরই সদর দপ্তরের দিকে পালিয়ে যায়। পালাবার প্রাক্কালেও অনেকে নিহত হয়। পুরোদিনের যুদ্ধে একমাত্র তাদের সদর দপ্তর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ব্যতীত সমস্ত শহরই আমাদের হস্তগত হয়। আমার সৈন্যরা শত্রুদেরকে ৩০শে মার্চ সারারাত চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখে মুহূর্তে জয়ধ্বনি জহকারে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। শত্রুরা অয়ারলেস সেটের মারফত শত্রুপক্ষের অয়ারলেস আবেদন মনিটরিং করে

যশোরের দেওয়া প্রত্যুত্তর আমাদের হস্তগত হয়। যশোরের প্রত্যুত্তর ছিল- “Reinforcement not possible. Try to live on your own.”

পরদিন ৩১শে মার্চ ভোরবেলা আমাদের আক্রমণ পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। তুমুল গোলাগুলির সাহায্যে শত্রুশক্তি আমাদের মাথা নিচু রাখতে বাধ্য করে। সারাদিনের যুদ্ধের পর আনুমানিক জীবিত শত্রু সংখ্যা ছিল ৪০/৪৫ জন। তার মধ্যে অফিসাররা সকলেই জীবিত ছিল। গতান্তর না দেখে রাতের অন্ধকারে তারা দুইটি জীপ ও একটি ডজ গাড়ীতে আরোহণ করে আমাদের ব্যুহ ভেদ করে তীব্র গতিতে বিনাইদহের দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আমার সৈন্যরা সাথে সাথে তাদেরকে অনুসরণ করে। শত্রুদের ভাগ্য মন্দ। শৈলকুপার পুলের গোড়ায় আমরা গর্ত খনন করে তারপোলিন দিয়ে সেই গর্তকে ঢেকে রেখেছিলাম সেটা তারা জানত না। তাদের প্রথম ২টা জীপ উপর্যুপরি গর্তে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে দুর্ঘটনায় পড়ে। মেজর শোয়েব ও কয়েকজন শত্রুসৈন্যরা সেখানে ভবলীলা সাজ হয়। বাকীরা আশে পাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সজাগ মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক ও জনগণের হাত থেকে একটি শত্রুসৈন্যও বাঁচতে পারেনি। আমার নির্দেশে উৎসাহিত হয়ে তারা এক একজনকে হত্যা করে তাদের হাতিয়ার এনে আমার সদর দপ্তরে জমা দেয়। এমনও হয়েছে একটি ছেলে একটা এখন শটগান দিয়ে একজন এলএমজিধারী শত্রুসৈন্যকে হত্যা করে তার হাতের একটি আঙ্গুল ও এলএমজি আমার সদর দপ্তরে জমা করে। এই ছেলেটির বয়স ছিল ১৮/২০ বছর। নাম তার সুলতান আলী জোয়ারদার। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও হৈ-হুল্লোড়ে এই ছেলেটির সাথে দেখা করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সেই রাতেই লেঃ আতাউল্লাহ শাহ ধরা পড়ে। তাকে বিনাইদহে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ২রা এপ্রিল বিকেলের দিকে আমার সদর দপ্তরে আনা হয়।

১লা এপ্রিল কুষ্টিয়া সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতে মুক্ত হয়। এরপর সামান্যসংখ্যক সৈন্য কুষ্টিয়ায় রেখে বাকী সৈন্যদের আমি বিনাইদহের দিকে পাঠিয়ে দেই। কিছু সংখ্যক সৈন্য মাগুরা, কিছুসংখ্যক বিনাইদহের দক্ষিণে বিশাখালী ও কিছুসংখ্যক সৈন্য কোটচাঁদপুরে অবস্থান করে। উদ্দেশ্য-যশোর থেকে উত্তর দিকে শত্রুদের অগ্রসর হবার সব পথ অবরোধ করে রাখা।

এদিকে ২৮শে মার্চ তারিখেই কলিকাতা হয়ে বহির্বিশ্বের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। আমার মনে আছে টেলিফোনে আমি ও ডাঃ আসহাবুল হক পালাক্রমে কলিকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কাছে যুদ্ধের খবর সরবরাহ করতাম।

এক রাত্রে কথা আমি ভুলব না। সেদিন বোধ হয় ২৮ কি ২৯ তারিখ রাত্রে ঘটনা। ঢাকা থেকে খবর পেলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধিধারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিজ নিজ ঘরে পাক সেনাবাহিনী অত্যন্ত ঘণ্যতমভাবে হত্যা করেছে। কলিকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকাকে টেলিফোনে এ খবর দিতে দিতে আমি ও ডাঃ আসহাবুল হক কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম। সেদিন তাদেরকে এও বলেছিলাম যে, আমরাও এর প্রতিশোধ সমভাবেই গ্রহণ করব। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা জনাব ইউনুস ইলী এম-পি-এ, ব্যারিস্টার বাদল রশীদ, প্রিন্সিপাল ফুলে হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার সাইফ উদ্দিন ও আরো অন্যান্যকে নানা বেসামরিক সংযোগ, অভ্যর্থনা, সাহায্য গ্রহণ ইত্যাদি কাজকর্মে নিযুক্ত করা হয়েছিল। স্থানীয় জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজ প্রত্যেকেই আপন আপন সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী এই যুদ্ধের আয়োজন ও সরঞ্জামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দিনরাত সাহায্য করেছি।

বিদ্রোহ করার অব্যবহিত পরে বর্তমান বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সাথে সংযোগ হওয়ার সাথে সাথেই আমার স্ত্রীকে সেখানকার কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, বেশ পরে অনেক সুহৃদই এই প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী ও মেয়েরা আমরা সাথে যুদ্ধক্ষেত্রেই হাসিমুখে যেকোন পরিস্থিতিতেই থাকবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, তাই আর যাওয়া হল না। থাকল ওরা আমারই ট্যাকটিক্যাল হেডকোয়ার্টারের একটি কামরায়। সেখানে থেকেই

মিসেস ওসমান স্থানীয় সেনাদের খাবার ও পানীয় সরবরাহের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। এ কাজের ভার তাকে সঁপে দিতে হয়নি, নিজেই চিন্তা করে তা শুরু করেন। এমনকি সে রণাঙ্গনের যেসব সেনাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সেখানে থাকত, তাদের খাবার ও পানীয়, টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বও তিনি পরিচালনা করেন। তার উপর হেডকোয়ার্টারে আমাকে বা প্রয়োজনবশত ডাঃ আসহাবুল হক ও অন্যান্য অফিসারকে নানাভাবে সাহায্য করতে দ্বিধা করেননি। প্রয়োজনবশত মাটিতে পজিশন নেওয়া, পরিখাতে ঢুকে সতর্ক পাহারা দেওয়া, ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা, এমনকি অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদের ও সেনাসামন্তের মেইনটেন করা, এ জাতীয় বহু কাজেও আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেননি সত্য, কিন্তু যুদ্ধের যে সরঞ্জাম তিনি দিয়েছিলেন, তা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুযায়ী কুষ্টিয়ার সৈন্যদের তুলে নিয়ে বিনাইদহের দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব-দক্ষিণের ভিন্ন ভিন্ন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োগ করা হয়। যশোর সেনানিবাস থেকে শত্রুপক্ষ যাতে কোনো দিক দিয়ে পালিয়ে আমাদের পিছনে বা মধ্যে আসতে না পারে তার জন্য জোর পেট্রলিং করা হচ্ছিল।

এদিকে পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী কুষ্টিয়ায় অধিকৃত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও গাড়ী ৩রা এপ্রিল অতি প্রত্যুষে হেডকোয়ার্টার চুয়াডাঙ্গা অভিমুখে পাঠিয়ে দেয়। সেদিন আমি ও ডাঃ আসহাবুল হক সাহেব যখন আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করছি, এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলো ফরাসী টেলিভিশন কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ দল। তারা আমার কাছে বিশ্রময় টেলিভিশন পাবলিসিটির জন্য আমার সাক্ষাৎকার চাইলেন। আমি চিন্তা করে দেখলাম, সে পর্যন্ত একমাত্র বিবিসি ও আকাশবাণী ছাড়া আর কোথাও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক রূপ প্রকাশ পায়নি। এমনকি বিবিসি থেকেও ২/৪টা খুচরো সংবাদ ছাড়া বিশেষ কিছু প্রকাশ পেত না। অথচ বিশ্ববাসী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক রূপ এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয়ে জানতে না পারলে তাদের সমর্থন পাওয়া অসম্ভব। বিশ্বের সমর্থন ছাড়া যে কোন মুক্তিযুদ্ধ লোকালাইজড হতে হতে শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাই এ সুযোগ আমি হেলায় ফেলতে পারলাম না। দীর্ঘ ১৫ মিনিট পর্যন্ত আমার সাক্ষাৎকার নেয়া হল। আমার ৬ বছরের ছোট মেয়ে, ডাকনাম তার কলি, তখন কাগজের উপর বাংলাদেশের পতাকা বানিয়ে সেটাকে ছোট একটা কঞ্চিতে লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এত কচি শিশুর এত উদ্দীপনা ও মনোবল তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেই মুহূর্তেই তারা কলির সেই ভঙ্গিমার মুভি শট নিলেন, আরও নিলেন আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে চম্পা এবং অন্যান্য আরও দু'চার-জনের সংক্ষিপ্ত কথা ও ছবি। আমাদের সৈনিকদের মনোবল দেখানো হলো নানাস্থানে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থান। বেলা তখন প্রায় সকাল ১০টা। এসে গেল কুষ্টিয়া হতে প্রেরিত অধিকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহনের কনভয়। কুষ্টিয়ার যুদ্ধে আমাদের অভাবনীয় জয়ের সেগুলো ছিল জীবন্ত নিদর্শন। টেলিভিশন কর্পোরেশনের সদস্যরা বেশ উৎসাহিত হলেন। সাথে সাথে সমস্ত 'কনভয়'কে হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে অবস্থিত রাস্তার উপর সার বাঁধিয়ে বড় বড় কামান ও মেশিনগানগুলি ভাল করে ডিসপ্লে করে রাখা হল। একের পর এক সুষ্ঠুভাবে তারা নিলেন এগুলোর জীবন্ত ছায়াছবি। আমাদের হাতে বন্দী লেঃ আতাউল্লাহ শাহকেও আনিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় সেই লাইনের অধিকৃত একটা জীপের পাশে বসিয়ে দেয়া হল। দীর্ঘ ১৫ মিনিট পর্যন্ত ধরা পড়ল তার জীবন্ত সাক্ষাৎকার।

আল্লাহর কি ইচ্ছা, শুটিং শেষ করে কর্পোরেশনের সদস্যরা তাদের টেপেরেকর্ডার ও মুভি ক্যামেরা গুটাতে যাবে, ঠিক এমনি সময় আসল চুয়াডাঙ্গার উপরে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বিমান হামলা। চলল বিমানে-জমিনে লড়াই। কর্ণবিদারী আওয়াজে মুখরিত হয় চুয়াডাঙ্গা। এই সুযোগের অপচয় করেননি ফরাসি টেলিভিশন কর্পোরেশনের নিভীক সদস্যরা। অসম সাহসের সাথে তারা নিতে লাগলেন বিমানের উড্ডয়ন, বোমা ও রকেট নিক্ষেপ, জমিনমুখী গুলি ও এ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ফায়ার-এর ছবি ও আওয়াজ। ধরা পড়ল তাতে সৈন্যদের ব্যস্তসমস্ত এ্যাকশন ও রিএ্যাকশনের জীবন্ত ছবি। বাংলার মাটিতে নিক্ষেপ হল প্রথম নাপাম বোমা চুয়াডাঙ্গার ইপিআর উইং-এর প্রাক্তন হেডকোয়ার্টার ভবনে। ধরে গেল আগুন। কর্পোরেশনের সদস্যরা ভাগ্যবশত ঠিক

সেখানটায় উপস্থিত ছিলেন। নাপাম বোমার নিক্ষেপ থেকে শুরু করে টারগেট হিট, আগুন ধরা সবকিছুর জীবন্ত ছবি উঠে গেলো তাদের ক্যামেরায়। ওরা এত নির্ভীক যে দ্রুত গতিতে গাছের উপর উঠেও তারা এই আকাশ ও জমিনের যুদ্ধের ছবি তোলা পরিচালনা করেন।

এই যুদ্ধে আমাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি, শুধু একজন স্বেচ্ছাসেবক গায়ে বোমার সামান্য একটা টুকরা লেগে সামান্য আহত হয়। তবে চুয়াডাঙ্গা শহরের ঠিক দক্ষিণ ভাগে একটা বাড়ীর কুঁড়েঘরে নাপাম বোমা নিক্ষেপ্ত হলে সে ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এত সুষ্ঠুভাবে এত সাহসের সহিত টিভির সদস্যরা এই জীবন্ত ছবি তোলার কাজ সমাপন করেন যে তাদেরকে আমি সালাম না জানিয়ে পারিনি।

আমার মনে আছে, এই মুভি রীলের মধ্যে আমি জোর দিয়ে একটা কথা পরিষ্কারভাবে বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চেয়েছি যে, আমরা পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলোর শুধু নৈতিক সমর্থন চাই, বস্তুগত সমর্থনের দরকার আমাদের নেই, কারণ আমার হাতের চীনা এসএমজি'টা দেখিয়ে ওদেরকে শত্রু অস্ত্র দিয়েই আমরা শত্রুকে হনন করবো।

পরিশেষে এই টিভি সদস্যদল আমাদের কাছে বিদায় গ্রহণ করে কলিকাতা যান। বলে গেলেন যে, তারা প্যারিসে সেদিনই চলে যাবেন এই এ্যাকশন ফিল্মের পাবলিসিটি দেবার জন্য।

পরবর্তীকালে এই সদস্যদলের দ্বিতীয়বার আগমনে জানতে পারলাম, তাঁরা নাকি এই ফিল্মের কপি আরও ৫১টি বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করেছে। আরো জানতে ও শুনতে পেলাম নামকরা চলচ্চিত্র পরিচালকের মাস্টার পিস ফিল্ম প্রোডাকশনের মত এই যুদ্ধের ফিল্মটিও সারা বিশ্বে সুপারহিট করেছিল, কারণ এটাই সে পর্যন্ত বহির্বিশ্বে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও প্রতিজ্ঞা সাফল্যজনকভাবে বিশ্বের স্বাধীনচেতা লোকদের মনোযোগ ও সমর্থন আকর্ষণ করতে পেরেছিল। লন্ডন, ওয়াশিংটন ও অন্যান্য জায়গা থেকে সামরিক ও বেসামরিক অফিসাররাও এই সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর কাছ থেকে কিছু কিছু ৩০৩ রাইফেল, ২/১টা এলএমজি, কিছু স্টেনগান ও সামান্য পরিমাণ গোলাবারুদ পেয়েছিলাম। অনেকে ভারত থেকে আমার কাছে এসেছিলেন দেখা করতে সামান্য কিছু রিলিফ সামগ্রী নিয়ে। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির খ্যাতনামা সেক্রেটারী শ্রী এম, কে, ভিমানী এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এসে আমার কাছ থেকে আমার কি কি প্রয়োজন তার একটা ফর্দ করে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ঐ ফর্দের কোন জিনিসই কোনকালে পেলাম না, তাদেরও আর সাক্ষাৎ পেলাম না। অবশ্য শ্রী ভিমানী আমার সৈন্যদের যে পরিমাণে রিলিফ সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন, তাতে যুদ্ধক্ষেত্রে বুট, কাপড়, ঔষধপত্র থেকে আরম্ভ করে ওদের কোন কিছুই অভাব হয়নি।

ভারতের সাথে যোগাযোগ

৫ই এপ্রিল, ১৯৭১ সন, সময় সকাল ১০টা। সীমান্তবর্তী জীবননগর থানা থেকে খবর আসল আমার সদর দপ্তরে যে, মাননীয় তাজউদ্দীন সাহেব এবং ভারতীয় কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার আমার সাথে দেখা করার জন্য জীবননগর সীমান্তে অবস্থান করছেন। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে আমার সেখানে যাওয়া উচিত। একটি জীপে চড়ে ২জন সৈনিক সাথে করে রওনা হলাম। সীমান্ত পার হয়ে ভারতের মাটিতে পা দিতেই লেঃ কর্নেল এইচ, আর, চক্রবর্তী (সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ৭৬ নং ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, কৃষ্ণনগর) আমাকে জোর আলিঙ্গন করে গ্রহণ করেন ও আমার বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেখানে দেখা হয় তাজউদ্দীন সাহেব এবং ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আই-জি সাহেবের সাথে। মনোযোগ সহকারে তাঁরা শুনলেন আমার রণাঙ্গনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস। শুনতে চাইলেন আমার যশোর আক্রমণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আরও শুনতে চাইলেন ঐ পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হলে আমার কি কি প্রয়োজন। বললাম সবকিছু। তাজউদ্দীন সাহেব আশ্বাস দিলেন

যে, যথাস্থিই আমরা সব পাব। লেঃ কর্নেল চক্রবর্তী এত বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন যে, তখনই তিনি সাথে করে আনা একটা চেকোস্লোভাকিয়ান এলএমজি দিতে চাইলেন। এটার ব্যবহারকৌশল আমাদের জানা ছিল না বলে তিনি আমাকে দুপুরের খাবারের পর নিয়ে গেলেন ওটার কৌশল শিখাবার জন্য। এমন সময় আমার সদর দপ্তর চুয়াডাঙ্গা থেকে টেলিফোনে খবর আসল যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা বড় দল বিনাইদহের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখানে একটু বলে রাখা ভাল যে, ওরা এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় বিমান হামলা চলাকালীন যশোর থেকে পাক সেনাবাহিনীর একটা দল অগ্রসর হতে গিয়ে কালীগঞ্জ এলাকায় আমাদের ফাইটিং পেট্রলের এ্যামবুশে পড়ে কিছুসংখ্যক প্রাণ হারিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। যাই হোক, খবর পেয়ে আমি আমার একজন সৈনিককে ঐ চেকোস্লোভাকিয়ান এলএমজি'র কৌশল শিখিয়ে ওটা নিয়ে আসবার জন্য ওখানে রেখে আমি সদর দপ্তরের দিকে দ্রুতগতিতে চলে আসি। সদর দপ্তরে তখন ছিলেন ডাঃ আসহাবুল হক সাহেব ও আমার স্ত্রী। এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই ওরা একটু মুষড়ে পড়েছিল। যাই হোক, আমি যাবার পর প্রয়োজনীয় খবরাখবর ও সৈন্য মোতায়েন করার পর অবস্থা আয়ত্তে আসে। পাকিস্তানীরা আর অগ্রসর হয়নি। বুঝতে পারলাম এটা ছিল তাদের নকল আক্রমণের প্রহসন।

জীবননগর থেকে চলে আসার পূর্বে লেঃ কর্নেল এইচ, আর, চক্রবর্তী আমাকে সবরকম আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, অচিরেই আমরা আমাদের ভারী অস্ত্রাদি পাব, যার জন্য তিনি আমাকে আইজি-এর অফিসে মেজর বি, এন, ভট্টাচার্যের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখার উপদেশ দিলেন। তাঁর নিজের টেলিফোন নাম্বারও দিলেন। সেই থেকে প্রতিক্ষণ ইন্ডিয়ান বিএসএফ-এর আইজি সাহেবের অফিসে মেজর ভট্টাচার্যের কাছে টেলিফোনে সর্বশেষ সিচুয়েশন রিপোর্ট দিতাম এবং জীবন নগরে প্রস্তাবিত আমার জন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহের সর্বশেষ অবস্থা কি জানতে চাইতাম। তিনি আমাকে প্রতিবারই আশ্বাস দিয়ে বলতেন যে আমার ডিমান্ড দিল্লীর অফিসে বিবেচনাধীন আছে, শীঘ্রই এসে যাবে।

এদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যশোর থেকে ৬ই এপ্রিল ভোরবেলা আমার বিশাখালী সৈন্যবহন আক্রমণ করে, কিন্তু তাদের ভাগ্যের পরিণতি কে এড়াবে! আমার বাহিনী সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিল, সতর্ক ছিল। এদের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ছত্রভঙ্গ হওয়ায় তাদের বহু প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি হয়, কেবল সামান্য কিছু লোক যশোর সেনানিবাসে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। এটা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে আমাদের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বিজয়, যার জন্য আমার সেনাবাহিনী ও স্থানীয় জনসাধারণের মনের বিশ্বাস ও উদ্দীপনা আকাশচুম্বি অবস্থা গ্রহণ করে। আমিও এই সুযোগে আমার বাহিনীর অবস্থান সীমা পরিবর্তন করে কালীগঞ্জের দক্ষিণে যশোর সেনানিবাস থেকে ৫ মাইল দূরে অর্ধবৃত্তাকারে স্থাপন করি। ব্যাপকভাবে পেট্রলিংও কয়েম রাখি যার জন্য যশোরে পাক-বাহিনী বের হতে আর সাহস করেনি।

অন্যদিকে জীবননগরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আশ্রুত হয়ে আমি দর্শনা-গেদের রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী উঠিয়ে ফেলা রেললাইন জোড়া দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপন করি এবং ৭ই এপ্রিল অপরাহ্নে একটা লম্বা খালি মালবাহী ট্রেন গেদে স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখি আমাদের ইঙ্গিত ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন করে নিয়ে আসার দুরাশায়। এটা যে সত্যি দুরাশা ছিল তখন ভেবে দেখার ফুরসত পাইনি, সন্দেহও হয়নি। এদিকে ৬ই এপ্রিলের পর থেকে তীব্র গতিতে চলতে লাগল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রি-ইনফোর্সমেন্ট প্রোগ্রাম-জল ও আকাশপথে। আকাশপথে বাধা দিবার আমার কোন শক্তি ছিল না। জলপথেও বাধা দিতে পারিনি, কেননা যশোর সেনানিবাস থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ দিকে খুলনা-মঙ্গলা বন্দর পর্যন্ত তখনও আমার আয়ত্তাধীন ছিল না।

ইপিআর-এর ৫নং উইং-এ অবস্থান ছিল খুলনায়। তার কমান্ডার ছিল অবাস্তালী। তারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে ইপিআর সেনাবাহিনীকে প্রায় পুরোপুরিভাবে নিরস্ত্র করে রেখেছিল। লড়াই লাগার সাথে সাথে

অনেকে প্রাণ দিল, অনেকে আত্মগোপন করে রইল। যারা আত্মগোপন করে রইল তাদের সামান্য সংখ্যকের কাছে রাইফেল ও স্টেনগান ছিল।

তৎকালীন ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল যশোরে। বেশীর ভাগই বাঙ্গালী। ক্যাপ্টেন হাশমত (পদাতিক বাহিনী) ও ক্যাপ্টেন আওলাদ হোসেন (সিগন্যালস) এই দু'জন ছিলেন বাঙ্গালী অফিসার। ২৬শে মার্চ আমি ক্যাপ্টেন হাশমতের কাছে আমাদের বিদ্রোহ করার খবর জানিয়ে তাদেরকেও জরুরী অবস্থা গ্রহণ করতে অয়ারলেসে খবর পাঠাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার সেখানকার বাঙ্গালী সুবেদার ও জওয়ানদের দৃঢ় মনোবল সত্ত্বেও এই দুজন অফিসার আত্মগোপন করে। পরবর্তী এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল নায়েব সুবেদার আবদুল মালেকের নেতৃত্বে সীমিত কিন্তু প্রচণ্ডভাবে লড়াই শেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা বেনাপোলের দিকে পালিয়ে যায়। সেখানেও তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে খন্ড খন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নাভারন থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়। তৎকালীন লেঃ হাফিজের মুখে শুনেছি, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লেঃ কর্নেল মেঘ সিং তাঁর এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে লেঃ হাফিজ ও ইপিআর বাহিনীর সাহায্যার্থে বাংলাদেশের মাটিতে ঢুকে পেরেন এবং নাভারনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত লেঃ কর্নেল মেঘ সিং-এর ২/৩ জন সৈন্য পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে, যার পরিণামে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তবে ভারত তাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে বাংলার মাটিতে ঢুকে যুদ্ধে লিপ্ত হবার কাহিনী অস্বীকার করে। লেঃ কর্নেল মেঘ সিং তার সৈন্যদের নিয়ে নিজের মাটিতে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

অপরিহার্য কারণবশত বেনাপোল-যশোর রোডসহ দক্ষিণাঞ্চল সরাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে আমার নিয়ন্ত্রণে আসেনি এপ্রিল মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত।

এদিকে মেহেরপুরের তদানীন্তন এসডিও জনাব তৌফিক এলাহি চৌধুরী ও ঝিনাইদহের তদানীন্তন এসডিপিও জনাব মাহবুবউদ্দিন আহমদ আমার সাথে যোগদান করেন। মাহবুব উদ্দিন সাহেব পুলিশ অফিসার হওয়া বিধায় আমি তখনই তাঁকে ঝিনাইদহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার ও ঝিনাইদহে প্রেরিত সকল সৈন্যের নেতৃত্ব প্রদান করি। কুষ্টিয়া যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মাহবুব সাহেব সুনিপুণভাবেই ঝিনাইদহে তাঁর কর্তব্য পালন করেন। এপ্রিল মাসের ২/৩ তারিখে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রফেসর সফিকউল্লাহ সাহেবও আমার সাথে যোগদান করেন। এদের আমি অশেষ দেশপ্রেম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কঠিন সংকল্প দেখতে পেলাম। আগেই বলেছি আমার কাছে ক্যাপ্টেন আজম ছাড়া দ্বিতীয় কোন অফিসার ছিল না। তাই ৭ই এপ্রিল সেক্টর অর্ডার-এর মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার জন্য আমি তাদেরকে সরাসরি ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কে কমিশন দিয়ে তাদেরকে র‍্যাঙ্ক পরিয়ে দিই। সেক্টর অর্ডারে আমি লিখেছিলাম- "On behalf of the Bangladesh High Command I hereby award Commission to the following persons directly in the rank of Captain to meet operational requirements:-

- (a) Mr. Toufiq Elahi Chowdhury.
- (b) Mr. Mahbubuddin Ahmed.
- (c) Mr. Md. Safiqullah.

এই তিনজন অফিসারই পরবর্তীকালে যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত সেক্টরে কোম্পানী কমান্ডার হিসাবে যুদ্ধ করেছেন। তাদের বীরত্ব ছিল সত্যিই অতুলনীয়।

কুষ্টিয়া যুদ্ধের পর ২রা এপ্রিল প্রথম বঙ্গ শার্শুলদের দুঃখময় পরিণামের খবর আমার গোচর করা হয়। আরও বলা হয় যে তাদের কিছুসংখ্যক লোক পালিয়ে চৌগাছায় একত্রিত হয়েছে এবং লেঃ হাফিজ নামে একজন

বাঙ্গালী অফিসারও সেখানে আছে। ঐদিনই আমি আমার কাছে উপস্থিত হবার জন্য লেঃ হাফিজকে লোক মারফত চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলাম, কিন্তু হাফিজ আসেনি। ৪ঠা এপ্রিল তাই বিনাইদহের কমান্ডার মিঃ মাহবুবকে লেঃ হাফিজের খোঁজে পাঠাই। লেঃ হাফিজ তার ২/৩ জন লোক সাথে করে মাহবুবের গাড়ী করে আমার কাছে উপস্থিত হয়। তার কাছে প্রথম বঙ্গ শার্দুলদের করুণ কাহিনী বিস্তারিত জানতে পারলাম এবং আমার খবর পাওয়া সত্ত্বেও আমার সাথে দেখা না করার একটা কারণ খুঁজে পেলাম। যাই হোক, আমার পরিকল্পনা মনে আছে যে আমার অধীনস্থ উপআর বাহিনীর জামা-কাপড়, ইউনিফর্ম, বুট, ইকুইপমেন্ট এবং কুষ্টিয়া থেকে অধিকৃত ভারী ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং গাড়ী দিয়ে ওদেরকে সজ্জিত করে চৌগাছা এলাকায় সন্নিবেশিত করলাম।

পূর্বেই বলেছি যে বিশাখালী (বিনাইদহ থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে) যুদ্ধের পর আমার সৈন্যদের ডিফেন্স লাইনকে অগ্রগামী করে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাত্র ৫ মাইল দূরে রেখেছি। তার কারণ ছিল এই যে, ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমার অবস্থান তাদের দূরপাল্লার কামানের আওতার বাইরে রাখা। দ্বিতীয়ত আমার কোন ভারী অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তে মাননীয় তাজউদ্দীন সাহেবের প্রতিশ্রুত ভারী অস্ত্রাদির অপেক্ষায় থাকা ও একইসঙ্গে ক্যান্টনমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাখা। পরিকল্পনা ছিল, ভারত থেকে কিছু পরিমাণ ভারী অস্ত্রাদি পেলেই আমরা যশোর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করব। এদিকে ঐ অস্ত্র আসার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বুঝতে পেরেছিলাম যে প্রতিদিনই পরিস্থিতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনুকূলে চলে যাচ্ছে, কারণ জল ও আকাশ পথে তাদের রি-ইনফোর্সমেন্ট পুরোদমেই চলছিল। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে প্রতি পলে পলে সিচুয়েশন রিপোর্ট দিয়েও শুধু আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাইনি। অবশ্য এটা যে শুধু আশ্বাসই ছিল তখন তা বুঝতে পারিনি। এভাবে কেটে গেল ১১ই এপ্রিল, ১৯৭১ সন।

\ গোয়ালন্দে প্রতিরোধ \

১২ এপ্রিল খবর আসল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা বিরাট অংশ আরিচা থেকে জলপথে গোয়ালন্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বুঝতে পারলাম এদেরকে যদি গোয়ালন্দে নামতে দেয়া হয়, তাহলে আমার যশোর পরিকল্পনা ভেঙে যাবে। আমার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী থেকে কোনরকমে এক প্লাটুন সৈন্য ২টি এলএমজি, ১টা এমজি ও একটা ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ছোট কামান সহকারে পাঠিয়ে দিলাম নায়েক সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে গোয়ালন্দে। তাদের উপরে আমার নির্দেশ ছিল যে, পাকসেনারা যেন কোনমতেই পদ্মার এপারে অবতরণ করতে না পারে। ১৩ই এপ্রিল এই অগ্রগামী সৈন্যের সাথে পদ্মার পারে আমার ক্ষুদ্র সেনাদলের এক তীব্র সংঘর্ষ হয়। এতে পাকবাহিনীর একটি জাহাজ ডুবে যায় এবং তারা উত্তরাভিমুখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে খবর পেলাম যে পাকবাহিনী একই সময়ে নগরবাড়ীতে অবতরণ করার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারলাম নগরবাড়ীতে যদি পাকবাহিনী বিনা বাধায় নামতে পারে, তাহলে তারা পাবনা-ঈশ্বরদী হয়ে আমার পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালাতে পারে। তাতে আমার পজিশন অত্যন্ত সংকটময় হয়ে যাবে। তাই রাজশাহীতে যুদ্ধরত মেজর মরহুম নজমুল হককে টেলিফোন করে নগরবাড়ীতে এক কোম্পানী সৈন্য জরুরী ভিত্তিতে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি যদিও এক প্লাটুন সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, তারা সময়মত পৌঁছতে পারেনি।

এদিকে শুনতে পেলাম তদানীন্তন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হকের নেতৃত্বাধীন এক কোম্পানী পরিমাণ মুজাহিদ ছিল নগরবাড়ী রক্ষণাবেক্ষণে লিপ্ত। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২/৪টা গোলা নগরবাড়ীতে পড়বার সাথে সাথেই তারা সব পালিয়ে যায় এবং পাকবাহিনী ১৫ই এপ্রিল পুরাপুরিভাবে নগরবাড়ীতে অবতরণ করতে সক্ষম হয়। অবতরণের পর পরই পাকসেনারা তীব্র গতিতে পাবনার দিকে অগ্রসর হয়। ১৬ই এপ্রিল ভেড়ামারায় অবস্থিত আমার ক্ষুদ্র সেনাদলের সাথে প্রচণ্ড গোলাগুলির পর পাকবাহিনী ভেড়ামারায় অবতরণ করে। ভেড়ামারার কমান্ডে তখন ছিল সুবেদার মেজর মুজাফফর। উপায়ান্তর না দেখে সে তার সৈন্যদল নিয়ে পিছু হটে যায়।

ওদিকে যুগপৎভাবে পাক সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী যশোর থেকে আমাদের উপর হামলা চালায়। এই দুই দিক থেকে (সামনে ও পিছন দিক থেকে) হামলা প্রতিহত করার মত সৈন্যবল ও অস্ত্রবল আমার ছিল না। কাজেই, আমার সম্মুখভাগ (ফ্রন্ট লাইন) সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে দুই দিক থেকেই সৈন্য দেব অপসারণ করে পিছিয়ে নিয়ে আসি পর্যায়ক্রমে এবং পুনঃপ্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করি কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ, শৈলকুপা (রাস্তা), পোড়াহাট লাইনে। কিন্তু ১৬ই এপ্রিল অপরাহ্নেই পাকবাহিনীর হাতে ঝিনাইদহের পতন হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উদ্বোধনঃ অপর পক্ষে ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর চুয়াডাঙ্গাকে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী বলে ঘোষণা করার সাথে সাথেই চুয়াডাঙ্গার উপর চলতে থাকে তীব্র বিমান হামলা। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার মনস্তির করলেন যে চুয়াডাঙ্গার কোন মুক্ত এলাকাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে ১৭ই এপ্রিল। নির্বাচন করা হল আমারই পূর্বতন ইপিআর কোম্পানী হেডকোয়ার্টার বৈদ্যনাথতলার আশ্রয়কানন। সময় সকাল ১০ ঘটিকা। আমি যুদ্ধে ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত থাকা বিধায় স্টেজ ও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার ভার নিলেন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ৭৬ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল চক্রবর্তী। স্থানীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও করলেন তিনি। আমাকে শুধু নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হবার জন্য খবর দেয়া হল। ওদিকে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে ঐ রাতেই সদর দপ্তর মেহেরপুর থেকে ভৈরব নদীর অপর পারে ইছাখালী বিওপিতে স্থানান্তরিত করি। এই বিওপি থেকে ভারতীয় বিওপি'র দূরত্ব ছিল প্রায় ৬০০ গজ। বিওপিতে থাকবার মত কোন ব্যবস্থা না থাকায় সৈন্যদের যথাক্রমে প্লেস করিয়ে গাড়ীতে করে আমার স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে এই প্রথমবারের মত ভারতে পদার্পণ করি।

সে রাতে সামান্য একটা ঘটনার কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। ঘটনাটা হল এই যে, ভারতীয় মাটিতে পদার্পণ করার সাথে সাথেই আমার স্ত্রী নিজেকে অত্যন্ত অসহায় অনুভব করে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। সাথে সাথে কন্যাদের অবস্থাও তৈবচ। আমার স্ত্রী যতক্ষণ সম্ভব বাংলার মাটিতে কাটাতে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। তাই ফিরে আসা হল আবার সেই ইছাখালীতে। বিওপি'র ভাঙ্গা ঘরে ছিল না কোন বিছানাপত্র, ছিল না কোন শোবার জায়গা। মাটিতে শুয়ে ওরা রাত কাটিয়ে দিল।

পরদিন ১৭ই এপ্রিল সকাল ১০টায় বৈদ্যনাথতলার আশ্রয়কানন লোকে লোকারণ্য। অথচ তখনও আমি মেহেরপুরে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নবগঠিত সরকারকে সালাম দেবার কথা আমারই কিন্তু এদিকে নিশ্চিত না করে রওনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ওদিকে দেশ-বিদেশের সাংবাদিক সমভিব্যাহারে বৈদ্যনাথতলার আশ্রয়কাননে পৌঁছে যান অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং অনেরা। ভাগ্যবশত তৌফিক এলাহি ও মাহবুবকে আমি ভোর ৭টায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওখানে। দ্রুত গতিতে মাহবুব উপস্থিত কিছুসংখ্যক যুদ্ধক্লান্ত ইপিআর ও আনসার-মুজাহিদের মিলিত সৈন্যদের একত্রিত করে সদ্য আগত প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে সালাম প্রদান করেন। তার কিছুক্ষণ পরেই আমি ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন (বর্তমানে মেজর), ক্যাপ্টেন হাফিজ, আমার স্ত্রী-কন্যা এবং সামান্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সেখানে উপস্থিত হই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা ও সনদপত্র পাঠের পর এই নবগঠিত সরকারকে আমি সামরিক অভিবাদন দিই। তারপর আনুষঙ্গিক আলাপ-আলোচনা, পরিচয়, ভাষণ ও সবশেষে মধ্যাহ্ন ভোজের পর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়।

গৌরবের বিষয় যে পলাশীর আশ্রয়কাননে বাংলার স্বাধীনতা লুপ্ত হবার পর আবার বৈদ্যনাথতলার আশ্রয়কাননে স্বাধীনতার উন্মেষ অনুষ্ঠানের মত এতবড় একটা ঐতিহাসিক পর্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত কমান্ডারদের মধ্যে একমাত্র আমিই এবং বাংলার নারী জাতির প্রতিনিধি হিসাবে আমার স্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ফিরে এলাম আমার অস্থায়ী আড়ম্বরহীন সদর দপ্তর ইছাখালী বিওপিতে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা আবশ্যিক যে, ১৬ই এপ্রিলে যখন দেখতে পেলাম সদর দপ্তর চুয়াডাঙ্গা থেকে সরিয়ে নিতে হবে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তখনই নির্দেশ দিলাম সমস্ত স্থানীয় ও দূরবর্তী ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা, সোনা-গয়না, সাথে নিয়ে নেয়ার জন্যে। নির্দেশ অনুযায়ী ডাঃ আসহাবুল হক, ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহি, ক্যাপ্টেন মাহবুব এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের প্রচেষ্টায় আনুমানিক সাড়ে চার কোটি টাকা ও আধ মণ সোনা আমরা সাথে নিয়ে যাই। স্থানীয় যত গুদামে চাউর ও আটা ছিল সবগুলো আমাদের গাড়ীতে উঠিয়ে নেই।

১৮ই এপ্রিল সকাল বেলা ঐ সীমান্তে ক্যাপ্টেন আজমের নেতৃত্বাধীনে এক কোম্পানী সৈন্য রেখে বাকী ও সদর দপ্তর নিয়ে আমি চলে যাই বেনাপোলে এবং সেখানে স্থাপন করি আমার সদর দপ্তর। ঐ দিনই আমি বেনাপোল ও যশোর রোড এবং তার দক্ষিণাঞ্চলের কর্তৃত্বভার প্রত্যক্ষভাবে নিজের অধীনে নিয়ে বেনাপোল থেকে পূর্বদিকে কাগজপুকুর এলাকায় আমার প্রতিরক্ষা ব্যূহ গঠন করি। ২০শে এপ্রিল সকাল ১০টায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবনিযুক্ত সেনাপতি কর্নেল এম, এ, জি, ওসমানী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) বেনাপোল আমার সদর দপ্তর পরিদর্শনে আসেন। বেনাপোলে তাকে যথাযথভাবে সামরিক সালাম দেওয়া হয়। আমি সেনাপতিকে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিই এবং আমার সামরিক সরঞ্জামাদি অভাব সম্বন্ধে তাকে অবগত করাই।

বেনাপোল থেকে পূর্বদিকে কাগজপুকুর এলাকায় আমার প্রতিরক্ষাব্যূহ স্থাপন করি বটে কিন্তু প্রথাগত প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জামাদি যে আমার ছিল না, তা পূর্বেই বলেছি। এই প্রতিরক্ষাব্যূহের সবচেয়ে মারাত্মক দুর্বলতা ছিল যে প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের সাপোর্টিং অস্ত্রশস্ত্র ছিল না এবং ফিল্ড অয়ারলেস বা ফিল্ড টেলিফোন এবং ডিগিং যন্ত্রপাতির মারাত্মক অভাব। এতসত্ত্বেও ২টি কোম্পানী ইপিআর সৈন্য নিয়ে আমি এই প্রতিরক্ষাব্যূহ যতায়ত্ন সম্ভব পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করি। আমার কাছে মাত্র ২টি ও ইঞ্চি মর্টার ও কিছুসংখ্যক গোলা ছিল, সেগুলো আমি রিজার্ভে রেখেছিলাম স্থান ও কালভেদে প্রয়োজনমত ব্যবহার করার আশায়। এই প্রতিরক্ষাব্যূহে আমার সাথে ক্যাপ্টেন তৌফিক, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন (বর্তমান মেজর) ও ডাঃ আসহাবুল হক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান (বর্তমান মেজর) ১০ই এপ্রিল ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে আমার সাথে যোগদান করেন। প্রথম বঙ্গশার্দ্দুল থেকে পালিয়ে আসা ১৫০জন সৈন্য নিয়ে হাফিজকেও বেনাপোল কাস্টম কলোনীর দক্ষিণ ভাগে রিজার্ভ বাহিনী হিসাবে পজিশন নেবার জন্য নির্দেশ দিই।

২৩শে এপ্রিল সকাল ১০টায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় তাজউদ্দিন আমার সদর দপ্তর বেনাপোলে এসে উপস্থিত হন বাংলার মাটিতে বৃটিশ এম-পি মিঃ ডগলাস ম্যাককে স্বাগত জানানোর জন্য। দীর্ঘ ৩ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর বৃটিশ অতিথি আমার সদর দপ্তরে এসে মাননীয় তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে ১ ঘন্টাব্যাপী আলোচনা করেন। সুখের বিষয় এই যে, বৃটিশ এম-পি ভারত থেকে এসে বাংলায় পদার্পন করার সাথে সাথেই আমার সদর দপ্তরে উড্ডয়নরত বাংলার জাতীয় পতাকা দেখতে পান ও তার পতপত আওয়াজ শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হন আমাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনায়। মাননীয় অতিথি বিদায় নেবার ১ ঘন্টা পরে জনাব তাজউদ্দিন মুজিবনগরে চলে যান। তিনি বিদায় নেবার ঠিক ১৫ মিনিটের মধ্যে ২৩শে এপ্রিল বিকেল সাড়ে ৩ টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের উপর আঘাত হেনে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ কাগজপুকুর থেকে বেনাপোলের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত সঙ্কুচিত করতে বাধ্য করে। যাই হোক রাতারাতি আবার আমরা নতুন করে প্রতিরক্ষা পজিশন সংগঠিতকরে নিই।

২৪ শে এপ্রিল ভোর ৪টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২ ব্যাটালিয়ন সৈন্য সহকারে আমাদের পজিশন আক্রমণ করে। আমার বাম দিকের কোম্পানী পজিশনে প্রথম আক্রমণ করা হয়। ২ কোম্পানীর মধ্যে যোগাযোগের জন্য রানার ব্যতিরেকে আমার আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। অন্ধকারে এই কোম্পানীর সাথে তুমুল যুদ্ধ চলে। ভোর

৬ টায় একটা ১ টন ডজ গাড়ীতে করে ৩ ইঞ্চি মর্টারগুলো পাঠিয়ে দিই তাদের সাহায্যার্থে। তার কিছুটা অগ্রসর হয়ে সুবিধাজনক স্থানে পজিশন নিয়ে শত্রুর উপর মুহূর্মুহ গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এমন সময় শত্রুর আক্রমণের চাপে আমার ভাইটাল পজিশন থেকে এমজিওয়ালা তার এমজি সহকারে পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ঠিক সে সময় পূর্বতন হাবিলদার-মেজর তখনকার নায়ক সুবেদার মুজিবল হক সেখানে উপস্থিত হয় এবং তার কাছ থেকে এমজি ছিনিয়ে নিয়ে ঐ ভাইটাল পজিশন তেকে ক্ষিপ্ত গতিতে অগ্রগামী শত্রুর উপর সুইপিং ফায়ার চালাতে থাকে। সুবিধা ছিল এই যে শত্রুর অবস্থান ছিল তখন খোলা এবং নিচু জায়গায়। মুজিবল হকের এই তীব্র আক্রমণে শত্রুপক্ষের অধিকাংশ সৈন্য ধরাশায়ী হয় এবং তাদের আক্রমণ প্রায় ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়।

ওদিকে পাকিস্তান বাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন আমার ডানদিকের কোম্পানীর উপর আক্রমণ চালায় সকাল ৬ টায়। তারা এসেছিল ইপিআর পোশাক পরে। কাজেই, প্রথমতঃ আমার ইপিআর বাহিনী ধোঁকা খেয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই তারা এই চালাকি বুঝতে পেরে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা চালায়। ওদিকে মুজিবল হকের একক অথচ তীব্র এমজি'র সুইপিং ফায়ারে যখন শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত প্রায়, তখনই ডানদিক থেকে ইপিআর পোশাকের বেশে ১ প্লাটুন শত্রুসৈন্য তার দিকে অগ্রসর হয়। মুজিবল হক তাদেরকে দেখতে পেয়েও ইপিআর বাহিনী ভ্রমে তাদের উপর ফায়ার করেনি। এটাই হল তার ও আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। প্রকৃত এম-জি ম্যান ল্যান্স-নায়ক বার বার মুজিবল হককে হুঁশিয়ার করা সত্ত্বেও সে ইপিআর বাহিনী বলে শত্রুর উপর ফায়ার করতে অস্বীকার করে কিন্তু মিনিট পরেই এই ইপিআর-বেশী শত্রুপ্লাটুন তার উপর হামলা চালায়। শত্রুর এল-এম-জি'র বুলেট মুজিবল হকের বক্ষ ভেদ করে তক্ষণই তার জীবন শেষ করে দেয় (ইন্না রাজেউন)। এল-এম-জি ম্যান হামাণ্ডি দিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। নায়ক সুবেদার মুজিবল হকের অপারিসমী সাহস, কৃতিত্ব ও আত্মত্যাগের ঋণ বাংলার জনসাধারণ কোনকালেই শোধ করতে পারবে না। প্রতক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, মুজিবল হকের এম-জি সহকারে তীব্র যুদ্ধে আনুমানিক ১৫০ জন শত্রুসৈন্য নিহত হয়, যার জন্য সাময়িকভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত হয়। ইত্যবসরে, আমার বামদিকের কোম্পানী মুজিবল হকের ফায়ারের আড়ালে থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম হয়। ওদিকে ডানদিকের কোম্পানীও সাপোর্ট ফায়ারের অভাবে ক্ষণিক যুদ্ধের পর সীমান্তবর্তী এলাকায় অপসারণ হয়। দুঃখের বিষয়, মুজিবল হকের পতনের সাথে সাথেই আমার মর্টার বাহিনী মর্টার গুটিয়ে গাড়ীতে করে পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা করে কিন্তু অল্প দূরে শত্রুসৈন্যের অবস্থান লক্ষ্য করে ড্রাইভার গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাস্তার আড়ালে হামাণ্ডি দিয়ে পিছনে পালিয়ে যায়। উপায়ন্তর না দেখে মর্টার বাহিনীর কমান্ডার মোমিনুল হককেও একই পদ্ধতিতে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। গাড়ী ও মর্টার শত্রুর হস্তগত হয়।

এদিকে সীমান্ত এলাকাকে আমার বাহিনী প্রাণপণে শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকে। সমস্ত দিন গোলাগুলির পরেও শত্রুসেনারা আমার বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারেনি। এবং আমার সদর দপ্তরে উড্ডয়নরত বাংলার জাতীয় পতাকার পতপত ধ্বনিকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা কোন দিন স্তব্ধ করতে পারেনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত ঐ পতাকা উড্ডয়নরত থাকে।

চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মেজর এ, আর, আজম চৌধুরী

২৬-৩-৭৩

আমি তখন চুয়াডাঙ্গা ইপিআর ৪ নং উইং-এ একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে কাজ করছি। ২৩শে মার্চ আমাদের সীমান্ত পরিদর্শনে যাই। ফিরি ২৫ শে মার্চ রাত সাড়ে এগারোটার দিকে। মেজর ওসমান চৌধুরী ২৫ শে মার্চ কুষ্টিয়া গিয়েছিলেন, ২৬ শে মার্চ বেলা ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গাতে আসেন।

যশোর ইপিআর হেডকোয়ার্টার থেকে ইপিআর মেজর চুয়াডাঙ্গাতে যান আমাদের সকল অফিসারকে আনবার জন্য কনফারেন্সের নাম করে ২৫ তারিখ সকাল ১০টার দিকে।

রাতে ফিরে শুনলাম যশোরের মেজর চুয়াডাঙ্গায় অবাস্তালী ক্যাপ্টেন মোঃ সাদেকের বাসায় আছেন। ২৬ শে মার্চ সকাল সাড়ে ছ'টার দিকে মেজরসহ ক্যাপ্টেন সাদেক ও তার পরিবার আমার বাড়িতে আসে। আমি বাথরুমে ছিলাম। বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেজর বললো 'এতনা জলদী আগিয়া'? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাজ শেষ হয়ে গেছে।' আমি মেজরকে দুপুরের খানা খেয়ে যেতে বললাম। অবাস্তালী মেজর রাজী হল না।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর হতে আমাদের কাছে চিঠি আসে কত পাঠান এবং পাঞ্জাবী পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে আছে তার একটা তালিকা পাঠাতে। আমরা পৃথক পৃথক ভাবে সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সে তালিকা পাঠিয়ে দেই। ২৬ শে মার্চ সকালে ক্যাপ্টেন সাদেকের স্ত্রী আমার আন্নার সাথে কান্নাকাটি করলেন। কিছুতেই যেতে চাচ্ছিলেন না। তিনি শেষবারের মত বললেন, ঢাকাতে যদি থাকি তো আবার দেখা হবে। ক্যাপ্টেন সাদেকের ফ্যামিলিকেই একেবারেই শেষে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

আমি সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে যাই এবং ইপিআর সুবেদার আমাকে বললো যে, পাঞ্জাবী মেজর এখানে সকল পাঞ্জাবী এবং পাঠানদের ডেকে পাঞ্জাবীতে কি বলে গেছে। আমার তাতে সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো।

২৬ শে মার্চ সকালে আমাদের অফিসে অয়ারলেসের মাধ্যমে জানলাম ঢাকা পিলখানা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনকে পাক আর্মি ট্যাঙ্ক দিয়ে আক্রমণ করে ধ্বংস করতে চলেছে-খবর আসল ৮/৯ টার দিকে।

সকাল ৯টার দিকে হাবিলদার মুজিবর রহমান আমাকে এসে বলে যে, আমরা বিদ্রোহ করবো। আমি মুজিবরকে নিষেধ করি এবং বলি যে কোতের চাবি তুমি রেখে দাও, (কোতের চাবি আমি যখন সীমান্তে যাই তখন ওর কাছে দিয়ে গিয়েছিলাম) কোয়ার্টার গার্ডে যে পাঞ্জাবী আছে তাদের ছুটি দিয়ে দাও এবং সকল পাঠানদের উপর নজর রাখ। শহীদ মুজিবর আমাকে আরও খবর দেয় অবাস্তালীদের কার কার কাছে গুলি এবং অস্ত্র আছে। আমি বললাম আমার উর্ধ্বতন অফিসার মেজর ওসমান যখন বাঙালী তখন তাঁর আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।

আমি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি যাই। ১১/১২ টার দিকে মেজর ওসমান আসার সাথে সাথে আমরা স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলি এবং রাজকীয় মর্জাদা দিই। অবাস্তালী যত ছিল তাদের অস্ত্রহীন করে এক ঘরে বন্দী করে রাখি।

২৬শে মার্চ বেলা ১১ টার দিকে যশোর হেডকোয়ার্টার থেকে লেঃ কঃ মোঃ আসলাম (অবাস্তালী) যাত্রা করে চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে কিছু সৈন্য, দুটো গাড়ী এবং অয়ারলেসসহ। এই খবর আমরা যশোর ইপিআর ক্যাম্প থেকে পেলাম অয়ারলেসে। সঙ্গে সঙ্গে মেজর ওসমান আমাকে এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে পজিশন নিতে বলেন। যশোর হেডকোয়ার্টার হয়তো খবর পেয়েছে যে, আমরা বিদ্রোহ করেছি। লেঃ কঃ আসলাম বারবাজার পর্যন্ত এসে এই সংবাদ শুনে ফিরে যায়।

ইতিমধ্যে আমরা ভারতীয় সীমান্তের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ করি। ৭৬ বিএসএফ কমান্ডার লেঃ কঃ চক্রবর্তী এবং আইজি, ডিজি সবাই গেদেতে রয়েছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। আমাকে মেজর ওসমান বেলা চারটার দিকে গেদেতে যাবার জন্য বলেন। আমি রওনা হয়ে গেলাম। আমরা 'সাইফ-ওয়েস্ট-কমান্ড' হিসেবে পরিচয় দিয়ে কাজ করতে থাকি। বেলা পাঁচটার দিকে গেদে পৌঁছালাম। ভারতীয় অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমার পুরা ইউনিফর্ম ও আর্মসহ তিনজন গার্ড ছিল। আমাদের অভ্যর্থনা জানালো ভারতীয় বিএএফ ক্যাপ্টেন মহাপাত্র। ক্যামেরাম্যানরা আমার ছবি তুলবে বলে আমি গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে বর্ডার পার হই। আমি মেজর ওসমানের পত্র দিই। সেখানে একটি আর্টিলারী ব্যাটারী, এক

স্কোয়াড্রন ট্যাঙ্ক, এক ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন সৈন্য যশোর আক্রমণের জন্য চাইলাম। ভারতীয় প্রধান বললেন, আমরা সরাসরি সাহায্য করতে পারছি না, তবে গোপনে আপনাদের সাহায্য করবো এবং আপনাদের এই চাহিদা দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি আলোচনার জন্য। আমি আবার দেখা হবে বলে চলে আসি।

২৮ শে মার্চ থেকে ট্রেন চালু হয়ে যায় ভারত সীমান্ত থেকে। ইতিমধ্যে ভারতীয় নাগরিকরা সাবান, পেট্রোল, খাবার, ঔষুধপত্র ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস নিয়ে এসে আমাদের সাহায্য করতে থাকে।

২৬ শে মার্চ রাতে মেহেরপুরে এসডিও তৌফিক এলাহি সাহেব এবং বিনাইদহের এসডিপিও মাহবুবুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় কুষ্টিয়া সম্পর্কে। কুষ্টিয়াতে ইতিমধ্যে পাক সৈন্য চলে এসেছিল। কিভাবে আক্রমণ করা হবে এ বিষয়ে আমরা মত বিনিময় করি।

কুষ্টিয়াতে কত পাকিস্তানি সৈন্য আছে তা জানবার জন্যে ইপিআর ক্লার্ক বারি এবং আরো দু'একজনকে পাঠাই। কুষ্টিয়াতে কত সৈন্য ছিল তার সঠিক সংখ্যা পেলাম না। মেজর ওসমান আমাকে ২৯ তারিখে কুষ্টিয়া আক্রমণ করতে বললেন।

তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে কুষ্টিয়া আক্রমণ করার প্ল্যান হয়। একটি দল যায় ভেরামার তারাগঞ্জ হয়ে এবং দ্বিতীয় দল নিয়ে আমি নিজে চুয়াডাঙ্গা-পোড়াদহ হয়ে যাই। তৃতীয় দল যায় বিনাইদহ এবং কুষ্টিয়ার মাঝে তারাগঞ্জ দিয়ে। সার্বিক ভাবে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম আমি। আমরা প্রাথমিক অবস্থায় ২০০ জনের মত ছিলাম। পরাগপুর-ভেরামারার নেতৃত্ব দিচ্ছিল সুবেদার মজাফফর আহমদ।

২৯ তারিখে আক্রমণের কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে ওই তারিখে সম্ভব না হওয়ায় ৩০শে মার্চ ভোর পাঁচটার সময় আমরা এক সময়ে তিন ভাগ থেকে আক্রমণ চালাই। সারাদিন আক্রমণ চালাই।

৩১ শে মার্চ কুষ্টিয়া সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। ২৫০ জন পাক সৈন্য মারা যায়, কিছু ধরা পড়ে লেঃ আতাউল্লাহ তাদের মধ্যে একজন। আমাদের মুক্তিবাহিনীর ২জন মারা যায়, কিছু আহত হয়।

৩১ শে মার্চ সকাল ১০ টার দিকে পাক বাহিনীর বিমান এসে বোমাবর্ষণ করে প্রায় ১ ঘন্টা ধরে, কেউ মারা যায়নি। ঐ দিনই আমি টেলিফোন মারফত মেসেজ পেলাম আমাকে যশোরের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমি ১ লা এপ্রিল যশোরের দিকে রওনা হই।

৩১ শে মার্চ সকাল ৯ টার দিকে বিশখালীতে যে দল আমাদের ছিল তাদের সাথে যশোর থেকে আগত পাক বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। যশোর বাহিনী কুষ্টিয়ার দিকে যাচ্ছিল সাহায্যের জন্য। কিন্তু ব্রিজের ওখানে ব্যারিকেড থাকায় তারা যেতে পারেনি। ওখানে মুক্তি বাহিনীর ২ জন মারা যায় এবং ৩/৪ জনকে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। যশোর সেনানিবাস থেকে ৭ মাইল দূরে আমরা পজিশন নিই। মেজর ওসমানের নির্দেশক্রমে আমরা দূরে ঘাঁটি গাড়ি। কেননা ভারত থেকে ভারী অস্ত্রের অপেক্ষা করছিলাম। আমার হেডকোয়ার্টার ছিল বিনাইদহ। আমার একটি পেট্রোল ছিল মাগুরার এসডিও'র সহযোগিতায় লেবুতলায়। সুবেদার আব্দুল মুকিদ ছিল কমান্ডিং অফিসার। ৫/৬ ই এপ্রিল পাক বাহিনীর একটি সার্চিং পার্টি লেবুতলার দিকে নিয়ে আসে রেকি করতে। আমাদের দল তৈরী ছিল, কারণ আগে থেকেই আমরা জানতাম যেহেতু যশোর-কুষ্টিয়া রোডে আমরা আছি তাই অন্য দিকে নিশ্চয় গ্যাপ খুঁজতে আসবে। এ্যামবুশে পাক বাহিনীর ১৫/১৬ জন মারা যায়, একজন লেফটেন্যান্টসহ। আমরা বহু ম্যাপ, নোটবুক উদ্ধার করি। মর্টার ফায়ার করে পাক বাহিনী তাদের মৃত দেহ নিয়ে যায়।

ইতিপূর্বে ২৭/২৮ তারিখের দিকে লেঃ কঃ জলিলের (১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট) কাছে আমরা দু'বার মেসেজ পাঠাই আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য, কিন্তু তিনি রাজি হননি। তখন কর্নেল জলিল সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাসলিয়াতে ছিলেন।

৫নং খুলনা উইং-এ আমরা ২৭/২৮ তারিখেই খবর পাঠিয়েছিলাম বেনাপোলে জমায়েত হবার জন্য। নির্দেশ দিল, ইতিমধ্যে যদি কোন অবাকালী অফিসার তোমাদেরকে নিরস্ত্র করতে চায় তা হলে তাকে বন্দী অথবা হত্যা করবে।

ক্যাপ্টেন মোঃ সাদেক ২৭ শে মার্চ খুলনা বিওপিতে যায় নিরস্ত্র করবার জন্য। কিন্তু রক্ষী তাকে চ্যালেঞ্জ করলে ক্যাপ্টেন পিস্তল দিয়ে রক্ষীকে হত্যা করে। পরে বিওপির ভিতর থেকে গুলি করে পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেনকে হত্যা করা হয়। ক্যাপ্টেনের সঙ্গীরাও প্রাণ হারায়। সমগ্র যশোর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা আমাকে দেখতে হতো, ফলে কোথাও ২/৪ ঘন্টার বেশী অবস্থান করতে পারতাম না।

১০ই এপ্রিল ঝিকরগাছা যাই ৫নং উইং দেখবার জন্য। কিন্তু পাকবাহিনী তখন অগ্রসর হয়ে পথ বন্ধ করে ফেলে এবং সংঘর্ষ হয়। আমি ভারত সীমান্ত ঘুরে ১১ ই এপ্রিল বেনাপোল আসি।

১১ তারিখে ৭২ নং বিএসএফ -এর কর্নেল কে, বি, সিংহ বিএসএফ আইজি, ৫নং গার্ডস-এদের সাথে আলাপ-আলোচনা করি এবং গত কালের যুদ্ধের ঘটনা বলি। আমি দর্শনা হয়ে চুয়াডাঙ্গা আসি এবং মেজর ওসমানকে যুদ্ধের কথা বলি। ঝিকর গাছা থেকে ওই দিনই ঝিনাইগহে রাত ১০ টায় পৌঁছে যাই।

১২ই এপ্রিল বারবার থেকে ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহর মেসেজ পেলাম যে ওখানে ভীষণ আর্টিলারী এবং ভারী অস্ত্রের আক্রমণ চালাচ্ছে পাক বাহিনী। সে আমার কাছে মতামত চাইল। আমি তাকে কালিগঞ্জ চলে আসতে বলি এবং আমাদের বাহিনীকে কালিগঞ্জ এবং বারবাজারের মধ্যখানে থাকতে বলি। ওখানেও আমাদের বাহিনী বেশ কিছু অস্ত্র এবং সেনা হারিয়ে ফিরে আসে।

১৩ই এপ্রিল পাক বাহিনী কালিগঞ্জ দখল করে নেয়। ১৪ই এপ্রিল আমি চুয়াডাঙ্গা আসি। ১৪ই এপ্রিল পাক বাহিনী ঝিনাইদহ চলে আসে। ১৫ ই এপ্রিল আমরা মেহেরপুরে ঘাঁটি সরিয়ে নেই।

১৬ ই এপ্রিল মেহেরপুর থাকলাম। ঐদিন রাতে ইছাখালী বিওপিতে থাকি। ১৭ই এপ্রিল খুব ভোরে মুজিবনগরে বৈদ্যনাথতলা যাই মন্ত্রিপরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য। ইপিআর-এর একটি কোম্পানি নিয়ে গিয়েছিলাম। বিচ্ছিন্ন ইপিআর বাহিনী সব বেতাইয়ে একত্র হয়। সমস্ত এপ্রিল মাসটা সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। মে মাস থেকে কোম্পানী ভাগ করে দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া-যশোরের সমস্ত প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মোহাম্মদ তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী

১৪-১০-৭৩

২১/২২/২৩ শে মার্চ আমরা নিম্নলিখিত কয়েকজন অফিসার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য তদানীন্তন এসডিপিও জনাব মাহবুবউদ্দিন আহমেদের বাসায় (ঝিনাইদহে) একত্রিত হইঃ ১। তৌফিক এলাহি, এসডিও, মেহেরপুর, ২। কামালউদ্দিন সিদ্দীকী, এসডিও, নড়াইল, ৩। ওয়ালিউল ইসলাম, এসডিও, মাগুরা, ৪। শাহ মোহাম্মদ ফরিদ, এসডিও, গোয়ালন্দ।

আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে একটা সামরিক সংঘর্ষ অবধারিত। এই বৈঠকে নিজ নিজ এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমি আমার এলাকায় সমস্ত থানার পুলিশদের প্রস্তুত রাখি।

২৫ শে মার্চ রাতে নূরুল হক এম-পি আমাকে টেলিফোনে জানালেন যে, ঢাকায় পাক সেনা বাহিনী শহরে বের হয়ে পড়েছে এবং জনগণের উপর আক্রমণ চালিয়েছে।

আমি তাকে আমার বাসায় অবিলম্বে আসতে অনুরোধ করি। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম যে, ঢাকা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কুষ্টিয়াকে ঢাকায় সেনাবাহিনীর আক্রমণের খবর জানিয়েছেন এবং কুষ্টিয়া এক্সচেঞ্জ মেহেরপুরে এই খবর জানিয়েছে প্রথমে কুষ্টিয়ার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যোগাযোগ তার আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একজন অজ্ঞাতনামা অপারেটর রাজারবাগ থেকে উত্তর দেয়, ‘যা বলার বলেছি ত, আর বিরক্ত করবেন না।’ আবার অনুরোধ করার পর আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

২৫ শে মার্চ রাত বারটায় মাইকে কুষ্টিয়া শহরের জনগণকে ঢাকাতে পাক বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা জানিয়ে দেয়া হল। সেই মুহূর্তে থেকে আমি আর পাকিস্তানী সরকারী কর্মচারী রইলাম না। এবং জনগনের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলাম।

২৫শে মার্চ রাতে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা পাকাসড়কে গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরী করা হয় এবং মেহেরপুরকে চুয়াডাঙ্গার সাথে বিচ্ছিন্ন করা হয়। মেহেরপুর কুষ্টিয়া রাস্তায় খলশাকুভী কাঠের পুল ভেঙ্গেচুরে দেয়া হল। এক দল যুবক এই পুলটা ভেংগে দিয়েছিল।

মেহেরপুরে আনসার কমান্ডারকে আমি আদেশ দিই ২৬শে মার্চের মধ্যে মেহেরপুর মহকুমার সমস্ত আনসার ও মুজাহিদকে একত্রিত করার জন্য।

২৬শে মার্চ ভোর বেলা। আমার ধারণা হয়েছিল মেহেরপুরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আমার মনে হল সমস্ত জনতার মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে এবং প্রত্যেকে তার একক সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে এক সম্মিলিত সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা এবং এর অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের শক্তি এই জনতার মধ্যে নবরূপান্তরিত সত্তার মধ্যে নিহিত ছিল। প্রত্যেকটা লোক এবং প্রত্যেকটা ছেলে আমার কাছে নতুনভাবে ধরা দিয়েছিল। গায়ের বধূরা পর্যন্ত এই স্বঃস্বঃহর্ত গণজাগরণে অঙ্গাঙ্গীভাবে একাত্মতা অনুভব করেছিল। সেই মুহূর্তে আমি যেন দিব্যচক্ষু পৃথিবীর বড় বড় বিপ্লবকে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম।

সমগ্র পরিস্থিতির আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের যে কোন জায়গা থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। এবং শুধুমাত্র ভারতই আমাদের এই সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ভারত-পাকিস্তানের ঐতিহাসিক বিরোধের পটভূমিকায় এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, বাংলাদেশের যে কোন সামরিক বা গণঅভ্যুত্থান ভারতের সমর্থন পাবেই। তাই ২৬ শে মার্চ সকালে আমি দু’রকম চিঠি ভারতে পাঠাই। একটা চিঠি পাঠানো হয়েছিল নদীয়া জেলা প্রশাসকের কাছে, যার একটা অনুলিপি পাঠাই লেফটেন্যান্ট কর্নেল চক্রবর্তী (সিও ৭৬ বিএসএফ, বা মেহেরপুর সীমান্তের ভারতে মোতায়েন ছিল) এর কাছে। দ্বিতীয় চিঠি ভারতবর্ষের জনগণকে উদ্দেশ্য পাঠাই। দুটো চিঠিতেই আমি আমার দস্তখত এবং সরকারি সিলমোহর ব্যবহার করি। দ্বিতীয় চিঠিটা ‘অমৃত বাজার’ এবং ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২৭/২৮/২৯/৩০ মার্চ- এর সংখ্যাগুলোতে। ‘ডেস্টিনেশন মুজিবনগর’ বইটিতে একটা চিঠির ফটোস্টেট কপি মুদ্রিত হয়েছে।

প্রথম চিঠিটা নদীয়ার জেলা প্রশাসক মিঃ মুখার্জীর কাছে লেখা হয়েছিল। কর্নেল চক্রবর্তী আমাকে বলেছিলেন যে এই চিঠিটা দিল্লীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনতিবিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তারই ফলস্বরূপ ২৯ শে মার্চ বেতাই (ভারতে) বিওপিতে আমাকে দেখা করার খবর পাঠানো হয়।

২৯শে মার্চ আমি বেতাই বিওপিতে যাই নদীয়া জেলা প্রশাসক এবং কর্নেল চক্রবর্তী আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় বিএসএফ-এর একটি ছোট দল গার্ড অব অনার প্রদর্শন করে। আমি এবং কর্নেল চক্রবর্তী গার্ড অব অনার পরিদর্শন করি। নদীয়া জেলা প্রশাসক আমাকে আনঅফিসিয়াল দূত হিসেবে মর্যাদা দেন।

আমাদের বৈঠক এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। আপ্যায়নের মাধ্যমে মিঃ মুখার্জী আমাকে জানান যে, আমার চিঠির উত্তরে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া আমাকে শীঘ্রই জানানো হবে এবং তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাদের সংগ্রামে ভারতের জনগণের ও সরকারের সমর্থন জানান এবং চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে চেংখালী চেক পোস্টের অদূরে ভারতীয় বিওপিতে কোন একজন সামরিক অফিসারকে সাথে নিয়ে দেখা করি আমাদের সামরিক প্রয়োজন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করার জন্য। ইতিমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় তদানীন্তন ইপিআর এর উইং কমান্ডার মেজর ওসমানের সাথে আমার যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

৩০শে মার্চ সকালে মেহেরপুর থেকে ১৮ মাইল দূরে চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমানের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে যাই। চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান কুষ্টিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তিনি পরামর্শ দেন যে আমি মাহবুবউদ্দিন আহম্মদ (তদানীন্তন বিনাইদহের এসডিপিও)-কে সাথে নিয়ে যাই। আমি মাহবুবকে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু অল্প সময় পরে হঠাৎ সে মেজর ওসমানের চুয়াডাঙ্গা অফিসে আবির্ভূত হয়। মাহবুবকে আমি ভারতীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করি এবং তাকে বলি ঐ দিন সন্ধ্যায় ভারতের চেংখালী চেকপোস্ট বিপওপিতে কিছু সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নিতে আমার সাথে আসতে এবং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাথে বিশদ আলোচনা করতে। আমি তখন অত্যধিক উত্তেজিত ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম মাহবুবও কম উত্তেজিত ছিল না। কারণ একটু পরে বুঝতে পারলাম মাহবুব আমাকে অদূরবর্তী একটি জীপের কাছে নিয়ে চলল এবং খুব গোপনে বলল (মেজর ওসমান ও এ ঘটনা সম্বন্ধে তখন অবহিত ছিলেন না) যে, ঐ জীপের বিতরে ২ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বসে আছেন এবং তারা হচ্ছেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম (বর্তমান খাদ্য প্রতিমন্ত্রী)। আমরা দু'জনে জীপের ভেতরে প্রবেশ করলাম। শার্ট এবং লুঙ্গি পরিহিত এবং পুঁটুলি হাতে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত এই দুই ব্যক্তিই অবশ্য পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

আলাপ-আলোচনার পর বুঝতে পারলাম তাঁরা বিভিন্ন জনপদ ঘুরে বিনাইদহে এসেছেন এবং সেখান থেকে মাহবুব তাদেরকে মেহেরপুরে নিয়ে আসে এই উদ্দেশ্যে যে, তাদেরকে যেন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছানো যায়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ এবং আক্রমণকে পরাভূত করে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য বন্দু প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাহায্য এবং সহযোগিতার ব্যকস্কা করা। সত্যি বলতে কি, তাঁদের এই বৃহত্তর প্রচেষ্টার তাৎপর্য আমি তখনো উপলব্ধি করতে পারিনি। সিদ্ধান্ত হল যে, ভারত সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈঠকে মিলিত হবে। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সীমান্তের অপর দিকে যাবার ব্যবস্থা করা হবে। শর্ত হল একটা, আমরা যাদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি তাদের কাছে এই দুই জনের পরিচয় গোপন রাখব। তারা জানতে চাইলে আমরা বলব, এই দুই ব্যক্তি আমাদের পরিচিত।

বিকালে সীমান্তের উদ্দেশ্যে দুটো জীপ রওয়ানা দেয়। পথে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমরা ব্যারিকেড সরিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমাদের গাড়ীতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড্ডীয়মান ছিল। রাস্তার দু'পাশে জনতা মুহূর্মুহু জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে আমাদেরকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল। এই দুটো জীপ গাড়ী যেন তাদের কাছে স্বাধীনতার শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছিল। এরা অনেকেই আমাদেরকে চিনত। গ্রামবাসীরা বুঝতে পেরেছিল যে আমরা কোন গোপন মহৎ সামরিক উদ্দেশ্যে সীমান্তে ঘোরাফেরা করছি। পথে পথে দেখতে পেলাম স্বতঃস্ফূর্ত জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল, অস্ত্র বলতে হয়ত একটা দুটো শটগান। তখনই এদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের নিউক্লিয়াস, এবং আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে

ভবিষ্যত প্রস্তুতি, সামরিক প্রতিরোধ এবং সংঘর্ষে জনশক্তি এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ দলবদ্ধ জনতাই জোগাবে।

সন্ধ্যার পরে পরে আমরা চেংখালী চেকপোস্ট পৌঁছালাম। বড় বড় শিরিষ গাছের সারি দু'পাশ থেকে রাস্তার উপরে একটা ছাতার মত আবরণ সৃষ্টি করেছিল। কোন লোকালয় জনপদ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, চারদিক পরিবেশ ধু-ধু খাঁ খাঁ করছিল। শুক্রপক্ষের ম্লান চাঁদের আলো পরিবেশকে আরো গভীরতর করে তুলেছিল। পিছনে গাড়ী দুটো রেখে আমি এবং মাহবুব ধীরে এবং সতর্কতার সাথে অপরিচিত গন্তব্যস্থানের দিকে আস্তাজের উপর ভর করে এগুচ্ছিলাম। বারবার আমাদের গায়ের লোম শিউরে উঠছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর সামনে একটা পাকা ঘরের ধ্বংসস্তুপ দেখতে পেলাম, আমরা বুঝতে পারছিলাম না আমরা কোথায় যাচ্ছি। হঠাৎ সেই ভুতুরে ধ্বংসস্তুপ থেকে যেন এক অশরীরী আত্মার আওয়াজ শুনতে পেলাম-‘হলট’। যদিও আমরা একটু ভড়কে গিয়েছিলাম তবুও অনতিবিলম্বে ঝোপের আড়াল থেকে একটা মানুষের ছায়া বের হয়ে আসল। এবং সেটা ছিল ভারতীয় বিএসএফ-এর একজন সিপাহী, আমাদের পরিচয় দেবার পর সে আমাদেরকে তাদের বিওপিতে নিয়ে চলল। আরো আধা মাইল চলার পর আমরা বিওপিতে পৌঁছালাম এবং আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন বিএসএফ-এর উচ্চপদস্থ কর্মচারী জনাব গোলাম মজুমদার এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল চক্রবর্তী। আনুষঙ্গিক আলোচনার পর দুটো সিদ্ধান্ত নেয়া হলঃ ১। আমাদেরকে আগামীকাল থেকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হবে এবং ২। ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে হবে এবং যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালাতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করার। তখনো তারা জানতেন না যে আমাদের সাথে জনাব তাজউদ্দিন এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম রয়েছেন।

আমি এবং মাহবুব নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করলাম যে, আমাদের সাথে যে তাজউদ্দিন রয়েছেন তা গোলক মজুমদারকে জানাব এবং গোলাম মজুমদারকে জানালাম। গোলক মজুমদার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাড়াতাড়ি কাজউদ্দিন সাহেবকে তার কাছে নিয়ে আসতে বললেন। আমরা তাজউদ্দিনকে তার কাছে নিয়ে আসলাম। তারা একে অপরকে আন্তরিকভাবে করমর্দন এবং আলিঙ্গন করলেন। গোলক মজুমদার আমাদেরকে বলেছিলেন যে, কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে একটি সামরিক জেট বিমান অপেক্ষা করছে। যদি কোন রাজনীতিবিদ আসে তাকে যেন তক্ষুণি দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হয়ত ঐ প্লেনেই জনাব তাজউদ্দিন একং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম দিল্লীতে গিয়েছিলেন।

রাতে আমরা এক সাথে খাবার খাই। গোলক মজুমদার, তাজউদ্দিন এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে নিয়ে যান। এবং চুয়াডাঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করি।

এই রাতে সাক্ষাৎকারের পর থেকে ভারত থেকে আমরা কমবেশী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং জ্বালানি পেতে থাকি। আমি নিজে প্রায় এক পক্ষকাল ধরে এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ভারত থেকে নিয়ে আসতাম। এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র চেংখালী চেকপোস্টের বিপরীত দিকে ভারতীয় বিওপি থেকে নিয়ে আসতাম। আমি প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায় ভারত সীমান্ত অভিমুখে চুয়াডাঙ্গা থেকে যাত্রা করতাম। সাথে থাকত ইপিআর এর দুটো এসকর্ট পেট্রল, কয়েকটা ট্রাক এবং কোন কোন সময় দর্শনা চিনিকলের ট্রাক্টর এবং তার সাথে লাগানো ট্রলী। এই অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করার সময় আমি ভারতীয় কাগজপত্রে দস্তখত করে নিতাম এবং মেহেরপুরের এসডিও-র সরকারী সীলমোহর ব্যবহার করতাম।

মধ্যরাত্রে দিকে আমরা ভারতীয় বিওপিতে পৌঁছাতাম এবং চুয়াডাঙ্গায় ফেরত আসতে আসতে অধিকাংশ সময়েই ভোর হয়ে যেত। এই সময় এক নাগাড়ে আমি দশ দিন বিছানায় গা লাগাতে পারিনি। অস্ত্রশস্ত্র দেবার সময় অনেক সময় কর্নেল চক্রবর্তী থাকতেন এবং সব সময় ক্যাপ্টেন মহাপাত্র থাকতেন।

এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ থেকে আমরা অস্ত্রশস্ত্র বেতাই বিওপি (যা মেহেরপুর মহকুমার সংলগ্ন ছিল) থেকে সংগ্রহ করতাম।

২৫ মে মার্চ রাতে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং কুষ্টিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। কুষ্টিয়া এবং চুয়াডাঙ্গার খবরাখবর আমরা নিতে থাকি। আমরা খবর পাই যে চুয়াডাঙ্গায় অবস্থিত ইপিআর বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং মেজর ওসমান চুয়াডাঙ্গায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, চুয়াডাঙ্গার সাধারণ ইপিআর এর জোয়ানরা সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছে। চুয়াডাঙ্গার এই সিদ্ধান্তে ইপিআর-এর সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে ভূমিকা এবং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের এই সাহসিকতা এবং দেশপ্রেম বাংলাদেশের এই এলাকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত। চুয়াডাঙ্গায় অবস্থিত ইপিআর এর ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরীর ভূমিকা এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেজর ওসমান কুষ্টিয়া থেকে ২৭/২৮ শে মার্চ চুয়াডাঙ্গায় আসেন এবং তিনিও এই সিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান। দুইজন সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে থাকি পোশাক পরিহিত এবং সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই ইপিআর বাহিনী কুষ্টিয়া জেলা, পাবনা জেলার বহুলাংশ, যশোরের কিয়দংশ এমনকি ফরিদপুরের গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত বাংলার সাধারণ জনগণের চোখে স্বাধীনতার সূর্যসৈনিক হিসেবে প্রতীয়মান ছিল। আজো শহীদ হাবিলদার মেজর মুজিবর রহমান, সুবেদার মুজাফফর, সুবেদার মুকিত এবং আরো অনেক চেনা মুখের কথা বার বার মনে পড়ছে। সেই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে এরা আমার জন্যও আশার প্রতীক হিসেবে প্রোজ্জ্বল ছিলেন।

দু'একদিনের মধ্যেই চুয়াডাঙ্গার সাথে মেহেরপুরের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং আমি মেজর ওসমানের সাথে চুয়াডাঙ্গায় সাক্ষাৎ করি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু তাকে অবহিত করি। মেজর ওসমান আমাকে প্রয়োজনীয় সামরিক অস্ত্রসস্তার সম্বন্ধে ধারণা দেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গোয়ালন্দের তৎকালীন এস, ডি, ও জনাব মোহাম্মদ ফরিদ সস্ত্রীক মেহেরপুরে বেড়াতে এসে আটকা পড়ে যান। তাকে মার্চে ২৭/২৮ তারিখে গোয়ালন্দে ফেরত যাবার বন্দোবস্ত করি। জনাব ফরিদ তার স্বীয় মহকুমায় এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য অত্যধিক উৎসাহ দেখান এবং এই দুর্যোগের সময় গোয়ালন্দে ফেরত যান। তিনি পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং অমানুষিক ভাবে নির্যাতিত হন। তিনি ১৯৭১ এর ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান।

চুয়াডাঙ্গাতে ইতিমধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত এবং কর্মসূচী নেয়া হয়েছিলঃ ১। ইপিআর উইং হেডকোয়ার্টার চুয়াডাঙ্গা এবং তার অধীনস্থ সমস্ত বিওপিতে অব্যাহত ইপিআরকে নিরস্ত্র করা, ২। কুষ্টিয়া জেলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোতায়েন সম্বন্ধে বিশদ খবরাখবর সংগ্রহ করা, ৩। কুষ্টিয়ার উপর একটা আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা। এই মিশনে এর জনশক্তি যোগাবে একদিকে ইপিআর, অন্যদিকে আনসার মুজাহিদ এবং সাধারণ ছাত্র জনতা। আক্রমণ এবং অবরোধ মোটামুটি ত্রিমুখী হবে। একদিকে জনাব মাহবুবউদ্দিন আহম্মদ ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া রাস্তা অবরোধ করবেন এবং ইপিআর আনসার মুজাহিদদের একটি দল কুষ্টিয়া অভিমুখে অগ্রসর হবে। অন্য দিকে মেহেরপুর থেকে ইপিআর, মুজাহিদ, আনসারের একটি দল অভিমুখে যাবে। অপরদিকে প্রাগপুর-ভেরামারা-কুষ্টিয়া থেকে ইপিআর বাহিনী কুষ্টিয়া অভিমুখে অগ্রসর হবে। এই সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী।

প্রথমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে এই আক্রমণ ২৯ শে মার্চ ভোর পাঁচটার সময় শুরু করা হবে। পরে এই সিদ্ধান্ত ২৪ ঘন্টা পিছিয়ে দেয়া হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের অনধিক দুই কোম্পানী সৈন্য কুষ্টিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো পাহারা দিচ্ছিল। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেকি এবং সাপোর্ট ব্যাটালিয়নের একটি অংশ ছিল। এদের ফায়ার, পাওয়ার, মোবিলিটি এবং কমিউনিকেশন পাকিস্তানের অন্যান্য সাধারণ পদাতিক

ব্যাটালিয়নের চেয়ে অনেক বেশি। শহরের উপকণ্ঠে, অনেকটা অবরোধের মত, প্রথমে মুক্তি বাহিনীকে যার মধ্যে ইপিআর রা ছিলেন মূলশক্তি- মোতায়ন করা হয়। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল পুরানো ৩০৩ রাইফেল এবং কিছু পুরনো এসএমজি। ইপিআর ছাড়া আনসার এবং মুজাহিদদের কাছে ১০ রাউন্ড বা অনূর্ধ্ব ২০ রাউন্ডের মতো গুলি ছিল।

৩০শে মার্চ সকালে অবরোধের স্থানগুলো থেকে যুগপৎভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানের উপর অতর্কিতে গুলিবর্ষণ শুরু করা হয় এবং সাথে সাথে আমাদের প্রত্যেকটি অবস্থানের পিছনে সমবেত হাজার হাজার লোক গগন বিদারী আওয়াজে “জয় বাংলা” ধ্বনি তোলে এবং শ্লোগান দিতে দিতে মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসর হতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই অতর্কিত আক্রমণে, জনতার এই আকাশফাটা চিৎকারে এবং রাইফেল ছাড়াও কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের আওয়াজে দিশেহারা এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা তাদের কল্পনাতীত ছিল যে, বাঙ্গালী ইপিআর-এর জোয়ানরা ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তাদের নিজেদেরকে সংগঠিত করে সুসজ্জিত বিক্ষিপ্ত দলগুলো এই আক্রমণের মুখে তাদের কুষ্টিয়া সেনাবাহিনী সদর দফতরের দিকে পিছিয়ে পড়তে থাকে। তাদের এই পশ্চাদপসরণে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও মনোবল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য এই আক্রমণ ছিল সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিজনক। কারণ, তারা বুঝতে পারেনি কারা কোথা থেকে তাদের উপর এই আক্রমণ চালাচ্ছে এবং কেন? এই পশ্চাদপসরণই তাদের জন্য কাল হল। কারণ প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে সাথে তাদের মনোবল ভেংগে যাচ্ছিল এবং আমাদের মনোবল উত্তোরস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এভাবে যুদ্ধ সারাদিন চলতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে তারা তাদের অবস্থান থেকে পুল আউট করে কুষ্টিয়া জেলাস্কুল এবং সার্কিট হাউসে একত্রিত হতে থাকে। এবং এটাই তাদের জন্য কাল হয়। আমরাও তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। আমাদের অবরোধের তিন দিক থেকে জেলা স্কুল এবং সার্কিট হাউস ঘিরে ফেলে, যদিও তখন পর্যন্ত কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ রাস্তার কয়েক মাইল জনশক্তির অভাবে আমাদের আয়ত্ত্বাধীন ছিল না। পরে অবশ্য আমরা এই দল থেকে বন্দী লেফটেন্যান্ট আতাউল্লাহর কাছ থেকে জানতে পারি যে, মেজর শোয়েব এবং অন্যান্য অফিসাররা রিইনফোর্সমেন্ট-এর জন্য বার বার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন যশোহর সদর দফতরকে। কিন্তু যশোহর সদর দফতর তাদেরকে কোন সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছিল না। এতে তথাকথিত দুর্ধর্ষ ২২ এফএফ একেবারে হুঁড়ুরের মত হয়ে যায়। তারা পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করে। ৩১শে মার্চ থেকে তারা পলায়ন করতে শুরু করে।

মুক্তিবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে আনুমানিক ২০ জন পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়েছিল। বাকি দুই কোম্পানির অনধিক সৈন্য সবাই জনতার সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুষ্টিয়া হতে ঝিনাইদহের পথে একটা পুলের উপর মুক্তিবাহিনী একটা বিরাট খাদ খনন করে ক্যামোফ্লেজ করে রেখেছিল। মেজর শোয়েব এবং ২২ এফএফ-এর কিছু অফিসার এবং সৈনিক গাড়ীতে করে যশোহরের দিকে পশ্চাদপসরণ করার সময় এই খাদে পড়ে যায় এবং তারপর যারা বাঁচতে পেরেছিল তারা পাশ্ববর্তী গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার সাধারণ মানুষের এই সময়কার সাহসিকতা পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। তাদের স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলার গ্রামের আবা-বৃদ্ধবণিতা সমষ্টিগতভাবে রুখে দাঁড়ায়। এই সংঘর্ষে যদিও অনেক সাধারণ বাঙ্গালী নিহত হয় তবুও ২২ এফএফ-কেউ যশোহর ফিরে যেতে পারেনি। কড়াল, কাস্তে বা কোন সময় একেবারে খালি হাতে কোন সময়বা গাছ থেকে অতর্কিতে সাধারণ জনগণ এদের মোকাবিলা করে। আমরা ১লা এপ্রিল থেকে অনবরত এই গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেতে থাকি যা তারা পাক সেনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

আজো একটি কিশোরের কথা মনে পড়ে, যে একটা শর্টগান নিয়ে তিনজন পাকসেনাকে অনুসরণ করে, যাদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছিল। সে নিজের বুদ্ধিবলে শর্টগান দিয়ে তিনজন পাকসেনাকে খতম করে এবং ওদের অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কাছে জমা দেয়। পরে কুষ্টিয়া মুক্তিবাহিনীর দখলে আসার পর আমাদের দখলীকৃত অস্ত্রসম্ভারের হিসাব নিতে গিয়ে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। যে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ২২ এফএফ পশ্চাদপসরণ করে মনোবল থাকলে ঐ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তারা এক পক্ষকাল যুদ্ধ করতে পারত। হয়ত আমাদেরকে পরাজিত করতে

পারত। ২২ এফএফ-এর এই পরাজয় এবং মুক্তিবাহিনীর জয়ে আমাদের মনোবল দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আমরা বিশ্বাস করতে থাকি আমাদের বিজয়ের গতি অপ্রতিহত থাকবে এবং অচিরেই পদ্মার পশ্চিমাঞ্চলকে আমরা পুরোপুরি মুক্ত করতে পারব। কিন্তু সামরিক জ্ঞানের অভাবে আমরা বুঝতেই পারিনি যে এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী কিভাবে আবার মরণ কামর হানতে পারে।

আমার যতদূর মনে পড়ে কুষ্টিয়াতে আমরা ৩৫টি গাড়ী, ৬টি আর-আর গান সহ শতাধিক রাইফেল, এলএমজি এবং ভারী মেশিনগান এবং গোলাবারুদ দখল করি, যা দিয়ে আমরা মুক্তিবাহিনীকে সুসজ্জিত করতে থাকি। এই দখলকৃত অস্ত্রসম্ভার এবং গাড়ী আমরা চুয়াডাঙ্গায় এনে জনগণকে প্রদর্শন করি, যা অনেক বিদেশী সাংবাদিক এবং টেলিভিশন সংস্থা পর্যবেক্ষণ করে।

এই সময় এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কোন একদিন একটি ফরাসি-স্পেনিশ টেলিভিশন সংস্থার প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় ৩টি পাকিস্তানী স্যাবর জেট চুয়াডাঙ্গা আক্রমণ করে এবং আশঘন্টা পর্যন্ত গোলাবর্ষণ করে এবং কয়েক জায়গায় বোমা বর্ষণ করে। এই টেলিভিশন সংস্থা অত্যন্ত সাহসিতার সাথে এই ঘটনার পুরোপুরি আলোকচিত্র গ্রহণ করে, যা সারা বিশ্বে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এই ছবিগুলো নিশ্চয়ই বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতে বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

এই সময় মুক্তিবাহিনীর ক্ষুদ্র একটি দলকে কুষ্টিয়ায় রেখে আমরা নতুন সমর পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আমরা যশোহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে বিশাখালীতে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি। মাহবুব এই এলাকার সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বিশাখালীতে আমাদের দুই কোম্পানিরও কম সৈন্য ছিল। উত্তর-পূর্বে আমরা হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উভয় পার্শ্বে ঢাকা হতে আক্রমণ প্রতিহত করার প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করি। হার্ডিঞ্জ ব্রীজে আমাদের দুই প্লাটুনেরও কম ইপিআর জোয়ান ছিল। এই সময়কার টেলিফোন কর্মচারীদের সহায়তা এবং তাদের দেশপ্রেম আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি জায়গার সাথে আমরা সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে ছিলাম। রাজশাহী এবং পাবনায় পাক সেনাদের তৎপরতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম। গোয়ালন্দ মহকুমার প্রশাসক শাহ মোহাম্মদ ফরিদের অনুরোধে আমরা একটি ক্ষুদ্র ইপিআর বাহিনীকে গোয়ালন্দে শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করি। এমনকি আমরা পাবনা দখলের পর নগরবাড়ি ঘাটে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য ক্ষুদ্র একটি বাহিনী প্রেরণের প্রস্তুতি নিই। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যশোহরে পাকসেনাকে কোণঠাসা করা এবং ঢাকা হতে কোন রকম রিইনফোর্সমেন্ট বা আক্রমণকে প্রতিরোধ করা।

সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির কাছে এটা প্রতীয়মান যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইপিআর বাহিনীর পক্ষে এই সামরিক ভূমিকা পালন করা অসম্ভব ছিল। এবং কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী এই প্রস্তুতি নিতে কোন দিনই সাহস পেত না। তবুও দেশপ্রেমের উন্মাদনা আমাদেরকে পেয়েছিল, তাই যা করা সম্ভব নয় তা করার সাহস এবং প্রস্তুতি আমরা নিয়েছিলাম।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমরা কুষ্টিয়া যশোর, (গুপ্ত সেনানিবাসকে বাদ দিয়ে), ফরিদপুর,পাবনা, রাজশাহীকে মুক্তাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করি এবং আমাদের নিজস্ব সীলমোহরও বানাই। গুপ্ত তাই নয়, গোয়ালন্দ থেকে কুষ্টিয়া এবং কুষ্টিয়া থেকে দর্শনা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল চালু করতে শুরু করি। আমরা এই সময় ব্যাংকেও নির্দেশ দেই ৫০০ টাকার উপরে কাউকে কোন পেমেন্ট না করতে। এমনকি ভারতের সাথে আমাদের এই বোঝাপড়া হয় যে আমার সরকারী সীলমোহর এবং দস্তখত করা সার্টিফিকেট মোটামুটি পাসপোর্টের মর্যাদা পাবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত এটা বলবৎ ছিল- অর্থাৎ আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম সরকারের প্রশাসন

ব্যবস্থা চালাচ্ছিলাম। আমি এই সময় মেহেরপুরের প্রশাসন ভার মেহেরপুরের সেকেন্ড অফিসারকে দিই এবং নিজে সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সামরিক অফিসারের ভূমিকা গ্রহণ করি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় শত শত ভারতীয় এবং বিদেশী সাংবাদিক, টেলিভিশন সংস্থা আমাদের সাক্ষাৎকার নেয় এবং এই মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন করে। তাদের সবারই একই প্রশ্ন ছিল যে, তোমাদের সরকার কোথায়?

আমরা উত্তরে জানাই যে, অতিশীঘ্রই আমাদের বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হবে। এই সময় আমরা ভারতের টুংগী বিওপি'তে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎও করি এবং সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করি। তাঁরা আশ্বাস দেন যে অতি শীঘ্রই সরকার ঘোষণা করা হবে।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ও শেষদিক থেকে যুদ্ধ একটি নতুন মোর নেয়। এই সময় শত্রুসৈন্য যশোর সেনা নিবাসে নতুন ভাবে সমর প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আমার অভিমত যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি যে বাঙ্গালীরা তাদের সুশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দিতে পারে। কুষ্টিয়ার গুলনি নিশ্চয়ই তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। তাই প্রচুর রিইনফোর্সমেন্ট ঢাকা থেকে যশোর আনা শুরু হয়। আমরাও উর্ধ্বশ্বাসে তাদের নতুন তৎপরতার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। আমরা একসময় ভাবছিলাম যে জনতার সমুদ্র নিয়ে যশোর সেনানিবাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। যশোর সেনানিবাস তখন আমাদের কাছে বাস্তবতার কারাগারের মত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির প্রতীক মনে হচ্ছিল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ জনতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা ঝুঁকি ছিল যে হয়ত যশোর আমরা দখল করতে পারব কিন্তু তা হবে হাজার হাজার লোকের প্রাণের বিনিময়ে। এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

এই সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের প্রথম সংঘর্ষ হয় বিশাখালীতে। এইখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় আমাদের প্রতিরক্ষাবূহ্যের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এটা ছিল এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে। আমাদের ইপিআর বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এই আক্রমণ মোকাবিলা করে। হানাদার বাহিনীর শতাধিক সৈন্য হতাহত হয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টার এই আক্রমণ প্রতিহত করার পর আমরা বিশাখালী থেকে প্রতিরক্ষা বৃহৎ পিছিয়ে আনতে বাধ্য হই। এই প্রথম ট্যাকটিক্যাল রিট্রিট আমাদের মনোবলের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই প্রথম আমরা উপলব্ধি করি যে শত্রুর দূরপাল্লার ভারী কামানের জবাব দেবার মত অস্ত্র আমাদের ছিল না। অন্যদিকে শত্রু এই কামানের আক্রমণ দ্বারা আমাদেরকে পিনডাউন করে রেখে সেই আর্টিলারী কভারের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের উপর তাদের সুবিধা অনুযায়ী আক্রমণ চালাতে থাকে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক আক্রমণে তারা প্রচুর সৈন্য ব্যবহার করছিল। প্রত্যেক আক্রমণের সাথে আমাদের মনোবলও ভেঙ্গে যাচ্ছিল এবং আমরা ভবিষ্যৎ বিজয়ের কোন সামরিক সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তদুপরি আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছিল না এবং কোন রণাঙ্গণে অগ্রবর্তী অথবা পশ্চাদবর্তী অবস্থানগুলোর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাতে যুদ্ধ দক্ষতা এবং মনোবলের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা যারা যুদ্ধে অভিজ্ঞ তারাই বলতে পারবে। এই রকম একটি অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে আমি নিজেও অসহায় অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হই। তদুপরি এই সময় বর্ষার অশুভ আগমন শুরু হয়। আমাদের অবস্থানগুলোতে খাদ্যদ্রব্য এবং গোলাবারুদের অভাব দেখা দেয়। বিচ্ছিন্ন অবস্থানগুলোতে এই বিরূপ পরিস্থিতিতে সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে শুরু করে। আমাদের পশ্চাদপসরণ অব্যাহত থাকে। এছাড়া আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসারও কোন সুব্যবস্থা ছিল না। ঔষধের অভাবে অনেকেই মারা যায়। এটা সহ্যেই অনুধাবনযোগ্য যে গোয়ালন্দের মত জায়গায় ক্ষুদ্র একটি প্রতিরক্ষাবূহ্য কি রকম আত্মঘাতী ছিল। এদের পেছনে পাক ছত্রীসৈন্য অবতরণ করে অনায়াসে ঐ ঘাঁটিকে একেবারে উড়িয়ে দেয়। একইভাবে নগরবাড়ী ঘাট এবং অবশেষে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ শত্রুর আয়ত্তে চলে যায়। আমাদের খবর অনুযায়ী জেনারেল মিঠা খান পাবনা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ এ্যাসিগ্ন-এর অপারেশন চালান।

চতুর্দিকে শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে আমাদের সংগঠনও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকটি ঘাঁটি থেকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়ে আমরা ছত্রভংগ হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে বিনাইদহ আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। শত্রুসৈন্য কুষ্টিয়াও দখল করে ফেলে এবং চুয়াডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। আমরা এই শত্রুর আক্রমণের মুখে পুনর্গঠন এবং পুনর্বিন্যাসের সময় এবং সুযোগ পাচ্ছিলাম না। চতুর্দিকে প্রচুর বিভ্রান্তি দেখা দেয়। সাধারণ জনগণের মনোবলও ভেঙ্গে পড়তে থাকে। চুয়াডাঙ্গা যখন শত্রুর আক্রমণের আওতায় চলে আসে তখন আমরা সদর দফতর চুয়াডাঙ্গা থেকে সরিয়ে পেছনে মেহেরপুরে নিই।

প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টঃ প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট যশোর সেনানিবাসে অবস্থান করছিল। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জলিল প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। ২৫শে মার্চের আগেই প্রথম বেঙ্গলকে এক্সারসাইজের জন্য ঝিকরগাছার দিকে পাঠানো হয়। আমরা প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। আমি, মাহাবুব এবং মেজর ওসমান চিঠির মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে তাকে অবহিত করি স্বতন্ত্রভাবে চিঠির মাধ্যমে। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার আহবান জানাই। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের কোন চিঠিরই জবাব পাইনি। এ পরপরই প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট যশোর সেনানিবাসে ফিরে গেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে একজন তরুণ বাঙ্গালী লেফটেন্যান্ট আনোয়ার শাহাদাত বরণ করেন। প্রচুর বাঙ্গালী সৈন্য হতাহত হয়। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ক্যাপ্টেন হাফিজ প্রায় ৩০০ বাঙ্গালী সৈন্যকে নিয়ে চৌগাছার দিকে অগ্রসর হয়। প্রত্যেকে অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

ক্যাপ্টেন হাফিজের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় চুয়াডাঙ্গায়। সে তখন প্রথম বেঙ্গলের বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন লোকদের নিয়ে চৌগাছায় একত্রিত করছিল। আমাদের সশস্ত্র যুদ্ধের কিছু খবর পেয়ে সে আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে চুয়াডাঙ্গায় আসে। তার কাছে আমি জানতে পারি যে তারা তখন ভারত সরকারের কাছে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য চেষ্টা করছিল। আমরা তখন যৌথভাবে সামরিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিতে থাকি।

প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠনঃ এই সময় আমরা জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখি। এবং আমরা আশা করছিলাম যে, অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং ঘোষণা করা হবে। এই সময় আমাদের মুক্তাঞ্চলে প্রতিদিন অনেক বিদেশী সাংবাদিক এবং টেলিভিশন দল আমাদের মুক্তাঞ্চল ঘুরেফিরে দেখছিলেন এবং এত প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও আমরা যে শুধু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে প্রতিরক্ষা করছিলাম তা নয়, আমরা এ রকম একটা সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে জয়ী হয়েছিলাম। এই সামরিক বিজয় জনগণের উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা ও দৃঢ় সংকল্প তাদের সবাইকে বিমোহিত করেছিল।

মেহেরপুরের কোন এক স্থানে বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের প্রস্তাবের কথা আমরা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের দিকে জানতে পারি। আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য গভীর আগ্রহে প্রতিক্ষা করতে লাগলাম। এই সময় যশোরের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের প্রতিরক্ষাবৃহৎ ভেদ করে এগিয়ে আসছে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে শত্রুবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে আমরা পশ্চাদপসরণ শুরু করি। ওদের সৈন্যসংখ্যা আমাদের তুলনায় অনেক বেশী। আমাদের রণকৌশলগত পশ্চাদপসরণ ছিল প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে অনিবার্য পরাজয়ের সূচনা মাত্র।

১২ই এপ্রিল- দিনের পর দিন মরণপণ যুদ্ধের পরও আমরা যখন কোন স্বীকৃতি পাচ্ছি না, তখন আমাদের মনোবল ভাঙতে শুরু করে। একটা পর্যায় পর্যন্ত মানুষের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকগুলি ব্যর্থতা আমাদের যোদ্ধাদের মনেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল। এমন এক সংকটজনক দিনে আমরা খবর পেলাম, বাংলাদেশ সরকার ১৬ই কিংবা ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণ করবেন। তার আগেই আমি প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে ফেলেছিলাম। তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে আমাদের স্থান নির্ধারণের কাজ শুরু হয়েছে - শহর থেকে দূরত্ব

বজায় রাখা এবং ভারতীয় এলাকা থেকে বিদেশী সাংবাদিকরা যাতে সহজে আসতে পারেন এবং শত্রুর সম্ভাব্য বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ছদ্মাবরণের ব্যবস্থা করা।

১৬ই এপ্রিল মাহাবুব (বিনাইদহ মহকুমা পুলিশ অফিসার ছিলেন, পরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একজন অফিসার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন) ও আমি চূড়ান্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের দিকে যাত্রা করি। তখন ছিল অত্যন্ত সংকটময় সময়। তখন আমরা আমাদের বাহিনীর পশ্চাদপসরণের খবর পাচ্ছি। অগ্রবর্তী এলাকার সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আমাদের সেনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে পরিণত হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। মেজর ওসমান তখন আমাদের বাহিনীর প্রধান। তিনি তাঁর সদর ঘাঁটি মেহেরপুরে সরিয়ে এনেছেন। মেজর ওসমান ভীষণ ব্যস্ত এবং চিন্তাশ্রিত। পাকিস্তান বাহিনী একের পর এক আমাদের প্রতিরক্ষাবূহ্য ভেদ করে এগিয়ে আসছে। আমরা তখনো জানতাম না আর কতদিন মাতৃভূমির বুকে আমাদের শেষ ঘাঁটি টিকিয়ে রাখতে পারবো। আমরা দুপুর নাগাদ আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। একটা সাধারণ মঞ্চ তৈরী হচ্ছে, বাঁশ দিয়ে ঘেরা। এলাকাটি সীমান্ত ঘেঁষা বলে আমরা ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ৭৬তম ব্যাটালিয়নের লেঃ কর্নেল চক্রবর্তীর সাথে এই উপলক্ষে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করছিলাম।

১৭ই এপ্রিল আমি আর মাহাবুব সেই ঐতিহাসিক স্থানে ছুটলাম। অনাড়ম্বর আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। সকাল ৯টার দিকে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অন্যদের সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। আমি তাঁদের নিয়ে এলাম বদ্যনাথতলার মন্ডপে। ওখানে আশেপাশের গ্রাম থেকে কিছু চেয়ার সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। সংগৃহীত চেয়ারের মধ্যে সবগুলি পূর্ণাঙ্গ নয়। কোনটার একটা হাতল নেই, কোনটার একটা পায়া খোয়া গিয়েছে। মন্ডপ পাহারা দেবার জন্য নিয়োজিত আনসারদের জন্য কিছু রান্না হয়েছিল। মাহাবুব আর আমি দ্রুত একটা অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন করে ফেললাম। অন্যদেরও তা দেখালাম। আমরা নেতৃবৃন্দকে গার্ড অব অনার দেবার মত কয়েক প্লাটুন ইপিআর ও মুজাহিদ মোতায়েন করি। মাহাবুব তাদের নিয়ে গার্ড অব অনার দেবার মহড়া শুরু করলো। আমি তখন কর্নেল ওসমানী ও অন্যদের সাথে কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হাজার দুয়েক লোক জমায়েত হয়েছে অনুষ্ঠানে। তার মধ্যে অন্ততঃ শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও টিভি ক্যামেরাম্যান।

নীরব আত্মকুণ্জ। সমবেত গ্রামের মানুষের নিকট অতীতেও এমন কোন অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়নি। আমরাও অনুষ্ঠানের কথা গোপন করে রেখেছিলাম। গ্রামের মানুষের শূন্যদৃষ্টির ভাষা আমরা বুঝতে পেরেছি। তারা যেন এক অঘটন ঘটতে দেখেছে- বিস্ময়াবিষ্ট, নিষ্পলক।

বেলা ১১টা নাগাদ বহুপ্রতীক্ষিত অনুষ্ঠানের সূচনা হল। আমি জীপে করে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জেনারেল এমএজি ওসমানী ও অন্যান্য কয়েকজনকে মঞ্চের ৫০ গজের মধ্যে তোরণের কাছে নিয়ে এলাম। মাহাবুব গার্ড অব অনারের নেতৃত্ব দিল। সৈয়দ নজরুল ইসলাম অভিবাদন গ্রহণ করলেন। পিছনে দাঁড়িয়ে জেনারেল ওসমানী। সৈয়দ নজরুল ইসলাম যখন পতাকা উত্তোলন করছিলেন তখন সাংবাদিকরা তাদের চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটা ছোট দল জাতীয় সংগীত “আমার সোনার বাংলা” গাইলো। একটা জাতির জন্মলগ্ন প্রত্যক্ষ করলাম। এমন জন্মের কাহিনী ইতিহাসে বহুবার পড়েছি। কিন্তু বিশ্বাস হয় না চোখের সম্মুখে একটি জাতি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে। গার্ড অব অনারের পর ভারী মন্ত্রিসভার সদস্যরা মঞ্চ উপবেশন করলেন। সৈয়দ নজরুল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। তারপর এক এক করে মন্ত্রিসভার সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাষণ দান করলেন। রাষ্ট্রপতির পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ঘোষণা করা হল, লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের নীচে পাকিস্তান সমাধিস্থ হয়েছে। আর এই সমাধির উপরে একটি জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সেই জাতি হলো বাংলাদেশ। মানুষ এই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করলো।

আমাদের মধ্যে কয়েকজন সম্মেলন কেন্দ্র ছেড়ে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন হাফিজ তার সহযোদ্ধারা প্রতিরক্ষাবূহ রচনা করে বসে রয়েছেন। মাহাবুব আর আমি চললাম আমাদের কর্মক্ষেত্রে। পথে আমরা উপলব্ধি করলাম, একটি জাতি আজ জন্ম নিল বটে কিন্তু আজ যে শিশু জন্ম নিল সেই শিশুকে বিশ্ব সভায় আসন গ্রহণের জন্য অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আমরা জানি এই পথ পাড়ি দেবার জন্য আরও রক্তমূল্য দিতে হবে। আমাদের কাহিনী রক্তাক্ষরে লিখতে হবে। এই মুহূর্তে আমাদের চিন্তা হলো, সদ্যোজাত জাতি বড় হবে যেদিন, যেদিন বিশ্বসভায় মর্যাদার আসন পাবে, সেদিন কি আমরা তা আজকের মত দেখার জন্য বেঁচে থাকবো?

সরকার গঠনের পর আমাদের সাথে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একত্রীকরণ হয়। মেজর ওসমানের নেতৃত্বাধীনে আমাদের সৈন্য শার্শা-নাবারন এলাকায় মোতায়েন করা হয়। এই সময় উল্লেখযোগ্য যে, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন এবং ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ ঢাকা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে মেহেরপুরে এসেছিলেন তারাও এপ্রিলের আনুমানিক দশ তারিখে চুয়াডাঙ্গায় আমাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দেন। এই সময় আরো দুজন সামরিক অফিসার আমাদের সাথে যোগ দেন। তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন হুদা, যিনি পাবনা থেকে পিছু হটে আমাদের সাথে যোগ দেন। আর অন্যজন ছিলেন ক্যাপ্টেন ওহাব। যিনি যশোহর সেনানিবাস থেকে পালিয়ে আসেন। শার্শা নাবারনের নতুন প্রতিরক্ষাবূহকে আমরা শক্তিশালী করতে থাকি। এই সময় আমরা আর একজন নতুন মুক্তিযোদ্ধাকে পাই, যাকে পরে আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হয়। তার সাথে পরিচয় হয়। তিনি সরাসরিভাবে প্রতিরক্ষাবূহতে মোতায়েন ছিলেন। তিনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ। তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক ছিলেন।

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে এই সময়েই ক্যাপ্টেন হাফিজ নাবারনে শত্রুবাহিনীর ঘাঁটির উপর একটা সাফল্যজনক দঃসাহসিক রেইড চালান। এই রেইডে প্রথম বেঙ্গলের লোকজন ছিল। এতে করে যদিও শত্রুর কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয় তবুও তারা আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। এবং তারপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিরাট আকারে আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে শত্রুবাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নিয়েছিল, যার প্রত্যুত্তরে আমাদের কিছুই ছিল না। তাই আক্রমণকারী বাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করে আমরা পিছু হটে থাকি। এই সময় হাবিলদার মেজর মুজিবুর রহমান সহ আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে শহীদ হন। অনেকেই হতাহত হন। আমরা পরে জেনেছিলাম শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি হতাহত মিলিয়ে প্রায় দুই শতাধিক ছিল। সেই এলাকায় এক মৃত মেজরের নামে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এক ছোট মেমোরিয়াল তৈরী করেছিল।

আমাদের পশ্চাদপসরণ বিশৃঙ্খলভাবে হয়েছিল। পশ্চাদপসরণের সময় কিছু মূল্যবান হাতিয়ার খোয়া যায়। বেনাপোল চেক পোস্টে আমাদের দফতর স্থানান্তরিত করা হয়। ঐদিন জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বৃটিশ এমপি টমাসম্যানসহ চেকপোস্টে আসেন এবং ঐখানে তার বিবৃতি দেন। ঐদিন পরে শত্রুবাহিনী আমাদের হেডকোয়ার্টারের উপরে গুলীবর্ষণ করে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য আমরা মোটেও তৈরী ছিলাম না-শত্রুর আক্রমণে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি এবং বাংলাদেশের মাটিতে শেষ ঘাঁটিটুকু ছেড়ে দিয়ে ভারতে পশ্চাদপসরণ করি।

কুষ্টিয়ার যুদ্ধ

কুষ্টিয়াতে ২৮শে মার্চ সকালে কারফিউ উঠাতেই জনসাধারণ পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ৩০শে মার্চ সকালে পুলিশ ও ইপিআর সদস্যরা অসামরিক লোকজনদের সহায়তায় কুষ্টিয়া শহরে অবস্থানরত ২৭তম বালুচ রেজিমেন্টের ওপর আক্রমণ চালিয়ে অবস্থানটি দখল করে নেয়।

* 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

চুয়াডাঙ্গা ৪র্থ ইপিআর উইংয়ের উইং কমান্ডার মেজর ওসমান সরকারী কাজে কুষ্টিয়া গিয়ে সার্কিট হাউসে উঠেছিলেন। পাকিস্তানীদের হামলার সময় তিনি কোন প্রকারে কুষ্টিয়া থেকে আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। ২৬শে মার্চ বেলা ১টার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌঁছে ইপিআর সেনাদের সংগঠিত করেন এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। ৪র্থ উইংয়ের সদর দফতর থেকে ওয়ারলেসে ঐ এলাকার সীমান্তবর্তী সকল ফাঁড়ির ইপিআর সদস্যদের জনগণের সহযোগিতায় পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়। ২৭শে মার্চ সকালে মেজর ওসমান ১ বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেজাউল জলিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পাকিস্তানীরা কায়দা করে ২৪শে মার্চ এই রেজিমেন্টকে চৌগাছা পাঠিয়ে দিয়েছিলো। মেজর ওসমান সংক্ষেপে সর্বশেষ পরিস্থিতিবর্ণনা করে ইপিআর সুবেদার মজিদ মোল্লার মারফত লেঃ কর্নেল জলিলের কাছে একটি চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে তিনি লেঃ কর্নেল জলিলকে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই অঞ্চলের সার্বিক কমান্ড গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু চিঠির কোন জবাব পাওয়া গেল না। ২৮শে মার্চ মেজর ওসমান দানেশ নামে জনৈক মুক্তিযোদ্ধার মাধ্যমে তার কাছে পুনরায় বার্তা পাঠান। শোনা যায় মুক্তিযোদ্ধা দানেশ পুনরায় অনুরোধপত্র নিয়ে লেঃ কর্নেল জলিলের সামনে উপস্থিত হলে তিনি প্রথমে চিঠিটি পড়েন এবং তার পক্ষে বিদ্রোহে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় বলে দানেশকে জানিয়ে দেন। এভাবে তাঁর সাথে দেখা না করার জন্যও তিনি দানেশকে সতর্ক করে দেন। এর পরিণতি হয়েছিল করুণ। এই দিন অর্থাৎ ২৮শে মার্চেই লেঃ কর্নেল জলিলের কাছে ব্যাটালিয়ন নিয়ে তাকে যশোর ফিরে যাওয়ার এবং অস্ত্রশস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ আসে।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে ১ম ফিল্ড এম্বুলেন্স দলের বাঙ্গালী সৈন্যরা আসন্ন বিপদ অনুভব করতে পেরেছিলো। ২৯শে মার্চ রাতে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা চৌগাছা থেকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলে ফিল্ড এম্বুলেন্সের লোকেরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের অস্ত্র জমা না দেয়ার আহবান জানায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এর আগেই অস্ত্র জমা দেওয়া শেষ করে সৈনিকরা ব্যারাকে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। ২৯শে মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানীরা হঠাৎ প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ঘুমন্ত সৈন্যদের ওপর হামলা করে। বিশ্বাসঘাতকদের এই আক্রমণে অনেক বাঙ্গালী সেনা প্রাণ হারায়। প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলো এমন কয়েকজন পরে চুয়াডাঙ্গা গিয়ে মেজর ওসমানের সৈন্যদের সাথে যোগ দেয়।

১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর হামলার সময় পাকিস্তানীরা শুধু সেনাদেরই হত্যা করেনি, তাদের পরিবার-পরিজন, নারী-শিশুদেরও হত্যা করে। পাকিস্তান দের হত্যা এবং অত্যাচারের হাত থেকে দুহুপোষ্য নবজাতকেরাও রেহাই পায়নি। ফিল্ড এম্বুলেন্সের বাঙ্গালী কমান্ডিং অফিসার কর্নেল এস এ হাই এবং তার বাঙ্গালী সহকর্মী ক্যাপ্টেন কালামকে ওরা দুঃসহ নির্যাতনের পর হত্যা করে। এই পরিস্থিতিতে চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান এবং তার সহযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আজম ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে কুষ্টিয়া মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। কুষ্টিয়ার ২৭তম বালুচ রেজিমেন্টের দুইশত সৈন্য থানা, পুলিশ লাইন এবং জেলা স্কুলে অবস্থান গ্রহণ করছিলো। মেজর ওসমান তিনটি ঘাঁটিতেই পর্যায়ক্রমে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেন। ৩০শে মার্চ ভোর ৪টায় প্রথম আঘাত শুরু হয়। সারাদিন যুদ্ধের পর ৫টায় পুলিশ লাইন মুক্ত হয়।

এখানে অনেক পাকিস্তানী নিহত হয়, কয়েকজন আবার পালিয়ে গিয়ে জেলা স্কুলের প্রধান ঘাঁটিতে যোগ দেয়। ৩১শে মার্চ কুষ্টিয়া শহরের পাকিস্তানী অবস্থান গুলোর ওপর আবার নতুন আক্রমণ শুরু হয়। পাশ্চবর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক পুলিশ-ইপিআর-এর সহায়তায় এগিয়ে আসে। তাদের হাতে ছিলো বাঁশের লাঠি, বন্দুক এবং কয়েকটি ৩০৩ রাইফেল। জনতার ভীড় বেড়ে চলে। দুপুরের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের বিরাট দল পাকিস্তানীদের দ্বিতীয় ঘাঁটি দখল করে নেয়।

শত্রুরা তখন পিছু হটে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে। ২৭-বালুচ রেজিমেন্টের কোম্পানীর অস্ত্র মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। ঘেরাওয়ার মধ্যে থেকে কোনভাবে

প্রাণে রক্ষা পাওয়া কিছু পাকিস্তান সেনা দুটি জীপ এবং দুটি ডজ গাড়িতে করে রাতের অন্ধকারে ঝিনাইদহের দিকে পালাতে চেষ্টা করে। খবর পেয়ে জনসাধারণও পথের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। একদল মুক্তিযোদ্ধা শৈলকুপা সেতুর (যশোর জেলার ঝিনাইদহে) নিকট অবস্থান গ্রহণ করে।

সেতুর নিকট পৌঁছাতেই পাকিস্তানীরা মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশের ফলে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। কয়েকজন পালাবার চেষ্টা করলে জনসাধারণ তাদের পিছু ধাওয়া করে। পথে তারাও জনতার হাতে প্রাণ হারায়। তবে এই সময়ের মধ্যে ২৭-বালুচ রেজিমেন্টের ডেল্টা কোম্পানীর হাতে দুই শতাধিক বেসামরিক বাঙ্গালী প্রাণ হারিয়েছে, আহত আরো বেশী।

২রা এপ্রিল ভোরের দিকে বালুচ কোম্পানীর অবশিষ্ট সৈন্য কুষ্টিয়া থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার ব্যারিকেডের জন্য যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় তারা গ্রামের পথ ধরে পালাবার চেষ্টা করে। পথে কাউকে দেখতে পেলেই তারা গুলি ছুড়তে থাকে। কিন্তু শিগগীরই তারা হতাশা ও ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গোলাগুলিও ফুরিয়ে যায়। জনসাধারণ সহজেই তাদেরকে বন্দী করে। তারপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তালিকা থেকে ২৭-বালুচ রেজিমেন্টের ডেল্টা কোম্পানীর নাম চিরতরে মুছে যায়।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ যশোর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮। যশোর-নড়াইল-গোপালগঞ্জের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	 ১৯৭১

যশোর-গোপালগঞ্জের প্রতিরোধ যুদ্ধ

সাক্ষাৎকার : মেজর আবদুল হালিম

২২-১১-১৯৭৩

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আমি আমার নিজ বাড়ী ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে ছুটি ভোগ করছিলাম। ২৫শে মার্চের পাক বাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিই। প্রথমে গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ অফিসের নেতৃবৃন্দের সহিত মুক্তিযুদ্ধ কি ভাবে পরিচালনা করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করি। সাথে সাথে ছুটি ভোগকারী সৈনিক ও ইপিআরদিগকে গ্রাম-গঞ্জ ও শহর থেকে একত্রিত করি। সেই সময় গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ ফরিদ আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সর্ব প্রকারে সাহায্য করেন।

২৮শে মার্চ গোপালগঞ্জ থানা থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে তৎকালীন কালিয়া থানার এম-পি-এ সাহেবের সহযোগিতায় যশোর জেলার নড়াইল মহকুমা শহরে ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে পৌঁছি। সেই সময় নড়াইলের এস-ডি-ও কামাল সিদ্দিকী ও যশোর জেলার এ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার শাহাদৎ হোসেন সর্বপ্রকার সাহায্য করেন।

২৯শে মার্চ নড়াইল গিয়ে জানতে পারলাম, যশোরে পাকবাহিনীর সহিত মুক্তিবাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ চলছে। তাই, নড়াইল থেকে যশোর অভিমুখে রওনা হই। পরে হামিদপুরে এক প্লাটুন পাকসেনা ডিফেন্স নিয়ে ছিল। আমার প্লাটুন ও সেই এলাকার ছাত্র, পুলিশ ও কিছু বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানসহ ঐদিনই রাত্রি সারে তিনটায় তাদের ডিফেন্সের চারদিক থেকে আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে তারা ভয় পেয়ে পেছনের দিকে পালিয়ে যায়।

৩০শে মার্চ সকালে আমার প্লাটুন ও হামিদপুর এলাকার অসংখ্য ছাত্র-যুবকসহ যশোর রওনা হই। সকাল ৯টার দিকে যশোর শহরে পৌঁছি। সেই সময় যশোর শহর আমাদের বাহিনীর আয়ত্তে ছিল যশোর শহরে ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ক্যাপ্টেন হাসমত ও ক্যাপ্টেন আওলাদের সাথে দেখা করি এবং আমি ও আমার প্লাটুনের জোয়ানদেরকে কি করতে হবে তা অবগত করি।

সেই সময় ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে জানতে পারলাম যশোর-কলিকাতা রোডের শঙ্করপুর নামক স্থানে পাকবাহিনীর সহিত ইপিআর বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ চলছে। রাত্রে অয়ারলেসে যুদ্ধের অগ্রগতির সম্বন্ধে যোগাযোগ করি।

৩১শে মার্চ সকালে শঙ্করপুরে চলে যাই। সেখানে ইপিআর বাহিনীকে পুনরায় নতুনভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ডিফেন্স করে দিই। সেখানে ইপিআর বাহিনীর সুবেদার মালেক অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এইদিকে ক্যাপ্টেন আওলাদ ও ক্যাপ্টেন হাসমতকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এবং স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাদেরকে সক্রিয় অংশ নিতে দেখা গেল না।

৩১শে মার্চ থেকে এরা ওরা এপ্রিল পর্যন্ত যশোর সেনানিবাসের চতুর্দিক ঘিরে রাখা হয়। সকল গুরুত্বপূর্ণ পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয় ও ডিফেন্স তৈয়ার করা হয়। সেই সময় ভারতের সহিত যোগাযোগ করা হয় আধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য, কিন্তু প্রথম দিকে সাহায্য পাওয়া যায় নাই। আমাদের হাতে তখন আধুনিক অস্ত্রের সংখ্যা ছিল খুব নগণ্য।

৩রা এপ্রিল বিকাল ৩ ঘটিকার সময় পাকবাহিনী যশোর সেনানিবাসের দুই দিক থেকে আক্রমণ করে। যশোর কলিকাতা রোডের উপর শঙ্করপুর দিয়ে ও যশোর ঢাকা রোড দিয়েও তারা আক্রমণ করে। প্রথমে আর্টিলারি নিক্ষেপ করে ও মর্টার হতে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। গোলা নিক্ষেপ করে পাকসেনারা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের সম্মুখ ছিল ২টি ৬ পাউণ্ডার। দুইটিকে দুই রণাঙ্গনে বসান হলো। ৬ পাউণ্ডার থেকে পাকবাহিনীর উপর গোলা নিক্ষেপ করে বেশ কিছুক্ষন তাদের অগ্রগতিকে রোধ করা গেল। এই দিকে শঙ্করপুরের ৬-পাউণ্ডারটি থেকে কয়েকটি গোলা নিক্ষেপের পর জ্যাম লেগে যাওয়ায় আর গোলা নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ঢাকা-যশোর রোডের উপর বসান ৬-পাউণ্ডারটি নিয়ে আসার জন্য অয়ারলেসে বলা হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, নিয়ে আসবার সময় পথে পাকবাহিনী ৬ পাউণ্ডার ও চালককে আটকে ফেলে। এই সংবাদ পেয়ে আমাদের পক্ষে বাধা দেওয়ার আর কোন উপায় রইল না। এদিকে পাকবাহিনীর আর্টিলারীর শেলে কয়েকজন জখম হয় ও ছাত্র-যুবকরা হাতিয়ার ফেলে পিছনে চলে আসে। সন্ধ্যার দিকে পাক বাহিনী আমাদের হেডকোয়ার্টারের উপর গুলি নিক্ষেপ করতে থাকে। এমতাবস্থায় আমরা আশ্তে আশ্তে পিছনের দিকে চলতে থাকি। ৩রা এপ্রিল সারারাত উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। আমাদের পক্ষে দুই কোম্পানীর মত ইপিআর ও আনসার-মুজাহিদ-ছাত্র যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে বিশেষ অসুবিধা ছিল। আমি ইপিআর বাহিনীর ক্যাপ্টেন নই, তাছাড়া সকল সৈনিকের ছিল সিভিল পোশাক। তাই সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনায় কিছু অসুবিধা হয়। এই যুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী লেঃ মতিউর রহমান এমপিএ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে ১৫ জন মুক্তিসেনা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে শাহাদৎবরণ করেন। এদিকে পাকবাহিনী যশোর দখল করে নেয়। ৪ঠা এপ্রিল আমরা সকালে নড়াইলে পুনরায় একত্রিত হই। সেখানে নতুনভাবে মনোবল নিয়ে নড়াইল-যশোর রোডে দাইতলা নামক স্থানে বিকালে ডিফেন্স নিই। সেই সময় আমাদের জোয়ানদের মোট সংখ্যা ছিল এক কোম্পানী। অপরদিকে সকল আনসার ও মুজাহিদ নিজ নিজ এলাকায় চলে যায়। দাইতলা আমাদের ডিফেন্স খুব শক্ত করে গঠন করি।

৭ই এপ্রিল পাকবাহিনী বিকালের দিকে পুনরায় আক্রমণ করে, কিন্তু আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকসেনা টিকে থাকতে পারলো না। পাকবাহিনীর পিছনে ফিরে চলে যায়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর আনুমানিক ৩০ জনের মত নিহত হয়। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমাদের ডিফেন্স নষ্ট করতে পারেনি। আমাদের পক্ষে কোন হতাহত হয়নি।

৮ই এপ্রিল সকালে পাক বাহিনী পুনরায় আমাদের উপর আক্রমণ করে। পাকবাহিনী সেইদিন আর্টিলারী ও মর্টার ব্যবহার করে। আমরাও তাদের আক্রমণ প্রতিহত করি। প্রায় ৫ ঘণ্টা উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। পরে আমাদের গোলাবারুদের অভাবে আর টিকে থাকা গেল না। আমরা পিছনের দিকে চলে আসতে বাধ্য হলাম। নড়াইলে আমার কোম্পানী নিয়ে রাতে অবস্থান করি।

৯ই এপ্রিল পাক বাহিনী নড়াইল মহকুমা শহরে বিমান হামলা চালায় ও সাথে সাথে দাইতলা থেকে পাক বাহিনী এসে নড়াইল শহর দখল করে নেয়। আমার কোম্পানী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিছু ইপিআর জোয়ান ভারতে চলে যায়।

আমি পুনরায় গোপালগঞ্জে চলে আসি। সেই সময় গোপালগঞ্জ শত্রুমুক্ত ছিল। গোপালগঞ্জে পুনরায় ছাত্র, যুবক, ইপিআর ও সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের নিয়ে দুটি কোম্পানী গঠন করি। তাদের রীতিমত প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা করি। প্রথমে আমার কোম্পানীর হেডকোয়ার্টার গোপালগঞ্জ শহরে গঠন করি। পরে আমার নিজ গ্রাম মানিকহার হাইস্কুলে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি। মে মাসের প্রথম দিকে পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের সংবাদ জেনে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আমাদের নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে।

৮ই মে গোপালগঞ্জ থেকে ৫ মাইল দূরে তালা নামক স্থানে ৫টি বার্জ বোঝাই পাট খুলনার দিকে যাচ্ছিল। আমরা তা আক্রমণ করি ও অগ্নিসংযোগ করে বার্জগুলিকে ডুবিয়ে দিই। বার্জগুলিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া ‘বিরলা’ নামক ছোট জাহাজটিকে আমাদের নদীতে পেট্রোলিং করার কাজে ব্যবহার করি।

১১ই মে সকালে ঢাকা থেকে খুলনা অভিমুখে রকেট স্ট্রিমার যাওয়ার পথে তালা জাহাজঘাটে জোরপূর্বক আটকিয়ে রাখি। প্রত্যেকটি যাত্রীকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিই, কারণ অধিকাংশ যাত্রী পাক সরকারের পক্ষে চাকুরীতে যোগদানের জন্য খুলনা যাচ্ছিল। জাহাজটিকে নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। এবং জাহাজের যাত্রীদের সরকারী চাকুরীতে যেন যোগদান না করে এই শপথ করিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

১১ই মে বিকালে পাকসেনারা স্থানীয় কিছু দালালের সহায়তায় প্রথমে গোপালগঞ্জ প্রবেশ করে। পরে আমাদের হেডকোয়ার্টার মানিকহার আক্রমণ করে। প্রথমে আমরা তাদের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করি, কিন্তু পরে তাদের আধুনিক অস্ত্রের মুখে টিকে থাকা গেল না। আমাদের পক্ষে একটি মাত্র এল-এম-পি ছিল। তার চালক নায়েক রব হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ায় আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। পাক বাহিনী মানিকহার গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়।

গোপালগঞ্জ পতনের পর ভারত অভিমুখে রওনা হই। পথে বহু বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে ২২শে মে পশ্চিমবঙ্গের বয়রা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করি।

যশোর সেনানিবাস ও অন্যান্য স্থানে

১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎপরতা

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দীন আহমদ বীরবিক্রম

২৮-৯-১৯৭৩

২৫শে মার্চ ঢাকাসহ প্রদেশের অন্যান্য জায়গায় কি ঘটেছিল তা আমার সম্পূর্ণ অজানা ছিল। সেখানে কোন লোকজনের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়নি। কেননা ঐ এলাকাটি ছিল জঙ্গলের মধ্যে। এমনকি ২৭শে মার্চ মেজর (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী) জিয়াউর রহমান সাহেবের স্বাধীনতা ঘোষণা করার কথাও আমি জানতে পারিনি। আমার সৈন্যরা অনেকে কিছু জানতে পারলেও আমাকে কিছু জানায়নি।

২৯শে মার্চ ১২টার সময় অয়ারলেসে-এর মাধ্যমে পাকিস্তানী ১০৭ নং ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার আব্দুর রহিম দুররানী আমাদেরকে যশোরে পৌঁছতে বলায় আমরা সঙ্গে সঙ্গে জগদীশপুর থেকে যশোরের অভিমুখে রওনা দিই। যশোর ক্যান্টনমেন্টে রাত ১২টায় পৌঁছি। যদিও আমাদের ব্যাটালিয়নে মোট ৭৫০/৮০০ সৈন্য সাধারণত থাকে, কিন্তু অনেক সৈন্য ছুটিতে থাকায় আমাদের ব্যাটালিয়নে সৈন্যসংখ্যা তখন ছিল ৪০০ জন। (ব্যাটালিয়নে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল এবং সে জন্যই প্রায় অর্ধেক ছুটিতে ছিল।)

৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে ব্রিগেডিয়ার দুররানী আমাদের ব্যাটালিয়ন অফিসে যান এবং কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জলিলকে বলেন যে, আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হলো এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে বলেন। ব্রিগেডিয়ার দুরবানী আমাদের ব্যাটালিয়ন অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্র জমা করে চাবিগুলো নিজ হাতে নিয়ে নেন। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর আমাদের ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

* সাক্ষাৎকারদাতা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৩০ মাইল দূরে কোটচাঁদপুর ও জগদীশপুর এলাকায় কালেকটিভ ট্রেনিংয়ে ছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার দুরোনী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্যরাও তৎক্ষণাৎ ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি দিতে অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র যার যার হাতে নিয়ে নেয় এবং আমরা চতুর্দিকে আমাদের পজিশন নিই। আমাদের বিদ্রোহের খবর পাওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানী দুই ব্যাটালিয়ন (২৫-বেলুচ রেজিমেন্ট এবং ২২তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) সৈন্য আমাদেরকে তিন দিক দিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের জোয়ানরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। এ সময় কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জলিল আমাদের নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করেন এবং অফিসে বসে থাকেন। তখন আমি ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব নিই এবং পাঞ্জাবীদের আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিই এবং সেভাবে সৈন্যদের পুনর্গঠিত করি। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেনও আমার সঙ্গে বিদ্রোহে যোগদান করে।

এভাবে সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত পাঞ্জাবীরা আমাদের উপর বার বার আক্রমণ করে, কিন্তু প্রত্যেকবারই আমরা তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করি এবং তাদের আক্রমণকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হই। পাকিস্তানীরা পূর্ব থেকেই আমাদের উপর আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়েছিল, কেননা তারা মর্টার আক্রমণ করে এবং তা আমাদের ব্যাটালিয়নের উপরই করে। যেহেতু, পূর্বপরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তানীরা আমাদের উপর আক্রমণ করে, সেহেতু তাদের সঙ্গে আমরা বেশীক্ষণ যুদ্ধ চালাতে পারব না মনে করে আমি আমার ব্যাটালিয়ন নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদেরকে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়ে আক্রমণ করেছিল। পশ্চিম দিক দিয়ে আক্রমণ না করলেও পশ্চিমের খোলা মাঠে মাঝে মাঝে অবিরাম বৃষ্টির মত গুলি করছিল। আমরা পশ্চিম দিক দিয়েই কভারিং ফাইটের সাহায্যে বের হবার সিদ্ধান্ত নিলাম। পশ্চিম দিক দিয়ে কভারিং ফাইটের সাহায্যে বের হবার সময় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হই। (চৌগাছা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হবার সময় আমি আমার কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জলিলকে আমাদের সঙ্গে বিদ্রোহ করার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি মোটেই রাজী হননি।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে যুদ্ধের সময় সেকেন্ড অফিসার লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেন শহীদ হন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। তার সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে “বীর উত্তম” উপাধিতে ভূষিত করেন। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ারই প্রথম অফিসার যিনি যুদ্ধে শহীদ হন। তাছাড়া এ যুদ্ধে আমার ৪০ জন সৈন্য শহীদ হন। পাকিস্তানী সৈন্যও প্রায় ৪০ জন শহীদ হন।

চৌগাছায় একত্রিত হবার পর আমরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলি। এসময় আমি একমাত্র অফিসার ছিলাম। দশজন জুনিয়র কমিশন অফিসারও আমার সাথে প্রায় ২২৫ জন সৈন্য ছিল।

৩০শে মার্চ, ১৯৭১ঃ এইদিন রাত্রে জনসাধারণের মারফতই প্রথম জানতে পারলাম যে, মেজর জিয়াউর রহমান সাহেব চট্টগ্রাম থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং যুদ্ধের জন্য সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যদের আহ্বান করেছেন। কয়েকজন সাংবাদিকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের নিকট জানতে পারলাম সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর বাহিনীর সৈন্য ও অফিসাররা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এ খবর পাবার পর আমার এবং আমার সৈন্যদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা দেয় এবং মনোবল অত্যন্ত দৃঢ় হয়।

৩০শে মার্চ, ১৯৭১ঃ এই দিন আমার ব্যাটালিয়নে সমস্ত সৈন্যদের একত্রিত করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের অবহিত করলাম। তাদের উদ্দেশ্য করে সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানলাম যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে। স্ব-ইচ্ছায় যে বা যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত শুধু তারাই আমার ব্যাটালিয়নে থাকতে পারবে। এবং আরও বললাম, যদি কারো যুদ্ধ

করার ইচ্ছা না থাকে তবে সে কেটে পড়তে পারে। আমার বক্তব্য শুনে প্রত্যেক জোয়ানের মুখে নতুন করে উদ্দীপনা দেখা দেয়। তারা সবাই দেশের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং শপথ গ্রহণ করে।

চৌগাছায় আমার ও আমার ব্যাটালিয়নের যুদ্ধ করার মত কোন গোলাবারুদ ছিল না। আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত গোলাবারুদ ছিল তা যশোর ক্যান্টনমেন্টের যুদ্ধেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাছারা সকলেরই একটা করে পোশাক ছিল। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা দেখা দেয়। মোটকথা, বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। কিন্তু ছাত্র ও জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্যে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

২রা এপ্রিলঃ চৌগাছা থেকে সলুয়া নামক গ্রামে নায়ক সুবেদার এ বি সিদ্দিকের কমান্ডে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য। (সলুয়া গ্রাম যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৫ মাইল পশ্চিম দিকে)। চৌগাছা তখন আমার হেড কোয়ার্টার। এখান থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম ও উত্তর দিকের গ্রামগুলোতে পেট্রোলিং শুরু করি। হাবিলদার আবুল কাশেম (টি-জে) এবং হাবিলদার মোহাম্মদ ইব্রাহীমদের নেতৃত্বে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে খিতিবদিয়া নামক গ্রামে এ্যামবুশ পার্টি পাঠাই। হাবিলদার আবুল কাশেম এবং হাবিলদার ইব্রাহীম একটি পাকিস্তানী পেট্রোল পার্টিকে এ্যামবুশ করে। এতে ৬ জন পাকিস্তানী নিহত হয় এবং ৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয়।

ইতিমধ্যে ৭ই এপ্রিল খবর পেলাম যে, মেজর ওসমান চৌধুরী (বর্তমান লেঃ কর্নেল) চুয়াডাঙ্গায় তার ইপিআর বাহিনী নিয়ে মুক্তিসংগ্রামে যোগদান করেছেন। ঐদিন আমি একটা জীপ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার নিকট থেকে কিছু চাইনিজ এম্যুনিশন, এক্সপ্লোসিভ, কয়েকটি জীপ এবং কয়েকটি রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে চৌগাছায় ফিরে আসি।

১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ঃ নায়ক সুবেদার আহমেদউল্লাহর নেতৃত্বে কয়েকজন সৈন্যকে পাঠালাম ছোট হায়বতপুর গ্রামের ব্রীজ ধ্বংস করার জন্য। ব্রীজটি যশোর-বিনাইদহ বড় রাস্তায় যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ভোর তিনটের সময় নায়ক সুবেদার আহমেদউল্লাহ উক্ত ব্রীজ উড়িয়ে দেন। ব্রীজটি ভাঙ্গার ফলে এবং ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিকে আমার ব্যাটালিয়ন সৈন্যদের পেট্রোলিং-এর দরুণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে কিছুদিনের জন্য ভয়ে বের হতে পারেনি।

১১ই এপ্রিল, ১৯৭১ঃ সিপাই ড্রাইভার কালা মিয়াকে পাঠাই কোটচাঁদপুর থানায় কয়েকটি জীপ ও ট্রাক সংগ্রহ করে আনতে। কালা মিয়া কোটচাঁদপুর যাবার পথে খবর পায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা কনভয় কালিগঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উক্ত খবর পাবার পর কালা মিয়া আশেপাশের গ্রাম থেকে কয়েকজন (দশজন) মুজাহিদকে নিয়ে কালিগঞ্জের দিকে এক মাইল দূরে এ্যামবুশ করে। উক্ত এ্যামবুশে ৩টা গাড়ি বিনষ্ট হয় এবং দশজন পাকিস্তানী সৈন্যও নিহত হয়। কালা মিয়া একটা হ্যাড গ্রেনেড নিয়ে যখন একটা গাড়ির দিকে ছুড়তে যায় তখন তার বুকে পাঞ্জাবদদের বুলেট বিদ্ধ হয় এবং সে সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হয়।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১ : ইতিমধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈন্যরা বেনাপোলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ খবর পেয়ে ১৪ই এপ্রিল আমি আমার ব্যাটালিয়ন চৌগাছা থেকে তুলে নিয়ে বেনাপোলের ৩ মাইল পূর্বে কাগজপুকুর গ্রামে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি এবং যশোর-বেনাপোল রাস্তার দুধারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিই। এই সময় ইপিআর বাহিনীর দু'টো কোম্পানী যোগদান করে। আমার সৈন্যসংখ্য প্রায় ৫৫০ জনে দাঁড়ায়। এ সময় শত্রুর শক্ত ঘাঁটি ছিল নাভারনে। (নাভারন বেনাপোল থেকে ১২/১৩ মাইল পূর্ব দিকে)। আমি শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য নাভারন এলাকায় পেট্রোলিং শুরু করি।

২১শে এপ্রিল, ১৯৭১ : ঐ দিন ভোর আড়াইটার সময় আমি নিজে ২০ জন সৈন্য নিয়ে নাভারন মূল ঘাঁটিতে পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর রেইড করি। আমার রেইডে ১০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং ১৫ জন আহত

হয়। উক্ত রেইডে আমরা মর্টার ব্যবহার করি। আমার ৪ জন সৈন্য আহত হয়। উক্ত রেইডে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হয় আমাদেরকে, কেননা কাঁদামাটি এবং খালবিল পেরিয়ে আমাদের রেইড করতে হয়েছিল।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৭১ (কাগজপুকুরের যুদ্ধ) : ২৩শে এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য কাগজপুকুর গ্রামে আমাদের মূল ঘাঁটির উপর আক্রমণ করে। তারা আর্টিলারীর সাহায্য নেয়। এখানে দীর্ঘ ছয় ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ চলে। আমি আমার সৈন্যদেরকে নিয়ে পরে বেনাপোল কাষ্টম কলোনী ও চেকপোস্ট এলাকায় বিকল্প প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিতে বলি। কাগজপুকুরের এ যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় ৫০ জন সৈন্য নিহত হয় ও অনেক আহত হয়। আমার ২৫ জন সৈন্য শহীদ হয়। অনেক বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করায় বাংলাদেশ সরকার তাকে ‘বীরবিক্রম’ উপাধি প্রদান করেন।

এর পরবর্তী পনের দিন ধরে শত্রুশক্তি বেনাপোল কলোনী ও চেকপোস্ট এলাকা দখল করার জন্য বহুবার আক্রমণ করে। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাদের আক্রমণের পাল্টা জবাব দিই এবং প্রতিহত করি। উক্ত পনের দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় ১০০ জন সৈন্য নিহত হয়। এই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেনাপোল তারা দখল করে সেখানে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করবে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এবং বাংলাদেশের পতাকাই উড়তে থাকে। উপরন্তু এ এলাকা তারা কখনও দখল করতে পারেনি। বেনাপোলের যুদ্ধে আমার দশ জন সৈন্য শহীদ হন এ সংঘর্ষে হাবিলদার আবদুল হাই, হাবিলদার আবুল হাশেম (টি-জে), হাবিলদার মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ল্যান্স নায়েক ইউসুফ আলী, ল্যান্স নায়েক মুজিবুর রহমান, সিপাই আবদুল মান্নান অভূতপূর্ব দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেয়। বড়াআঁড়া গ্রামে এ্যামবুশ করে হাবিলদার ফয়েজ আহমদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৫ জন সৈন্যকে নিহত করে।

প্রতিরোধ যুদ্ধে যশোর ও অন্যান্য এলাকা

যশোর রণাঙ্গণে

২৩ মার্চ তারিখে ইপি-আর বাহিনীর জওয়ানরা তাদের ক্যাম্পে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলল, আর সেই পতাকার সামনে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ‘গার্ড অব অনার’ দিল। অবাস্তবালীরা প্রতিবাদ তুলেছিল, কিন্তু তাদের সেই আপত্তি টিকল না। ২৫শে মার্চ তারিখে ঢাকা শহরে ইয়াহিয়ার জঙ্গী-বাহিনীর বর্বর আক্রমণের খবর যখন এসে পৌঁছল, যশোরের মানুষ তাতে ভয় পাওয়া দূরে থাক, বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, ক্রোধে গর্জন করে উঠল-এর উপযুক্ত প্রতিশোধ চাই। যশোর ক্যান্টনমেন্টে কামান, মর্টার আর মেশিনগানে সজ্জিত হাজার হাজার পাক সৈন্য মোতায়েন হয়ে আছে, যে- কোন সময় তারা অগ্নিস্রাবী প্লাবন নিয়ে নেমে আসতে পারে, এ কথা চিন্তা করেও তারা ভয়ে পিছিয়ে গেল। ২৬, ২৭ ও ২৮শে মার্চ, এই তিন দিনে ইপি-আর-এর চারটি ক্যাম্পে জওয়ানরা প্রতিরোধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প নিল।

প্রথমম সংঘর্ষ ঘটল ২৯শে মার্চ তারিখে- শহরের উপর নয়, শহর থেকে বাইরে যশোর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে। সেদিন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল। দিনের অবস্থা বদলে গেছে, মুক্তি আন্দোলনের হাওয়া ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেও এসে ঢুকেছে - নিরস্ত্র বাঙ্গালী সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এর পরিণাম কি হবে, তা তারা ভাল করেই জানত, তা সত্ত্বেও এই লাঞ্ছনাকে তারা নিঃশব্দে মাথা পেতে মেনে নেয়নি।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওরা আগেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের ম্যাগাজিনের চাবিটা কেড়ে নিয়েছিল। বিদ্রোহীরা তাতেও দমল না, তারা ম্যাগাজিন ভেঙ্গে কিছু অস্ত্র বার করে নিয়ে এল। তার ক্যান্টনমেন্টের

* ‘প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

ভেতরেই দু'পক্ষে গুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ। একদিকে কামান, মর্টার, মেশিনগান প্রভৃতি ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য অপর দিকে হালকা হাতিয়ার সম্বল করে এক ব্যাটালিয়ন বাঙ্গালী সৈন্য। এই যুদ্ধ কতক্ষণ চলতে পারে! স্বাভাবিকভাবেই এই সংঘর্ষে বহু বাঙ্গালী সৈন্য মারা গেল। বাকী সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে ক্যান্টনমেন্টের বন্ধ দরওয়াজা ভেঙ্গে বাইরে পালিয়ে গেল।

এই সংবাদ দেখতে দেখতে শুধু যশোর শহর নয়, সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। সবাই বুঝল, এবার মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে, আর বসে থাকার সময় নেই। ইপি-আর বাহিনী আগে থেকেই পরিকল্পনা নিয়ে তৈরী হয়েছিল। এবার শহরের পুলিশ বাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই পুলিশ-বিদ্রোহে যারা নেতৃত্ব নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা হচ্ছেন হিমাংশু ব্যানার্জী, আকমল হোসেন আর পীযুষ। শহরের বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়ার হিসেবে হিমাংশু ব্যানার্জী পুলিশদের মধ্যে নয়, শহরের সাধারণ লোকের মধ্যেও জনপ্রিয়। সেই জনপ্রিয় খেলোয়ারটি এবার এক নতুন খেলায় নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন।

পুলিশ ম্যাগাজিনের চাবি ছিল অবাঙ্গালী জমাদারের হাতে। হিমাংশু, আকমল আর পীযুষ তাকে বন্দী করে তার হাত থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে ম্যাগাজিন খুলে ফেললেন। সেখান থেকে তারা সাত'শ রাইফেল, ছয়'শ শটগান, কিছুসংখ্যক ব্রেনগান এবং যথেষ্ট পরিমাণে কার্তুজ উদ্ধার করলেন। তারপর এই অস্ত্রগুলিকে বিদ্রোহী পুলিশ আর বিদ্রোহী জনতার মধ্যে বিলি করে দেওয়া হল। স্থির হোল, এদের এখনই অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতে হবে। মুক্তি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়বার জন্য ব্যাগ্র পুলিশ আর জনতা নিউ টাউনের নোয়াপাড়ার আমবাগানে ঘাঁটি করে বসেছিল। এখানে জনতার মধ্যে থেকে তিন'শ জনকে বাছাই করে নিয়ে ষাটজন পুলিশ তাদের রাইফেল চালনা শিক্ষা দিল। মাত্র এক ঘণ্টার মত সময় পেয়েছিল তারা। এইটুকু সময়ের মধ্যেই তারা রাইফেল চালনার অ, আ, ক, খ- টুকু আয়ত্ত করে নিল।

সেদিন সেই আমবাগানেই এই নবদীক্ষিত শত শত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের আহার্য-দ্রব্য যোগাবার দায়িত্ব নিয়েছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! ঘরের মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই স্মরণীয় আমবাগানের মধ্যে তাঁদের এই মুক্তিসংগ্রামী ভাইদের জন্য রান্না করছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবিকা নারী বাহিনীকে পরিচালনা করছিলেন হিমাংশু ব্যানার্জীর স্ত্রী।

সেই দিনই ইপি-আর বাহিনী, ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসা বেঙ্গল রেজিমেন্টের দু'শ'র উপরে সৈন্য, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ এবং ছাত্র-যুবকদের নিয়ে মুক্তিবাহিনীর গড়ে তোলা হোল।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে চারটি সৈন্যবাহী জীপ সম্ভবত শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়েছে। মুক্তিবাহিনী তাদের মধ্যে তিনটি জীপকে খতম করে দিল। এখান থেকে মুক্তিবাহিনীর সংগ্রাম শুরু। সেদিন রাত দশটার পর থেকে ভোর পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টের শালতলা এলাকায় পাক-সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে প্রচুর গুলি বিনিময় হয়।

সেই রাত্রিতেই যশোর জেলের কয়েদীরা বাইরের খবর শুনে চঞ্চল হয়ে উঠে। তারা জোর করে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এবং তাই নিয়ে জেল প্রহরীদের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় এবং গুলি চলে। শেষ পর্যন্ত তার পরদিন রাত্রিতে সেখানকার ১৩৭৫ জন বন্দী জেলের দরজা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। তাদের মধ্যে সতেরো জন ছিলেন নিরাপত্তা বন্দী। এটা ৩০ তারিখ রাতের ঘটনা।

৩০শে মার্চ ভোরবেলা দু'দল পাক-সৈন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে জীপে করে দু'দিকে যাত্রা করল। একদল এখানকার চাঁচড়ার দিকে, আর একদল খুলনার দিকে। মুক্তিবাহিনীও দু'দলে ভাগ হয়ে তাদের প্রতিরোধ করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাক-সৈন্যদের মধ্যে যে-দলটি খুলনার দিকে যাত্রা করেছিল, পুরাতন কসবার পুলের কাছে তাদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটল। এই সংঘর্ষে পুলিশদের নেতা হিমাংশু ব্যানার্জী নিহত হলেন। চাঁচড়ার যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর হাতে আচ্ছামত ঘা খেয়ে পাক-সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়ল। মুক্তিবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করে রইল।

৩১শে মার্চ তারিখে শহর থেকে চার মাইল দূরে যশোর-মাগুরা রোডের ধারে হালিমপুর গ্রামে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়। ইপি-আর বাহিনীর জওয়ানদের নেতৃত্বে এই ট্রেনিংদানের কাজ চলবে। শোনা যায়, জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা প্রায় পাঁচশ কয়েদী স্বেচ্ছায় এই ট্রেনিং সেন্টারে যোগ দিয়েছিল।

কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রামের সময়সজ্জা শুধু যশোর শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না প্রায় একই সাথে মহকুমা শহরগুলিতেও প্রতিরোধের প্রস্তুতি চলছিল। নড়াইলের এসডিও এবং সেখানকার বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্যোগে এক শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। যশোর শহরে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, এই খবর পেয়ে তারা শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য যশোর শহরের দিকে মার্চ করে এগিয়ে চলল। নড়াইল মহকুমার হাজার হাজার লোক যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে এই যুদ্ধ মিছিলে যোগ দেয়। যশোর-নড়াইল রোডের দু'ধারের গ্রামগুলি তাদের ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠতে লাগল।

নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া অঞ্চলেও একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। নৌ-বিভাগের প্রাক্তন অফিসার শামসুল আলমের উদ্যোগে এই শক্তিশালী মুক্তিবাহিনীটি গড়ে উঠেছিল। শামসুল আলম সামরিক চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর একটা ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে আর দশজনের মতই সংসার জীবনযাপন করে চলছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার আহবানে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তার চাকরির মায়া ছেড়ে দিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তার নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশত যোদ্ধার এক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠল। এই মুক্তিবাহিনীর জন্য থানা থেকে ও বিভিন্ন লোকের কাছে থেকে দু'শর উপরে রাইফেল ও বন্দুক সংগ্রহ করা হয়েছিল।

যশোর শহরের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোহাগড়ার এই মুক্তিবাহিনীও যশোরের দিকে দ্রুত মার্চ করে চলল। শামসুল আলম নিজ হাতে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তৈরী করে তুলেছিলেন। এখানেও হাজার হাজার লোক তাদের যুদ্ধ-যাত্রার সাথী হয়েছিল। তারা তাদের ভীমগর্জনে পথঘাট মুখরিত করতে করতে যুদ্ধের উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছিল।

এই যুদ্ধ-মিছিল সম্পর্কে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগারজন মেয়ে নিয়ে গঠিত একটা নারীবাহিনী মুক্তিবাহিনীর অংশ হিসেবে এই যুদ্ধ-মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল। এরা সবাই কলেজ ও স্কুলের ছাত্রী। মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের জন্য রান্না করা এবং যুদ্ধের সময় আহতদের সেবা গুরুত্বপূর্ণ করা, এটাই ছিল তাদের কাজ। এই এগারটি বীরকন্যা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে যশোরে গিয়েছিল।

মাগুরা ও ঝিনাইদহ মহকুমায় যাঁরা মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটি লোকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি হচ্ছেন মাগুরার তরুণ এসডিও ওয়ালীউল ইসলাম। এই ব্যাপক অঞ্চলের প্রতিরোধ সংগ্রাম কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

১লা এপ্রিল থেকে ৩রা এপ্রিল, এই তিনটা দিন হাজার হাজার পাকসৈন্য খাঁচার পাখির মত ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে অরুদ্ধ হয়ে রইল। ইতিপূর্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বারকয়েক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ওরা একেবারে ঘর নিয়েছে, বেরোবার নামটি করে না।

সৈন্যসংখ্যার দিক দিয়ে এবং আধুনিক অস্ত্রসজ্জার দিক দিয়ে শক্তি ওদের প্রচন্ড। তাহলেও মুক্তিযোদ্ধাদের মরিয়া আক্রমণে, আর তাদের চেয়েও বেশী হাজার হাজার ক্ষিপ্ত জনতার ভীমগর্জনে ওরা যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে ওদের মনোবল হারিয়ে ফেলেছে।

যশোর শহর মুক্তিবাহিনীর হাতে। এই তিনটি দিন শহরের মানুষ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ, কখনও দলে দলে, কখনও বা বিচ্ছিন্নভাবে যে যার হাতিয়ার উঁচিয়ে নিয়ে শহরের দিকে ছুটে আসছে। আওয়ামী লীগ আর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রতিরোধের বাণী ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের সেই সংগ্রামী অহবান ব্যর্থ হয়নি। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। তারা এই বর্বর হামলাকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তাদের এই সোনার দেশকে মুক্ত করবে, স্বাধীন করবে।

ঘরের মেয়েরাও এগিয়ে আসতে চাইছে। এই মুক্তিসংগ্রামকে সফল করে তুলবার জন্য তারাও কিছু করতে চায়। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঘরে ঘরে রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে। কেউ তাদের বলুক আর নাই বলুক, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঘরে খাবার তৈরী করে চলেছে। যে যা পারছে সে তাই দিয়ে চলেছে। নিজেরা এগিয়ে গিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই সুযোগ থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায় না।

পর পর তিন দিন ধরে অবরোধ চলছে। হাজার হাজার লোক ঘিরে আছে ক্যান্টনমেন্টকে। দিন-রাত্রি অষ্টপ্রহর ধরে তারা পাহাড়া দিয়ে চলেছে। ক্যান্টনমেন্টের পেছন দিকে বিল অঞ্চল। সেখানেও পাহাড়া চলেছে, যাতে এরা কোন দিক দিয়ে বেরোবার পথ না পায়। রাইফেল বা বন্দুক ক'জনের হাতেই বা আছে। গ্রামের মানুষ হাতিয়ার বলতে যার যা সম্বল তাহা নিয়ে ছুটে এসেছে। বর্শা, বল্লম, রামদা, লেজা থেকে লাঠিসোঁটা পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, পথের মোড়ে মোড়ে গাছের উপর অনেকে তীর-ধনুক নিয়ে বসে আছে। দুশমনরা একবার ওদের কোট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেই হয়। একটাকেও জ্যান্ত ফিরে যেতে হবে না।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট এক বিরাট ঘাঁটি। এখানে প্রায় সতের হাজার সৈন্য থাকার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া এরা ট্যাঙ্ক ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। কয়েকশ রাইফেল, কয়েকটা লাইট মেশিনগান আর কেবলমাত্র একটা পাঁচ পাউণ্ড গোলা কামান দিয়ে এদের প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের ব্যাপারে সাহস অত্যন্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ যুগে শুধু সাহস দিয়েই যুদ্ধ জয় করা চলে না। এই প্রতিরোধ সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা হয়তো এ বিষয়ে পুরোপুরি সজাগ ছিলেন না।

তাছাড়া মুক্তিবাহিনীর আরেকটা দুর্বলতা ছিল তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। বীর জনতা তিন দিন ধরে যশোর ক্যান্টনমেন্টে হাজার হাজার পাক-সৈন্যকে অবরোধ করে রাখল, অথচ সেই খবরটা সময় মত তাদের সদর দফতর চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে পৌঁছল না। আর যদি পৌঁছেও থাকে, তবে মূল নেতৃত্ব সাড়া দেয়নি। সে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট-মুহূর্তে তাদের শক্তি সম্পদ যশোরে এনে সমাবেশ করার প্রয়োজন ছিল। তাহলে যুদ্ধপরিচালনার ব্যাপারে অভিজ্ঞ যোদ্ধারা থাকতেন এবং আরও কিছু ভারী অস্ত্রশস্ত্রও ব্যবহার করা যেত। অবশ্য তাহলেই যে তারা যুদ্ধ জয় করতে পারতেন, এমন কথা বলছি না। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তার ফলে সেইদিন যশোর শহর একটা প্রচণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে পারত এবং তারা বহু শত্রুসৈন্যকে খতম করতে পারত।

অবরোধের তৃতীয় দিনে অবরোধকারীদের সংখ্যা কমতে কমতে অবরোধের বেষ্টিতীটা একটু পাতলা হয়ে এসেছিল। উপযুক্ত সময় বুঝে অবরুদ্ধ পাক-সৈন্যরা কামানের গোলায় পথ করতে করতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর দু'পক্ষে চলল যুদ্ধ। কামান, মর্টার আর মেশিনগানের বিরুদ্ধে রাইফেলের লড়াই, এ এক দুঃসাহসিক অথচ মর্মান্তিক দৃশ্য। এই যুদ্ধে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এসবই অগ্নিস্রাবী কামান আর ভারী মেশিন গানের সামনে এই প্রতিরোধ কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে! যশোরের রাজপথ রক্তে লাল হয়ে গেল, কত দেশপ্রেমিক এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন তার হিসেব কেউ দিতে পারবে না। যুদ্ধ সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিল, শহরের পথগুলি অসংখ্য দেশভক্তের মৃতদেহে বিকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা বেঁচেছিল, তারা মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ণগঠন করার সঙ্কল্প নিয়ে শহর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। এইভাবে যশোরে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল।

এপ্রিলের মধ্যভাগ। ইতিমধ্যে পাকসৈন্যরা যশোরের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মগোপন করে হামলাকারীদের উপর চোরা-গোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। যশোর শহর থেকে দশ-বারো মাইল দূরে মুরাদপুর গ্রাম। বারো বাজারের পাশেই মুরাদগড়। এখানে মুক্তিবাহিনীর একটি গোপন ঘাঁটি ছিল। খবর পাওয়া গেল যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু সৈন্য মুরাদগড়ের দিকে আসছে। সুখবর। এই শিকারটা যেন ফসকে না যায়। স্থির হলো এদের উপর অতর্কিত হানা দিতে হবে। ভাগ্যক্রমে এদের হাতে একটি লাইট মেশিনগান ছিল। এমন সুযোগ কি সবসময় মেলে! কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় মাত্র তিনজন একজন ক্যাপ্টেন আর দু'জন তার সহকারী। খবর পাওয়া গেছে ওদের সঙ্গে আছে পাঁচখানা জীপ, আর একখানা ট্রাক। সৈন্যসংখ্যা সবসুদ্ধ শ'খানেক হবে। একশ জনের বিরুদ্ধে তিনজন। হোক তিনজন, এই নিয়েই তারা ওদের প্রতিরোধ দেবে।

যথাসময়ে ওদের সেই 'কনভয়' মুরাদগড়ে এসে পৌঁছলে ওরা কালীগঞ্জের দিকে চলেছিল। মুরাদগড়ের পুলটা যেখানে তারই একপাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে সেই তিনজন মুক্তিযোদ্ধা পজিশন নিয়ে বসেছিল। পাক সৈন্যরা নিশ্চিত মনে এগিয়ে চলেছিল। তাদের বাধা দেবার দুঃসাহস যে কারও থাকতে পারে এটা তারা ভাবতে পারেনি। তাদের দুটো জীপ সবেমাত্র পুলটা পেরিয়ে ওপারে গেছে, এমন সময় মুক্তিযোদ্ধাদের মেশিনগানটি তাদের লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠল।

এ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়ে পাক-সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ওদের মেশিনগান অবিরল ধারায় গুলিবর্ষণ করে চলেছে। ফলে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে ছুটল।

একটু বাদেই এই ভগ্নদূতের দল হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে এই সংবাদ পৌঁছল। দেখতে দেখতে এক বিপুল বাহিনী বেরিয়ে এলে ক্যান্টনমেন্ট থেকে। ট্রাক-বোঝাই সৈন্যদল বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়ে মুরাদগড়কে কেন্দ্র করে একটা বিরাট অঞ্চল ঘেরাও করে ফেলল। মুক্তিযোদ্ধারা ওদের সেই ঘেরাও-এর মধ্যে আটকে পড়ে গিয়েছিল। বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথ ছিল না। সেই তিনজন বীরযোদ্ধা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলো।

মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলণ শুরু হবার ঠিক অল্প কিছু কাল আগেই কর্তৃপক্ষ আবদুর রউফকে পাকিস্তান থেকে তাঁর স্বদেশে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে বেঙ্গল রেজিমেন্টের দলভুক্ত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে গর্জন করে উঠেছে। স্বাধীনতার এই দুর্বীর কামনাকে দমন করবার জন্য সামরিক সরকার ২৫-এ মার্চ রাত্রিতে ঢাকা শহরের বুকে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রদেশময় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জনতা, দিতে দিকে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠতে লাগল।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক ব্যাটালিয়ন বাঙ্গালী সৈন্য। পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্রন্টিয়ার ও বেলুচ বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যের মধ্যে তারা একেবারেই সংখ্যালঘু। তাই ভেতরে ভেতরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও তারা প্রথম দিকে কোন অসন্তোষ বা বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করেনি।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা তাদের বিশ্বাস করতে পারেনি। ২৯-এ মার্চ পর্যন্ত মানুষের মনের অবস্থা যা'ই থাক না কেন যশোরে নাগরিক জীবন স্বাভাবিকভাবেই বয়ে চলেছিল। কিন্তু ৩০-এ মার্চ তারিখে যশোর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে অবাঙ্গালী ও বাঙ্গালী সৈন্যদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটল। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্ত্রাগারের চাবি কেড়ে নিয়ে সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্র

করে ফেলল। তার মিনিট কয়েক পরেই বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালী সৈন্যরা মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং জোর করে তাদের নিজেদের অস্ত্রাগার দখল করে নিল।

এবার দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তান সৈন্যদের সংখ্যা বাঙ্গালীদের চেয়ে বহুগুণে বেশি। তাছাড়া কামান, মর্টার ইত্যাদি ভারী অস্ত্রশস্ত্র, সবকিছুই তাদের হাতে, ফলে এই যুদ্ধের পরিণতি যা ঘটবে স্বাভাবিক তাই ঘটল। ঘণ্টাকয়েক ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। এই সংঘর্ষের ফলে ক্যান্টনমেন্টের দু-তিন শ বাঙ্গালী সৈন্য মারা গেল। অবশিষ্ট বাঙ্গালী সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে গেল। যশোর জেলার মুক্তিসংগ্রামের এটাই হলো সূচনা।

এই পালিয়ে আসা বাঙ্গালী সৈন্যদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, যে যেকোনো পারল সে সেই দিকে পালাল। আবদুর রউফ আর তাঁর সাথী দুইজন সৈন্য তাদের সবার মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও তাঁরা তাঁদের মনোবল হারাননি। তাঁর এই তিনজনে মিলে নিজেদের একটা ইউনিট গঠন করলেন এবং শপথ নিলেন যে, তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাবেন। এই সঙ্কল্প নিয়ে তাঁরা যশোর শহরে ফিরে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করলেন। তখন যশোর শহর মুক্তিবাহিনীর অধিকারে এসে গেছে। মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের পর থেকে আবদুর রউফ ও তাঁর দুইজন সাথী একই সঙ্গে লড়াই করে এসেছেন এবং আবদুর রউফ আহত হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসার আগ পর্যন্ত তাঁরা এক সঙ্গেই ছিলেন।

৩রা এপ্রিল তারিখে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাক-সৈন্যরা যশোর শহর পুনর্দখল করে নিল। মুক্তিবাহিনী শহর ত্যাগ করে নড়াইল গিয়ে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করল। কিন্তু যশোর শহর ছেড়ে গেলেও মুক্তিবাহিনীর একটা অংশ শহর থেকে মাত্র মাইল দেড়েক দূরে দুই তালার ফতেহপুরে পাক-সৈন্যদের প্রতিরোধ দেবার জন্য তৈরী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের সঙ্গে ছিল তিনটা মেশিনগান। এই তিনটা মেশিনগানের মধ্যে একটা ছিল আবদুর রউফ আর তাঁর দুইজন সাথীর হাতে। ই, পি, আর বাহিনীর ৮/১০ জন যোদ্ধা বাকী দুইটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। এদের সাহায্য করবার জন্য পঞ্চাশেক ছাত্রও সঙ্গে ছিল। এই প্রতিরোধের দলটি দুইতালার যেখানে ঘাঁটি করেছিল, সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

আবদুর রউফ বলেছিলেন: ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত শত্রুপক্ষের কারও সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। ১২ই এপ্রিল তারিখে বেলা ১টার সময় আমরা যখন খেতে বসেছি, এমন সময় লক্ষ্য করলাম শহরের দিক থেকে একটা কাল রং এর জীপ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু দূরে থেকতেই জীপটা থেমে গেল। মনে হলো, জীপের আরোহীরা আমাদের দেখতে পেয়েছে, তাই ওখানে থেমে গিয়েছে। আমরা দেখা মাত্রই খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। সাথে সাথে আমাদের তিনটা মেশিনগান একই সঙ্গে গর্জন করে উঠল। কিন্তু ওরা আগে থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে জীপটাকে একটা গাছের আড়ালে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। তাই আমাদের গুলি ওদের স্পর্শ করতে পারল না। জীপটা ঐভাবেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বোধ হয় আমাদের অবস্থানটা পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছিল। তারপর গাড়িটা যেকোনো দিকে এসেছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেল।

জীপটা চলে যাবার মিনিট কয়েক বাদেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হলো। গোলাগুলি আমাদের সামনে এসে পড়েছিল। আমরা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে এইভাবে গোলাবর্ষণ চলল। ওরা মনে করল, এই গোলাবর্ষণের পরে পথ নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাদের প্রতিরোধ করবার মত কেউ নেই। তাই ওদের একটা পদাতিক দল নিশ্চিত মনে যশোর নড়াইল সড়ক দিয়ে আসতে লাগল। আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করেছিলাম, আসুক, ওরা আরও কাছে এগিয়ে আসুক, তারপর ওদের একবার দেখে নেওয়া যাবে। উপযুক্ত সময় আসতেই আমরা মুহুর্তের মধ্যেই পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে মেশিনগান চালাতে শুরু করলাম। ওরা এ জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তাই আমাদের তিনটা

মেশিনগানের অবিরল গুলিবর্ষনের ফলে ওদের মধ্যে প্রচুর লোক মারা গেল। বাকী সবাই উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালাল।

ওরা পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমাদের নিশ্চিত মনে বিশ্রাম নেবার সময় দিল না। একটু বাদেই ওদের একটা বড় দল আমাদের উপর এসে হামলা করল। ওরা অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েই এসেছিল, সঙ্গে মেশিনগান ও ছিল, কিন্তু ওরা এবার বরাবর সোজা পথ ধরে আসেনি। আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে হঠাৎ এক সময় উঠে দেখলাম, ওরা দুটো দলে ভাগ হয়ে দু'দিক থেকে সাঁড়াশীর মত আক্রমণ করেছে এবং আমরা প্রায় ঘেরাও হয়ে যেতে বসেছি।

আমাদের উপর দু'দিক থেকে গুলিবর্ষণ চলেছে আমরা যেন গুলির বেড়া জালের মধ্যে আটকে পড়তে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে সাহায্য করার মত যারা ছিল তারা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের মধ্যে একে একে পাঁচজন যোদ্ধা শহীদ হলেন। কিন্তু তবু আমরা আমাদের মনোবল হারাইনি। আমাদের তিনটি মেশিন গান অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে গুলি করতে করতে পিছিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট কৌশলের পরিচয় দিয়ে সেই মৃত্যু-ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এলাম।

শত্রুশক্তি বুঝল, লড়াইয়ের পথ এখনও তাদের জন্য কষ্টকমুক্ত নয়। তাই তারা আর বেশী দূরে না গিয়ে যশোর শহরে ফিরে এল। ইতিমধ্যে নড়াইল এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, পাক সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী নড়াইল আক্রমণ করতে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। নড়াইল শহরের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। আবার সেই রাত্রিতেই ওরা নড়াইল শহরের উপর মারাত্মক রকম বোমাবর্ষণ করল। বিস্ফোরণের আগুনে জ্বলতে লাগল নড়াইল শহর। অবস্থা গুরুতর মনে করে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নড়াইল শহর ছেড়ে লোহাগড়ার দিকে চলে গেল।

পরদিন যশোর থেকে এক বিরাট মিলিটারি বাহিনী নড়াইল এসে হামলা করল। তাদের সঙ্গে ছিল তাদের বিহারী ও বাঙ্গালী দালালরা। ওরা লুটের লোভে উন্মত্ত হয়ে ছুটে এসেছে। ওদের বাধা দেওয়ার মত কেউ ছিল না। ওরা নিশ্চিত মনে নড়াইল শহরের ঘরে ঘরে মনের সাধ মিটিয়ে লুটপাট করে শেষ ফিরে গেল যশোর শহরে। তখন নড়াইল শহরে বেসামরিক বা সামরিক কোন শাসনই রইল না। কুখ্যাত গুণ্ডা টগর সেই সুযোগে সারা শহরের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে যা খুশি তাই করে চলল।

মূল মুক্তিবাহিনী চলে গেছে লোহাগড়া। আমাদের সঙ্গে যারা ছিল তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় চলে গেছে। এবার আমরা তিনজন মুক্তিবাহিনী থেকে বিচিছন্ন হয়ে পড়লাম। আমরা স্থির করলাম আমাদের নিজেদের এবার নিজেদের পথ বেছে নিতে হবে, নিজেদের উদ্যোগেই মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শত্রুশক্তি যতই প্রবল হোক না কেন এবং আমাদের অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক না কেন আমরা কিছুতেই এই সংগ্রাম ছেড়ে পেছনে হটে যাব না। আমরা তিনজন আর আমাদের মেশিনগানটি, এই আমাদের শক্তি, এই আমাদের সম্বল। এই নিয়ে আমরা আমাদের নতুন পথে যাত্রা করলাম।

আমাদের প্রথম কাজ হোল নড়াইল গিয়ে টগর গুণ্ডাকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া। আমরা সোজাগিয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা করলাম। টগর তার দলবল নিয়ে অবাধে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে বাক্য বিনিময়ের ইচ্ছা বা সুযোগ আমাদের ছিল না, দেখা হওয়া মাত্রই আমাদের গুলিবিনিময় চলল। কিন্তু আমাদের মেশিনগানের সামনে ওরা কি করে দাঁড়াবে! টগর প্রাণের ভয়ে আত্মসমর্পণ করল। আমরা দেশের শত্রুসেই শয়তান মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করলাম। তারপর পরপর তারই মত আরও কয়েকজন দেশদ্রোহীকে হত্যা করা হলো।

এবার আমরা নড়াইল শহর ছেড়ে লোহাগড়ার কাছে দীঘলিয়া গ্রামে চলে গেলাম। আমরা স্থির করেছিলাম, এবার আমরা নিজেদের উদ্যোগে একটি নতুন মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলব। এই অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছাত্র ও যুবকদের অভাব ছিল না। সামরিক ট্রেনিং পাওয়ার জন্য তারা অধীর হয়ে উঠেছিল। আমার ডাকে দেখতে দেখতে অনেক ছাত্র ও যুবক এসে জুটল। আমি দীঘলিয়াতে ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করে এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং দিয়ে চললাম। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত চল্লিশ-পঞ্চাশ জনে দাঁড়াল।

এদিকে পাক সৈন্যদের জয়লাভের ফলে স্থানীয় দালালরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল চোর, ডাকাত, লুটেরা আর গুপ্তা বদমাসের দল। ওরা এই সুযোগে নিজেদের ফায়দা উসুল করে নিচ্ছিল। ওদের পেছনে সামরিক সরকার সমর্থন রয়েছে, তাই তারা নিশ্চিত ছিল যে, তারা যা-ই করুক না কেন, কেউ তাদের বাধা দিতে সাহস করবে না। দীঘলিয়ার কুখ্যাত চেয়ারম্যান নওশের আলী ছিল এমন একজন নামকরা দালাল। আমাদের মুক্তিবাহিনীর খবর শুনে তার টনক নড়ল। সে টাকা পয়সা ছড়িয়ে চারদিক থেকে হাজার দুই গুণ্ডা জাতীয় লোক এনে জড় করে আমাকে ধরতে এল। আমাকে ধরাটা সহজ নয়, এটা সে, আগেই বুঝতে পেরেছিল। তার জন্যই তার এত তোড়জোড়া। আমি খবরটা পেয়েই দীঘলিয়া বাজার ‘কারফিউ’ জারী করে দিয়েছিলাম। আমাদের মুক্তিবাহিনীর ছোট একটা গ্রুপ নিয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করলাম। কিন্তু যুদ্ধ করার প্রয়োজন হলো না, আমাদের মেশিনগানের আওয়াজ শুনে দালাল নওশের আলীর ভাড়াটে গুণ্ডাগুলি দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, জায়গাটা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। আমাদের অন্যত্র সরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু যাবার আগে দালাল নওশের আলীর লীলাখেলা শেষ করে দিয়ে যাব। এই সঙ্কল্প নিয়ে আমি তখনকার মত আমাদের এই মুক্তিবাহিনীকে ভেঙ্গে দিলাম। তারপর সে অঞ্চলে পনের-ষোল দিন আত্মগোপন করে ছিলাম। একদিন উপযুক্ত সুযোগে শয়তান নওশের আলীকে হত্যা করা হয়। তারপর আমি আর আমার দুই সাথী সেই অঞ্চল ছেড়ে এলাম ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে।

আমরা গোপালগঞ্জ মহকুমার চন্দ্রদীঘলিয়া গ্রামে এসে আশ্রয় নিলাম। দেখতে দেখতে এখানেও এক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠল। আমাদের দৃষ্টি রইল গোপালগঞ্জ শহরের দিকে। সেখানে তখন মুসলিম-লীগ পন্থী, জামাত পন্থী প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল দেশদ্রোহীদের অপ্রতিহত রাজত্ব চলছে। পুরানো এসডিওকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় একজন অবাস্তবালীকে নিয়োগ করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ শহর তখন শত্রুপক্ষের দূর্বৃত্ত্য দুর্গন্ধরূপ। পরিকল্পনা নিলাম, ওদের সেই দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়ে ওদের উপর হামলা চালাব। এই পরিকল্পনা যদি সফল হয়, তবে সমস্ত মহকুমা জুড়ে মুক্তিবাহিনীর প্রভাব ও মর্যাদা বহু গুণে বেড়ে যাবে।

কিন্তু আমরা তিনজনই শুধুই সেখানে যাব, যা করবার আমরা তিনজনেই করব, মুক্তিবাহিনীর আর কউকে সঙ্গে নেব না। এ কাজ করতে হবে অত্যন্ত কৌশলে। ওরা যদি আগে থেকে টের পেয়ে যায়, তাহলে একজনকেও সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হবে না। আমার প্যারাট্রোপারের ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতাটাকে এবার ভাল করে কাজে লাগাতে হবে। খুবই দুঃসাহসের কাজ। আমরা তিনজন সেই বিপজ্জনক পথে পা বাড়লাম।

গভীর রাত্রে অতি সন্তর্পণে আমরা তিনজন গোপালগঞ্জ শহরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। শান্ত শহর ঘুমিয়ে আছে, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। আমাদের ভাগ্য ভাল, আমরা কোথাও কোন পাহারাদারের নজরে পড়ে যাইনি। কি করে অত্যন্ত দ্রুত ও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শত্রুপক্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হয়, সেই শিক্ষা আমার ভাল করে জানা ছিল। এবার তা কাজে লেগেগেল। আমরা যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছিলাম। দেখতে দেখতে ওদের-বেতার প্রেরণ ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিলাম। কেটে ফেললাম টেলিগ্রাম আর টেলিফোনের তার। গোপালগঞ্জ শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু এমন সতর্কতার সঙ্গে এই

কাজগুলি করেছিলাম যে, একটি জন-প্রাণীও তা টের পায়নি। এইভাবে আমাদের প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করে নিয়ে আমরা তিনটি নিশাচর প্রাণী দিবালোকের প্রতিক্ষায় রইলাম।

অবশেষে রাত্রির অন্ধকার কেটে দিনের আলো দেখা দিল। ক্রমে বেড়ে উঠল বেলা। আমরা আমাদের গোপন আশ্রয় ছেড়ে প্রকাশ্যভাবে বেরিয়ে এলাম পথে। পথের মানুষ আমাদের দেখে চমকে উঠল। ভয় পেয়ে দু'ধারে সরে গিয়ে আমাদের পথ করে দিল। আমরা আমাদের মিলিটারি বুটের খট খট শব্দে রাজপথ ধ্বনিত করে সোজা পুলিশ ব্যারাকে গিয়ে উঠলাম। ব্যারাকে ঢুকেই চমকে উঠলাম আমি। আমরা সংবাদ পেয়েছিলাম, ব্যারাকে মাত্র জনকয়েক পুলিশ আছে। কিন্তু আমরা এক অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে, আমাদের ভয় করলে চলবে না। এখন যা হবার তা হোক।

আমাদের দেখে ওরা সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিল। ওরা আমাকে পাঞ্জাবী অফিসার বলে মনে করেছিল। এমন ভুল অনেকেই করে থাকে। এরই উপর ভরসা করে আমি এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে গোপালগঞ্জ শহরে এসেছি। বলতে গেলে জেনেগুনেই বাঘের মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি মিলিটারি অফিসারের গান্ধীর্ষ নিয়ে পরিষ্কার উর্দু ভাষায় বললাম, আমি সামরিক হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছি। তোমাদের উপর নির্দেশ, তোমরা এখনই তোমাদের অস্ত্র আমার সামনে এনে জমা করবে।

ওরা আমার নির্দেশ শুনে অবাক হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকাল। তারা এই অর্ডারেরমানে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। তারা তো বাঙ্গালী পুলিশ নয়, তবে তাদের এভাবে নিরস্ত্র করা হচ্ছে কেন? আমি তাদের আর বেশী ভাববার সময় না দিয়ে বজ্রগর্জনে সেই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করলাম। এবার ওরা ঘাবড়ে গিয়ে একে একে সবাই সুড়সুড় করে আমার নির্দেশ পালন করল। পাশেই ছোট একটা ঘর। সেখানে রাইফেলগুলি স্তূপীকৃত হয়ে উঠল। এবার আমরা ওদের একটা হলঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে গট গট করে চলে এলাম বাইরে। এইখানে প্রথম দৃশ্যের শেষ।

এবার দ্বিতীয় দৃশ্য। আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম, তার মধ্যে ট্রেজারি আর ব্যাঙ্ক লুট করার কথাও ছিল। কিন্তু এখন বুঝলাম অবস্থা গুরুতর। আপাতত আমাদের পরিকল্পনা থেকে সে দুটো ছাঁটাই করেই দিতে হবে। এবার পুলিশ ব্যারাক পেছনে ফেলে নবনিযুক্ত এসডিওর কুঠিতে গিয়ে উঠলাম। খবর পাঠাবার একটু বাদেই সেই অবাঙ্গালী এসডিও হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের সামনে চলে এল। আমার দিকে চোখ পড়তেই সে সসম্মানে আমাকে স্যালুট দিল। আমি তাকে উর্দু ভাষায় বললাম আমি সামরিক কতৃপক্ষের কাছ থেকে জরুরী নির্দেশ নিয়ে এসেছি। এক্ষুণি মুসলিম লীগের আফসার উদ্দিন মোল্লা ও সিদ্দিক সিকদারকে ডেকে পাঠান। একটা বিষয় নিয়ে ওদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। এসডিও অতি সমাদরে আমাদেরকে একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। একটু বাদেই যাদের ডাকানো হয়েছিল তারা এসে উপস্থিত হলো। ওরা ঘরে এসে ঢুকবার সাথে সাথেই আমরা তিনজন উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরলাম। একই সঙ্গে তিনটি রাইফেল গর্জে উঠল। ওদের কথা বলবার সময়টুকু পর্যন্ত ছিল না। তিনটি দেহ একই সঙ্গে ভূমিশ্যায় লুটিয়ে পড়ল। এমনি করে পর পর তিন বার গুলি ছুড়লাম, তারপর কাজ শেষ করে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পেছনে লোকজনের কোলাহল আর হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পেছনে ফিরে তাকাবার সময় নেই আমাদের। আমরা যেন ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছি। এতক্ষণে মনে পড়েছে, একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে; সেটিকে শেষ করে যেতে হবে। আমরা ছুটে ছুটে গিয়ে মুসলিম লীগের নেতা ওয়াহিদুজ্জামানের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সামরিক সরকারের বড় দালাল ওয়াহিদুজ্জামান। কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশ হতে হলো। খবর নিয়ে জানলাম ওয়াহিদুজ্জামান বর্তমানে গোপালগঞ্জে নেই। না-ই বা থাকল ওয়াহিদুজ্জামান, তার ভাই ফায়েকুজ্জামান তো আছে। সেও তো এই অপকর্মে তার ভাইয়ের সাথী। আপাতত তাকে দিয়ে আমাদের কাজ

চলবে। কিন্তু কি আশ্চর্য এই ফায়েকুজ্জামান বন্ধ দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল সে। কিন্তু আমাদের মুখের দিকে তাকাতেই, কে জানে কি করে আমার আসল রূপ আর আসল উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলল। এতগুলি লোককে ঘোল খাইয়ে এলাম, কিন্তু তার সাবধানী চোখ দুটিকে ফাঁকি দিতে পারিনি। আতঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে এক লাফে ঘরে ঢুকে পড়ল সে, তারপর দরজার পাট দুটো আমাদের মুখের সামনে দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। আমাদেরও কেমন জিদ চেপে গেছে, আমরা বাইরে থেকে পাল্টা গুলি চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একটু বাদেই নিজেদের ভুলটা বুঝতে পারলাম। ইতিমধ্যে সারা শহর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পথের মোড়ে মোড়ে ভীড় জমে যাচ্ছে। এর পর আর শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উপায় থাকবে না। অবস্থার গুরুত্বটা বুঝতে পেরে কাজটা অসামঞ্জ্য রেখেই আমরা ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা ছুটছি, আর ফাঁকা আওয়াজ করে চলেছি, সঙ্গে রাস্তা সাফ যাচ্ছে।

নিরাপদে, সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে শহরের বাহিরে বেরিয়ে এলাম মৃত্যুর গহবর থেকে।

প্রকাশ্য দিবালোকে গোপালগঞ্জ শহরের বকের উপর এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যাবার পর অবস্থা গরম হয়ে উঠল। সামরিক বাহিনী আর তাদের দালালরা মুক্তিবাহিনীকে নির্মূল করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। আমরা যে অঞ্চলে ছিলাম সেখানকার জনসাধারণের উপর নানারকম জুলুম আর অত্যাচার চলল। শেষ পর্যন্ত আমরা তিনজন ঐ অঞ্চল ছেড়ে মাণিকহার গ্রামে চলে এলাম। আমরা যেখানেই যাই সেখানেই স্থানীয়ভাবে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে। তাছাড়া দীর্ঘলিয়া আর চন্দ্রদীঘলিয়ার মুক্তিযোদ্ধারাও সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল।

মাণিকহারে এসে একটা মস্ত বড় খবর পেয়ে গেলাম। নারায়ণগঞ্জ থেকে আটটা ফ্ল্যাট প্রায় দেড় লক্ষ মণ পাট বোঝাই হয়ে খুলনার দিকে যাচ্ছে। আমাদের শত্রু আমরা এই পাট বিদেশে রফদানি করে মুনাফা লুটবে, আর হয়তো বা সেই টাকা দিয়ে আমাদের মারবার জন্য অস্ত্র আমদানী করবে। ফ্ল্যাটগুলি এই মধুমতি নদীর তীর ঘেঁষেই চলে যাবে।

এই খবর পেয়ে আমরা একদল মুক্তিযোদ্ধা এই ফ্ল্যাটগুলিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মাণিকদা গ্রামে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। অবশেষে যথাসময়ে ফ্ল্যাটগুলি মানিকদার কাছে তালাঘাটে এসে ভিড়ল। আমরা আগে থেকেই ফ্ল্যাটগুলির উপর হামলা করবার জন্য তৈরী হয়ে ছিলাম। ওরা পালিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না। আমরা ওদের সব পাট পুড়িয়ে ছাই করে দিলাম।

১০ই মে তারিখ নারায়ণগঞ্জ থেকে রকেট স্ট্রীমারটি সৈন্যদের রসদে বোঝাই হয়ে খুলনার দিকে যাচ্ছিল। তাছাড়া এই স্ট্রীমারে একজন মেজর নেতৃত্বে ৫০জনের মত সৈন্যও যাচ্ছিল। এই সৈন্যদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না এবং তারা সাদা পোশাকেই চলেছিল। রকেট স্ট্রীমারটি তালাঘাটে এসে ভিড়ল। আমরা তখনও মাণিকদাতেই ছিলাম। এই খবরটা আমাদের কাছে এসে গিয়েছিল। স্ট্রীমারটা ঘাটে ভিড়বার সাথে সাথেই আমাদের মুক্তিবাহিনী তাকে ঘেরাও করে ফেলল। ওদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আরোহীদের নদীর তীরে নামিয়ে দিয়ে আমরা স্ট্রীমারটিকে ডুবিয়ে দিলাম। তারপর মেজরসহ সৈন্যদের খতম করে দেওয়া হলো।

সেই দিনই রাত্রিতে খুলনা থেকে একটা রসদ-বোঝাই লঞ্চ এবং বরিশাল থেকে একটা সৈন্যবাহী লঞ্চ গোপালগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। আমরা খাদ্যবাহী লঞ্চটিকে ডুবিয়ে দিলাম। আমাদের প্রবল গুলিবর্ষণের ফলে রাত্রির অন্ধকারে সৈন্যবাহী লঞ্চটিও ডুবে যায়। এই অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর উৎপাতে সামরিক কর্তৃপক্ষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। গোপালগঞ্জের এসডিও হত্যা, দেড় লক্ষমণ পাট পুড়িয়ে দেওয়া, সৈন্যবাহী লঞ্চ ডোবান-পর পর এই সমস্ত ঘটনা মুক্তিবাহিনীর প্রভাব বাড়িয়ে চলেছিল; অপরপক্ষে সামরিক কর্তৃপক্ষের মর্যাদার হানি ঘটছিল। তাই আমাদের নির্মূল করে দেবার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগল।

সেই দিনটা ছিল ১১ই মে। এই তারিখটা আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। ওদের গুপ্তচরের মুখে ওরা আমাদের অবস্থানটা জানতে পেরেছিল। সেদিন আমাদের জায়গা থেকে বেশ অনেকটা দূরে ওরা লঞ্চ বোঝাই সৈন্য নামাল। ব্যাপারটা আমরা একেবারেই টের পাইনি। যখন টের পেলাম, তখন আমরা প্রায় ঘেরাও হয়ে এসেছি। সেই ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসা সহজ কথা নয়। আমার কথা বলি, আমি ওদের একদল সৈন্যের একবারে কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলাম। আমার ভাগ্য ভাল, ওরা আমাকে ওদের একজন বলে ভুল করে বসেছিল। তাই আমার কাছ থেকে ওরা আক্রমণ আশঙ্কা করেনি। আর আমিও ওদের অপ্রস্তুত অবস্থায় মেশিনগান দিয়ে এক পশলা গুলিবর্ষনের সুযোগ পেয়ে গেলাম। ফলে ওদের মধ্যে অনেক সৈন্য হতাহত হলো। সেদিন আমরা গুলি চালাতে চালাতে বহু কষ্টে ওদের সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমি নিজে একবারে অক্ষত অবস্থায় চলে আসতে পারিনি। এতদিন এত সমস্ত সংঘর্ষের মধ্যেও আমার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগেনি। কতবার কত গুলি আমার কানের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে, কতবার কত গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়ে অক্ষত দেহে বেরিয়ে এসেছি। ফলে আমার মনে মনে কেমন একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, ওদের গুলি আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু আজ শত্রুরা আমার দেহে ওদের দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। বইরে বেরিয়ে এসে দেখি আমার এই হাত থেকে অবিরাম ধারার রক্ত ঝরে চলেছে। আমার হাতে একই সঙ্গে তিনটি গুলি এসে বিদ্ধ হয়েছে।

বলতে বলতে মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফ তাঁর ব্যালুজ বাঁধা বাঁ হাতখানি আমার সামনে তুলে ধরলেন।

কি করলেন তারপর? জখম হাতটার কি ব্যবস্থা করলেন? প্রশ্ন করলাম আমি।

আমি যে জখম হয়েছি, ওরা এই খবরটা জানতে পেরেছিল এবং আমি কে সেটাও ওদের অজানা ছিল না। ইতিমধ্যে এখানকার মুক্তিযুদ্ধের নেতা হিসাবে আমার নামটা এখানকার সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। ওরা মনে করেছিল, আমি নিশ্চয়ই আমার এই জখমটার চিকিৎসার জন্য কাছাকাছি কোন ডাক্তারখানায় বা কোনও ডাক্তারের কাছে যাব। তাই ওরা আমাকে ধরবার জন্য সেই সব জায়গায় হামলা করেছে। কাজেই আমার পক্ষে সেইসব জায়গায় যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আট-দশ দিন বিনা চিকিৎসাতেই কাটল। ফলে সেপটিক হয়ে আমার হাতটা পেকে উঠল। ঐ অবস্থায় আর কিছুদিন থাকলে নির্ঘাত মারা যেতাম। তখন বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নিলেন জখম চিকিৎসার জন্য বর্ডারের ওপারে চলে যেতে হবে। আমার অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছিল, তাতে এ ছাড়া আমার বাঁচার আর কোন উপায় ছিল না।

সশস্ত্র প্রতিরোধ : রংপুর দিনাজপুর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯। রংপুর দিনাজপুর জেলায় প্রতিরোধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সশস্ত্র প্রতিরোধে ৩য় বেঙ্গল *

সাক্ষাৎকার : মেজর মো: আনোয়ার হোসেন

.....১৯৭২

১৯৭১ সাল ২৫শে মার্চ আমি সৈয়দপুর সেনানিবাস ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাষ্টার হিসাবে নিযুক্ত ছিলাম। ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দপুরে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের ভিতর প্রথমে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় ও পরে অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাটালিয়নের জোয়ান ও অফিসারদের মধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সব সময়ের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, যে কোন সময়ে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে।

সেই সময় আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে: কর্নেল ফজল করিম (পাঞ্জাবী), ২য় অধিনায়ক মেজর আকতার (পাঞ্জাবী) ও ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ খান মালিক (পাঞ্জাবী) আমাদের ব্যাটালিয়ন ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী অফিসার দ্বারা বিভিন্ন কোম্পানীকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিভিন্ন জায়গায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য পাঠায় : ১। মেজর নিজাম, লে: মোখলেস ও ২য় লে: রফিকসহ বি ও ডি কোম্পানীকে রংপুর জেলার ঘোড়াঘাটে পাঠানো হয়; ২। ক্যাপ্টেন আশরাফকে সৈয়দপুর ও দিনাজপুর রোডের মধ্যবর্তী মণ্ডলপাড়া নামক স্থানে বৈদ্যুতিক সংযোগস্থল পাহারার জন্য ৪০ জন জোয়ান দিয়ে পাঠানো হয়; ৩। সুবেদার রহমতুল্লাহ ও আবঙ্গালী মেজর শাফায়াৎ হোসে কে সঙ্গে দিয়ে ১প্লাটুন পার্বতীপুর পাঠানো হয়; ৪। মর্টার প্লাটুনের জোয়ানদিগকে মর্টার রেখে দিয়ে শুধু রাইফেল দিয়ে শহরের অনতিদূরে পাওয়ার হাউস পাহারার জন্য পাঠানো হয়। ১৭ মার্চ অয়ারলেস সেট ও ভারী হাতিয়ারগুলি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

আমি কোয়ার্টার মাষ্টারের দায়িত্বে থাকায় ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের কাছে নিয়োজিত ছিলাম। সেই সময় দেশের পরিস্থিতি খুবই ভয়ানক ছিল। ২৪ শে মার্চ আমাকে এবং আমাদের ব্যাটালিয়নের সুবেদার মেজর হারি কে ব্রিগেডিয়ারের অফিসে ডাকা হয়। ব্রিগেডিয়ার আমাকে ও সুবেদার মেজর সাহেবকে বাইরের গুজব না শুনে শৃঙ্খলার সাথে দয়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন, কিন্তু আমাদের ২য় অধিনায়ক মেজর আকতারের সাথে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বহু সময় আলাপ আলোচনা করেন। এতে আমাদের মনে আরো সন্দেহের ভাব উদয় হল।

২৮শে মার্চ মণ্ডলপাড়া থেকে ক্যাপ্টেন আশরাফ অফিসে আসে এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানায়। তখন ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের ১ জন বাঙ্গালী অফিসার লে: সালামকেও ডাকা হয়। আমরা তিনজন রুদ্ধদ্বার কক্ষে ভবিষ্যতে কি কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করি। সৈয়দপুর সেনানিবাসে অপর যে দুইটি ব্যাটালিয়ন ছিল ঐ ব্যাটালিয়ন দুইটির ৩১শে মার্চ রাতে বণ্ডুয়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। আমরা ঐ সময়ে সৈয়দপুর সেনানিবাস দখল করার সিদ্ধান্ত নিই। সেই অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আশরাফকে এক ট্রাক গোলা বারুদ মণ্ডলপাড়া নিয়ে যাওয়ার জন্য দিয়ে দিই।

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

৩১শে মার্চ রাত্রি আড়াই ঘটিকার সময় ২৬এফ-এফ ব্যাটালিয়ন ও ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের ব্যারাকের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায় কিন্তু আমরা সতর্ক থাকায় সকাল ১০টা পর্যন্ত উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় হয়, এবং তারা আমাদের ব্যারাকে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। পাক বাহিনী মাইক দ্বারা প্রচার করতে থাকে, তোমরা আত্মসমর্পণ কর, তোমাদিগকে কিছু করা হবে না। সেই সময় আমাদের অবস্থানের চারিপাশ তারা ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। আমরা তখন বাধ্য হয়ে সেনানিবাস ছেড়ে ফুলবাড়ী নামক স্থানে ডিফেন্স নিই। সাথে সাথে আমাদের বাইরে অবস্থানরত অন্য সকল কোম্পানীকে এই ঘটনা অবগত করি।

১লা এপ্রিল সুবেদার রহমতুল্লাহ তার অবাস্থালীর মেজর সাফায়েৎ হোসেনকে হত্যা করে এবং সমস্ত জোয়ান নিয়ে ফুলবাড়ীতে চলে আসে।

৩রা এপ্রিল ঘোড়াঘাটে অবস্থানরত বি ও ডি কোম্পানী ফুলবাড়ী এসে পৌঁছে। সেই সময় আমাদের মোট শক্তি ছিল ৪৫০ জনের মত। ৪/৫ তারিখে ব্যাটালিয়নকে পুনর্গঠন করা হয় ও তিনটি কোম্পানীতে ভাগ করা হয়।

ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয় মেজর নিজাম সাহেবকে। ১টি কোম্পানীর দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্যাপ্টেন আশরাফকে। লেঃ মোখলেসকে দেওয়া হয় ১ টি কোম্পানীর দায়িত্ব। আপনার কোম্পানীর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় আমার উপর। ক্যাপ্টেন আশরাফ তার কোম্পানী নিয়ে দিনাজপুরে পথ দিয়ে সৈয়দপুর আসবে স্থির হয়। সৈয়দপুর থেকে তিন মাইল দূরে ৮ই এপ্রিল পাক বাহিনীর সাথে তার কোম্পানীর ভীষণ যুদ্ধ বাধে। এখানে পাকবাহিনীর তিনটি গাড়িসহ বহু পাকসেনা হতাহত হয়। লেঃ মোখলেস তার কোম্পানী নিয়ে নীলফামারী হয়ে সৈয়দপুর আসবে ঠিক হয়। আমার কোম্পানী এবং হেডকোয়ার্টার কোম্পানী নিয়ে আমি ফুলবাড়ী থেকে খোলাহাটিতে শিবির স্থাপন করি।

৭ই এপ্রিল সুবেদার রহমতুল্লাহ ১টি প্লাটুন নিয়ে পার্বতীপুর চলে যায়। আমি সেই দিনই আমার কোম্পানী নিয়ে বদরগঞ্জে ডিফেন্স করি।

৯ই এপ্রিল পাকবাহিনী বদরগঞ্জে আমাদের ডিফেন্সের উপর আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর পক্ষে ব্রিগেডিয়ার আব্দুল্লাহ খান মালেক যুদ্ধ পরিচালনা করে। সকাল ৯ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। শেষে পাক বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের জোয়ানরা পিছন হটতে থাকে। এই সময় আমি এক ডিফেন্স থেকে অন্য ডিফেন্সে যাওয়ার সময় বদরগঞ্জ বাজারে পাক বাহিনীর ঘেরাওয়ে পড়ে যাই। তখন তারা আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে আমার গাড়ির ড্রাইভার মারা যায়। আমি তখন গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে অন্য দিকে বদরগঞ্জ বাজারের ভিতর ঢুকে পড়ি। সেখান থেকে বহু কষ্টে বের হয়ে বদরগঞ্জ রেল স্টেশন হয়ে আড়াই মাইল গ্রামের ভিতর চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমার জোয়ানদিগকে দেখতে পাই। তখন আমার শরীর রক্তাক্ত ছিল এবং পা গুলিবিদ্ধ ছিল। সেখান থেকে আমাকে ফুলবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমার কোম্পানী খোলাহাটিতে চলে যায়।

১০ই এপ্রিল সকালে পাক বাহিনী খোলাহাটি আক্রমণ করে। সেখানে পাক বাহিনীর সাথে আমার কোম্পানী টিকতে না পেরে ফুলবাড়ীতে চলে যায়। এদিকে ক্যাপ্টেন আশরাফ ও লেঃ মোখলেসের কোম্পানীও ফুলবাড়ীতে চলে আসে।

১১ই এপ্রিল পাকবাহিনী ফুলবাড়ী আক্রমণ করে। ফুলবাড়ীতে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের ব্যাটালিয়নের ভীষণ যুদ্ধ হয়। কিন্তু পাকবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের পুরা ব্যাটালিয়ন চরখাইয়ে চলে যায়। চরখাইয়ে ডিফেন্স করে কোম্পানীগুলিকে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পথে ডিফেন্সে বসানো হয় যাতে পাকবাহিনী চরখাই আক্রমণ করতে না পারেঃ (১) ক্যাপ্টেন আশরাফের কোম্পানীকে ফুলবাড়ী-চরখাই রোডে

বসানো হয়; (২) আমি আমার কোম্পানী নিয়ে ঘোড়াঘাট-চরখাই রোডে ডিফেন্স নিই; (৩) লেঃ মোখলেসের কোম্পানীকে ডেপথ কোম্পানী হিসাবে রাখা হয়।

১৩ই এপ্রিল সংবাদ পাওয়া গেল পাকবাহিনী বগুড়া দখল করে নিয়েছে। তাই পাকবাহিনী বগুড়া জয়পুরহাট ও পাঁচবিবি রোড হয়ে হিলি দখল করে নিতে পারে ভেবে ১৪ই এপ্রিল আমি আমার কোম্পানী নিয়ে পাঁচবিবি-হিলি রোডে ডিফেন্স নিই। অপর ২ কোম্পানী চরখাইতেই ডিফেন্স নিয়ে থাকে।

১৯শে এপ্রিল পাকবাহিনী পাঁচবিবির দিক থেকে হিলি আক্রমণ করে। সেই দিন পাকবাহিনীর সাথে আমাদের চার ঘন্টা যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত হয় ও আমাদের তীব্র আক্রমণের মুখে তারা পিছন হটতে বাধ্য হয়। সেই দিন চরখাই থেকে ২ কোম্পানীকে হিলি চলে আসার নির্দেশ দিই। সেই সময় ক্যাপ্টেন আশরাফ ও লেঃ মোখলেস তাদের জোয়ানদের ফেলে চলে যায়।

২০শে এপ্রিল সুবেদার হাফিজ, নায়েক সুবেদার করম আলী, নায়েক সুবেদার শহীদুল্লাহ দুই কোম্পানীসহ হিলিতে আমার নিকট পৌঁছে। সেই দিন খুব ভোরে পাকবাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাকবাহিনীর সাথে আমাদের তীব্র যুদ্ধ চলে। অবশেষে পাকবাহিনী পিছন হটতে বাধ্য হয়। এদিকে পাকবাহিনীর মর্টার ও শেলিং-এ ভারতীয় সীমান্তের কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়। ফলে, ভারতীয় বি-এস-এফ কর্নেল মুখার্জী, পশ্চিম দিনাজপুরের ডি-এম ও পুলিশ সুপারের অনুরোধে ২০ তারিখ গভীর রাতে আমাদের ডিফেন্স ভেঙ্গে দিয়ে হিলি থেকে ১৩ মাইল দূরে ভারতের কামালপাড়া নামক স্থানে কুরমাইল বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ২৫০ জনের মত জে, সি, ও, ও জোয়ান আশ্রয় নিই। এই যুদ্ধে ৬ জন জোয়ান শাহদাৎ বরণ করে। সীমান্ত অতিক্রম করার পূর্বে চরখাই ও হিলি সরকারী গুদাম থেকে ৪শত বস্তা চাউল নিয়ে যাই। ২১শে এপ্রিল পাকবাহিনী হিলি দখল করে নেয়।

ভারতে অবস্থানকালে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে কামারপাড়া, সোবরা এবং আঙ্গিনাবাদে তিনটি অপারেশন ক্যাম্প স্থাপন করি। সুবেদার রহাফিজকে আঙ্গিনাবাদ ক্যাম্প কমান্ডার, সুবেদার আলী নেওয়াজকে কামারপাড়া ক্যাম্প ও জয়পুরহাট চিনি মিলের একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে সোবরার ক্যাম্প কমান্ডার হিসাবে নিযুক্ত করে আমি উক্ত তিনটি শিবির পরিচালনা করি।

সেই সময় বাংলাদেশের কমান্ডার-ইন-চীফ কর্নেল এম, এ, জি, ওসমানী বালুরঘাট আসেন এবং আমাকে হিলি সেক্টর কমান্ডার হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১৩ই মে পর্যন্ত আমি হিলি সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করি। আমি সেক্টর কমান্ডার থাকাকালে আরো তিনটি ক্যাম্প স্থাপন করি- মালন ক্যাম্প, তরঙ্গপুর ক্যাম্প ও তপন ক্যাম্প। মেজর নাজমুল হক আমার নিকট থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেন এবং তৎকালীন মেজর বর্তমান কর্নেল শাফায়েৎ জামিল ওয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। আমি আঙ্গিনাবাদ ক্যাম্প কমান্ডার হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি।

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত গেরিলা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় ও পাকবাহিনীর চলাচলের পথে এ্যাম্বুশ করে পাকবাহিনীকে নাজেহাল ও তাদের ক্ষতি সাধন করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, জয়পুরহাট রেলওয়ে স্টেশন অপারেশন করে পাকবাহিনীকে সেখান থেকে প্রতিহত করে ২ ট্রাক ঔষধ, ৬০ বস্তা চিনি ও কিছু কাপড় নিয়ে আসা হয়।

২৯শে মে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক কোম্পানী বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর জোয়ান নিয়ে হরতকিডাঙ্গা নামক স্থানে পাকবাহিনীর গতিপথের উপর এ্যাম্বুশ করি। সেই সময় পাকবাহিনীর এক কনভয় উক্ত পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের অতর্কিত আক্রমণে পাকবাহিনীর এজন অফিসারসহ আনুমানিক ৩০ জন নিহত হয় ও একখানা জীপ ধ্বংস হয়। আমাদের পক্ষে ইপিআর-এর জলিল শাহদাৎ বরণ করে। সেখানে একটি পিআরসি-১০ অয়ারলেস সেট ও একটি এস-এম-জি উদ্ধার করি।

২৮শে মে দিনাজপুর-ফুলবাড়ী রোডে মোহনপুর ব্রীজ এক্সপ্লোসিভ দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানেই এ্যাম্বুশ বসান হয়। ২৯শে মে ১০-১০ মিনিটে পাকবাহিনীর এক কোম্পানী ঐ পথে অগ্রসর হওয়ার সময় আমরা অতর্কিত আক্রমণ করি। সেখানে পাকবাহিনীর সহিত আমাদের চার ঘন্টা গুলি বিনিময় হয়। এখানে পাকবাহিনীর ১১ জন নিহত হয় ও ২০ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে ২ জন শহীদ হয় ও একজন আহত হয়। তাছাড়া জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রামগতি, ফুলবাড়ী, চরখাই, রামনগর, জলপাইতলী, বাজাই, আমবাড়ী, গৌরীপুর, মনুথপুর রেলওয়ে স্টেশনে রেইড, কমান্ডো ও এ্যাম্বুশ করে পাকবাহিনীর বহু ক্ষতি সাধন করি।

সশস্ত্র প্রতিরোধে রংপুর

সাক্ষাৎকার : লেঃ মোঃ আবদুস সালাম

৭-৬-১৯৭৩

২৬শে মার্চ সকাল বেলা রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল' জারী করার কথা শুনতে পাই। এই সময় হাজার হাজার ক্রুদ্ধ জনতা শ্লোগান দিতে দিতে টোগরাই হাট রেল স্টেশনে আসে এবং ৩ মাইল পর্যন্ত রেল লাইন তুলে ফেলে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

২৭শে মার্চ রংপুর থেকে একজন আর্মি ক্যাপ্টেন (নওয়াজেশ) আমাদের এখানে পালিয়ে এসে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোক্তার আহম্মদ হোসেন সরকার সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে পারি যে, ঢাকা থেকে একটা টেলিফোন আসে, তাতে ক্যাপ্টেন নওয়াজেশকে মেরে ফেলতে বলা হয়। ঘটনা চক্রে সেই সময় টেলিফোনের সামনে ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ নিজেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি টেলিফোনে উত্তরে বলেন যে, এখনই ক্যাপ্টেন নওয়াজেশকে হত্যা করছি।

ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ বিভিন্ন জায়গা থেকে পলায়নরত বাঙ্গালী পুলিশ, ইপি-আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ ছাত্র-জনতাকে নিয়ে একটা বাহিনী গঠন করেন এবং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন। ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেবের সঙ্গে আমি থানাতে গিয়ে ও, সি, কে কিছু রাইফেল দেবার জন্য বলি। কিন্তু ও, সি, রাইফেল দিতে অসম্মত হলে পরে তাকে রাইফেল দিতে বাধ্য করা হয়। থানা থেকে আমরা ২৫০টি রাইফেল যোগাড় করি।

ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের নেতৃত্বে আমরা তিস্তা নদীর পারে ডিফেন্স নিই। নদীর অপর পারে অবস্থানরত খান সেনারা রাত্রিতে আমাদের উপর শেলিং আরম্ভ করে। বলা প্রয়োজন যে, ঐ দিন সকাল ১০ টার দিকে যখন আমরা চুপচাপ ডিফেন্স নিয়েছিলাম তখন খান সেনারা আমাদের অবস্থান জানতে না পেরে তিস্তা রেল ব্রিজের উপর দিয়ে কিছু খান সেনা এপার আসে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালাই। ঘটনাক্ষেত্রেই একজন মেজরসহ ৮ জনকে হত্যা করতে সক্ষম হই। এই মেজরটির নাম ছিল মেজর এজাজ। পরবর্তীকালে তিস্তা ব্রিজের নাম পালটিয়ে খান সেনারা মেজর এজাজের নাম অনুসারে “এজাজ ব্রিজ” রাখে।

এখানে পাক বাহিনীর শেলিং-এর মুখে টিকতে না পেরে আমরা সেখান থেকে পিছু হটে কুড়িগ্রামে ডিফেন্স নিই। ৮ই এপ্রিল খান সেনারা কুড়িগ্রাম আক্রমণ করে। কুড়িগ্রামে ডিফেন্স নিই। ৮ই এপ্রিল খান সেনারা কুড়িগ্রাম আক্রমণ করে। কুড়িগ্রামের ৩ মাইল বাইরে আমরা টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। ৮ তারিখে খান সেনারা কুড়িগ্রাম দখল করে এবং ব্যাপক গণহত্যা করে এবং বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। তারা পরে সোনালী ব্যাঙ্কও লুট করে। ৯ তারিখে ছাত্র এবং গ্রামবাসী মিলে টোগরাইহাট থেকে তিস্তার প্রায় দশ মাইল রেল লাইন তুলে দিই যাতে করে খান সেনারা আমাদের এলাকায় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করতে না পারে।

টোগরাইহাটের যুদ্ধঃ আমরা পুনরায় প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত হই এবং ১৫ তারিখে আমরা টোগরাইহাটে ডিফেন্স নিই। খান সেনারা কুড়িগ্রাম থেকে একটা ট্রেন নিয়ে লাইন সারতে সারতে তিস্তার দিকে

যাচ্ছিল। ট্রেনটা যখন টোগরাইহাটের নিকট আসে তখন আমরা পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে খুব দূরে থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ি। এই গুলির আওয়াজে খান সেনারা গাড়ি থেকে নেমে পজিশন নেয়। পুনরায় আরও কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লে খান সেনারা গুলির শব্দ যেদিক থেকে আসছিল সেই দিকে ধাওয়া করে। তারা যখন আমাদের নিকটবর্তী হয় তখন আমরা তাদের উপর আক্রমণ করি। উভয় পক্ষ থেকে সমান তালে যুদ্ধ চলতে থাকে। এই যুদ্ধ ১৪ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এই যুদ্ধে বহু খান সেনা নিহত হয় বলে আমরা খবর পাই, আর বাদ বাকী সৈন্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধ শেষে আমরা যখন তিস্তা ব্রিজের দিকে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তায় খান সেনাদের তিনটা দালালকে ধরতে সক্ষম হই। এরা ঐ অঞ্চলে লুটতরাজ, ডাকাতি, নারী ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত ছিল। ঘটনাস্থলেই তাদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

সৈয়দপুর-রংপুর প্রতিরোধে ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মোহাম্মদ আবদুল খালেক

১১-১০-১৯৭৩

৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে দুটো কোম্পানী লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফজল করিমের নেতৃত্বে (যিনি ৩য় বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন) বগুড়াতে চলে যায়। দুটো কোম্পানী মেজর নিজামউদ্দীনের নেতৃত্বে ঘোড়াঘাটে (দিনাজপুর) পাঠানো হয় অনির্ধারিত সাঁতার প্রশিক্ষণের জন্য। দু'জন জুনিয়র অফিসার এবং কয়েকজন জেসিও-ও সাথে ছিল। হেডকোয়ার্টার কোম্পানী ইউনিট লাইনকে রক্ষা করার জন্য সৈয়দপুরে থেকে যায়।

২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের দিনগুলোতে প্রতিবেশী ইউনিট ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট এবং ২৩ ফিল্ড গোলন্দাজ বাহিনীর কোন নির্ধারিত প্রশিক্ষণ সূচী ছিল না। ২৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরশাদ কোরেশীকে সৈয়দপুরে গ্যারিসন কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং হেডকোয়ার্টার কোম্পানীর সবাইকে নিজেদের কাজকর্ম ছাড়াও তার নির্দেশমত কাজ করতে হত। ২৬ ফ্রন্টিয়ার কোর্স-এর কিছু লোক আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং অয়ারলেস সেটসহ পানির ট্যাঙ্ক পাহারা দেওয়ার ভান করে ইউনিটে থাকতে আরম্ভ করে। অপরপক্ষে ২৩ গোলন্দাজ বাহিনী তাদের কিছুসংখ্যক মেশিনগানকে আমাদের ইউনিটের অস্ত্রাগার, খাদ্য গুদাম, গ্যারেজ প্রভৃতি লক্ষ্য করে তাক করে রাখে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যে, আমরা এই এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এগুলো লাগিয়েছি।

এ ছাড়াও তারা স্থানীয় জনসাধারণের উপর নানা রকম নির্যাতন চালাচ্ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় জনসাধারণ সেনানিবাসে সৈনিকদের রসদপত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা গ্রামে গিয়ে জোর করে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে হাঁস মুরগী, ডিম, তরকারী নিয়ে আসত। কিন্তু বাঙ্গালী সৈন্যরা গ্রামে গেলে জনগণ তাদেরকে সবকিছু দিয়ে সাহায্য করত।

এই সময় বগুড়ার ছাত্ররা বগুড়াতে যেখানে আমাদের কমান্ডিং অফিসার অবস্থান করছিলেন সেই ভবনের উপর বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। তারা সি-ওকে ঘেরাও করে রেখেছিল। কমান্ডিং অফিসার বগুড়া থেকে ঘোড়াঘাটে চলে যান। সেখানে আরো দুটো কোম্পানী ছিল।

১৫ই মার্চ আর্টিলারী রেজিমেন্ট আমাদের ইউনিটের চারিদিকে পরিখা খনন করতে শুরু করে। আমরা ঘোড়াঘাটে আমাদের সি-ওকে এ খবর জানালাম। কমান্ডিং অফিসার কর্নেল শফি (২৩ আর্টিলারী রেজিমেন্ট) কে এগুলো বন্ধ করতে অনুরোধ জানালেন। তাঁর অনুরোধে এ সমস্ত কাজ বন্ধ করা হয়েছিল।

মেজর আখতার রিয়ারে ও-সি হিসাবে রিয়ারে রয়ে গিয়েছিলেন। সে তার বাসায় টেলিফোন বসিয়েছিল। এমনকি গোপন অয়ারলেস-এর সাহায্যে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী ইউনিট-এর খবরাখবর এবং যোগাযোগ রাখত। সে অনেক সময় কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশ পালন করত না। আমরা এ সমস্ত খবরাখবর মেজর আখতারের উপস্থিতিতে আমাদের সি-ওকে জানালাম। এ সমস্ত কার্যকলাপের কথা শুনে সি-ও-আর ঘোড়াঘাটে গেলেন না। তিনি ইউনিটে রয়ে গেলেন। তিনি আমাদেরকে সব সময় সাতুনা দিতেন এবং আমাদের উপর কোন হামলা হবে না আশ্বাস দিতেন।

রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার আমাদের সি-ওকে ঠাকুরগাঁ, বগুড়া, দিনাজপুর এবং পার্বতীপুরে যে সমস্ত সৈন্য আটকা পড়ে আছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য বলেন।

৩১শে মার্চ বেলা সাড়ে বারটার দিকে রংপুর থেকে ব্রিগেড কমান্ডার সি-ওকে টেলিফোনে ডাকেন। তিনি ব্রিগেড কমান্ডারের সাথে কথা বলেন এবং দু'টার সময় অফিসে আসেন। সুবেদার মেজর হারিস মিয়াকে তিনি ডেকে পাঠান এবং তাঁরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করেন। বের হয়ে সকলের উদ্দেশ্যে তিনি এক ভাষণ দেন, 'হাজেরানে অফিসার, সরদার আওর জোয়ানো, আপ সবকে লিয়ে ম্যায় এক খোশখবর লে আয়া হুঁ। ওয়হ ইয়ে হ্যায় কে কোর কমান্ডার, জিওসি আওর ব্রিগেড কমান্ডার কি তরফছে আপ সবকো মোবারকবাদ হ্যায়। ইস লিয়ে কে ইস ওয়াকত তক কিছি পলিটিকাল পার্টিও নে হিসসা নিহি লিয়ে, আওর ম্যায় দাওয়া কে সাথ কাহ সেকতা কে থার্ড ব্যাটালিয়ন হর তরফছে পাকিস্তান সরকারকে ওফাদার রহেগী। ম্যায় আপসে ওয়াদা করতে হুঁ আপ বরদাস্ত করে আওর মুঝ পর ভরোসা রাফে- উছ ওয়াকত তক আপকো কুয়ি কুছ নেহি বোলেগা যব তক মুঝ পর কুইভি কুছ না বোলে। তারপর তিনি এ্যাডজুট্যান্ট লেফটেন্যান্ট সিরাজুল ইসলাম এবং তিনজন এনসিও ও ৩০ জন সিপাই সাথে নিয়ে রংপুর রওনা হয়ে যান, এবং সেখান থেকে তিনি বগুড়া যান ২৬ এফ এফ এবং ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার জন্য-যারা বগুড়াতে ইপিআরদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল।

সেদিনই বেলা সাড়ে চারটার সময় ২৬ এফ-এফ এবং ফিল্ড রেজিমেন্ট (আর্টিলার) ৬৪টা কনভয় নিয়ে ঘোড়াঘাটের দিকে যায়। সেখানে ৩য় বেঙ্গলের দুটো কোম্পানী ছিল। তারা তাদের উপর অতর্কিতে ভীষণভাবে গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। অনন্যোপায় হয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকেরা ছোট অস্ত্র দিয়ে প্রত্যুত্তর দেয়। ঘটনাস্থলে ওদের ১৩ জন নিহত হয়। গ্যারিসন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল কোরেশী এবং আরো কয়েকজন সাদা পতাকা উত্তোলন করে বরং অস্ত্র সমর্পণ করে এবং বলে যে তারা মনে করেছিল এখানে ইপিআর-এর লোকজন আছে। তারা মেজর নিজামের সাথে আলাপ করল। মেজর নিজাম তাদেরকে চা পানে আপ্যায়িত করেন। লেফটেন্যান্ট রফিক তাদেরকে এগিয়ে দিয়ে যায়। যখন লেঃ রফিক কোরেশীর সাথে করমর্দন করছিল তখন কোরেশী তাকে তাঁর জীপে উঠিয়ে নেয় এবং দ্রুত চলে যায়। সাথে সাথে এলএমজি থেকে কয়েক রাউণ্ড গোলা বর্ষণ করা হয় এবং আমাদের তিনজন খেলোয়াড় ঘটনাস্থলে মারা যায়।

আমাদের কমান্ডিং অফিসার যখন রংপুর থেকে ৩০ মাইল দূরে পলাশবাড়ীর নিকটে আসেন তখন তিনি কোরেশীর কনভয়গুলো দেখতে পান। তারা সি-ওর জীপ এবং অন্য দুটো ডজ গাড়ী থামায় এবং কমান্ডিং অফিসারসহ সমস্ত বাঙ্গালী সৈনিককে গাড়ী থেকে নামানো হয় এবং নিরস্ত্র করা হয়। বংশার্জুলদের তিনটা গাড়ী তাদের কনভয়-এর মাঝখানে রেখে তারা রংপুরের দিকে চলে যান। এই সময় লেঃ রফিক লেঃ সিরাজুল ইসলামের সাথে আলাপ করতে সমর্থ হয়। লেঃ রফিক লেঃ সিরাজুল ইসলামকে কানে কানে ঘোড়াঘাটের ঘটনা বলে।

কনভয়গুলো রংপুরে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে রাত ৮টার সময় পৌঁছে এবং কর্নেল কোরেশী ব্রিগেড কমান্ডারের সাথে আলাপ করে। কিছুক্ষণ পর আবার কনভয়গুলো সৈয়দপুরের দিকে রওয়ানা হয়। সৈয়দপুরের

দু'মাইল নিকট চেকপোস্ট তৈরী করা হয়। সেখানে বংগশাহুর্লদের (৩৩ জন ছিল) সবাইকে একটা অন্ধকার দালানে তালা বন্ধ করে রাখা হয়। লেঃ সিরাজুল ইসলাম এবং রফিককে অন্য কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আমাদের কাছে কোন অয়ারলেস সেট না থাকাতে বাইরের কোন খবর পাচ্ছিলাম না। ঢাকা থেকেও কোন খবর পাই নাই। কিন্তু সৈয়দপুরে আমরা মোট ১২০ জন ছিলাম। আমরা সব সময় সতর্ক ছিলাম। আমাদের অনেকেই পরিবার নিয়ে সেখানে ছিল।

২০শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আমরা কোন চিঠিপত্র পাচ্ছিলাম না। ৩১শে মার্চ প্রচুর চিঠিপত্র আসল। আমি ওগুলো দেখতে পারলাম না, কেননা মেজর আখতার, ক্যাপ্টেন মালিক এবং আরো অনেকে আমার কোয়ার্টারে এসেছিল।

তারা বেলা ১টার সময় আমার বাসা থেকে চলে যায়। তারপর আমি অফিসে গেলাম। মেইল দেখে বাসায় ফিরছিলাম। মেজর আখতারকে আমাদের কমান্ডিং অফিসারের গাড়ীতে করে ঘুরতে দেখলাম।

আমি বাড়ীতে পৌঁছলাম এবং খেতে বসলাম। তখনও আমি জীপের আওয়াজ শুনছিলাম। আগে থেকেই মেজর আখতারের কার্যকলাপ সন্দেহজনক ছিল। তাই খাওয়া ছেড়ে আমি বেরিয়ে আসলাম। সুবেদার আলী আহম্মদকে জীপটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল যে, মেজর আখতার সুবেদার মেজর হারিস মিয়াকে ২৬এফএফ-এর কমান্ডিং অফিসারের কাছে নিয়ে গিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি সেখানে গেলাম এবং সুবেদার-মেজর এবং ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেনকে সেখানে দেখলাম। আমাদের কমান্ডিং অফিসার ২২৬-এফ, এফ রেজিমেন্ট অফিস থেকে ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও সুবেদার-মেজর হারিস মিয়াকে উপস্থিতির জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। সে সংবাদ আমাকেও তারা জানান। ওখানে বসা অবস্থায় আবারও কমান্ডিং অফিসারের টেলিফোন আসে না। তিনি ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে ২৬এফ-এফ-এর অফিসে সুবেদার-মেজরসহ যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন আনোয়ার তাতে সায়্য দেন নাই। বরং তিনি সি-ওকে নিজেদের অফিসে আসার জন্য অনুরোধ করছিলেন। কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশ অমান্য করার প্রধান কারণ হল মেজর আখতারের সন্দেহজনক কার্যকলাপ-যেহেতু তিনি নিজ অফিস সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর জীপ অফিসের সামনে দাঁড় করান নাই। কমান্ডিং অফিসার আবার ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে টেলিফোনে বলেন, ‘আনোয়ার, অনুগ্রহ করে তুমি তাড়াতাড়ি চলে আস-ম্যায় তোমহারা ভালাই কা লিয়ে বোলা রাহা হোঁ।’ আমি ক্যাপ্টেন আনোয়ারের টেলিফোন হ্যাণ্ড সেটের সংলগ্ন থাকায় কমান্ডিং অফিসারের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। সে কণ্ঠস্বর কাঁপছিল বলে মনে হচ্ছিল। সুতরাং আমি তাদের যাবার জন্য সায়্য দিলাম না। তৎক্ষণাৎ সেখানে নায়েক সুবেদার (এ্যাডজুট্যান্ট) শহীদউল্লা ভূইঞা (শহীদ) উপস্থিত হন। আমরা সবাইকে সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়েছিলাম। আনুমানিক ১৫/২০মিনিটের মধ্যে সমস্ত পরিবারবর্গ আমার বাসায় সমবেত হয়।

ঠিক ১লা এপ্রিল রাত ২-৪৫ মিনিটের সময় গোলন্দাজ বাহিনীর শেল বা গোলা আমাদের মোটর ট্রান্সপোর্ট গ্যারেজ ও পেট্রল ডাম্পে এসে পড়ে। সেখানে সমস্ত যানবাহন আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়। এত ভীষণভাবে গোলা বর্ষণ হচ্ছিল যার দরুন রাস্তার উপর বৈদ্যুতিক তারসমূহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কয়েকটা দালান, অস্ত্রাগার, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ গুদাম ধসে পড়ে যায়। তবুও অসমসাহসী ১২০ জন বংগশাহুর্ল সকাল ৮-৩০-মিনিট পর্যন্ত বীর বিক্রমে তাদের ওপর এই কাপুরুষোচিত আক্রমণকে প্রতিহত করে। জনশক্তি কম থাকায় এবং অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ না থাকায় তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। শত্রুর সংখ্যা ১৬০০ ছিল এবং তারা আধুনিক ভারী এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

১লা এপ্রিল ভোর ৫-৩০ টা নাগাদ আমি সমস্ত পরিবার-পরিজনকে (তারা প্রায় ৩০০ ছিল) নিকটবর্তী গ্রামের দিকে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হই।

এরপর আমি আমার বাসার নিকটবর্তী পরিখায় ১টা স্টেনগান, একটা এলএমজি এবং কিছু গোলাবারুদসহ অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সকাল ৮-৩০টার সময় আমার সামনে একটা মর্টারের গোলা এসে পড়ে। সুতরাং আমি পরিখা ত্যাগ করে গ্রামের দিকে অন্যান্য সঙ্গীদের খোঁজে চলে যাই।

আনুমানিক ১২-৩০টার সময় সেনানিবাস থেকে প্রায় ৫/৬ মাইল দূরে ক্যাপ্টেন আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি তখন আমার যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে আমার সুবেদারের পদবী কাঁধ থেকে অপসারিত করেন এবং সাতুনা দেন। আমরা আমাদের সৈন্যসংখ্যা গণনা করে মাত্র ৫০ জন দেখতে পেলাম। তারপর আমরা অন্যান্যদের খোঁজে বেরুলাম। কিছুসংখ্যক গুলীবিদ্ধ সৈন্যকে নিকটবর্তী বদরগঞ্জ বেসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। পাঁচজন বংশশার্দুল শহীদ হয়। বাকি সবাইকে দূরদূরান্ত থেকে একত্রিত করা হয়।

পূর্বে রাতে প্রায় ৪-৪৫টার সময় আমি সুবেদার রহমতউল্লাহর কাছে একটি চিরকুট পার্বতীপুর পাঠাই। সেখানে মেজর শাফায়াত হোসেনের (পশ্চিম পাকিস্তানী) অধীনে প্রায় ৫০ জন বংশশার্দুল ছিলেন। উক্ত চিরকুট তার কাছে বেলা ৮ ঘটিকায় পৌঁছে এবং তার মর্মানুসারে তিনি মেজর শাফায়াতকে হত্যা করে আমাদের সাহায্যের জন্য গ্রামের পথে অগ্রসর হন। সৌভাগ্যবশতঃ তার সাথে পশ্চিমধ্যে আমাদের দেখা হয়। অনুরূপ সংবাদ ঘোড়াঘাটে মেজর নিজামউদ্দিন আহম্মদের কাছেও পাঠানো হয়। কিন্তু মেজর নিজামুদ্দিন উক্ত সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও কমান্ডিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে সেখান থেকে আসতে অস্বীকার করেন।

ঘোড়াঘাটের সংঘর্ষে যে তিনজন বংশশার্দুল শাহাদৎবরণ করেন তাদের দাফনের জন্য সুবেদার আওয়াল খান (পাঠান)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। তার সাথে ১২ জন প্রহরী দেয়া হয়েছিল। সে তখন মৃতদেহ নিয়ে কারমাইকেল কলেজের (রংপুর) সামনে আসে ও রাস্তা অতিক্রম করতে থাকে তখন পশ্চিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সে গাড়ী থেকে নামার সাথে সাথে পাক সেনারা গুলী ছুড়তে শুরু করে। গুলীতে ১১ জন বংশশার্দুল নিহত হয়। আওয়াল খান গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। তাকে ছাত্ররা ধরে পিটিয়ে হত্যা করে।

খান সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞঃ যাদেরকে (৩৩ জন) সৈয়দপুরের দু'মাইল দূরবর্তী অন্ধকার দালানে তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছিল তাদের সবাইকে রাত দু'টা ৪৫ মিনিটে গুলী করে হত্যা করা হয়। সেখানে আব্দুল কাদের নামক একজন সিপাহী মৃতদেহের স্তূপের মধ্য থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের ব্যাটালিয়নের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ সৈন্য বদরগঞ্জের নিকটবর্তী খোলাহাটা নামক জায়গায় একত্রিত হয়।

আমরা ২/৩ রা এপ্রিল পার্বতীপুর আক্রমণ করি এবং পাক বাহিনীকে প্রতিহত করা হয়। কিন্তু পার্বতীপুর শহর দখল করতে ব্যর্থ হই।

১২ এপ্রিল বদরগঞ্জে পাক বাহিনীর সাথে (১৫ টি ট্রাক বোঝাই) আমাদের সংঘর্ষ হয়। পাক বাহিনীকে পর্যদস্ত করা হয়। আমি এবং সুবেদার শহীদুল্লাহ এই যুদ্ধের কমান্ড করেছিলাম।

১৩ই এপ্রিল পাক বাহিনী ট্যাংক নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হই। বদরগঞ্জ সংঘর্ষ শুরু হওয়ার প্রায় দু'ঘন্টা আগে রংপুর থেকে রংপুরের তৎকালীন এস-পি বদরগঞ্জ থানা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ২৯ ক্যান্ডলারির একজন মেজরকে পাঠান ড্রাইভারের বেশে বদরগঞ্জে নিয়ে আসে। এস-পির সাথে কথোপকথনের পর উক্ত ড্রাইভারের পরিচয় জানতে চাওয়ায় তাকে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের ড্রাইভারের পরিচয় দেয়া হয়। কিন্তু উক্ত মেজর (ড্রাইভার) আমার আগের পরিচিত ছিল। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করায় সে স্বীকার করে। পরে তাকে আমাদের ক্যাম্পে পাঠানো হয় ও হত্যা করা হয়। এস-পিকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

তারপর আমরা ফুলবাড়িতে এসে ক্যাম্প করলাম। কিন্তু মুসলিম লীগাররা আমাদের অবস্থান পাক বাহিনীর গোচরীভূত করে। সেখানেও তারা ট্যাংক নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারপর আমরা চরকাই (হিলির সীমান্তের কাছাকাছি) তে স্থানান্তরিত করি এবং আমাদের কন্ট্রোল রুমসহ হেডকোয়ার্টার তৎকালীন পাকিস্তানের হিলিতে স্থাপন করি।

২২শে এপ্রিল ১৯৭১ পাক বাহিনী আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বর্ডার বেটের ভেতরে আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকি।

২৪এপ্রিল ১৯৭১ তারা ভারতের হিলির উপরও আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করে নাই। ঐ দিন অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি ছিল এবং আমাদের সৈন্যরা তাদের সঙ্গে টিকতে না পেরে এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

২৫শে এপ্রিল ৩য় বেঙ্গলের শার্দুলগণ পশ্চিম-দিনাজপুরের কামাপাড়া স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করেন। এরা ৪র্থ এবং ৫ম সেক্টর স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

সশস্ত্র প্রতিরোধে রংপুর

সাক্ষাৎকারঃ হাবিলদার জয়নাল আবেদীন

৫-১১-১৯৭৪

২৫শে মার্চ আমি ১০ নং শাখার রংপুর ডবল সুতি বিভূষিত হাবিলদার পদে বহাল ছিলাম। ৭ ই মার্চের পর পাঞ্জাবী অফিসাররা ক'দিন পরপর গোপনে মিটিং করত, সেখানে বাঙ্গালীদের ডাকতো না। এইসব দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিল একটা কিছু হতে পারে।

১০ নং শাখার কমান্ডার ছিল একজন ইউপি। সহকারী ক্যাপ্টেন ২জন ছিল। (১) ক্যাপ্টেন ভুট্টো খান ছিল (পাঞ্জাবী) এবং অপরজন বাঙ্গালী নওয়াজেশউদ্দিনের ৫টি কোম্পানী ছিল এই শাখাতে। একটি সাপোর্ট প্লাটুনও ছিল। কোম্পানগুলো ছিলঃ চিলমারী, কমান্ডার ছিল সুবেদার আবদুল মান্নান, অপরটি বাগভাডারে যার কমান্ডার ছিল বিহারী। মোগলহাটে অপর আরেকটি কোম্পানী ছিল যার কমান্ডার ছিল সুবেদার আরব আলী। পাটগ্রামে একটি কোম্পানী ছিল, কমান্ডার ছিল সুবেদার বোরহান উদ্দিন। উইং হেডকোয়ার্টারে কোম্পানী কমান্ডার ছিল এতয়ার খান। সাপোর্ট প্লাটুন কমান্ডার ছিল নায়ক সুবেদার নূর মোহাম্মদ।

২৬শে মার্চ বিকালে ঢাকার পিলখানার হত্যাজঙ্কের খবর পেলাম। ঠাকুরগাঁওয়ে ৯নং শাখা ছিল। তারা ২৬ শে মার্চ বিদ্রোহ করে। এ খবর আমরা পেলাম।

২৭শে মার্চ সেক্টর কমান্ডার তারিখ রসুল ১০নং শাখাতে টেলিফোন করেন। সেই টেলিফোন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ ধরেন। সেক্টর কমান্ডার জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? নওয়াজেশ বলেন ‘আমি ভুট্টো’-এখনই ক্যাপ্টেন নওয়াজেশকে হত্যা কর’।

ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ পাকিস্তানীদের মতলব বুঝে জীপ নিয়ে সীমান্তের দিকে চলে যান। নায়ক সুবেদার নূর মোহাম্মদও (সাপোর্ট প্লাটুন কমান্ডার) গাড়ী নিয়ে সীমান্তে যায়। গাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে সকল কোম্পানীকে তিস্তা ব্রিজে ক্রোজ হতে বলেন।

মোগলহাট কোম্পানী লালমনিরহাট আসলো। পাটগ্রাম কোম্পানী তিস্তা চলে আসে। চিলমারী কোম্পানীর কিছু তিস্তার পারে চলে আসে। আমরা তিস্তার পারে ৪০০/৫০০ জনের মত ইপিআর ডিফেন্স নিই ব্রিজ পর্যন্ত। নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ। ৩০শে মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত এখানেই পাকবাহিনীর সাথে প্রায় রোজ যুদ্ধ হয়েছে। পাকবাহিনী ব্রিজ অতিক্রম করে এপারে আসতে পারেনি। ৫ই এপ্রিল পাকবাহিনীর ব্যাপক

আক্রমণে আমরা পিছু হটি। আমরা ফুলবাড়ী থানাতে ডিফেন্স নিই ছোট্ট একটি নদীর পারে। তিস্তা থেকে কুড়িগ্রাম রোড আমরা অবরোধ করে থাকি। ১৩/১৪ এপ্রিল আমরা ৩টি কোম্পানী নিয়ে লালমনিরহাটে আসি পাক ঘাঁটি আক্রমণের জন্য। আমরা ঐ যুদ্ধে টিকতে ব্যর্থ হই। আমাদের ৬/৭ জন শহীদ হন। আমরা আবার ফুলবাড়ী চলে আসি।

এপ্রিলের ২৫ তারিখে ১০নং শাখার সকল ফোর্স পাটেশ্বরীতে নিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ। নাগেশ্বরী থানাতে হেডকোয়ার্টার করা হয়। এখানে আমরা পাক্সা ডিফেন্স করি। আনসার-মুজাহিদসহ ১২০০ জনের মত ফোর্স ছিল। ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬শে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সময় পাকবাহিনী সাথে খণ্ড যুদ্ধ হয়।

২৪শে জুন থেকে পাকবাহিনীর ব্যাপকভাবে চারিদিক থেকে শেলিং ও বিমান হামলা করে। ২৬শে জুন আমাদের সকল ডিফেন্স থেকে মুক্তি বাহিনী পিছু হটতে থাকে এবং পাকবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এখানে কিছু শহীদ হন। এখান থেকে সুবেদার বোরহান উদ্দিনের সাথে আমাদের কোম্পানী সোনারহাট সেক্টরে চলে যায়। সুবেদার আরব আলী এবং অন্যান্যরা ভারতের শ্যামগঞ্জ পৌঁছায়। আমরা সোনারহাটে নদীর পারে ডিফেন্স নিই ৩০শে জুন। আগস্টের ২২ তারিখ পর্যন্ত এখানে আমরা ডিফেন্স করে থাকি। এই সময়ের মধ্যে সোনারহাট ব্রিজে কয়েকদিন পর পর পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ বাধতো।

সশস্ত্র প্রতিরোধে রংপুর

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ নুরুজ্জামান

১৫-৭-১৯৭৮

২৭শে মার্চ রাত ৮ ঘটিকার দিকে আমরা প্রায় ২০/২৫ জন বাঙ্গালী ইপিআর সমবেত হয়ে পরামর্শ সভা করি। নায়েক সুবেদার নূর মোহম্মদ এই পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সবাইকে সাহস দিয়ে বলেন যে, যেহেতু তিনি সবারই সিনিয়র, যেহেতু কোন ক্ষতি হলে আগে তারই হবে। কিন্তু আমি ভিন্নমত পোষণ করি ও জানাই যে, অস্বস্তিকর অবস্থায় আর বসে থাকা সম্ভব নয়। এখন আমরা নিরস্ত্র। যে কোন সময় আমাদের বিপদ হতে পারে। কাজেই হয় ব্যারাক থেকে আমাদের বেরিয়ে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে, নতুবা এখানকার অস্ত্রাগার ভেঙ্গে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আমাদের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই পরামর্শ সভায় আমরা সবাই বিপদ বুঝতে পারি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি নাই।

আমরা জানতে পেলাম যে, সাবেক বাঙ্গালী ইপিআর ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেব নিখোঁজ হয়েছেন। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পুনরায় পরামর্শ সভা হয়। অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পাঞ্জাবী সৈন্যদেরকে আঘাত হানার স্বপক্ষে আমি উক্ত সভায় সোচ্চার হই। আমাদের পরামর্শ সভা যখন চলছিল তখন শহরের সেনাবাহিনীর গ্যারিসনের সৈন্যরা উত্তর দিকের একটি পুলের নিকটবর্তী গৃহস্থ বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করছিল। আমরা আগুন দেখার সাথে সাথে সৈন্যদের মেশিনগানের গুলির শব্দও শুনতে পাই। হঠাৎ দেখতে পাই পাঞ্জাবী সৈন্যদের জীপগুলো আমাদের ব্যারাকের দিকে এগিয়ে আসছে। সবাইকে গ্রামের দিকে ঢুকে পড়তে বলা হয়। আমি নিজেও নূরুল হক নামে একজন অসুস্থ বাঙ্গালী ইপিআরকে নিয়ে নিকটবর্তী গ্রামে ঢুকে পড়ি। ব্যারাক থেকে উত্তরে প্রায় ৫ মাইল দূরে জনৈক হিন্দু গৃহস্থ বাড়ীতে প্রথমে আশ্রয় নিই।

২৮শে মার্চ ভোর বেলা কালীগঞ্জ থানার এম-সি-এ করিম উদ্দিন সাহেবের নিকট উপস্থিত হই। তাঁর সাথে পরামর্শ করে প্রায় ৩০ জন ছাত্রকে জোগাড় করা হয়। সীমান্তবর্তী ভারতীয় ফাঁড়ি থেকে কিংবা ভারতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে মাইন ও এক্সপ্লোসিভ আনার জন্য ছাত্রদেরকে পাঠানো হয়। এরপর তাড়াহুড়ো করে স্থানীয় আসসার-মুজাহিদ ও ছাত্রদের সমন্বয়ে প্রায় ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করে আমরা তাদেরকে

* স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প কর্তৃক সংগৃহীত।

প্রশিক্ষণ দানের কাজ শুরু করি। এম-সি-এ করিম উদ্দিন সাহেব মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঐ দিনই রংপুর জেলার ভারত সীমান্তবর্তী পাটগ্রাম, লালমনিরহাট, হাতিবান্দা, কালীগঞ্জ, থানার সমস্ত ইপিআর ফাঁড়িগুলোতে সংবাদ পাঠানো হয়। এই সংবাদে সাবেক ইপিআরদেরকে সশস্ত্র অভিযানের জন্য সংগঠিত হয়ে একযোগে রংপুর শহরে অবস্থিত সামরিক গ্যারিসনের দিকে অগ্রসর হবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল।

১লা এপ্রিল সাবেক ইপিআর কোম্পানী প্রধান সুবেদার বোরহান উদ্দীন বাঙ্গালী ইপিআরদেরকে সংঘবদ্ধ করে পাকিস্তানী সৈন্যদের অগ্রাভিযান প্রতিরোধের জন্য কাকিনা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ডিফেন্স দেন। এদিকে আমি দ্রুত মুক্তিযোদ্ধাদের দু'টি কোম্পানী গড়ে তুলি। এই কোম্পানী দু'টির কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মুজাহিদ তমিজ উদ্দিন এবং আনসার কমান্ডার রিয়াজ উদ্দিন। মুজাহিদ ক্যাপ্টেন তমিজ উদ্দিন পরে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে নিহত হন। মুজাহিদ ক্যাপ্টেন তমিজ উদ্দিন তার কোম্পানীসহ সুবেদার বোরহানের কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কমান্ডার রিয়াজউদ্দিনকে তার কোম্পানীসহ গঙ্গাচড়া ও কালীগঞ্জ থানার তিস্তা নদীর তিনটি ঘাট পাহারায় নিয়োজিত করা হয়েছিল।

৮ই এপ্রিল রাত ১টার দিকে সুবেদার বোরহানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি কোম্পানী লালমনিরহাট থানা হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের পরপরই সুবেদার বোরহান তার কোম্পানীকে সরিয়ে কুড়িগ্রাম মহকুমা শহরের দিকে নিয়ে যান।

৯ই এপ্রিল পাকিস্তানী সৈন্যরা কালী বাজারের কাছাকাছি এসে পড়লে আমরা সবাই সরে পড়ি। ১৪ই এপ্রিল ফুলবাড়ী থানায় উপস্থিত হই। এই ফুলবাড়ী থানাতেই সাবেক ইপিআর ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেবের সাথে আমাদের দেখা হয়। ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের সাথে ঐসময় দ্বিতীয় কোন অফিসার ছিল না তিনি আমাকে ভারত সীমান্তবর্তী থানা ভূরঙ্গামারীতে নিয়ে যান। আমি নওয়াজেশ সাহেবের সহকারী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করি। প্রকৃতপক্ষে ভূরঙ্গামারী থানা হেডকোয়ার্টার ঐ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি পুরো সেক্টরে পরিণত হয়েছিল। রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে থেকে সাবেক ইপিআর মুজাহিদ-আনসার এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ দলে দলে ভূরঙ্গামারী থানায় আসতে থাকে। আমরা তাদেরকে নিয়ে ছয়টি কোম্পানী গঠন করি। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ভূরঙ্গামারী থানা সদরেই দেয়া শুরু হয়। সুবেদার বোরহান পাঁচগাছি থেকে কাউয়াহাঙ্গা পর্যন্ত ধরলা নদীর বিস্তৃত নদী তীর এলাকা জুড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি কোম্পানী মোতায়েন করেন। অপরদিকে সাবেক ইপিআর সুবেদার আরব আলী কাউয়াহাঙ্গা থেকে গোরল মঞ্জিল পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে দুটি কোম্পানী মোতায়েন করেন।

কুড়িগ্রাম মহকুমা শহরে পাকিস্তানী সৈন্যরা অবস্থান গ্রহণ করার পর ভূরঙ্গামারী থানার ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধাদের পাঠানো হয়। তারা অধিকৃত কুড়িগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী উলিপুরে সাফল্যের সাথে গেরিলা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়।

নবগঠিত বাংলাদেশ বাহিনীর সি-ইন-সি কর্নেল ওসমানী ২৪শে মে ভূরঙ্গামারী থানা হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনে আসেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য এবং কুড়িগ্রাম শহরের সাথেই প্রবাহিত ধরলা নদীর উত্তর তীরস্থ আমাদের প্রতিরোধ ঘাঁটি মজবুত করার জন্য পর্যন্ত ও ভারী অস্ত্র প্রদানের আহবান আমরা জানাই। এর ফলে আমরা ভারত থেকে দুটি এসএমজি ও দুটি ৮১ এম-এম মর্টার পাই। এই অস্ত্র দুটো ধরলা নদীর উত্তর তীরস্থ পাটেশ্বরী ডিফেন্স ও কাউয়াহাঙ্গা ডিফেন্স ব্যবহার করা হয়। হানাদার বাহিনী প্রতিরোধে এই অস্ত্র খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত উক্ত এসএমজি দুটো ফেরত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে এসএমজি দুটো তাড়াছড়ো করে ফেরত দেয়া হয়।

এদিকে ২৬শে মে পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারী কামানের সাহায্যে পাটেশ্বরী প্রতিরোধ ঘাঁটিতে তীব্র আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানী সৈন্যরা ধরলা তিস্তা নদীর তীর থেকে শেল বর্ষণ শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা ভারী অস্ত্রের অভাবে বাংকার থেকে উঠে ভূরঙ্গামারীর দিকে ফিরে আসতে থাকে। মূলতঃ ঐ দিনই পাটেশ্বরী প্রতিরোধ ঘাঁটি ভেঙ্গে যায়।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ঠাকুরগাঁ-দিনাজপুর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০। দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁ অঞ্চলে সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সশস্ত্র প্রতিরোধে ঠাকুরগাঁ-দিনাজপুর
সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিন
১২-৬-১৯৭৪

২৫শে মার্চের বিকালে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, পিলখানা হইতে প্রেরিত বেতার সংকেত কিছুই আমাদের কানে পৌঁছে নাই। হঠাৎ মাঝরাতে কি এক জরুরী ডাকে আমাদের নবম শাখার ছোট কর্তা ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম এক প্লাটুন লোক নিয়ে দিনাজপুর গেলেন। সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল তারেক রসুল কোরেশীর সঙ্গে কি যেন আলোচনা হইল। ভোর রাতে সদলবলে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ২৬শে মার্চের ভোর। আসিয়াই ক্যাপ্টেন ঠাকুরগাঁ হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত তামাম জুনিয়র কমান্ডারগণকে অফিসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জরুরী সভা করিয়া সরকারের আদেশ সবাইকে জানাইয়া দিয়া হাজির রিজার্ভ কোম্পানীসহ বাকী সবাইকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ সামরিক সাজে সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন। উপস্থিত সকলেই “বহুত আচ্ছা সব” বলিয়া যে যার কাজে লাগিয়া পড়িল।

এদিকে উইং অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ হুসেন সীমান্ত পরিদর্শনে পঞ্চগড়ের দিকে বাহিরে ছিলেন। তাকে বিশেষ করিয়া ডাকিয়া পাঠান হইল। সকলেই রণ সাজে সজ্জিত হইয়া গভীর আগ্রহে বসিয়া আছে। ঠাকুরগাঁ টাউন ততক্ষণে ফাটিয়া পড়িয়াছে, জনতার বান ডাকিয়াছে, রাস্তাঘাটে ব্যারিকেড তৈরী করা হইতেছে ইট পাথর ও অন্যান্য জিনিস দিয়া শত শত গাছ কাটিয়া। উইং হেডকোয়ার্টারে আত্মরক্ষামূলক সামরিক ব্যূহ রচনা করিয়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হইল। এমন সময় প্রায় ৯ টার দিকে মেজর আসিলেন, আবার জরুরী সভা বসিল। খামাখাই ছুতানাতায় নেহাৎ ভাল মানুষ বলিয়া সুপরিচিত মেজর বিষম রাগত হইয়া উঠিলেন সবার প্রতি, আর রিজার্ভ কোম্পানীর অধিনায়ক সুবেদার হাফিজকে তো একেবারে হাজতে দিবেন বলিয়া শাসাইলেন। তাহার অপরাধ কোম্পানী রণপ্রস্তুতি নিতে একটু দেরী করিয়া ফেলিয়াছে। মওকা বুঝিয়া ক্যাপ্টেনও এক ধাপ আগ বাড়িলেন-বলিলেন, “ও দিন ভুল যাও -আওয়ামী লীগ-মীগ নেহী চলে গা।” তাহাদের মনের খবর পাওয়া গেল। আমরা চুপচাপ শুধু নীরব শ্রোতা। দীর্ঘশ্বাসটি পর্যন্ত না ফেলিয়া কাজ করিয়া যাইতে লাগিল আমাদের লোক। তবে বাঙ্গালী সৈনিকের অবস্থাটা বেশ গভীরভাবে আঁচ করিতে পারিল। ডাক-তার না থারিলেও বাতাস যেন কানে কানে চুপে চুপে সব খবর দিয়া যাইতে লাগিল। এমনভাবে সমুদয় বাঙ্গালী সৈনিকের মন পুরাদস্তুর বারুদের ঘর হইয়া উঠিল। অপেক্ষা একটু মাত্র ইঙ্গিতের কিন্তু আমি লোকদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম।

এদিকে কালবিলম্ব না করিয়াই বড় কর্তার আদেশে টাউনে পেট্রল পাঠানো হইল, আর কারফিউ জারী থাকিল দিন-রাত। কিন্তু হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা সকল আদেশ অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করে এবং নানা জায়গায় বেরিকেড স্থাপন করিয়া চলিল। মেজর ও ক্যাপ্টেন আমাকে সঙ্গে নিয়া শহরে গেলেন এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা নেন। সেইদিন বেলা দশ ঘটিকার সময় মিছিলের উপর গুলি চালানো হয়। ফলে রিকশাওয়ালা মোহাম্মদ আলী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আমাদের লোক আরও খাপ্পা হইল; আমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া আমার কয়েকজন সহকর্মীসহ পরিস্থিতি সম্পর্কে পরামর্শ করিলাম এবং সকল আলোচনা গোপন রাখা হইল।

আবার সেই দিনই (২৬শে মার্চ) দিবাগত রাত্রে বাঙ্গালী ক্যাপ্টেন নজির আহমেদ সুবেদার আতাউল হকসহ ৩০ জনের একটি প্লাটুন সেক্টর সদর দিনাজপুর হইতে আমাদের সাহায্যার্থে ঠাকুরগাঁ আসিয়া হাজির হইলেন। এই দলে পশ্চিমারা ছিল প্রায় ডজন খানেক। আমাদের হেডকোয়ার্টার সংরক্ষণ ও টাউন পেট্রল ডিউটি সমানে চলিতে লাগিল। প্রায় এক কোম্পানী লোক ইহাতে নিয়োজিত রহিল। ২৭তারিখ আবার ঠাকুরগাঁ টাউন রক্তে রঞ্জিত হইল আমাদের নির্মম গুলির আঘাতে। এই একটি নিষ্পাপ শিশু নিহত হইল। আমাদের ডিউটি চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহারা ততক্ষণে টাউন ছাড়িয়া পলাইতে শুরু করিয়াছে।

আমি সেই দিনই সুবেদার হাফিজ, সুবেদার আতাউল হক, নায়েক সুবেদার মতিউর রহমান, হাবিলদার আবু তালেব ও নায়েক আব্দুল হাকিমকে নিয়া এক গোপন আলোচনা সভায় বসিয়া সিদ্ধান্ত নিলাম পরদিন ভোর ৬টায় পশ্চিমাদের উপর আমাদের তরফ হইতে আক্রমণ চালানো হইবে। কিন্তু হায়, পরিকল্পনা অনুসারে সুবেদার হাফিজ যখন পশ্চিমানিধনে উদ্যত হইলেন তখন জনৈক বাঙ্গালী হাবিলদারের অসহযোগিতার দরুন তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সেই দিনকার মহত আক্রমণ স্থগিত রহিল। আমরা বিশেষ চিন্তিত হইলাম, কারণ, একেত শুরুতেই বাধা আসিল, দ্বিতীয়তঃ যদি আমাদের উদ্দেশ্য ফাঁস হইয়া যায় তবে আর রক্ষা থাকিবে না।

খোদার উপর ভরসা করিয়া সেই দিন চুপ থাকিলাম। কিন্তু সহকর্মীদেরকে নির্দেশ দিলাম সকলেই যেন জরুরী নির্দেশের অপেক্ষায় সব সময় সজাগ থাকে। এই সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ আমাদের কর্মসূচী জানিবার জন্য বার বার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কিন্তু তাহাদেরকে বলি যে সুযোগ আসিলেই তাহা করা হইবে এবং আপনারা সজাগ থাকিয়া আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিবেন।

২৮শে মার্চ ভোরেও বিশেষ কারণে পরিকল্পনামাফিক আমাদের পশ্চিমাদের উপর আক্রমণ চালানো সম্ভব হইল না। মনটা একেবারে বিগড়াইয়া গেল। খোদা না করুন আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস হইয়া গেলে এর পরিণাম কি হইবে! আবার ঐদিকে আমাদের পাঞ্জাবী মেজর ও ক্যাপ্টেনসহ পশ্চিমাদের তৎপরতা বেশ বাড়িয়া উঠিল। আমরা সরকারী কার্যের মধ্য দিয়া খুব সতর্ক থাকিলাম। সেই দিন রিজার্ভ কোম্পানী কমাণ্ডার সুবেদার হাফিজ সেইদিনকার মত টাউন ডিউটি শেষ করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজ বিছানায় শুইয়া নানা চিন্তায় মগ্ন। প্রোগ্রাম মাফিক তার পরবর্তী ডিউটি ছিল পরদিন অর্থাৎ ২৯শে মার্চ সকাল পৌনে সাতটায়, কিন্তু সেই দিন হঠাৎ করিয়া বিকাল পৌনে চারটায় তাহাকে জরুরী পেট্রলে পাঠানো হয় ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুর হাইরোড পর্যবেক্ষণ ও পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে। মেজর হুসেন নিজে তাহাকে পেট্রল সম্বন্ধে বিস্তারিত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সুবেদার হাফিজ প্রভুর ইশারায় বলিতে গেলে আদেশ বর্হিভূত কাজ করিয়া অনেক দূর পথ অগ্রসর হইলেন। ফলে পথিমধ্যে দিনাজপুর হইতে পলায়নপর বাঙ্গালী ইপিআর জোয়ানদের নিকট জানিতে পারেন সেই দিন দুপুরেই দিনাজপুর সেক্টর হেডকোয়ার্টার কুটিবাড়ীতে বাঙ্গালী ইপিআর লোকদের সঙ্গে আর্মি ও ইপিআরের পশ্চিমাদের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হইয়া গিয়াছে। এক নিমেষে মনে মনে তিনি নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া সাত তাড়াতাড়ি উইং সদরে ফিরিয়া আসেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। আসিয়াই তিন মাগরেবের নামাজের জন্য আমাকে মসজিদে উপস্থিত পান এবং উপরোক্ত বিষয় অবহিত করেন। অপরদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম রাত্রি পৌনে ১১টায় উইং-এর শেষ পেট্রল লাইনে ফিরে আসার পরপরই বাঙ্গালীদের উপর হামলা শুরু করার নির্দেশ এবং আমাকে গ্রেফতার করার আদেশ সৈয়দপুর আর্মি হেডকোয়ার্টার দিয়া দিয়াছে। অতএব আমার বাসায় সুবেদার হাফিজ, ৮উইং-এর সুবেদার আতাউল হক, নায়েক সুবেদার মতিয়ুর রহমান ও আরও জন তিনেক জোয়ান একত্রিত হইয়া মিনিট কয়েকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিলাম বিপ্লব ঘটাইবার এবং সেই রাতেই। এমন সময় উইং কমাণ্ডার হইতে আদেশ আসিল সব হাতিয়ার ম্যাগাজিনে জমা দিতে হইবে। মুহূর্তে খানদের চক্রান্ত সম্বন্ধে আমার দ্বিধা দূর হইল। আমি আরও শক্ত হইয়া বাঙ্গালী সহকর্মীদেরকে অস্ত্র জমা না দিবার নির্দেশ দিলাম। পরম পরিতোষের বিষয় কসলেই একবাক্যে আমার আদেশ মান্য করিল এবং হাতিয়ার জমা দেওয়া হইল না একটিও। বিপ্লব করিতেই হইবে, অথচ এদিকে অসুবিধা ছিল ঢের। গোটা এক প্লাটুন টাউনে গিয়াছে পেট্রলে, বাকী সব

লোক উইং সদরের চতুর্দিকস্থ পরিখা-বিবর ঘাঁটিতে ডিউটিরত। লাইনে হাজির লোক খুব কম, আবার ওদের সঙ্গে উঠাবসা-শোয়ার ব্যবস্থা। তথাপি কমাগুরগণ নির্দেশ মারফিক আপন-আপন গ্রুপের লোকজনদের গোপনে ইশারায় সব বলিয়া দিলেন। অতি সতর্কতার সহিত প্রস্তুতি চলিল। প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও অনেককেই এই সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে দেখা গেল। তবে মঙ্গলময়ের আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া সুবেদার হাফিজ খুবই সক্রিয় ছিলেন। তিনি উইং-এর পুরা রক্ষাব্যূহ ঘুরিয়া প্রতিটি মরিচায় যাইয়া প্রতিটি বাঙ্গালীর কাছে পৌঁছাইয়া দিলেন অপারেশনের নির্দেশ এবং বাহিরে পেট্রল পার্টির সাথে যোগাযোগ রাখা হইল। খোদাকে ধন্যবাদ কেহ সেই দিন না বলে নাই, যদিও মনে মনে ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল অনেকেই।

রাত ১০টা ১৮ মিনিট। চারিদিকে অন্ধকার, থমথমে ভাব। সুবেদার হাফিজের হস্তস্থিত ঠোঁট স্টেনগানটা হঠাৎ গর্জিয়া উঠিল। মেজর আর ক্যাপ্টেনের দেহরক্ষীদের অধিনায়ক হাবিলদার মোহাম্মদ জামান বুকে গুলিবিদ্ধ হইয়া পরকালের যাত্রী হইল তাহারই গার্ড-রুমের বিছানায়। ইশারা বুঝিয়া পর মুহূর্তে আরও অনেক ক্ষমর্ত হাতিয়ার গর্জিয়া উঠিল একসঙ্গে। বেশ কয়জন পশ্চিমা পরপারের যাত্রী হইল। আমাদের লোক ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি দিয়া বিজয়বার্তা ঘোষণা করিল। থামিয়া সারা রাত ধরিয়া ফায়ার চলিল, যদিও আমার মতে আদৌ এর দরকার ছিল না। ঐদিকে গোলাগুলির ফাঁকে এক সময়ে বর্ডার কোম্পানীগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হইল সব পশ্চিমা খতম করতঃ সামান্যসংখ্যক লোক পিছনে রাখিয়া অধিকাংশকে ঠাকুরগাঁ পাঠাইয়া দিতে। রাতের অন্ধকারে তেতলা দালান, বাসাবাড়ী ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে চতুর্দিকে লোক ছড়াইয়া ছিল, তাই একেবারে পশ্চিমা নিধন পর্ব শেষ হইল না। অধিকন্তু নানা সুযোগে নানা জায়গায় কিছুসংখ্যক পশ্চিমা হাতে অস্ত্র তুলিয়া নেয়। তাই আরও কিছুটা সময় লাগিল আমাদের। এই এলোপাতাড়ি পাতলা ফায়ারের ভিতর দিয়া আমাদের বাঙ্গালী পরিবারগুলিকে শহরে স্থানান্তরিত করিয়া দিলাম। শহরবাসীরা প্রথমে গোলাগুলির শব্দে ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়া পড়িলেও অনতিবিলম্বে আমাদের বিজয় সংবাদ শ্রবণে হাজার হাজার মুক্তিপাগল মানুষ সমবেত কণ্ঠে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনিসহ বিভিন্ন শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল এবং তাহারা বিভিন্ন প্রকারে আমাদের সাহায্য করিতে লাগিল। সেই দিন ভোররাতে বাঙ্গালী ক্যাপ্টেন নজীর আহমদ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম ও তাহার স্ত্রীকে নিয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করিতে থাকেন সম্ভবতঃ সৈয়দপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পদব্রজে সামান্য কিছু দূর যাওয়ার পরই ক্ষীণ জনসাধারণের হাতে মারা পড়েন। ওদিকে সেইদিন ভোররাতেই ৮-উইং হইতে আসা সুবেদার আতাউল হক শহীদ হন। এই বিপ্লবে তাহার ভূমিকা অতি প্রশংসনীয়। তাহারই যোগসূত্র ক্রমে সেই রাতে ই হাজার হাজার লোক টাউনে বাহির হইয়া পড়ে এবং তাহারা আমাদের সহযোগিতা পাইয়া আবার শতগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠে এবং আমাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসে।

২৯শে মার্চ সকালবেলা সামান্য গোলাগুলি চলিতে লাগিল। অবশিষ্ট খানরা দালানকোঠায় থাকিয়া ফায়ার করাতে তাহাদিগকে কাবু করা গেল না। আমরা ছাত্র, জনসাধারণ ও স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারী বিশেষ করিয়া ওয়াপদা বিভাগের লোকদের সহায়তায় ছাউনি হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় সব হাতিয়ার, গোলাগুলি ও অন্যান্য বহু জিনিসপত্র অন্যত্র সরাইয়া নিলাম।

২৯শে পার হইয়া ৩০শে মার্চের সকাল। আমি সুবেদার মতিউর রহমানকে এক প্লাটুন লোকসহ ঠাকুরগাঁ হেডকোয়ার্টারকে শত্রুশূন্য করার নির্দেশ দিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার দলবল নিয়া অগ্রসর হইলেন কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টার পর খানদের ব্যূহ ভেদ করিতে না পারিয়া ফেরত চলিয়া আসিলেন। তখন সুবেদার হাফিজ তাহার কোম্পানীর কিঞ্চিদধিক এক প্লাটুন লোক নিয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং বিকাল প্রায় তিনটা নাগাদ তেতালা দালানের শেষ দুশমনটি পর্যন্ত খতম করিয়া তাহা পরিষ্কার করেন। তাহারই আদেশে প্লাটুন কমাগুর বজল আহমদ চৌধুরী একদল লোক নিয়া উইং অধিনায়কের বাসভবন মুক্ত করেন। মেজর হোসেন এই সময়ই নিজ বাসভবনে নিহত হন। একই সময় যুগপৎ আক্রমণ করিয়া নায়েক সুবেদার মতিউর রহমান পাক আর্মির গেরিলা সুবেদার ও তাহার সঙ্গীদের খতম করিয়া জেসিও মেস পরিষ্কার করেন। পাবলিকের সহায়তায়

অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মৃতদেহ অন্যত্র সরাইয়া দাফন করিয়া ফেলা হয়। আর এদিকে দ্রুতগতিতে লাইনের ভিতরকার সবকিছু যথাসম্ভব গোছগাছ করিয়া নিয়া হেডকোয়ার্টারের চতুর্দিকে দৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করা হইল। সুবেদার হাফিজের নেতৃত্বে তাঁহার নিজস্ব ডি কোম্পানী ব্যতীত আরও কিছু আসার-মুজাহিদ এই প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে মোতায়েন রহিল।

ওদিকে স্থানীয় এম-সি-এ জনাব ফজলুল করিমের নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁ শহরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হইল। আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ স্বেচ্ছায়ই তাহারা গ্রহণ করিলেন। তাহাদের কর্তব্য ঠিচ্ছল শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনমত যুদ্ধরত লোদের নানা কাজে সাহায্য করা। ছাত্র-জনতা আমাদের পার্শ্বে থাকিয়া যে সাহায্য করিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্থানীয় নারী সমাজ পর্যন্ত এই সংগ্রামে প্রচুর সাহায্য ও সমর্থন দিয়াছে। ঐ দিন (৩০শে মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত সীমান্তস্থ কোম্পানীসমূহের লোকজন ঠাকুরগাঁয় আসিয়া সমবেত হয়। আমাদের জোয়ানরা ও স্থানীয় জনসাধারণ আমাদের মেজর পদে বরিত করিয়া যুদ্ধের পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ঘোর দুর্যোগের সময় এত বড় দায়িত্ব আমাকে বহন করিতে হইল। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নাম স্মরণ করিয়া জনসাধারণের শুভাশীষ নিয়া আমি আমার ব্যাটালিয়নকে পুনর্গঠন করিয়া আগামী দিনের জন্য সকলকে তৈয়ার করিতে লাগিলাম এবং সামান্য ভাষণের মাধ্যমে আমরা সমবেতভাবে শপথ নিলাম।

এই দিন বিকালেই সুবেদার আবদুল খালেকের নেতৃত্বে আমাদের দুই কোম্পানী এবং এক কোম্পানী মুজাহিদকে সাধ্যানুযায়ী সুসজ্জিত করিয়া ঠাকুরগাঁর ২৩ মাইল আগে ভাটগাঁও পুল প্রতিরক্ষার্থে পাঠানো হয়। নায়ক সুবেদার বদিউজ্জামানের অধীনে আমাদের সি কোম্পানীকে এক কোম্পানী মুজাহিদসহ দেবীগঞ্জে পাঠানো হইল। হাবিলদার নুর মোহাম্মদের অধীনে এক প্লাটুন ইপিআর এবং এক প্লাটুন মুজাহিদ শিবগঞ্জ বিমান বন্দর প্রতিরক্ষার জন্য পাঠানো গেল। বাকী সদর কার্যালয়ের সঙ্গে এক কোম্পানী অতিরিক্ত হিসাবে রাখা হইল। সে রাতেই আনসার-মুজাহিদ ভাইয়েরাও অধিক মাত্রায় আসিয়া একত্রিত হইতে লাগিল। সহকারী আনসার এ্যাডজুটেন্ট (মহকুমা) জনাব কবির তাহাদিগকে পুনর্গঠন করিয়া আমার পার্শ্বে থাকিয়া অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন। আমরা সীমান্ত এলাকাকে দুইটি সাব সেক্টরে ভাগ করিয়া সুবেদার আবুল হাশেম ও নায়ক সুবেদার হাজী মুরাদ আলীকে যথাক্রমে পঞ্চগড় সাবসেক্টর ও রুহিয়া সাবসেক্টরের দায়িত্বভার অর্পণ করি এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলি তাহাদের দায়িত্বের অন্তর্গত করিয়া দিইঃ (১) সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা আঞ্চলিক আনসার-মুজাহিদদের সহযোগিতায়; (২) এলাকায় জনসাধারণের এবং সরকারী বেসরকারী সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা; (৩) আনসার মুজাহিদদের পুনর্গঠন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা; (৪) বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সদর কার্যালয়ে অবহিত করা; (৫) বন্ধুরাষ্ট্রের যে কোন সাহায্যের জিনিসপত্র সমিতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বন্টনের তদারক করা; (৬) রণাঙ্গনের খবর কতিপয় নির্দিষ্ট লোককে জ্ঞাত করানো। এমনভাবে সবরকম আদেশ উপদেশ দিয়া তাহাদেরকে নিজ নিজ জিম্মাদারী এলাকায় মোতায়েন করা হইল।

ইতিমধ্যে হেডকোয়ার্টার এবং বর্ডারের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত বিপ্লব অপারেশনের বিস্তারিত খবর আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। হিসাবে দেখা গেল, এই অপারেশনে বর্ডারে আমাদের একজন মাত্র লোক আহত হইয়াছে। সে হাবিলদার আব্দুল আজিজ। হেডকোয়ার্টারে চারজন ঘোরতর জখম ও দুই জন শহীদ। জখমী (১) হাবিলদার দীন মোহাম্মদ (২) সিপাহী ওলিউল্লাহ ভূঞা (৩) সিপাহী আবু তাহের (৪) একজন মুজাহিদ কমাণ্ডার এবং শহীদ (৫) সুবেদার আতাউল হক (৬) ল্যান্স নায়ক জয়নাল আবেদীন। এই সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে আমরা এক মেজর ও এক ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ১১৫ জন খান সেনাকে খতম করি-তাহাদের অধিকাংশই ছিল কমিশনড, জুনিয়র কমিশনড ও নন কমিশনড অফিসার এবং বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতায় পরিপক্ব ও সামরিক প্রশিক্ষণে নিপুণ আর সর্বোপরি এই এলাকার রাস্তাঘাট ও অবস্থান এবং আমাদের বৈশিষ্ট্য সমন্ধে ছিল বিশেষ

ওয়াকিফহাল। তাই সার্বিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা আমাদের পক্ষে ছিল এক বিরূপ সাফাল্য। পশ্চিমা হতাহতদের মধ্যে ছিল ইপিআর-এর ১০৪, আর্মির ৮ এবং বিমান বাহিনীর ৩ জন।

৩০শে মার্চ হইতেই সকল গ্রামেগঞ্জে, স্কুল কলেজে যুবকদের সামরিক শিক্ষা চলিতে লাগিল। আমরা ব্যাটালিয়ন ছাড়া একদিনের মধ্যেই এক ব্যাটালিয়ন আনসার ও এক ব্যাটালিয়ন মুজাহিদ পুনর্গঠিত হইল। এক ব্রিগেডের মত শক্তি নিয়া (অবশ্যই শুধু সংখ্যানুপাতিক) আমরা বিখ্যাত সৈয়দপুর শত্রু ছাউনি আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলাম। এই দিকে দিনাজপুর হইতেও সাহায্য পাইবার আশ্বাস পাইলাম। পরিকল্পনা অনুসারে ইপিআর, আনসার ও মুজাহিদদের মিলিত বাহিনীকে প্রয়োজনভিত্তিক প্লাটুন ও কোম্পানী পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা হইল বিশেষ করিয়া সৈয়দপুর- ঠাকুরগাঁও মধ্যে যোগাযোগকারী বিভিন্ন রাস্তার উপর অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ডাইনে বীরগঞ্জ, শালবাগান, ভাতগাঁও এবং বায়ে খানসামা, দেবীগঞ্জ, জয়গঞ্জ, বারবাড়ী প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি রক্ষাবূহ তৈয়ার করিয়া আরও অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইলাম। অবশ্য স্থানগুলি ছিল একে অন্য হইতে বহু দূরে এবং যোগাযোগের দিক দিয়া একেবারেই বিচ্ছিন্ন। না ছিল কোন পজিশন অন্য পজিশনের বদলী বা অবস্থান- প্রস্থানের কিছুই জানিত না। অথচ আধুনিক সমরে এ রীতি সম্পূর্ণ অচল। খাদ্য এবং অন্যান্য সামরিক সরবরাহের ব্যাপারও ছিল সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল। কাজেই অনাহার- অর্ধাহার ছিল নিত্যসঙ্গী।

ইতিমধ্যে সৈয়দপুরে ৩নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিলাম, তবে মাত্র তাহাদের সি কোম্পানীর লোকজন সেখানে ছিল। তাঁহারাও ততক্ষণে খানদের দ্বারা একবার আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত অবস্থায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের কোম্পানীর লোকজন পুরা ছিল না এবং তাহার নেতৃত্ব দিতেছিলেন ক্যাপ্টেন আশরাফ। যাহাই হউক, তাহাদের সহযোগিতায় সৈয়দপুরের দিকে অগ্রাভিযানের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। পিছনের দিকে পূর্বে কথিক হাবিলদার নূর মোহম্মদের নেতৃত্বাধীন প্লাটুনদ্বয় ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দরের হেফাজত করিতে লাগিল এবং তথাকার ম্যানেজার আতাউর রহমান ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বিমানবন্দরকে নানা উপায়ে শত্রুর ব্যবহারের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলা হইল।

৩১শে মার্চ। বন্ধুরাষ্ট্রের ৭৫ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ডার কর্নেল ব্যানার্জী সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করিলাম। তিনি সব রকম সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পহেলা এপ্রিল রাত্রে কর্নেল ব্যানার্জী সাহেবকে আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করাইলাম, তিনি আমাদের কাজের বিশেষ প্রশংসা করতঃ তাঁহার নিজের কিছু পরিকল্পনা ব্যক্ত করিলেন। আমরা তাঁহার উপদেশ মত নিজ বাহিনীকে সৈয়দপুরের আরও কাছাকাছি নিয়া যাইবার পরিকল্পনা নিলাম। ২রা এপ্রিল হঠাৎ আমরা পুরানো কমান্ডিং অডফিসার পাক আর্মির অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম, টি হুসেন আমার সহিত দেখা করিয়া আলাপচারী হইলেন। তাঁহার প্রাথমিক আলাপের অবিকল উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইলঃ “সুবেদার মেজর সাহেব, আপনি আপনার লোকজনসহ দেশের মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়াছেন তাহা সত্যি অদ্ভুত। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে কাজ করিবার সুযোগ দিবেন কি।” আমি আনন্দের সঙ্গে তাহাকে গ্রহণ করিলাম ও আমাদের কমান্ডিং হিসাবে নিযুক্ত করিলাম।

এক্ষণে আমরা আরও নতুন উদ্যম নিয়া কাজ করিতে লাগিলাম। পরদিন ৩রা এপ্রিল আমরা দিনাজপুর গেলাম এবং সেখানকার সরকারী ও বেসরকারী নেতা ও কর্মচারীবৃন্দকে নিয়া একটি সভা করিয়া আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়া আলোচনা করিলাম। পরিকল্পনা মাসিক ঐদিন ৩রা এপ্রিল ঠাকুরগাঁও রক্ষাবূহ উঠাইয়া ফেলা হয় আর সুবেদার হাফিজকে তাহার ডি কোম্পানীসহ সবার আগে দশ মাইল তে-রাস্তার মোড়ের প্রায় দেড় মাইল পূর্বে দিনাজপুর- সৈয়দপুর প্রধান সড়কের উপর করা হইল। সেখানে গিয়া তাঁহারা ক্যাপ্টেন আশরাফের ৩ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানী সহিত মিলিত হন। তাহারা মিলিভাবে সৈয়দপুরগামী সড়কে

অক্ষরেখা ধরিয়া সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ৪ঠা এপ্রিল তাহারা ভূমির বন্দরে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করে। আবার ঐ দিন দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও ইপিআর, আর্মি, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনী নিয়া একটা যৌথ কমান্ড গঠিত হইল। আর ভাতগাঁও পুলের নিকট একটি জরুরি সভা ডাকিয়া তাহাতে যৌথ কমান্ডের অধীনে সৈয়দপুর আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল।

৫ই এপ্রিল ৮ উইং দিনাজপুরের সুবেদার আবদুল মজিদের নেতৃত্বে এক কোম্পানী ইপিআর ৯ উইং-এর একটি ইপিআর প্লাটুনসহ সৈয়দপুর- নীলফামারী সদর রাস্তায় সৈয়দপুরের অদূরে দারোয়ানির নিকট প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করে। উক্ত তারিখে ভূমির বন্দরে আমাদের সঙ্গে শত্রুদের সংঘর্ষ হয় এবং তাহারা পালাইয়া যায়। সেইদিনই আমাদের বাহিনী একনাগাড়ে প্রায় ১০ মাইল আগাইয়া চম্পাতলী নামক স্থানে গিয়া পৌঁছে। তখন রাত্রি ১১টা। একেত অপরিচিত স্থান, তদুপরি গাঢ় অন্ধকার ও মুষলধারে বৃষ্টি। যাহা হউক ভোর পর্যন্ত প্রতিরক্ষার অনেকটা ব্যবস্থা হইয়া গেল। কিন্তু ৬ই এপ্রিলের সূর্য উঠিতে না উঠিতেই দুশমনরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। তারপর ‘ইয়া আলী’ হুঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইপিআর ও রেজিমেন্টের জোয়নরা মিলিতভাবে পাল্টা ‘ইয়া আলী’ বলিয়া সিংহনাদে দুশমনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। বঙ্গশার্ভুলের থাবায় নয়জন খানসেনা প্রাণ হারায়, বাকী ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় প্রাণ নিয়া পলাইয়া যায়। খানিক পরে ক্যাপ্টেন আশরাফ পরামর্শ সভা ডাকিলেন, জানা গেল তার কাছে গোলাবারুদ একেবারেই কম, কোনমতে সেদিনকার মত চলিতে পারে। তিনি সেইদিনই সন্ধ্যা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ততক্ষণ আর অপেক্ষা করিতে হইল না। হঠাৎ করে শুরু হইল শত্রুর গোলন্দাজ বাহিনীর অজস্র শেলিং, পিছনে আসিল কয়েকটি ট্যাঙ্ক, সঙ্গে ৮১ মিলিমিটার মর্টার। অনেকক্ষণ সংঘর্ষ চলিল। উভয় পক্ষেই হতাহত হইল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া অনেক লোক দলত্যাগী হইবার সুযোগ পাইল। আমরা ভূমির বন্দর প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে পজিশন নিলাম। পরদিন সেখানে তুমুল যুদ্ধ হইল। আমাদের নিকট ভারী এবং প্রতিরোধক অস্ত্র না থাকায় আবার পশ্চাতে আসিতে বাধ্য হইলাম।

এই সময় সুবেদার হাফিজ কোম্পানীর অধিকাংশ দেবীগঞ্জ হইয়া খানসামায় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। ওদিকে নীলফামারী রাস্তায় মজিদ কোম্পানীর সঙ্গে ৭ এবং ৮ এপ্রিল দুশমনদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। সেখানে আমাদের তিনজন শহীদ কয়েকজন আহত ও বহু হত্যারপত্র খোয়া গেলেও দুশমনরাও বিশ-পঁচিশ জন হতাহত নিয়া অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইখানেও ট্যাঙ্ক এবং গোলন্দাজ হামলার মোকাবিলা করিতে না পারিয়া ক্যাপ্টেন আশরাফ, সুবেদার মেজর আব্দুর রব, ক্যাপ্টেন নজরুল হক এবং আমার উপস্থিতিতে ৪ঠা এপ্রিল ভাতগাঁয়ে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা আমাদের কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলাম এবং পিছনে হাটয়া দশ মাইল স্ট্যাণ্ডে শত্রু করিয়া ঘাঁটি গাড়িলাম।

১০ই এপ্রিল সকাল ৯ ঘটিকায় শত্রুরা ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বহর নিয়া আমাদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাইল। প্রথম বার আমরা তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিলাম। দ্বিতীয় বার বেলা ২ ঘটিকার সময় আক্রমণ চালায়। শত্রুপক্ষের গোলায় আমাদের দুইটি ছয় পাউন্ডার গান-ই নষ্ট হইয়া যায়। তুমুল যুদ্ধের পর এখানে আমাদের চারজন লোক শহীদ হয় এবং কিছু লোক আহত হয়। ফলে আমাদের লোক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দিনাজপুরের লোক দিনাজপুরের দিকে ঘাঁটি পরিবর্তন করে ও ঠাকুরগাঁয়ের লোক ভাতগাঁও পুলের নিকট দৃঢ় অবস্থান নেয়। দশ মাইল স্ট্যাণ্ডের যুদ্ধে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হইল, কেননা বাহির হইতে অনেক গোলাবারুদ আমরা এখানে আনিয়া জমা করিয়াছিলাম এবং আমাদের কাছে থাকা কয়েক শত রাইফেল বন্দুকও সেখানে রাখা ছিল। সকলেরই ধারণা ছিল আমাদের এই স্থান ছাড়িতে হইবে না কিন্তু ট্যাঙ্ক বহরের আক্রমণের

চাপে ঐ স্থানও ছাড়িতে হইল। লোকের মনোবল যথেষ্ট ছিল কিন্তু ভারী অস্ত্র না থাকায় আবার সরিয়া আসিতে হইল।

আমরা আবার ভাতগাঁয়ের পুলের নিকট শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করিলাম। মেজর এম, টি, হোসেনসহ কর্নেল কোন কাজে আসিল না। আমি ব্যানার্জী সাহেবকে বলিয়াছিলাম যে, ভাতগাঁয়ের পতন হইলে আমাদের লোকজনের মনোবল নষ্ট হইবে এবং ঠাকুরগাঁ শহরকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। তাই যেভাবেই হউক ভাতগাঁকে রক্ষা করিতে হইবে। আমরা দুইজনে ভারী অস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য অনেক টেষ্টা নিলাম কিন্তু কিছুই হইল না। বিহারের প্রধানমন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুর আমাদেরকে যে কোন সাহায্য দিতে আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা পাইতে অনেক দেরী হইয়া গেল।

১৩ই এপ্রিল ভাতগাঁয়ে সম্মুখ সমরে না আসিয়া খান সেনারা রাস্তা ধরিয়া পিছন দিক হইতে আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা নিল। শত্রুদের পরিকল্পনা আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। খানসামায় তখন আমাদের কোন লোক ছিল না। তাই আমরা তাড়াহুড়ো করিয়া গোপনে সুবেদার হাফিজের নেতৃত্বে এক কোম্পানী সেখানে পাঠাইলাম। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় তাহার কোম্পানী বীরগঞ্জ হইতে পদব্রজে অগ্রসর হইয়া খানসামায় পৌঁছে। শত্রুসেনারা দুইটি কোম্পানী যখন নদী পার হইতেছিল তখন তাহারা সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের ৮ বালুচ ডি কোম্পানীকে সম্পূর্ণ রূপে পর্যন্ত করিয়া দেয়। প্রচুর হতাহত করা ছাড়াও তাহারা দুশমনের নিকট হইতে ১০ গাড়ী মালামাল হস্তগত করে যাগার মধ্যে অনেক গোলাবারুদ, ৭৫টি বিছানা, প্রচুর রেশন, পাকের সরঞ্জাম, একটি অয়ারলেস সেট, একটি মোটর সাইকেল ও আরও বিবিধ দ্রব্যাদি ছিল। সুবেদার হাফিজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বই ছিল এই কোম্পানীর সাফল্যের কারণ। শত্রুর এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পাল্টা তাহাদের যে ক্ষতি সাধন করা হইয়াছিল তাহাতে শত্রুর মনোবল যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, ফলে তিনদিন পর্যন্ত শত্রুদের তরফ হইতে আর কোন সাড়াশব্দ ছিল না এবং পশ্চাৎ আক্রমণ হইতেও আমাদের ঘাঁটি মুক্ত রহিল।

১৭ই এপ্রিল আমি বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের তিন সদস্যের একটি দলকে নিয়া ভোর পাঁচটায় রওয়ানা হই সীমান্তের দিকে তাহাদিগকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে। মেজর এম, টি, হোসেন সাহেব থাকিলে রণাঙ্গনের দায়িত্ব নিয়া। আমি প্রায় দুপুর তিনটায় রুহিয়া পৌঁছি এবং ঠাকুরগাঁও কমাণ্ড পোস্টের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিবার চেষ্টা করি কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া আমার মনে সন্দেহ জাগে এবং আমি তাড়াতাড়ি পঞ্চগড় কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে চলিয়া আসি। এখানে আমাদের অল্পসংখ্যক লোককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞেসাবাদে জানিতে পারি ভাতগাঁও ঘাঁটিতে প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে আমাদের লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। মেজর এমটি হোসেনের কোন খবর নাই, তবে শুনিলাম, তিনি একটি বড় বাস ও একটি জীপ নিয়া অর্ধ লক্ষ টাকাসহ ভারতে চলিয়া গিয়াছেন হাতিয়ার ও গোলাবারুদ আনার জন্য। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তিনি আর দেশে ফিরিয়া আসেন নাই। যাহাই হউক ভাতগাঁও ঘাঁটির নেতৃত্বে ছিল নায়ক সুবেদার আব্দুল খালেকের উপর। তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা জানতে পারিলাম। তিনি জানাইলেন শত্রুরা সকাল আটটার সময় প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালায় ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে। তাহারা প্রথমে কান্ত মন্দিরের পাশ দিয়া ঢুকিয়া সোজা বীরগঞ্জ দখল করিতে চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের জোয়ানদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তাহা ভঙ্গুল হইয়া যায়। এরপর শত্রুরা শক্তি বৃদ্ধি করতঃ দ্বিতীয় দফা আক্রমণ করে। আমাদের বাহিনীও অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বাধা দেয় এবং প্রায় ৫ ঘন্টা ধরিয়া তুমুল সংঘর্ষের পর আমাদের লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া অনেকে দলত্যাগী হইয়া ভারতের দিকে চলিয়া যায় এবং অনেকে পিছনে পচাঁগড় হইয়া জমায়েত হইতে থাকে। এখানে আমাদের ৩ জন শহীদ হন। তাহারা বীরবিক্রমে লড়াই করিয়া শত্রুপক্ষের অন্ততঃ ২৫/৩০ জনকে নিহত ও ১৫/২০ জনকে আহত করেন। সিপাহী আবদুল মান্নান, সিপাহী গুল মোহাম্মদ ভূঞা ও হাফিজ আবদুর রহমান এই যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আহতদের মধ্যে সিপাহী আবদুল মান্নান আহত অবস্থায় শত্রুর হস্তে বন্দী হয়-

বর্বর পশুরা তাকে গুলি করিয়া মৃত মনে করিয়া পুকুরে ফেলিয়া দেয়। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় এবং তাহাদের প্রাণভরা সেবা ও দয়া ময়ের কৃপায় সে সুস্থ হইয়া উঠে ও অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তেতুলিয়াতে আমাদের সাথে যোগদান করে। বাকী দুইজন শাহাদৎ বরণ করিয়া অমর হইয়া আছেন।

অন্যদিকে খানসামাতে ১৩/১৪ তারিখের সংঘর্ষে হাফিজ কোম্পানী পাক আর্মিকে তিনদিন পর্যন্ত জব্দ করিয়া রাখিলেও আমাদের ভাগ্যলক্ষী প্রসন্ন ছিল না। একেত খানরা মার খাইয়া ততক্ষণে ভারী মর্টার ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়া আসিল, তদুপরি সেইদিন একই সময়ে খবর পাওয়া গেল ভাতগাঁয়ের প্রধান প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাই ডি কোম্পানীও খানসামা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল। তবে এই কোম্পানী ঐ স্থানে মোতায়ন থাকায় ভাতগাঁও শত্রুর পাশ অথবা পশ্চাৎ আক্রমণ হইতে নিশ্চিতভাবে রক্ষা পাইয়াছিল।

এই কোম্পানীর পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে জয়গঞ্জ, ঝারবাড়ী, দেবীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের ছোট ছোট রক্ষাবৃহত্তলিরও পিছু হটিতে বাধ্য হইল। এইভাবে শত্রুসেনার অগ্রাভিযান আর আমাদের পশ্চাদপসরণের পালা চলিতে থাকিল। তবে সাতুনা এই হতাহতের দিক দিয়া শত্রুসংখ্যা বরাবরই ভারী ছিল। আমরা দিনব দিন হত্যার আর গোলাবারুদ হারাইয়া দুর্বল হইতে থাকিলাম- স্বাধীন এলাকার পরিধিও কমিয়া আসিতে লাগিল, জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল- খাদ্য সরবরাহও আমাদের প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। আমরা প্রমাদ শুনিলাম এবং আরও পিছে হটিয়া আসিলাম।

প্রায় ২০/২১ দিন মুক্ত থাকার পর ঠাকুরগাঁয়ের পতন হইল। স্থানীয় জনসাধারণ শহর ছাড়িয়া গ্রামে ও ভারতে আশ্রয় নিতে লাগিল। সামরিক নিয়মে সামরিক বাহিনী কোন স্থান ছাড়িয়া দেয় আবার কোন স্থান দখল করে এবং তাহা পরিকল্পনা মাফিক হইয়া থাকে। আমাদেরও তেমন পরিকল্পনা ছিল কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, যতদূর সম্ভব গোলাবারুদ, রেশনপত্র সঙ্গে নিয়া গিয়াছি কিন্তু আরও সরকারী বেসরকারী জিনিস নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। মেজর এম, টি হোসেনের অনুপস্থিতিতে আবার আমাকেই দায়িত্বভার নিতে হইল। আমি সুবেদার হাশেম, নায়েক সুবেদার মতিউর রহমানকে আরও ২২ জন লোকসহ মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়া ঠাকুরগাঁ পাঠাইলাম ব্যাক্সের টাকা পয়সা ও মূল্যবান গহনাপত্র যাহা পাওয়া যায় তাহা নিয়া আসার জন্য। তাহারা ঠাকুরগাঁ আসিয়া স্টেট ব্যাক্সের সীলমোহর যুক্ত একত্রিশ বাস্ত্র টাকা লইয়া পঁচাগড়ে ফিরিয়া আসিয়া একটি গাড়ীতে বোঝাই অবস্থায় আমার কাছে অর্পণ করে। আমি ১২ জন লোকের একটি গার্ড দিয়া রেশনের গাড়ীতে ঐ গাড়ীটিও রাখিয়া দিই। কিছু দিন পরে এই টাকা ক্যাপ্টেন নজরুল, জনাব সিরাজুল ইসলাম এমসিএ, জনাব আবদুর রউফ এমসিএ-দের উপস্থিতিতে কর্নেল ব্যানাজীর হেফাজতে রাখি এবং পরে অর্থমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী সাহেব স্বয়ং আসিয়া ঐ টাকা মুজিবনগরে নিয়া যান। আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই টাকা জমা দিতে। সেখানে প্রায় ১ কোটির মত টাকা ছিল যাহার হিসাব অর্থমন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়।

১৭ই এপ্রিল নাগাদ আমাদের কোম্পানীগুলি বিভিন্ন প্রতিরক্ষা ঘাঁটি হইতে পঞ্চগড়ে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা পরস্পরের সহযোগিতায় সেখানে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করিতে শুরু করিল। ১৭ এবং ১৮ তারিখ বিভিন্ন কোম্পানীর বেশ কিছু লোক যাহারা নানাস্থানে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল অথবা আটকা পড়িয়াছিল পঞ্চগড় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের লোক নতুন উৎসাহ নিয়া কাঞ্চন নদীর তীরে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণে তৎপর হইল। ১৮ তারিখ ছোট ছোট কয়েকটি দল আগে পাঠাইলাম, অনেক দূর আগাইয়াও শত্রুর কোন আনাগোনা দেখা গেল না। আমাদের প্রায় ১০৬ টি পরিবার ছেলেমেয়েসহ ছিল। এই সুযোগে তাহাদিগকে সরাইয়া নিরাপদ স্থানে নিবার ব্যবস্থা করিলাম। চিকিৎসাধীন কিছু রোগী এবং আহতকেও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল। এই সময় আমাদের কাছে কোন ডাক্তার ছিল না। একমাত্র কম্পাউন্ডার মনসুরই ছিল আমাদের প্রধান অবলম্বন এবং তাহার সঙ্গে কয়েকজন নার্স ছিল। কম্পাউন্ডার মনসুর বিপদের সময় যে কাজ করিয়াছেন, যেভাবে রোগীদের সেবায়ত্ত্ব নিয়াছেন তাহা সত্যিই প্রশংসনীয়।

পরের দিন ২৯শে এপ্রিলের দুপুর। আমার সহকর্মী কমাগুরদের নিয়া নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনার্থ সবেমাত্র ডাকবাংলায় বসিয়াছি এমন সময় হঠাৎ কয়েকটি গোলার শব্দ শোনা গেল। আমার আলোচনা স্থগিত করতঃ বাহির হইয়া পড়িলাম। অবস্থা আঁচ করিতে না করিতেই আরও কয়েকটা শেল আমাদের ডাইনে- বাঁয়ে- পিছনে আসিয়া পড়িল, বুঝিতে বাকী রহিল না দুশমনের প্রত্যক্ষ আক্রমণ অত্যাশঙ্ক। কমাগুররা যে যার স্থানে চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে দুশমনের একটি গোলা আমাদের একটি গাড়ীর উপর আঘাত করিল এবং তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল। গাড়ীটিতে খানসামায় দুশমনদের নিকট হইতে আটককৃত গোলাবারুদ রক্ষিত ছিল, উহার পাশ্বেই আমার জীপগাড়ীটিও ছিল, কোনমতে তাহা সরাইয়া নিতে সক্ষম হইলাম। আমরা শত্রুর আক্রমণের জবাব দিতে লাগিলাম। চার ঘন্টা ঘন্টা ধরিয়া চলিল, সুবেদার আবুল হামেশাসহ কয়েকজন আহত হন। ইহাদেরকে পরে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবশেষে ট্যাক্সসহ শত্রুহাহিনী আমাদের উপর বাঁপাইয়া পড়ে এবং আমরা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হই। এইবার আরও হাতিয়ার গেল, গোলাবারুদ গেল, বাহিনীর বহু লোক পালাইয়া গেল। নায়েক সুবেদার খালেক ও সুবেদার হাফেজ সাহসে ভর করিয়া ঐ দিন সন্ধ্যায়ই কিছু লোকজনসহ ভজনপুর গিয়া পৌঁছিলেন। এপ্রিলের ২০ তারিখের ভোর হইতে না হইতে তাহারা ভজনপুরে ঘাঁটি নির্মাণের কাজ শুরু করিয়া দিলেন। আমি তাহাদেরকে যথারীতি উপদেশ দিয়া নানা জরুরী কাজে ও বিচ্ছিন্ন লোকদেরকে জড় করার উদ্দেশ্যে পিছনে গেলাম। এই দিকে দুশমনরাও অতি তাড়াতাড়ি জগদল এবং ওমরখানায় তাহাদের শত্রু ঘাঁটি গাড়িয়া বসিল। ওমরখানা পর্যন্তই শেষ ঘাঁটি ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল।

তারপর ঐ মাসের অর্থাৎ এপ্রিল মাসের এক শুভক্ষণে জানিতে পারিলাম যে স্বাধীন বাংলার সরকার গঠিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় মে মাসের ৮ তারিখ আমাদের মুক্তিবাহিনী প্রধান তদানীন্তন কর্নেল এম এ জি ওসমানী আমাদেরকে ভারতের কদমতলায় ডাকিয়া পাঠান। সেখানে এক জরুরী সভা হইল। তাহাতে যোগ দিলেন ক্যাপ্টেন নজরুল হক, ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ এবং কয়েকজন ভারতীয় অফিসার। মুক্তিবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে যুদ্ধের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করিলেন। এরপর তিনি তার পরিকল্পনা অনুসারে আমাদেরকে নির্দেশ দান করিলেন। আমরাও আমাদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিলাম, তিনি যথাসাধ্য পূরণ করিবার আশ্বাস দিলেন। উক্ত সভায় তিনি ক্যাপ্টেন নজরুল হক সাহেবকে আমার ব্যাটালিয়নের দায়িত্বভার অর্পণ করিলেন। তারপর ঐ দিনই সন্ধ্যায় তিনি আমাদের ভজনপুর ঘাঁটিতে আগমন করিলেন। তাহার দর্শন লাভে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমরা আরো সতেজ হইলাম, তার উপদেশের মাধ্যমে পথের দিশা পাইলাম। অধিকন্তু তিনি ক্যাপ্টেন নজরুল সাহেবকে আমাদের অধিনায়ক রূপে নিয়োগ করায় আমরা আরো উৎসাহিত হইলাম। এর কিছুদিন পর প্রধান সেনাপতি আবার ভজনপুর আসিলেন, সঙ্গে বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। ইহাতে জোয়ানরা খুব খুশী হইল, তাহাদের মনোবল দৃঢ়তর হইল। ততক্ষণে ভারত হইতে অপ্রচুর হইলেও বিভিন্ন রকম সাহায্য আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব মুক্তি সংগ্রামীদের মনোবল উর্ধ্বমুখী হইয়া উঠিল।

৯ই মে ক্যাপ্টেন নজরুল আমার ব্যাটালিয়নের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন এবং আমি তাহার সহকারী হিসাবে কাজ করিতে লাগিলাম। এ সময় দুশমনরা ওমরখানার জগদল এলাকায় দৃঢ় প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমরা আমাদের মূল ঘাঁটি ভজনপুরের ৩/৪ মাইল আগে মাগুরমারী ও ময়নাগুড়ি নামক স্থানে দুইটি পোষ্ট খুলিয়া দুইটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠানোর ব্যবস্থা করিলাম। ২৬শে এপ্রিল হাবিরদার দেওয়ানের নেতৃত্বে ১০ জনের একটি ছোট দল প্রথম ওমরখানার কাছে মাগুরমারীতে পাঠানো হইয়াছিল। তাহারা দুশমনের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিত এবং পিছনে আমাদেরকে খবর দিত। ৩০শে এপ্রিল শত্রুদের হঠাৎ আক্রমণে এই ছোট দলের ২ জন শহীদ এবং অন্য ২ জন গুরুতরভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হয়। যাহা হউক, মাগুরমারীতে ক্রমান্বয়ে লোকসংখ্যা বাড়াইয়া শেষ পর্যন্ত দেড় কোম্পানীর মত করা হয়। এর এক কোম্পানী নতুন সি কোম্পানী নাম নিয়া নায়েক সুবেদার হাজী মুরাদ আলীর নেতৃত্বে দুশমনের ওমরখানা ঘাঁটির সন্নিকটে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করে। ২রা মে হইতে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ তাহারা সেখানে অবস্থান করে

এবং দুশমনদের শতাধিক সৈন্য ও চার পাঁচখানা গাড়ী ধ্বংস করাসহ অশেষ ক্ষতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে নির্বাক নিবীৰ্য করিয়া রাখে। আমার হিসাব মতে সিপাহী আবুল হোসেন একাই সত্তর জনের মত শত্রুসান খতম করিয়াছে। তবে এই দলকে বহু কষ্টের মধ্যে দীর্ঘ দুই মাস কাটাইতে হইয়াছে, কেননা উন্মুক্ত আর নীচু জায়গায় পজিশন থাকা বিধায় দিনের বেলা এরা সামান্য নড়াচড়া পর্যন্ত করিতে পারিত না- শুধু রাত্রেই এদের খাওয়ার সুযোগ ঘটিত। আমি মাঝে মাঝে এই কোম্পানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। কোন কোন সময় আমি দেখিয়াছি বৃষ্টির মত গোলাগুলির মধ্যেও হাজী মুরাদ আলী তাহার লোজনের তদারকি করিয়া ফিরিতেছেন। আমার মতে হাজী মুরাদ আলীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই এই ক্ষুদ্র দলটি নিভীক সৈনিকের ভূমিকা পালন করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

দিনাজপুর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ঘটনাবলী

সাক্ষাৎকারঃ নায়ক সুবেদার মোহাম্মদ আনসার আলী

১৯-১১-১৯৭৩

২৫শে মার্চ থেকেই দিনাজপুর শহরে ছাত্র- জনতার মিছিল বের হতে শুরু করে। ২৬শে মার্চ সকালেই আমরা সামরিক শাসন জারী করার কথা শুনি। এটা শনে আমাদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আনন্দিত হয়েছিল এবং বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলছিল। ২৬শে মার্চ বেলা দশটার দিকে আমি ৩০/৪০ জন লোক নিয়ে নিউ টাউনে ডিউটি করতে যাই।

২৭শে মার্চ ১/২ টার দিকে বিহারীরা প্রায় ১২/১৩ জন বাঙ্গালীকে হত্যা করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

২৭শে মার্চ বেলা ১২/১ টার সময় তিনজন মেজর, কর্নেল এবং দুই/তিনজন ক্যাপ্টেনসহ পশ্চিম পাকিস্তানীরা এক বৈঠক করে। বেলা সাড়ে তিনটার সময় বৈঠক শেষ হয়। শেষ হবার পর ঢাকার সাথে যোগাযোগকারী সিগন্যাল সেটের কমান্ডারকে জীপে উঠিয়ে নেয় এবং তার বাসার দিকে রওয়ানা হয়। সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ১৫/২০ জন বাঙ্গালী ছিল। কোয়ার্টার মাস্টার আবু সাইদ খন্দকার, হাবিলদার ভুলু এবং প্লাটুন হাবিলদার নাজিমও ছিল। বাকি সবাইকে ডিউটিতে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা এক জায়গায় একত্রিত না থাকে। জীপটা যখন অফিস থেকে রওয়ানা হয় সেই সময় আমাদের ৬- পাউন্ডার প্লাটুন হাবিলদার নাজিম উদ্দিন ঐ জীপে লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণ করে। কিন্তু গুলীটা জীপে না লেগে অফিসের কর্নারে লেগে যায়। তখন চারিদিক থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। বিকেল পাঁচটার মধ্যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানীদের হত্যা করা হয়। জনগণ হেডকোয়ার্টারে এসে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যায়। সেক্টর হেডকোয়ার্টারের একটু দূরে সার্কিট হাউসে ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের প্রায় ১৫০ জন সৈন্য রিজার্ভ ছিল।

কাঞ্চন নদীর ওপারে গিয়ে আমরা অবস্থান নিতে শুরু করি। অস্ত্রাগার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নদীর ওপারে গিয়ে আমরা রিজার্ভে ১৫০ জনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই। এই সংঘর্ষ দুই তিন দিন চলেছিল।

এপ্রিলের ৩ তারিখে ২/৩টা জীপে করে সার্কিট হাউস থেকে তারা পলায়ন করে দক্ষিণ দিকে পার্বতীপুর যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়। মোহনপুরের আগে যাওয়ার পর সুবেদার শকুর সাহেবের কোম্পানী তাদেরকে বাধা দেয়। তারা আবার দিনাজপুরে ফিরে আসে, ফিরে আসার পর শালবাগানে তাদের অনেককেই জনসাধারণ এবং বাঙ্গালী ইপিআর মেরে ফেলে। কর্নেল তারেক রসুল জীপ নিয়ে পার্বতীপুর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

২৭শে মার্চ দিনাজপুরের সীমান্ত এলাকায় সমস্ত বিওপিতে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে যত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর ছিল সবাইকে হত্যা করা হয়।

এপ্রিল মাসে দিনাজপুর টাউন শত্রুমুক্ত হবার পর পুলিশকে দিনাজপুর শহর হস্তান্তর করে আমাদের কিছু লোক পার্বতীপুরের দিকে এবং কিছু লোক সৈয়দপুরের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

এপ্রিল মাসের ১২/১৩ তারিখে সৈয়দপুরের ছিু দূরে পাকিস্তানীদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পশ্চাদপসরণ করি।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ১৫ এপ্রিল তারিখে দিনাজপুর শহর পুনরায় দখল করে নেয়।

দিনাজপুর জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার আরব আলী

.....১৯৭২

২৫শে মার্চের পাকবাহিনীর পৈশাচিক ঘটনার কথা আমরা ২৬শে মার্চ সকাল বেলা জানতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এই দিন থেকে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনসাধারণ খানসেনা আসার সম্ভাব্য সকল রাস্তায় বেরিকেড রচনা করে। এই সময় জনসাধারণ ত্রুদ্ব হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে দেখা যায়। চারিদিকে একটা মার- মার, কাট- কাট অবস্থার সৃষ্টি হয়।

২৭শে মার্চ পাঞ্জাবী বাহিনী দিনাজপুর কুটিবাড়ী ইপিআর হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে এবং সমস্ত ইপিআরকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে। এই সময় ইপিআররা পাঞ্জাবীদের প্রতি পাল্টা আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষ মর্টার ও কামান মারতে থাকে। আমরা বর্ডার থেকে মুহূর্মুহ কামানের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। এই সময় দেখতে পাই হাজার হাজার নিরীহ শহরবাসী ভারতের দিকে রওনা দিচ্ছে। এই সময় আমি আমার উপরস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে পাক পাক হিলি বর্ডারে যোগাযোগ করি।

২৯শে মার্চ ভোরে ভাইগর বিওপিতে অবস্থানরত একজন পাঞ্জাবী ইপিআর হাবিলদার ও একজন নায়েককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই দুইজনকে খতম করে আমি রুধরাণী বিওপিতে চলে যাই। সেখানে অবস্থানরত একজন পাঞ্জাবী হাবিলদার ও একজন সিপাইকে জিন্দা বন্দী করি। এরপর আমি রাণীনগর প্লাটুন হেডকোয়ার্টারে চলে আসি। এখানে একজন পাঞ্জাবী ল্যান্স নায়েককে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং একজন সিপাইকে জিন্দা বন্দী করে তাকে পাবলিকের হাতে তুলে দিই। পরে জনসাধারণ তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

ফুলবাড়ী সংঘর্ষে ঃ ২৯শে মার্চ উপরোক্ত ঘটনার পর আমি আমার সমস্ত জওয়ানদেরকে একত্রিত করি। ফুলবাড়ী আসার দুই মাইল দূরে থাকতে খবর পাই যে পাঞ্জাবী সৈন্যরা দিনাজপুর থেকে ইপিআর- এর হাতে মার খেয়ে পার্বতীপুর যাবার জন্য ফুলবাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই কথা শোনার পরপরই ভীষণ গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। খবর নিয়ে জানতে পারি যে ফুলবাড়ী থেকে ইপিআররা পাকবাহিনীর গতিরোধ করেছে। এই খবর পাবার পর খুব তাড়াতাড়ি আমি আমার জওয়ানদেরকে নিয়ে ফুলবাড়ী যাবার পথে হাসপাতালের কাছে রোড ব্লক করলাম। আমরা পজিশন নেবার পরপরই পাঞ্জাবীরা অবস্থা বেগতিক দেখে পিছু হটতে আরম্ভ করে এবং কিছু সৈন্য গাড়ী ফেলে কানাকুনি মাঠের মধ্য দিয়ে পার্বতীপুরের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা তাদের পিছু নেই এবং আক্রমণ চালাই। এই যুদ্ধে ফুলবাড়ী বাজারের মোড়ে ৭ জন খান সেনার লাশ পাওয়া যায়। একজন

সিগন্যাল ম্যানকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সঙ্গে ২ টা চাইনিজ মেশিনগান ও ৫টা রাইফেল আমরা হস্তগত করি। এই সময় ১ টা জীপ ও ২ টা ডজ গাড়ী আমাদের হাতে আসে।

পার্বতীপুরে বিহারীদের লুটপাট ও সংঘর্ষঃ অতঃপর এপ্রিল মাসের ৭ তারিখে আমরা জানতে পারি যে পার্বতীপুরের বিহারীরা নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে ব্যাপক হারে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে। তারা নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্মভাবে হত্যা করেছে। এই খবর পাবার পর আমি আমার প্লাটুন নিয়ে পার্বতীপুরের নিকটে গ্রামগুলির নিরাপত্তা বিধানের জন্য যাই। আমরা যাবার পর প্রায়ই বিহারীরা আমাদের উপরে গোলাগুলি নিক্ষেপ করতে থাকে এবং সুযোগ বুঝে লুটপাট চালাতে থাকে।

১০ই এপ্রিল স্থানীয় হাজার হাজার লোক এসে আমকে জানায় যে বিহারীরা অত্যাচারের চরম সীমায় পৌঁছেছে। কাজেই তাদের যে কোন প্রকারে শায়েস্তা করতে হবে। তখন আমি হাজার হাজার জনতার সঙ্গে একত্রিত হয়ে আমার বাহিনী নিয়ে পার্বতীপুরের বিহারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি প্রথম দিকে বিহারীরা আমাদের প্রতি গোলাগুলি নিক্ষেপ করতে থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তারা আমাদের গোলার মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে থাকে। বিহারীরা এই সময় লাইন ধরে যৈদপুরের দিকে যেতে থাকে। হিংস্র জনতা পলায়নরত বিহারীদের উপর চড়াও হয় এবং যাকে যাকে পায় পিটিয়ে মেরে ফেলে। ঐদিন আনুমানিক প্রায় ৪০০/৫০০ লোক মারা যায়। এই সময় পার্বতীপুর পুরাপুরি আমাদের আয়ত্তে এসে যায়।

১১ই এপ্রিল সৈয়দপুর থেকে ৩ টনী ওটা গাড়ী, ২টা জীপ বোঝাই খানসেনা পার্বতীপুর আসে এবং আমাদের উপর প্রবলভাবে গোলা বর্ষণ করতে থাকে ঐদিন সন্ধ্যার পর উভয় পক্ষ থেকে গোলাগুলি বন্ধ করা হয়। এই সময় আমাদের কাছে গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে আসে। সারা রাত্রি আমরা বহু জায়গায় যোগাযোগ করেও কোন গোলাবারুদ জোগাড় করতে পারিনি।

১২ই এপ্রিল সকাল ৮টার সময় সেনারা পুনরায় আমাদের অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এই সময় তারা মর্টার থেকে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর আমরা আর টিকতে পারি না, বাধ্য হয়ে পিছু হটতে থাকি। এখানে আমার একজন সিপাই মারা পড়ে এবং খোলাহাটিতে ৩নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আনোয়ার সাহেবের কাছে যাই এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। কিন্তু সে জানায় যে, তার কাছে তেমন কোন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নাই। তখন বাধ্য হয়ে আমরা ফুলবাড়ী হেডকোয়ার্টারে চলে যাই। অতঃপর আমি ফুলবাড়ী ক্যাম্প থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওখান থেকে আরও জওয়ান ও আনসার নিয়ে আমি ১৫ই এপ্রিল পুনরায় পার্বতীপুরের দিকে যাত্রা করি। এবং আমরা পার্বতীপুরের আগের রেল স্টেশন ভাবানীপুরের হাওয়া গ্রামে ডিফেন্স করি।

১৬ই এপ্রিল খান সেনারা পার্বতীপুর থেকে ১টা ট্যাঙ্কসহ ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে সকাল ১১ টার দিকে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় ১ ঘন্টা প্রবল যুদ্ধ চলার পর খান বাহিনীর ট্যাঙ্কের গোলার মুখে পরপর আমার ৩ জন আনসারসহ ৫ জন সিপাই মারা যায়। এই সময় আমার সিপাই মোঃ হোসেনের মাথার উপর ১টা মর্টারের গুলি এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে আমরা পিছু হটে ফুলবাড়ীর দিকে যাত্রা করি এবং এই সময় আমাদের পিছু পিছু খানসেনারা ফুলবাড়ীর দিকে যাত্রা করে।

ঐ দিনই বিকাল প্রায় ৫টার দিকে খানসেনারা ফুলবাড়ীতে আমাদের হেডকোয়ার্টারের উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। এই সময় তারা ট্যাঙ্ক, মর্টার, কামান, মেশিনগান ব্যবহার করে। রাত ৮টা পর্যন্ত খানসেনাদের সঙ্গে চলে যাই। এই সময়ও আমাদের মনোবল অটুট থাকে।

১৮ই এপ্রিল খানসেনারা হিলি আক্রমণ করে। এখানে ভীষণ যুদ্ধের পর আমরা ভারতের দিকে চলে যাই।

সশস্ত্র প্রতিরোধে দিনাজপুর
সাক্ষাৎকারঃ হাবিলদার বাসারতউল্লাহ

১৬-১১-১৯৭৪

২৫শে মার্চ আমি দিনাজপুর ৪নং সেক্টর কুটিবাড়ীতে ৮নং উইং- এর 'সি' কোম্পানীতে ছিলাম। আমরা তখন উইং হেডকোয়ার্টারে ছিলাম। ৮নং শাখার কমান্ডার ছিল মেরজ আমীন তারিক (পাঞ্জাবী)। সহ উইং কমান্ডার ছিল বাঙ্গালী নজরুল ইসলাম এবং অপরজন পাঞ্জাবী ছিল। উইং হেডকোয়ার্টারে 'সি' কোম্পানী ছিল। কমান্ডার ছিল আতাউল হক। 'বি' কোম্পানী ছিল এলাকাতে ছিল, কমান্ডার ছিল সুবেদার আবদুস শুকুর। 'এ' কোম্পানী ছিল চাপাসারে, কমান্ডার ছিল সুবেদার আখতারুজ্জামান। 'ই' কোম্পানী ছিল বিরলে, কমান্ডার ছিল সুবেদার বাদশা আহমদ (বিহারী)।

দিনাজপুর সার্কিট হাউসে বেলুচ রেজিমেন্টের এক প্লাটনের কিছু বেশী পুরা আধুনিক অস্ত্রে জানুয়ারী থেকে অবস্থান করছিল। পাক আর্মির ৩ জন অয়ারলেস সেট নিয়ে উইং হেডকোয়ার্টারের মধ্যে থাকতো। ৩ জন আর্মির মধ্যে একজন বাঙ্গালী সিগন্যালম্যান ছিল। আমি ওখানে গেলে তারা কথাবার্তা বন্ধ করে দিত। বাঙ্গালী অপারেটরটি অপর দুজন পাঞ্জাবীকে ২৮তারিখ দুপুর 'তোমরা অগ্রসর হও আমি যাচ্ছি', এই বলে আমাদের সিগন্যাল সেন্টারে আসে এবং বলে 'যদি পাকিস্তানীদের আক্রমণ করতে হয় তবে এখনই কারো, পাকসেনারা কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে।' আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম আক্রমণের।

হাবিলদার ভুলু মিয়া, নায়েক সুবেদার মোসলেম, সুবেদার মোমিনুল হক এদের নেতৃত্বে ২৮শে মার্চ রবিবার প্রায় ২টা ৪৫মিনিটে উইং- এর সকল অবাকালী ইপিআরদের উপর আক্রমণ করি। আমরা উইং এবং সেক্টর হেডকোয়ার্টার দখল করে নিই সন্ধ্যার মধ্যে। সকল অস্ত্র আমরা আমাদের আওতায় নিয়ে আসলাম। ঐ তারিখেই পাকসেনারা আমাদেরকে আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

৩১শে মার্চ পর্যন্ত আমরা কুটিবাড়ীতেই (উইং হেডকোয়ার্টার) ছিলাম। সীমান্ত এলাকার কোম্পানীগুলো কুটিবাড়ীতে চলে আসে। ৩১শে মার্চ বিকাল থেকে হাবিলদার নাজিমউদ্দিন ৬ পাউন্ডার ছুড়তে থাকে পাক ঘাঁটির উপর। একই সাথে আমরা ব্যাপকভাবে আক্রমণ করি। ঐ তারিখ রাতেই পাকসেনারা দিনাজপুর থেকে পালিয়ে যায়। পাকসেনারা পার্বতীপুরের দিকে যায়। পথে বহু পাকসেনা জনতার হাতে নিহত হয়।

নায়েক সুবেদার কাউসারের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন রংপুরের বদরগঞ্জ পৌঁছায়। সৈয়দপুর থেকে পাকসেনারা যাতে দিনাজপুরে না আসতে পারে সেজন্য বদরগঞ্জে ডিফেন্স নিই। আমাদের সামনে নদীর পাড়ে এক প্লাটুন মত বেঙ্গল রেজিমেন্টের অংশ ছিল।

অনুমান ৮/৯ ই এপ্রিল বদরগঞ্জের পতন ঘটে পাক বাহিনীর হাতে। আমরা পিছু হটে ফুলবাড়ীতে আসলাম। ওখানে সুবেদার শুকুর সাহেব তার ফোর্স নিয়ে আগে থেকেই ছিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈন্যও ছিল। পরদিন আমরা দিনাজপুর চলে আসলাম। এরপর কাউঘর মোড়ে যাই। হাবিলদার আবদুস সোবহানের নেতৃত্বে ঐ মোড়ে ডিফেন্স নিই। নায়েক সুবেদার মোমিনুল হক সাপোর্ট প্লাটুন নিয়ে আমাদের পিছনে থাকলো। ফুলবাড়ী- দিনাজপুর সড়কে আমরা ডিফেন্স নিলাম। এখান থেকে শিয়ালগাজী মাজারের পার্শ্বে নায়েক সুবেদার মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে ডিফেন্স নিই।

১৩ই এপ্রিল সাড়ে ১২ টার সময় রাজবাড়ীর দিক থেকে শহরের পূর্বপাশ দিয়ে সৈয়দপুর-দিনাজপুর রাস্তার বাম দিক থেকে পাকবাহিনী আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্টিলারী ও ট্যাঙ্ক নিয়ে। পাকবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে এখানকার বিভিন্ন আমাদের লোকেরা বিচ্ছিন্নভাবে পিছু হটতে থাকে। সন্ধ্যার পূর্বেই পাকসেনা দিনাজপুর শহর দখল করে নেয়।

শহর পতনের পর আমরা নদীর অপর পাড়ে আশ্রয় নিই। আমরা বিরল সীমান্তের দিকে অগ্রসর হই। বিরলে (ভারতীয় সীমান্ত থেকে ৬ মাইল ভিতরে) ডিফেন্স নিই। বিরলে ২০০ মত ইপিআর আসে।

১৭/১৮ই এপ্রিল পাকবাহিনী আমাদের বিরল ডিফেন্সের উপর আক্রমণ চালায়। মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর লোকেরা আমাদের অবস্থানগুলো পাকবাহিনীর কাছে প্রকাশ করে দেয়। এই যুদ্ধে বিরলের পতন ঘটে। এখান থেকে কিশোরীগঞ্জ এলাকাতে ডিফেন্স নিই।

২০/২১শে এপ্রিল পাকসেনা আমাদের কিশোরীগঞ্জ ডিফেন্স আক্রমণ করে। কিশোরীগঞ্জের পতন ঘটলো পাকবাহিনীর হাতে। আমরা আরও পিছু হটলাম। একদম সীমান্ত বরাবর আমরা ডিফেন্স লাগলাম। পাকসেনারা কিশোরীগঞ্জ থেকে মাইকযোগে আমাদের গালাগালি করতে থাকে। ৮নং শাখার সহকারী উইং কমান্ডার ক্যাপ্টেন চিমা, নায়ক সুবেদার নিয়ামতউল্লাহ আমাদের গালাগালি করতে থাকে। পাকসেনারা প্রতিটি জায়গা দখলের পর আগুন লাগিয়ে সমগ্র এলাকা ধ্বংস করে হত্যাযজ্ঞ চালায়, তারা হাজার হাজার মণ চাউল পুড়িয়ে দেয়।

অনুমান ২৪শে এপ্রিল ফ্লাগ মিটিং হয়। সেখানে পাকসেনারা ইপিআরদের হ্যাণ্ডওভার করার জন্য জানায়। ২৫/২৬শে এপ্রিল রাধিকাপুরে এবং আমাদের অবস্থানের উপর বিমান হামলা চালায়। বিএসএফ অবস্থানের উপরও বোমা ফেলে। আমরা ভারতে আশ্রয় নিলাম এক আমবাগানে। আমাদের সাথে প্রচুর গোলাবারুদ ছিল। ডামিলগাঁও যাই, সেখানে সকল অস্ত্র জমা দিই। ট্রেনিং ক্যাম্প খুলে দেওয়া শুরু হয়। দেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে থাকি।

সশস্ত্র প্রতিরোধে দিনাজপুর

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার আহম্মদ হোসেন

১৮-১১-১৯৭৪

আমি একাত্তরের মার্চে ৯নং উইং হেডকোয়ার্টার ঠাকুরগাঁতে ছিলাম। উইং- এর অধীনে ৫টি কোম্পানী ও একটি সাপোর্ট ছিল। হেডকোয়ার্টারে ছিল ‘ডি’ কোম্পানী, কমান্ডার ছিল সুবেদার এম এ হাফিজ। রুহিয়াতে ছিল ‘এ’ কোম্পানী, কমান্ডার ছিল সুবেদার কালা খান (পাঞ্জাবী)। ‘বি’ কোম্পানী ছিল চিলাহাটিতে, কমান্ডার ছিল একজন বিহারী। ‘সি’ কোম্পানী ছিল তেতুলিয়ায়, কমান্ডার ছিল (ভারপ্রাপ্ত) পাঞ্জাবী নায়ক সুবেদার মীর্জা খান। ‘ই’ কোম্পানী ছিল পঞ্চগড়ে, কমান্ডার ছিল নায়ক সুবেদার আবদুল খালেক। উইং কমান্ডার ছিল মেজর মোহাম্মদ হোসেন। সেকেন্ড- ইন- কমান্ড ছিল ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম। নির্বাচনের পর থেকেই আমরা ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলাপ- আলোচনা করতাম।

২৫শে মার্চের রাতে ‘ডি’ কোম্পানী উইং হেডকোয়ার্টারে ছিল। আমাদের উইং হেডকোয়ার্টারে ম্যাগাজিনের সঙ্গে মুজাহিদের জন্য একটি ম্যাগাজিন ছিল। ৫ জন পাকসেনারা দায়িত্বে থাকতো। পাক বিমান বাহিনীর চারজন লোকও থাকতো। যারা সকল বিমানের গতিবিধি লক্ষ্য করতো এবং ঢাকা সেনানিবাসে রিপোর্ট করতো।

২৬শে মার্চ আমরা ঢাকায় পার্ক আক্রমণের খবর পেলাম।

৭ই মার্চের পর থেকে আমাদের আই- এস- ডিউটি বেড়ে যায়। তখন থেকেই অস্ত্র আমাদের সঙ্গে থাকতো। ২৩শে মার্চ থেকেই কয়েকবার আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নিয়ে নেবার চেষ্টা হয়। কিন্তু আমরা অস্ত্র কোতে জমা দিইনি।

আগে থেকেই জেনেছিলাম ২৮শে মার্চ রাতে পাক বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। তাই আমরা সুবেদার হাফিজের নেতৃত্বে ২৮শে মার্চ রাত সাড়ে ১০টায় উইং হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত সকল

অবাস্গালী ইপিআর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আই- এস ডিউটির জন্য আগে থেকেই উইং- এর চারপাশে বাস্কার তৈরী ছিল।

সুবেদার হাফিজ প্রথম উইং কমান্ডার ও সহকারী উইং কমান্ডারের গার্ডের উপর গুলি ছোড়েন। ২৫শে মার্চ ১০টার কিছু আগে আমরা ক'জন যেমন- আমি, নায়েক সুবেদার মতিউর রহমান, বজল আহম্মদ চৌধুরী, সুবেদার এম এ হাফিজ এবং আতাউল হক মিলে সুবেদার মেজর কাজিমুদ্দিন সাহেবের বাসাতে গিয়েছিলাম আলাপ- আলোচনার জন্য। তখনই হাবিলদার আবু তালেব আমাদের কাছে এসে খবর দেয়, সুবেদার মেজর কাজিমুদ্দিনকে বন্দী করতে আসছে পাকসেনারা ৪ জন। আমরা তখনই বেরিয়ে আসি এবং যার যার অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সুবেদার হাফিজ তখনই চাইনিজ মেশিনগান নিয়ে মেজর সাহেবের বাংলাতে যান এবং গুলি ছোড়েন। তারপর সারারাত ধরে উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে। কোতের দায়িত্বে ছিল সব অবাস্গালী। ২৯শে মার্চ সুবেদার আতাউল হক ভুল বুঝাবুঝির জন্য বাস্গালীদের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপঃ

২৯শে মার্চ ভোরবেলা সুবেদার আতাউল হক ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন কি অবস্থা, এমন সময় সিদ্দিক নামে এক সিপাই বাস্কার থেকে উঠে এসে সুবেদার আতাউল হক সাহেবের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সিপাই সিদ্দিক ভেবেছিল সুবেদার হয়তো কিছু বলবেন না। সুবেদার আতাউল হক সম্পূর্ণ নতুন, সবাইকে চিনতেন না ফলে সিদ্দিককে বিহারী মনে করেন এবং উর্জুতে 'তুমি এখনও বেঁচে আছ' বলেই স্টেন তোলে। সিদ্দিকও সাথে সাথে রাইফেল তুলে গুলি চালায়। সুবেদার আতাউল হক ওই গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

অবাস্গালী ইপিআর থাকতো প্রধানতঃ তিনতলার উপর এবং কোয়ার্টার গার্ডে। এর ফলে তাদেরকে আয়ত্তে আনা কঠিন ছিল। ১লা এপ্রিল বেলা ৪টার মধ্যে আমরা উইং সম্পূর্ণ দখল করতে সক্ষম হই। অবাস্গালী ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম এবং ক্যাপ্টেন নজির আহমদ পালাতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়েন এবং সবাই মৃত্যুবরণ করেন।

২রা এপ্রিলের মধ্যে সীমান্তের সমস্ত ইপিআর উইং হেডকোয়ার্টারে চলে আসে সুবেদার মেজর কাজিমুদ্দিন সাহেবের নির্দেশক্রমে। আমাদের আনসার- মুজাহিদও এসে জমায়েত হয়।

সুবেদার হাফিজের নেতৃত্বে আমরা একটি কোম্পানী সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হই ৩রা এপ্রিল। ৪ঠা এপ্রিল ভূমিরবন্দরে পুলের পাশে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করি।

২৯শে মার্চ আমরা খবর পেলাম ৮/১০ টি ট্রাক করে পাকসেনা ঠাকুরগাঁ- এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা তখনই যার যার মত পজিশন নিয়ে তৈরী থাকলাম। দেখলাম সত্যি তারা আসছে। কিছুক্ষণ পর সকাল ৯টার দিকে জানলাম তারা বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক। ক্যাপ্টেন আশরাফ সুবেদার মেজর খবর দেন আমরা শিবগঞ্জে বিমানবন্দরে আইএস ডিউটি করতে যাচ্ছি। কাজিমুদ্দিনের সন্দেহ হয়, তাই পুনরায় একটি সিপাইকে মোটর সাইকেল যোগে বেঙ্গল রেজিমেন্ট সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বলেন। ক্যাপ্টেন আশরাফ নিজের সকল জোয়নকে দেখিয়ে বলেন আমরা সবাই বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক। সিপাই ফিরে এসে সুবেদার মেজরকে রিপোর্ট করলে ক্যাপ্টেন আশরাফ তার কোম্পানী নিয়ে শিবগঞ্জে চলে যান। সুবেদার মেজর কাজিমুদ্দিন অনেক অনুরোধ করেন তাদের সাথে কাজে যোগ দেবার জন্য। কিন্তু ক্যাপ্টেন আশরাফ বিশ্বাস করতে পারেননি সব ঘটনা। ক্যাপ্টেন আশরাফ তার কোম্পানী নিয়ে শিবগঞ্জে পৌঁছালে তাঁর বেঙ্গল- এর ৩/৪ জন জোয়ানের দেখা পান। তারা উপরে পাকবাহিনীর আক্রমণের ঘটনার কথা জানায়। এই ৪ জন বলে, আমরা ২০/২৫ জন ছিলাম। কিন্তু দশমাইল নামক স্থানে পাঞ্জাবীরা আমাদের ঘেরাও করে। আমরা ক'জন পালাতে পেরেছি; অবশিষ্টদের খবর জানি না।' ক্যাপ্টেন আশরাফ তখন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বীরগঞ্জে থেকে

যান। আমরা সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হতে বীরগঞ্জে উপস্থিত হলে ক্যাপ্টেন আশরাফের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সুবেদার হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন আশরাফ আলোচনা করেন। সৈয়দপুরের পথে ভূমিরবন্দর পুলের পাশে পৌঁছাই। পুলের বাম পাশে সৈয়দপুর- দিনাজপুর রাস্তায় আমরা এবং ডান পাশে ক্যাপ্টেন আশরাফ তার কোম্পানী নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করলেন।

৫ই এপ্রিল পাকবাহিনী ১১টি গাড়ী নিয়ে আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ওয় বেঙ্গল প্রথমে মেশিনগানের গুলি ছোঁড়ে। পাকসেনারা সামনে অগ্রসর না হয়ে সৈয়দপুরে পালিয়ে যায়।

৫ই এপ্রিল তারিখে আমরা আরও ৬ মাইল সামনে চম্পাতলী নামক স্থানে যাই এবং রাতের মধ্যে ডিফেন্স নিই।

৬ই এপ্রিল পাকসেনারা সেনানিবাস থেকে দিনাজপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের রাইফেলের আয়ত্তের মধ্যে আসলে আরম্ভ করি। দুই- তিন ঘন্টা উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলে। পাকসেনারা ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে সেনানিবাসে চলে যায়।

ঐ তারিখেই বেলা আড়াইটা- তিনটার দিকে পাকসেনারা একটি ট্যাঙ্ক নিয়ে আমাদের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা তখন সৈয়দপুর থেকে দুই মাইলের ভিতর। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকবাহিনীর আক্রমণে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পিছু হটতে থাকি। বামদিকে নীলফামারীর দিকে পিছু হটি। ওয় বেঙ্গল এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পাকসেনারা অগ্রসর হতে থাকে। বাড়ীঘরে সব আগুন লাগাতে থাকে। সুবেদার হাফিজ আমাদের নিয়ে রাত ১১টায় দারয়ানী স্টেশনের পশ্চিম পাশে এক গ্রামে আকবর আলী চেয়ারম্যানের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। আমরা তখন ৭০/৮০ জন ছিলাম। সেই রাতে আকবর আলী সকলের খাবারের ব্যবস্থা করেন। রাতে ওখানে থাকি।

৭ই এপ্রিল আমরা খানসামা নামক স্থানে গেলাম। সেখানে থেকে খবর পেলাম নীলফামারীর ৮নং শাখার যে কোম্পানী ছিল তারা পাকবাহিনী কবজায় চলে যায়। খানসামাতে নদীর পাড়ে আমাদের ৯নং উইং- এর একটি প্লাটুন আগে থেকেই ডিফেন্সে ছিল। আমরা এই প্লাটুনের সাথে একত্রিত হই। প্লাটুনকে রেখে আমরা বীরগঞ্জে চলে আসি। সেখানে ৮ নং শাখার সুবেদার মেজর রব সাহেবের নির্দেশক্রমে খানসামাতে আমরা ডিফেন্স নিই এবং খানসামাতে অবস্থানরত দশমাইল স্ট্রিং ডিফেন্স পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১০ই এপ্রিল পাকসেনারা দশ মাইল ডিফেন্সের উপর আক্রমণ করে। দশ মাইলে আমাদের বাহিনী টিকতে ব্যর্থ হয়। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পাকসেনারা ভাতগাঁও নামক স্থানে আসে। ভাতগাঁওতে আমাদের ডিফেন্সের পতন ঘটে।

১০ই এপ্রিল রাতে আমরা খানসামা ছেড়ে দেবীগঞ্জ পৌঁছাই। ১১ই এপ্রিল সেখানে আমাদের উইং- এর একটি কোম্পানী ও একটি প্লাটুন ছিল। আমরা দেবীগঞ্জ পথের পাশে ডিফেন্স নিলাম। ঠাকুরগাঁও থেকে খবর পেয়ে আমরা ১৩ই এপ্রিল ঠাকুরগাঁও পৌঁছাই। সেখান থেকে আমরা বীরগঞ্জ পৌঁছাই।

১৩ই এপ্রিল তারিখের খানসামাতে পাকবাহিনীর সামনেই আমরা প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করি। রাত ৩টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত ফায়ারিং চলে। সকাল ৮টায় আমরা পাকবাহিনীর মেশিনগানের অবস্থান জানতে পারি। আমি ২” মর্টার দিয়ে মেশিনগানের উপর গোলা ছুড়তে থাকি। পাকবাহিনী বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পালাতে থাকে। বহু পাকসেনা এখানে নিহত হয়। এখানে আমরা পাকবাহিনীর ঘাঁটি দখল করে নিই। দুই ট্রাকভর্তি পাকবাহিনীর মালামাল উদ্ধার করি।

১৪ই এপ্রিল আমরা এই এলাকা দখল করে অসতর্ক অবস্থায় বসেছিলাম। সেই সময় হঠাৎ করে পাকসেনারা নীলফামারী থেকে এসে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসে। আমরা হঠাৎ আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। সবাই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পিছু হটে থাকি এবং ১৬ই এপ্রিল পঞ্চগড় পৌঁছাই। তখন আমরা ৫০/৬০ জনের মত ছিলাম। পঞ্চগড়ে ঠাকুরগাঁ থেকে সুবেদার মেজর কাজিমদ্দিন সমস্ত গোলাগুলি, রেশন এবং সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিল। ১৭ই এপ্রিল আমরা এখানে ডিফেন্স নিই। তখন আমাদের কাছে একটি মেশিনগান ছিল। ১৯শে এপ্রিল পাকসেনারা আমাদের উপর আক্রমণ করে। ৯টায় এখানে ২/৩ ঘন্টা যুদ্ধ হবার পর আমরা পিছু হটে ভজনপুর নামক স্থানে চলে যাই। এখানে নদীর পাড়ে ২০শে এপ্রিল সকালে ডিফেন্স নিই। অন্যান্য স্থান থেকে টহল দিয়ে বেড়াতে। আমরা ভজনপুর থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পাকবাহিনীর উপর হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ চালাতে থাকি। ৮ নং শাখার পতন ঘটলে ক্যাপ্টেন নজরুল আমাদের এখানে আসেন। তিনি দায়িত্ব নেন আমাদের। কিছুদিন পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এবং এম এ জি ওসমানী আসেন এবং ভাষণ দেন। আমরা পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাকসেনাদেরকে খতম করতে এগিয়ে যাই। ভজনপুর সব সময় মুক্ত ছিল। আমরা বাংলাদেশের মাটিতে থেকেই দেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করেছি।

সশস্ত্র প্রতিরোধে ঠাকুরগাঁ- দিনাজপুর

সাক্ষাৎকারঃ নায়েব সুবেদার আবু তালেব শিকদার

১৬-৭-১৯৭৪

ইপিআর- এর ৯নং শাখা ঠাকুরগাঁতে ছিল। উইং কমান্ডার ছিলেন মেজর মোহাম্মদ হোসেন (পশ্চিম পাকিস্তানী), সহকারী উইং কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম। কোয়ার্টার মাস্টার ছিলেন ক্যাপ্টেন নজীর আহমদ (বাঙ্গালী)।

২৬শে মার্চ সকালবেলা সামরিক বিধি জারী হওয়ার পর প্রায় ১০/১২ হাজার লোক ঠাকুরগাঁ ইপিআর হেডকোয়ার্টার ঘেরাও করার চেষ্টা করে। বাঙ্গালী ইপিআররা জনসাধারণকে সেখান থেকে চলে যেতে বলাতে তারা চলে যায়। ঠাকুরগাঁ শহরে কারফিউ জারী করা হয়। ২৭শে মার্চ একজন পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর ঠাকুরগাঁ শহরে একজন রিকশাওয়ালাকে গুলি করে তহা করে। ২৮শে মার্চ একজন দোকানদারের ছেলেকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২৮শে মার্চ বিকেল ৬টার সময় আমরা গোপন সূত্রে জানতে পারলাম যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের বাঙ্গালী জেসিওদের গেফতার করবে রাত ১২ ঘটিকার সময়। ২৮শে মার্চ রাত আটটায় চট্টগ্রাম বেতার থেকে আমরা খবর পেলাম পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য। রাত ৯টার সময় সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরদের অস্ত্র জমা দেবার জন্য মেজর মোহাম্মদ হোসেন নির্দেশ দেন। আমরা রাত ১০-৩০ মিনিটে বাঙ্গালী সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন এবং সুবেদার হাফিজ ও অন্যান্য বাঙ্গালী জেসিওদের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ি। সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরকে খতম করা হয়। ওদের প্রায় ৭০/৮০ জন ছিল। বেলুচ রেজিমেন্টের একজন সুবেদার এবং কিছু সৈন্যও ছিল। এয়ার ফোর্সের কয়েকজন সৈনিক ছিল। রাত ১১টার সময় আমরা বাঙ্গালী ইপিআর কোতে ও ম্যাগাজিন ভেঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিই।

২৯শে মার্চ বেলা তিনটার সময় মেজর মোহাম্মদ হোসেনকে তার বাসভবনে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরিবার পরিজনসহ ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম ঐ দিন রাতে পালিয়ে সৈয়দপুর যাবার চেষ্টা করলে স্থানীয় জনসাধারণের হাতে সে খোচাবাড়ি এলাকাতে ধরা পড়ে। জনগণ বাঙ্গালী ইপিআরদের কাছে তাঁকে ও তার পরিবারবর্গকে সোপর্দ করে। ঘটনাস্থলে সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২৯শে মার্চ ঠাকুরগাঁওর অধীনে সমস্ত বিওপির (৩৪টা) সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরকে হত্যা করা হয়। কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী ইপিআর বিওপিতে থেকে বাকি সবাই ঠাকুরগাঁও এসে একত্রিত হয়।

৩০শে মার্চ সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআর সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে ভাতগাঁও পুলে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। ঐদিনই দিনাজপুরের কুঠিবাড়ী থেকে ৮নং উইং- এর ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম, সুবেদার মেজর এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম টি হোসেন, ক্যাপ্টেন আরশাদ (৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ভাতগাঁও পুলের কাছে আসেন। এখানে সবাই কনফারেন্স করেন।

৩০শে মার্চ বিকেলে সবাই সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হয়। ভূষিরবন্দর ব্রীজে আমরা ডিফেন্স তৈরী করি। ৩১শে মার্চ সৈয়দপুর থেকে বেলুচ এবং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ভূষিরবন্দরে প্রায় দুই ঘন্টা ওদের সাথে আমাদের গুলি বিনিময় হয়। তারা আবার সৈয়দপুর চলে যায়। আমরা ভূষিরবন্দর থেকে একটু এগিয়ে চম্পাতলীতে ডিফেন্স তৈরী করি।

১লা এপ্রিল সকালবেলায় চম্পাতলীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানীরা মিডিয়াম গান ব্যবহার করে। ১২টা পর্যন্ত আমাদেরকে ওখান থেকে হটাতে না পেরে বেলা দুইটার সময় তারা ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। বিকেল ৬টা পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলে। কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী ইপিআর সেখানে শাহাদাৎ বরণ করেন। পাকিস্তানীদের দুটো ট্যাংক আমরা ৬-পাউন্ডার গোলায় সাহায্যে ধ্বংস করতে সমর্থ হই। আমরা পিছিয়ে এসে ভূষিবন্দরে ডিফেন্স তৈরী করি।

২রা এপ্রিল আমাদের কিছু বাঙ্গালী ইপিআর নীলফামারী হয়ে সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সৈয়দপুর থেকে দুই মাইল আগে তাদের সাথে সারাদিন তুমুল যুদ্ধ চলে। রাত্রিবেলা বাঙ্গালী ইপিআরা সেখান থেকে ঠাকুরগাঁও এসে একত্রিত হয়। ৩রা এপ্রিল ভূষিরবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। সারাদিন যুদ্ধ চলে। রাতে আমরা দশমাইলে গিয়ে ডিফেন্স তৈরী করি।

৫ই এপ্রিল পাকিস্তানীদের সাঁজোয়া এবং গোলন্দাজ বাহিনী দশমাইলে আমাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। দশ মাইলে অনেক বাঙ্গালী ইপিআর শাহাদাৎ বরণ করেন। অনেকেই আহত হন। কুঠিবাড়ীর বাঙ্গালী ইপিআররা আবার দিনাজপুরের দিকে চলে যায়। ঠাকুরগাঁওর বাঙ্গালী ইপিআররা আবার ব্রীজে অবস্থান নেয়।

৭ই এপ্রিল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ভাতগাঁওর উপর হামলা চালায়। এখানেও বাঙ্গালী ইপিআর হতাহত হয়। পেছন থেকে কোন সাহায্য না পাওয়াতে আমরা সেখান থেকে পিছু হটেতে বাধ্য হই। পঁচাগড়ে গিয়ে আমরা একত্রিত হই এবং সেখানে ডিফেন্স তৈরী করি। ১৪ই এপ্রিল পঁচাগড়েও পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের উপর আক্রমণ করে এবং আঙুনে বোমার সাহায্যে পঁচাগড় শহরকে সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেয়। পঁচাগড় থেকে বাঙ্গালী ইপিআররা অমরখানাতে গিয়ে শেষ ডিফেন্স তৈরী করে। সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রতিজ্ঞা নেয়া হয় যে একটা লোক জীবিত থাকা পর্যন্ত এখান থেকে কেউ পিছু হটেবে না। আল্লাহর রহমতে দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত অমরখানা আমাদের দখলে থাকে।

সশস্ত্র প্রতিরোধে দিনাজপুর

সাক্ষাৎকারঃ খন্দকার আবদুস সামাদ

২২-৭-১৯৭৪

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে আমি দিনাজপুর জেলার পঁচাগড় থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ছিলাম। ২৫শে মার্চের পরপরই যখন ঢাকায় সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণের খবর পাই তখনই থানার ৫ জন অবাস্তানী সিপাইকে

নিরস্ত্র করে ঠাকুরগাঁ জেলখানায় পাঠিয়ে দেই। থানার বাঙ্গালী সিপাহীরা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সহযোগিতা করে। এপ্রিলের প্রথমেই থানা ক্যাম্পাসে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, ইপিআর ও পুলিশ একযোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কাজ করে। ঠাকুরগাঁ উইং হেডকোয়ার্টার থেকে বাঙ্গালী ইপিআরগণ তাদের অস্ত্রাদি নিয়ে পঁচাগড় চলে আসেন। থানার রাইফেলগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেয়া হয়। পঁচাগড় থানা ক্যাম্পাসে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে আমি নিজেও সক্রিয় ছিলাম। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু ছিল।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে দিনাজপুর- পঁচাগড় রাস্তায় ভাতগাঁও নামক স্থানে একটি পুলে পাকিস্তানী সেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট সংঘর্ষ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও ছাত্র- জনতা ছিল। সৈন্যদের ভারী অস্ত্রের মোকাবেলা করতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে এসে পঁচাগড়ে ডিফেন্স দেয়। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে পঁচাগড় প্রবেশে বাধা দেয়া। ঐ সময়ই নিরাপত্তার জন্য আমি আমার পরিবারের লোকজনকে ভারত সীমান্তের কাছে ভিতরগড় নামক স্থানে স্থানান্তরিত করি। আমি নিজে পঁচাগড়েই অবস্থান করতে থাকি।

২১শে এপ্রিল সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করতে করতে পঁচাগড়ে ঢুকে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষ হবার পর সৈন্যরা পঁচাগড় থানা বাজারটি সম্পূর্ণ পুড়িয়া দেয়। বহু লোক মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধারা গ্রুপ হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতে প্রবেশ করে।

মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর*

গভীর রাত্রিতে ওরা দিনাজপুর শহরে এসে ঢুকল। এ রাত্রি সেই ২৫-এ মার্চের রাত্রি, যে রাত্রির নৃশংস কাহিনী পাকিস্তানের ইতিহাসকে পৃথিবীর সামনে চির-কলঙ্কিত করে রাখবে।

ওরা সৈয়দপুর থেকে এসে অতি সন্তর্পণে শহরের মধ্যে ঢুকল। শ'খানেক পাঞ্জাবী সৈন্য। শহরে ঢোকার মুখে প্রথমেই থানা। সৈন্যরা প্রথমে থানা দখল করে নিয়ে সেখানে তাদের ঘাঁটি করে বসল। তারপর তারা তাদের পূর্ব- নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে শহরের টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। সেইদিনই শেষ রাত্রিতে দিনাজপুরের বিখ্যাত কৃষক নেতা গুরুদাস তালুকদার এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিক তাদের হাতে গ্রেফতার হলেন। এমন নিঃশব্দে ও সতর্কতার সঙ্গে এ সমস্ত কাজ করা হয়েছিল যে, শহরের অধিকাংশ লোক তার বিন্দুমাত্র আভাস পায়নি। পরদিন সকাল বেলা তারা ঘুম থেকে জেগে ওঠে জানল, পাকসৈন্যরা তাদের দিনাজপুর শহর দখল করে নিয়েছে। আরও শুনল, বেলা ১১টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ আদেশ ঘোষণা হচ্ছে। দিনরাত অষ্টপ্রহর ধরে কারফিউ চলবে। শহরের রাজপথ জনশূন্য, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া- শব্দ নেই। সবাই যে যার ঘরে মাথা গুজে বসে তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জল্পনা- কল্পনা করে চলেছিল। সারাটা দিন এইভাবে কাটল কিন্তু রাত্রি বেড়ে উঠার সাথে সাথে এই ভীতসন্ত্রস্ত মানুষগুলির মনের পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল, তারা মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুহূর্মুহু ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। শহরে যে- সব জায়গায় মেহনতী মানুষদের বাস, সেই সব জায়গা থেকেই সবচেয়ে বেশী আওয়াজ উঠছিল। দম বন্ধ করা সেই ভয় ও দুর্ভাবনার বোঝাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মানুষ প্রাণ খুলে তার প্রাণের কথা বলতে চাইছিল। রেল চলাচল, ডাক, টেলিগ্রাফ, সবকিছু বন্ধ অথচ খবরগুলি যেন বাতাসে উড়ে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কেমন করে সেই সমস্ত সংবাদ এল কেহই তা স্পষ্ট করে বলতে পারে না, কিন্তু ২৭তারিখের মধ্যেই এ কথাটা মোটামুটি সবাই জেনে ফেলেছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। শহরের লোকদের চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা তাদের ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। এটা সবাই তীব্রভাবে অনুভব করছে যে, এই মুক্তিসংগ্রামে সকলেরই যোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু সাধারণ মানুষ, নিরস্ত্র মানুষ, তারা কি করে জঙ্গী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

* ‘প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ’ থেকে সংকলিত।

২৬-এ মার্চ থেকে ২৮-এ মার্চ পর্যন্ত একটানাভাবে দিনরাত কারফিউ চলছিল, মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, উত্তেজনা ফেটে পড়তে চাইছে। এদিকে পাক- সৈন্যরা নিশ্চিন্তে ছিল না। জনসাধারণ জানুক আর-না-ই জানুক এক মহাসঙ্কট সৈন্যদের মাথার উপর খড়গের মত ঝুলছিল। এক প্রবল বিরোধী শক্তি উদ্যত হয়ে আছে, যে কোন সময় তা এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। দিনাজপুরে ইপিআর বাহিনীর পাঁচশ জওয়ান আছে। সৈন্যদের সংখ্যা মাত্র একশ। এখানে আপাতত তারা শান্ত হয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের মনোভাব অজানা হয়। পূর্ববঙ্গে সর্বত্র এই ইপিআর বাহিনী বিদ্রোহীদের পক্ষে প্রধান শক্তি। কাজেই সময় থাকতেই এদের নিরস্ত্র ও বন্দী করে ফেলা দরকার। প্রয়োজন হলে এদের কচুকাটা করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। কিন্তু মাত্র একশ সৈন্য ইপিআর- এর পাঁচশ জওয়ানকে নিরস্ত্র করবে অথবা বন্দী করবে, অথবা কচুকাটা করবে; এটা ইবা কেমন করে সম্ভব? সৈন্যদের নেতৃস্থানীয়রা বুদ্ধি করল, এক্ষেত্রে সরাসরি বল প্রয়োগ না করে ওদের কৌশলে ডেকে এনে ফাঁদে ফেলতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে একটা বড় রকম ভোজের আয়োজন করে তারা ইপিআর বাহিনীর জওয়ানদের সাদর আমন্ত্রণ জানাল। সৈন্যদের পক্ষ থেকে হঠাৎ এমন আদর-আপ্যায়নের ঘটনা দেখে ইপিআর বাহিনীর লোকেরা মনে মনে হাসল। ওদের মতলবখানা বুঝতে কারও বাকী ছিল না। ওরা এই কদিন ধরে ভেতরে প্রস্তুতি নিয়ে চলেছিল। এবার আর দেরী না করে তারা স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

আমন্ত্রিতেরা সদলবলে তাদের ঘাঁটি থেকে দিনাজপুর শহরে চলে এল। তারা ২৮-এ মার্চ বেলা ২টায় ‘জয় বাংলা’ ধ্বনিতে সারা শহর মুখরিত করে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝটিকার বেগে আক্রমণ করল। হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হয়ে উদ্ভ্রান্ত পাক- সৈন্যদের অধিকাংশ ‘সার্কিট’ হাউসে গিয়ে সেখানে তাদের ঘাঁটি করে বসল। অন্যান্যরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শহরের নানা জায়গায় আশ্রয় নিল। কিন্তু শহর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইপিআর বাহিনীর যোদ্ধারা আর শহরের মানুষ এই পলাতক দস্যুদের সেই সমস্ত আশ্রয় থেকে টেনে টেনে বার করতে লাগল। তাদের খতম করে ফেলতে খুব বেশী সময় লাগল না। কিন্তু সার্কিট হাউসের মধ্যে অবরুদ্ধ পাক সৈন্যরা ৩০ মার্চ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করে চলেছিল। এই তিন দিনের যুদ্ধে তাদের মধ্যে মাত্র সাতজন ছাড়া আর সবাই মারা পড়ল। ৩১ই মার্চ তারিখে সেই সাত জন সৈন্য মরিয়া হয়ে একটা গাড়ি নিয়ে অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। এইভাবে তারা মৃত্যুর গহবর থেকে প্রাণ বাঁচাল। শোনা যায় ঐ গাড়ির মধ্যে কর্নেল তারেকও নাকি ছিলেন।

দিনাজপুর জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধের আরও বিবরণ

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর এ,রব ডি-এ-ডি)

২৪-২-১৯৭৯

From 9.3.71 Major Amin Tarique, 8 Wing Comd, changed the Bengali Guard Comd, Kote and Magazine NCOS and detailed Punjabi in their Place. He deputed few Beharis of EPR to act as security against 3 Bengali Army officers, sectors SM (me) and against Bengali JCOs, NCOs. These actions created a commotion among us. Capt Nazir Ahmed and Capt Nazrul Haque both being Bengali were QM and Adjt respectively in these days. I reported all these happenings to Adjt and QM.

When 8 wing kote, magazine NCOs and guard comd were changed, I with Ataul Haque (shaheed), N/Sub Lutfur Rahman, N/Sub Moazzem Hossain. Sector QM/Hav Khandaker Abu Sayed, QM/Hav Bhulu Miah of 8 wing, Hav Nazim of

sector antitank platoon and with more NCOs and few others made plan that in case of untoward happenings sector SM (A Rab) will supply keys which he had kept earlier to open kotes and magazines for getting arms and/ammos. Our plan for action was confined within few pers through whom men kept organised for any eventuality.

On 17.3.71 Sector comd ordered QM capt Nazir Ahmed to make over all granade, Chinese arms to 26 FF Regt coys, who were at Dinajpur circuit house. In turn QM Capt ordered sector QM/Hav kh Abu Sayeed to hand over, but he did not make over.

In the 2nd week of March 71 some non- Bengali JCOs/NCOs and ORs were closed from BOPs to Wing /Sector HQ to increase the non-Bengali strength and arms were issued to them for whole time. On 18.3.71 QM/Hav kh Abu Sayeed were ordered to hand over the key of sector armoury to N/Sub-QM Mohd Ibrahim (non-Bengali), but he did not hand over, rather he issued all Chinese arms to all Bengali family pers for which he was charged on 24.3.71 Finding the situation becoming aggravated day-by-day, I drew up a plan to face sudden untoward incidents, if any, and face the enemy.

As arms and ammo control were out of our hand, one day during my talk with Col. I played tricks with him stating that his non-Bengali securith could not get true political situation report from town as they were unable to mix –up with locals. So some trusted Bengali should be deputed for this job who could mix-up with political parties and students freely and may bring correct information, Sector Comd having confidence on me, accepted my suggestion and asked me to depute 2/3 trusted Bengali boys for the job. Accordingly I deputed L/NK Abul Mannan, L/NK Motahar and Sepoy Mustifizur Rahman telling them to report to Sector Comd direct. I advsd them that during their report they would state that Awami League volunteers, students and N.A.P workers were being trained by Indian agents at dead of night in Rajbari mango garden and in other jungles outside the town and they had been issued wityh arms/ammos and they might suddenly attack EPR sector HQ, officers club and their bungalows. My motive behind this briefing to security team was that on hearing these reports C.O. most likely would call me and other officers and would ask for action. In that case my advice would be to dig out all round defence in lines, club and officer's bungalow and there should be dawn to dusk 'stand to posn', so arms/ammos may remain in our hand in spite of kotes and amgs being with the Punjabis. Sector Comd accepted my advice and ordered for implimentation. Immeditely I did the work as per plan and by the grace of Almighty Allah not a single Bengali EPR lost their lives without battle. Also lives of MNAs/MPAs and students leaders were saved.

On 18.2.71 Sector Comd insisted D. C., Dinajpur, Mr. Faizuddin Ahmed to promulgate carfew in Dinajpur but D.C.declined to do it. Officers of 26 FF coys, and EPR non-Bengali officers on DC's refusal to impose carefew were trying to cause riots through their agents, mostly Beharies so that Army may get a chance to overrule D. C. and promulgate carfew. I managed to meet Prof Yousuf Ali in the house of Mr. Zaman (prop. Friends Electrical Stores) and a relation Bangobandhu and informed the situation. I informed the Awame League MNAs and other leaders through various Sources.

On 19/20th March 71 Capt Adjt Nazrul Haque was removed and Capt Javed Feroz (Punjabi) posted as Adj. Bengali suppt pl comd N/Sub Moazzem Hossain was changed by a Behari Comd. Due to all these happenings Bengali EPR pers at some stage became frustrated. Noticing this I informed them not to get nervous or frustrated rather remain organized and alert and wait for the time without exposing themselves first to be victimised.

On 23.3.71 at about 09-30 hrs, over telephone Sector Comd ordered me to arrange 'Bara Khana' and variety function for the troops. At about mid day sector Comd again ordered to invite 26 FF Regt pers in Bara Hhana. At about 1600 hrs through my intelligence information reached me that a plan was made that during 'Bara Khana' half of The FF Regt pers would take food with us and the rest suddenly would appear with arms and capture our kote magazine. At once I communicated this to my trusted Bengali troops to remain alert. By the grace of Allah, nothing happened in that night and the invited left the lines after taking their Khana smoothly, though some of them came with rifle.

On 24.3.71 mental unrest among us was created by the ugly activities of the pak force in the shape of blank firing creating tension in the town. On and from 23rd March 71 I increased my night sentries with necessary instruction to keep watch over the movement of Pak army.

On the 24th of March 71 we saw the pak army placing some automatic weapons in the Circuit house compound at Dinajpur facing our lines. This activity on the part of the Pak army created tension.

On 25th night at about 01-30 hrs I got up from sleep and sat for Tahajjat prayer and hardly I could finish it when I got a telephone call from my Adj. Capt Zaved Feroz (punjabi), who asked me to report at the sector Comd residence in uniform. I got perplexed. However, I put on my uniform and took my revolver and loaded it with view to shoot at least two in the event of any attempt upon my life. As soon as I came out of my gate I saw a jeep coming and when the jeep stopped before me at my gate, I saw two non-Bengalee escorts sitting inside the jeep. I boarded on the jeep and while I was passing by the residence of D. C. Dinajpur, I found the D. C's bungalow encircled by the pak army with automatic weapons. After reaching the residence of sector Comd I saw all of our officers holding a conference and among them there were Bengalee officers, viz QM., Capt Nazir Ahmed, Capt Nazrul Haque, Asstt wing Comd, 8 Wing and Medical Officer Maj M.H. Choudhury and at the presence of my officers there, my mental unrest to some extent minimised. After my arrival there, Sector Comd informed me that in Dacca, Chittagong, Rajshahi, Khulna and other districts innumerable cases of arson, looting and molestation of women and all sorts of unsocial activities have occurred due to the failure of civil adm. So for the greater interest of public and the state, the Army and the EPR have taken over the the adm. of the country i. e . E . pak, now Bangladesh, from mid night. The Sector Comd asked me to inform lines over telephone asking them to assemble in the Recreation Room where he intended to address them. Accordingly, we all reached the EPR lines and the Sector Comd talked to men and talked to men and passed order to post pickets at the key points of the town, but it was found that most of the comds were non-Bengalees.

While I was going to retire, I got another telephone call from circuit house where army HQ was located asking me to reach there. On arrival at the circuit house I found Sector Comd, security Officer Maj Raja Siddique and Maj Durrani who received me with a smiling face and asked me to write down in Bengali an order of curfew to be imposed in the Dist. I obeyed and I was detailed to announce it in my language. During announcement I was escorted by the said officers in four jeeps and a guard of FF Regt behind me. Announcement started at 03-00 hrs and ended at 09-30 hrs. After it, I was ordered to take rest for the day.

On 26.3.71 throughout the day Army and EPR patrolled the town and its suburbs and few standing pickets were posted for 24 hrs. Road blocks and obstacles were put up by the public for which army opened fire and killed several persons. At night, Army and EPR non-Bengalee officers arrested public leaders including Guru Das Talukder, Baroda Chakravarty and others and some Hindu merchants including Sogunlal Lahia and put them into jail.

On 27.3.71 I was called by 8 Wing Comd and Adjutant and was ordered to accompany the publicity officer to help him during announcement in the town. I carried out the order and returned from announcement at about 11-30 hrs when sector Comd ordered me to close all the available persons in the lines as he intended to address them. The sector Comd addressed the force repeating the speech of president Yahya Khan accusing Awami League and Banga Bandhu.

After this, QM Capt. Nazir Ahmed and sub Ataul Haque with one platoon were sent to Thakurgaon. I felt the absence of Sub Ataul Haque very much as he was one of my right hand in the liberation struggle of Dinajpur. N/Sub Lutfar Rahman who was picket comd at Balubari was threatened by sector Comd unnecessarily on the plea that he had instigated public to attack our 21/C's residence. This was a pretext to remove him and to put a non-Bengali comd in his place. At about mid day some Behari came to Sector Comd and reported that Bengalees were assembling near Kanchan River and in other outlying areas of town to attack the Beharis. I went with patrol party and on return reported to the Sector Comd that this was false. Throughout the day Army and EPR patrolled the town. A 12 year old was killed by the army in Balubari area while he was crossing the road.

On 27.3.71 in the evening the Sector Comd tried to go to Rangpur Brigade to bring some more army at the instigation of his non-Bengalee officers but he failed to go due to heavy road block. On return, he sent patrol party who killed about 14 Santals who were residing near that road block.

On 27/28th night pak army called some of their enlisted men from their houses including brother of Habib, Chairman of Chehelgazi Union Council and killed them. Dead bodies lay scattered in three places i.e. in Rajbari jungle, four bodies were near Fulhat Bridge and about 8/9 bodies were thrown in the ditch of WAPDA band. During daytime people became very much panicky seeing these dead bodies.

In the meantime source report reached me that all the M.N.As and M.P.As and prominent town leaders would be called in a conference in the evening in Dinajpur Army HQ and after conference during a tea they would be killed. After it, leaders in jail would be dealt with and after at about 17-00 hrs attack would be launched against Bengalee EPR. All available M.N.As/M.P.As were told not to attend the conference through our source.

At about 10-30 hrs on 28.3.71 (Sunday) Hav Nazim came to me with tears in his eyes. He was stating that about 200 men were killed by Pak army last night and some dead bodies were lying near his house and informed me that he had been asked by 8 Wing QM Hav Muslim Ali and Sector QM Hav Khandaker Abu Sayed to contact me for the instruction as to what step we should take now. I told him to wait for our zero hour and in case if I was unable to reach them, they should not wait for the order but go ahead with the plan (i.e., our time was 1600hrs). It may be mentioned that Subedar Badsha Ahmed (Behari) was called from his border coy (Biral). Though 28.3.71 was Sunday yet Sector Comd and other non-Bengalee officers held a meeting in the office upto 1400 hrs. After meeting, an order was passed to provide one PI to subedar Badsha Ahmed for outside use with arms and weapons as per his demand. There was an army signal set in EPR line since the arrival of army in Dinajpur and NCO In-charge (Punjabe) was called to circuit house and on return to line he asked his Bengalee operator to close the set. Due to the demand of one PI str by Sub Badsha Ahmed along with 3" Mor, MMG and LMG and removal of wireless set from line we were compelled to shift our 'H' hour one hour and 15 minutes ahead of our schedule time. As soon as officers left the office, arms Behan to be issued to the men of Sub Badsha Ahmed PI and with these arms men were deployed as per plan. Hardly our men could reach their position when first fire came from circuit house and we responded with 3" Mor and MGs, LMGs from our posn to that and another party started dealing with non-Bengalee EPR pers who had already made a plan to kill us along with their W/Pak brothers. By this time heavy shelling and LMG fire from both sides was in full swing. Firing was so intense and heavy that I could not instantly reach my R.V as my quarter was situated in between circuit house and EPR lines. Firing continued throughout the night with intermittent break. During this break I managed to reach R.V and directed the operation. One M.M.G. 1×3"Mor was placed on the Kanchan bridge to cover any enemy approach through ferry ghat and RLY bridge. In the meantime all our heavy arms and ammo were removed to the circuit house on gun point by Cap Adj Ahmed were removed to the other side of the river with the help of local public. Our MO with his family, Capt Nazrul Hoque with his family and wife of Capt Nazir Ahmed were removed to the circuit house on gun position on roof of Mission building which was at a distance of 200/250 yds from our posn. In the meantime I sent instructions to all border coy comds and their BOPS to start operation against the enemy and join with us leaving 2 men in each BOP and they did it.

On 29.3.71 when fight started Hav Bulu Miah, Hav Kalam (Suppt Comd), Hav Sobhan, Hav Idrish, Hav Abdur Rahim (Shaheed), N/Sub Lutfar Rahman, Hav Nazim A/Tk Comd- all of 8 Wing, L/Nk Abul Kalam, Sepoy Awal, Sector QM/Hav kh Abu Sayed, 8 Wing QM/Hav Muslim Ali and L/Nk Motahar and Nk A. Aziz played a major

role in this fight in different front. Prompt and active response from the younger generation of Dinajpur was spontaneous and encouraging.

On 30.3.71 whole day with intermittent break fight between pak junta and EPR was severe. Both used 3" mortars and MGs and EPR who had a 6 pounder anti-tank gun used maximum. This weapon had a very bad effect on the Pak army. They presumed that Indian Army tank entered into Dinajpur town to help EPR. In the meantime a good number of police from the town and subers, Ansars and Mujaheeds joined with us and this had increased our morale. Operation against the non-Bengalee EPR in border and camp areas was almost complete by the 30th evening.

By the evening of 30th March 71 we removed our extra arms/ammo and other heavy stores opposite to Kanchan river and established our main rear HQ there. Enemy tried to attack our main rear HQ from two sides i.e. from the side of Chehel Gazi Mazar and Ghugu Danga side but failed and sustained heavy casualties.

On 30 March 71 night at about 20-00 hrs when I was drafting few messages for our outlying coys Mr. Abdur Rahim M.C.A and Shah Mahatab Uddin M.C.A came to our help. We got all kinds of help including food etc. from the public and it was very commendable.

9 Wing of Thakurgaon also started action throughout their wing and broader as per our earlier plan.

During 30th night fight was on. As our all the Bengali coy and pl comds were in border except N/Sub Lutfar Rahman, the leadership upto 30th midday at different front was given by our valiant NCOs.

By the early morning of 31st Mar. 71 Sub A Majjid, N/Sub Amir Ali Sk, N/Sub Moazzem Hossain, N/Sub Mir Mokaddas, N/Sub Mominul Haque with their troops joined with us. Now with the full strength of about 400/500 men we gave a heavy thrust on the enemy. Sub Sukur who was Coy Comd advanced towards Parbatipur.

On 29/30th night reinforcement with field guns were sent from Sayedpur to help Pak troops at Dinajpur but they could not reach due to heavy road blocks, obstacles and resistance by our force and local youths. By the mid-day of 31st Mar 71 enemy had sustained heavy casualty and finding no material help from Sayedpur Cantt, our Sector Comd Col Quraishi, 21/C Major Zubairi, Capt Javed Feroz, Capt Chema, all of EPR, with Major Durrani and Lt Khokar of 26 FF Regt withdrew through Fulbari road where they were intercepted by coy of Sub Sukkur near Fulbari bridge and fight continued for some time. During this fight both the sides sustained loss and the enemy changed their route. When they reached near Mohanpur bridge they got another beat by our force and withdrew through Rajbari- Raninagar road to Sayedpur leaving behind their deads and few transport they had with them including jeep of Col Quraishi. In the meantime enemy field gun started firing on us (EPR) from Bhushir Bander area and as such we could not chase the enemy further. Those shots fell on EPR lines, D.C's ground and police lines.

The whole night of 30/31st Mar. 71EPR re-inforcement continued their covering fire but finding no reply from the retreating enemy our forces gradually advanced towards 10 miles ('T' junction), Raninagar Bhushi area keeping a PI under Comd of N/Sub Lutfar Rahman on the right of Rajbari dighi to meet enemy in case of their advance through jungle. We covered all the approach roads of Dinajpur town with 1 PI under comd of Hav Bulu Miah in new town area where Beharis had their concentration with arms, keeping another detachment under comd of N/Sub Mominullah in Mohanpur bridge area, and one more near Kanchan RIY station.

By the 31st midday we cleared the town from the enemy. From circuit house where the enemy had their HQs we recovered 5 students, some police, 5EPR jawans dead bodies and one truck-load ration, one truck-load ammo with some arms beddings left by enemy. Hav A Sobhan who led one pI from Kutibari EPR HQs to the town recovered 1× 3" Mor and 2 Chinese M.G. left by enemy from the roof of circuit house. At new town Sub/Maj Osman Gani joined with Bulu Miah's force from Parbtipur.

On 31st Mar. 71all the EPR troops and nearly 150/200 police, Ansar and Jujaheeds who had joined us took defensive posn. At about 0900 hrs Dinajpur jail gate Was opened and all the political leaders including Mr. Gurudas Talukder, Baroda Bhusan Chakravarty, Sagun Lal Lohiya and some other men including students were released. After clearing the enemy we brought whole town and villages under our control. Bangladesh flag started flying on all public and private buildings. SDO and other police and civil officials who hid themselves for fear of life were asked to reach town and resume their duties.

On 30/31st evening Maj M.H. Chy, Capt- Nazrul Haque, Mr. Faizuddin Ahmed, DC. Mr. Hashem SP, Mr. Hannan Chy, Dist. Judge, Mr. Shahadat Hossain Ex-En, Road and Mr. A Rouf Ex-En, Building, Dinajpur were rescued with their family members by our patrol party of Hav Idris and taken to our rear HQs at Kanchan RIY station. Previously we had information that these officers had been killed by Pat army on 28/29 when they were under their custody.

Although most of the BOPs of 9 Wing started their operation by 29th Mar. 71 on having our information but 9 Wing HQs started their operation on 30th limitedly. After eliminating their Punjabi Wing Comd and other non-Bengali pers they were hesitating for any further action. On hearing this I sent a written order from my rear HQ on 30th at 1300 hrs through a motor cycle courier who was sent by Sub/Maj Kazimuddin for further instruction. In that order I asked him to cover probable enemy approach from Rangpur and Sayedpur via Khanshama and Debiganj route.

During Thakurgaon operation our QM. Capt Nazir Ahmed (Bengali) was killed by public when he made a frantic effort to save Capt. Navid Alam (Punjabi) and his wife, claiming her to be his sister. Sub Ataul Haque, L/Nk joinal Abedin were also killed by the same.

On 30/31st (exact date not remembered) our Head Asstt N/Sub Taluker, signal Sub Majid, Hav/Asstt Kashem Mondal and other family pers for whom we were anxious came

and joined us from their hideout. N/Sub Asst Talukder was given the responsibility to protect the Kutibari SHQ/WHQ lines. On 1.4.71 entire force was deployed on different strategic routes.

From 1.4.71 to 4.4.71 Dinajpur town and its suberb was thoroughgly combed out of Pakistani army and non-Bengali EPR elements. In this combing operation police helped us. All the shops, bazars, Banks and Officers started functions; public transport started Plying.

On 1.4.71 I moved my HQ to town area leaving Capt Nazrul Haq at rear. On arrival at town I extended our defence futher to: a.From 10miles to further ahed near Bhusir Bandar bridge. b. From Rajbari area to Shibpur Nala to stop enemy advance from Parbatipur and Sayedpur. c. From Ananda Nagor to Chirir Bandar area to stop enemy advance by train and Fulbari route. Sub Sukkur (B Coy of Hilli) made an attack on Parbatipur along with one coy of 3rd. EB Regt who joined with them.

On 3/4th Apr. one pI of Capt Asharf, 3rd EB Regt who were sent by their CO from Sayeedpur to recee the Shibganj airport (Thakurgaon) joined with us after a great persuation. After recee when they were returning to Sayedpur trouble started and they were stuck up at Thakurgaon.

From 2/3rd Apr. 71 to 4/5th Apr. 71 when our all the border people reached Dinajpur we reorganised our pI/coy and deployed them in different fronts Dinajpur Dist.

All the public leaders including MNAs/MPAs, general public and student community rendered all possible help to us. The contributions of Mr. A Rahim MPA, Mr. shah Mahatab Uddin, MNA, Mr. Azizur Rahman, MNA, Haji Danesh, Gurudash Talukder, Sagunlal Lohia and other leaders during this period are beyond description.

On 3/4th Apr. 71 I, Sub Major Kazimuddin, Capt Nazrul Haque, Captain Asharaf 3rd EBR. Major M.H. Chowdhury and Major M.T. Hossain (rtd) who joined with us held a meeting at Bhatgoan Bridge and discussed our future poan of action.

Having an exprienced and renowed officer like Major M T Hossain we set up an unified operational command keeping him as our head. Then we jountly prepared operational plan to disturb enemy concentration through fighting patrol. According to plan (1) one coy under comd of Sub A Majid (8 wing) was sent to Nilfamary. N/Sub Amir All Sheikh, and N/Sub Moazzem Hussain were with their pI comd and Hav Abul Kalam (now Sub) was with his suppt arms comd. (2) Capt Asraf of 3rd EBR with I coy of 3rd EBR along with JCOs Sub Abdullah and N/Sub Nasir, 2 coys of EBR under comd of sub Hafiz with 2 anti-tank guns under comd of Hav Nazim were deployed in Bhusir Bandar Bridge. Here over all comd was under Capt Asharf. (3) one coy with N/Sub Kawser and N/Sub Zaidul Hussain was sent to Badargonj area where Capt Anwar of 3rd EPR with 2 pI strength joined with our troops.

Over a pI strength under N/Sub Lurfar Rahman and Hav Kibria was deployed on Rajbari and Raninagar road to stop enemy infiltration through the jungle road into Dinajpur town. Capt Nazrul Haque was made the operational Commander for EPR

troops Sub Maj Osman Gani who joined with us from Parbatipur remained in rear HQ for adm arrangement. I was holding the comd of Dinajpur and its suberb including Raninagar area. From 2/3rd Apr. 77/78 BSP officers used to meet us and rendered valuable suggestion. We requested them for support arms but due to obvious reason they could not give it except small arm. Two 3rd EBR coy under Major Nizam were sent to Ghoraghat area on a exercise plea. One coy of 3rd was at parbatipur and one coy with Capt Anwar and their Sub/ Maj Harish had sustained a heavy loss at Sayed, but their Major force remained at Pulbari area. One coy plus str of EPR under comd of Sub Khaleque was deployed in Bhatagaon Bridge area.

Nilfamari fight: On 6th and 7th April, 71 coy of Sub A Majid of 8 wing had a tough fight with enemy who used tank and field guns. In this fight enemy lost 7/8 pers. We lost one EPR jawan and two Ansars and Hav Ishaque of EPR was wounded. During fight our I M.G (Vickar) and one 3" Mor were damaged by arty fire due to use of tank and arty our troops could not stay but withdraw to Debeganj. When enemy entered Nilfamari town they set fire on public houses on both the sides of road and killed innocent people. After Debiganj fight our troops fell back to rear Hq.

Badarganj fight: On 8th Apr. there was heavy fight with Pakistani army during whole day. Due to espionage by anti-Awami League elements of Badarganj enemy had early information about our movement in that area. Suddenly our men were ambushed by enemy but still our troops gave gallant fight. S.P., Rangpur, first came to reece the area with a Capt of Cav. Regt who acted as driver of SP. but could not bluff the eye of EPR who recognised the Capt. The Capt was killed and the S.P. was taken into custody. During this fight, Capt Anowar sustained injury on leg. Our two sepoy and one driver deid. Enemy loss could not be ascertained. From Badarganj our troops were withdrawn to Fulbari defence posn. From Fulbari EPR troops of N/Sub Kawser moved to Mohanpur Bridge and took defence posn and N/Sub Mominul Haque shifted his pI to Kawgaon area.

Bhushir Bandar: On 7th and 8th there was heavy fight with enemy. In this fight also losses. Capt Ashraf who was overall comd deserted us. After the of Bhushir Bandar our troops took next defensive posn at 10 Miles (T. Junction). From here one road leads to Dinajpur (distance 10 miles) and another to Takurgaon Sub Division. Here I took over the comd on 8th April.

From 8th evening enemy started shelling on our posn by field guns. On 7/8th April B.B.C team of Nikolas Tomalin, Alan Heard and Mark Taly visited this area.

10 Miles (t. Junction); After withdrawal from Bhushir Bandar on 8th April 71 our troops (exclusively EPR) with some strength took defensive position in 10 Miles area. I took over the command there on the 8th in absence of Capt Nazrul with N/Sub Matiar Rahman (Suppt comd), 9 wing, N/Sub Goran 9wing, N/Sub Rowshan 9 wing, N/Sub Mir Mokaddes Ali 8 wing, Hav Kalam and Nk Hakim (3" Mor comd). My defence was from famous Kantanagar Mandir area to Nashirpur jute research farm area. Distance was about 10/12 miles but strength was nearly two coys. Raninagar-Rajbari road was being defnded by N/Sub L Rahman and Hav Kibria.

During Nilfamari, Bhushir Bandar and Badarganj fight we lost our 3" motors and machine gun and I had only 2X3" mor, two MGs and two antitank guns, which were not sufficient to fight against arty and tank attack. 2 miles ahead of 10 Miles I sent a fighting patrol to delay enemy advance.

From 9.4.71 morning enemy started pounding our posn by arty guns which continued whole day night and next day on 10.4.71 they attacked us from three axis and fight continued upto 15.00 hrs after which we could not stop the enemy advance. In this fight we lost about ten pers. Among them L/Nk A Sattar and L/Nk Mustafizur Rahman's name could be remembered. 8 person sustained shell wound. We withdrew to Kharal P.S. side. We had second defence in Tobacco Co. WAPDA colony and rice mill area. This rear defence help up the enemy and they did not advance further. While we were fighting the liberation war at 10 Miles, most of the MNA/MPAs excepting Mr. Rahim, MPA and district officials left Dinajpur and entered into India which affected the morale of our troops. For want of heavy weapons we started losing the battle now.

An import bridge called Bhatagaon Bridge about 10 miles away from 'T' Junction in between Dinajpur-Thakurgaon road and its northern area which was the probable approach of Pak enemy from Sayedpur bifurcating 10 Miles defence was being defend by the following 9 and 8 wing J.C.Os and N.C.Os 1) N/Sub Motiur Rahman, 2) N/Sub Mond. 6) Hav. A. Hakim, 7) Hav. Nazimuddin under overall command of Sub. maj (D.A.D. Rtd) A. Rab of Dinajpur sector. Sub-major (D.A.D. Rtd) Kazimuddin was commanding the rest of the 9 wing E.P.R. force in Thakurgaon area.

With the fall of 10 Miles and Bhatgaon bridge area on 10 April '71, 9 wing contingent withdrew to Thakurgaon area. For some times they resisted the Pak army advance from Khansama and Debiganj area. After the fall of 10 Miles defence Bhatgaon and Thakurgaon tactical contact between Dinajpur and Thakurgaon force was cut off.

Fall of Dinajpur Town: on 14.4.71 there was a full in fight from both the sides I took right upto Rajbari. With me one pl of Sub Abdullah and one pl of Sub Nasir Ahmed of Khoshaldanga hat near Biral. On 14.4.71 after 7/8 hrs fight enemy entered Dinajpur town at about 15.00 hrs with tank and arty through two sides. In this fight we lost five pers of whom the name of Hav Miah Hossain could be remembered. We had posn to the right of Dinajpur-Sayedpur road, withdrew to Baragram border side. Troops who were on the left side of the road, withdrew to Biral border. At about 01-00 hrs I with some men reached Baragram area. Some villagers gave us shelter and food for the night. Opposite to Baragram was BSF camp named Amlia. With the fall of Dinajpur enemy entered the town, set fire on almost all the wayside shops and houses and killed men. All our troops moved to bordering BOPs towards various directions. Rest of our men reached by 14 th evening through various routes to Baragram BOP.

Fight in Biral area: with the fall of Dinajpur town our forces were divided into two axis i.e., one portion of the force had to retreat towards border of Baragram, Khanpur,

Mohanpur and Amlia (Indian B.O.P) side and another portion retreated towards Biral border where we had already rear head quarter under command of Capt. (now Lt. Col) Nazrul Haque and Sub Maj (now D.A.D) Osman Ghani. Biral is situated in the western side of Kanchan river. Peoples of the locality rendered all possible help to our troops. In village Tefra about 100 families of us were accommodated in Hajibari with food and other help by villagers.

Enemy launched attack with the support of artillery on Biral area on 16th /17th April, 71 at about 14-00 hrs. A tough fight continued for over 3/4 hrs. and enemy occupied Biral by the evening but sustained heavy casualty. During the fight our Hav. Nesar Ali of Ex-E.P.R. became Shaheed.

After the fall of Biral our troops retreated towards Panchpara village, extreme border of Bangladesh. Here our troops were exhausted and tired and to some extent disappointed for want of heavy and medium arms and ammunitions, transport, rations and treatment for the injured persons. Thanks to B.S.F. and Indian political leaders who boosted our morale and rendered all possible help. Thus we got ready ourselves for an attack on Pak enemy. After Biral enemy captured Kishorganj B.O.P. which was next to Biral towards Indian border, Radhikapur. Our plan was now to drive out enemy from Kishorganj and Panchpara area.

As per approved plan on 2nd May `71 at dawn our troops attacked Kishorganj B.O.P. area from three axis and there was a good battle. Students of Dinajpur also took part in the fight and both the side sustained good casualties. Enemy oped long range weapons from Biral approximately 15 miles away from border and approximately 10 miles from Kishorganj B.O.P. Most of the enemy bombs fell on the refugee camps established by the Indian Govt. at the Radhikapur. One died on the spot and several got injured in the camp. This was willfully done by the enemy. So the Indian authority put pressure on Mukti Bahini to stop their fight against pak army. After tough fight Kishorganj was recaptured by our E.P.R. forces, Ansars, mujaheeds and students in the evening of the same day and enemy retreated towards Biral.

On 3rd May `71 Major Bedi of B.S.F. came to Radhikapur and advised Sub Maj Osman Ghani not to launch any frontal attack on Pak army which may cause heavy disadvantage in the training of Mukti force. To train future M.P this was most necessary. After this tactical action of M.F. was confined to raids, ambush and guerilla activities. In these actions our sepoy Tuta Mia became Shaheed.

Next day on 4th May `71 pak officers arranged a flag meeting with Indian B.S.F and told them that Bengali E.P.R troops had killed over 50 pakistani soldiers during yesterday's fight and had requested Indian B.S.F officers to handover the Bengali E.P.R. troops to them who had taken shelter in India. B.S.F. officers flatly denied that any Bengali E.P.R troops had been staying in and Indian territory. Thereafter we continued regular raid, ambush and guerilla fight against Pak army till June 1971.

Troops under command of sub Major A. Rab who had withdrawn towards Baragram, Khanpur and Amlia border were recognised and put on protective standing patrol around the area to stop further enemy advance.

A company strength of 3rd Bengal Regt under command of Major Nizam (who was later on killed by own troops at Fulbari) and Capt. Anwar (now Col) joined with E.P.R. troops of Fulbari and Hilli area. After the fall of Hilli area they withdrew to Inedian Hilli side.

At Indian Hilli our forces closed at Kurmail technical school and Subra area where E.P.R. troops of former E.P.R. 7 wing of Noagaon and a small contingent of E.P.R 6 wing (Chapai Nawabganj) joined with the forces of E.P.R., E.P.R., Ansar, Mujaheed and students. It is to be mentioned that contingent of 3rd E.B.R. under command of a Sub. (name not remembered) and N/Sub Nasir Mia who were with me at 10 Miles area were also with me and remained active in Borsgram area.

From Kurmail and Subra area regular raids and ambushes continued around the Hilli, Mohanpur bridge, Fulbari, Panchbibi, Joypurhat (Bogra) Dhamurhat parshipara area of Noagaon sub-division along with the Noagaon E.P.R. forces, Mr. M. A. Jalil, Mr. Baitullah M.N.A., Jahangir M.N.A and Amjad Hossain of Noagaon came to this area and opened 2/3 youth camps and Sayed Hyder Ali M.N.A. and Prof. Abu Sayeed M.N.A. of Sirajganj opened two youth camps to train guerillas for future fight. With the 7 wing EPR one Lt. (discharged) Idris B.U. who was sbsequently promoted to Captain, joined the liberation war. He was a great brave fighter.

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ রাজশাহী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১। রাজশাহী জেলায় সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ	বাংলা একাডেমির দলিলপত্র	 ১৯৭১

নওগাঁ রাজশাহীর সশস্ত্র প্রতিরোধ
সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী

মার্চ মাসে (১৯৭১) আমি রাজশাহীর নওগাঁওয়ের বিড়িয়ার (তৎকালীন ইপিআর)- এর ৭নং উইংয়ের সহকারী উইং কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। ১৮ই মার্চ মেজর নাজমুল হক (বাঙ্গালী) সাহেব উইং কমান্ডার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ঐ পদে এর আগে একজন পাঞ্জাবী অফিসার বহাল ছিলেন। নাজমুল হক সাহেব সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নওগাঁওতে আসেন এবং দায়িত্ব বুঝে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাঞ্জাবী অফিসারটি দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে কিছুটাটালবাহানা শুরু করেন। কিন্তু সেই সময় সেই এলাকায় গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দরুন পাঞ্জাবী মেজর আকরাম দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হন।

মেজর আকরাম ২৩শে মার্চ ঢাকার পথে ক্যাপ্টেন নবীদ নামে সেই উইংয়ের আর একজন পাঞ্জাবী অফিসারসহ রওনা হন কিন্তু পথিমধ্যে ফেরীর লোকজন নগরবাড়ী ঘাটে তাদেরকে পার করতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তারা ফিরে আসতে বাধ্য হন। ফেরত আসার পর আমি তাদের কে নিরাপত্তার অজুহাতে আমার বাসার উপরের তলায় প্রকৃতপক্ষে নজরবন্দী করে রাখি। এবং একই অজুহাতে নিচে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করি।

২৩শে মার্চ এবং ২৫শে মার্চের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার উইং-এর কমপক্ষে ১০০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর; জেসিও এবং অফিসারদেরকে আয়ত্তে ফাঁদ রচনা করি। কেননা; আমি বুঝতে পারি যে তারা সবাই উইং হেডকোয়ার্টারে টালবাহানা করে একত্রিত হবার চেষ্টা করছে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। ২৪শে মার্চ আমি উইং-এর উপপ্রধান হিসাবে অধিকাংশ অস্ত্রগারের পাঞ্জাবী প্রহরী অধিনায়কদের সরিয়ে ফেলি এবং বেশীর ভাগ বাঙ্গালীকে নিয়োগ করি।

২৫শে মার্চ পর্যন্ত আমরা বাইরের কোন খবর পাইনি। ২৬শে মার্চ ভোর ছয়টায় সুবেদার মেজর চুপি চুপি আমার বাসার এসে বলে যে আমাকে কে যেন ঢাকা ইপিআর অয়ারলেস স্টেশন থেকে ডাকছে, এবং তার মনে হচ্ছে ঢাকায় কিছু একটা ঘটেছে।

অয়ারলেসে কথা বলার সময় একজন বাঙ্গালী ইপিআর সিগন্যালার আমাকে বলল যে ঢাকায় গত রাতে রাজারবাগ পশ্চিম পাকিস্তানীরা হামলা চালিয়েছে এবং পিলখানার ইপিআর বিদ্রোহ করেছে এবং তারা অধিকাংশ ইপিআর ক্যাম্প দখল করে নিয়েছে, আপনারা যে যেখানে আছেন আপনাদের নিজেদেরও কাজ শুরু করুন। কিন্তু আমি তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে পরিচয় দিতে অসম্মতি জানায়। যদিও এ খবরের সত্যতা প্রমাণ করার কোন উপায় ছিল না তথাপি কিছু সত্য থাকতে পারে এ কথা মনে করে নিজে বিদ্রোহ করতে মনে মনে স্থির করি।

* ১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি তাঁর মেজর থাকাকালীন সময়ে গৃহীত। এই প্রকল্পের জন্য তাঁর ২০-৯-৮৩ তারিখে লিখিত ইংরেজী প্রতিবেদনের প্রথমার্শ প্রাসঙ্গিক বোধে এই সাথে সংযোজন করা হলো। প্রতিবেদনের বাকী অংশ ১০ম খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে খবর শুনতে চাইলে কোন জবাব পাওয়া গেল না। বেশ কিছুক্ষণ পর বলা হয় ইয়াহিয়া খান ভাষণ দেবেন। কিছুক্ষণ পর ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনা গেল এবং সামরিক নির্দেশনাবলীও প্রচার করা হল।

বিদ্রোহের দাবানল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চারদিকে বিহারী-বাঙ্গালী দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল; বিশেষ করে সান্তাহারে -যেখানে ছয় হাজার বিহারী বাস করত। আমরা দাঙ্গা বন্ধ করতে ছেঁটা করছিলাম এবং এ নিয়ে মেজর নাজমুল হকসহ কিছু স্থানীয় এমসিএ এবং এসডিওর সাথে আমরা বৈঠক করি এবং যাতে লোকের মনে কোন সম্ভ্রাসের সৃষ্টি না হয় তার চেষ্টা করি। ইয়াহিয়ার ভাষণ এবং সামরিক নির্দেশনাবলী শুনে আমাদের সেদিন ক্ষোভ এবং ভীতির সঞ্চার হয়।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় যখন সন্ধ্যার সময় বেতার কেন্দ্র খুলি তখন হঠাৎ করে মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বেতারের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হল। মনে সাহস হল যে অন্ততঃপক্ষে একজন অধিনায়ক হিসাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব নিয়েছেন। সকলের মনে সাহসের সঞ্চার হল এবং আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোপুরিভাবে ঝাপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

আমি আমার অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার অফিসে স্থাপন করলাম এবং মেজর নাজমুল হকসহ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা শুরু করলাম। আমাদের পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ছিল (কে) অয়ারলেস স্টেশন সারাদিন খোলা থাকবে এবং ইপিআর- এর ১৭উইং-এর খবরাখবর মনিটর করা হয় এবং সেগুলো অপারেশনাল হেডকোয়ার্টারে জানানো; (খ) নিজের হেডকোয়ার্টার থেকে কোন কথাবার্তা না বলা ; শুধু শুনা; (গ) পুলিশের অয়ারলেসগুলোতেও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং সেগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগ করা; কেননা সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবস্থা ছিল না; (ঘ) টেলিফোন ডিপার্টমেন্টকে বলা হয় যেন বগুড়া এবং যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আসার সম্ভাবনা আছে সে সমস্ত জায়গায় অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত কয়েকটা প্রধান জায়গার সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখে এবং সেখানকার স্থানীয় ছাত্রনেতা অথবা আওয়ামী লীগ নেতা যেন আমাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত রাখে তার ব্যবস্থা করে; (ঙ) সমস্ত গাড়ী বাস ট্রাক রিকুইজিশন করা হল; (চ) ছাত্রদের মধ্য থেকে ভলান্টিয়ার নেয়া হল এবং কিছু কিছু আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে ডাকা হল যেমন জনাব বয়তুল্লাহ (বর্তমান ডেপুটি স্পীকার) এবং ছাত্রনেতা মোহাম্মদ আবদুল জলিল কে ডাকা হল; (ছ) ছাত্রদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হল এবং তাদেরকে রাইফেল দেয়া হল; (জ) অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ স্টোর থেকে সরিয়ে কিছু কিছু মাটির নিচে রাখা হল যাতে করে জঙ্গী বিমানের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; (ঝ) প্রধান হেডকোয়ার্টার-এর কিছু দূরে পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করা হল এবং খবরাখবর সরবরাহের জন্য রানার নিয়োগ করা হল; (ঞ) এবং স্থির হল যে এবং নওগাঁ কে আপাততঃ আমাদের রিয়ার হেডকোয়ার্টার করা হবে যেহেতু এটা হবে শত্রুবাহিনীর জন্য দূর্গম স্থান ; (ট) এদিকে আমি ৬নং উইং ইপিআর যেটা রাজশাহী ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অধীনে নওয়াবগঞ্জে অবস্থিত ছিল তাদেরকে অয়ারলেসে বাংলায় কিছু নির্দেশাবলী দিতে শুরু করলাম। সেই উইংয়ে কোন বাঙ্গালী অফিসার ছিল না। তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ছিল। ২৬/২৭শে মার্চের রাত্রে গোলযোগের পর তারা উইং হেডকোয়ার্টার ছেড়ে রাজশাহীতে পালিয়ে আসে। সেই সুযোগে আমি সমস্ত উইং-এর লোকজনকে নওয়াবগঞ্জে একত্রিত হতে বলি এবং বিওপি ছেড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেন সেখানে উপস্থিত হয় তার নির্দেশ দিই; (ঠ) সেখানে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সরিয়ে ফেলে নিরাপদ জায়গায় রাখার নির্দেশ দিই। দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাদের অবহিত করা হয় এবং তাদের উপর বিওপিতে হামলা হবার সম্ভাবনা আছে সেকথাও অবহিত করি।

২৭শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের প্রস্তুতি চলে এবং রাজশাহী সেক্টরের নওগাঁ এবং নওয়াবগঞ্জের সমস্ত ইপিআরকে এক জায়গায় নিজ নিজ হেডকোয়ার্টারে একত্রিত করা হয়।

২৭শে মার্চ আনুমানিক বেলা ১১ টার সময় আমাকে পুলিশের অয়ারলেসযোগে রাজশাহীর ডি-সি ডাকেন। তার সাথে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন যে; রাজশাহী পুলিশ লাইনের চতুর্দিকে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ঘেরাও করে আছে এবং পুলিশদের আত্মসমর্পন করতে আদেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কেউই আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত নয়। তিনি এবং এসপি তাদের সাথেই আছেন। যদি সম্ভব হয় কিছু ইপিআর-কে এর লোক যেন সাহায্যে এগিয়ে আসে। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী আর আধঘন্টা সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে পুলিশ লাইনের উপর আক্রমণ চালাবে এবং তার মর্টার ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে বললাম কি করে এত অল্প সময়ের মধ্যে ৬০ মাইল কাচা রাস্তা (নাওগাঁ থেকে রাজশাহী) যাওয়া সম্ভব? এ কথা শেষ হতে না হতে ডিসি অয়ারলেস ছেড়ে দিলেন এবং আমি অপারেটরের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে বলছিল; গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে-এরপর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অনেক চেষ্টার পরও কোন খবর পাওয়া গেল না। এ দিকে আমরা খবর পেলাম যে বগুড়ার আর্টিলারী রেজিমেন্ট-এর একটা ব্যাটারী আছে যেটাকে এখন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির জন্য মুভ করানো হয়েছে এবং তারা সেখানকার গার্লস স্কুলে অবস্থান করছে।

প্রতিরোধের পরিকল্পনা: আমি মেজর নজমুল হক সহ পরিকল্পনা করলাম যে ২৮শে মার্চ প্রথমতঃ এক কম্পানী ইপিআর ফোর্স নাটোরের রাস্তা দিয়ে সারদায় পাঠাব ক্যাডেট কলেজের এ্যাডজুট্যান্ট মেজর রশিদের কাছে। এবং রংপুর থেকে রাজশাহী যাবার রাস্তা বগুড়ায় বিচ্ছিন্ন করে দেব। অন্যথায় মেজর রশীদ তার ফোর্সসহ ঢাকা থেকে রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে রাজশাহী আসার রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

২৮শে মার্চ বিকেলে আমি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার লোকজন নিয়ে বগুড়ায় পৌঁছে গেলাম যার দূরত্ব আনুমানিক ৩০ মাইল। কিন্তু রাস্তায় ব্যারিকেড থাকতে আমাকে সকাল দশটায় রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় পৌঁছতে হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখি শহরের লোকজন নেই বললেই চলে। সব মিলে হাজার খানেক লোক হবে কি না সন্দেহ। পরিবার বলতে কারুরই ছিল না। একটা থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছিল এবং গাড়ীর আওয়াজ শুনে এবং লাইট দেখে সবাই পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেও এখানে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে স্থানীয় লোকের সামান্য গোলাগুলি হয়েছিল; সন্ধ্যা হতে না হতেই শহর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল এবং শহরের রাস্তাগুলো ছিল ব্যারিকেডপূর্ণ।

বগুড়ায় সংঘর্ষ: আমি প্রথমে পুলিশ লাইনে গেলাম। সেখানে একজন বেশ সাহসী রিজার্ভ পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং শ” দুয়েক পুলিশ দেখতে পেলাম। আমাদেরকে দেখতে পেয়ে তারা অনেকটা সাহস পেলে এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদেরকে জ্ঞাত করল। আমি জানতে পারলাম যে তারা (আর্টিলারী ব্যাটারী) আপাততঃ রংপুর থেকে কোন ফ্রেশ সাপ্লাই পাচ্ছে না যেহেতু রাস্তাঘাট বন্ধ। তবে তারা প্রায়ই গ্রামের পথে গাড়ী নিয়ে যায় এবং তরিতরকারী এবং মাংস সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। আমার জানা ছিল যে আর্টিলারী ব্যাটারীতে ৫০/৬০ জনের বেশী লোক হতে পারে না এবং তাদের ততোটা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবার নিপুণতা নেই। সেই হেতু প্রথমতঃ পরিকল্পনা করলাম যে গ্রামে যাবার পথে অথরা পেট্রলিং-এর সময় তাদেরকে এ্যামবুশ করা সহজসাধ্য হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৯/৩০শে মার্চ রাতে একট্যাঁয়ামবুশ পার্টি পাঠালাম। এতে ছিল নওগাঁ থেকে আসা কয়েকজন ছাত্র ও ইপিআর ও পুলিশের লোকজন। তিনখানা ৩ টনী গাড়ীসহ সেনাবাহিনীর কয়েকজন কমপক্ষে এক প্লাটুন পেট্রলিংয়ে বের হয় এবং রাস্তার মধ্যে আমাদের লোকজন তাদের কে এ্যামবুশ করে। তিনটা গাড়ী বিধ্বস্ত হয়। তিনটা অয়ারলেস সেট দখল করা হয় এবং ২৩জন নিহত হয়। বাকি লোক ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এই এ্যামবুশে আমাদের সৈনিকদের মনোবল অনেক বৃদ্ধি পায়।

বগুড়াতে তখন একটা এ্যামুনিশন ডাম্প ছিল; যেটা একজন ক্যাপ্টেন কমান্ড করছিল। ওখানে মাত্র ২০/২৫ জন সৈনিক প্রহরা দিচ্ছিল। আমি সবাই কে একত্রিত করে কিভাবে এ্যামুনিশন ডাম্প দখল করতে হবে; বিশেষ

করে এর চরিদিকে ঘেরাও করে তাদেরকে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করতে হবে তার ব্যবস্থা করি। ঘেরাও করার জন্য গ্রাম থেকে কিছু লোক যোগাড় করা হল। এবং এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ঘেরাও করে গলোবারুদ বের করে নেয়ার জন্য নির্দেশনাবলী দিয়ে আমি আমার সুবেদার সাহেব কে রেখে নওগাঁ চলে আসি; যেহেতু আমার সেখানে যাবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এ্যামুনেশন ড্যাম্প ঘেরাও করা হয়েছিল এবং ক্যাপ্টেনতার লোকজন সহ আত্মসমর্পণ করে। অধিকাংশ গোলাবারুদ মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে নিয়ে যায় এবং বাকিগুলো পানিতে ফেলে দেয়া হয়।

বগুরা থাকাকালীন সময়ে অয়ারলেসে মেজর শফিউল্লাহর সাথে আমার কথা হয়। তিনি বললেন যে; কিশোগঞ্জের কাছে দ্বিতীয় ইস্ট বেংগল নিয়ে যমুনা নদীর কাছে তিনি আছেন ; আমরা যেন ওখানে গিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করি। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন; উওরাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার। সেখান থেকে একজন লোক পাঠিয়েছিলাম তাঁর কাছে। কিন্তু খবর পাওয়া গেল তিনি সিলেটের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

নওগাঁতে মেজর নজমুল হকসহ আবার পরিকল্পনা শুরু করলাম। এদিকে খবর পাওয়া গেল যে; ইপিআর কোম্পানী রাজশাহীর পথে মর্টার এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাঠানো হয়েছে। সেটা রাজশাহীর নিকটবর্তী আড়ানী নামক রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ২৫ পাঞ্জাবের এক কোম্পানীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে-২৯/৩০ মার্চ রাতে তাদের সাথে কয়েকহাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং গ্রামের লোক গোণ দিয়েছে। এই পাকিস্তানী কোম্পানীটি পাবনা থেকে পশ্চাদপসরণ করে তাদের নিজের ব্যাটালিয়ন-এর দিকে পদব্রজে রাজশাহী আসছিল। কোম্পানিটি সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও হয়ে যায় এবং ইপিআর কোম্পানী তাদের উপর ৩ ইঞ্চি মর্টার এর গোলা বর্ষন করতে শুরু করে। শত্রুবাহিনী দিশেহারা হয়ে গোলাগুলি শুরু করে এবং অনেকক্ষণ গোলাগুলি বিনিময় হয়। শেষ রাতের দিকে শত্রুবাহিনীর গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায় এবং প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক পালাতে শুরু করে। কিন্তু গ্রামের লোক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রায় সবাই ধরা পড়ে এবং তারা গ্রাম বাসিনদের হাতে নিহত হয়। মেজর আসলাম এবং ক্যাপ্টেন রেজা (উপ অধিনায়ক) মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দী হয় এবং আড়ানী স্টেশনের কাছে নিহত হয়।

শত্রুবাহিনীর মনোবল খুবই ভেঙ্গে পড়ে এবং সেই সুযোগে আমি এক কোম্পানী ইপিআর নিয়ে নওগাঁ থেকে ৩১শে মার্চ রাজশাহীর পথে রওয়ানা হই। নওয়াবগঞ্জের উইংকে নির্দেশ দিই তারা যেন নওয়াবগঞ্জ থেকে পদব্রজে অগ্রসর হয় এবং শত্রু মোকাবেলা করতে যেন প্রস্তুত থাকে। অনেক ব্যারিকেড অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত রাজশাহীর অদূরে নওহাটা (মত্ৰাটি হতে মাত্র দুই মাইল দূরে) আমি আমার লোকজন নিয়ে অবস্থান নেই এবং অন্যদিকে অগ্রসরমান নওয়াবগঞ্জের ইপিআর উইং (যেখানে ৫০০সশস্ত্র লোক ছিল)-এর সাথে যোগাযোগ করি।

সেই রাতে আমি কিছু লোক নওহাটায় রেখে রাজশাহী থেকে ছয় মাইল দূরে খরচক্কা (রাজশাহী-নওয়াবগঞ্জ রাস্তার উপর) নামক স্থানে ইপিআর-এ অগ্রসরমান লোকদের সাথে দেখা করি এবং সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে আমার অধীনে নিয়োজিত করি। সেই রাতে ২৫পাঞ্জাবের একটি পেট্রল বাহিনী তিনখানা গাড়ী নিয়ে সেই রাস্তায় আসে এবং আমাদের বাহিনী অতর্কিতে তাদেরকে এ্যামবুশ করে। আমরা ওদের ৭ জনকে নিহত এবং একজনকে জীবিত ধরতে সক্ষম হই। সেই বন্দীর কাছ থেকে জানা যায় যে ক্যাপ্টেন সালমান নামক এক অফিসার তাদের পেট্রল পার্টির নেতৃত্ব দিচ্ছিল এবং একটা প্লাটুন পেট্রলিংএ এসেছিল। ওদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং আহত-নিহতদের অধিকাংশকে নিয়ে চলে যায়। এতে আমাদের লোকজনের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। এবং আমার লোকজন ত্বরিত বেগে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হয়।

১লা এপ্রিল ভোর ছটার মধ্যে আমরা রাজশাহী শহরের অদূরে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করি। আমাদের পেট্রল বাহিনী নিয়োগ করি খবরাখবর আনার জন্য। আমার পূর্বদিকে মেজর রশীদেবের নেতৃত্বে যে সমস্ত লোকজন পাঠানো হয়েছিল তাদের সাথেও যোগাযোগ করি এবং তাদেরকে বলা হয় যেন তারা সারদা থেকে অগ্রসর হয়ে রাজশাহীর পূর্বদিকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে।

এদিকে আমার সশস্ত্রবাহিনীর সংখ্যা পুলিশ; আনসার মুজাহিদ; ছাত্র; ইপিআর মিলে একহাজারের ওপরে পৌঁছে যায়। শত্রুবাহিনী রাজশাহীর চারিদিকে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ আরো শক্তিশালী করে এবং তাদের স্বয়ংক্রিয় ভারী অস্ত্র প্রধান পথে মোতায়েন করে। শত্রুবাহিনী আমাদের শক্তি এবং সংখ্যা নির্ণয় করতে সক্ষম হয় এবং তাদের জংগী বিমান ঢাকা থেকে সাহায্যের জন্য আসে। ১লা এপ্রিল থেকে ৫ই এপ্রিল প্রত্যহ দু'একবার করে বিমান হামলা চলে; কিন্তু রাজশাহীর চতুর্দিকে আত্মকুঞ্জ থাকায় এবং তার নীচে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি হওয়ায় শত্রুবাহিনীর বিমান গুলো আমাদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারেনি এবং আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তবে বেসামরিক অনেক লোকজন মারা যায় এবং ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।

৩রা এপ্রিল ভারত থেকে বিএসএফ-এর একজন লেঃ কর্নেল সেন এবং মেজর ত্রিবেদী নামে দুজন অফিসার আমার সাথে দেখা করতে আসেন এবং আমার কি সাহায্যের প্রয়োজন জিজ্ঞেস করেন। আমি তাদেরকে কিছু আর্টিলারী ফায়ার-এর সাপোর্ট দিতে বলি তাদের সীমানা থেকে। সীমান্ত নিকটে থাকায় এটা সম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি জানালেন যে; এটা তারা দ্বারা সম্ভব নয়; তবে তিনি কর্তৃপক্ষকে বলবেন তবে যদি কোন রাইফেল এলএমজি চান দিতে পারি। কিন্তু ইমি তাকে বললাম যে; এখন আমার কাছে ১২টা ৩ ইঞ্চি মর্টার; একশোর উপর এলএমজি-এমজি এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ আছে। তাই আমার এগুলো দরকার নেই। বিমান হামলা মোকাবেলা করার জন্য ভারতীয় সীমান্ত থেকে কিছু বিমান বিববংসী কামান দিয়ে সাহায্য করতে অনুবোধ করলাম। আমি তাকে আরো বললাম যে ৬ই এপ্রিল আমি রাজশাহী আক্রমণ করব বলে স্থির করেছি; সে দিন যেন আমাকে আর্টিলারী ফায়ার সাপোর্ট দেয়া হয়।

রাজশাহী যুদ্ধঃ আমার পরিকল্পনা ছিল শহরের দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ চালানো এক ব্যাটালিয়ন নিয়ে। আর কিছু লোক উত্তর পশ্চিম দিকে শত্রুক ধোঁকা দেয়ার জন্য কিছু গোলাগুলি করবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে ব্যাটালিয়নকে দক্ষিণ দিকে মুভ করিয়ে আনি এবং আক্রমণের প্রস্তুতি নিই; ইদিকে জানতে পারলাম বন্ধুরাষ্ট থেকে সাহায্য পাবার কোন সম্ভাবনা নেই এবং তা কখনো আসেনি।

আক্রমণ শুরু হয় ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা-৭টার দিকে। শত্রুবাহিনী আমাদের উপর প্রবল গোলাবর্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে গুলি বর্ষন করতে শুরু করে। অদম্য সাহস মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সম্মুখে ঠেলে নিয়ে যায় এবং শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে তারা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। প্রায় চার ঘন্টা লড়াইয়ের পর রাজশাহী শত্রুমুক্ত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহীর চতুর্দিকে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করে ফেলে। পশ্চিম সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ৩০/৩৫ জন হতাহত হয়। রাজশাহী পুলিশ লাইন প্রভৃতি জায়গা থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করি। রাজশাহী পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার থেকে প্রায় তিন হাজার অস্ত্র তিন লাখ গুলি উদ্ধার করা হয়। বাকি শত্রুবাহিনী তাদের ছাউনি পশ্চাদপসরণ করে এবং সেখানে একত্রিত হয়ে আরো শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। ছাউনির চারিদিকে মাইন পুতি রাখে এবং কাঁটা তারের বেড়া দিতে শুরু করে। শহরের লোকের মনে উল্লাসের সৃষ্টি হয়। এবং আমাদের পূর্ববর্তী কর্মসূচী ঐ ছাউনি দখল করার কাজে নিযুক্ত হয়। এদিকে শত্রুবাহিনী বিমান হামলা আমাদের উপর অব্যাহত থাকে।

৭ই এপ্রিল থেকে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত আমরা শত্রুবাহিনীর ছাউনির অতি নিকটে চতুর্দিকে থেকে ঘিরে ফেলি এবং ছাউনির ৩০০/৪০০ গজের মধ্যে পৌঁছে যাই। কিন্তু শত্রুবাহিনীর মাইন এবং কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে গিয়ে আক্রমণ চালানো বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। শত্রুবাহিনী সমস্ত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র; ট্যাঙ্কবিধবংসী

কামান; তিন ইঞ্চি মর্টার ইত্যাদি বাইরের দিকে মুখ করে বসিয়ে রাখে। সেই সময় আমরা জানতে পারি সেখানে শত্রুবাহিনী ২৫০থেকে ৩০০সৈন্য আছে। বাকি নিহত; আহত অথরা নিখোঁজ। আরো জানতে পারি যে তাদের ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শফকত; বেলুচ; সিতারা-ই-জুরাত যিনি ৭ই এপ্রিল আমাদের সাথে যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন; এবং তাকে হেলিকপ্টারে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে শত্রুবাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেংগে যায়। শত্রুবাহিনী সে এলাকায় সমস্ত বিহারীকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিরক্ষা ব্যুহ তৈরি করে তাদেরকে সাহায্য করতে নির্দেশ দেয়।

এদিকে আমরা ছাউনি দখল করার শেষ প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করি। তখন খবর পাওয়া গেল যে; পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই ডিভিশন সৈন্য নগরবাড়ী ঘাটে অবতরণ করার চেষ্টা করছে হেলিকপ্টার; স্ত্রীমার ফেরীর মাধ্যমে। অতর্কিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট-এর কথা শুনে সকলের মনোবল ভাঙতে শুরু করে। কিন্তু সকলকে আশ্বাস দিয়ে আমি বলি যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তারা যেন তাদের কাজ চালিয়ে যায়।

আমি দুটো কোম্পানী সেখান থেকে উঠিয়ে নগরবাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিই। ১১ই এপ্রিল বিকেল বেলায় আমাদের বাহিনী যখন পাবনার অনতিদূরে পৌঁছে তখন পাবনা শহরের উপর শত্রুবাহিনীর মর্টার এবং আর্টিলারী ফায়ার হচ্ছিল। তখন ঐ দুই কোম্পানী মুলাহলী নামক স্থানে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যুহ তৈরি করে কিন্তু তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তারা শত্রুবাহিনীর জংগী বিমানের হামলা এবং আর্টিলারীর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ও অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্যদের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর টিকতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করে।

এদিকে আমি ১২ই এপ্রিল সকাল বেলায় আমার সেনাবাহিনীর মনোবল অটুট রাখার জন্য নিজে এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে পাবনার পথে অগ্রসর হই এবং বাকি সংগ্রামী সৈনিকদেরকে ছাউনির উপর তাদের চাপ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিই। ১০মাইল পথ অতিক্রম করার পর আমি খবর পেলাম যে শত্রুবাহিনী অতি নিকটে পৌঁছে গেছে এবং আসার পথে প্রধান রাস্তার দু পাশে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং আমি নিজেও তার ধোয়া দেখতে পেলাম। এমতাবস্থায় আমি সারদা এবং রাজশাহী যাওয়ার মোড়ে আমার শেষ প্রতিরক্ষা ব্যুহ তৈরি করি।

১২ই এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে আমাদের প্রতিরক্ষার এক হাজার গজ দূরে রাস্তা কেটে দেয়া হল এবং বড় গাছ কেটে ব্যারিকেডের মধ্যে বুবিট্র্যাপস ও কিছু মাইন দু পাশে পুতে রাখলাম। ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যা নাগাদ পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেখানে পৌঁছাল এবং ব্যারিকেড সরাতে চেষ্টা করল। বুবিট্র্যাপ ফেটে বেশ কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়। আমাদের ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে অগ্রসরমান শত্রুবাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ করা হল। সারা রাত দু'পক্ষের তুমুল লড়াই চলে এবং সারদার কাছে সারদা ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপক এ;বি;সিদ্দিকী যাকে আমি 'বীর বিক্রম (মৃত্যুর পর) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপর ১৩ই এপ্রিল ভোরের দিকে পাক সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং অবস্থান করতে থাকে। আমার সৈন্যরা তখনও মনোবল অটুট এবং শহরের চারিদিকে প্রতিরক্ষা ব্যুহ অব্যাহত রাখে। ছাউনি দখল করার জন্য তখনও তাদের চাপ অব্যাহত রাখে।

১৩/১৪ই এপ্রিল রাত দুটোর দিকে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ শুরু হয় এবং শত্রুর গোলন্দাজ বাহিনী বিপুলভাবে গোবর্ষণ শুরু করে। যতই ভোর হতে থাকে আমার লোকদের সাথে আমার অয়ারলেস এবং টেলিফোন

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক ব্রিগেড সৈন্য আমার সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমার সৈন্যদের অপসারিত করা হয় এবং তারা নওয়াবগঞ্জের দিকে সরে আসে।

নওয়াবগঞ্জের প্রতিরোধঃ বেলা প্রায় দুই ঘটিকায় সময় আমি আমার এক হাজার সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র ৩ শত জনকে খুঁজে পাই এবং তাদের নিয়ে রাজশাহী এবং নওয়াবগঞ্জের মাঝখানে গোদাগাড়ী নামক স্থানে আমার প্রতিরক্ষা ব্যুহ পুনরায় তৈরি করি। এটা রাজশাহী থেকে ১৮ মাইল এবং নওয়াবগঞ্জ থেকে ১২মাইল দূরে ছিল। রাজশাহীর যুদ্ধে আমার ৩৫/৪০ জন নিহত হয়। এতে আমার সৈন্যদের মনোবল একেবারে ভেংগে পড়ে।

আমার সাথে নুরুল ইসলাম নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ১৫ই এপ্রিল সে ভারতে চলে যায় এবং ১৬ তারিখ সে আমাকে এসে খবর দেয় যে মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা প্রশাসক এবং বিএসএফ-এর কমান্ডার আমার সাথে জরুরী কাজে দেখা করতে চান এবং তিনি আমাকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নুরুল ইসলাম নামের সেই ছাত্রটির সাথে ১৬ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদে ওদের সাথে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু এতে কোন ফলই হল না। কোন সাহায্যই পাওয়া গেল না। নিরাশ হয়ে ফিরে আসলাম।

১৭ই এপ্রিল সকালের দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের অবস্থানের উপর এবং নওয়াবগঞ্জ শহরের উপর হামলা চালাল। জংগী বিমানের সাহায্যে রকেট এবং মেশিনগানের প্রচণ্ড হামলা চালায়; কিন্তু আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যুহ ভেংগে নওয়াবগঞ্জ পৌছতে তখনও সক্ষম হয়নি।

২১শে এপ্রিল খুব ভোরের দিকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হল আমাদের অবস্থানের উপর এবং শত্রুসাহিনী আক্রমণ চালাল। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যুহ শত্রুসাহিনী ভেদ করতে সক্ষম হল বেলা দশটার দিকে। প্রতিরক্ষা ব্যুহের নিকটেই ছিল পদ্মা নদী। সেখানে আমার সাবেক ইপিআর- এর দু খানা স্পীড বোট ছিল; যাতে করে আমি লড়াই চলাকালে ভোরের দিকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র; গোলাবারুদ নদী পার করে বাংলাদেশের ভেতরেই চর এলাকায় পৌঁছে দিয়েছিলাম। শত্রুসাহিনী ত্বরিত গতিতে নওয়াবগঞ্জসহ প্রায় সমস্ত এলাকাই; নওয়াবগঞ্জের চর এলাকা ছাড়া শত্রুকবলিত হয়। সেখানেই আমার সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি।

ক্ষোভে; দুঃখে এবং হতাশায় আমি যখন নিমজ্জিত তখন বিএসএফ-এর কয়েকজন লোক আমাকে খবর দিল যে; আমাকে মেজর দারাস বলে একজন অফিসার আমার সাথে দেখা করতে চান। অগত্যা তার সাথে দেখা করতে গেলাম। সে আমাকে বললো; আমি যেন আমার সমস্ত জিনিস এবং অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদসহ লালগোলায় (মুর্শিদাবাদ) পৌঁছে যাই। ২২শে এপ্রিল আমি আমার তিন হাজারে উপর রাইফেল; স্টেনগান; এল-এম-জি এবং গোলাবারুদ নিয়ে লালগোলায় পৌঁছলাম। পৌঁছতে না পৌঁছতে বিএসএফ- এর দু'খানা ট্রাক এসে আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে মুর্শিদাবাদ চলে গেল। তবে সামান্য কিছু রাইফেল আমাদের কাছে রেখে গেল।

এদিকে আমাকে খবর দেয়া হল যে কর্ণেল ওসমানী আমাদের সাথে বালুর ঘাটে (দিনাজপুর) ২৩ শে এপ্রিল দেখা করতে চান। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সেখানে পৌঁছলাম এবং এই প্রথম এম-সি এর সাথে দেখা হয়। কর্ণেল ওসমানী সেদিন আমাকে সে এলাকার অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং বলেন যে বিএসএফ আমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ খাদ্য প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করবে।

RE-ORGANISATION OF TROOPS AT RAJSHAHI

(FROM the diary of brig. Gyas uddin chowdhury; BB Psc(Rtd) then Maj. Gyas;the Comd. of rajshahi sub-Sector-20-1983)

After the force battle on 13 and 14 April with pak army at rajshahi town I pulled back my troops towards Nawabganj and took up a strong defence at Gdagari area. at that time I had with me 6 Win (Battalion) of EPR intact and some elements of 7 Wing (Battalion) who came with me from Nawgaon and those who followed me from Charchat company of the wing. In addition approximately 200 volunteer freedom fighters stayed with the troops rest of whom left after losing the initial battle at rajshahi. The pak force which recaptured Rajshahi from us after consolidating the position for Nawabganj on 17 april. On the way they met with pockets of resistance and went back to Rajshahi On night of 20/21 april; Pak army made a desperate attempt and contacted own troops at night on forward position around Godagari. In the very early hour they launched an attack which was a dawn attack. I was expecting such an action from them. On 20 April I ferried across river padma opposite Godagari with 300(three thousands)303 rifles; 96 Bretta guns and 3 lacs of ammunition which I collected from rajshahi armoury between 07 April and 13 April when rajshahi town was under my captivity. I also sent across 48 LMGs; 4 vicar machine guns; 6 3" mortars; which were surplus in 6 wing Hqs as they were switching over from 3" two 81mm mortars and new machine guns (latest American version) and 1400 rounds of mortar shells. In addition I had many other types of explosives and armaments which I collected mainly from EPR sector after it fell during the battle with occupation forces of 6 wing Hqs located at located at Nawabganj which remained Liberated till 21 April and acted as our firm base.

The troops who were in defence at that time had 60 LMGs; 6x81mm mortars; 10x2" mors; 6xLirat (an old model of British rocket launcher) and personal weapons; ammunitions and grenades with each fighting members. Pak army always used unconventional and most brutal technique of assault by opening their fire of automatic weapons to all the built up areas and huts of the village; and firing with flame thrower so that the whole built up area is demolished and burnt to ashes thus not providing any shelter to freedom fighters and RR shells for softening the position prior to launching an attack. In 3 weeks time our freedom fighters already got enough battle inoculation and gave a tough fight to the assaulting troops of pak army at Godagari. I started pulling back my troops in phases in a planned way across river Padma with the help of number of speed boats of EPR; available for patrolling by evening of the day on 21 april we withdrew along with all weapons and equipments on the other side of Padma just opposite to Godagari Police station. We just had 7 minor casualty. But the casualty of local people was quite heavy. I saw 24/25 injured persons being ferried across and 2/3 dead bodies lying around the market area. We also carried sufficient amount of rice and pulse from the LSD godown located at Godagari. During enemy attack from 17 April to 21 April the occupation army used in average 3 air sorties every day of F-86 (sabre) jet in our defence. They used mostly MGs and rockets against our troops; beside hitting the civilian population and killing the innocent persons.

সারদা ও অন্যান্য স্থানের সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার আলী মোহাম্মদ মকিবর রহমান সরকার

০৬-০৬-১৯৭৩

২৫শে মার্চের ঘটনায় আমরা বিস্মিত হয়ে পড়ি এবং পশ্চিমা শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অস্ত্র জবাব অস্ত্র দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হই।

সারদায় অস্ত্র সংগ্রহঃ সারদা পুলিশ একাডেমির ভাইস প্রিন্সিপাল মিঃ বরুয়াকে সভাপতি এবং আওয়ামী লীগের আজিজুর রহমান কে সম্পাদক করে এবং আমি স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসাবে থেকে একটি মুক্তি সংগ্রাম কমিটি গঠন করি। সেই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে পুলিশের কিছু অংশ ; ইপিআর; আনসার; মুজাহিদ; ছাত্র; অধ্যাপক সব মিলে বিরাট এক মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। সারদা ক্যাডেট কলেজ থেকে ৩০৩ মার্ক রাইফেল এবং পুলিশ একাডেমি থেকে ৬০০/৭০০ রাইফেল ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করি এবং সারদা ও রাজশাহী রোডে বাস্কার করে পজিশন নিয়ে থাকি।

রাজশাহীতে ইতিমধ্যে পাক সেনারা অবস্থান করছিল। আমরা একটি কোম্পানি নিয়ে রাজশাহী অভিমুখে যাত্রা করি। কিছু দূর যাওয়ার পর আমরা গুনতে পাই যে; নাটোর হয়ে আর একটি ব্যাটালিয়ন ঢাকা-পাবনা-নগরবাড়ী পথে রাজশাহীর দিকে আসছে। ক্যাপ্টেন রশিদের নেতৃত্বে ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে তাদের প্রতিরোধের জন্য পাঠান হয়।

আমরা প্রথম পাবনার মুলডুলিতে পাকসেনাদের সম্মুখীন হই। সংঘর্ষে পাকসেনাদের বিপুল ভারী অস্ত্রের সামনে টিকতে না পেরে পিছু হটি। রাজশাহীতে অপর দল যেটি ছিল তাদের সঙ্গে পাক সেনাদের নিয়মিত যুদ্ধ হচ্ছিল। সংঘর্ষে সমস্ত পাকসেনা খতম হয়।

১২ এপ্রিল রাজশাহী সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়। অপর দলটি যেটি মূলাডুলিতে পিছু হটছিল নাটোরে গিয়ে পুনরায় পজিশন নেয়। সেখানেও ব্যাপক শেলিং-এর সামনে টিকতে না পেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে আমরা পিছু হটি। সেখান থেকে আমরা বানেশ্বরে (রাজশাহী) ডিফেন্স নিই। পাক আর্মির একটি ব্যাটালিয়ন ৭৫ মিলিমিটার কামান এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করে।

ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলাম আড়ানীতে ২০/২৫ জন পাক সেনা গ্রামে ঢুকে নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে এবং ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে। খবর পেয়ে আমি একটি ছোট সেকশন নিয়ে গ্রাম অভিমুখে রওয়ানা হই। গ্রামে গিয়ে শুনলাম নদীর অপর পাড়ে পাক সেনারা পজিশন নিয়ে আছে। আমরা ফায়ারিং শুরু করি। বহুক্ষন ফায়ারিং-এর পর অপর পক্ষ থেকে কোন জবাব না আসায় আমি বিস্মিত হই। পরে সেখানে গিয়ে দেখলাম তারা ক্যামোফ্লেজ করে পালিয়েছে। পাকসেনারা কলাগাছ কেটে তাতে খাকী কাপড় পরিয়ে এবং কাঠের তৈয়ারী রাইফেল হাতে দিয়ে নদীর পাড়ে আমাদের দিকে মুক করে রেখে দিয়েছে। আমরা ভাবছিলাম পাকসেনারা তাদের অস্ত্র নিয়ে পজিশন নিয়ে আছে।

আড়ানী ব্রিজে প্রতিরোধঃ আমরা হতাশ হয়ে আমাদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে আড়ানী ব্রিজের নিচে এ্যামবুশ করে থাকি। রাত্রি ৪টার দিকে বুঝতে পারলাম ব্রিজের উপর দিয়ে কিছুলোক যাচ্ছে। হল্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফায়ারিং শুরু করে। আমরা পাল্টা জবাব দিই। কিছুক্ষন উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয়। ৫/৭ মিনিট পর ব্রিজের উপরে পাকসেনারা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। আমরা সেখানে ৪টি পাক সেনার লাশ উদ্ধার করি। বাকি দই চারজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

বানেশ্বরের যুদ্ধ ও সারদায় গণহত্যাঃ আমরা সবাই রওনা হয়ে ১৩ই এপ্রিল তারিখে বানেশ্বরের অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেই। বানেশ্বরে পাকসেনাদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আমাদের মুক্তি সেনারা

ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অনেক মুক্তিসেনা শাহাদৎ বরন করেন। বানেশ্বর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সারদার পতন হয়। সারদায় পাক আর্মি চলে আসায় বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর প্রায় ১৫০০/২০০০ লোক নদীর ধারে আশ্রয় নিয়েছিল। পাকসেনারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং ৭০০/৮০০লোককে নৃশংসভাবে গুলি করে পেট্রল দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। ওই দলের মধ্যে থেকে আমরা মাত্র তিন-চারজন বেঁচে ছিলাম। পাক সেনাবাহিনী সন্ধ্যার দিকে রওনা হয় এবং রাজশাহী দখল করে নেয়।

সশস্ত্র প্রতিরোধ-রাজশাহী-বগুড়া-পাবনা
সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার খন্দকার মতিউর রহমান বীর বিক্রম
২৪-১২-১৯৭৩

২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় উইং কমান্ডার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির জন্য তিনটি প্লাটুন তৈরি করে রাখার নির্দেশ দেন। রাত আট ঘটিকার সময় উইং হাবিলদার মেজর সৈয়দুর রহমান (পাঠান) কে পুরো উইংকে ফল ইন করার নির্দেশ দেয়া হয়। তখন তিনটি প্লাটুন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকে।

২৬শে মার্চ সকাল বেলায় কোয়ার্টার গার্ড কমান্ডার মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে পতাকা কোয়ার্টার গার্ডে গার্ড অব অনার দিয়ে উত্তোলন করে। ২৬শে মার্চ সকাল ৭ঘটিকার সময় মেজর নজমুল হক; ক্যাপ্টেন গিয়াস; মেজর আকরাম ও ক্যাপ্টেন নাবিদ আফজাল উইং-এ আসেন এবং সুবেদার মেজর আবদুল লতিফ মোল্লাকে পুরো উইংফল-ইন করার নির্দেশ দেন। ফল ইন করা হয়। মেজর নজমুল হক বললেন যে, যা করার আমি সব করব।

২৬শে মার্চ সকাল ৮/৯টার সময় ১০০থেকে ১৫০জন লোক মাইক নিয়ে আমাদের অফিসের সম্মুখে এসে ৭ই মার্চে শেখ সাহেবের টেপ রেকর্ডকৃত ভাষণ বাজাতে শুরু করে এবং শ্লোগান দিতে থাকে। মেজর নজমুল হক অফিসের সম্মুখে হেঁচৈ গণ্ডগোল না করার জন্য জনতাকে নির্দেশ দেন। আনুমানিক ১০/১১টার সময় কোয়ার্টার গার্ডের সেন্ট্রির উপর হঠাৎ একটি গুলি আসে। এটা শোনার পর চতুর্দিক থেকে ফাঁকা আওয়াজ শুরু হয়। ১০ মিনিট গোলাগুলি চলে। উল্লেখ্য যে ২৫শে মার্চ রাতে আমরা তিনটা বাংলালী প্লাটুনকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে রাখি (ক্যাপ্টেন গিয়াসের গোপন নির্দেশে) মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে আশংকায়। ক্যাপ্টেন গিয়াস আমাকে এবং সুবেদার মনোয়ার আলীকে অফিসে ডেকে গোপনে বলেন যে; বাঁচার জন্য আপনারা তৈরি থাকুন ঢাকার অবস্থা খুবই খারাপ। এই কথা বলে তিনি ভেংগে পরছিলেন। গোলাগুলির পর মেজর আকরাম বেগ মেজর নজমুল হককে অনুরোধ করেন যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরকে যেন তিনি একটা ব্যারাকে হেফাজতে রাখেন। তখন সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরকে একটি ব্যারাকে প্রহরী মোতায়েন করে রাখা হয়। তাদেরকে ব্যারাক থেকে বের হয়ে না আসতে নির্দেশ দেয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরদের পরিবারবর্গকে জেসিও মেসে রাখা হয় এবং বাংলালী ইপিআর তাদের পাহারা দেয়। মেজর নজমুল হকের নির্দেশে তাদের অস্ত্রশস্ত্র অফিসে জমা করানো হয়। অফিসের চতুর্পার্শ্বে বাংলালী ইপিআর প্রহরী লাগানো হয়। বেলা বারটা-১টার সময় বিপুল জনতা অফিসের সামনে হাজির হয়। তারা ক্যাপ্টেন গিয়াসকে বলে যে; শান্তাহারে বিহারী অস্ত্র নিয়ে বোয়ালিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আপনারা এগিয়ে আসুন।

২৭শে মার্চে মেজর নজমুল হকের নির্দেশে তিনটি প্লাটুন তিনটি অয়ারলেস সেট সহ শান্তাহার অভিমুখে আমার নেতৃত্বে রওনা হয়। শান্তাহারে দেখি চারিদিকে শুধু ধোয়া আর আগুন; গোলাগুলির আওয়াজ। আমি অয়ারলেসে নওগাঁতে মেজর নজমুল হকের সাথে যোগাযোগ করি; বাংলালী ও বিহারী বহু মৃতদেহ উদ্ধার করি এবং পরিস্থিতি আমাদের আয়ত্তে নিয়ে আসি। মেজর নজমুল হক ১৪৪ ধারা জারী করেন। সীমান্তের বিওপিগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

৩০শে মার্চ ক্যাপ্টেন গিয়াস; হাবিলদার আলী আকবর (বর্তমানে নায়ক সুবেদার); এবং আমি বগুড়া অভিযুক্ত রওনা হই। বগুড়ার রেলওয়ের স্টেশন মাস্টারকে নগাঁওতে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে অনুরোধ করি। এরপর আমরা বগুড়া পুলিশ লাইনে যাই। হাবিলদার আলী আকবরকে পুলিশ লাইনে রাখা হয় ও তার সাথে ২৫ জন ইপিআর দেওয়া হয়। হাবিলদার আলী আকবরকে পুরোপুরি কমাণ্ড দেয়া হয়। আমি ক্যাপ্টেন গিয়াসসহ নগাঁওতে ফিরে আসি।

৩০শে মার্চ আমি এক প্লাটুনসহ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বগুড়া রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাই। হাবিলদার আলী আকবর ২৫জন ইপিআর; কিছু পুলিশ; ছাত্রসহ মুজিবর রহমান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর আক্রমণ চালায়। মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ওদের ক্যাম্প ছিল। এক রেজিমেন্ট ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে ওরা সজ্জিত ছিল। রাত চার ঘটিকার সময় পশ্চিম পাকিস্তানীদের সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী অয়ারলেস স্টেশনে ও এতিমখানার পার্শে পেন্ট্রেল ডাম্পে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে তারা ৩০/৩২ টা গাড়ী নিয়ে রংপুরের দিকে পালিয়ে যায়।

১লা এপ্রিল বেলা ৯টার সময় হাবিলদার আলী আকবর আড়িয়াল বাজারে এ্যামুনিশন ডিপোর উপর আক্রমণ চালায় এবং ক্যাপ্টেন নূর আহম্মদসহ ২৩ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের পরিবারবর্গকে জীবিত অবস্থায় ধরে ফেলে। তাদের পরিবারবর্গকে সে নিজের হেফাজতে রেখে হাজতে নিয়ে আসে। এই আক্রমণ তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। এখানে ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন নায়ক সুবেদার আবুল কাশেমসহ এক প্লাটুন বাঙ্গালী সৈন্য ছিল। তাদেরকে পরে ডেকে আনা হয়।

এই এ্যামুনিশন ডিপোতে ৯২ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ছিল। ৮০ ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র; গোলাবারুদ বগুড়াতে নিয়ে আসা হয়। এবং পুলিশের হেফাজতে দেয়া হয়। মেজর নজমুল হক উক্ত সংবাদ পেয়ে বগুড়াতে আসেন এবং হাবিলদার আলী আকবরকে এই দুঃসাহসিক অভিযানের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি আমাকে বলেন যে এত অল্প লোক নিয়ে এত বড় একটা আক্রমণ চালানো কখনো সম্ভব ছিল না।

বগুড়া জেলা স্কুলে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য। হাবিলদার আলী আকবর ছেলেদেরকে দিবারাত্র প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে সকল এমসিএ; ডিসে এবং সংগ্রাম পরিষদের কর্মীগণ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। স্থানীয় প্রশাসন আমাদের থাকা খাওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করার জন্য এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে ছিলেন পুলিশের আর- আই হাতেম আলী; তার অধঃস্তন কর্মচারীবৃন্দ; এমসিএ ডাক্তার জাহিদুর রহমান; ডাক্তার গোলাম সরওয়ার; এডভোকেট গাজিউল হক; এমসিএ মুজিবর রহমান আক্কেলপুরী প্রমুখ। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলের কর্মীগণ এ কাজে সহযোগিতা করেন।

ইতিমধ্যে মেজর নজমুল হক কিছু লোক বাঘাবাড়ি ঘাটে পাঠাবার নির্দেশ দেন। কিছু লোক সিরাজগঞ্জে এবং কিছু লোক মহাঙ্গানে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম দিনাজপুরের ঘোরাঘাট থেকে ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আনোয়ার; ক্যাপ্টেন শওকতের চিঠি এবং একজন এমসিএসহ হাবিলদার ও দুইজন নায়ক একটা জীপে এ্যামুনিশন নেয়ার জন্য বগুড়াতে এসেছেন। এমসিএগণের পরামর্শ ও মেজর নজমুল হকের আদেশক্রমে তাদেরকে ট্রাক ও জীপে আর্মস ও গোলাবারুদ দেয়া হয়। পরে সুবেদার প্রধান পুনরায় অস্ত্র নিতে আসে। ৮ ট্রাক অস্ত্র ও দুটি ৩ ইঞ্চি মর্টার তাদেরকে দেয়া হয়।

হাবিলদার আলী আকবরকে মহাঙ্গানে পাঠানো হয়। পরের দিন তাকে আবার ডেকে পাঠানো হয়। আলী আকবরকে হেডকোয়ার্টারে (বগুড়া) রেখে আমি বাঘাবাড়ি ঘাটে ডিফেন্সে যাই। এবং সিরাজগঞ্জের এসডিও জনাব সামসুদ্দিন; শাহজাদপুরের এমসিএ আব্দুর রহমান; শাহজাদপুরের প্রিন্সিপাল তাসাদক হোসেন এবং আরো অন্যদের সহিত আমার নিজস্বাং পরামর্শ করে আলী আকবরকে আনার জন্য বগুড়া পাঠাই। দুদিন পর আলী আকবর বগুড়া হতে এসে আমার সাথে বেড়াতে যোগদান করে। পাইকড়াহাটে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করা

হয়। পরের দিন তাকে পাকবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য সাথিয়া থানায় (পাবনা) পাঠাই। ইতিমধ্যে পাকবাহিনী নগরবাড়ী থেকে (১০ ই এপ্রিল) পাবনা অভিমুখে যাত্রা করে। পরদিন আলী আকবর ফেরত এসে বলল যে গতকাল (১৩ এপ্রিল) পাক সেনাবাহিনী পাবনায় প্রবেশ করেছে এবং লোকমুখে জানা গেছে তাদের এক ডিভিশন সৈন্য এ্যাডভান্স করছে। ১৩ ই এপ্রিল পাবনার ডিসি; এসপি নদী পার হয়ে কুষ্টিয়ার দিকে চলে গেছেন। পাবনা পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র ও এ্যামুনিশন আর-আইয়ের নিকট থেকে টিপু বিশ্বাস নিয়ে গেছে। তখন আলী আকবর কে পুনরায় নাকালীয়া বাজারে পাঠাই। নাকালীয়াতে চেয়ারম্যান (নব্বালপট্টী) তাকে সেখানে থাকতে বাধা দেয় এবং এখানে থাকতে দেব না বলে হুমকি দেয়। পরদিন সকালে এসে আলী আকবর আমাদের এসব জানায়। ঐ এলাকায় জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগপট্টী কিছু লোক আমাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো।

আমি আলী আকবরের সাথে পরামর্শ করি কিভাবে আক্রমণ পরিচালনা করা যায়। তারিখ ছিল ১৪ই এপ্রিল। আলী আকবরকে নির্দেশ দিই বগুড়াতে গিয়ে মেজর নজমুল হকের সাথে পরামর্শ করে ফেরত আসতে। ১৭ এপ্রিল আলী আকবর ফেরত আসে। এক প্লাটুন সৈন্যসহ তাকে নগরবাড়ী এবং পাবনা রাস্তার মধ্যে পাকসেনাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দিই। আলী আকবর ১৭ই এপ্রিল রাতে সেখানে যায়।

আমি জানতে পারলাম যে আমাদের যে; আমাদের সুবেদার মেজর আবদুল লতিফ মোল্লা ১৭ই এপ্রিল বাঘাবাড়ি ঘাটে এসেছেন। আমি তার সাথে দেখা করতে যাই। ২০শে এপ্রিল আমি বাঘাবাড়ি ঘাটে পৌছাই এবং দেখতে পাই হাবিলদার আলি আকবর এক আহত সৈনিককে নিয়ে ঘাটে রেখেছে। আলী আকবর বলল যে; ১৯শে এপ্রিল পাইকড়াহাটে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ পাকসেনা অগ্রসর হচ্ছিল। সেই সময় সে পাকসেনাদের উপর গুলী ছোড়ে। পাকসেনাদের ৬ গাড়ী নষ্ট হয়েছে এবং বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে। তার পক্ষেও অনেক হতাহত হয়েছে এবং ছত্রভঙ্গ হয়েছে। আহত হাবিলদার আবদুল আলীকে নিয়ে আমরা শাহজাদপুর হাসপাতালে আসি। সেখানে তার উপর অস্ত্রোপচার করা হয় স্থানীয় ডাক্তারদের দ্বারা। এরপর হাবিলদার আলী আকবর সিরাজগঞ্জের এসডিও-র সাথে যোগাযোগ করে। ছত্রভঙ্গদের আমি একত্রিত করার চেষ্টা করি কিন্তু তা করতে পারিনি।

আমি তার পর ৩নং সেক্টরে যোগ দিই। সেখান থেকে আমাকে কোম্পানী কমান্ডার বানিয়ে সিলেটের আসালংবাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহীর সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকার; হাবিলদার মোহাম্মদ ফসিউদ্দিন

০২-০৫-১৯৭৪

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ইপিআর-এর ৬নং উইং ছিল। ২৪শে মার্চ থেকে আমাদের কিছু লোককে বাইরে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির জন্য পাঠানো হয়। এই উইং এর কমান্ডার; সহকারী উইং কমান্ডার; ক্যাপ্টেন সিদ্দিক ও আর একজন ক্যাপ্টেন মেস কমান্ডার থেকে সুবেদার মেজর পর্যন্ত সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। বাঙ্গালীদের বদলী করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়োগ করা হয়। ২৫শে মার্চ থেকে বাঙ্গালী ইপিআদের কাছে থেকে অস্ত্র নেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাঙ্গালীদের সন্দেহ জাগায় অস্ত্র জমা দিতে তারা অস্বীকার করে। জনসাধারণ আমাদের উপর হামলা চালাবে এই অজুহাতে আমরা অস্ত্র জমা দিই নাই।

২৫শে মার্চ বিকেলে সেক্টর হেডকোয়ার্টার রাজশাহী থেকে ১৫/১৬ জন বাঙ্গালী ইপিআর একজন সিকিউরিটিসহ নবাবগঞ্জে আসে। মাঝে মাঝে তারা গোপনে বৈঠক করতে থাকে। ২৫শে মার্চ রাতে তিনজন ক্যাপ্টেনসহ আনুমানিক ২৫/৩০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর রাত প্রায় দেড় ঘটিকায় সময় রহনপুর প্লাটুন

হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ চালায়। রহনপুর ক্যাম্পের বাঙ্গালী ইপিআররা তাদের জীবন রক্ষার্থে ওদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। ওদের তিনজন আহত হয়। ২৬শে মার্চ পাকিস্তানীরা রহনপুর বাজারে কিছু নিঃসহায় লোককে গুলী করে হত্যা করে। ২৬শে মার্চ দিনে নবাবগঞ্জ ক্যাম্পের সমস্ত বাঙ্গালীকে নিরস্ত্র অবস্থায় তিন চারবার ফলইন করানো হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী অস্ত্রসহ বাইরে গুণ্ডাগোলের অভ্যুত্থানে ক্যাম্পের আশেপাশে থাকে। আমাদেরকে ফল-ইন করিয়ে উইং কমান্ডার বলেন যে; আমরা যদি বাইরের জনসাধারণের সাথে সহযোগিতা করি তাহলে আমাদের কঠিন সাজা দেয়া হবে এবং গুলি করে হত্যা করা হবে। কথা প্রসংগে পশ্চিমা সুবেদার মেজর দাডু খান বলে যে তোমাদেরকে ট্যাক্টের সাহায্যে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হবে।

২৬শে মার্চ দিনের বেলা আমরা চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে ইপিআর অয়ারলেসে খবর পাই যে ঢাকাতে বাঙ্গালী ইপিআরদের কে খতম করা হয়েছে। বাইরে যারা আছে তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক করে দয়া হয়।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী এসসিও হাবিলদার মোস্তফা কামাল; হাবিলদার জমজম আলী হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমান ; হাবিলদার সৈয়দ আলী তালুকদার এবং কিছুসংখ্যক নায়ক সিপাহী পশ্চিম পাকিস্তানী কয়েকজন এনসিও-র সাথে আলাপ করছিলাম। হঠাৎ ব্যাটালিয়ন হাবিলদার মেজর গুলজার খান পশ্চিম পাকিস্তানীদের চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে আসেন। তাদের এহেন আচরনে আমরা সন্দেহ হলাম। আমরা আরো সতর্ক হই। কিছুক্ষণ পর রাজশাহী সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে একটি মেসেজ আসে। সেটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী সমস্ত অফিসার এবং জোয়ানদের পরিবারকে রাজশাহীতে সরিয়ে ফেলার জন্য এবং বাঙ্গালীদের খতম করে রাজশাহীর দিকে যাবার জন্য। আমাদের বাঙ্গালী অপারেটর এই মেসেজ সমস্ত বাঙ্গালীদের জানিয়ে দেয়। এই মেসেজ অফিসারের হাতে পড়ার সাথে সাথে আমাদের উপর হামলা শুরু হয়। গোলাগুলির মধ্যেই তিনজন অফিসার পরিবারসহ পালিয়ে রাজশাহীর দিকে চলে যায়। প্রায় দুই ঘণ্টা গোলাগুলির পর পরিস্থিতি বাঙ্গালীদের আয়ত্তে আসে এবং অস্ত্রসহ পশ্চিম পাকিস্তানী জেসিওকে বন্দী করা হয়। গোলাগুলিতে তাদের কিছু লোক মারা যায়; কিছু আহত হয়। আমাদের একজন সামান্য আহত হয়।

ক্যাম্পকে সম্পূর্ণরূপে নিজ দায়িত্বে আনার পর বাইরে জনসাধারণ কে খবর দেয়া হয়। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে ২/৩ হাজার লোক ক্যাম্পে আসে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। সারা রাত ক্যাম্পের বাইরে এবং ভিতরে চতুর্দিকে ডিফেন্স করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য। তখন রাজশাহীতে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ছিল। আমরা সীমান্তের সমস্ত বিওপিতে অবাঙ্গালীদের গ্রেফতার করে কিছু লোক বিওপিতে থাকি; বাকি সবাই উইং হেডকোয়ার্টারে সমবেত হবার জন্য অগ্রসর হই। ২৭ মার্চ বিকালে ৫ ঘটিকায় আমরা রাজশাহীর বাঙ্গালীর ইপিআর এবং বাঙ্গালী পুলিশদের জীবন রক্ষার্থে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হই। রাজশাহীর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পাকিস্তানীরা সমস্ত গোলাবারুদ এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। সেক্টর হেডকোয়ার্টার পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন ইসহাক সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে সতর্ক করে দেন এবং বলেন যে; তোমাদের সাথে আমি অনেক দিন যাবৎ আছি এখানে অনেক কিছু খেয়েছি। তিনি সবাইকে আত্মরক্ষার জন্য দুই মিনিটের মধ্যে চলে যেতে বলেন। ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে পাকিস্তানীরা গোলাগুলি এবং আগুন জ্বালানো শুরু করে দেয়।

নবাবগঞ্জ থেকে ১৮ মাইল দূরে গোদাগাড়ীতে কিছুসংখ্যক লোক ডিফেন্স তৈরি করে। রাতে পাকিস্তানীরা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলে। আমরা আস্তে আস্তে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হতে থাকি গোলাগুলি চলতেই থাকে। রাজশাহীর কাছিয়াডাঙ্গাতে ক্যাপ্টেন গিয়াস নওগাঁ থেকে এসে আমাদের সাথে মিলিত হন। সেই সময় আমাদের কোন অফিসার না থাকায় তিনি নেতৃত্ব দেন। রাজশাহী কোর্ট স্টেশনের নিকট ডিফেন্স থাকাকালীন আমাদের একজন নায়ক আবদুল মালেক শহীদ হন। ক্যাপ্টেন গিয়াস সাহেবের নেতৃত্বে আমরা রাজশাহী শহর দখল করে নেই। এরপর রাজশাহী সেনানিবাস দখলের জন্য সাঁড়াশী অভিযান শুরু হয়। প্রায়ই আমাদের উপর বিমান হামলা হত-দিনে ৩/৪বার করে। ১৩ই এপ্রিল বিকেল পর্যন্ত

আমরা সেনানিবাসের কিছু জায়গা দখল করে নেই। এই অভিযানে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অধিকাংশই নিহত হয়।

রাজশাহী দখলের পরই খবর আসে যে ঢাকা থেকে বিপুল সৈন্য আরিচাঘাট- নগরবাড়ি হয়ে রাজশাহীর দিকে আগ্রসর হচ্ছে। তাদের পথে বাধা দেয়ার জন্যে আমাদের কিছু লোক-আনসার ; মোজাহিদ ; পুলিশ ঐদিকে এগিয়ে যায়। নগরবাড়িতে আমাদের লোকের সাথে পাকবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। আমাদের লোক পিছু হটতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানীদের রাজশাহী পৌছা পর্যন্ত রাস্তার কয়েক জায়গায় আমাদের লোকের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। সংখ্যায় তারা অধিক থাকায় বহু হতাহতের পরও তারা রাজশাহী পৌছে যায়- বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের সুশিক্ষিত গোলন্দাজ বাহিনী তাদের অনেক গাড়ী ধ্বংস করে। তাদেরও অনেক হতাহত হয়। ১৩ই এপ্রিল শেষ রাতে পাকিস্তানীরা আমাদের উপর মরণপণ আক্রমণ চালায়। আর্টিলারী; পদাতিক এবং বিমান হামলা চলে সম্মিলিতভাবে। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা আত্মরক্ষার জন্য পিছু হটতে বাধ্য হই।

পুনরায় আমরা সমবেত হই-চাঁপাইনবাবগঞ্জে। গোদাগাড়ীতে পুনরায় ডিফেন্স নিই। ২২শে এপ্রিল ভোর বেলায় পাকিস্তানীরা আমাদের উপর হামলা চালায়। এখানে পাকিস্তানীদের প্রায় ১৫০টি কনভয় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায়। পরপর কয়েকবার আমাদের উপর পাল্টা আক্রমণ হয়। আমাদের বহু লোক এখানে শহীদ হয়।

২৩শে এপ্রিল ভোরে আমরা পদ্মা নদী পার হয়ে হাকিমপুর, পোলাডাঙ্গা এবং সাহেবনগর চরে গিয়ে সমবেত হই। ক্যাপ্টেন গিয়াসের নির্দেশে সমস্ত লোক পোলাডাঙ্গা ক্যাম্পে একত্রিত হয়।

কানুপুরের যুদ্ধ*

রাজশাহী-একান্তরের ২৯শে এপ্রিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শেষবর্ষের ছাত্র আসাদ আহমদ বায়রনের নেতৃত্বে একদল গেরিলা নবাবগঞ্জ মহকুমার শিবগঞ্জ থানাধীন পাগলঅ নদীর ওপার থেকে নদী পার হয়ে কানুপুর যাত্রার জন্য তৈরি হয়। রাত তখন নয়টা বেজে ত্রিশ মিনিট; দুর্গভপুর গেরিলা শিবির থেকে বায়রন তার দল নিয়ে যাত্রা শুরু করে। সাথীদের সকলের চোখে মুখে যেন কিছুটা নৈরাশ্যের ছাপ। হয়তো মনে হচ্ছিল এই দুঃসাহসিক অপারেশন বুঝি কেউ আর ফিরে আসবে না। পরক্ষণেই তাদের আবার মনে হয়েছে যেমন করেই হোক তাদের এ অপারেশনে সাফল্যলাভ করতেই হবে। কারণ দখলদার নরঘাতক ইয়াহিয়া বাহিনীর কবল থেকে মুক্তির আশায় বাংলাদেশের মানুষ দিন গুনছে। দুটিমাত্র ছোট নৌকা তাদের সম্ভল; অস্ত্রশস্ত্র নৌকায় রাখা আর গেরিলা নৌকায় ভেসে চলেছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলেছে পশুহত্যার উল্যাসে। রাত পৌনে এগাটা। শেষ হলো জলে ভাসা। কানুপুরের কাছে এক আশ্চর্য্যে নৌকা রাখা হয়। নৌকায় রাখা অস্ত্র তারা হাতে তুলে নেয়। আবার শুরু হয় যাত্রা। এক বুক পানি ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে। খানিকটা দূর ঘুরে কানুপুর গ্রামটাকে পেছনে ফেলে এক আম বাগানে প্রবেশ করে। সেখানেই প্রত্যেককে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়। তারা যখন আম বাগান প্রবেশ করে তখন শিবগঞ্জের খানসেনাদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে ভেসে আসছিল মুহূর্মুহ গোলাগুলির আওয়াজ। পদপ্রদর্শক ছিল ১১ বছরের একটি বালক; এর নাম জানা যায়নি। প্রথমে যদিও এই বালকের ওপর ভরসা করা যায়নি; কিন্তু সে ভুল ভাঙতে খুব দেরি হয়নি। সে অত্যন্ত গেরিলাদের এগিয়ে নিয়ে গেল-পাঞ্জাবী আর রাজাকারদের ট্রেন্ড ও বাংকারগুলো খুব কাছ থেকে দেখিয়ে দিল। ক্রলিং করে গিয়ে পাহারারত রাজাকারকে কিছু করার সুযোগ না দিয়ে গলা টিপে হত্যা করে অস্ত্র কেড়ে নেয় এগারো বছরের বালকটি। এরপর শুরু হয় গেরিলাদের কাজ।

* দৈনিক বাংলা ২১শে মার্চ ১৯৭২-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত

অন্যান্য গেরিলারা তড়িৎবেগে দলের নেতার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দেয়। যে বাংকারে পাঞ্জাবী ছিল সেখানে গ্রেনেড চার্জ করা হয়। বাংকারে তখন তিনজন পাঞ্জাবী ঘুমুচ্ছিল। মাত্র কয়েক সেসেণ্ড। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে সাথে বাংকার ধসে পড়ে। পাশের বাংকার গ্রেনেড চার্জ করে হত্যা করা হয় চারজন রাজাকারকে। নিকটে এক বাড়ীতে দু'জন রাজাকার ও তিনজন দালাল ছিল। তারা পালিয়ে পাঞ্জাবীদের কাছে খবর নিয়ে যাচ্ছিল। হাতের রাইফেল তাদের লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠে। অব্যর্থ লক্ষ্য। মহুর্তে লুটিয়ে পড়ে পাঁচজন মীরজাফর। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবীরা টের পেয়ে যায়। প্রায় এক কোম্পানী পাঞ্জাবী ও রাজাকার আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। আত্মক্ষেপে নৌকায় রেখে আসা হয়েছিল দু জনকে; তারা তাদের সাথীদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য খানসেনাদের লক্ষ্য করে গোলাগুলি ছুড়তে আরম্ভ করে। ফলে খানসেনারা হকচকিত হয়ে পড়ে। খানসেনারা ভালভাবে কিছু বুঝতে পারার আগেই গেরিলারা নৌকায় ফিরে শিবিরে ফিরে যায়। কানুপুর অপারেশনে বায়রনের গেরিলা দল একটি এলএমজি; দুটি চীনা স্বয়ংক্রিয় রাইফেলসহ বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে।

সশস্ত্র প্রতিরোধ : বগুড়া

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২। বগুড়ায় সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ		 ১৯৭১

বগুড়ার ছাত্র জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ

বাংলাদেশের প্রতিরোধ সংগ্রামে বগুড়ার ছাত্রসমাজ সারা দেশের ছাত্রদের মুখ উজ্জ্বল করে তুলেছে। বগুড়ার ছাত্ররা এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের ছাত্র পতাকাকে সবার উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। যারা এই মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করবেন তাদের এই সত্যটি অবশ্যই স্বীকৃত দিতে হবে। শুধু কলেজের ছাত্ররাই নয় দলে দলে স্কুলের ছাত্ররাও শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পথ নেমে এসেছে। যুদ্ধবিদ্যায় অশিক্ষিত এ কাঁচা বয়সের ছেলেরা একমাত্র দেশপ্রেমের বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ পাক সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে অকুতোভয়ে প্রাণ নিয়েছে; প্রাণ দিয়েছে।

দেশকে মুক্ত করতে হলে শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে হবে; ছাত্ররা এই সত্যটিকে ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। তাই মার্চের প্রথম থেকে তারা পাড়ায় পাড়ায় প্যারেড আর রাইফেল চালানোর ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছিল। ছোট ছোট ছেলেরাও এই ট্রেনিং- এ অংশ নিত। এই ট্রেনিং-এর মধ্য দিয়ে শুধু হাত নয়, হাতের চেয়েও বড় কথা, তাদের মনটাও সংগ্রামের জন্য দেবী হয়ে উঠছিল। এটা শুধু কথার কথা নয়, তারা কার্যক্ষেত্রে এই কথাটিকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে।

সারাটা মাস ধরে মিছিলের পর মিছিল চলেছিল। ছাত্রদের মিছিল' শ্রমিকদের মিছিল; চাকুরীদের মিছিল; সাধারণ মানুষের মিছিল-মিছিলের আর শেষ নেই। বগুড়ার আকাশ বাতাস মিছিলের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে দিয়ে এল ২৫শে মার্চ; সেই অবিস্মরণীয় ২৫শে মার্চ। অবশ্য বগুড়া শহরে এই দিনটিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যাবেলায় ছাত্রদের মিছিল পথে বেরোল; তারই পাশাপাশি লাল ঝান্ডাকে সামনে নিয়ে শ্রমিকদের মিছিল চলে এল। ছাত্র আর শ্রমিকদের শ্লোগানে শ্লোগানে বগুড়া শহরের রাজপথে আর অলি-গলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আসন্ন ঝাড়ের আভাস পেয়ে তাদের মনে আশংকা-মিশ্রিত উত্তেজনা।

খবর এসেছে ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনা ভেঙ্গে গেছে। এবার এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে; সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঘটনার গতি প্রবাহে এক ভীষণ সংগ্রামে অনিবার্যভাবে ভেঙে পড়বে।

সেই দিন রাত দুটোর সময় খবর এসে পৌছাল; রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে একদল সৈন্য বগুড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। এর তাৎপর্য সুস্পষ্ট; ওরা ওদের হিংস্র থাবা বিস্তার করে আক্রমণের জন্য ছুটে আসছে স্বাধীনতা সংগ্রামকে অংকুরেই চূর্ণ করে ফেলবার জন্য ওরা ওদের এই অভিযান শুরু করেছে।

খবরটা দেখতে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। ঘুমন্ত মানুষ শয্যা ছেড়ে উঠে বসল। ইতিমধ্যে পথে আওয়াজ উঠেছে- প্রতিরোধ চাই; প্ররোধ। ছাত্র আর শ্রমিকদের মিছিল বেরিয়ে গেছে। তারা সারা শহরের

পথে পথে ঘুরে প্রতিরোধ সংগ্রামের আওয়াজ তুলেছে। সেই আওয়াজে ঘরের মানুষ ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

শত্রুদের প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু প্রতিরোধ করার মত অস্ত্র কোথায়? ছাত্রেরা দল বেঁধে থানায় গিয়ে সেখান থেকে সমস্ত রাইফেল বের করে নিয়ে এল। শুধু তাই নয়; শহরে যার যার হাতে যত বন্দুক ছিল; তোর সবাই তাদের হাতে চলে এসেছে। এ অবস্থায় কোন দিকে থেই তারা ভাধা বা আপত্তি পায়নি। সবাই যে যার বন্দুক তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। ছাত্রেরা সেই সমস্ত অস্ত্র নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। এই ক’দিনে তারা রাইফেল চালানোর ব্যাপারে যে ট্রেনিং পেয়েছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তা হোক; সংগ্রামে নেমে এসেছে; এখন আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার সময় নেই, তাদের যতটুকু বিদ্যা সেই টুককেই কাজে লাগাতে হবে।

সারা শহরের পথি বহু ব্যারিকেড গড়ে উঠেছে। এই ব্যারিকেড গড়ে তোলার ব্যাপারে শত শত হাত অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে। ছাত্র আর শ্রমিকরা সবাইর আগে; সাধারণ মানুষও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। বড় বড় গাছ কেটে শহরের প্রবেশ মুখ-বন্দ করে দেয়া হচ্ছে। কাজের বিরাম নেই। এইভাবে রাত কেটে গিয়ে ভোর হয়ে এল; তখনও কাজ চলছে। হ্যা; সকল দিক দিয়ে ওদের চলাচলের পথ রুদ্ধ করে দিত হবে; ওদের আক্রমণকে অচল করে ফেলতে হবে।

সৈন্যরা মহাস্থানগড় হয়ে বগুড়া শহরের দিকে মার্চ করে চলে আসছিল। ওরা সকালবেলা বগুড়া শহরের সামনে এসে পৌঁছল। শহরে ঢোকার একমাত্র পথ সুবিলখালের পুল। ওরা সেই পথ দিয়েই চলে এল। ছাত্র আর শ্রমিকরা সেখানে হানাদার শত্রু সৈন্যদের দৃষ্টির আড়ালে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সৈন্যরা ব্যারিকেড সরিয়ে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছিল। গোপন আশ্রয়ের আড়াল থেকে ছাত্র আর শ্রমিকরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিল। হানাদার সৈন্যরা কালিতলাহাট হয়ে ঝাউতলা রোড ধরে বড়গোলা মোড়ে আসে। এখানে আগে থেকেই অনেক ছত্র পজিশন দাঁড়িয়েছিল। সৈন্যরা এখানে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল গুলিবর্ষনের সম্মুখীন হোল। ফলে এখানে একজন কর্ণেলসহ ১১জন সৈন্য মারা যায়। সৈন্যরা এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। একই ভাবে পাক সৈন্যরা অনেকক্ষণ ধরে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে গুলি চালিয়ে যেতে থাকে। বেলা যখন সাড়ে বারোটো তখন স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র টিপু শত্রুসৈন্যের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মাড়া যায়। ঢুটি ইউনাইটেড ব্যাংক অফিসের দোতলায় দাঁড়িয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। মাত্র পনের বছর তার বয়স। বগুড়া শহরের স্কুলের ছাত্রদের সে ছিল নেতা। সবাই তাকে চিনত জানত; সবাই তাকে ভালবাসত। গত এক মাসের মুক্তি আন্দোলনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাহসের পরিচয় দিয়ে সে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছিল। বীর কিশোর টির যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিল। শুধু সে-ই নয় তারই মত বগুড়ার আরও কয়েকটি বীর সন্তানকে সেদিন এই মুক্তিসংগ্রামে প্রাণ দিতে হয়েছে।

আজাদুর রহমান নামে এক তরুন ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং বিল্ডিং-এ আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করছিল। শত্রুদের গুলিতে তার মাথার খুলি উড়ে যায়। আজাদ একটি প্রেস চালাত; তারই সাথে সাথে লেখাপড়াও করত। বগুড়ার মানুষ এই সমস্ত বীর শহীদের কথা ভুলে যেতে পারেনি। আরও একজন শহীদের নাম এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। তার নাম হিরু। এই হিরুও সেদিন তাদের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিল। হিরু কিন্তু একজন বিহারীর সন্তান। বগুড়ার বিহারী কলোনীতে তার জন্ম; সেইখানেই সে বাস করত। তাহলেও জন্মভূমি বাংলাদেশকে সে তার মাতৃভূমি বলে মনোপ্রাণে গ্রহন করে নিয়েছিল এবং এই মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে সে শাহাদৎ বরণ করল। বিহারী কলোনীর মধ্যেই হিরুর মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়।

টিটু, আজাদুর রহমান ও হিরুর মৃত্যুর পর পাক সৈন্যরা দু’ভাগে ভাগ হয়ে দক্ষিণ দিকে এগুতে থাকে। একদল ঝাউতলার মধ্যে দিয়ে যায়; আর একদল যায় রাজাবাজার দিয়ে। এরা রেল লাইনের কাছে এসে গেলে ছাত্রেরা ওদের চারদিকে থেকে ঘিরে ফেলে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এইভাবে আক্রান্ত হয়ে সৈন্যরা বেলা দেড়টার

সময় পেছনে হাটতে থাকে। সৈন্যরা তাদের মনের ঝাল মেটাবার জন্য বেশ কিছু লোককে ধরে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তারা ওদের সবাইকে গুলি করে মারে এবং তাদের মৃতদেহ পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। এছাড়াও এরা রেল লাইনের কাছে পাচঁজন হোটেলের বয়কে মেরে ফেলেছিল।

তার পরদিন ২৭শে মার্চ তারিখে সৈন্যরা বগুড়ার কটন মিল মহিলা কলেজ; নাইট কলেজ আশিযুল হক সরকারী কলেজের পুরাতন ভবন এবং বেতার ভবন দখল করে সেসব জায়গায় ঘাটি গেড়ে বসল। তারপর তারা মহিলা কলেজ ও রেস্টহাউসের চারতলা বাড়ি থেকে মর্টার শেল রকেট এবং মেশিনগানের সাহায্যে শহরের উপর আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। এইভাবে সারাটা দিন কাটল। তার পরদিনও তারা শহরের লোকদের উপর নানাভাবে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল।

মোঝে মাঝে এখানে-ওখানে ছাত্রদের সঙ্গে গুলি বিনিময় চলছিল। দুপুর বেলা সৈন্যরা শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যায় এবং সেখান থেকে লোককে ধরে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে কিছু লোককে মেরে ফেলা হয়। এরা বাকী লোকদের সঙ্গীন উঁচিয়ে প্রাণের ভয় দেখিয়ে ব্যারিকেড সরিয়ে নেবার কাজে লাগায়। বেলা ৩টার সময় এই সৈন্যরা হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় ম্যাচ ফ্যাক্টরীর ভেতর থেকে ওদের উপর গুলিবর্ষণ হতে থাকে। সৈন্যরা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই আগুন সঞ্চিত বারুদের গাদায় গিয়ে লাগতেই এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এবং নিকটবর্তী বাড়ীগুলোতে আগুন ধরে যায়।

বেতার ভবনের পেছন দিককার পাড়াটা বৃন্দাবনপাড়া নামে পরিচিত। সৈন্যরা ২৯শে মার্চ তারিখে সেই পাড়ার উপর গিয়ে হামলা করে। সেখান থেকে তারা চাল হাল থেকে শুরু করে মোরগ; খাসি গরু পর্যন্ত লুটপাট করে নিয়ে আসতে থাকে। এরা সেখানে ঘরে ঘরে আগুন দিয়ে মজা দেখে এবং মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। এর ফলে সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ছাত্রজনতা এদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কলিমুদ্দীন নামে এক পুলিশ ও একটি চাত্র নিহত হন। এই কলিমুদ্দীনই সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করছিল।

পরদিন ৩০শে মার্চ তারিখেও এরা আগেকার মতই চারদিকে এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। সেদিনও রাত্রিবেলায় তারা রেস্ট হাউসের উপর থেকে মর্টার শেল; বোমা ও রকেট ছুড়ে শহরের নানান জায়গায় অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। ফলে কিছু লোকও মারা যায়। কিন্তু ওরা অস্ত্রের দাপটে যতই প্রতাপ দেখাক না কেন; ওদের মনোবল ক্রমেই কমে আসছিল। এই ক'টি দিনে ছাত্র ও সাধারণ মানুষের আক্রমণের ফলে ওদের চল্লিশজন সৈন্য মারা গেছে। এমন যে হতে পারে এটা ওরা ভাবতেই পারেনি। এইভাবে যদি মৃত্যুর হার বেড়ে চলতে থাকে; তবে আর কিছু দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে বিনাশ হয়ে যেতে হবে। ওদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হচ্ছিল বুঝতে পারছিল যে তারা ওদের সঙ্গে উঠতে পারছে না। তাই শেষ পর্যন্ত ওরা শহর থেকে পাল্টা গুটিয়ে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল। তার পরদিনেই ওরা চোরের মত চুপিচুপি শহর ছেড়ে চলে গিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাত্রা করল। ওরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল তার চারদিকের গ্রামগুলিতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল।

এই পলাতকের দল যখন কাটাখালিতে পৌঁছাল তখন স্থানীয় ছাত্ররা ওদের পথরোধ করার জন্য কাটাখালি পুলটাকে ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওদের ভাগ্য ভাল সময়ের অভাবে ছাত্রেরা একটুর জন্য তাদের কাজটাকে শেষ করতে পারেনি।

সৈন্যরা কাটাখালি থেকে মানে মানে প্রাণ নিয়ে সরে পড়তে পারল বটে; কিন্তু আরও কিছুদূর এগোবার পর ওদের বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াতে হোল। জায়গাটার নাম গোবিন্দগঞ্জ। এখানে বহু স্থানের ছাত্র আক্রমণমুখী হয়ে ওদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। কি দুঃসাহসী এই ছাত্রের দল। আগ্নেয়াস্ত্র বলতে অতি সামান্যই ওদের

কাছে ছিল। আর যা ছিল তা হচ্ছে লাঠি-সোটা বর্শা বল্লম এই সমস্ত হাতিয়ার। তাই নিয়ে ওরা মেশিনগানের বিরুদ্ধে দাড়ায়েছিল। এই সংঘর্ষে অনেক ছাত্র হতাহত হোল। কিন্তু সৈন্যরাও অক্ষত অবস্থায় চলে যেতে পারেনি। ওদের মধ্যে সাতজন ছাত্রদের হাতে ধরা পড়ল। বাকী সবাই প্রাণ নিয়ে উদ্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

এদিকে বগুড়া মিলিটারী ক্যাম্প আর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে চলেছিল। ক্যাম্পটা বগুড়া শহর থেকে আট মাইল দূরে। ক্যাম্প সৈন্যদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল বাঙ্গালী। কিন্তু অফিসাররা সবাই পাঞ্জাবী; অফিসাররা বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে রেখেছিল। আর তাদের মধ্যে যারা তাদের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল; তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

ব্যাপারটা ক্যাম্পের বিতরে ঘটলেও এই খবর চাপা রইল না, দেখতে দেখতে সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। খবর পেয়ে ছাত্ররা দলে দলে ছুটে এল। শুধু শহরের ছাত্ররা যে এল তাই নয়, চারদিককার গ্রামাঞ্চলের বহু ছাত্র এসে সেখানে জমল।

ক্যাম্পের ভিতরে অবরুদ্ধ বাঙ্গালী সৈন্যদের এই দুর্দশার কথা জানতে পেরে গ্রামাঞ্চলের লোকদের মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল। ক্যাম্প পাঞ্জাবী অফিসারদের খতম করে দেয়ার জন্য তারাও এসে ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিল। খালি হাতে আসেনি কেউ; যে যার হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কৌতূহলী দর্শক নয় তারা; জীবন পণ করে লড়াই করতে এসেছে। শেরপুর; নন্দীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হতে হাজার হাজার লোক এসে ক্যাম্পটাকে ঘেরাও করে ফেলল।

লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২০ হাজার উঠে পড়ল। পর পর ক’দিন তারা এই অবরোধ চালিয়ে গেল। ছাত্ররা অফিসারদের আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান জানাল। কিন্তু তারা কিছুতেই রাজী হতে চায় না। তারা ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর ভরসা করে শক্ত হয়ে বসে রইল। ইতিমধ্যে এই খবর ঢাকায় গিয়ে পৌছেছে ঢাকা থেকে উড়ে এল বোমারু বিমান জনতাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মানুষ ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার উত্তেজিত জনতার চাপে অফিসারদের বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হোল। পরে এই অফিসারদের বগুড়ার রেলগেটে এনে গুলি করে মারা হয়।

সশস্ত্র প্রতিরোধ বগুড়া

সাক্ষাৎকার: গাজীউল হক

২১-০৮-৮৩

১৯৭১ সাল। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে তিনটা। এমদাদুল হক নামে এক তরুন এসে ঘুম থেকে ডেকে তুললো। এফুনি থানায় যেতে হবে; জরুরী খবর আছে। খবর এসেছে পাকসেনা বগুড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। দু’মিনিটে তৈরি হয়ে নিলাম। চিন্তা ভাবনার ফুরসৎ নেই। ছুটতে হলো ডাঃ জাহিদুর রহমান (এমপি) তাঁর বাড়িতে দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাকতেই নেমে এলেন। তাকে নিয়েই ছুটতে ছুটতে থানায় হাজির হলো।

আধো আলো আধো অন্ধকার বগুড়া কোতাওয়ালা থানার আঙ্গিনায় ২০/২৫ জন লোক দাড়ায়ে। সামনে এগিয়ে এলেন মকবুল সাহেব (ইন্টেলিজেন্স ব্যাঞ্চের অফিসার) তিনি জানালেন অয়ারলেসে খবর এসেছে পাকসেনারা রাজারবাগ এবং পীলখানা আক্রমণ করেছে। রাজারবাগ এবং পীলখানায় প্রতিরোধ চলছে। এদিকে রংপুর থেকে পাকিস্তানী সৈন্য বগুড়ার দিকে এগিয়ে আসছে।

নিজেকে ভীষণ অসহায় বোধ করছিলাম। আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলাম না। কোন রাজনৈতিক দলের নেতাও নই। সুতরাং এ অবস্থায় আমার দায়িত্ব কতখানি বুঝতে না পেরে বিব্রত বোধ করছিলাম। ডাঃ জাহিদুর

রহমানের অবস্থাও আমার চাইতে বিশেষ সুবিধেয় নয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি সম্পূর্ণ নতুন। ৭০ সালেই নির্বাচনের আগে সক্রিয় রাজনীতে এসেছেন এবং পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তবুও কর্তব্য সমন্ধে যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন; বললেন; এখন সকলকে ডেকে সিদ্ধান্ত নেবার সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। সুতরাং আপনাকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে। “মকবুল সাহেব; অফিসার ইন-চার্জ নিজামউদ্দিন সাহেব এবং থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীগণেরও একই মত। সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেললাম। হঠাৎ যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো “অল রাইট; আই এসিউম দি কমাণ্ড। উই শ্যাল রেসিস্ট দি পাকিস্তানী আর্মি।”

কিছুক্ষনের জন্য আলোচনা হলো বগুড়া থেকে আট মাইল দক্ষিণে আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট। রংপুর ক্যান্টনমেন্ট উত্তরে। মকবুল সাহেব বললেন; আড়িয়াতে পাকসেনার সংখ্যা খুব বেশী নয়। সুতরাং তারা হঠাৎ কিছু করবে না। তাছাড়া; অয়ারলেসে খবর এসেছে রংপুর থেকে পাক আর্মি আসছে। মনে পড়লো ২৫শে মার্চের সন্ধ্যার সময় ছত্রলীগের সামাদ এবং ছাত্র ইউনিয়নের রেজাউর রহমান ডিংগুর নেতৃত্বে বগুড়া আড়িয়া সড়কের মাঝখানে কটকির সংকীর্ণ পুলের উপর গাছ কেটে ফেলে এবং ইটের স্তূপ সাজিয়ে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছিলো। সুতরাং শহরের উত্তরে বগুড়া-রংপুর সড়কের ব্যারিকেড দিতে হবে। ব্যারিকেড বাধা পেলে হয়তো রাতে তারা আর এগুবে না। শহরবাসীদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অন্ততঃ সকাল পর্যন্ত সময় চাই। (আমাদের চিন্তায় ভুল ছিলো না সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছে। শহর থেকে তিন মাইল উত্তরে মাটিডালীতে ব্যারিকেড দেখে পাকিস্তানী সেনারা রাতে শহরে ঢুকতে সাহস করেনি)।

দারোগা নিজামউদ্দিন এবং নুরউল ইসলাম তিনজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে রাইফেল হাতে নির্দেশমত আজাদ গেস্ট হাউসের ছাদে ঘাটি গাড়লেন। পাকিস্তানী সেনা রেললাইন পার না হওয়া পর্যন্ত তারা আক্রমণ চালাবেন না এই নির্দেশ তাদের দেয়া হলো পুলিশ ফোর্সের অন্যান্যদের অস্ত্রশস্ত্র পুলিশ লাইনে পাঠিয়ে দিলাম। মকবুল সাহেব চলে গেলেন অয়ারলেসে আর কোথাও যোগাযোগ করা যায় কিনা সে চেষ্টা চালাতে।

থানা থেকে বেরোতেই দেখি থানার গেটে ২০/২৫ জন ছাত্র-যুবক জমায়েত হয়েছে। খবর তারাও পেয়েছে। তাদের নিয়ে ডাঃ জাহিদুর রহমান এবং আমি ছুটলাম উত্তর দিকে। যত দ্রুত সম্ভব মাটিডালী পৌছতে হবে। ব্যারিকেড দিয়ে প্রথম বাধার সৃষ্টি করতে হবে। শেষ রাত্রির নিস্তন্ধতা ভেঙ্গে শ্লোগান উঠলো জাগো জাগো বীর বাঙ্গালী জাগো জয় বাংলা; বীর বাঙ্গালী হাতিয়ার ধরো; পাকিস্তানীদের প্রতিরোধ করো।

ছুটছি, রীতিমতো দৌড়াছি। পাকিস্তানী সেনারা যে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে সে রাস্তা দিয়ে ছুটছি। পাগলের মতো চীৎকার করছি সবই ঘুম থেকে জেগে উঠুন। পাকিস্তানী সেনারা আসছে। যাদের বন্দুক আছে, তারা বন্দুক হাতে বেরিয়ে আসুন। পাকিস্তানী সেনাদের ঠেকাতে হবে।’

মাটিডালী এসে পৌছলাম। শহর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। শ্লোগান দিতেই মুস্তাফিজুর (বাবু) সহ অনেকেই রাস্তায় বেরিয়ে এলো। ব্যারিকেড দেবার কথা বলতেই ১৫/২০খানা কুড়াল নিয়ে গাছ কাটা শুরু হয়ে গেলো। রাস্তার দুপাশের লোকজনদের বাড়ী ছেড়ে সরে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো (পাক সেনারা ব্যারিকেড দেখে ওখানকার অনেক বাড়ীই পুড়িয়ে দিয়েছিলো)। একট বিরাট গাছ রাস্তা জুড়ে পড়ার পর আবার ছুটলাম শহরের দিকে। মাটিডালীতে তখন আরো গাছ কাটা এবং ব্যারিকেড রচনার কাজ চলছে।

২৬শে মার্চের ভোর। পূর্ব আকাশে সূর্য মাত্র উকি দিয়েছে। ডাঃ জাহিদুর রহমানের বাড়ীতে সামনে রাস্তায় মাহমুদ হাসান খান একা দাঁড়িয়ে আছেন। মাহমুদ হাসান খান জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। আর সবাই কোথায়? জিজ্ঞেস করতে ঘাড় নেড়ে জানালেন; জানেন না শুধু বললেন হাবিবুর রহমান (এমপি) আত্মসমর্পণ করার পক্ষপাতী। (পরবর্তীকালে হাবিবুর রহমান পাক সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাদের সহযোগিতা করেছিলেন)।

‘না তা চলবে না।’ ডঃ জাহিদুর রহমান রীতিমতো ক্রুদ্ধ। মামুদুল হাসান খানকে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাঠিয়ে ডঃ জাহিদুর রহমানসহ দু’খানা সাইকেলে ছুটলাম পুলিশ লাইনের দিকে। পথে দেখা করলাম জেলা প্রশাসক খানে আলম খান সাহেবের সঙ্গে; দেখলাম ভীষণ উদ্ভিগ্ন। বললেন সম্মুখযুদ্ধে ওদের সাথে পারবেন না। গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিন। আপনদের সাফল্য কামনা করি।

এরপর পুলিশ লাইন। পুলিশ লাইনের মকবুল সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। জানালেন অয়ারলেসে কুষ্টিয়া ছাড়া আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। কুষ্টিয়ার শেষ খবর হানাদার বাহিনী কুষ্টিয়া আক্রমণ করেছে। এরপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

রিজার্ভ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পুলিশ লাইনে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। স্থির হলো ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পুলিশ লাইনে তারা প্রস্তুত থাকবেন। সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স।

শহরে যখন ফিরে আসি তখন সকাল সাতটা। রাস্তায় লোক নেমে পড়েছে। কিন্তু অস্ত্রের সংখ্যা অতি নগণ্য। একনলা, দোনলা বন্দুক এবং টু-টু রোব রাইফেলসহ মাত্র আটাশটি। শুধু আজাদ গেস্ট হাউসের ছাদে দারোগা নিজামউদ্দীন এবং তার সঙ্গীর কাছে পাঁচটি ৩০৩ রাইফেল। যে দুরন্ত সাতাশটি ছেলে আমার সঙ্গে ২৬শে মার্চের ভোরে অকুতোভয়ে হানাদার বর্বর পাক বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছিলো; তাদের সকলের ভাল নাম হলো; (১) এনামুল হক তপন (২) আব্দুল জলিল (৩) এমদাদুল হক তরুন (৪) নূরুল আনোয়ার বাদশা; (৫) শহীদ টিটু; (৬) শহীদ টিটলু; (৭) শহীদ মোস্তাফিজ (ছন্ন); (৮) শহীদ আজাদ; (৯) শহীদ তারেক (১০) শহীদ খোকন পাইকাড়; (১১) সালাম (স্বাধীনতার পরে আততায়ীর হাতে নিহত); (১২) বখতিয়ার হোসেন বখতু (আর্ট কলেজের ছাত্র); (১৩) খাজা সামিয়াল (১৪) মমতাজ (বর্তমানে বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক); (১৫) রাজিউল্লা (১৬) টি এম মূসা (পেস্তা) (১৭) নান্না (১৮) সৈয়দ সোহরাব; (১৯) শহীদ বকুল (২০) বুবলা (২১) জাকারিয়া তালুকদার (২২) মাহতাব (২৩) টাটরু (২৪) বুলু (২৫) বেলাল (২৬) এ কে এম রেজাউল হক (রাজু); (২৭) ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ।

কালীতলা থেকে রেল লাইনের দু’নম্বর ঘুমটি পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে দেয়ালের আড়ালে ছোট ছোট দলে ভাগ করে এদের দাঁড়বার নির্দেশ দিলাম। কিন্তু এই নির্দেশ ভেঙ্গে টিটু, হিটলু এবং মুস্তাফিজ বড়গোলায় ইউনাইটেড ব্যাংক (বর্তমানে জনতা ব্যাংক)-এর ছাদে ঘাঁটি গেড়ে প্রতিরোধ করে এবং সেখানেই তারা শহীদ হন। তপন, সামিয়াল এবং বখতু ও জলিলসহ চারজনের একটি দল কালীতলার মুখে প্রথম প্রতিরোধের জন্য ঘাটি গাড়লো। প্রত্যেককে নির্দেশ দিলাম গুলী করার সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করে এক আড়াল থেকে সরে যেতে হবে অন্য আড়ালে। যুদ্ধ চলাকালীন যোগাযোগ রক্ষা; সংবাদ আদান-প্রদান এবং নির্দেশ পৌছানোর দায়িত্ব নিলো একরামুল হক স্বপন, মঞ্জু (শহীদ আজাদের ভাই), ছাত্র লীগের সামাদ, বিলু (মরহুম আকরব হোসেন আকন্দ সাহেবের ছেলে), সৈয়দ কেরামত আলী গোরা (পরবর্তী কালে পাক সেনাদের হাতে নিহত হন) এবং আবু সুফিয়ান (পরবর্তীকালে পাক সেনাদের হাতে শাহাদাত বরন করেন) সত্যি বলতে কি আমার নিজেকে একজন সেনাপতি সেনাপতি মনে হচ্ছিলো। আমার সেই নির্বোধ সেনাপতির ভূমিকার কথা মনে হলে এখন হাসি পায়।

২৬শে মার্চের সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ পাক সেনা সুবিল পার হয়ে বগুড়া শহরে ঢুকলো। সুবিল পার হবার আগে মাটিডালি; বৃন্দাবনপাড়া এবং ফুলবাড়ী গ্রামের কিছু কিছু বাড়ী তারা আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিলো। শহরে ঢুকবার পর পাক সেনাদল রাস্তার দু’পাশ দিয়ে দুটো লাইনে এগুতে শুরু করে। সুবিল (করতোয়ার একটি খাল) পার হবার পর কোন প্রতিরোধ না পেয়ে বেশ নিশ্চিত্তেই তারা এগুচ্ছিলো। রাস্তা জনশূন্য; কোন বাধা নেই। কিন্তু কালীতলাহাট পার হবার পরপরই দেয়ালের আড়াল থেকে তপনের হাতের বন্দুক আচমকা আগুন ঝরালো। অব্যর্থ নিশানা। লুটিয়ে পড়লো একজন পাকসৈন্য। তপনই বগুড়ার প্রথম মুক্তিযোদ্ধা যার অস্ত্র বগুড়ার মাটিতে প্রথম পাক সেনার রক্ত ঝরালো। গুলি করেই তপন এবং তার সঙ্গীরা স্থান ত্যাগ করে আর এক

দেয়ালের আড়ালে চলে যায়। হঠাৎ আঘাত পেয়ে বিচলিত পাক সেনা এলোপাতাড়ি গুলী চালাতে চালাতে এগিয়ে চলে। জামিলের বাড়ি পার হতেই আবার রাস্তার দু'পাশে দেয়ালের আড়াল থেকে পাকসেনাদের লক্ষ্য করে নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধাদের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠলো। এখানে দু'জন পাকসেনা গুরুতর জখম হয়। কিন্তু বগগোলা পার হবার পর প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হলো পাকসেনা। ঝাউতলা বোম্বে সাইকেল স্টোরের পাশ থেকে গুলী করে সরে যাবার সময় গুলীবর্ধিত হয়ে শহীদ হলো আজাদ। স্বাধীনতা যুদ্ধে অস্ত্র হাতে বগুড়ার মাটিতে আজাদই প্রথম শহীদ। উক্ত পাকসেনা রাস্তার পাশের ছোট চায়ের দোকানের ঝাপ তুলে দুটো কিশোর কর্মচারীকে গুলী করে মারলো।

পাকসেনারা রেল লাইনের দু'নম্বর ঘুমটির কাছে আজাদ রেষ্ট হাউসের ছাদ থেকে দারোগা নিজামউদ্দীন, দারোগা নুরুল ইসলাম এবং তাদের সহযোগীদের ৩০৩ রাইফেল গর্জে উঠলো। সম্মুখ দিক এবং দু' পাশ থেকে আক্রান্ত হয়ে হানাদার সৈন্যরা থমকে দাঁড়ালো। কিছুটা পিছু হটে এলো তারা। এমনি সময়ে বড়গোলায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ছাদের ওপর থেকে তিনটি বন্দুক গর্জে উঠলো। উৎসাহের বলে নির্দেশ অমান্য করে সকলের অজান্তে ব্যাঙ্কের ছাদে পজিশন নিয়েছিলো টিটু, হিটলু এবং মুস্তাফিজ(ছনু)। দু'জন পাকসেনা জখম হলো। পেছন দিকে থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে হানাদার সেনাদল বিচলিত হয়ে পড়ে। পিছু হটে দ্রুত তারা ব্যাঙ্ক ভরনটি ঘিরে ফেলে। টিটু, হিটলু এবং ছনু সরে যাবার সুযোগ পেল না। শহীদ হলো বগুড়ার আর তিনটি দামাল ছেলে। বেলা সাড়ে বারোটো নাগাদ বর্বরহানাদার সেনারা দ্রুত পিছু হটে শহর ছেড়ে গেলো। সুবিলের উত্তর পাড়ে পূর্ব বিভাগের ডাকবাংলা এবং মহিলা কলেজে অবস্থান নিলো তারা।

রাস্তায় বের হয়ে এলো বগুড়া শহরের লোক। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিনে আমাদের ছেলেরা প্রাণ দিয়েছে। সেজন্যে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত। কিন্তু তার সঙ্গে মিলে আছে জয়ের আনন্দ, এক অভূতপূর্ব আশ্বাদ। বর্বর হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেছি আমরা। তাদের হটিয়ে দিয়েছি, জয়ী হয়েছি।

২৬শে মার্চেরই অপরাহ্নে একরামুল হক স্বপন; ফজলার রহমান (ফুলবাড়ী) এবং চন্দন এসে খবর দিলো যে তারা একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন যোগাড় করেছে। সুতরাং বুলেটিন সাইক্লোস্টাইল করে বিলি করা যায়। বুলেটিনের খসড়া দিলাম। এক পাতার বুলেটিন সন্ধ্যার সময় শহরে ছাড়ানো হলো। হেডলাইন ছিলো “প্রথম দিনের যুদ্ধে বগুড়াবাসীর জয়লাভঃ পাঁচজন পাকসেনা নিহত”। এরপর ছিলো এক সর্বাঙ্গিক যুদ্ধের আহবান। সবশেষে ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের নির্দেশ। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মাটিডালিতে যখন ব্যারিকেড দিয়ে ফিরে আসিছিলাম তখন দণ্ডবাড়ীর সম্মুখে অয়ারলেস অফিসের একজন লোক ডাঃ জাহিদুর রহমানের হাতে একটা কাগজ দিয়ে যায়। মেসেজটি রাতে পেয়েছিলো বলে জানায়। লাল কালিতে লেখা। যতদূর মনে হয় বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়াবেঃ “এটি আমার নির্দেশ। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। শত্রুসৈন্য আমাদের আক্রমণ করেছে। বাংলার মানুষ তোমরা যে যেখানে আছ; যার হাতে যে অস্ত্র আছে তাই নিয়ে রুখে দাড়াও। হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় না পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে”। এই নির্দেশটিও বুলেটিনে জুড়ে দিয়েছিলাম। বুলেটিন অবশ্য আমাদের তরফের ক্ষয়ক্ষতির কথা উল্লেখ করিনি। কারন ভেবেছিলাম তাতে সাধারণ মানুষ ভয় পেতে পারে। এর পর থেকে প্রতিদিন আমরা বুলেটিন বের করতাম। এমন কি প্রচুর গোলাবৃষ্টির মধ্যেও স্বপন ডিকটেশন নিত। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বুলেটিন সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপা হয়ে শহরে ছড়ানো হতো। ২৬শে মার্চ থেকে শুরু করে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন বুলেটিন বের হতো। বুলেটিনের বিশেষ দায়িত্ব ছিলো একরামুল হক স্বপন; চন্দন ধলু এবং সৈয়দ কেরামত (গোড়া)-এর ওপর।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় বাতুড়তলার একটি বাড়ীতে যুদ্ধ পরামর্শ সভা বসলো। আলোচনা শেষে জনাব মোখলেসুর রহমানের প্রস্তাবক্রমে পাঁচ সদস্যের একটি হাই কমান্ড করা হলো:

- (১) গাজীউল হক (অদলীয়); সর্বাধিনায়ক; (যুদ্ধের দায়িত্ব)
- (২) ডাঃ জাহিদুর রহমান (আওয়ামী লীগ) (খাদ্য এবং চিকিৎসার দায়িত্ব)
- (৩) জনাব মাহমুদ হাসান খান (আওয়ামী লীগ) প্রশাসন
- (৪) জনাব মোখলেসুর রহমান (মোজাফফর ন্যাপ); যোগাযোগ
- (৫) জনাব আব্দুল লতিফ (কম্যুনিষ্ট পার্টি) প্রচার। ২৬শে মার্চ রাতেই আমরা সুবিলের দক্ষিণ পাড়ে ঘাটি স্থাপন করলাম।

২৭শে মার্চ সকাল আটটা। সুবিলের উত্তর পাড় থেকে পাকসেনারা গুলীবর্ষণ শুরু করে। পাল্টা জবাব দেয় আমাদের ছেলেরা। এই দিন ঝন্টু; মাহমুদ; ডঃ টি; আহমদের ছেলে মাসুদ; গোলাম রসুল; বিহারীর ছেলে (নামটি মনে নেই); রশীদ খানের ছেলে গুলার; রেডিও; রফিকুল ইসলাম লাল; শহীদ আবু সুফিয়ান রানা এবং আরো অনেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সকাল সাড়ে আটটার দিকে ডঃ জাহিদুর রহমান পুলিশ লাইন থেকে বাহিনীর ৬০ জনের এক দলকে নিয়ে এলেন। ৩০৩ রাইফেল হাতে আমাদের ছেলেরা পাশাপাশি তারাও অবস্থান নিলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টি হলো। গোলাবৃষ্টির মধ্যেই হানাদার বাহিনী সড়ক ধরে এগিয়ে এসে শহরের উত্তর প্রান্তে কটন মিল দখল করলো। (তখন বগুড়া শহরের উত্তর সীমার প্রান্তে ছিল কটন মিল)। পুলিশ এবং আমাদের ছেলেরা সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে শহরের ভিতরে বেশী এগিয়ে আসতে পারলো না হানাদার। এদিনের যুদ্ধে পাকসেনারা ভারী মেশিনগান ব্যবহার করে এবং মর্টারের গোলাবর্ষণ করে। বিকেল তিনটার মর্টারের গোলায় আঘাতে শহীদ হলো তারেক; দশম শ্রেণীর ছাত্র। মৃত্যুর সময়েও তার হাতে ধরা ছিলো একটি একনলা বন্দুক। তারেকের রক্তে ভিজে গিয়েছিলো আমার বুক। মনে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধড়ে অঝোরে কেঁদেছিলাম।

২৭শে মার্চ বিকেলে বাতুড়তলায় একটি খাদ্য ক্যাম্প বসানো হলো এবং তার সঙ্গে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রও খোলা হলো। খাদ্য ক্যাম্পের দায়িত্ব নিলেন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার জনাব আমজাদ হোসেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য মোশারফ হোসেন মণ্ডল; বাতুড়তলার আবু মিয়া, আবেদ আলী; মজিবুর রহমান এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো। এরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতেন। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শহীদ ডাঃ কহিরউদ্দীন তালুকদার সাহেব। তিনি এক সময়ে বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ঐ সময়ে বৃদ্ধ বয়সে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে যেভাবে তিনি এগিয়ে আসেন একজন চিকিৎসক হিসাবে তা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর বাড়িটিও আমাদের শেলটার হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পাক সেনা বাহিনীর হাতে তিনি শাহাদৎ বরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে বগুড়ায় প্রয়াত প্রবীণতম মুসলিম লীগ নেতা ডাঃ হাবিবুর রহমানও সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন। ২৭শে মার্চ রাতে খবর পলাম একজন মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করছেন।

২৮শে মার্চের সকাল। কটন মিলের গেট হাউসের ছাদে পাকসেনারা মেশিনগান বসিয়েছে। তখনো গোলাগুলি শুরু হয়নি। মেশিনগানের পাশে দু জন পাকসেনা দাঁড়িয়ে। একজন পাকসেনা ছাদের রেলিং এ ভর দিয়ে কি যেন দেখছে। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে দূরন্ত ছেলে তপন রাইফেল তুললো। অব্যর্থ লক্ষ্য। ছাদের ওপর থেকে পাকসেনাটি ছিটকে পড়লো মাটিতে। পিছু হটে তপন লাফিয়ে পড়লো রাস্তার পাশের নর্দমায়। নর্দমার দেয়াল ঘেঁষে সরে এলো আড়ালে।

শুরু হলো এলোপাতাড়ি গোলাবৃষ্টি। ২৮শে মার্চে মুক্তিসেনারাও দলে বারী। মিন্টু, ডিউক লিয়াকত (পরে রাজাকার হয়ে যায়), আব্দুর রহমান, মামুন (হক সাহেবের কম্যুনিষ্ট পার্টির), হারুন (ব্যাক্স অফিসার), ধুলু বজলু, মুকুল, সান্তার রশীদ (রশীদ গুন্ডা নামে খ্যাত ছিলো) এবং গ্রাম থেকে প্রায় শ'খানেক বন্দুকসহ এসে যোগ দিয়েছে। প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও ভারী মেশিনগানের গুলী এবং মর্টারের গোলাবর্ষণের আড়াল নিয়ে বেলা সাড়ে তিনটার পর পাকসেনারা ক্রল করে শহরে ঢুকতে শুরু করলো। প্রচণ্ড প্রতিরোধের মধ্যেও তা এগিয়ে চললো। বেচলা ডোবার একটু পর পাকসেনারা রেল লাইন পার হয়ে থানার মোড়ে পৌঁছালো। হতাশ হয়ে গেলাম এবার বগুড়ার পতন নিশ্চিতপ্রায়। জলিল বিড়ি ফ্যাক্টরীর পিছনে একটি ছোট বাড়ীতে ছাত্রলীগের সামাদ, মাসুদ, সৈয়দ কেরামত আলী গোরা আমরা কয়েকজন জড়ো হয়েছি। মাসুদকে দেখে একটি ঘটনা মনে হয়ে গেলো। ২০শে মার্চের রাতে মাসুদ এবং মুস্তাফিজুর রহমান পটল আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো স্টেডিয়ামের কাছে তাদের তৈরী বোমার কার্যকারিতা দেখাবার জন্যে। দুটি বোমা ফাটানো হলো। সে কি বিকট আওয়াজ! কিন্তু হতাশ হলো সবাই দেয়ালে একটুও চিড় পর্যন্ত ধরেনি ধ্বনি ধ্বনিসর্বস্ব বোমা।

ঘটনা মনে আসতেই মাসুদের কাছে জানতে চাইলাম সেই বোমা আছে কিনা। সামাদ জানালো ২৩টি বোমা আছে। সামাদ এবং মাসুদ ছুটলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতবোমা দুটো নিয়ে এসে হাজির। বললাম যেমন করেই হোক দত্তবাড়ীর উত্তরে যে কোন জায়গায় রাস্তার ওপর এই বোমা দুটো ফাটাতে হবে। এবং কিছু মুক্তি সেনা কাছাকাছি জায়গায় ফাকা গুলী ছুড়বে এবং সরে পড়বে।

শেখ ইনসান হাজী সাহেবের বাড়ীর উত্তর ধারে বোমা দুটি ফাটানো হলো। সে কী বিকট শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে এলোপাতাড়ি, কিছু একনলা দু'নলা বন্দুকের গুলীর আওয়াজ পেছন থেকে আক্রান্ত হয়েছে ভেবে সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে হানাদার সেনারা ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর দ্রুত পিছু হটে কটন মিলের গেস্ত হাউসে এবং সুবিলের উত্তর পাড়ের ঘাটিতে ফিরে গেলো। সেদিনের মতো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এক অনাড়ি মূর্খ সেনাপতির রণকৌশলে বগুড়া শহর সেদিন পতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলো।

২৮শে মার্চ রাতে সুবেদার আকবরে নেতৃত্বে ৩৯ জন ই;পি;আর এর একটি দল বগুড়া পৌঁছায়। অস্ত্র বলতে তাদের রাইফেল; কয়েকটি গ্রেনেড এবং তিনটি এল;এম;জি। বিনা খবরে ওরা পৌঁছায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সন্দিহান হই। পুলিশ লাইনে ওদের নিরস্ত্র করে নওগাঁয় মেজর নজমুল হকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম। তিনি ই,পি,আরদের কাজে লাগাতে বললেন এবং ৩০শে মার্চ নিজে বগুড়া আসবেন বলে জানালেন।

২৯শে মার্চ। সকাল বেলায় বিস্ময়ে দেখলাম রাতে অন্ধকারে হানাদার পাক সেনা কটনমিলের গেস্ত হাউস ছেড়ে সুবিলের উত্তর পাড়ের ঘাটিতে ফিরে গেছে। নিশ্চই গুপ্তচর মারফত তারা ই,পি,আরদের পৌঁছানোর খবর পায়। সকাল ৯টায় সুবেদার আকবার এবং মাসুদ রেকীকরতে বের হলে। বেলা ১১টায় ইপিআর-এর কয়েকজন একটি এল,এম,জি পাকসেনাদের দিকেমুখ করে কটন মিলের ছাদে বসালেন। বেলা আনুমানিক বারোটায় সময় পাক সেনারা বৃন্দাবনপাড়া প্রাইমারী স্কুলের ঘাঁটি থেকে মর্টারের আক্রমণ শুরু করে। এইবার আমাদের তরফ থেকেও তিনটি এল,এম,জির মুখ দিয়ে পাল্টা জবাব গেলো, সন্ধ্যার সময়ে দুপক্ষের গোলাগুলি বন্ধ হয়। করিম হাওলাদার নামে একজন পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা আহত হন।

৩০শে মার্চ। বেলা ৯টায় জেলা প্রশাসক খানে আলম সাহেব খবর পাঠালেন মেজর নজমুল হক এসেছেন। দেখা হলো মেজর নজমুল হকের সঙ্গে। মাঝারি গড়নের শ্যামল রঙের একহারা চেহারা। সর্বাঙ্গ একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। সংক্ষেপে তার কাগজে সব রিপোর্ট করলাম। শেষে বললাম 'যুদ্ধ করা আমার কাজ নয়। আমি যুদ্ধের কৌশল জানিনে। আজি এসেছেন। এখন দায়িত্ব আপনার'।

মেজর নজমুল মৃদুস্বরে বললেন, “দায়িত্ব আমাদের সকলের। পলিটিক্যাল হাই কমান্ডের নিযুক্ত সর্বাধিনায়ক হিসেবে আপনিই কাজ করবেন। আমি আপনার সাহায্যের জন্য রইলাম।”

অদ্ভুত ভালো লেগেছিলো এই মানুষটিকে। নিরহঙ্কার। কোন দিন ভুলতে পারবো না স্বাধীন বাংলাদেশ তিনি দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অতুলনীয় সাহস বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

৩০শে মার্চ বেলা দশটায় পাকসেনারা মর্টারের প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। মুক্তি সেনারাও পাল্টা জবাব দেয়। বেলা ১টা নাগাদ হঠাৎ পাক সেনারা গোলা বর্ষণ বন্ধ করে।

বেলা আড়াইটায় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী জিন্নাহর বাসায়(নিলিন্দার গ্রামে) হাই কমান্ডের বৈঠক। বৈঠকে আলোচনা শুরু হয়েছে। হঠাৎ উড়োজাহাজের আওয়াজ পাওয়া গেলো। জিন্নাহ এসে খবর দিলো বেশ নীচু দিয়ে দুটো উড়োজাহাজ ছুটে আসছে। একটু পরেই মেশিনগানের গুলীর আওয়াজ এবং তার পর পরই বোমা বর্ষণ শুরু হলো। সবাই বিচলিত হয়ে পড়লাম।

বোমাবর্ষণ বন্ধহবার পর ঘুরে দেখলাম বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কোন লক্ষ্যই আঘাত করতে পারেনি। মুক্তিসেনাদের মনোবল আরো চাঙ্গা হয়ে গেছে। মেজর নজমুল হক সার্কিট হাউসে কন্ট্রোল রুম বসালেন। সন্ধ্যায় শহীদ খোকন পাইকাড় এবং সালাম একটা খাকী ফুলপ্যান্ট এবং খাকী শার্ট তৈরি করে এনে দিলো। তাদের জেদে পরতে হলো তাই। ষোলকলা পূর্ণ হলো যখন তপন এসে একটা রিভলবার ঝুলিয়ে দিলো কোমরে। হাসি পাচ্ছিল। সর্বাধিনায়ক, সেনাপতি, জেনারেল-এ জেনারেল অব ড্রিমল্যান্ড।

৩১শে মার্চ। দিনের বেলা দু’পক্ষই নীরব। খবর এলো ক্যাপ্টেন আনোয়ার এবং ক্যাপ্টেন আশরাফের নেতৃত্বে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে এবং ঘোড়াঘাটে অবস্থান করছেন। ৩১শে মার্চ রাতে অসীম সাহসী সুবেদার আকবরের নেতৃত্বে মুক্তি সেনারা মহিলা কলেজের ঘাটিতে গ্রেনেড চার্জ করলো। পেট্রোলের ড্রামে আগুন ধরিয়ে গড়িয়ে দেয়া হলো পাক সেনাদের ঘাঁটির দিকে। পাক সেনাদের ঘাঁটি থেকে লক্ষ্যবিহীন গুলীর শব্দ শোনা গেলো। তারপর অন্ধকারে মোটর কনভয়ের শব্দ। কিন্তু বোঝা গেলো না। ভোরে দেখা গেলো পাক সেনা বগুড়া ছেড়ে অন্ধকারের মধ্যে রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে গেছে।

১লা এপ্রিল। সকালেই সারা শহর রাষ্ট্র হয়ে গেলো হানাদার বাহিনী পালিয়েছে। সারা শহরে আনন্দের ঢেউ। হরিগাড়ীর গোপন আড্ডা থেকে সার্কিট হাউস কন্ট্রোলরুমে এসেছি। সুবেদার আকবর এসে দাঁড়ালেন। স্যার আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করবো, অনুমতি চাই। কিছু জানি না বুঝি না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, ‘চলুন’।

৩৯জন ইপিআর, ৫০জন পুলিশ বাহিনীর লোক এবং ২০ জন মুক্তিসেনা। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম- এই তিন দিক থেকে ঘেরাও করা হলো। দু’পক্ষ থেকে গুলীবৃষ্টি চলছে। এরই মধ্যে বিমান আক্রমণ শুরু হলো। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে গ্রামের হাজার হাজার লোক টিনের ক্যানিস্তারা পেটাতে শুরু করলো। বোমাবর্ষণ বন্ধ হবার পর আবার কিছুটা এগুলাম। কিন্তু পাক সেনারা অবিরাম গুলী চালিয়ে যেতে লাগলো। অবশ্য তাদের সুবিধে ছিলো। ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে আমাদের একটা ফাঁকা মাঠ পাড়ি দিতে হয়। সেদিন ছিলো দক্ষিণের জোর হাওয়া। গ্রামের লোকদের অনুরোধ জানানো হলো তারা ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ দিক থেকে মরিচের গুঁড়ো ছাড়তে পারে কিনা। ব্যস আর বলতে হলো না। কোথা থেকে এত মরিচের গুঁড়ো ভেসে এলো তা বলা কঠিন। ক্যান্টনমেন্ট-এর ৫০০গজ উত্তরে আমাদের চোখমুখ জ্বলতে লাগলো। বেলা তখন আড়াইটা। আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট সাদা পতাকা উড়লো। আনন্দের আতিশয্যে রাইফেল হাতে লাফিয়ে অসীম সাহসী যোদ্ধা মাসুদ। আর তৎক্ষণাৎ শত্রুর নিষ্ফিণ্ড শেষ বুলেটটি তাকে বিদ্ধ

করলো। শহীদ হলো নির্ভীক সেনা, বগুড়ার এক বীর সেনানী। যুদ্ধে জয় হলো। পাকিস্তানী সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে। বন্দী সেনাদের এবং আটক ট্রাক ভর্তি এম্বুল্যান্স নিয়ে ফিরলাম। কিন্তু চোখের জল বাধা মানছিলো না। মাসুদকে হারিয়ে এলাম চিরদিনের জন্যে। সেদিনই ঘোষণা করেছিলাম আড়িয়ার নাম হবে ‘মাসুদনগর’। রাতে ২১ টি গান স্যালুটের মাঝে মাসুদকে কবরে সমাহিত করলাম। দেখলাম ডাক্তার জাহিদুর রহমানের দু’চোখেও জলের ধারা নেমে এসেছে।

আড়িয়ার ক্যান্টনমেন্ট একজন পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন (ক্যাপ্টেন নূর) সহ ৬৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে। এরমধ্যে ছিল ২১ জন পাঞ্জাবী সৈন্য। জনতার দ্রুত আক্রমণের হাত থেকে এদের রক্ষা করতে পারিনি। জেলখানার তালা ভেঙ্গে ওদের বের করে নিয়ে এসে কুড়ুল এবং বাঁটি দিয়ে কুপিয়ে আমার অনুপস্থিতিতে ওদের হত্যা করে। বাঙ্গালী সৈন্য যারা ছিলো তাদের নজরবন্দী করে রাখা হলো। আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট কিছু চাইনীজ রাইফেল ও গুলী পাওয়া যায়। ৫৮ ট্রাক ভর্তি এম্বুল্যান্স পাই, কিন্তু তা ব্যবহারের অস্ত্র ছিলো না। অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা বললেন, সেগুলো ছিলো ১০৫ গান এবং আর-আর-এর এম্বুল্যান্স।

২রা এপ্রিল। পাবনার এস-পি জনাব সাঈদ এলেন এবং কিছু রাইফেলের গুলি নিয়ে যান। তাঁকে বললাম যেমন করে হোক ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবকে বগুড়া নিয়ে আসতে।

৩রা এপ্রিল। জনাব কামরুজ্জামান, শেখ মনি এবং তোফায়েল আহমদ বগুড়া এসে উপস্থিত হলেন। ডাঃ মফিজ চৌধুরীকে সঙ্গে দিয়ে তাদের সীমান্ত পার করে দেরাব ব্যবস্থা করলাম। জনাব শেখ মনির কাছেই জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধু পাক সেনাদের হাতে বন্দী।

৪ঠা এপ্রিল। বগুড়া আওয়ামী লীগের জনাব আব্দুর রহিম তালুকদার জীপ নিয়ে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে নিয়ে বগুড়া পৌঁছালেন। তার সঙ্গে জনাব আবু সাঈদ এম-পি। মনসুর ভাইকে বিশেষ করে অনুরোধ করলাম যাতে প্রোভিশানাল গভর্নমেন্ট-এর নাম ঘোষণা করেন। মনে আছে একটা সিগারেটের প্যাকেটের সাদা অংশে বি-এস-এফ-এর কর্নেল মুখার্জীকে লিখেছিলাম মনসুর ভাইকে নিরাপদে তাজউদ্দীনের কাছে পাঠানোর জন্যে।

৫ই এপ্রিল। মেজর নজমুল হক বগুড়া এলেন। জেলা প্রশাসক জনাব খানে আলমের কুঠিতে আলোচনা সভা বসলো। মেজর নজমুল হক জানালেন যেমন করে হোক ১০৫ কামান এবং আর-আর জোগাড় করতে হবে। তিনি বললেন হিলিতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার চাটার্জীর সঙ্গে দেখা করতে। তার সঙ্গে আলোচনায় ঠিক হলো, যদি কোন প্রকারে আমরা রংপুর ক্যান্টনমেন্ট দখল করে উত্তরাঞ্চল শত্রুমুক্ত করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানিদের পাল্টা আক্রমণ ঠেকাতে পারবো।

৬ই এপ্রিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি এবং জাহিদুর রহমান হিলি যাই। পশ্চিম হিলিতে গেলে আমাদের দু’জনকে এক প্রকার নজরবন্দী করে রাখে সারাদিন। সন্ধ্যায় জানালো রাত তিনটায় ব্রিগেডিয়ার চাটার্জী আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। রাত তিনটায় ব্রিগেডিয়ার চাটার্জী সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমাদের দু’পেটি ৩০৩ রাইফেলের গুলী দিয়ে বিদেয় দিলেন এবং ১৬ই এপ্রিল হিলিতে তার সঙ্গে আবার দেখা করতে বললেন। জানালেন তিনি ভারত গভর্নমেন্টকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে অস্ত্র সাহায্য করতে অনুরোধ জানাবেন।

৭ই এপ্রিল। প্রায় খালি হাতেই বিকেল বেলা আমি এবং ডাঃ জাহিদুর রহমান হিলি থেকে ফিরলাম। মুক্তিসেনারা সাগ্রহে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলো। কিন্তু আপাতত কোন সামরিক সাহায্য না পাওয়ার কিছুটা হতোদ্যম হলো বলতে হলো। বলতে ভুলে গেছি, ২রা এপ্রিল থেকেই মুক্তি সেনাদের কয়েকটি ক্যাম্প ভাগ করে দিয়ে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছিলাম। করোনেশন স্কুলে একটি ক্যাম্প, সেন্ট্রাল হাই মাদ্রাসার একটি ক্যাম্প এবং জিলা আনসার অফিসের মাঠে একটি ক্যাম্প। ইপিআর বাহিনীর ব্যবস্থা করেছিলাম এডওয়ার্ড পার্কের কম্যুনিটি সেন্টার হলের একে তলায়। কন্ট্রোল রুম শিফট করেছিলাম দোতলায়। বগুড়া সার্কিট হাউসে প্রশাসন

কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। জনাব এম আর আখতার মুকুলকে কেরোসিন , ডিজেল এবং পেট্রোল-এ পারমিট ইস্যু করার দায়িত্ব দেয়া হয়। খালি হাতে ফিরে আসার খবর জেনে মুকুল একান্তে ডেকে নিয়ে বললো, ‘শালা সেরেছে’। এবার আস্তানা গুটাও। পাকিস্তানী খুনীরা এবার তোমার জন্যে ট্যাংক নিয়া আইবো। এদিকে তোমার মুক্তি সেনাদের থামাও। এর কোন শৃঙ্খলা মানে না। এরাই এখন প্রব্লেম। দেখলাম তাই। মুক্তি সেনাদের মধ্যে একদল ভীষণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। এদের নিয়ন্ত্রন রাখাই মুশকিল। তাছাড়া পাকসেনা সরে যেই দলীয় কোন্ডল মাথাচাড়া দিয়েছে। দুষ্কৃতকারীরাও সুযোগ নেবার চেষ্টায় আছে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে শেষ চেষ্টা চালালাম।

৮ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল বিশেষ কোন ঘটনা ঘটালো না। ১৩ই এপ্রিল সিরাজগঞ্জের মহকুমা অফিসার শহীদ শামসুদ্দীন সাহেব দেখা করলেন এবং সিরাজগঞ্জ-নগরবাড়ীর ডিফেন্সের ব্যবস্থাও বগুড়া থেকে করতে অনুরোধ জানালেন।

১৪ই এপ্রিল, হিলি থেকে একটা খবর আসে। যেসব এম্যুনিশন আড়িয়া যুদ্ধে পাওয়া গেছে তার নমুনা নিয়ে অতি অবশ্য হিলিতে দেখা করতে হবে। ১৪ই এপ্রিল রাতে সুবেদার আকবরের নেতৃত্বে মুক্তি সেনার একটি দল নগরবাড়ী প্রতিরক্ষার জন্য পাঠানো হলো।

১৬ই এপ্রিল, জনাব এম, আর, আখতার মুকুল, জনাব আসাদুজ্জামান, মজিবুর রহমান এমপি, ডাঃ জাহিদুর রহমান এমপি এবং দু’জন ইপিআরকে সাথে নিয়ে এম্যুনিশনের নমুনাসহ বিকেল বেলা হিলি পৌঁছে। সেদিন বিকেলেই কর্নেল ব্লিৎস এম্যুনিশনগুলো পরীক্ষা করেন। ঐদিন রাতেই আমাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে কোলকাতা যেতে বলা হয়। ১৭ই এপ্রিল ভোরে আমরা কোলকাতা রওয়ানা হই। ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় লর্ড সিনহা রোডে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ অর্থমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান এবং পার্লামেন্ট সদস্য জনাব আবদুল মান্নান এবং আবদুস সামাদ-এর নিকট বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করি।

২২শে এপ্রিল বগুড়া শহরের পতন ঘটে।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ পাবনা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩। পাবনা জেলায় সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ	প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ*গ্রন্থ	 ১৯৭১

পাবনা শহরে পুলিশ ও জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ*

ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনী ২৫শে মার্চ তারিখে পাবনা শহরে এসে ঢুকে পড়ল। শহরের মানুষ আতঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। শিগগিরই এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে যাবে। তারা মনে মনে এই আশঙ্কা করছিল। কিন্তু সেই ঘটনা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে, সেটা তারা ভাবতে পারেনি। এই তারিখেই ঢাকা শহরে আক্রমণ শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেটা গভীর রাত্রিতে। ওরা ২৫শে মার্চ শেষ রাত্রিতে পাবনা শহরে এসে হামলা করল।

শহর থেকে মাইল চারেক দূরে হেমায়েতপুরের কাছে ইপসিক-এর অফিস। পাক সৈন্যরা সেখানেই এসে ঘাঁটি গেড়ে বসল। তারপর সেখান থেকে কিছু সৈন্য শহরে এসে ট্রেজারী দখল করে নিল। তাছাড়া ২৭ জন সৈন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্র দখল করে বসল। তারা সারা শহরে কারফিউ জারী করে দিয়েছিল।

হামলাকারী সৈন্যরা শহরে এসেই আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এম,এল,এ আমিনুদ্দীন সাহেব ভাসানীপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ডাক্তার অমলেন্দু দাক্ষী এবং আরও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করল। যারা ওদের তাতে ধরা পড়ল, শেষ পর্যন্ত তাদের সবাইকে ওদের গুলির শিকার হয়ে মরতে হয়েছিল। এর কয়েকদিন আগেই শহরের ডি,সি ও এস,পি, স্থির করছিলেন যে শহর আক্রান্ত হলে তাঁরা প্রতিরোধ দেবেন। তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে পুলিশ ব্যারাকের ১০০ জন সশস্ত্র পুলিশও মনে মনে প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়েছিল। যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ এই শহরকে তারা পশ্চিমাদের হাতে ছেড়ে দেবে না। যেটুকু শক্তি আছে, তাই নিয়েই ওদের বিরুদ্ধে লড়াই।

২৭শে মার্চ তারিখে সৈন্যরা পুলিশ ব্যারাকে যায়। এবং পুলিশদের অস্ত্রাগার তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পুলিশরা এতে অসামর্থ্য জানায় এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে ডি,সি,তাদের অস্ত্রাগার সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। তাঁর এই আদেশ কিছুতেই তারা অমান্য করতে পারবে না। এই নিয়ে দু'পক্ষে প্রথমে বাক-বিতণ্ডা এবং পরে গুলিবর্ষণ চলে। তখন বলা শেষ হয়ে এসেছে। এই যুদ্ধে তিনজন সৈন্য মারা যায়। পাক সৈন্যরা বাহাদুর পুলিশ ভাইদের হাতে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে পিছিয়ে গেল। কিন্তু এ শিক্ষাও ওদের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি। সেই রাত্রিতে তারা নতুনভাবে আক্রমণ করবার জন্য তোড়জোড় চালাতে লাগল। রাত যখন সাড়ে চারটা তখন ওরপা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে অতর্কিতে পুলিশ ব্যারাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু পুলিশ ভাইয়েরাও আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। সৈন্যরা যে আবার ফিরে এসে আক্রমণ করবে সে বিষয়ে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এবার আর ব্যারাকে নয়, ব্যারাক ছেড়ে নিকটবর্তী বাড়িগুলির ছাদে এবং পথের মোড়ে মোড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আড়াল নিয়ে হামলাকারী শত্রুদের জন্য বাঘের মত ওত পেতে বসে ছিল। তারা তো ছিলই, জেলখানার পুলিশ ভাইয়েরাও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। এইভাবে সারাটা রাত তারা শত্রু জন্মে মৃত্যু-ফাঁদ সাজিয়ে বসে ছিল। রাত সাড়ে চারটার সময় দু'পক্ষ সংঘর্ষ ঘটল। সৈন্যদের পরিবর্তে পুলিশরাই প্রথম আক্রমণ করল। এইভাবে অতর্কিত চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে ইয়াহিয়ার সুশিক্ষিত সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে গেল। এই সংঘর্ষ ২১ জন সৈন্য নিহত হবার পর বাকী সৈন্যরা উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালাল। পুলিশদের মধ্যে একজনও মারা যায়নি। সাবাস! পাবনার পুলিশ ভাইয়েরা।

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' গ্রন্থে 'পাবনার মুক্তিযোদ্ধা' শীর্ষক অংশ থেকে সংকলিত।

২৭শে মার্চ তারিখে পাবনা শহরের বুকে এ লড়াই শুরু হয়েছিল। ২৭শে থেকে ২৯শে, এই তিন দিন ধরে লড়াই চলল ২৬শে আর ২৭শে এই দুইদিন ওরা শহরের উপর কারফিউ জারী করেছিল। তা সত্ত্বেও ঐ অবস্থাতেই শহরের যুবক ও ছাত্ররা ২৬শে মার্চ সারাদিন আর সারারাত প্রতিরোধের জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। ঐ একটি দিনের মধ্যে তারা বেশ কিছু অস্ত্র হাত করে নিয়েছিল। সেই একটি দিনে কারফিউ আইন ভঙ্গকারীদের মধ্যে ৮/১০ জন সৈন্যদের গুলিতে মারা গিয়েছে, কিন্তু প্রতিরোধকারীদের মনোবল তাতে একটুও ভঙ্গে পড়েনি।

পাবনা শহরের প্রতিরোধের ব্যাপারে ডি,সি-র প্রথম থেকেই সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আওয়ামী লীগের নেতা আমজাদ সাহেব আর তিনি মিলিটারীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার জন্য ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করে চলেছিলেন। তাঁরা দুইজন চর-অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে তাদের উদ্ধুদ্ধ করে তুলেছেন। মানুষ ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়েই ছিল। তাঁদের এই আহবানে উৎসাহিত হয়ে দলে দলে কৃষক এই হামলাকারী শত্রুদের খতম করে দেবার জন্য শহরের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

২৮শে মার্চ। ২৭ জন সৈন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে নিয়ে পাহারা দিয়ে চলেছিল। চরের কৃষকরা ছুটে ছুটে এসে তাদের ঘেরাও করে ফেলল। তাদের হতে লাঠিসোটা, বর্শা-বল্লম ধনুক, তীর-ধনুক আরও কত রকমের হাতিয়ার। ব্যারাক থেকে সকল পুলিশ চলে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তাছাড়া শহরের যুবক ও ছাত্ররা দলে দলে ছুটে এসে তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত জনতা প্রায় ১৫ হাজারে এসে দাঁড়াল। তাদের গগনবিদারী জয়ধ্বনিতে সারা শহর কেঁপে উঠল, থরথরিয়ে কেঁপে উঠল অবরুদ্ধ পাক সৈন্যদের মন। এবার দু'পক্ষে গুলিবর্ষণ চলল। সৈন্যদের হাতে মেশিনগান ও উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। পুলিশরা শুধু রাইফেল নিয়েই লড়ছিল। জনতার মধ্যে যাদের হাতে বন্দুক ছিল, তারাও সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। সৈন্যরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুরক্ষিত আশ্রয়ে থেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল। কাজেই সংখ্যায় কম হলেও তাদের খতম করে ফেলা সহজ কাজ ছিল না-ওদের মেশিনগানের অবিরল গুলিবর্ষণকে ভেদ করে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া জুলন্ত অগ্নিকুন্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতই দুঃসাহসের কাজ। সেই কারণেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। হাজার হাজার জনতা এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোন কার্যকর সাহায্য করতে না পারলেও তাদের আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি পাক-সৈন্যদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে তুলেছিল। তারা হতবুদ্ধির মত হয়ে গিয়েছিল। তাই উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র হাতে থাকলেও তারা তাদের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারেনি। এমনভাবে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে এক এক করে তাদের ২৭ জনই মারা গেল। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্র মুক্তিবাহিনীর হাতে এসে গেল।

জয়োল্লাসে মেতে উঠল সারা শহরের মানুষ। বুড়ো থেকে বাচ্চারা পর্যন্ত আনন্দধ্বনি করতে করতে ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে সমস্ত সৈন্য ট্রেজারী ও শহরের অন্যান্য জায়গায় মোতায়ন ছিল মুক্তিবাহিনীর প্রতি-আক্রমণের সূচনাতেই তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নিহত হয়েছে, বাকী সবাই পালিয়ে গিয়েছে। সারা শহরের পথে পথে জনতার বিজয় মিছিল চলছে।

শহর থেকে শত্রুসৈন্যরা নিহত ও বিতাড়িত হলেও শহর বিপদমুক্ত নয়। শহর থেকে মাইল চারেক দূরেই ইপসিক-এর অফিস বাড়িতে শত্রুসৈন্যরা মূল বাহিনীর অধিকাংশ ঘাটি করে বসে আছে। তাদের সংখ্যা দেড়শতের মত। সংখ্যার দিক দিয়ে যাই হোক না কেন অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী। শহরকে বাঁচাতে হলে তাদের রাহুগ্রাস থেকে শহরকে মুক্ত করতে হবে। একটু কথা মনে রাখতে হবে, যে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে যারা উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে, পাবনা জেলায় সেই ইপিআর বাহিনীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। পুলিশ ভাইয়েরাই এখানকার একমাত্র সশস্ত্র যোদ্ধা কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে তারা খুবই দুর্বল। হামলাকারী পাক সৈন্যদের মূল ঘাঁটি থেকে হটিয়ে দেয়া তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এক্ষেত্রেও জনতাই সামনে এগিয়ে এল।

পাবনা শহরের লড়াইয়ের খবরটা শহরের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বাইরে গ্রামাঞ্চল থেকে বিভিন্ন কৃষক সমিতির লোকেরা শহরকে শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে আসছিল। তারা দলে দলে এসে শত্রুপক্ষের মূল ঘাঁটিকে ঘেরাও করে ফেলল। রাত্রির অন্ধকারে ঘটনাটা এমন দ্রুতভাবে ঘটে গিয়েছিল যে, ওরা কৃষক- জনতার এই অবরোধ থেকে বেরিয়ে পড়বার মত সময় বা সুযোগ পায়নি। পুলিশ ভাইয়েরাও এ আক্রমণে কৃষকদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল। তারা শত্রুপক্ষের মেশিনগানের পাল্লার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ দিয়ে চলেছিল।

অবরোধকারীদের প্ল্যান ছিল এই যে, তারা এইভাবে দিনের পর দিন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিয়ে ওদের না খাইয়ে মারবে। কৃষক জনতার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে প্রায় কুড়ি হাজারে এসে দাঁড়াল। মুক্তিবাহিনীর এই বিরাট সমাবেশের দিকে তাকিয়ে এবং তাদের উন্মত্ত গর্জন শুনে অবরুদ্ধ পাক সৈন্যরা এগিয়ে এসে আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছিল না। দু'পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রক্ষা করে গুলি বিনিময় করে চলেছিল।

সময়ের সাথে সাথে অবরোধকারীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। ওদের দিকে তাকিয়ে পাক সৈন্যরা এটা নিশ্চতভাবে বুঝে নিয়েছিল যে এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যুহ ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই তারা বেতারযোগে ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত অবস্থাটা খুলে জানাল। জানাল। জানার যে, তাদের জীবন বিপন্ন, অবিলম্বে সাহায্য দরকার।

খবর পাঠাবার কিছুকাল বাদেই আকাশে জেট বিমানের ঘোর গর্জন শোনা গেল। শব্দ শুনে চমকে উঠে সবাই উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেই বিমান সমস্ত অঞ্চলটা প্রদক্ষিণ করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। একটু বাদেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শব্দ। সেই হিংস্র যন্ত্র-দানবটা জনতার ভীর লক্ষ্য করে একর পর এক বোমা ফেলে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ চীৎকার আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। শুধু বোমা ফেলা নয়, প্লেনটা মাঝে মাঝে বাজপাখির মত ছোঁ মেঝে নীচে নেমে আসছে, আর এক এক পশলা মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে চলে যাচ্ছে। বোমারু বিমানের এই অতর্কিত আক্রমণে কিছুসংখ্যক লোক হতাহত হোল, জনত ইতস্তত ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে লাগল। অবরুদ্ধ পাক-সৈন্যরা এই সুযোগে অবরোধের বেড়া ভেঙে উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু তাদের সঙ্গী সবাই পালিয়ে যেতে পারেনি। অবরোধ ভেঙে গেলেও মুক্তিবাহিনীর একদল সশস্ত্র যোদ্ধা তখনও তাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। কিছুসংখ্যক সৈন্যকে হতাহত অবস্থায় রণক্ষেত্রে ফেলে রেখে অবশিষ্ট পাক বাহিনী এই মৃত্যুর ফাঁদ থেকে পালিয়ে বাঁচল।

এইভাবে শত্রুসৈন্যদের বিতাড়িত করে জয়োন্মত্ত কৃষক-জনতা উল্লাসধ্বনি করতে ফিরে এল। মুক্ত নগরী পাবনা উৎসবমুখর হয়ে উঠল। কিন্তু পরদিন এই উৎসবের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে বিষাদের এক কালো ছায়া নেমে এল। এই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ সাহেব ২৯শে মার্চ তারিখে হঠাৎ করোনারী প্রস্রসিস রোগে মারা গেলেন। এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধাবস্থায় কঠিন পরিশ্রম ও দারুণ উত্তেজনাই তাঁর এই অকালমৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। একথা বললে ভুল হবে না যে, পাবনা শহরের মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন, আমজাদ সাহেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের এইখানেই ইতি নয়। বিতাড়িত পাক-সৈন্যরা তাদের ইপসিকের ঘাঁটি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালল বটে, কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। উদভ্রান্ত ও দিশেহারা পলাতক সৈন্যদের পালাবার পথে পর পর দু'বার -প্রথম দাশুরিয়া পরে মুলাডুলিতে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল। এই দুই জায়গাতেই প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটেছিল। দুই সংঘর্ষের ফলে অবশিষ্ট পাকবাহিনীর প্রায় সবাইকেই প্রাণ দিতে হলো, কেবলমাত্র চারজন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

সিরাজগঞ্জ এলাকার সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মোজাফফর হোসেন

২৫-০৮-১৯৭৩

২৫শে মার্চের ঘটনা। রাত একটার দিকে মহকুমা প্রশাসক জনাব শামসুদ্দিন সিএসপি (শহীদ) আমাকে সংগ্রাম পরিষদে জানালেন, পুলিশ, আনসার বাহিনীর যত অস্ত্র আছে সব তোমাদের জন্য দেব প্রতিরোধের জন্য।

২৬শে মার্চ বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। ছুটি ভোগরত পাক বাহিনীর সেনা আনসার, পুলিশ, ছাত্র, সাধারণ লোক, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সব মিলে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় অস্ত্র রাইফেল, বন্দুক টু-টুবোর রাইফেল নিয়ে যুদ্ধে নামা হয়।

বগুড়ার আড়িয়ার বাজারে আগে থেই পাক ঘাঁটি ছিল। মার্চে মাসের শেষের দিকে সাধারণ লোক সামান্য অস্ত্র নিয়ে পাক-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৩০ জনের মত পাকসেনা ছিল। আকাশে থেকে বিমান আক্রমণ চালায় পাকবাহিনী। ওদের গুলী এসে লাগে। গোলার ডাম্প তাতে আগুন লেগে বিমান বাহিনীর গুলীতেই বেশ পাকসেনা খতম হয়। তারপর জনসাধারণ ঢুকে পড়ে অনেককে আত্মসমর্পণ করায়, অনেককে হত্যা করে পিটিয়ে।

আমি এবং এসডিও শামসুদ্দিন সাহেব এদিন বগুড়া গিয়ে সেখানকার মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সমঝোতা করে কিছু অস্ত্র এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ২০ জন এবং ইপিআর-এর প্রায় ৩০ জন নিয়ে সিরাজগঞ্জ চলে আসি। তখন আমাদের কাছে ছিল চাইনিজ রাইফেল ৭টি, মার্ক-৪৬টি, রাইফেল ৫/৬টি।

২৬শে মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। তখন আমাদের খাওয়া, থাকা, বেতন, দেওয়া যাবতীয় ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ করতে থাকে।

সিরাজগঞ্জ যমুনার পড়ে আমরা ৬/৭টি ছোট ধরনের কামান পেতে রাখি, যার দূরত্ব এক মাইলের মত। এই কমানগুলি তৈরি করেছিল আমাদের স্থানীয় লোক আবুল মিন্ত্রী।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর পেলাম টাঙ্গাইলের ঘাটে ৭টি লঞ্চ গেছে পাক বাহিনীকে নিয়ে যাবার জন্য। আমি তিনজন ছেলে এবং কিছু অস্ত্রসহ স্পীডবোট নিয়ে টাঙ্গাইল ঘাটে পৌঁছে ফাঁকা আওয়াজ করে সারেংদের আটকিয়ে ১১টি লঞ্চসহ সিরাজগঞ্জ ফিরে আসি।

বাঘাবাড়িতে প্রতিরোধঃ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রায় ১৫০ জন ছেলসহ আমি বাঘাবাড়ী ঘাটে ডিফেন্স দিই। আমার সাথে লতিফ মীর্জা, গোলাম কবরিয়া, সোহরাব হোসেনও ছিল। পরদিন ইপিআর, আনসার, পুলিশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে প্রায় ১০০ জন যোদ্ধা আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন এসডিও সাহেব।

বাঘাবাড়ীতে নদীর পাড়ে ২ মাইলব্যাপী ২০০ গজ পরপর পাকা মরিচা খনন করে সেখানে ডিফেন্স নিয়ে থাকি। তার পরদিন এসডিও সাহেব নিজে আমাদের ডিফেন্স আসলেন প্রায় ৫০ জন ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক নিয়ে।

আরিচা ঘাট রক্ষা করার জন্য প্রায় ১০০ জন বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর বাহিনীর লোক নিয়ে আমি এবং এসডিও সাহেব অগ্রসর হই। কাশিনাথপুর পৌঁছালে শুনলাম আরিচার পতন ঘটেছে। তখন আমরা কাশিনাথপুরে জঙ্গলের ভিতর আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করি। ওখান থেকে ১০ মাইলের মধ্যে পাক ঘাঁটি আছে।

* বাংলা একাডেমির দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত।

শুনলাম (গ্রামের নাম মনে নেই)। এসডিও শামসুদ্দিন সাহেবের কমান্ডে আমরা ১০০ জন তিন ভাগে ভাগ হয়ে পাক ঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিই। একদল আক্রমণ চালাবে, একদল গাড়ী ধ্বংস করবে এবং একদল ব্রিজ ধ্বংস করবে একই সময়ে। আমরা আক্রমণ করি রাত ২ টার দিকে। একই সাথে ব্রিজ ধ্বংস, ৫টি ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত এবং ১৯ জন পাকসেনা খতম হয়েছে শুনলাম। পরদিন ভোর বেলা আমরা ফিরে আসি। আমাদের একজন ইপিআর জোয়ান গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। তাকে সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই।

এপ্রিল মাসের ২৫তারিখের দিকে এসডিও সাহেব ফিরে আসলেন বাঘাবাড়ী ঘাট থেকে। তিনি আবার গেলেন বাঘাবাড়ী ঘাটে। আমিও গেলাম এসডিও সাহেবের সাথে। তার পরদিন পাকবাহিনী দুপুর ১টার দিকে হঠাৎ করে কাশীনাথপুর ক্যাম্প আক্রমণ করে। একজন হাবিলদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ক্যাম্পের। আমাদের জোয়ানরা বিশ্রাম করছিলো, ঠিক এসই সময় শত্রুরা মর্টার আক্রমণ চালায় চারদিক থেকে। ৩০/৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা ওখানে শহীদ হয় বাকিরা পালিয়ে যায় অস্ত্র ফেলে। পাকসেনারা আমাদের প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে। আমি ১৫ জন উদ্ধার কর্মী নিয়ে পরদিন চারদিকে খুঁজতে লাগলাম আমাদের বাহিনীর লোকদের। ২ জন আহত বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ৮/১০ জন অন্যান্য জোয়ান নিয়ে বাঘাবাড়ী ঘাটে চলে আসি। আমাদের ডিফেন্স আরও জোরদার করি।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে লতিফ মীর্জাকে বাঘাবাড়ী ঘাটের দায়িত্ব দিয়ে আমি এবং এসডিও সাহেব অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারতে যাই। সিদ্ধান্ত হয় ৪ কোটি টাকার অস্ত্র কেনা হবে। পশ্চিম দিনাজপুরে ভারতীয় কর্নেলের সাথে দেখা করেন আমাদের এসডিও সাহেব। যাবার পথে হিলি সীমান্তে ক্যাপ্টেন আনোয়ার আমাদেরকে খুব বেশী অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পাবেন না জানান। তারপরই আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দিনাজপুর যাই। এসডিও সাহেব অস্ত্র কিনতে চান। কর্নেল সাহেব জানান, এভাবে অস্ত্র বিক্রী করা যায় না। এসডিও সাহেবের না-খাওয়া, নান্নান অবস্থা অহোরাত্র চিন্তায় মাথা প্রায় খারাপ ছিল। তাই কর্নেল সাহেব অস্বীকার করলে এসডিও সাহেব খুব রাগারাগি করেন। বাকবিতণ্ডা হয়। কর্নেল সাহেব পাক স্পাই মনে করে আমাদের দু'জনকে বন্দী করেন। আমি কোনরকমে খবর পাঠিয়ে কংগ্রেসনেতা এবং ছাত্রনেতার কাছে আমাদের অবস্থা জানাই। ছাত্রনেতা এবং কংগ্রেস এমপিদের প্রচেষ্টায় আমরা মুক্তি পাই। তারপর ফিরে আসি বাঘাবাড়ী ঘাটে।

ফিরে শুনলাম সিরাজগঞ্জ বাঙ্গালী-বিহারী মারামারি হয়েছে। বিহারীদের নিরাপত্তার জন্য এসডিও সাহেব সকল বিহারীকে গ্রেফতার করে জেলখানাতে নিয়ে আসেন। এসডিও সাহেব ও আমি বাঘাবাড়ী ঘাটে ফিরে যাই আবার।

মে মাসের ২০তারিখের দিকে বাঘাবাড়ী নদীর অপর পারে পাক বাহিনী বাংকার করা শুরু করে। আমরা আক্রমণ করি। ক্রমাগত চারদিন পর তারা বিমান হামলা চালায় আমাদের উপর।

২৩/২৪ তারিখের দিকে আমরা পিছু হটে উল্লাপাড়া চলে আসি। আমরা প্রায় ১৫০ জন ছিলাম তখন। বাকি বাহিনীকে সিরাজগঞ্জে পাঠানো হয়। আমরা মোট প্রায় ৪০০ জন ছিলাম।

আমরা উল্লাপাড়া থেকে ২/৩ দিন রাতে অকস্মাৎ বাঘাবাড়ী ঘাটে পাক বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে পালিয়ে যেতাম।

ঘটনা প্রতিরোধঃ মে'র ২৫ তারিখে পাক বাহিনী উল্লাপাড়া আক্রমণ করলে আমরা ঘটনা (সলপ) ব্রিজে আসি। আমরা সলপ স্কুলে আশ্রয় নিই। এসডিও সাহেব এবং লতিফ মীর্জা আমাদের সাথে। ওখান থেকে ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকেরা বলে, “আমরা শেষ পর্যন্ত মারা যাবো, শেষবারের মত স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের দেখতে দিন।” এসডিও সাহেব প্রত্যেককে ২০০/৩০০/১০০ টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক মহিউদ্দীন আমাদের ছেড়ে গেলেন না।

শেষ সময় আমরা ১০০ কজন ছিলাম ঘাটনাতে। এসডিও শামসুদ্দিন সাহেব নিজে কমান্ডিং অফিসার। ৪/৫ দিন আমরা না খেয়ে।

সিদ্ধান্ত হয়, এসডিও সাহেব ৪০ জন ছেলে নিয়ে অস্ত্রসহ সিরাজগঞ্জ যাবেন সিরাজগঞ্জ রক্ষার জন্য। এখানে ২০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আমরা ৫০/৬০ জন থাকবো ঘাটনাতে। পাক বাহিনীকে বাধা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ এসে শেষযুদ্ধ হবে। সেই মত এসডিও সাহেব চলে যান। আমি, লতিফ মীর্জা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদেও সাধারণ সম্পাদক সামাদ থাকলো ঘাটনাতে। আমি এবং লতিফ মীর্জা ১০ জনের খাবার যোগাড় করে ঘাটনা ব্রীজে রওনা হই। কারণ ওখানে আমাদের নেতৃত্বে ১০ জন যোদ্ধা ছিল পাহারায়। আমরা খাবার পৌঁছলে দেখতে পেলাম একটি ট্রেন আসছে ঈশ্বরদী থেকে। আমাদের খাওয়া হলো না। খাবার পাঠিয়ে দিয়ে আমরা ১২ জন দু'দিকে ডিফেন্স নিই। আমাদের ২টি এলএমজি এবং ১০টি চাইনিজ রাইফেল ছিল। ট্রেন ব্রিজের কাছে আসলে দেখলাম গাড়ীটি পাকসেনাতে ভর্তি। ওর মইন সরাচ্ছে আর অগ্রসর হচ্ছে। পাক-সেনারা নেমে এখানে-ওখানে ঘোরাফিরা করছে। মিস্ত্রীরা লাইন সারছে। ক্রমশ ৪০/৫০ জন পাকসেনা ব্রিজের এক স্থানে একত্রিত হতে থাকে। পাকসেনাদের সাথে বেসামরিক পোশাকে অনেক বিহারীকে দেখলাম। ৪০/৫০ জন একস্থানে হলে আমি ফায়ার ওপেন করতে বলি; সাথে সাথে ১০টি চাইনিজ রাইফেল ও ২টি এলএমজি গর্জে ওঠে। ক্রস ফায়ারের সাথে সাথে সবকটি সৈনিক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বাকিরা সব ট্রেনে উঠে ট্রেনটি পিছনে নিয়ে গিয়ে অনবরত মেশিনগান এবং মর্টার দিয়ে বৃষ্টির মত গোলা ছুড়তে থাকে। ৩ ঘণ্টা গুলি ছোড়ার পর আমরা জঙ্গল থেকে বের হই। আমরা ক্লোজ রেঞ্জে থাকায় আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ১ মাইল দূরে যে আমাদের ক্যাম্প ছিল সেখানে গোলা পড়ায় আমাদের ছেলেরা সব পালিয়ে যায়-মনে করে আমরা সব মারা গেছি। রাতে কিছুদূর এসে দেখলাম যে বাইনোকুলার ফেলে এসেছি। ১০ জনকে রেখে আমি এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের মহিউদ্দীনকে নিয়ে ঘাটনা ব্রীজে যাই বাইনোকুলার খুঁজতে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম একটি নৌকা করে কিছু পাকসেনা পার হচ্ছে। কৌতূহল বশে বাইনোকুলার খোঁজা বাদ দিয়ে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কি হয় দেখার জন্য। দেখলাম ৪ জন পারে নামলো। অকস্মাৎ অন্ধকারে তারা হারিয়ে যায়। আমরা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর পাতার মচমচ শব্দ শুনতে পেলাম এবং ছায়ার মত আমাদের দিকে আসছে দেখলাম। আমাদের হাতের দুটি চাইনিজ এসএমজি একসাথে গর্জে ওঠে। পতনের শব্দ পেলাম। পাল্টা কোন গুলি হয় না, বুঝলাম সব খতম। তার পরপরই নদীর অপর পার থেকে বাঁক বাঁক গুলি আসতে লাগলো। আধ ঘণ্টা পর গুলি বন্ধ হলে ক্রলিং করে পালিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে এসে আর সব সাথীদের সাথে মিলিত হই। ক্যাম্প এসে শুনি আমাদের ছেলেরা সব পালিয়েছে। লোকজন অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে, জিনিসপত্র লুট করেছে। নাম সংগ্রহ করে চারজনকে ধরে গুলি করে হত্যা করা হয়। পাক বাহিনী ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালায়-দু ঘণ্টা ধরে বৃষ্টির মত মর্টার ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে গুলি চালায়। গুলি বন্ধ হলে আমরা পালিয়ে সিরাজগঞ্জের দিকে রওনা হই।

শাহজাদপুরসহ অন্যান্য স্থানের সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ আবদুর রহমান, প্রাক্তন গণপরিষদ সদস্য

১২-১১-১৯৭৩

২৫মে মার্চ দিনগত রাত দুটোর সময় শাহজাদপুর থানার ওসি আমার কাছে একজন পুলিশ পাঠিয়ে সংবাদ দেন যে, “ঢাকায় সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ হয়েছে এবং ইয়াহিয়া কানকে বন্দী করে রাওয়ালপিন্ডি পাঠিয়েছে। আপনি অবিলম্বে থানায় এসে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে কর্তব্য নির্ধারণ করুন।” আমি ভেবে দেখলাম এ সংগ্রামের কেবল শুরু-অনেকদিন চলবে। কাজেই উত্তেজিত না হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। থানায় গিয়ে দেখি

অনেক আওয়ামী লীগ কর্মীও এস গেছেন। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হোল, আমাদের প্রথম কাজ যোগাযোগের ব্যবস্থা বন্ধ করা। সেই অনুযায়ী বাঘাবাড়ীর ফেরী বন্ধ করার দায়িত্ব দিয়ে আবুল হোসেন চৌধুরীকে পাঠানো হোল। আমি উল্লাপাড়া ও তার পরবর্তী এলাকার কাজকর্ম তদারক করার জন্য মোটর সাইকেলযোগে সেদিকে রওনা দিলাম। উল্লাপাড়ার জনপ্রতিনিধি (এম-পি-এ) এলাকায় অনুপস্থিত থাকেন এবং রায়গঞ্জ থানার প্রতিনিধিও তাড়াশে থাকেন বিধায় ঐ এলাকার জরুরী দায়িত্ব পালক কর্তব্য মনে করে আমি ঐদিকে রওনা দিই। প্রথমে আমি সরাসরি রায়গঞ্জ থানায় যেতে চাই। কিন্তু ঐ এলাকার রাস্তার বড় বড় গাছ থাকায় রায়গঞ্জ থানা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব না হওয়ার জন্য কিছু আওয়ামী লীগ কর্মীর সঙ্গে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে কর্তব্য নির্ধারণ করে ফিরে আসি। উল্লাপাড়া থানার এসে সেখানকার কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে ফিরে আসি। আমার এই কয়েক ঘন্টার সফরে জনসাধারণের যে আন্তরিকতা দেখেছি তার তুলনা হয় না।

সম্ভব ২৯/৩০ মার্চ আমি বঙ্গবন্ধুর শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনামা পাই। আমি এটি অনুবাদ করার ও ছাপানোর ব্যবস্থা করি। ছাপানোর দায়িত্ব এককালীন কনভেনশন লীগ নেতা ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ও পরবর্তী কালের জেলা শান্তি কমিটির প্রধান মৌলানা সাইফউদ্দিন ইয়াহিয়া সাগ্রহেই নিয়ে ছিলেন ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন।

এই সময়ে ‘শাহজাদপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করা হয়। শাহজাদপুরের আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ কর্মীদের ও সরকারী কর্মচারীদের মিলিত সভায় সাতজন সদস্য সমবায়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। আমি ঐ সভায় সভাপতিত্ব করি এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদেরও সভাপতি নির্বাচিত হই। এই কমিটির সদস্যগণ ছিলেনঃ (১) জনাব আবদুর রহমান (এম,পি,এ)-সভাপতি (২) জনাব আবদুল লতিফ খান (৩) জনাব আবুল হোসেন চৌধুরী (৪) তাহাজ্জাদ হোসেন (অধ্যক্ষ) (৫) বাবু ননী-গোপাল সাহা (৬) সি-আই, পুলিশ স্টেশন, (৭) ও-সি, পুলিশ স্টেশন।

শাহজাদপুরে স্বাধীনতা যুদ্ধের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব এই কমিটির উপর থাকলেও অন্যান্য অত্যন্ত জরুরী কাজের জন্য কয়েকটি উপ-কমিটিও গঠন করা হয়। খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া ছিল ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগ দলীয় এম,এল,এ জনাব আবু মোহম্মদ ইউনুস সাহেবের উপর। টাকা-পয়সা সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল বাবু বিনোদবিহারী জোয়ারদারের উপর। প্রচারের দায়িত্ব ছিল জনাব আব্দুল গফুর সবারতের উপর।

আমরা প্রথম থেকেই আমাদের অস্ত্রের অপ্রতুলতার কথা জানতাম। ইতিমধ্যে সংবাদ পেলাম যে বগুড়ার নির্মীয়মাণ ক্যান্টনমেন্ট ওখানকার মুক্তিযোদ্ধারা দখল করেছে। আমি রেডার জনপ্রতিনিধি এম-এন-এ জনাব আবু সাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উভয়ে কয়েকজন কর্মীসহ বগুড়া গেলাম। এটা এপ্রিলের ৪ তারিখ। ওখানে গিয়ে ঐদিন লোক ও অস্ত্র না পেয়ে আমাদের কর্মীদের চান্দাইকোনা রেখে আমি ও আবুল চৌধুরী ফিরে এলাম। এলাকার কাজের জন্য আমাকে ফিরে আসতে হোল। আমি ফিরে এসে নগরবাড়ী এলাকার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা দেখতে গেলাম। কারণ ঐ সময় নগরবাড়ী রক্ষা করা না গেলে আমাদের বাঘাবাড়ীতে রক্ষার প্রচেষ্টার কোন মানেই থাকবে না। নগরবাড়ীতে কোন জনপ্রতিনিধি না থাকায় আমার পক্ষে ও স্থানের কাজকর্ম বাদ দিয়ে আসা সম্ভব হোল না।

নগরবাড়ীতে আমি নিয়োজিত থাকায় বগুড়াতে আমি না যেতে পেরে আবুল চৌধুরীকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠালাম। সেখান থেকে আমাদের খুব সামান্য অস্ত্রই দেয়া হয়েছিল। যাই হোক নগরবাড়ীতে আমাকে এবং ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) নজমুল হুদাকে সব সময় একসঙ্গে পরামর্শ করেই কাজ করতে হোত। পাবনা থেকে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা এসেছিল। আমি ও ক্যাপ্টেন হুদা প্রথমেই স্পীডবোট নিয়ে সমস্ত নদী এলাকা ঘুরে দেখলাম। দেখলাম যে, পাক-বাহিনী নগরবাড়ীতে সরাসরি না এসে নগরবাড়ীর ৮/৯ মাইল দক্ষিণ দিক দিয়েও

পার হয়ে নগরবাড়ী-পাবনার পাকা রাস্তায় উঠতে পারে। আমরা সেজন্য ঐ সমস্ত এলাকায় গিয়ে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে আসি।

৯ই এপ্রিল বেলা ৪টার দিকে পাক-বাহিনী বিমান আক্রমণ করে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কয়েকজন আহত হয়। বিমান আক্রমণের কথা আমরা এতটা ভাবি নাই। সতর্কতার কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, পাবনা গিয়ে আমি ও ক্যাপ্টেন হুদা মেশিনগান নিয়ে আসি। পরে দেখা গেল তার পিন ভাঙা। এর দুই দিন আগে ঈশ্বরদী থেকে একটা হাত-সাইরেন আনা হয়েছিল। সন্ধ্যার পর দেখা গেল তার এমন একটা পার্টস কেউ ভেঙ্গে রেখেছে যে বাজানো যায় না।

ক্যাপ্টেন হুদা বারে বারেই অস্ত্রের কথা বলছিলেন, কিন্তু পাবনা ও বগুড়া ছাড়া কোথাও আমার চেষ্টা করার জায়গা ছিল না। তৎকালীন ডি-সি জনাব নুরুল কাদের খানের মাধ্যমে চেষ্টা করে কুষ্টিয়া থেকে কিছু আনসার আনা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিনের বিমান আক্রমণের পরই তারা চলে যায়।

পরদিন ১০ই এপ্রিল সকালে আবার বিমান আক্রমণ হয়। ঐদিন আমাদের কেহ হতাহত হয়নি। কয়েকজন গ্রামের লোক মারা গিয়েছিল কিন্তু আমাদের সমস্ত বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে যায়।

বাঘাবাড়ী প্রতিরোধঃ শাহজাদপুর এসে আমি বাঘাবাড়ীতে প্রতিরক্ষা গড়ার চেষ্টা নেই। এই সময় সিরাজগঞ্জে তৎকালীন এস-ডি-ও জনাব জনাব শামসুদ্দিন আসেন এবং যুদ্ধের প্রদান কাজকর্ম তিনি উপস্থিত থেকে করান। তিনি অবশ্য পরে শাহজাদপুরে ছিলেন না, মাঝে মাঝে আসতেন।

নগরবাড়ী থেকে আসার পর আমি বগুড়ার সাথে যোগাযোগ করি। সেখান থেকে বেশ কিছুসংখ্যক ইপিআর আসে। তাদের নিয়ে প্রথমে বেড়া যাই। পরবর্তী সময়ে জনাব শামসুদ্দিনের সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন রাতে আমরা নগরবাড়ীতে অবস্থানরত পাক বাহিনীকে আক্রমণ করার প্রোগ্রাম করি। কিন্তু অনেকের, বিশেষ করে ট্রাক ড্রাইভারের অসহযোগিতার জন্য ঐ আক্রমণ সফল হয় নাই। আমরা নিজেরা প্রায় দুই ঘন্টা ধাক্কিয়েও ট্রাক সচল করতে পারি না। অতঃপর ভীষণ বৃষ্টি ও বাতাসে খেজুরপাতার পাটিতে খোলা ঘরে মাটিতে শুয়ে থেকে ঠান্ডায় যখন হাত-পা হিম হয়ে এসেছিল তখন আমরা কোনক্রমে রাত ৪টায় বেড়া সিএন্ডবি ডাকবাংলোয় চলে আসি। ঘন্টাখানেক পর সমস্ত বাহিনীও বৃষ্টিতে ভিজে ফিরে আসে। আরও কয়েকটি আক্রমণের চেষ্টা আমরা করলেও নানা কারণের জন্য তা সফল হয় নাই।

অবশেষে ১৯শে এপ্রিল পাক বাহিনীই বেড়ার ডাব-বাগানে অবস্থানরত আমাদের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। উভয় পক্ষেই প্রচুর ক্ষতি হয়। পরের দিনই বাঘাবাড়ীতে অবস্থানরত আমাদের সংগৃহীত ও সিরাজগঞ্জের সশস্ত্র বাহিনী ঐ স্থান ত্যাগ করে। তার পরদিন আমার কাছে খবর আসে যে, ডাব-বাগানে আমার পক্ষে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের কবরও দেওয়া হয় নাই। আমি দুজন কর্মী নিয়ে অমনি রওনা দিই। কিন্তু বেড়া পৌঁছার পর ঐ স্থানের কর্মীরা আর আমাদের অগ্রসর হতে দেয় নাই।

২২শে এপ্রিল পাক বাহিনী বাঘাবাড়ীতে এসে শাহজাদপুরকে লক্ষ্য করে শেল মারতে থাকে এবং বাঘাবাড়ী ও শাহজাদপুরের পতন হয়।

মুক্তিপাগল এক সরকারী অফিসার*

তিনি শুধু একজন মহকুমা প্রশাসক বা সিএসপি অফিসারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন অগ্রসেনা, এক নির্ভীক যোদ্ধা। মুক্তি সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রথম ক্ষণেই সিরাজগঞ্জে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুক্তিপাগল এই বীর সেনানী। শুধু সিরাজগঞ্জেই নয়, সারা উত্তরবঙ্গই উত্তাল হয়ে

* দৈনিক বাংলা, ১৫ জানুয়ারী ১৯৭২-এ মনজুর আহমদ প্রদত্ত প্রতিবেদন।

উঠেছিল তাঁর সেই বলিষ্ঠ সংগ্রামী ভূমিকায়। সবাই তাঁকে ভূষিত করেছিল কর্নেল উপাধিতে। সবাই তাঁকে ডাকতো কর্নেল শামসুদ্দিন বলে। নাম ছিল তাঁর এ, কে, শামসুদ্দিন।

শামসুদ্দিন তখন ছিলেন সিরাজগঞ্জের এসডিও। গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার মিথ্যা প্রলোভনে এদেশের মানুষকে মাসের পর মাস সন্দ্বিদ্ধ রেখে সেই পঁচিশে মার্চের যে ভয়াল রাতে পাকিস্তানী হানাদাররা তাদের হিংস্র বিষাক্ত থাবা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গ্রামবাংলার সাড় সাড় কোটি মানুষের ওপর, সেই ঝঞ্ঝা-বিস্ফোরক দিনে এদেশের অসহায় মানুষের পক্ষে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রথম যারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন জনাব শামসুদ্দিন তাদের অন্যতম।

শুধু রুখে দাঁড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি-তিনি রীতিমত গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট সংগঠন। সামান্য মাত্র অস্ত্র সম্বল করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সম্মুখযুদ্ধে। বাংকারে বাংকারে নিপুণ যোদ্ধার মত অস্ত্র হাতে নিয়ে চালিয়েছিলেন লড়াই, শত্রুর সাথে মোকাবিলায় দেখিয়েছেন চমৎকার নৈপুণ্য, দেখিয়েছেন পারদর্শিতা।

বাঘাবাড়ীর প্রতিরোধঃ শত্রুসাহিনীর অগ্রাভিযানের বিরুদ্ধে বাঘাবাড়ীতে যে প্রচণ্ড প্রতিরোধ তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা এক অস্মিরনীয় ঘটনা। হানাদাররা ৯ই এপ্রিল নদী পার হয়ে চারদিকে যখন হত্যা ও ধ্বংসের হাহাকার তুলে এগিয়ে চলছিল উত্তরবঙ্গের শহর-বন্দরের দিকে তখন এই বাঘাবাড়ীতেই তাদেরকে বাধা দেন জনাব শামসুদ্দিন তাঁর সামান্য সামর্থ্য, সামান্য শক্তি নিয়ে। একদিন দুইদিন এভাবে একটানা পাঁচদিন তিনি এই প্রতিরোধ এড়াবার জন্য হানাদার বাহিনী গতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল।

সোজা পথে সিরাজগঞ্জে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে তারা শুরু করেছিল বোমাবর্ষণ। ২৬মে এপ্রিল সিরাজগঞ্জবাসীদের ওপর নেমে আসে হানাদারদের এই বর্বর অভিযাপ। আর এই বিমান হামলারই আবরণে সুযোগ বুঝে ২৭মে এপ্রিল তারা ঢুকে পড়ে শহরে।

জনাব শামসুদ্দিন এই সময়ে চলে যান চর এলাকায়। চর এলাকার অধিবাসীদের নিয়েই তিনি চেষ্টা করতে থাকেন একটি সশস্ত্র দল গঠনের। চেষ্টা করতে থাকেন অস্ত্র সংগ্রহের। এই অস্ত্র সংগ্রহের জন্যেই তিনি ঘুরতে থাকেন এখানে-ওখানে। তিনি যান টাঙ্গাইলে। যোগাযোগ স্থাপন করেন সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে।

আর এই ঘোরাঘুরিই তাঁর কাল হোল। সর্বনাশা মৃত্যু যেন দুই ব্যাগ্র হাত মেলে বসেছিল তাঁকে ছিনিয়ে নিবার জন্য। আর সেই কঠিন মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেবার জন্যেই বুঝি তিনি ঢাকায় এসেছিলেন মে মাসের গোড়ার দিকে। এসেছিলেন তিনি গোপনে। এসেছিলেন কর্তব্যের ডাকে। এ কর্তব্য ছিল তার পরিবারের।

কিন্তু গোপনে এলেও গোপন তিনি থাকতে পারেননি। ১৭ই মে তিনি ধরা পড়ে যান খানসেনাদের হাতে। তার পরের ইতিহাস বর্বর খানসেনাদের নারকীয় নির্যাতনের ইতিহাস। তার পরের ইতিহাস ক্যান্টনমেন্টের একটি ছোট্ট সেলে অমানুষিক নির্যাতনে তাঁর মৃত্যুবরণের ইতিহাস। বাঘাবাড়ী-সিরাজগঞ্জে যিনি ছিলেন খানসেনাদের ত্রাস সেই প্রতিভাধর তরুণ বাঙ্গালী অফিসারকে হাতের মুঠোয় পেয়ে বুঝি উল্লাসে নেচে উঠেছিল হানাদারদের চোখ।

অত্যাচার-নির্যাতনে অর্ধমৃত জনাব শামসুদ্দিনের ওপর শেষবারের মতই তাদের আক্রোশ মিটিয়ে নেবার জন্যেই বোধ হয় ২৯শে মে বিকেলে সেলের ভেতরে তার ওপর লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল মেজর সরফরাজের জ্বলদা দল-ক্র্যাক পার্টিকে। নিষ্ঠুর এক পৈশাচিকতা নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জনাব শামসুদ্দিনের ওপর। মৃত্যুপথযাত্রী এই অসহায় মানবসন্তানের ওপর তারা তাদের আক্রোশ মিটিয়েছিল সর্বশক্তি দিয়ে।

এ অত্যাচার আর তিনি সহিতে পারেননি। মৃত্যুর প্রান্তে পৌঁছে সেলের মধ্যে তাঁরই সাথে আটক সিলেটের এক ভদ্রলোকের কোলে মাথা রেখে তিনি খেতে চেয়েছিলেন এক ফোঁটা পানি।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ বরিশাল-খুলনা-ফরিদপুর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪। বরিশাল-খুলনা-ফরিদপুর জেলায় সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	----- ১৯৭১

সশস্ত্র প্রতিরোধে বরিশাল
সাক্ষাৎকারঃ মেজর মেহেদী আলী ইমাম*

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে আমি আমার বাড়ী মঠবাড়িয়ার দাউদখালীতে ছিলাম। অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত পরিস্থিতি আমি রেডিও থেকে শুনতাম। সব সময় আশংকার মধ্যে ছিলাম পাকসেনারা কখন আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে চলে এল ২৫শে মার্চের কালরাত্রি। রেডিও ও অন্যান্য খবর মারফত বুঝতে পারলাম ঢাকায় এবং অন্যান্য জায়গায় পাক মিলিটারীরা নিরীহ জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি এসব খবর শোনার পর ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় মঠবাড়িয়া থেকে লঞ্চযোগে বরিশালের পথে রওয়ানা হলাম।

২৭শে মার্চ সকাল ১০-১১টায় বরিশাল শহরে পৌঁছলাম। বরিশাল শহর তখন গরম। শহরের ছেলেরা রাইফেল, লাঠি, ব্লুম এবং অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে বরিশাল শহর পাহারা দিচ্ছিল। লোকের মুখে জানতে পারলাম একজন মেজর জলিল এখানে এসেছেন এবং স্থানীয় এম-সি-এ নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের বাসায় কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে এবং সেখানেই মেজর জলিল আছেন। আমি এ খবর পেয়ে বেলা ১২টার সময় নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের বাসায় গেলাম। সেখানে অত্যন্ত ভীড়। ভীড় ঠেলে ভেতরে গেলাম। সেখানে মঞ্জুর ভাই, মেজর জলিল, স্থানীয় এম-সি-এ আমু ভাই, শামসু মিয়া, মহিউদ্দিন ভাই, বারেক (এঁরা সবাই এম-সি-এ ছিলেন) এবং আরো অনেক স্থানীয় ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন। সবাই দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং এ পরিস্থিতিতে কি করা যায় তা ভাবছিলেন। আমি মেজর জলিল, মঞ্জুর ভাই এবং অন্যান্যের সাথে দেখা করলাম। মেজর জলিলের সঙ্গে আমার আগে আলাপ ছিল না। তিনি আমার সম্পর্কে প্রথমে খোঁজখবর নিলেন। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন থানা দখল করে নেবার জন্য।

২৭শে মার্চ রাতে আমরা প্রতিটি থানাতে অয়ারলেসের মাধ্যমে খবর পাঠালাম যেসব বাঙ্গালী সৈনিকরা ছুটিতে আছেন তাদের পাঠিয়ে দেবার জন্য এবং মুজাহিদ, আনসার, উৎসাহী যুবক, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বরিশালে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিলাম এবং আসতে না পারলে সেখানেই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে বলা হল। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ট্রেনিং-এর জন্য দিতে বলা হল। প্রতিটি থানা আমাদের নির্দেশ জেনে নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। আমরা মেজর জলিলের নির্দেশে জায়গায় জায়গায় যুবকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করলাম।

২৭শে মার্চের রাতে নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের বাড়ীতে সব আওয়ামী লীগ নেতা ও অন্যান্য দলের নেতাদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। মেজর জলিলকে দক্ষিণাঞ্চলের সর্বাধিনায়ক করে কাজ শুরু করে দিলাম। দক্ষিণাঞ্চলের এলাকা বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা নিয়ে গঠিত ছিল। এস-পিদের নির্দেশ দেয়া হল সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে দিয়ে দেবার জন্য। এস-পি'রা নির্দেশ মেনে নিয়ে সমস্ত অস্ত্র আমাদের হাতে তুলে দেন।

সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করা হয়। খাদ্য সরবরাহের জন্য একটি গ্রুপ গঠন করা হয়- যাদের কাজ ছিল সব মুক্তিযোদ্ধার জন্য খাবার যোগাড় করে দেয়া। ট্রান্সপোর্টগুলি আমাদের কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণে

আনা হয়। বেসামরিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ও একটি পরিষদ গঠন করা হয়। ডেপুটি কমিশনার, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ও অন্যদের নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়েছিল। এছাড়া বরিশাল শহরের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হয়। এগুলি ছিল বেলস পার্ক, সদর গার্লস হাইস্কুল, লাকুটিয়া জমিদার বাড়ী (কমান্ডো ট্রেনিং-এর জন্য), মাধবপাশা ও প্রতাপপুর। অন্যান্য থানাগুলিতেও এরূপ অনেক ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হয়। এসব কেন্দ্রে হাজার হাজার যুবক দেশকে মুক্ত করার জন্য ট্রেনিং নিতে শুরু করে। বেলস পার্কে সর্ববৃহৎ ট্রেনিং কেন্দ্র ছিল। এখানে হাজার হাজার যুবক ট্রেনিং নিতে থাকে এবং এদের অনেককে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়। আমি সমস্ত ট্রেনিং কেন্দ্রের উপর নজর রাখতাম। ক্যাপ্টেন হুদা মেজর জলিলের সাথে থাকতেন এবং অন্যান্য দিকগুলির উপর নজর রাখতেন।

অয়ারলেসের মাধ্যমে আমরা পূর্বেই চাঁদপুর, পিরোজপুর, বাগেরহাট ইত্যাদি স্থানে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলাম। চাঁদপুর থেকে মিজানুর রহমান চৌধুরী অয়ারলেসের মাধ্যমে খবর পাঠালেন পাকসেনা যে কো মুহর্তে চাঁদপুর আক্রমণ করতে পারে। তিনি আমাদের কিছু লোক পাঠাতে বললেন। মেজর জলিলের নির্দেশে আমি প্রায় ১০০ জন যুবককে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ চাঁদপুরে পাঠিয়ে দিলাম। ফরিদপুর, পটুয়াখালী বাগেরহাট, খুলনা পিরোজপুর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও আমি প্রায় এক হাজার জনকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে শত্রুর আক্রমণকে রুখবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। এছাড়াও বিভিন্ন থানা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরো ৫০০ জনকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদসহ শত্রুদের রুখবার জন্য পাঠিয়ে দিই। ব্রজমোহন কলেজের কেমিস্ট্রির একজন অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান বিভাগ ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সহায়তায় আমরা হ্যান্ড গ্রেনেড, মলোটভ ককটেল ইত্যাদি হাতবোমা তৈরী করতে শুরু করে দিলাম এবং এগুলি বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিলাম। বরিশাল-পটুয়াখালী যেহেতু নদী প্রধান ছিল, সেহেতু শত্রুরা গানবোট নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। তাই গানবোট ধ্বংস করার জন্য ‘রকেট’ ধরনের বোমা তৈরী করার চেষ্টা করি। এতে কিছুটা সফল হলেও আমরা তা কার্যকর করতে পারিনি।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের প্রবল চাপের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে শুরু করেছে। পাকসেনাদের তুলনায় আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল খুবই কম। সেজন্য অন্য কোথাও থেকে অস্ত্র যোগাড় করা যায় কিনা চিন্তা করতে থাকি। বন্ধুদেশ ভারত থেকে অস্ত্র যোগাড় করার জন্য দক্ষিণাঞ্চল কমান্ডের প্রধান মেজর জলিল আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে ভারতে পাঠান। অস্ত্রশস্ত্র যোগার করা ছাড়াও অন্যান্য নেতাদের সাথে যোগাযোগ করাও প্রয়োজন ছিল। আমরা চিন্তা করে দেখলাম পাকিস্তানীদের সাথে এ অবস্থাতে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না। তবুও বরিশালের সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্ব ছিল। আমরা বরিশালকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিই। সেজন্য ঢাকা থেকে বরিশাল আসার পথের উপর ২টি সড়কসেতু ধ্বংস করে দিই। ঢাকা থেকে বরিশালের সরাসরি রাস্তাযোগে কোন যোগাযোগ না থাকলে এই সড়কসেতু ২টি উড়িয়ে দেয়াতে শত্রুদের বরিশাল যাবার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। ফেরীগুলি নষ্ট করে দেয়া হয়। পাকসেনারা যাতে বিমানে করে নামতে না পারে তার জন্য রহমতপুর এয়ার বেইসে শক্তিশালী পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। কালিজিরা নদীতে শত্রুদের বাধা দেবার জন্য শক্তিশালী পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। শত্রুরা যাতে নদীপথে আসতে না পারে তার জন্য বরিশাল থেকে ৫/৭ মাইল দূর পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় বাংকার খুঁড়ে নদীপথের উভয় দিকে শত্রুদের অগ্রগতিকে বাধা দেবার জন্য বেশ কয়েকটি অবস্থান গড়ে তুলি।

অন্যদিকে, খুলনা হয়ে শত্রুরা যাতে বরিশালে ঢুকতে না পারে তার জন্যও ঝালকাঠিতে শক্তিশালী পাহারার ব্যবস্থা করার জন্য আমি সেখানে যাই। খুলনা থেকে বরিশালে নদীপথ আসতে হলে গাবখান চ্যানেল হয়ে আসতে হবে। তাই গাবখানের উভয় পাশে শক্তিশালী পাহারার ব্যবস্থা করি এবং মধ্যে একটি ‘ফ্ল্যাট’ রেখে দিই যাতে শত্রুদের গানবোট না আসতে পারে। শত্রুরা নদীপথে পার না হতে পারলে নদীর এক পাড়ে নামবে, তখন আমরা আক্রমণ চালাব। এটা ছিল পরিকল্পনা।

এরপর যাই পিরোজপুর। পিরোজপুরে লেঃ জিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়। মেজর জলিল তাকে পিরোজপুরের ভার দিয়ে আমাকে নিয়ে বাগেরহাটে যান। বাগেরহাটের অবস্থান শক্তিশালী করে তুলি এবং পরিকল্পনা নিই খুলনা বেতার কেন্দ্র দখল করে নেয়ার জন্য। পরিকল্পনা মোতাবেক ৩/৪ এপ্রিল রাতে বেতার কেন্দ্রে অবস্থানরত পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালাই এবং ২৪ ঘণ্টার জন্য খুলনা বেতার কেন্দ্র মুক্ত রাখতে সক্ষম হই। কিন্তু পাকসেনাদের প্রবল চাপে খুলনা বেতার কেন্দ্র বেশীক্ষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। খুলনা বেতার কেন্দ্রের যুদ্ধে আমাদের তিনজন শহীদ হন। পাকসেনাদের ৩৫ জনের মত হতাহত হয়। আমরা বাগেরহাটে ফিরে আসলাম।

বাগেরহাটে এসে প্রথমে খুলনার এম-সি-এ জনাব রহমান, ছাত্রনেতা টুকু এবং অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। যোগাযোগ করে আমরা রূপসা নদী পার হয়ে রাতের আঁধারে খুলনা শহরের পিছন দিক দিয়ে গিয়ে গোপ্তামারীতে অবস্থিত খুলনা বেতার কেন্দ্রের নিকটে কলাবাগানে ২টি প্লাটুনকে অবস্থান নিতে বলি। খুলনা থেকে গোপ্তামারী আসার পথে একটি ব্রিজ ছিল। সেই ব্রিজের নিচে এ্যামবুশ নেয়ার জন্য আর একটি ছোট গ্রুপকে নিযুক্ত করি। বয়রাতে কিছু ইপিআর ছিল। তাদের বলা হয় আমরা যখন গোপ্তামারী বেতার কেন্দ্রে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব তখন তারা যেন সার্কিট হাউসে অবস্থানরত পাকসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদিকে খুলনা শহরের নিকটস্থ গ্রামের দেশপ্রেমিক যুবকদের (নব্বালদের) সাথে যোগাযোগ করা হয়। তারা আমাদের আক্রমণে সাহায্য করার জন্য একসাথে শত্রু বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই পরিকল্পনা নেয়া হয়। আমাদের পরিকল্পনা ছিল একসাথে পাকসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুলনা শহর শত্রুমুক্ত করব।

পরিকল্পনামত ৩/৪ এপ্রিলের রাত ৯টার সময় গোপ্তামারীতে অবস্থিত বেতার কেন্দ্রে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। গোপ্তামারীতে অবস্থিত পাকসেনাদের সাহায্য করার জন্য সার্কিট হাউস থেকে আরও সৈন্য ১টা জীপ ও ২টা ডজে করে গোপ্তামারীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আগে থেকেই গোপ্তামারী-খুলনার মধ্যে আবস্থানরত এ্যামবুশ পার্টি পাকসেনাদের গাড়ীর উপর গ্রেনেড, হাতবোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। জীপ এবং ডজ দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাক-সেনারা টিকতে না পেরে ব্রীজ এবং বেতার কেন্দ্র ছেড়ে শহরে পালিয়ে যায়।

বয়রাতে অবস্থানরত ইপিআররা শত্রুদের উপর কোন কারণে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি। সেজন্য আমরা খুলনা শহর দখল করতে পারিনি। বেতার কেন্দ্র চালু করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। এ আক্রমণে শত্রুদের ৭৯ জন হতাহত হয়। এদের মধ্যে একজন মেজর ছিলেন। আমাদের পক্ষে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। হাবিব নামে জনৈক তরুণ ছাত্র ছিল, সে আক্রমণের পূর্বে তার পিতার রিভলবার চুরি করে এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। তার বয়স কম দেখে আমি তাকে আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু সে আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধের পরে তাকে মৃত অবস্থায় দেখি। শহীদদের মধ্যে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ই-এম-ই'র সৈনিকও ছিলেন।

পরদিন শত্রুরা খুলনা শহর থেকে মর্টারের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করতে থাকে এবং ৩০-এম-এম-জি থেকে আমাদের উপর মুশলধারে গুলি চালাতে থাকে। আমরা চিন্তা করে দেখলাম শত্রুদের বিরাট শক্তির সাথে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না। সেজন্য কৌশলগত কারণে ৫ই এপ্রিল রাতে শত্রুসৈন্যের প্রচণ্ড চাপের মুখে টিকতে না পেরে ফিরে বাগেরহাটে চলে আসি। আমাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণকে আমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞাত করা এবং শত্রুকে পর্যুদস্ত করা। সেটা আমরা করতে পেরেছিলাম।

বাগেরহাটের তৎকালীন এস-ডি-ও পরিস্থিতির জন্য ভীত ছিলেন। তিনি আমাদের ঠিকমত সাহায্য দিতে পারছিলেন না। বাগেরহাট শহরে অবস্থান নিয়ে থাকা ঠিক হবে না, কেননা শত্রুরা আমাদের অবস্থানের কথা জেনে ফেলেছিল। তাই বাগেরহাটের ছেলেরা বলে খান জাহান আলী সাহেবের দরগার পাশে অবস্থান নিলে ভাল হবে। তাদের একটা বিশ্বাস ছিল দরগার কাছাকাছি অবস্থান নিলে শত্রুরা আক্রমণ করতে পারবে না। সেজন্য

আমি বাগেরহাটে দরগার পাশে অবস্থান নিই। বাগেরহাটের এম-সি-এ আবদুর রহমান অনেক সময় আমাদের কোন নির্দেশ না নিয়ে অনেক কাজ করে ফেলতেন। আমি খবর পাই খুলনার এম-সি-এ শেখ আবদুল আজিজ সাহেব বাগেরহাটে এসেছেন। তার সাথে অনেক কষ্টে যোগাযোগ করি। তিনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন।

একদিন খবর পাই একটা জাহাজে কিছু হাতিয়ার আছে-যার কথা পাকসেনারাও জানেনা এবং জাহাজটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। এ খবর আমাকে দেন মংলা পোর্টের একজন কাস্টম অফিসার। সে হাতিয়ার যোগাড় করার জন্য আমি দুটি স্পীডবোট নিয়ে সুন্দরবন হয়ে ঘুরে মংলা পোর্টে যাই। পোর্টে গিয়ে একটা স্পীডবোট পরিত্যক্ত জাহাজটির কাছে যায়। আমি অন্য স্পীডবোটটি থেকে শত্রুদের উপর নজর রাখি। আগের স্পীডবোটটি যখন কয়েক বাস্ক মাল নামিয়েছে, হঠাৎ করে গানবোট থেকে পাকসেনারা গোলা ছুঁড়তে থাকে আমরা কোনরকমে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে আসি। পরে বাস্ক খুলে দেখতে পাই, সেগুলি বন্দুকের গুলি বাগেরহাট থেকে আসার পথে দেখতে পাই চার নৌকা বোঝাই চাল চুরি হয়ে গেছে। আমরা তার অধিকাংশই উদ্ধার করে বাগেরহাটে নিয়ে আসি। গুলি নিয়ে স্পীডবোটে করে পালিয়ে আসার সময় বৈঠাঘাটা থানাতে আশ্রয় নিই। এখানে শুনতে পাই, পাকসেনারা নদীপথে গানবোটের সাহায্যে পাহারা দিচ্ছে। আমি এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে বাগেরহাটে ফিরে আসি। একদিন রাতে দালাল রজব আলী ও তার সঙ্গীরা আমাদের বাগেরহাট দরগা অবস্থানে রাতের অন্ধকারে হামলা চালায়। আমরা হামলা প্রতিহত করি। রজব আলী ও তার দলবল রাতের অন্ধকারে আমাদের কাছে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন উপায়ে বাধার সৃষ্টি করত।

নানারকম সুবিধা অচলাবস্থা ও সাময়িক হতাশার জন্য বাগেরহাটে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এক হতাশার সৃষ্টি হয়। আমি তাদের মধ্যে হতাশার ভাব দূর করে মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করে তুলি। তারপর মেজর জলিল আমাকে পিরোজপুর ও বাগেরহাটের ভার দেয়া হয় এবং আমাকে বরিশালে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য সেখানে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর আমি বরিশালে এসে আগেকার তৈরী বাংকার এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থান নিই এবং বরিশাল শহর ও অন্যান্য এলাকায় যাতে শত্রুরা প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য শক্তিশালী ব্যুহ তৈরী করতে থাকি। বরিশাল থেকে বেশ কিছুদূরে জুনাহাড়ে কীর্তনখোলা নদীর দুই পারে বাংকার খুঁড়ে শত্রুর অগ্রগতি ঠেকানোর জন্য শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে থাকি। ঢাকা এবং ভোলা থেকে রাতে পাকসেনারা আসতে না পারে তার জন্য জুনাহাড়ে অবস্থান নিই। পূর্বেই বলেছি বরিশাল হল নদীপ্রধান। স্থলপথে পাকসেনাদের বরিশাল আসা অসম্ভব ছিল। যেদিক দিয়েই শত্রুসেনারা বরিশালের দিকে আসুক না কেন তাদের নদীপথ হয়েই আসতে হবে। পটুয়াখালী তখন আমাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। সেদিক দিয়ে পাকসেনাদের আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না, খুলনা হয়ে এতদূর ঘুরে পাকসেনারা আসবে সেটাও সম্ভব নয়। তবুও বরিশাল থেকে কিছু দূরে আমরা বাংকার খুঁড়েছিলাম পাছে খুলনার দিক থেকে কোন আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। তবে অস্ত্রের অভাবে সেখানে কোন অবস্থান নেওয়া হয়নি। জুনাহাড়ে কীর্তনখোলা নদীর দুই পারে অবস্থান নেওয়ার পর শত্রুরা যাতে অতি সহজে নদীপথে বড় স্টিমারে না আসতে পারে তার জন্য ২টা স্টিমার ব্যারিকেড করে নদীর মধ্যে আড়াআড়িভাবে রেখে দেয়া হয়। আমি জুনাহাড়ে প্রথমে ৯০জনকে ৯০টি রাইফেল দিই। এর মধ্যে ৫০টি ৩০৩ রাইফেল ছিল, বাকি ৪০টি ছিল মাস্কাতা আমলের। মেজর জলিল ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে অস্ত্রের জন্য ভারত থেকে ৫০টি এস-এম-জি, ২০০টা ৩০৩ রাইফেল, ১৫টি এস-এল-আর, ৩০০টা ৩৬-হ্যাড গ্রেনেড ও কিছু এনারগা গ্রেনেড ও লাঞ্চার নিয়ে আসেন। তবে এসব অস্ত্রের কোন শক্তি ছিল না পাকসেনাদের গানবোট ধ্বংস করার। এসব অস্ত্র নূরুল ইসলাম মঞ্জুর মেজর জলিলের হাতে তুলে দেন। মেজর জলিল এসব অস্ত্রের মধ্যে আমাকে ২টা এস-এল-আর, ৪টা এনারগা গ্রেনেড ও ৩০টি মাস্কাতা আমলের রাইফেলের পরিবর্তে ৩০৩ রাইফেল ৩০টি দেন। ইতিপূর্বেই

পাক বিমান বাহিনী বরিশাল শহরে এসে ২টা স্যাবর জেটের সাহায্যে স্ট্রাফিং করে। বিমান বাহিনীর বুলেটবৃষ্টির ফলে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এত ৩০/৪০ জন নিরীহ লোক মারা যায়।

এ বিমান আক্রমণের ফলে জনসাধারণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রাণভয়ে অধিকাংশ লোকই শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বরিশাল একরকম জনশূন্য হয়ে পড়ে। বিমান হামলার বেলস পার্কে অল্পের জন্য মেজর জলিল রক্ষা পান।

বিমান হামলার পর প্রয়োজনীয় মজুত রিজার্ভ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ লাকুটিয়া জমিদার বাড়ী ও অন্যান্য স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়। বরিশাল শহরের উপর আক্রমণ অত্যাসন্ন ভেবে আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। পেট্রোল যোগাড় করার জন্য ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় স্পীডবোটে করে ভোলায় যাই। বহুকষ্টে সামান্য পেট্রোল সংগ্রহ করে পরদিন সকালে ফিরে আসি।

আমি যখন কন্ট্রোল রুমে বসে আছি তখন হঠাৎ বরিশালের ২০ মাইল দূরে নান্দিনাবাজারে অবস্থানরত আমাদের পার্টি খবর জানায় ৪টি গানবোট ও অন্য দুটি বোটে করে পাকসেনারা যতদূর সম্ভব বরিশালের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তারা বরিশাল আক্রমণ করতে পারে। আমি তৎক্ষণাৎ জুনাহাংরে আমাদের অবস্থানের দিকে চলে যাই। জুনাহাংরে পৌঁছতে পৌঁছতে দেখি পাকসেনারা আমাদের উপর হামলা শুরু করে দিয়েছে। আমি জুনাহাংরের তালতলী নদীর পারে আমার অবস্থানে গিয়ে দেখি সেখানে অবস্থানরত সেনারা ভয় পেয়ে গেছে। আমি তাদের সাহস দিয়ে সংগঠিত করি। শত্রুসেনারা বাধা পেয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নদীর উপর ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখা ২টি স্তীমারের উপর হামলা চালায়। ১টি স্তীমার গোলা মেরে পুড়িয়ে এবং অন্যটি ডুবিয়ে দিয়ে তারা তালতলী নদীর ভেতরে ঢুকে পড়ে।

আমাদের হাতে ভারী অস্ত্র না থাকার ফলে আমরা গানবোটগুলি ধ্বংস করে দিতে পারিনি। আমি দ্রুত ১টি নৌকায় করে তালতলী নদী পার হবার চেষ্টা করি। এ সময় শত্রুসেনারা আমার নৌকার উপর হামলা চালায়। এতে নৌকার মাঝি আহত হয়। আমি দ্রুত নদীতে বাঁপিয়ে পড়ি এবং পার হতে সক্ষম হই।

শত্রুসেনারা সে সময় আমার উপর মেশিনগানের গুলি চালাতে থাকে। আমি চরে ধানক্ষেতে প্রায় ১ ঘন্টা পড়ে থাকি। তারপর আস্তে আস্তে ক্রলিং করে মূল অবস্থানে ফিরে আসি।

শত্রুদের গানবোট ধ্বংস করার জন্য আমার বাহিনীর ইপিআর-এর হাবিলদার আবদুল মান্নান অতি সাহসিকতার সাথে খুব নিকট থেকে ১টি গানবোটের উপর হামলা চালায়। এতে গানবোটের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ১২টা পর্যন্ত মুঘলধারে উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে। ইতিমধ্যে হেলিকপ্টারে আরও ১০০-এর মত খানসেনা তালতলী পাড়ে নামানো হয়। সন্ধ্যার দিকে আমরা অবস্থান তুলে নিই। পাকসেনারা আশেপাশের গ্রামগুলি উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। পরদিন ২৬শে এপ্রিল পাকসেনারা বরিশাল শহরে প্রবেশ করে এবং যুদ্ধের সময় যথেষ্ট গোলাগুলি ক্ষয়ের ফলে পাক সেনারা বরিশাল শহরে ক্ষতি করতে পারেনি। ইতিমধ্যে সংঘর্ষের সময় বরিশাল শহরের লোকেরা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যায়। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ২৫ জন মারা যায়। আমাদের কেউ মারা যায়নি।

বরিশালে প্রতিরোধের বিবরণ

সাক্ষাৎকারঃ মহিউদ্দীন আহমদ, প্রাক্তন এম-টি

২৮-০৮-১৯৭৩

২৫মে মার্চের ঘটনা আমি জানতে পারি টেলিফোনযোগে রাত সাড়ে নটা-দশটার দিকে। আমরা মঞ্জুর ভাই সহ বসলাম আলাপ-আলোচনার জন্য। অয়ারলেস মারফত আমরা বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করে ঢাকার পুরা

খবর পেলাম। রাতে আমরা সিদ্ধান্ত নিই পাকসেনা আসার আগেই আমরা সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র তথা অস্ত্র আমাদের হাতে নিয়ে আসবে।

মার্চ মাসের শুরু থেকেই আমিসহ আমার দলের লোকজন বিভিন্ন স্থানে জনসভা করে জনমত গঠন করে। পাক-আক্রমণ ঘটলে যেকোন জবাবের জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সমগ্র বরিশাল জেলার বিভিন্ন থানা, উইনিয়ন, গ্রামে সভা করে বেড়াই। মানুষ প্রস্তুত ছিল যেকোন অবস্থার জন্য।

২৬শে মার্চ আমি এবং নূরুল ইসলাম মঞ্জুর মিলে পুলিশ লাইনে পুলিশ রিজার্ভ ফোর্সের সামনে বক্তৃতা করি। তারা সবাই হাত উঠিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত বলে জানায়। এস-পি'র সাথে আলাপ-আলোচনা করি। আমরা সমস্ত জেলার দায়িত্ব নিই। পাকসেনা ওয়াপদা কলোনীতে কিছু ছিল, তারা আমাদের ফোন পেয়ে পালিয়ে যায়।

২৭শে মার্চ আমরা এসপি'র কাছে থেকে চাবি নিয়ে ট্রাকে করে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে যাই। লাকুটিয়া জমিদার বাড়ী কাশীপুর, মঞ্জুর সাহেবের বাসাতে অস্ত্রশস্ত্র রাখি এবং ছাত্র, পুলিশ, আনসার, সাধারণ লোক, ছাত্রলীগ কর্মী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, শ্রমিক সব মিলে ৪/৫ হাজার যুক্তিযোদ্ধা তৈরী করি। ২৭/২৮শে মার্চ থেকে পুলিশ লাইনে এবং বেলস পার্কে (বঙ্গবন্ধু পার্ক) আর্মস ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। উজিরপুর থানাতে মেজর জলিলের বাড়ী। জনসভা করে বের হওয়ার সময় মেজর জলিলের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। সে আমাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বলে, “আমি ছুটিতে আছি, যদি কোন কাজে লাগে ডাকবেন।” ২৮শে মার্চ আমরা চিঠি পাঠিয়ে মেজর জলিলকে নিয়ে আসি এবং কাজে লাগাই। আমরা ডিসির বাংলাতে আলাপ-আলোচনা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, এম-পি-সিভিল প্রধান; মহিউদ্দীন আহমদ এম-পি খাদ্য এবং যোগাযোগ; আমির হোসেন আমু, এম-পি-সাহায্য; আমিনুল হক চৌধুরী-বিচার বিভাগ; এম-পি সার্জেন্ট ফজলুল হক, মেজর জলিল ও এস-পি-ডিফেন্স; আবদুল মালেক খান, আওয়ামী লীগ সভাপতি-অর্থ বিভাগ; সর্দার জালাল, এডভোকেট ইউসুফ, হুমায়ুন এমপি-প্রচার বিভাগ; কাজী মহিউদ্দিন-নদীপথ যোগাযোগ; হেমায়েত উদ্দীন এডভোকেট-সমন্বয় বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগের সাথে ডিসি, এসপি, এডিসি, যাবতীয় বিভাগীয় প্রধানরা সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। ডিসি ছিলেন হাবিবুর রহমান, এমপি ফখরুদ্দিন আহমেদ, এডিসি কাজী আজিজুল ইসলাম (শহীদ), অতিরিক্ত জেলা পুলিশ প্রধান গোলাম আহমদ (শহীদ), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আসমত আলী, আনসার এ্যাডজুটেন্টরাও আমাদের সহযোগী ছিলেন। তালতলী, সাগরদি, কাশীপুর এলাকা, লাকুটিয়া ইত্যাদি স্থানে ডিফেন্স দেওয়া হয়। শহরের ভিতরেও আমাদের গোপন সেল ছিল।

ইতিমধ্যে ঢাকা, খুলনার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার শরণার্থী তথা আহত লোক আসা শুরু করে। তাদেরকে কলেজসহ বিভিন্নস্থানে রাখার ব্যবস্থা করি এবং পরে তাদেরকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা আমি নিজে করি। ফোন মারফত আমাদের বাগেরহাট, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পটুয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর ইত্যাদি স্থানের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মঞ্জুর সাহেব (এমপি) আগরতলা যান। তিনি আগরতলা থেকে ফিরে আবার কলকাতা যান অস্ত্রের জন্য। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে ডিফেন্সের। আমি ১৫০ জনের মত যোদ্ধাকে অস্ত্র, খাদ্য, ওষুধ সহ লঞ্চযোগে চাঁদপুর পৌঁছি মিজানুর রহমান চৌধুরীর অনুরোধে। এই বাহিনী কুমিল্লা সেনানিবাস আক্রমণ করে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। আমাদের বাহিনীর ৩০ জনের মত শহীদ হয় ওখানে।

বাগেরহাটেও আমরা পাঠিয়েছিলাম ৬০ জনের মত যোদ্ধাকে। খুলনার যুদ্ধে আমাদের ৩/৪ জন শহীদ হন। আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি ছিল যারা মোটরসাকেল এবং মোটর সহযোগে যোগাযোগ রাখতো। প্রতি থানাতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। থানার সাথে আমাদের সব সময় যোগাযোগ থাকতো। বরিশালের সকল মহকুমায় আমরা নির্দেশ এবং যোগাযোগ রাখতাম।

২৬শে এপ্রিল বরিশালের পতন ঘটে পাক বহিনীর হাতে। ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসের ১০/১২ তারিখে এবং ১৯/২০ তারিখে পাক বিমান দু'বার হামলা চালিয়ে আমাদের একটি লঞ্চ ডুবিয়ে দেয় এবং বোমার আঘাতে ২০ জনের মত লোক মারা যায়। বহু আহত হয়। পশ্চিমদিকেও বহু লোক মারার যায়। মঞ্জুর সাহেবের কথা মত মেজর জলিল এবং ক্যাপ্টেন হুদাকে অস্ত্রের জন্য ভারতে পাঠানো হয়। মঞ্জুর ভাই ইতিমধ্যে ২২ এপ্রিল কিছু অস্ত্র নিয়ে বরিশাল আসেন।

২৫শে এপ্রিল ভোরবেলা থেকে পাকসেনারা শেলিং করতে করতে আসে মুলাদির দিক থেকে। খুলনার দিক থেকেও আসতে থাকে। ফরিদপুর থেকেও স্থলবাহিনী মার্চ করে আসতে থাকে। ৪টি জেট অনবরত বোমা ফেলা শুরু করে। পর মুহুর্তে ৬টি হেলিকপ্টারযোগে অসংখ্য ছত্রীসেনা নামিয়ে দেয়। মঞ্জুর তখন তালতলী (উত্তর দিকে) ও আমি দক্ষিণ দিকে যুদ্ধ পরিচালনা করি। পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন ফিরুর গুলি লাগে। পাশাপাশি মঞ্জুরও ছিল। মঞ্জুর আমাকে মেসেজ দেন ফোর্স নিয়ে লাকুটিয়া রওয়ানা হবার জন্য। আমি নিজে বাহিনীর ডাক্তারসহ লাকুটিয়া রওনা হই। কিন্তু অনবরত বোমা ফেলার জন্য লাকুটিয়া না যেতে পেরে সরদার জালাল, আমিনুল হক চৌধুরী এবং কিছু ছেলে নিয়ে কাশীপুর ক্যাম্পে চলে যাই। এর আগেই অবস্থা বুঝতে পেরে শহর থেকে বেসামরিক লোকদের সরে যেতে বলি। আওয়ামী লীগের কিছু নেতাকেও চলে যেতে বলি। সরদার জালালকে রুহাতে (গ্রাম) রেখে একটি জীপ নিয়ে দুজন মুক্তিযোদ্ধাসহ বিকাল ৫টার দিকে শহরে চলে আসি অবস্থা দেখার জন্য। শহরে ঢোকার সময় গ্রামসংলগ্ন রাস্তার দু'পাশে বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধাকে পজিশন নিয়ে থাকতে দেখি। আমি কিছু মুক্তিবাহিনীকে নদীর ওপারে (কীর্তনখোলার ওপারে পজিশন নিয়ে গানবোটের সুযোগ বুঝে আক্রমণ করতে বলি।

শহর তখন শূন্য। কিছুক্ষণ পরপরই আবার ব্যাপকভাবে বোমা ফেলা শুরু হয়। আমি ও ড্রাইভার দু'জন বাংকারে আধ ঘন্টা বসে থাকি। বোমা ফেলা একটু কমলে গাড়ী নিয়ে রুহা গ্রামে রওনা হই। ছত্রীসেনা নেমে গিয়েছিল। তারা আমার গাড়ী লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। আমরা অস্ত্রের জন্য বেঁচে যাই। রুহা গ্রামে পৌঁছালে মঞ্জুরের মেসেজ পেলাম যে আমাদের লাকুটিয়া ঘাঁটির পতন ঘটেছে। তিনি স্বরূপকাঠির দিকে যোদ্ধা নিয়ে রওনা হয়েছেন। আমাকে রাতেই তার সাথে দেখা করতে বলেন। রাতেই কিছু যোদ্ধা, জালাল আহমেদসহ রওনা হয়ে পরদিন ভোরবেলা স্বরূপকাঠি (থানা) গিয়ে পৌঁছাই। ২৬ তারিখে রাত ৩টার দিকে কাউখালীতে মঞ্জুরের সাথে আলাপ করি। আমরা ওখান থেকে গানবোটের শেলিং শুনতে পাচ্ছিলাম।

২৭শে এপ্রিল রওনা হয়ে আমরা ৩টি বড় লঞ্চে বহু পরিবারসহ (২০০/৩০০) সুন্দরবন হয়ে হাসনাবাদ পৌঁছাই ২৯শে এপ্রিল। বিশ্রাম সিংহ তখন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী প্রধান ছিলেন। তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করেন। কলকাতার বালিগঞ্জে মঞ্জুরসহ মন্ত্রী পরিষদের সাথে দেখা করে আলাপ-আলোচনা করি বরিশালের সব কথা বলি। জেনারেল ওসমানীর সাথেও ওখানে সাক্ষাৎ হয়। বিশ্রাম সিংহ মিঃ মুখার্জী, নেভাল কমান্ডার কে,বি, সিংহ- এদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। এদের আন্তরিকতা ও সাহায্য-সহানুভূতি ভোলা যায় না।

১লা মে থেকে ৭ই মে পর্যন্ত হাসনাবাদ, ব্যারাকপুর পাগলের মত আমি এবং মঞ্জুর ঘোরাঘুরি করে দুই লঞ্চ আধুনিক অস্ত্র, ওষুধ, ড্রাই ফুডসহ কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস সরকারী চুক্তি ছাড়াই কামান্ডার মুখার্জী, কে,বি, সিংহ, বিশ্রাম সিংহ গোপনে আমাদের হাতে তুলে দেন। ৬/৭ দিন আমাদের ছেলেদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে প্রতি গ্রুপকে বিভিন্ন অস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা দিই। আমরা নিজেরাও শিক্ষা নিই। আমি, মঞ্জুর, সরদার জালাল, প্রায় ৮০ জন যোদ্ধা, মেজর জলিল, ক্যাপ্টেন রহমান, লেঃ নাসের সহ ২টি লঞ্চ ভর্তি অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে বরিশালের দিকে রওনা হই। ৪০ হর্স-পাওয়ারের স্পীডবোটও ছিল আমাদের সাথে।

দুপুর ২টার দিকে আমরা হাসনাবাদ থেকে রওনা হই। ২টি ভারতীয় নেভাল শীপ আমাদের পৌঁছে দিয়ে সালাম করে চলে যায়। একটি লঞ্চে মেজর জলিল, ক্যাপ্টেন রহমান এবং অন্যটিতে আমি, মঞ্জুর, লেঃ ময়নুল ছিলাম। আমরা সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করি।

খুলনা জেলার সুন্দরবন এলাকায় গাবুরিয়া ইউনিয়নের বুড়িগোয়ালিনীর নিকটে তিনটি পাক গানবোট আমাদের আক্রমণ করে। আমরাও পাল্টা আক্রমণ করি। এক ঘন্টা যাবৎ দু'পক্ষে গোলাগুলি হয়। আমাদের আক্রমণে একটি গানবোট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন ওরা দূরে চলে গিয়ে কামান ছুড়তে থাকে। রাত ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। আমাদের দু'টি লঞ্চে পিছনে যে পেট্রোল ছিল তাতে শেল পড়ে আগুন লেগে যায়। ওখানে আমাদের কয়েকজন যোদ্ধা শহীদ হয়। আমরা পানিতে ঝাঁপ দিই। আমরা কিছু সাঁতরিয়ে পাড়ে উঠি। ওয়াপদা বাঁধে উঠে পজিশন নিই। কিছু মুক্তিযোদ্ধাসহ আমি এবং মঞ্জুর পিছু হঠতে থাকি। পাকসেনারা অনবরত শেল ফেলতে থাকে গ্রামের দিকে। আমরা যে কোন স্থানে তার কিছুই বুঝিলাম না।

গাবুরিয়া ইউনিয়নের ঐখানে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খবর দিয়ে পাক গানবোট নিয়ে আসে। তখন ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঠের ভিতর আমি নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে হারিয়ে ফেলি। আমি এবং আবুল হোসেন নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা বিচ্ছিন্নভাবে একদিকে এগোতে থাকি। ভোরবেলা সর্দার জালাল, কানু, মকসেদ আলী, বাদল, ফিরোজসহ কিছু লোককে মাঠের মধ্যে দেখতে পাই এবং তাদের সাথে মিলিত হই। আমরা ১৭ জন লোক। আর কারো কোন খোঁজ পাইনি। একদিকে বিদ্যুৎ, সার্চ লাইটের আলো, অন্যদিকে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ক্রলিং করে এগোচ্ছিলাম। আমরা ১৭ জনই কমবেশী আহত ছিলাম। আমরা ১৭ জন গ্রামের দিকে রওনা হচ্ছিলাম। বৃষ্টি তখন সমানে হচ্ছে। আমরা পাইকগাছা থানার ভিতরে মদিনাবাদ গ্রামে কয়রা ইউনিয়নে পৌঁছাই। আমরা আমাদের পরস্পরের নাম বদল করি। গ্রামের অবস্থাও বুঝি যে তা আমাদের পক্ষে হবে না। মওলানা সালাম ওখানে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। মওলানা আবদুস সালাম তার দলবল এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের ঘেরাও করে বন্দী করে ফেলে।

প্রতিরোধ-বরিশাল

সাক্ষাৎকারঃ আবদুল করিম সরদার, প্রাক্তন এম-পি

২২-১০-১৯৭২

২৬শে মার্চ কটকস্থল নামক স্থানে পাক-বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধে পাক-বাহিনীর ৭ জন নিহত ও বহু আহত হয়। অপরপক্ষে মুক্তিবাহিনীর ৩ জন (পরিমল, আবুল হাশিম ও মোশাররফ) শহীদ হয়। জুলাই মাসের শেষের দিকে কোদালদহে এক যুদ্ধে ৬ জন পাকসেনা নিহত হয়।

প্রতিরোধ-বরিশাল

সাক্ষাৎকারঃ ডাঃ মোহাম্মদ শাহজাহান

.....১৯৭২

মার্চ মাসে আমি বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলাম। ২৫শে এপ্রিল, ১৯৭১-এ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বরিশাল দখল করে নেয়। বরিশাল শহরের ৪ মাইল দূরে লাকুটিয়া জমিদার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি স্থানান্তর করা হয়। ২৫শে এপ্রিল পাকসেনা বাহিনীর গুলিতে কামাল নামে একজন ছাত্র আহত হয়। আমাকে এসে খবর দেয়া হল। তখন সেখানকার হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার ভয়ে পালিয়ে যায়। আহত ছাত্রটিকে লাকুটিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, আমি এবং আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা লাকুটিয়া ঘাঁটিতে গেলাম।

বরিশাল শহরের পতনের পূর্বে মেজর জলিল সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করছিলেন। তিনি, লেফটেন্যান্ট হুদা এবং আরো কয়েকজন তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোক ভারতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য

গিয়েছিলেন। মেজর জলিল তখন বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। এর আগে জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ভারতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন। তিনিও স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করছিলেন।

লাকুটিয়াতে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে আমরা সেখান থেকে মাধবপাশা চলে গেলাম। আমরা প্রায় ৩০ জন লোক ছিলাম। তাদের মধ্যে জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, লেঃ নাসিরও ছিলেন। মাধবপাশা থেকে আমরা মামুদকাঠিতে জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেলাম। এখানে আমরা শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা সবাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োজন হলে প্রাণ দেব। এখানে বসে আমরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করি। দুটো ছেলেকে খবর আনার জন্য বরিশাল শহরে পাঠানো হয়।

আমরা পুলিশের এস-পি'র লঞ্চে করে সুন্দরবনের দিকে রওনা হলাম। ২৭শে এপ্রিল দুপুরের দিকে সুন্দরবনে ঢুকলাম। ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সুন্দরবনের মধ্যে ছিলাম। সুন্দরবন, শরণখোলা, বুড়িগোয়ালিনী হয়ে ১লা মে ভারতীয় সীমান্ত হিংলগঞ্জে পৌঁছলাম। সেদিনই ভারতের হানসাবাদে চলে গেলাম কালিন্দী নদীর মধ্য দিয়ে।

এখানে এসে মেজর জলিল, লেঃ হুদা এবং আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে দেখা হয়। বরিশাল শহরের পতনের ৪/৫ দিন পূর্বে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাঁরা ভারতে গিয়েছিলেন। তারা ভারতের কাছ থেকে বেশ অস্ত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেখানে দিকান্ত নেয়া হল যে, এ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুন্দরবনের কোন এক জায়গায় ঘাঁটি স্থাপন করা হবে।

৬ই মে দুটো লঞ্চে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা হল। আহত কামাল এবং লেঃ হুদাকে হাসনাবাদে আরো অস্ত্র সংগ্রহের জন্য রেখে আসা হল। আমরা দুপুরের দিকে রওনা হলাম। আমরা হিংলগঞ্জে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সন্ধ্যার দিকে কৈখালীর সীমান্ত ঘাঁটির কাছে একটা খালের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়লাম। আমাদের বড় লঞ্চটা আগে ছিল এবং মেজর জলিলের লঞ্চটা ২৫/৩০ গজ পিছনে ছিল। লঞ্চ-এর সমস্ত বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল। বড় লঞ্চে আমি, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, এমপি মহিউদ্দিন, সেকেন্ড লেঃ নাসির এবং আরো অনেকে ছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং বৃষ্টি হচ্ছিল। বুড়িগোয়ালিনীর কাছে কপোতাক্ষ নদীতে পাকিস্তানীদের দুটো গানবোট ছিল। আমরা গানবোটগুলো প্রায় ৫০ গজের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। তখন গানবোট থেকে আমাদের লঞ্চের উপর সার্চলাইট ফেলা হল এবং ১টা সিগন্যাল ফায়ারও করা হল। লঞ্চটাকে নদীর পারে লাগিয়ে আমরা ছোট-খাট অস্ত্র এবং কিছু গুলির বাক্স নিয়ে নদীর পাড়ে লাফিয়ে পড়লাম। পিছনের লঞ্চ থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়। তখন গানবোটগুলো আমাদের উপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমরা বাঁধের অপরদিকে গিয়ে বসে পড়লাম। এখান থেকে আমরা কিছুক্ষণ গুলিবর্ষণ করি এবং পেছনের লঞ্চের কাছে যাবার চেষ্টা করি। রাত তিনটা পর্যন্ত গানবোটের সাথে আমাদের গোলাগুলি বিনিময় হয়। আমরা লঞ্চ থেকে নামার ঘন্টাখানেক পরে লঞ্চে আগুন ধরে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

আমরা ১৪/১৫ জন পেছনের লঞ্চের দিকে এগুতে লাগলাম, কিছুদূর গিয়ে আমি এবং আর একজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র মইনুল পথ হারিয়ে ফেলি। পথ হারিয়ে আমরা আবার পেছনের দিকে যেতে শুরু করি। কিছুদূর গিয়ে একটা ডিংগী নৌকা দেখতে পেলাম। আমরা নৌকায় উঠলাম। কিন্তু নদীর মধ্যে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের উপর গানবোট থেকে সার্চলাইটের আলো এসে পড়ল। আমরা নদীতে লাফিয়ে পড়লাম এবং সাঁতরে নদীর অপর পাড়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে একজন লোকের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল। সে এলাকাটি ছিল মুসলিম লীগের সমর্থকদের। পথে আমরা কয়েকবার মুসলিম লীগের দালালদের হাতে ধরা পড়েছি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি। অবশেষে আমরা আবার ভারতে চলে যেতে সমর্থ হই।

বরিশাল রণাঙ্গনে*

পাকসৈন্যরা এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মাদারীপুর শহর দখল করে নিয়েছিল। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ওরা মিলিটারী ভ্যান নিয়ে বরিশাল জেলার সীমানায় এসে প্রবেশ করল। খবর পেয়ে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য মুক্তিবাহিনী গৌরনদী থেকে মার্চ করে এগিয়ে চলল। এদের মধ্যে যুদ্ধ-বিদ্যায় অভিজ্ঞ কেউ ছিল না- সকলেই কাঁচা, সকলেই অনভিজ্ঞ। মাস খানেকের রাইফেল ট্রেনিং আর নির্ভীক দেশ প্রেম, এই টুকু কেউ সম্বল করে তারা এই দুর্ধর্ষ শত্রুদের মোকাবিলা করতে চলেছে।

বরিশাল আর ফরিদপুর জেলার সীমান্তরেখায় ভুরপাটা গ্রাম। পাক-সৈন্যবাহিনী বেলা এগারোটার সময় এই ভুরপাটার সেতু পেরিয়ে ইল্লা গ্রামের দিকে চলে এসেছে। দু'পাশের গ্রামবাসীদের মনেও আতঙ্কের সঞ্চার করে ভ্যানগুলি গর্জন করে ছুটে আসছে। রাইফেল, মেশিনগান, মর্টার সবকিছুই আছে তাদের সঙ্গে। কুড়ি-পঁচিশটা রাইফেল আর বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ-বিদ্যায় অশিক্ষিত একদল তরুণ তাদের প্রতিরোধ করতে চলেছে।

মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'টি তরুণ এই সীমান্তে এলাকার গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠনের কাজ করে চলেছিলেন। দু'জনেই কলেজের অধ্যাপক। মতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের পথে এগিয়ে এসেছেন। আজ সকল কর্তব্যের বড় বর্তব্য মুক্তিযুদ্ধে সামিল হওয়া। শত্রুসৈন্যরা যে বরিশাল জেলার মাটির উপর এসে গেছে, এখনও তাঁরা জানতে পানেনি। আক্রমণ আসন্ন, ভুরপাটা গ্রামের সেতুটিকে এখনই ভেঙ্গে ফেলা দরকার। সেতুটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তাঁরা দু'জন রিকশাযোগে ভুরপাটা গ্রামের দিকে চলেছিলেন। ইল্লা গ্রামে এসে পৌঁছতেই মিলিটারী ভ্যানের গর্জন শুনে চমকে উঠলেন তাঁরা। সরে পড়ার সময় ছিল না, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দ্রুতবেগে ছুটে আসা ভ্যানগুলি তাঁদের দৃষ্টিগোচরে এসে গেল। তার ঠিক সেই সময় একটা বুলেট তাঁদের দু'জনের মাঝখান দিয়ে রিকশার গা ভেদ করে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন রিকশা থেকে পথের দু'পাশে ছিটকে পড়লেন। বরিশাল জেলার বুকে শত্রুপক্ষের এই প্রথম গুলিবর্ষণ।

তাঁরা দু'জন হামাগুড়ি দিয়ে উঁচু সড়ক থেকে নীচে নেমে এলেন। তাঁদের ভাগ্য ভাল, তাঁরা শত্রুদের নজরে পড়ে যাননি। তাঁরা গুণে গুণে দেখলেন। ১০টা ভ্যান, তার পেছনে একটা এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি। ভ্যানগুলি সম্ভবত গৌরনদীকে লক্ষ্য করে ছুটে চলে গেল। এঁরা দু'জন গ্রামের পথ ধরে পেছন পেছন ছুটলেন।

বাথী গ্রামের সামনে গিয়ে ভ্যানদুটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একদল সৈন্য ভ্যান থেকে নেমে গ্রামের ভেতর ঘুরে ঘুরে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে চলল। যাকে সামনে পেল তাই মারল। তখন কালীপূজার সময়। ওরা পূজাবাড়িতে গিয়ে পূজায় রত দু'জন পুরোহিতকে হত্যা করল। এই 'পবিত্র' কর্তব্য সুসম্পন্ন করে ভ্যানগুলি আবার তাদের গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করল।

বাথী থেকে মাইল দুই দূরে কটকস্থল নামে একটি গ্রাম। মুক্তিবাহিনীর যে যোদ্ধারা শত্রুসৈন্যদের প্রতিরোধ করার জন্য গৌরনদী থেকে যাত্রা করেছিল, তারা সেই সময় এই কটকস্থল গ্রামে পথের ধারে বসে বিশ্রাম করছিল। ভ্যানগুলি এগিয়ে আসতেই প্রতিদ্বন্দ্বী দু'পক্ষ পরস্পরকে দেখতে পেল। পাক-সৈন্যরা তাদের লক্ষ্য করে প্রথমেই গুলি ছুড়ল। প্রতিপক্ষ যে কোন সময় তাদের উপর এসে চড়াও হতে পারে, এমন একটু অবস্থার জন্য মুক্তি বাহিনীর যোদ্ধারা প্রস্তুত ছিল না। সেজন্য তাদের মূল্যও দিতে হয়েছিল। কিন্তু একটু বাদেই তারা তাদের পজিশন নিয়ে নিল। তারপর পরস্পর অজস্র ধারায় গুলি বিনিময় চলল। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। কিন্তু পাক-সৈন্যরা যখন ভারী মেশিনগান ব্যবহার করতে শুরু করল, তখন রাইফেল সর্বস্ব মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সামনে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দাঁড়িয়ে থাকাটা সমীচীনও ছিল না। তারা পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধার মৃতদেহ পেছনে ফেলে রেখে গ্রামের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত

কটকস্থল গ্রামের যুদ্ধের দিন কয়েক পরে। গৌরনদী পাক-সৈন্যদের দখলে এসে গিয়েছে। এখানকার ঘাঁটি সুদৃঢ় করে নিয়ে এবার তারা বরিশাল শহর দখলের অভিযানের জন্য তৈরী হচ্ছে। অপর দিকে বরিশাল শহরে মুক্তিবাহিনীও চূপ করে বসে নেই। হামলাকারী শত্রুদের প্রতিরোধ করবার জন্য তারা তাদের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে চলেছিল।

বরিশাল শহরের মুক্তিবাহিনী গৌরনদীর মুক্তিবাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও অস্ত্রবলের দিক দিয়েই নয়, তাদের মধ্যে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ লোকও ছিল। ছাত্র ছাড়াও বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইপিআর বাহিনীর জওয়ানরা, পুলিশ, আনসার ইত্যাদি নিয়ে এই বাহিনী গড়ে উঠেছিল।

মুক্তিবাহিনীর নেতারা প্রতিরোধ-প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে এসে এক নতুন রণকৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। এই কৃতিত্বের জন্য অবশ্যই তাদের প্রশংসা করতে হবে। সি-এন্ড-বি রোড বরিশাল শহরকে ফরিদপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করেছে। শত্রুরা এই পথ দিয়েই বরিশাল শহর আক্রমণ করতে আসবে। তাদের গতিপথকে রুদ্ধ করে দেবার জন্য এবং তাদের অচল করে ফেলবার জন্য ইতিপূর্বে এই সড়কের বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর নির্দেশে সেই সমস্ত গ্রামের লোকেরা উদ্যোগী হয়ে সেই কাজে হাত দিয়েছিল। কিন্তু মুক্তিবাহিনী শেষ মুহূর্তে হঠাৎ তাদের এই পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়ে এক নতুন রণকৌশল নিয়ে শত্রুশক্তির জন্য এক মায়ার ফাঁদ পেতে বসল। দেখতে দেখতে সমস্ত ব্যারিকেডগুলিকে সরিয়ে নিয়ে এই রাস্তাকে যানবাহন চলবার পক্ষে সুগম করে দেওয়া হোল। শত্রুরা যাতে বিনা বাধায় এবং নিশ্চিত মনে এগিয়ে আসতে পারে, সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বরিশাল শহরে আসতে হলে পর পর দুটো নদী পেরিয়ে আসতে হয়। প্রথমটা শিকারপুরের নদী, দ্বিতীয়টা দোহারিকা নদী। এই দুয়ের মাঝখানে দশ মাইল স্থলপথ। এইখানে মায়ার ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে। পথে কোথাও কোন বাধা পাওয়া যাবে না, কোন ব্যারিকেড সরিয়ে আসতে হবে না, কোন ভেঙ্গে ফেলা পুল সারাই করে নিতে হবে না এমন কথা পাক-সৈন্যরা ভাবতেও পারেনি। এমন সহজ সুগম পথ পেয়ে তাঁরা মহাখুশী। তাদের সৈন্যবাহী গাড়িগুলি স্বচ্ছন্দে শিকারপুরের নদীর পার পর্যন্ত চলে এল।

ফেরী বোটে করে এই নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে যেতে হবে। ওরা উল্লাসিত হয়ে দেখল ফেরীবোটের মাথায় পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। ফেরীবোটের লোকেরা ওদের আসতে দেখে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ বলে জয়ধ্বনি তুলল। তখনকার মত দুর্দিনে এমন সাদর সংবর্ধনা পাবে, এটা ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। আনন্দে ডগমগ হয়ে ওরা ফেরীবোটের সাহায্যে নদী পার হতে লাগল। মুহূর্তের জন্য তাদের মনে এই সন্দেহ জাগেনি যে, এই ফেরী বোট যারা চালিয়ে যাচ্ছে, তারা সবাই মুক্তিবাহিনীর লোক; মুহূর্তের জন্যও তারা ভাবতে পারেনি যে তারা ইতিমধ্যেই প্রতিপক্ষের রচিত মায়ার ফাঁদে পা দিয়ে বসেছে।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে নববই জন সৈন্য আর চালকসহ ন’খানা গাড়ি পারি দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল। এখানেও কোন বাধা নেই, ওরা স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলল। একটু দূরে গিয়েই ওরা থামল। তাদের গোয়েন্দারা চারদিকটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিল-না, কোথাও কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। সবাই গ্রামে ঢুকে পড়ল, নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। পেছনে পড়ে রইল ন’খানা মিরিটারী ভ্যান ও তাদের চালকরা। সৈন্যদের মধ্যে কেউ কেউ গৃহস্থদের দিয়ে ডাব, নারিকেল, কলা এবং নানারকম খাদ্য আনাতে লাগল, তারপর সেইখানেই তাই দিয়ে ভোজের উৎসবে মেতে গেল। কেউ কেউ গৃহস্থদের ভয় দেখিয়ে হাঁস-মুরগী, খাসি ইত্যাদি এনে জড়ো করতে লাগল। আবার আর একদল গৃহস্থবধূদের কাছে সোনাদানা, গয়না যা পেল সবকিছু লুটে-পুটে আনতে লাগল। এই শান্ত, ঠান্ডা আর ভেড়ার মত নিরীহ মানুষগুলি এর প্রতিবাদে একটি কথাও বলল না। ওরা তখনকার মত যুদ্ধবিগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে ভোজের উৎসবে মেতে গেছে, সৈনিকের শৃঙ্খলাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। খেয়ে-দেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে আরামে এলিয়ে দিয়েছে দেহ। এমন সময় হঠাৎ একই সঙ্গে বহু রাইফেলের আওয়াজ শান্ত প্রকৃতির নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল সৈন্যরা। তাদের উপর বৃষ্টিধারার মত

গুলিবর্ষণ চলছে। শুধু রাইফেলের আওয়াজ নয়, তারই সাথে সাথে শত শত দৃষ্টকণ্ঠের ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করে চলেছে। অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে হতে ওদের অনেক সময় কেটে গেল। অস্ত্র চালাতে গিয়েও প্রতিপক্ষের দেখা পেল না, ওরা গোপন আশ্রয়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে একটানা গুলিবর্ষণ করে চলেছে। মুক্তিবাহিনীর জয়ধ্বনির উত্তরে আহত ও মূর্খ্য পাক-সৈন্যদের আত্নাদ শোনা যেতে লাগল। পুরা এক ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর আর কোন সাড়াশব্দ শোনা গেল না, শান্ত প্রকৃতি আবার শান্ত হয়ে গেছে। পাক-সৈন্যদের দুর্বল প্রতিরোধ কোন কাজেই আসেনি সেই যুদ্ধে একটি মুক্তিযোদ্ধাও মারা যায়নি।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। হামলাকারী পাক-সৈন্যরা বরিশাল আর ফরিদপুর জেলার নানা জায়গায় ঘাঁটি করে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এই নৃশংস মানুষ শিকারীর দল গ্রামের পর গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, লোকের যথাসর্বস্ব লুটপাট করে নিচ্ছে, আর যেখানে বিন্দুমাত্র বাধা পাচ্ছে, সেখানে ঘর-বাড়ী জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। এ এক অসহনীয় অবস্থা। গ্রামের লোক ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এই অসহায় আর নিরুপায় মানুষগুলি কি করবে, কোথায় যাবে পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

গৌরনদী থানায় যে-মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে ভেঙে-চুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

এই অবস্থায় জনকয়েক তরুণ কর্মী আবার নতুন করে মুক্তিবাহিনীকে গড়ে তোলবার জন্য আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে এবার শুধু গৌরনদী থানা নয়, বরিশাল জেলার গৌরনদী আর ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া ও কালকিনি এই তিন থানার কর্মীরা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। সেই সময় গৌরনদী থানার পূর্ব-নবগ্রামের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

পূর্ব-নবগ্রামটি বরিশাল জেলা আর ফরিদপুর জেলার সীমান্তস্থলে অবস্থিত। পূর্ব-নবগ্রামের উত্তর দিকে একটি সরু খাল তার গা ঘেঁষে চলে গেছে। এই খালের অপর পারে ফরিদপুর জেলার নবগ্রাম। পূর্ব-নবগ্রাম থেকে মাত্র মাইল দেড়েক দূরে মেদাকুল, এখানে পাক-সৈন্যরা ঘাঁটি করে বসে আছে। এটি একটি নমঃশূদ্র অঞ্চল। এখানকার লোকদের মধ্যে অধিকাংশ কৃষক হলেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ও আছে। তাদের মধ্যে কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও আছে। মাত্র মাইল দেড়েক দূরে শত্রুদের ঘাঁটি। এখানকার বসিন্দারা প্রতিমুহূর্তেই ওদের আক্রমণের আশঙ্কা করছিল। বাইরের কোন কিছু আভাস না পেলেও কয়েকদিন থেকে এদের ভেতরে ভেতরে একটি প্রতিরোধের প্রস্তুতি চলছিল।

সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক সিদ্ধেশ্বর সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তারা স্থির করেছিল, যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে তারা ওদের বিরুদ্ধে একহাত দেখে নেবে। পূর্ব-নবগ্রামের শিক্ষিত তরুণ ও সাধারণ কৃষকরা এই উদ্দেশ্যে সংকল্পবদ্ধ হয়ে একজোট হয়ে দাড়িয়েছিল। বরিশাল আর ফরিদপুরের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা ছেলেবেলা থেকেই লাঠি, সড়কি, লেজা ইত্যাদি অস্ত্র চালনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পূর্ব-নবগ্রামের যেসব তরুণরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তারাও এ বিষয়ে আনাড়ি নয়, তারাও এখানো এই সমস্ত অস্ত্র চালনার অভ্যাসটা হারিয়ে ফেলিনি। এই সুঃসাহসী তরুণরা সংকল্প নিয়েছিল যে, যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে সড়কি, লেজা ইত্যাদি অস্ত্র নিয়েই ওদের রাইফেলের সঙ্গে মোকবিলা করবে। প্রবীণ সিদ্ধেশ্বর সরকারের উদ্যোগে এবং অর্থব্যয়ে এই সমস্ত অস্ত্র তৈরী হচ্ছে। উত্তেজনায় সারাটা গ্রাম গরম হয়ে উঠেছে। রাইফেলের বিরুদ্ধে সড়কি আর লেজা- এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

এরা উপযুক্ত সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। সেই সুযোগ একদিন এসে গেল। ১৩ই মে তারিখে মেদাকুলের ঘাঁটি থেকে মাত্র চারজন সৈন্য পূর্ব-নবগ্রামে এসে প্রবেশ করল। সাধারণ রাইফেল নয়, ওদের সঙ্গে একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেলও ছিল। এখানকার গ্রামাঞ্চলে আসার পর থেকে পাক-সৈন্যরা এ পর্যন্ত কোন দিক থেকেই কোন বাধা পায়নি। গ্রামে ঢুকেই ওরা প্রথমে সিদ্ধেশ্বর সরকারের বাড়িতে গিয়ে হামলা করল। সিদ্ধেশ্বর সরকার বাড়ি ছিলেন না, তিনি তখন এদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য উদ্যোগ আয়োজনে অন্যত্র ব্যস্ত। সরকার-

বাড়িতে যা কিছু মূল্যবান জিনিস পেল তা লুটপাট করে নিয়ে ওরা খালের ওপারে নবগ্রাম গ্রামের বিশ্বাস বাড়িতে লুটপাট করতে গেল। বিশ্বাস-বাড়ির চিলেকোঠাটা ছিল এখানকার ছাত্রদের বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী করার ল্যাবরেটরী। দু'টি ছেলে সেখানে বসে তাদের সংগ্রহীত যৎসামান্য রাসায়নিক মাল-মশলা দিয়ে হাতবোমা তৈরী করত। তাদের মধ্যে একজন ছিল পাশ-করা ডাক্তার। সৈন্যরা বিশ্বাস-বাড়ি আক্রমণ করতে আসছে এ-সংবাদ পেয়ে তারা তাদের তৈরী কতকগুলো হাতবোমা নিয়ে বিশ্বাস-বাড়ির কাছে একটা ঘন গাছপালায় ঢাকা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। সৈন্যরা তাদের নাগালের মধ্যে আসতেই তারা তাদের লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটা হাতবোমা ছুড়ল। বিস্ফোরণের শব্দে গ্রামের শান্ত আবহাওয়া কেঁপে উঠল। ভয়ে কেঁপে উঠল পাকিস্তানী সৈন্যরা। ওরা প্রাণের ভয়ে উর্ধ্বশ্বসে ছুটল। কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে পূর্ব-নবগ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা আকাশ ফাটানো গর্জনধ্বনি করতে করতে ছুটে আসছে।

এইভাবে আক্রান্ত আক্রমণকারী সৈন্যরা অবিরল ধারায় গুলিবর্ষণ করতে করতে পেছনে হটে যেতে লাগল। যেকোন ভাবেই হোক, এখন ওদের মেদাকুলের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা ওদের গুলিবর্ষণকে অগ্রাহ্য করে ক্রমেই কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। অর্ধচন্দ্রাকারে ঘেরাও করে এসেছে। সৈন্যরা কোন দিকে লক্ষ্য রাখবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। তাছাড়া তাদের ঘন ঘন 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে ওরা মাথা ঠিক রাখতে পারছিল না। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কয়েকজন দুঃসাহসী মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে একেবারে সামনে এসে পড়েছে। তাদের মধ্যে একজন মাত্র হাত দশেক দূর থেকে একজন সৈন্যকে তাক করে তার হাতের সড়কি ছুঁড়ল। অব্যর্থ লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে দানবের মত বিরাট দেহ সেই পাঞ্জাবী সৈন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

যে দুঃসাহসী যুবক সড়কিটা ছুঁড়েছিল, তার নাম অমূল্য মল্লিক। ইতিমধ্যে আর একজন সৈন্য এগিয়ে এসে অমূল্যকে লক্ষ্য করে তার হাতের রাইফেলটা তুলেছে। অমূল্যকে রক্ষা করার জন্য মধ্যবয়সী দেবেন সরকার দু'লাফে সামনে এগিয়ে এল। সেই পেছন থেকে জাপটে ধরল সেই সৈন্যটিকে, কিন্তু ততক্ষণে সেই রাইফেলের গুলি তার লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছেছে। গুলিবিদ্ধ অমূল্য মল্লিক চিরতরে চোখ বুজল, তার মাতৃভূমির বুকে শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে প্রফুল্ল সেই সৈন্যের হাত থেকে সেই মৃত্যুবরী রাইফেলটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই লেজার ঘায়ে সেই সৈন্যটির ভবলীলা সাজ হোল।

চারজন সৈন্যের মধ্যে বাকি রইল দুইজন। ওরা পেছন দিকে ছুটে ছুটে সামনে একটা খালের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খালের পাড়টা খাড়া, তার মধ্যে নেমে পড়া সহজ কিন্তু সেখান থেকে ওঠাটা সহজ নয়। তাছাড়া একগলা জলে দাঁড়িয়ে ওরা ওদের রাইফেল চালাতে পারছিল না। এই মরণের ফাঁদ থেকে ওরা উঠতে পারল না, মুক্তিযোদ্ধাদের সড়কির ঘায়ে সেইখানেই তাদের সলিল সমাধি ঘটল।

বরিশাল আর ফরিদপুর জেলার যে কর্মীরা সম্মিলিতভাবে মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিল, পূর্ব-নবগ্রামের এই প্রতিরোধ সংগ্রামের সঙ্গে তাদের প্রথম থেকেই যোগাযোগ ছিল। পাক-সৈন্যদের নিধন পর্বের মধ্য দিয়ে তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। ইতিমধ্যেই পূর্বোক্ত তিনটি থানার কর্মীদের নিয়ে মুক্তিফ্রন্ট সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। এই তিনটি থানা থেকে পঞ্চাশ জনের মত তরুণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লিখিয়েছে। এদের মধ্যে মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোক আছে। ছাত্রও আছে, কৃষকরা আছে। আরও অনেক লোক দলে আসবার জন্য উনুখ। কিন্তু এ বড় কঠিন জিনিস, অনেক দেখে শুনে, ভেবে-চিন্তে লোক বাছাই করতে হয়। ফ্রন্টও গঠিত হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধারাও সামনে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু না আছে অস্ত্র, না আছে ট্রেনিং। পূর্ব-নবগ্রামে যাই হোকনা কেন, ওদের বিরুদ্ধে সত্য সত্যই তো আর সড়কি আর লেজা নিয়ে লড়াই করা চলবে না। চাই রাইফেল, নিদেনপক্ষে বন্দুক। যে-করেই হোক তা সংগ্রহ করতে হবে। মুক্তিফ্রন্টের সেক্রেটারী জনৈক তরুণ অধ্যাপক। এক বিরাট দায়িত্ব তাঁর মাথার উপর এসে পড়েছে।

চারজন পাক-সৈন্যকে এভাবে খতম করতে পারার ফলে পূর্ব-নবগ্রাম ও নিকবতী গ্রামগুলিতে উৎসাহ ও আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা একটুকু সময়ের জন্যই; পরমুহূর্তেই সকলের মনে পড়ল যে সামরিক কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে কিছুতেই এত সহজে হজম করে নেবে না। মাত্র দেড় মাইল দূরে ওদের ঘাঁটি, ওরা এক্ষণি সদলবলে এসে হানা দেবে এবং কঠিন হাতে এ প্রতিশোধ নেবে। ওদের প্রতিহিংসার আগুনে পূর্ব-নবগ্রাম আর নবগ্রাম এই দু'টি গ্রাম পুড়ে ছাই হবে যাবে। এরপর এখানে একটি জনপ্রাণীকেও ওরা বেঁচে থাকতে দেবে না। এ অবস্থায় প্রাণে বাঁচতে হলে এক্ষণি, এই মুহূর্তে কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে হবে। একটি জায়গা আছে বটে, সেটা হচ্ছে এখানকার বিল অঞ্চল। সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে ডাঙা থেকে বহুদূরে বিক্ষিপ্তভাবেই ছড়িয়ে আছে বিল এলাকার ছোট ছোট গ্রামগুলি। সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে ঝড়ের এই প্রথম ঝাপটাটা হয়তো সামলে নেওয়া যাবে। পাকিস্তানী সৈন্যরা টের পেলেও ওখানে যেতে সাহস করবে না। বেশী চিন্তা করবার সময় নেই, যা করবার এই মুহূর্তেই করতে হবে। দেখতে দেখতে সমস্ত এলাকা জনমানবশূন্য হয়ে গেল।

ওরা যা ভেবেছিল তাই ঘটল, খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই হিংস্র পাক-সৈন্যরা শস্যে ক্ষেতে পঙ্গপালের মত এসে ছেয়ে ফেলল, গ্রামের পর গ্রামে হানা দিয়ে চলল। পাশাপাশি ক'টা গ্রাম ওরা একেবারে উচ্ছন্ন করে দিল।

এত বড় ঘা খেয়েও মুক্তিফ্রন্টের লোকদের মনোবল কিন্তু ভাঙেনি। একটা জিনিসের দিকে তাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, যে চারজন পাকিস্তানী সৈন্য এখানে নিহত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রাইফেল ছিল। সেই চারটা রাইফেলের মধ্যে একটি ছিল চীনা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। এই অস্ত্রটি দুর্লভ। এই অস্ত্রটিকে হাত করতে পারলে গুলি সেটা দিয়েই বহু কাজ হাসিল করতে পারা যাবে। আপাতত তাদের হাতে রাইফেল বা বন্দুক জাতীয় একটিও অস্ত্র নেই। ওই চারটি রাইফেল এই গ্রামেই আছে, ওইগুলিকে বের করে হস্তগত করতে পারলে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের হাতে-খড়ির কাজ শুরু হতে পারবে।

সবাই যখন জান-প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত, মুক্তিবাহিনীর সেক্রেটারি তখন সেই রাইফেলগুলির সন্ধানে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। হাতে সময় নেই, শত্রুসৈন্যরা যেকোন সময় এসে পড়তে পারে, তার আগেই এই অস্ত্রগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে। অস্ত্রগুলির সম্পর্কে প্রথমে কেউ কোন কথা বলতে চায় না। বহু মিনতি আর রাগারাগির পর অবশেষে একটি একটি করে সব কটির সন্ধান পাওয়া গেল। সবচেয়ে আনন্দের কথা, সেই চীনা স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটিকেও পাওয়া গেছে। মুক্তিফ্রন্টের সেক্রেটারি উত্তেজনা আর উল্লাসে অধীর। আর চিন্তা নেই, এবার এই ক'টিকে পুঁজি করেই তারা কাজ শুরু করে দেবেন।

আরও আনন্দের কথা এই যে, রাইফেলগুলির সাথে এক পেটিভর্তি বুলেটও পাওয়া গেছে, যার অভাবে রাইফেলগুলি অচল হয়ে থাকত। অস্ত্রগুলি যাদের হাতে এল, তাদের কিন্তু রাইফেল চালনা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। কারও কাছ থেকে এ বিষয়ে সাহায্য নেবো, এমন লোকও হাতের কাছ নেই। কিন্তু তাতেও তারা ঘাবড়াল না। তাদের উৎসাহ অদম্য। সারারাত জেগে রাইফেলগুলিকে নিয়ে নানাভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে রাইফেল থেকে গুলি ছুড়বার কৌশলটা বেরিয়ে এল। এ তাদের কাছে এক মহা-আবিষ্কার।

সাফল্যের পর সাফল্য। ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের উপর সুপ্রসন্ন হয়ে তাঁর ভান্ডারের বন্ধ দরজাটা এবার তাদের সামনে খুলে ধরেছেন। ইতিপূর্বে মার্চ মাসে গৌরনদী থানা এলাকায় যে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল তাদের হাতে বেশকিছু রাইফেল আর বন্দুক ছিল। সেই মুক্তিবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অধিকাংশ কে কোথায় চলে গেছে তার কোন পাত্তা নেই। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বর্ডারের ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। কিন্তু তাদের অস্ত্রগুলিকে কোথায় রেখে গেছে তারা? শোনা যায়, এই অঞ্চলেই কোথায় নাকি লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। নবগঠিত মুক্তিফ্রন্ট তার জন্মের পর থেকেই এই নিরুদ্দেশ অস্ত্রগুলির অনুসন্ধান করে চলেছিল। অবশেষে সেই পুরানো দলের একটি ছেলের সাহায্য নিয়ে সেই মহামূল্য গুপ্ত সম্পদগুলিকে আবিষ্কার করা গেল। সহজ ব্যাপার নয়, রাইফেল আর বন্দুকে মিলিয়ে সতেরখানা। নিহত পাকসৈন্যদের কাছ থেকে পাওয়া চারটি

রাইফেল আর এই সতেরখানা, মোট একশখানা। মুক্তিবাহিনী এখন একশটি অস্ত্রের অধিকারী। অস্ত্রের সাথে সাথে বেশকিছু বুলেটও পাওয়া গেছে। তাই দিয়ে অনেকদিন কাজ চলবে। একটা নিরালা জায়গায় ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করে এক মাসের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতে লাগল। বহু খোঁজাখুঁজির পর ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একজন প্রাক্তন সৈনিকের সন্ধান পাওয়া গেল। অনেক সাধ্য-সাধনাকরে রাজী করান গেল তাকে। আপাতত প্রথম রাউন্ডে তাকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি ক'টা গ্রাম একেবারে জনমানবশূন্য। ট্রেনিং এর জন্য গোপন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করবার মত নিরালা জায়গাও মিলল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল এই যে, পঞ্চাশটি তরুণ এক মাস কাল ধরে ট্রেনিং নেবে, তারা খাবে কি? এই দুঃসময়ে যারা তাদের অর্থ দিয়ে খাদ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারত, তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রাম থেকে পালিয়ে বিল অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য মুক্তিফ্রন্ড অর্থ সাব-কমিটি ও খাদ্য সাব-কমিটি গঠন করেছিল। তাদের চেষ্টার ফ্রুটি ছিল না বটে কিন্তু এই কঠিন সময়ে যথাশক্তি চেষ্টা করেও তারা তাদের দায়িত্ব পূর্ণ করে উঠতে পারছিল না। তা সত্ত্বে এক মাস ধরে এই ট্রেনিং চলল। প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবকের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়সংকল্প এই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। সত্য কথা বলতে কি, তারা অধিকাংশ সময়ে আধ-পেটা খেয়ে এবং সময় সময় না খেয়েও এই সামরিক ট্রেনিং নিয়ে চলেছিল।

প্রাথমিক প্রস্তুতি সমাপ্ত করে মুক্তিবাহিনী এবার কাজে নামল। তারা প্রথমে সমাজ-বিরোধী শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে নামল। তারা এই সমস্ত দালাল ও দুর্বৃত্তদের নামের একটি কালো তালিকা তৈরী করে নিয়েছিল। পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। ১২ই জুন তারিখে মুক্তিবাহিনী গইলা অঞ্চলের দুইজন কুখ্যাত দালালের বাড়িতে হামলা করল। এদের হাতে প্রথম বাড়িতে আরজান ও তার দুই ছেলে এবং দ্বিতীয় বাড়িতে গইলার প্রতাপশালী চেয়ারম্যান আফতাবুদ্দিন মুন্সী নিহত হোল।

এইভাবে বিভিন্ন স্থানে দালাল হত্যার পর সারা অঞ্চল সাড়া পড়ে গেল। লোকে বুঝল, সামরিক সরকার মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে তাদের দালালদের রক্ষা করতে অসমর্থ। অবস্থা দেখে অন্যান্য দালালরাও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাদের অনেকের কাছ থেকে মুক্তিফ্রন্টের নেতাদের নামে চিঠি আসতে লাগল। কালো তালিকার কথাটা সকলের কাছেই প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কগ্রস্ত দালালরা তাদের সেই সমস্ত চিঠিতে এই মিনতি জানাত যে, তাদের নাম যেন ওই কালো তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। মুক্তিফ্রন্ট যদি তাদের রেহাই দেন, তাহলে তারা মুক্তিফ্রন্টকে অনেক টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে।

এইভাবে দালালদের দমন করে মুক্তিবাহিনী এবার তাদের আসল কাজে নামল।

ইতিমধ্যে একটা অনুকূল যোগাযোগের ফলে মুক্তিবাহিনীর শক্তি আশাতীতরূপে বেড়ে গিয়েছিল। আপনা থেকে একটা বিরাট সুযোগ তাদের হাতে এসে গেল। মুক্তিফ্রন্ট তাদের সংগ্রাম শুরু করবার কিছুটা আগে আর একটা ছোট দল অনুরূপ আদর্শ নিয়ে কার্যক্ষেত্রে নেমে গিয়েছিল। দলটি ছোট হলেও গুণের দিক দিয়ে উন্নত পর্যায়ে। দলের নেতার নাম হেমায়েতউদ্দীন। হেমায়েতউদ্দীন প্রাক্তন সৈনিক। ২৫-এ মার্চ ঢাকায় যখন প্রথম আক্রমণ শুরু হোল, সেই সময় হেমায়েতউদ্দীন ঢাকাতেই ছিলেন। তার কিছু আগেই তিনি কি করে একটা মেশিনগান ও একটা সাবমেশিনগান যোগাড় করে নিয়েছিলেন, একমাত্র তিনিই তা জানেন। এ ছাড়া কয়েকটি রাইফেলও তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল। ঢাকার হামলার পর এই দু'টি ভারী অস্ত্র সুসজ্জিত হয়ে হেমায়েতউদ্দীন চলে এলেন ফরিদপুরে। এখানে এসেই তিনি জঙ্গী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে নেমে গেলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁর ছোট দলটি গড়ে উঠল। তাঁর এই বাহিনীতে মাত্র ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা। ৪ জন প্রাক্তন সৈন্য, আর ৩ জন বেসামরিক লোক। মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রাথমিক অবস্থায় অস্ত্রবলের দিক থেকে এরা ছিল খুবই শক্তিশালী। তাছাড়া এই দলে ছিল যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ৪ জন সৈন্য। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি দলের নেতা হেমায়েতউদ্দীন। পরিচালনা শক্তি, বুদ্ধি ও সাহসের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা কমই মেলে। মুক্তিফ্রন্টের বহু ভাগ্য, এক বন্ধুর মধ্যবর্তিতায় তাদের সঙ্গে হেমায়েতউদ্দীনের যোগাযোগ ঘটল এবং কিছুদিনের মধ্যে এই দুই দল

পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেল। মুক্তিফ্রন্ট হেমায়েতউদ্দীনকে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার বা সেনাপতির পদে নির্বাচিত করল। অস্ত্রশক্তির দিক দিয়ে এবং সামরিক শিক্ষাব্যবস্থার দিক দিয়ে মুক্তিবাহিনী এবার থেকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

মুক্তিফ্রন্টের এই বাহিনীতে যোগ দেবার আগে হেমায়েতউদ্দীন তাঁর এই ছোট্ট দলটিতে নিয়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে কাজ করে চলেছিলেন। কোন রাজনৈতিক দলের লোক নন তিনি। তাহলেও সারা প্রদেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল তারপর বর্বর পাকসৈন্যদের নৃশংস অত্যাচার তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। যে করেই হোক এদের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতেই হবে- এই প্রতিজ্ঞা তার ধ্যান, জ্ঞান আর জপমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

এইভাবে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে হেমায়েতউদ্দীনের এই ছোট্ট দলটি একান্তভাবে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করেই কাজে নামল। ৯ই মে তারিখে তাঁরা ফরিদপুরের কোটালিপাড়া থানা আক্রমণ করেছিলেন। থানায় সশস্ত্র পুলিশরা ছিল, দু'চারজন মিলিটারির লোকও ছিল। কিন্তু মেশিনগানের গুলিবর্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করবার মত হিম্মত তাদের ছিল না। তারা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থানা ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাল। হেমায়েতউদ্দীন সেখানে বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি পেয়ে গেলেন।

পাক-সৈন্যরা একটার পর একটা অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। তাদের অধিকার পাকাপোক্ত হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুসলিম লীগ-পন্থী ও জামাত-পন্থী দালালের দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। গুলি ও লুটেরার দলও তাদের সঙ্গে হাত মিলাল। হেমায়েতউদ্দীন প্রধান রোখ পড়ল এদের উপর। তিনি বললেন, এই ঘরের ইঁদুরগুলিকে খতম করতে না পরলে মুক্তিসংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই প্রথমেই এদের শায়েস্তা করতে হবে। এ শুধু কথার কথা নয়, তিনি যা বললেন তা কাজেও পরিণত করে চললেন। অদ্ভুত তাঁর সাহস, প্রকাশ্য দিবালোকে এক হাট লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি এই সমস্ত দেশদ্রোহী দালালদের উপর কড়া দাওয়াই প্রয়োগ করতেন। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।

কিছু দিনের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হয়ে উঠল, দালালদের হুকম্প জাগল। ওদিকে সামরিক কর্তৃপক্ষও চুপ করে বসে ছিল না। মুক্তিবাহিনীকে চূর্ণ করে দেবার জন্য তারা সদলবলে তৈরী হচ্ছিল। প্রধানত এই উদ্দেশ্যে তারা কোটালীপাড়া থানায় তাদের মূল ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। সৈন্যরা একা, তাদের সঙ্গে ছিল পুলিশ আর রাজাকার বাহিনী।

এদিকে মুক্তিবাহিনীও তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এবার তাদের সামনে অগ্নিপরীক্ষা। এতদিন তারা এখানে ওখানে ছোটখাট আক্রমণ চালিয়েছে, কিন্তু এরা দম্ভুরমত যুদ্ধ। মুক্তিফ্রন্টের গোয়েন্দা বিভাগের চরেরা সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, সৈন্য পুলিশ আর রাজাকার মিলিয়ে বেশ বড় একটা বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে অক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একটা সুখবর, ওদের সঙ্গে মেশিনগান নেই। একমাত্র রাইফেলের উপরই তাদের নির্ভর। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর হাতে আছে একটা মেশিনগান আর একটা সাব-মেশিনগান। তাছাড়া রাইফেল তো আছেই। মুক্তিফ্রন্ট সিদ্ধান্ত নিল, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ নয়, আগ বাড়িয়ে ওদের উপর আক্রমণ চালাতে হবে। ওদের অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের চমকে দিতে হবে। তারিখটা ছিল ১৪ই জুন। গভীর রাত্রিতে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নৌকাযোগে শত্রুদের মূল ঘাঁটি কোটালিপাড়া তানার দিক যাত্রা করল। তাদের ছোট ছোট এক-মাল্লাই নৌকাগুলি রাত্রির অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ঠিক সেই রাত্রিতেই পাক-সৈন্য বাহিনীও আক্রমণশূলক পরিকল্পনা নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটির দিকে এগিয়ে আসছিল। এই দুই দল হরিণাহাটি নামক গ্রামের কাছে এসে পরস্পরের সম্মুখীন হোল।

ওদের আটখানা বড় বড় হিফ নৌকা ছপ্ ছপ্ করতে করতে এগিয়ে আসছে। নৌকাগুলির মধ্যে সৈন্য, পুলিশ আর রাজাকাররা মিলিয়ে প্রায় দু'শো জন লোক ছিল। মুক্তিবাহিনীর ছোট ছোট নৌকাগুলি প্রথমে ওদের

নজরে পড়েনি। ফলে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা প্রথমে আক্রমণের সুযোগ পেয়ে গেল। এ রকম আকস্মিক আক্রমণের জন্য ওরা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কমান্ডার হেমায়েতউদ্দীনের দক্ষ পরিচালনায় মুক্তিবাহিনীর মেশিনগান ও সাব-মেশিনগান দু'টি একই সঙ্গে ছিপগুলিকে লক্ষ্য করে অবিরল ধারায় গুলিবর্ষণ করে চলেছে। ওরা একটু বাদেই প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে তার প্রত্যুত্তরে রাইফেল চালাতে লাগল। কিন্তু ওদের মনোবল আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাছাড়া ওদের পুলিশ আর রাজাকারদের মধ্যে শৃঙ্খলা বলতে কোন কিছু ছিল না। তারা সবাই যে যার প্রাণ বাচাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অপর দিকে মুক্তিবাহিনীর মেশিনগান আর রাইফেলগুলি ওদের উপর অশ্রান্তভাবে মরণ-আঘাত হেনে চলেছে। এই প্রবল আক্রমণের মুখে ওরা সংখ্যায় বেশী হোলেও বেশীক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারল না। ওরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য নৌকা থেকে খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সৈন্য, পুলিশ আর রাজাকার সবাই এই একই পন্থা অনুসরণ করল। এইভাবেই হরিণাহাটি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল, মুক্তিবাহিনীর জয়ধ্বনিতে হরিণাহাটির নৈশ আকাশ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে চলল।

যুদ্ধের ফলাফল দেখে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেরাই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। এত বড় সাফল্যের কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। পরদিন সকালবেলা নৌকার মধ্যে ও জলের ওপর শত্রুপক্ষের ৫০টি মৃতদেহ পাওয়া গেল। ১৮ জন তাদের হাতে বন্দী হয়েছে। বাকি সবাই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মাত্র একজন মারা গেছে। তার নাম ইব্রাহিম। মুক্তিবাহিনী ওদের নৌকার ভেতর থেকে ৫টি রাইফেল ও বেশকিছু বুলেট উদ্ধার করল।

এ-সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে, শত্রুরা পর পর দু'বার ঘা খেয়ে ক্ষান্ত থাকবে না, তাদের আক্রমণ আসন্ন। সেজন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। পরদিন ১৬ই জুন তারিখ মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি খালের পূর্বদিকে কোদালধোয়া গ্রামে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল। কিন্তু এই সংবাদটা শত্রুদের অগোচর রইল না। খবর পাওয়াটা গেল তারা সেদিনই তাদের বর্তমান ঘাঁটির দিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। ওদের লঞ্চ সেখান থেকে এক মাইল দূরে পয়সারহাট বাজারে এসে ভিড়েছে। শত্রুদের লঞ্চ এই খালের উপর দিয়ে আসবে। মুক্তিযোদ্ধারা খালের দু'পাশে স্থানে স্থানে পজিশন নিয়ে তৈরি হয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এইভাবে ঘন্টাখানেক সময় কেটে গেল, কিন্তু সেই লঞ্চটির আর দেখা নেই। শেষে খবর পাওয়া গেল যে, ওরা পয়সারহাট বাজারে খানাপিনার উৎসবে মেতে গেছে। এই বাজারে যে-সমস্ত খাদ্য-দ্রব্য মেলে ওরা তা জবরদস্তি করে লুটেপুটে নিচ্ছে।

কমান্ডার হেমায়েতউদ্দীন স্থির করলেন, মুক্তিবাহিনীর একটা দল এখানেই মোতায়েন থাকবে। অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি দু'মাইল পথ এগিয়ে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে লঞ্চসহ শত্রুদের ঘেরাও করে ফেলবেন। এই পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর দল সবেমাত্র কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছে, এমন সময় শত্রুসৈন্যবাহী লঞ্চটা তাঁদের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। জায়গাটা এমন যে, সেখানে দাঁড়িয়ে পজিশন নেওয়ার খুবই অসুবিধা। কিন্তু উপায়ন্তর না থাকায় সেখানেই তাদের পজিশন নিতে হোল। শত্রুরা তাদের দেখতে পেয়েছে এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়তে শুরু করে দিয়েছে। মুক্তিসেনাদের মেশিনগান ও রাইফেলের গুলিও তার প্রত্যুত্তর দিয়ে চলল। তাদের প্রবল গুলিবর্ষণের ফলে লঞ্চটা জায়গায় জায়গায় ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা বেগতিক দেখে শত্রুরা তাদের লঞ্চ নিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেবার চেষ্টা করছিল। কমান্ডার হেমায়েতউদ্দীন পলায়মান লঞ্চের পেছনে পেছনে ধাওয়া করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লঞ্চ তাঁদের আক্রমণের নাগালের বাইরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘন্টা দেড়েক ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। তাতে হানাদারদের মধ্যে ছয়জন সৈন্য নিহত ও অনেক সৈন্য আহত হয়।

সেইদিনই বিকালবেলা দু'দল পাক-সৈন্য দু'দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি কোদালধোয়া গ্রামটিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে থাকে। একটি দল মাদারীপুর থেকে স্পীডবোট বোঝাই করে আসছিল। তারা অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছিল বটে, কিন্তু তাদের দালালদের মুখে মুক্তিবাহিনীর

মেশিনগানের শক্তির পরিচয় পেয়ে তারা আর বেশীদূর এগুতে ভরসা করল না। শেষ পর্যন্ত তাদের মনের ক্ষোভ মেটাবার জন্য তারা পীড়ারবাড়ি গ্রামে হামলা করে, সেখানকার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে গেল। অপরদিকে গৌরনদী, উজিরপুর, কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ থেকে চারটি স্পীডবোট বোবাইকরে বহু পাক-সৈন্য আর একদিক দিয়ে কোদালধোয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মুক্তিফৌজ সামনে এগিয়ে গিয়ে এই হানাদার শত্রুদের প্রতিরোধ করে দাঁড়াল। দু'পক্ষে প্রবল সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী শত্রুদের পয়সাহাট থেকে আট মাইল দূরে তাড়িয়ে দিয়ে জয়-গৌরবে ফিরে আসে। এই যুদ্ধে নয়জন পাক-সৈন্য মারা যায়।

গৌরনদীর প্রতিরোধ*

২৫শে এপ্রিল। মিলিটারী আসছে, গৌরনদীর সর্বত্র রব উঠল। সকাল থেকে চারখানা লেলিকপটার বেশ উঁচু দিয়ে বার বার মাদারীপুর থেকে যে রাস্তা গৌরনদীর বুক চিরে বরিশালের দিকে চলে গেছে তার উপর দিয়ে উড়ছে। ওদিকে বরিশাল শহরের চার মাইল উত্তরে জুনাহায়ে প্রচন্ড গোলা বিনিয়ম হচ্ছে মুক্তি বাহিনীর সাথে। কামানের গর্জন, গানবোটের শেলিং আর মর্টারের শব্দে থেকে থেকে খেঁপে উঠছে। অপর দিকে খবর পাওয়া গেল, মাদারীপুর দুদিন পূর্বে পাকবাহিনী দখল করে নিয়েছে এবং আজকেই সড়কপথে দস্যুরা গৌরনদী হয়ে বরিশাল যাবে। কি করা যায় ভাবছে কৃষক-শ্রমিক আর রাজনৈতিক কর্মীরা। মুহূর্তের মধ্যে স্থির করে নিল তারা। যে করে হোক হানাদারদের বাধা দিতে হবে। অন্তত বাধা দেয়ার চেষ্টা করতেই হবে? বীর যোদ্ধারা জানতো, সম্মুখযুদ্ধে কয়েকটা ৩০৩ রাইফেল আর পাঁচ-দশ রাউন্ড করে গুলি দিয়ে ভারী অস্ত্রের সামনে কিছুই করা যাবে না। তবুও সাধারণ মানুষ যাতে ভেঙ্গে না গড়ে বা ভুল না বোঝে তার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। তাই তারা সকাল থেকে গৌরনদীর উত্তরে কটকস্থল নামক স্থানে পজিশনে রইল। ঘন্টা কেটে যাচ্ছে তবুও শত্রুর সাথে দেখা নেই।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। রৌদ্রের প্রখরতায় পিপাসাকাতর হয়ে পড়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের গোপন অবস্থান থেকে (সিএন্ডবি সড়কের পাশে) কয়েক গজের মধ্যেই সাধারণ কৃষক জহরউদ্দীন মোল্লার বাড়ী। তাই কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পানি খাওয়ার জন্য জহর মোল্লার আঙ্গিনায় বিরাট বটগাছটার ছায়ায় বসলো। ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে আর জহরউদ্দীন মোল্লা পানি ঢেলে দিচ্ছে। যেখানে বসে মুক্তিকামী ভাইয়েরা বিশ্রাম নিচ্ছিল তার থেকে কয়েক গজ উত্তরে একটা উঁচু পুল রয়েছে। এত উঁচু যে পুলের অপর দিক থেকে কিছুই দেখা যায় না। দুপুর গড়িয়ে বেলা তখন তিনটা। হঠাৎ করে শব্দ না করে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। পরপর আরও কয়েকটা একেবারে গুনে গুনে চল্লিশটা। বর্বর সেনারা গুলি চালালো। বসা অবস্থায়ই শহীদ হলেন চারজন মুক্তিযোদ্ধা। শহীদ হলো জহরউদ্দীন মোল্লা ও তার ছেলে মোবারক মোল্লা। মুক্তিবাহিনীর হাতে সেদিন খতম হল দু'জন খানসেনা।

সেদিন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়া মুক্তিবাহিনী কয়েক দিনের মধ্যেই আবার একত্রিত হল। এই একত্রিত করার পেছনে যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছিল তারা হলেন এস, এম রকিব, অধ্যাপক এনায়েত, সেন্টু ও আরও কয়েকজন। তাদের প্রচেষ্টায় ২৪টা রাইফেল ও তিনশত রাউন্ড গুলি দিয়ে প্রথম দল গঠন করা হয়। পরে এই দল মিলিত হয় গোপালগঞ্জের হেমায়েতের সঙ্গে।

গৌরনদীর প্রতিরোধ সংগ্রামে আরও যাদের নাম অম্লান তাদের কথা কিছু লিখতেই হবে। এই দলটি সরিকলে ঘাঁটি করেছিল। এই দলটি খসরুর পার্টি নামে পরিচিত ছিল। এরা বয়সে তরুণ এবং সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটি শক্তিশালী দল হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলেছিল। এরা সাধারণত হিট এ্যাণ্ড রান করে অনেক অস্ত্র পাক সৈন্য, পুলিশ ও রাজাকারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। বহু দালাল

* 'দৈনিক বাংলা,' ২৪ মার্চ, ১৯৭২-এ প্রকাশিত মহীদ সেরনিয়াবাত রচিত প্রতিবেদনের অংশ।

এদের হাতে নিহত হয়েছে। এরা নিজ হাতে অস্ত্র তৈয়ারও করত। আজও সরিকলবাসী আলমের কথা ভোলেনি। নিজের তৈরি বোমার আঘাতেই আলম শহীদ হয়েছেন সরিকলের শামসু মিয়র বাড়িতে। জনতার প্রতিরোধ শক্তিশালী, দুর্জয়। তার প্রমাণ গৌরনদীর বাকহি। বাকাইর বীর জনতা বল্লম দিয়ে মেরেছিল চার-চারটে তরতাজা পাঞ্জাবী দস্যুকে। কেড়ে নিয়েছিল চারটে চায়না রাইফেল।

সেদিন ছিল ১৪ই মে। একদল খানসেনা বাকাই গ্রামে ঢুকে পড়েছে। যেভাবে হোক তাদের রুখতেই হবে। তাই প্রস্তুত হয়ে গেল গ্রামবাসী। হাতে বল্লম ও রামদা। কয়েকজন গ্রামবাসী যেখান দিয়ে খানসেনারা আসবে সেই পথের ধারে একটি গর্তের মধ্যে আত্মগোপন করে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খানসেনারা কাছে এসে গেল। মুহূর্তের মধ্যে কয়েকটি বল্লম নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করলো। বল্লম একেবারে হানাদার চারটের বক্ষভেদ করে দিল। তারপর টুকরো টুকরো করে চড়িয়ে দিল সে মৃতদেহ চারটি। খানসেনারা ওর পর থেকে আর ঢোকেনি বাকাই গ্রামে।

খুলনার প্রতিরোধ যুদ্ধ*

খুলনার মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্ব

২৫শে মার্চ। পরিস্থিতি গুরুতর, সেটা সবাই বুঝতে পারছে। আবহাওয়া ক্রমেই যেন ভারী হয়ে আসছে। খুলনার রাজনৈতিক নেতারা অবস্থাটা বুঝবার জন্য ঢাকার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করছিলেন। কিন্তু রাত্রি আটটার সময় ফোনের যোগাযোগ একবারেই বন্ধ হয়ে গেল। তখনি তাঁদের মনে সন্দেহ জাগল ঢাকার অবস্থা ভাল নয়, একটা কিছু অঘটন ঘটেছে।

কর্মীদের চোখে ঘুম নেই। রাত্রি ১২টার সময় একটা ঘোষণার শব্দ শুনে তারা মকে উঠল। শুধু তারা নয়, সারা শহরের ঘুমন্ত মানুষ শয্যা ছেড়ে উঠে বসেছে। সরকারী ঘোষণাকারীরা সারা শহরে ঘুরে ঘুরে মাইকযোগে প্রচার করে ফিরছে যে, আগামীকাল ২৬শে মার্চ সকাল পাঁচটা থেকে সারা শহরে ৭২ (বাহাদুর) ঘন্টা পর্যন্ত কারফিউ জারী করা হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে যদি কেউ ঘর ছেড়ে পথে বেরোয় তবে তাকে সঙ্গে গুলি করা হবে।

অনেকেই অনুমান করল, ঢাকা শহরে অথবা আর কোথাও অবশ্যই একটা কিছু হয়ে গেছে এবং তার জের সারা প্রদেশময় ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু প্রথম আক্রমণ করেছে কারা-পাকিস্তানির জঙ্গী বাহিনী না মুক্তিকামী জনগণ?

ইতিমধ্যে সবার অগোচরে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা ঘটেছে কারফিউ জারী করার বেশ কিছু আগেই। এটা একটা আশাতীত সুখবর। আজই রাত্রিতে ইপিআর বাহিনীর জনৈক পাঞ্জাবী অফিসার তাঁর কয়েকটি প্রিয়-পাত্রকে এই বলে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন ইপিআর এর লোকদের সামনে এক ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও আর দেবী না করে এখনি পালিয়ে যাও। স্থানীয় ইপিআর বাহিনীতে প্রায় তিন শত জন লোক। খবরটা তারেদ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ইপিআর লাইন খালি হয়ে গেল। তারা রাতের অন্ধকারে সেই স্থান ত্যাগ করে সুশৃঙ্খলভাবে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নিল। আপর দিকে কারফিউ জারী হবার পর অবস্থা সঙ্গীন বুঝতে পেরে শহরের পুলিশরাও তাদের ব্যারাক ছেড়ে পালিয়েছে।

গভীর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সেই রাতটা কেটে গেল। পরদিন সকালে কি ঘটনা ঘটে দেখবার জন্য সবাই উদ্ভিগ্ন কারো চোখে ঘুম নেই। স্বাধীনতার সংগ্রাম কি তবে সত্য সত্যই শুরু হয়ে গেছে? বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। কে কোথায় আছে তাও ভালভাবে জানে না, অথচ অবিলম্বে উদ্যোগ নিয়ে কিছু একটা করতে হবে। সাধারণ মানুষ তো তাদের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। কারফিউ শুরু হবে কাল

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' থেকে সংকলিত

সকাল পাঁচটায়। অথচ মিলিটারীর লোকেরা ইতিমধ্যে সারা শহরের পথে পথে টহল দিয়ে ফিরছে। ওরা নিশ্চয়ই সব কিছু চোখে চোখে রাখছে। এখন বাইরে চলাচল করতে হোলে সতর্কভাবে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে।

বেশ কিছু খোঁজাখুঁজির পর তিনজন এক জায়গায় মিলিত হলেন। একজন আওয়ামী লীগের, একজন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ও একজন ছাত্রলীগের নেতা। ইতিমধ্যে একটা খবর তাঁদের কাছে এসে পৌছেছে যে, ইপিআর বাহিনীর সমস্ত লোক ইতিপূর্বে তাদের জায়গা ছেড়ে দৌলতপুরের দিকে পালিয়েছে। সংবাদটা সুসংবাদ। তাঁরা তিন জনে বসে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। নিজ নিজ দলের মতামত নেওয়ার মত সময় ছিল এখন সমন একটা সময়, যখন ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক, যা করবার নিজেদের দায়িত্বেই করতে হবে। এই পরিকল্পনা নিয়ে এই তিন জন অতি সঙ্গোপনে শহর ছেড়ে দৌলতপুরের দিকে চলে গেলেন।

ইপিআর বাহিনীর পলাতক লোকেরা দৌলতপুর থেকে চার মাইল দূরে রংপুর, শাহপুর, লতা প্রভৃতি প্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামবাসীদের ঘরের দরজা তাদের জন্য অব্যাহত, তারা নিতান্ত আপনজনের মত তাদের নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছে। এতো যে বিপদের আশংকা আছে, এ কথাটা কি তাদের জানা ছিল না? ছিল বৈকি। কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম করতে হলে দুঃখ আর বিপদ আর মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে। এই পলাতকের দল প্রাণ বাচানোর জন্য পালিয়ে এসেছিল একথা সত্য, কিন্তু সেটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তার চেয়েও বড় কথা, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পশ্চিমা শাসকদের জঙ্গী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যদি প্রাণ দিতে হয়, প্রাণ দেবে। সারা বাংলাদেশের মানুষ যে অনেক আশা করে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাই পালিয়ে আসার সময় তারা যত বেশী সম্ভব রাইফেল, কার্তুজ আর গোটা কয়েক লাইট মেশিনগান সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

যে তিনজন স্থানীয় নেতা এদের সন্ধানে শহর থেকে চলে এসেছিলেন তাঁরা এদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। পরামর্শ করলেন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই বাহিনী অবিলম্বে দ্রুত মার্চ করে খুলনা শহর দখল করে নেবে।

ইপিআর আর পুলিশ মিলে এই বাহিনীতে শতিনেক লোক ছিল, তাছাড়া তাদের সঙ্গে কিছু-সংখ্যক সাধারণ লোকও ছিল। যে তিন জন রাজনৈতিক নেতার কথা আগে বলেছি, তাঁরা প্রথম থেকেই এদের সঙ্গেই ছিলেন এবং এই বাহিনীকে সংগঠন করা আর এই আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করবার পেছনে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। রংপুর, শাহপুর ও লতা এই তিনটি গ্রামের মাঝখানে আড়ংঘাটা ময়দান। এরা সুশৃঙ্খলভাবে সেই ময়দানে জমায়েত হোল, তারপর শহর দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। বেশ কিছুদূর এগিয়ে আসার পর তেলিগাতি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে শত্রুপক্ষের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা করল।

কলেজের কাছে পঁচিশ/ত্রিশ জন পাক-সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল। সে কথাটা এদের অজানা ছিল না। তারা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে অতিসন্তর্পণে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে আচমকা আক্রান্ত হয়ে পাক-সৈন্যদের সেই ছোট দলটি কিছুটা দিশাহার হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণের গুলিবর্ষণের পর তারা কুড়িটি মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। সেই সংঘর্ষে এ পক্ষের মাত্র দু'জন পুলিশ মারা গিয়েছিল।

এরা পালিয়ে যাওয়ার ফলে একটা ট্রাক ও গোটা কয়েক জীপ মুক্তিবাহিনীর দখলে এসে গেল। প্রায় পঞ্চাশ জন মুক্তিযোদ্ধা এই গাড়িগুলিতে চেপে পলাতক শত্রুর পেছনে পেছনে ধাওয়া করে এগিয়ে চলল। মুক্তিবাহিনীর বাকি যোদ্ধারা যানবাহনের অভাবে পায় হেঁটে আসছিল। তারা কিছুটা পেছনে পড়ে গেল।

মুক্তিবাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্য প্রায় আড়াইশ' পাক-সৈন্য দৌলতপুরের 'বৈকালী' সিনেমার কাছে অপেক্ষা করছিল। মুক্তিবাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা পাবলিক লাইব্রেরি ও গার্লস কলেজে ঘাঁটি করে বসল।

এবার দু'পক্ষের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মত সংঘর্ষ ঘটল। নিউজপ্রিন্ট পেপার মিলের সামনে কিছুসংখ্যক ই,পি,আর,- এর লোক মোতায়েন করা ছিল। তারা এসে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দিল। শুধু তারাই নয়, নিউজপ্রিন্ট পেপার মিলের একদল শ্রমিকও তাদের সঙ্গে এসে সামিল হোল। এবার মুক্তিবাহিনী এক নতুন কৌশল গ্রহণ করল। দু'পক্ষের যখন যুদ্ধ চলছে তখন মুক্তিবাহিনী পেছন দিককার অংশটা প্রতিপক্ষের দৃষ্টির আড়ালে বিল অঞ্চল দিয়ে ওদের পেছনে দিক দিয়ে হানা দিল। হঠাৎ এভাবে দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পাক সৈন্যরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করল। এই সংঘর্ষের ফলে তাদের বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছিল। মুক্তিবাহিনী উল্লাস-ভরে জয়ধ্বনি দিতে দিতে গার্লস কলেজ ও পাবলিক লাইব্রেরি দখল করে নিল।

কিন্তু এই তো সবে সূচনা। আসল যুদ্ধের তখনও অনেক বাকি।

একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের আক্রমণকারী জঙ্গী বাহিনী, অপরদিকে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণ। এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য মারতেও জানে, মরতেও জানে। খুলনা শহরের রাজপথে বৃকের রক্ত ঢেলে দিয়ে তারা এই সত্যটিকে প্রমাণিত করেছিল। এই যুদ্ধ একটানা ছত্রিশ ঘন্টা পর্যন্ত চলেছিল।

মুক্তিবাহিনীর এই প্রবল একটানা আক্রমণের সামনে প্রতিপক্ষ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারত না। যথেষ্ট সৈন্য থাকলেও এবং উন্নততর আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হলেও নৈতিক দিক থেকে এরা ছিল দুর্বল। কিন্তু বাইরে থেকে আর একদল সৈন্য এদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে ওদের শক্তি আশাতীতভাবে বেড়ে গেল। খুলনার রক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করে তোলবার জন্য ২৪-এ মার্চ তারিখে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে যানবাহন ও আধুনিক সমরোপকরণে সজ্জিত এক বিরাট সৈন্যবাহিনী রওনা হয়েছিল। কিন্তু তারা বিনা বাধায় আসতে পারেনি। পথের মাঝখানে দেশপ্রেমিক জনতা তাদের রুখে দাঁড়িয়েছিল। তারা প্রথম বাধা পায় যশোর জেলার অন্তর্গত নওয়াপাড়া গ্রামে।

এখানে ই,পি,আর-এর কোন সশস্ত্র লোক ছিল না। তবু দুঃসাহসী পুলিশ, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই দুর্বল ও ভঙ্গুর বাধাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে হামলাকারীর দল তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলল। ওরা দ্বিতীয়বার বাধা পেলো খুলনা জেলার ফুলতলা অঞ্চলে। মুক্তিবাহিনী এদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করবার জন্য তাদের বাহিনীর একটি অংশকে পাঠিয়েছিল। ফুলতলা অঞ্চলে দু'পক্ষের সংঘর্ষ ঘটল। সেখানে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলেছিল। এদের এই প্রবল আক্রমণের ফলে যশোর থেকে আগত পাক-সৈন্যবাহিনী যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করার পর মধ্যপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

একটা অংশ তাদের হতাহত সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে যশোরের দিকে ফিরে চলে গেল। কিন্তু বৃহত্তর অংশটি খুলনা শহরে রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলল। এদের সঙ্গে ছিল পঁয়ত্রিশটি গাড়ি বোঝাই সৈন্য, আর ষোলটি কামান সজ্জিত জীপ। ফুলতলা থেকে খুলনা শহর ষোল মাইল দূরে, পথের মাঝখানে সংগ্রামী জনতা বহু বাধা ও ব্যারিকেডের সৃষ্টি করে তুলেছিল, যার ফলে এই ষোল মাইল পথ অতিক্রম করতে এদের আঠারো ঘন্টা সময় লেগেছিল।

যশোরের সৈন্যদল এসে পৌঁছবার পর পাক-সৈন্যবাহিনীর শক্তি বহু পরিমাণে বেড়ে গেল। শুধু সৈন্য-সংখ্যার দিক দিয়েই নয়, এরা ষোলটা মর্টার নিয়ে এসেছে। অপর দিকে খুলনা শহরের শ্রমিক ভাইয়েরা দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে চলেছে। এরা মৃত্যুভয় ভুলে গিয়ে উন্মত্তের মত যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে।

যখন দু'পক্ষে প্রবল হানাহানি চলছে, তখন হঠাৎ দেখা গেল পাক-সৈন্যবাহিনী একটু পেছনে চলে গিয়ে শ্বেতপতাকা তুলে ধরেছে। তার মানে এরা আত্মসমর্পণ করতে চাইছে। থেমে গেল যুদ্ধ। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা

জয়োল্লাসে মেতে উঠল। তারা নিশ্চিত মনে পাক-সৈন্যদের বন্দী করবার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু এটা যে ওদের ছলনা মাত্র, একটু বাদেই তা বুঝতে পারা গেল। ওরা অপ্রস্তুত অবস্থায় কাছে এগিয়ে আসতেই জঙ্গী বাহিনীর মেশিনগানগুলি তাদের লক্ষ্য করে একসঙ্গে গর্জে উঠল। ফলে মুক্তিবাহিনীর বহু লোক হতাহত হল। ওদের মর্টারগুলি একসঙ্গে অনর্গল অগ্নিগোলক উদগীরণ করে চলেছে। এর প্রত্যুত্তর দেবার মত উপযুক্ত অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল না। সেই অগ্নিবর্ষণের ফলে তারা পতঙ্গের মত পুড়ে ছাই হতে লাগল। এরপর তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আর উপায় রইল না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর খুলনা শহরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই যুদ্ধে বহু পাক-সৈন্য হতাহত হয়। তাদের মধ্যে একজন মেজর মারা যান এবং খুলনা সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল শামস গুরুতরভাবে আহত হন।

খুলনার মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব

খুলনা শহরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেলেও ছাত্ররা প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত হয়নি। ২৬শে মার্চ থেকে শুরু করে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত তারা গোপনে নানা জায়গায় পজিশন নিয়ে পাক-সৈন্যদের উপর ইতস্তত চোরাগোষ্ঠা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে তারা বেশ কয়েকজন সৈন্যকে হত্যা ও জখম করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই গুপ্ত আক্রমণ চালাবার কালে কোন ছাত্র মারা যায়নি বা শত্রুর হাতে ধরা পড়েনি।

২৮শে মার্চের যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনী যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাই বলে তারা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়নি। শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ করবার জন্য তারা বাগেরহাটে গিয়ে মিলিত হোল। বাগেরহাটে প্রাক্তন সামরিক অফিসার মেজর জলিল ইপিআর ও পুলিশের লোকদের নিয়ে এক মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। খুলনা থেকে যারা বাগেরহাট গিয়েছিল তারা মেজর জলিলের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। ফলে এদের সংখ্যা দাঁড়াল সাতশ'শ। মেজর জলিল কোন দিকে নতুন করে আক্রমণ করা যায় সেই পরিকল্পনা রচনা করে চলেছেন।

খুলনা শহর শত্রুপক্ষের অধিকারে থাকলেও সেখানকার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী শত্রুদের দৃষ্টির আড়ালে গোপনে গোপনে কাজ করে চলছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁদের প্রাণপ্রিয় শহরটিকে তাঁরা শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবেন, এই আশা বা পরিকল্পনা তাঁদের ছিল না। তবু শত্রুপক্ষকে অতিষ্ঠ করে তোলাবার জন্য এবং প্রচারকার্যে সুযোগ লাভের জন্য আরও একটা ঘা মারবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এটিকে খুলনা শহরের মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব বলা চলে। শত্রুঅধিকৃত শহরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে যে নতুন আক্রমণ চালানো হয়েছিল, তা থেকে তাঁদের দুঃসাহস ও রণকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

জনৈক সুপরিচিত স্থানীয় নেতা এই পরিকল্পনাটি রচনা করেন এবং তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেন। তিনি খুলনা শহর থেকে চলে গেলেন বাগেরহাটে। তারপর সেখানে মেজর জলিলের সঙ্গে তাঁর এই নতুন পরিকল্পনা নিয়ে পরামর্শ করলেন। মেজর জলিল তাঁর এই পরিকল্পনাকে অনুমোদন ও সমর্থন করার পর তিনি তার বাহিনী থেকে ১১০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

এই মুক্তিযোদ্ধারা রাত্রির অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে খুলনা শহরে এসে প্রবেশ করলেন। পাক-সৈন্যবাহিনীর কর্তারা এমন যে ঘটতে পারে সে কথা কল্পনাও করতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের ময়া ছেড়ে দিয়েই এই দুঃসাহসিক কাজে পা বাড়িয়েছিল। গভীর রাত্রে তারা শহরের বেতার ঘাঁটি আক্রমণ করল, তারা স্থায়ীভাবে বেতার ঘাঁটি নিজেদের দখলে রাখতে পারবে, এই চুরাশা তাদের ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি দিনের

জন্য হলেও তারা এটাকে নিজেদের দখলে রাখবে এবং এর মধ্য দিয়া সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছ স্বাধীন বাংলার বাণী ছড়িয়ে দেবে।

সে সময় আঠারো জন পাক-সৈন্য বেতার ঘাঁটি পাহারা দিচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা আচমকা আক্রমণ চালিয়ে তাদের আঠারো জনকেই খতম করল। পাহারাদার পাক-সৈন্যরা তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিজেরাই গুলি চালিয়ে বেতার ঘাঁটির ট্রান্সমিটারগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছিল। ফলে বেতার ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে এল বটে, কিন্তু তারা তাকে তাদের কাজে লাগাতে পারল না। বেতার ঘাঁটি দখল করার ফলে তাদের হাতে একটা মেশিনগান, ছয়টা গ্রেনেড এবং আরও কিছু অস্ত্রশস্ত্র এসে গিয়েছিল।

রাতটা কেটে গেল। ১১০ জন মুক্তিযোদ্ধা শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করবার জন্য শহরের এক প্রান্তে প্রতিরোধ ঘাঁটি তৈরী করে অপেক্ষা করছিল। এই শক্তিশালী শত্রুদের পরাজিত করতে বা হটিয়ে দিতে পারবে না, একথা তারা ভাল ভাবেই জানতে, কিন্তু যাবার আগে তাদের একটু শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে।

সকাল হতে না হতেই পাক-সৈন্যবাহিনী তাদের আক্রমণ করাবার জন্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে এল। প্রথমে তিন লরী বোঝাই সৈন্য, তারপর কতকগুলি খালি গাড়ি, অবশিষ্ট সৈন্যরা মার্চ করে আসছে। ওরা নাগালের মধ্যে আসতেই মুক্তিযোদ্ধারা তিনটি লরীকে লক্ষ্য করে ছ'টি গ্রেনেড ছুড়ল। এই গ্রেনেডগুলিকে তারা বেতার ঘাঁটির মধ্যে পেয়েছিল। অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রেনেড। গ্রেনেড ছোড়ার ফলে তিন লরী বোঝাই সৈন্য লভভন্ড হয়ে গেল।

এই মারাত্মক দুর্ঘটনার ফলে তাদের পেছনে যে সৈন্যরা আসছিল, তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করার পর ওরা বুঝতে পারল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আর গ্রেনেড নেই, এবার নিশ্চিত মনে এগোনো যেতে পারে। মুক্তিযোদ্ধাদের তুলনায় এদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী। তাদের হাতে মাত্র একটি মেশিনগান, বাকী সবই রাইফেল। এ অবস্থায় দু'পক্ষে বেশীক্ষণ লড়াই চলতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আশাতীত সাফল্যের ফলে খুবই খুশী হয়েছিল। এবার তারা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দ্রুত সরে পড়বার জন্য চেষ্টা করল। পাক-সৈন্যরা তাদের এই উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাদের খতম করে দেবার জন্য দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হোল। তাদের একটা অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের পাশ কাটিয়ে তাদের ঘেরাও করে ফেলবার জন্য চেষ্টা করছিল। মুক্তিবাহিনীর নেতা বুঝতে পারলেন তাঁরা এক ভীষণ সংকটজনক অবস্থায় এসে পড়েছেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে গাড়ি আছে, আর তাদের পায়ের উপর নির্ভর করে ছুটতে হবে। এ অবস্থায় এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজ কথা নয়। যদি বাঁচতে হয় তবে নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হবে, কিছ সংখ্যক লোকের মায়া ছেড়ে দিয়ে বাকি সবাইকে বাঁচাতে হবে।

দু'পক্ষের মাঝখানে তখনও কিছুটা ব্যবধান ছিল। নেতা নির্দেশ দিলেন; কয়েকজনকে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। বাকি সবাই যতক্ষণ নিরাপদে পালিয়ে যেতে না পারে, ততক্ষণ এরা যতই বিপদ ঘটুক না কেন, পেছনে হটেবে না, সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে। এর নাম সুইসাইড স্কোয়াড। এভাবে আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত আছে কারা, তিনি আহবান জানালেন। একটু সময় সবাই চুপ করে রইল, তারপর সামনে এগিয়ে এল ছ'জন। নিজেদের জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আর সকলের আত্মরক্ষার সুযোগ করে দেবে।

এই রণকৌশল সার্থক হোল। সেদিনকার সেই ছ'জন মুক্তিযোদ্ধা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে শত্রুদের হাতে ধরা পড়ল। বাকী সবাই নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করে চলে এল। এইভাবেই খুলনার মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল।

মঙ্গলা পোর্টের বাহাদুর শ্রমিক ভাইয়েরা

খুলনা জেলার মঙ্গলা পোর্ট। চালনার মতই এই বন্দরেও দেশ-বিদেশের জাহাজ যাতায়াত করে। রফতানির মাল জাহাজে ওঠে, আর আমদানির মাল জাহাজ থেকে নামে। কিন্তু অন্যান্য বন্দরের মত এখানে জাহাজ ভিড়বার জন্য ডক ইয়ার্ডের ব্যবস্থা নেই। জাহাজগুলিকে মুরিং বয়ার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে মালপত্রের ওঠানামা চলে।

মঙ্গলা পোর্ট খুলনা শহর থেকে বহু দূরে। জলপথ ছাড়া সেখানকার সঙ্গে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে মঙ্গলা পোর্টে যেন সব কিছু থেকে এক প্রান্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। সারা প্রদেশজুড়ে স্বাধীন বাংলার আন্দোলন চলছে। কিন্তু এখানে তেমন কোন আন্দোলন নেই। তাহলেও এই বাংলাদেশের যেখানেই যত দূরেই থাকুক না কেন আন্দোলন প্রতিটি বাঙ্গালীর মনে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। মঙ্গলার অধিবাসীরাও এই বিষয়ে একেবারে উদাসীন হয়ে থাকতে পারে না। আমি এখানে বিশেষ করে নীচের তলার সাধারণ মানুষের কথাই বলছি। মঙ্গলা বন্দরের শ্রমিক ভাইয়েরা এই বিষয় নিয়ে চিন্তা না করে পারল না। এই নিয়ে তারা পরস্পরের মধ্যে নানারকম জল্পনা কল্পনা করে, কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের কি করণীয় থাকতে পারে তা তারা ভেবে পায় না।

ক'দিন হয় একটা ফ্ল্যাট এখানে এসে পাড়ে ভিড়েছে। সবাই লক্ষ্য করেছে, এই ফ্ল্যাটটার মধ্যে দশ-বারো জন পাঞ্জাবী সৈন্য আছে। এক এক করে ক'টা দিন কেটে গেল, কিন্তু ফ্ল্যাট যেমন ছিল তেমনি আছে।

এমন তো কখনও হয় না। এই সৈন্যগুলি এখানে বসে বসে করছে কি! ওদের নিশ্চই কোন খারাপ মতলব আছে।

শ্রমিক ভাইয়েরা অতি সতর্কভাবে ওদের হাল-চাল আর গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। তারা দেখেছে, ফ্ল্যাটের সেই সমস্ত সৈন্যরা বড় হুঁশিয়ার, ওরা পালা করে সারা রাত জেগে পাহারা দেয়। ওটা কি শুধু আত্মরক্ষার জন্যই, না, এর পেছনে আরও কিছু আছে? শুক্ল অফিসে অনুসন্ধান নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া গেল। এই ফ্ল্যাটে নাকি অনেক গোলাগুলি মজুদ করা আছে। এই সৈন্যরা তারই জিম্মাদার।

খবরটা পেয়ে শ্রমিকরা অধীর হয়ে উঠল। এমন চমৎকার মওকা খুব কমই পাওয়া যাবে। এই সময় আক্রমণ করতে পারলে অতি সহজেই ওদের সব ক'টাকেই খতম করে দেয়া যাবে আর তারই সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে গোলা-গুলি উদ্ধার করা যাবে। এইভাবে একবাণে দুই পাখি মারার এমন সুযোগ কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কেমন করে এই কাজ হাসিল করা যাবে?

অনেক চিন্তা ভাবনার পর অবশেষে একটা পথ পাওয়া গেল।

এখানে বসে কোন কিছু করা যাবে না, মুক্তিবাহিনীকে খবর দিতে হবে। তারা অবশ্যই এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারবেই। কিন্তু কোথায় আছে মুক্তিবাহিনী, তারা কেমন করে তাদের সন্ধান পাবে? একজন বলল, সে শুনেছে, বাগেরহাট শহর এখনও নাকি মুক্তিবাহিনীর দখলে আছে। খবরটা সত্য কিনা, জোর করে বলা যায় না। তাহলেও একবার সেখানে গিয়ে চেষ্টা করে দেখা দরকার। তার এই প্রস্তাবটা সবাই একবাক্যে সমর্থন করলো।

বাগেরহাট শহর এখান থেকে বত্রিশ মাইল দূরে। বর্তমানে নৌকা ছাড়া সেখানে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। যদি যেতে হয় এক্ষুনি যেতে হবে, একটুও দেরী করলে চলবে না। অবস্থা অত্যন্ত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, পরে এমন সুযোগ নাও মিলতে পারে। যেমন প্রস্তাব তেমন কাজ। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন শ্রমিক নৌকা পথে বাগেরহাট রওয়ানা হয়ে গেলো।

খবরটা মিথ্যে নয়। মুক্তিবাহিনী এখনও বাগেরহাট শহর অধিকার করে বসে আছে। বরিশালের প্রাক্তন সামরিক অফিসার মেজর জলিল এই মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এবং তিনিই ছিলেন তাদের পরিচালক। মঙ্গলার শ্রমিক ভাইয়েরা বাগেরহাট শহরে পৌঁছে তাঁর সাথে দেখা করল।

তারা যে উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছিল তা সিদ্ধ হোল, মেজর জলিল তাদের প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন।

তার দু'দিন বাদে মঙ্গলার ঘুমন্ত অধিবাসীরা গভীর রাত্রিতে চমকে উঠে শয্যা ছেড়ে উঠে বসল। মেশিনগান আর রাইফেলের শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে চলেছে। ভয়ে কেঁপে উঠল তাদের মন। তবে কি বর্বর পাক-সৈন্যরা বাঙলার উপর হামলা করেছে? উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় সবাই ঘর ছেড়ে ছুটে এল বাইরে। পরে খবর শুনে আশ্বস্ত হোল, না পাক-সৈন্যরা নয়, তাদের অতি প্রিয় মুক্তিবাহিনী সেই ফ্ল্যাটের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করেছে।

সব কটা সৈন্যকে ওরা নিঃশেষ করে দিয়েছে। আরও জানা গেল, ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে অনেক অস্ত্র ও গোলা-গুলি উদ্ধার করা গেছে।

খুলনা জেলার সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকার*: মোমিন উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন এম-পি

৮-৬-১৯৭৬

১৮৭১ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে বয়রা গ্রামে তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা ই-পিআর-রা ৩০৩ রাইফেল ও শটগান নিয়ে পাক-ফৌজের বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধ হয় যশোর রোডে। যুদ্ধে ২টি ট্রাক ধ্বংস হয় এবং পাক-সৈন্যরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

এর পরের সংঘর্ষ হয় দৌলতপুরের মিনাক্ষী সিনেমা হলের সম্মুখে ২০শে মার্চ তারিখে। রাস্তার দু'পাশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাক ফৌজের ওপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা তখন ট্রাকে করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আক্রান্ত পাকসেনারা রিকয়েললেস গান দিয়ে রশীদ বিল্ডিং ধ্বংস করে। সে সময় ঐ ভবনের ৩ জন লোক নিহত হয়।

এপ্রিল মাসের ৭ তারিখে পাকসেনারা ট্রাকে করে যশোর থেকে খুলনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। খুলনার রেডিও স্টেশন তখন পাক-সৈন্যদের দখলে ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা রেডিও স্টেশনের ওপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা রেডিও স্টেশনের ভিতর থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। এভাবে এক রাত যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে কিছু মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। যশোর থেকে ট্রাকে করে আগত পাকসেনা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ চালালে মুক্তিযোদ্ধারা আন্তে আন্তে বিলের দিকে পিছু হঠে। যুদ্ধে পাক ফৌজের বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়। খুলনা রেডিও স্টেশনকে রক্ষার জন্য যশোর থেকে পাক-সৈন্য তিন দফা আসে। ৭ তারিখের পর পাক-সেনারা দৌলতপুরের রঘুনাথপুর গ্রামে হামলা করে। সেখানে তারা বহু লোককে হত্যা করে।

খুলনা জেলার তেরখাদা থানায় মুক্তিবাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল। সেখানে প্রায় দুই হাজারের মতো মুক্তি সেনা ছিল। তারা তেরখাদা থানাকে সব সময়ের জন্য মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ফহমউদ্দিন নামে একজন তহশিলদারের নেতৃত্বে ঐ ক্যাম্পটি পরিচালিত হয়। আব্দুল হামিদ মোল্লা নামে এক ব্যক্তি পাকসেনাদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে। পরে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা নিহত হয়।

ফরিদপুরের প্রতিরোধ*

আকস্মিকভাবে পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে রাজধানীতে পাক-হানাদার বাহিনীর হামলার খবর, রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যদের প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগের কথা এবং বঙ্গবন্ধু শখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা ছবিবশে

* বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত

* সাপ্তাহিক 'চিত্রবাংলা' ৩জুন, ১৯৮৩-এ প্রকাশিত শরীফ আফজাল হোসেন-রচিত প্রতিবেদনের অংশ।

মার্চ সকাল বেলায়ই পেয়ে গেলাম। এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফরিদপুরের পুলিশ ব্যারাক এবং বিভিন্ন থানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ফরিদপুরের প্রাথমিক প্রবেশদ্বার গোয়ালন্দ ঘাটে ছাত্র-জনতা, পুলিশ ও আনসার সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে উঠল এবং ঢাকা-ফেরত কিছু ইপিআর এসে এতে যোগদান করলেন। সর্বস্তরের জনগণের সমর্থনে আমরা উৎসাহিত বোধ করলাম। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে গোয়ালন্দঘাটে ছাত্রজনতার এই প্রতিরোধ শুধুমাত্র রাইফেল, বন্দুক এবং মনোবলকে সম্বল করে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আশ্চর্য হলেও সত্য এবং আজও ভাবতে অবাক লাগে যে এটা হল সুসজ্জিত পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মানুষকে বাঘের সামনে অবোধ বালকের নুড়ি হাতে খেলা করার মত। এ সকল আয়োজনের ভিত্তি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত জনতার দেশপ্রেম ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ফরিদপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় এভাবে জনতার প্রতিরোধের সাড়া পড়ে গেল। তখন প্রয়োজন দেখা দিল সুসমন্বয় ও প্রশাসনিক নির্দেশ প্রদানের। খুব সম্ভব ২৯শে মার্চ তদানীন্তন নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য কে, এম, ওবায়দুর রহমানকে আহবায়ক করে এডভোকেট আদেলউদ্দিন, ইমামউদ্দিন আহমেদ, শামছদ্দিন মোল্লা, সৈয়দ হায়দার হোসেন, মোশাররফ হোসেন, নূরুল্লাহী, কাজী খলিলুর রহমান, মুজিবুর রহমান খান, গৌরচন্দ্র বাল্লা, ফিরোজার রহমান, আমিনউদ্দিন, মোখলেসুর রহমান প্রমুখ স্থানীয় জননেতা ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নাসিরুদ্দিন মুসা, শাহ আবু জাফর, কবিরুল আলম, সালাউদ্দিন আহমদ, আবু সাঈদ, আতিয়ার প্রমুখ ছাত্র ও জনপ্রতিনিধিমূলক নেতা ও কর্মীদের নিয়ে জেলা সমন্বয় ও প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সার্বিকভাবে ফরিদপুরের প্রশাসন ও তদারকি কাজ পরিচালনা করতে থাকে। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক ছিলেন তখন এ, এন, এম ইউসুফ এবং পুলিশ সুপার ছিলেন নূরুল মোমেন খান। পরবর্তীকালে ফরিদপুরে পাক-হানাদার বাহিনী প্রবেশের পরেই তাঁরা ধৃত হন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দীর্ঘ প্রায় নয় মাস কারাবাসের পর মুক্তি লাভ করেন। ফরিদপুরের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী এবং সাংবাদিকের মধ্যে বিশেষ করে লিয়াকত আলী হোসেন, আব্দুস সালাম মিয়া, আজম আমীর আলী, আনম আবদুস সোবহান, মিহির কর্মকার, আতাহার হোসেন, শামসুল হক, তারাপদ ঘোষ এবং অনেকের কথা স্মরণ করা যায়। এছাড়াও ফরিদপুরের গোয়ালন্দ, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুরের প্রত্যেক মহকুমায় স্থানীয় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। রাজবাড়িতে মরহুম কাজী হেলায়েত হোসেন, মোসলেম আলী মৃধাসহ জননেতা ডা. এস, এ, মালেক, ওয়াজেদ চৌধুরী, নূরুল ইসলাম, মরহুম আবদুল জলিল, আবদুল হাই, চিত্তাবাবু, আলী আকাস এবং স্থানীয় ছাত্রনেতা আবদুল জব্বার, নাজিবর, ফজলু, রেজা, তাপস প্রমুখ।

ফরিদপুর জেলা সমন্বয় ও প্রতিরোধ কমিটির মূল ক্যাম্প স্থাপন করা হয় ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ডাক বাংলা বিলটুলীতে এবং সেখান থেকে প্রত্যেকটি মহকুমায় যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। হানাদার বাহিনী ফরিদপুরে প্রবেশ করার আগে পর্যন্ত এ দিনগুলো ছিল ফরিদপুরের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় সময়কাল। ফরিদপুরের প্রতিরোধের সেই সাতাশটি দিন মনে হোত আমরা সম্পূর্ণ একটি স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক ভূখণ্ডে বাস করছি। কোথাও কোন স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলার অবনতি পরিলক্ষিত হয়নি। এ যেন জনতার স্বতঃস্ফূর্ত নতুন জীবনের পথে স্বাভাবিক পথ চলা। ঢাকা থেকে বহু প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট পাক-হানাদার বাহিনীর অনেক কুর্কীতি শুনতে পেলাম এবং ফরিদপুরে আমরা আতঙ্কিত হলাম। সম্ভবতঃ ১লা এপ্রিল তারিখে প্রয়াত নেতা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ দিল্লীর পথে ফরিদপুর পৌঁছালেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে পরের দিন চলে গেলেন। ১৭ই এপ্রিল বাংলার মাটিতে মেহেরপুরে মুজিবনগরে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঐতিহাসিক ঘোষণার কথা জানতে পারলাম এবং ফরিদপুরকেও আমরা তখন মুক্ত এলাকার একটা অংশ হিসেবে গর্ব অনুভব করলাম। আমরা তখন ফরিদপুরে স্থানীয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতাম। সে সময় ফরিদপুরবাসীদের সার্বিক সুখ-দুঃখ এক উচ্ছ্বাসময় শিহরণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। কখন হানাদার বাহিনী ঢুকে পড়ে সেটাই ছিল সার্বক্ষণিক চিন্তা। দেশের অন্যান্য জায়গায় পাক-বাহিনীর নারকীয় অমানবিক দস্যুতার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের বেশী ভয় ছিল প্যারাদ্রুপ হানাদার বাহিনী নামলে

প্রতিরোধ করার কোন অস্ত্র আমাদের হাতে ছিল না। নদীপথে গোয়ালন্দঘাট, গোপালগঞ্জ এবং মাদারীপুর ছাড়াও স্থলপথে পাংশা ও কামারখালীতে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়, যাতে করে কুষ্টিয়া কিংবা যশোর হয়ে আক্রমণের সম্ভাবনা প্রতিহত করা যায়। দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের কন্ট্রোল রুম কর্মব্যস্ত থাকতো এবং সেখান থেকে তাৎক্ষণিক তদারকি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হতো। ফরিদপুর ছিল ভারত অভিমুখে শরণার্থীদের অনেকেরই মাঝপথ। অনেক নেতা ও কর্মী ঢাকা থেকে ভারত যাওয়ার পথে ফরিদপুরে বিশ্রাম নিয়ে যশোর হয়ে চলে যেতেন। এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অনেক নেতৃবর্গই ফরিদপুরে অবস্থান নিলেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর শহর থেকে লোকজন পরিবার-পরিজনসহ গ্রাম এলাকায় চলে যেতে লাগলেন। একটা আসন্ন সংঘাতের মুখোমুখি আমরা প্রশাসন কর্মকর্তা ও প্রতিরোধে নিয়োজিত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা শহরে রয়ে গেলাম। আমরা শহরের প্রবেশের বিভিন্ন এবং রাস্তার উপর ব্যারিকেড তৈরী করলাম। ২১শে এপ্রিল ভোর রাতে হানাদার বাহিনী সুসজ্জিত গানবোট দিয়ে প্রথমে গোয়ালন্দঘাট আক্রমণ করল। আমাদের প্রতিরোধের কর্মীরা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু দূর থেকে অবিরাম মর্টার-এর শেল বর্ষণের মধ্যে সকাল নয়টায় হানাদার বাহিনী গোয়ালন্দঘাট দখল করল এবং একই সঙ্গে হেলিকপ্টারে করে ফরিদপুরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ছত্রী বাহিনী অবতরণ করতে লাগলো। নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ফরিদপুর শহর ত্যাগ করতে লাগলাম।

আমি সকাল দশটার দিকে ইপিআর-এর একজন প্রতিরক্ষা কর্মী সদস্য কবিরুল আলমকে সঙ্গে নিয়ে নড়বড়ে একটা জীপে করে কামারখালীর দিকে রওয়ানা হলাম এবং কে, এম, ওবায়দুর রহমান নগরকান্দা হয়ে গোপালগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলেন। অন্য নেতৃবৃন্দও বিচ্ছিন্নভাবে শহর ত্যাগ করলেন।

ফরিদপুর শহরে প্রাথমিক প্রতিরোধ*

২৬শে মার্চ রাত প্রায় ২/৩টার দিকে কোতোয়ালীর ও-সি আমাদের বাসায় আসেন। বাবা তখন এমএনএ আদিলউদ্দিন আহমেদ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনি এসে জানালেন ঢাকার অবস্থা খুবই খারাপ এবং ফরিদপুরের দিকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক-বাহিনী আসছে। এ অবস্থায় ও-সি সাহেব থানার চাবি আন্সাকে দিয়ে সরে যেতে চাইলেন। তখন আব্বা এ অবস্থায় থানার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন না। এরপর আব্বা এবং আমি ডি-সি সাহেবের বাসার দিকে রওয়ানা হলাম। ফরিদপুরের ডি-সি তখন জনাব এ, এম, এন, ইউসুফ। এস-পি ছিলেন মিহির সাহেব। উভয়কে আমরা ডি-সি সাহেবের বাসার অফিসে দেখতে পাই। ডি-সি সাহেবের সাথে ঢাকা এবং ফরিদপুরের অবস্থা নিয়ে আলাপ হয়। তিনি বললেন, এখনও যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে আর্মি আসছে। তারা আজকেই শহরে এসে পৌঁছাবে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের নেতা এবং কর্মীদের শহর থেকে সরে যাওয়াটাই উচিত। তখন আমরা ঠিক করলাম যে, আওয়ামী লীগের এমএনএ ও এমপিদের সাথে যোগাযোগ করে একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে। তখন তিনি গাড়ী পাঠালেন তাদেরকে আনার জন্য। জনাব শামসুদ্দিন মোল্লা (এমএনএ), জনাব হায়দার হোসেন (এমপি) এরা সবাই আসলেন। পরিস্থিতি জানার পরে আপতত শহর থেকে সরে যাওয়ার জন্য সকলেই সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর আমি একটি জীপসহ বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন দলের ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ঢাকার ঘটনা জানাই এবং যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফরিদপুরের দিকে সেনাবাহিনী আসার পথে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এতে ঐ সময়ে অনেকেই ব্যাপারটিকে অবাস্তব মনে করে প্রতিরোধে অংশীদার হতে চাইলেন না। কিন্তু সৈয়দ নাসির হোসেন আহমেদ, জামাল ও আরো কয়েকজন মিলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, রাস্তায় বড় বড় গাছ কেটে সেনাবাহিনীর পথ রোধ করতে হবে। তখন গাড়ি

* প্রতিবেদনটি জানুয়ারী, ১৯৮৪-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আহমেদ কামাল-এর কাছ থেকে সংগৃহীত।

নিয়ে আমরা দরবেশের পুলের ওপারে গিয়ে গ্রামবাসীদের ডেকে জড়ো করলাম এবং ঢাকার পরিস্থিতি ও পরিকল্পনাও জানানো হলো। এখানে গ্রামের লোকদের গাছ কাটার জন্য প্রচুর উৎসাহ দেয়া হয়। তারা নিজেরাই কুড়াল নিয়ে গাছ কাটতে শুরু করলো। এবং পরামর্শ দেয়া হলো যে, আর্মি এলে যেন তারা গ্রাম থেকে সরে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে তারা ২০/২৫টি গাছ কেটে রাস্তার উপর ফেলে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। তারপর আমরা শহরের একটু বাইরে অপেক্ষা করতে থাকি পাক-সেনা শহরে ঢোকার আশঙ্কায়, কিন্তু সময় গড়িয়ে গেলো পাক-সেনাবাহিনী আসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। পরদিন হঠাৎ চট্টগ্রাম বেতারের জিয়াউর রহমানের ঘোষণায় আমরা সবাই খুব উজ্জীবিত হয়ে উঠি এবং ডি-সি সাহেবকে অনুরোধ করি শহরের প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে। এ ব্যাপারে সার্মথ্য এবং মওজুদ অস্ত্রের পরিমাণ জানতে চেষ্টা করি। কিন্তু পুলিশ বাহিনী সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করে। আমরা এই সময় জানতে পারি যশোর ক্যান্টনমেন্টের জনগণ এবং পুলিশ দ্বারা অবরুদ্ধ আছে। ২৮ মার্চ ঢাকা থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এবং ঢাকায় অবস্থানরত ফরিদপুরবাসীরা ফরিদপুর আসতে শুরু করে। তাদের মুখে ঢাকার সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কাহিনী শুনে আমাদের মধ্যে প্রতিরোধস্পৃহা আরো বেড়ে ওঠে। তখন আমরা কোনরকম প্রতিরোধের তৎপরতা না দেখে শহরের কতিপয় তরুণের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪/৫ জন ছাত্র নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পদ্ধতি হবে গেরিলা যুদ্ধ এবং অবিলম্বে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হওয়া উচিত এবং এ প্রশিক্ষণে ষোল বছরের উর্ধ্বের সকল সুস্থ লোকের অংশগ্রহণে আহ্বান জানানো উচিত। এই বৈঠক চলাকালে আমাদের সাথে যোগাযোগ এবং উৎসাহিত করেন নৌ বাহিনীর একজন প্রাক্তন সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান। তিনি নিজেকে কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের একজন ঘনিষ্ঠ লোক হিসেবে পরিচয় দেন। এই সিদ্ধান্ত হবার পর শহরে মাইকযোগে ঘোষণা করা হয় যে, প্রতিরোধের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য সামরিক ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে এবং রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গণে সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। সেই সাথে আরো ঘোষণা করা হয় যে, ছুটিরত পাক বাহিনীর বাঙালী সৈনিক ভাই এবং প্রাক্তন সৈনিক ভাইদেরও কলেজ প্রাঙ্গণে আসার জন্য বলা হচ্ছে। এই ঘোষণার পর প্রায় দু'শো লোক কলেজ ময়দানে হাজির হয়। এদের মধ্যে ছুটিরত এবং প্রাক্তন পাক-সেনাবাহিনীর সংখ্যাও ছিল প্রায় ৬/৭ জন। স্টেডিয়ামের একটি রুমকে এই প্রশিক্ষণের হেডকোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়। প্রথমে কলেজের ইউ-ও-সি ইউনিটের ডামি রাইফেল এবং পুলিশ লাইন থেকে রাইফেল এনে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ফরিদপুর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা কমিটি নাম দিয়ে এই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করা হয়।

ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সাইক্লোস্টাইল প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এসব প্রচারপত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কি করে গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তান সরকারকে অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন করার জন্য পাটচাষ বন্ধ করা ইত্যাদি। এই পর্যায়ে আমাদের ধারণা হয় এই যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী এবং সকল বাঙালী শিক্ষিত যুবকই পাক-সেনাবাহিনীর বুলেটের লক্ষ্য হবে। আমাদের ট্রেনিং চলাকালে কুষ্টিয়া এবং যশোরের প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি এবং অস্ত্রের জন্য মেজর ওসমানের সাথে যোগাযোগ করি। তাঁর নির্দেশ অস্ত্র আনার জন্য যশোরে দুইজন সদস্যকে পাঠান হয়। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের অস্ত্র দেয়া হয়নি। ইতিমধ্যে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়নি, এপ্রিলের প্রথম দিকে জয়দেবপুর থেকে পাক-সেনাবাহিনীর সদস্য হেমায়েত উদ্দিন তার তিন সদস্য সিপাহীসহ বেশকিছু গোলাবারুদ, গ্রেনড, এস-এম-জি, চাইনিজ রাইফেল সহ পদ্যার চরে অবস্থান করছে বলে তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানের সাংবাদিক ভুঁইয়া ইকবাল আমাদের খবর দেন। আমরা কয়েকজন সদস্য পাঠিয়ে তাদেরকে স্টেডিয়ামে নিয়ে আসি এবং আমাদের এই প্রতিরোধ আন্দোলনে তাকে শরিক হতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি একদিন পরে শহরের অন্যত্র অবস্থান করতে থাকেন। আমরা কামারখালী, গোয়ালন্দ এবং ভাংগা পর্যন্ত স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে আমাদের প্রচেষ্টাকে জড়িত করার চেষ্টা করতে থাকি। দ্বিতীয়বার অস্ত্র সংগ্রহের

জন্য যশোর লোক পাঠানো হয়। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হয়। রাজেন্দ্র কলেজ এবং স্টেডিয়ামের মাঠে আমাদের ট্রেনিং অব্যাহত থাকে এবং ক্রমেই ট্রেনিং গ্রহনকারীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। আমাদের এই প্রচেষ্টার দু'টি উল্লেখযোগ্য দিক ছিলঃ (১) জনগনের মনোবল সুদৃঢ় করার জন্য প্রচারকাজ চালানো; (২) ফরিদপুর শহর এবং আশেপাশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা। অস্ত্র না পাওয়াতে এবং দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধে অংশগ্রহনের পরিকল্পনা কারনে ২২শে এপ্রিল পাক-সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করার মুহূর্তে আমরা শহর ত্যাগ করি এবং ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ি। আমাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথীরা অস্ত্র যোগাড় করতে না পেরে ভারতে চলে যান এবং ট্রেনিংশেষে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। অনেকে ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চল থেকেই রাজাকর এবং পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে এলাকাভিত্তিক প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন।

সশস্ত্র প্রতিরোধ : পত্র-পত্রিকার আলোকে

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ	যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা	মার্চ-জুন, ১৯৭১

পাক মিলিটারী তাড়বে বাঙ্গালীর রক্ত ঝরছে

কলকাতা, ২৬শে মার্চ (ইউ,এন আই)- শেখ মুজিবর রহমান এক বার্তায় আজ বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতার জন্য সাহসের সঙ্গে যুদ্ধে করছে। এক গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবরের প্রচারিত বার্তা এখানে শোনা গেছে। এই গোপন বেতার কেন্দ্রটি চট্টগ্রাম অথবা চালনায় অবস্থিত বলে মনে করা হচ্ছে।

ঐ বার্তায় বলা হয়েছে, গতকাল রাত ১২টায় সময় পিলখানা ও রাজারবাগে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানী রাইফেলসের ঘাঁটি আক্রমণ করে বহু নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। ঢাকাতে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনী সঙ্গে পাক-বাহিনীর তীব্র সংঘর্ষ চলছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সাধারণ অসম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ যে কোন মূল্যে শত্রুকে বাধা দেবে। স্বাধীনতার জন্য এই সংগ্রামে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন।

-যুগান্তর, ২৭ মার্চ, ১৯৭১

কুমিল্লায় সংঘর্ষ

বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কুমিল্লায় সৈন্যবাহিনী ও মুক্তিসংগ্রামী জনগনের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানী রাইফেলস বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী জনগনের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। সৈন্য-বাহিনীর গুলিতে কিছু লোক আহত হয়েছে। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারকে সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করেছে বলে প্রকাশ।

মুক্তিফৌজকে সাহায্য করুনঃ ভারত-পাক সীমান্তে সংগৃহীত একটি বাংলা ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে এই ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে।

বেতার কেন্দ্রের ঘোষক শত্রুর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বেতারে বলা হয়েছে, ঝড়ের বেগে মুক্তিফৌজ এগিয়ে চলেছে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও শ্রীহট্টের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে। অনুগ্রহ করে তাঁদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সাহায্য করুন। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করুন। ঢাকা কেন্দ্র ছাড়া আর সকল কেন্দ্রের রেডিও শুনুন। জয় বাংলা। গনমুক্তিবাহিনীর পক্ষে জনাব শেখ সাহেব।

-যুগান্তর, ২৮ মার্চ, ১৯৭১

ওরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন-আরও গুলিগোলা চাই (রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

দু’দিনের লড়াইয়ে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় এক লক্ষ লোক মারা গিয়েছেন বলে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে ভারত সরকারের দফতরগুলিতে খবর পৌঁছেছে। বিভিন্ন সীমান্ত ঘাঁটি থেকে যেসব খবর আসছে তার সারমর্মঃ মুজিবর রহমানের সমর্থক পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর লোকজনদের গুলি ফুরিয়ে এলেও তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সেনাবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে।

লড়াই এখনও সবচেয়ে বেশি চলছে ঢাকা এবং রংপুরে। এই দুই এলাকায় হাজার হাজার সাধারণ মানুষও সেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় লড়াই চালাচ্ছেন। পাক সেনাবাহিনী ও এই দুই এলাকায় ট্যাঙ্ক নিয়ে নেমেছে। তারাও ট্যাঙ্ক থেকে অবিরাম গুলি চালাচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তানের দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কের ওপরের কয়েকটি ব্রিজও আওয়ামী লীগের সমর্থকরা উড়িয়ে দিয়েছেন। এই দুটি সড়কই ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম এবং যশোরের যোগাযোগ রক্ষা করত। এই দুটি সড়ক দিয়ে এইদিন সেনাবাহিনীর গাড়ি এগোতে পারেনি। এছাড়া মুজিবর রহমানের সমর্থকরা বিভিন্ন রাস্তায় সৈন্যদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করার জন্য নানারকমের প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছেন। বহু এলাকায় রাস্তা খুঁড়ে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় ওপারের লোকেরা এসে এপারে গুলি চেয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে তাঁদের গুলি ফুরিয়ে যাচ্ছে। গুলিগোলা না পেলে আর লড়াই চালাতে পারছেন না। কিন্তু তাদের সবাইকেই এপার থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে একজন এসডিও-ও গুলি চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে মার্চ, ১৯৭১

আওয়ামী লীগের নেতারা এপারে তাঁদের আবেদনঃ অস্ত্র চাই

আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা সোমবার ওপার থেকে এপার এসেছেন। সকলেরই একই লক্ষ্য-ভারত থেকে অস্ত্র সাহায্য সংগ্রহ করা। এদের মধ্যে একজন আছেন নবনির্বাচিত পাক জাতীয় পরিষদের সদস্য। তিনি মালদহ জেলা সীমান্ত দিয়ে ঢুকেছেন।

এদিকে, মুক্ত কুষ্টিয়ায় এইদিন পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে নিয়েই আওয়ামী লীগের শাসকরা ট্রাঙ্ক টেলিফোনে ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছেন। সোমবার দুপুরেই মুক্ত কুষ্টিয়ার প্রধান পরিচালক ডাঃ আসাবুল হক টেলিফোনে শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরও আবেদন ছিলঃ আপনারা অবিলম্বে সাহায্য পাঠান।

ডাঃ হক জানান, এখন কার্যত হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষ সৈন্যদের আক্রমণ করছে। এত মানুষ এসে লড়াইয়ে যোগ দিচ্ছে যে, সেনাবাহিনী মেশিনগান চালিয়েও মেরে শেষ করতে পারছে না। তিনি জানান, কুষ্টিয়া, পাবনা, যশোর, খুলনায় এইদিন হাজার হাজার মানুষ বল্লম ও সড়কি নিয়ে এসে সেনাবাহিনী ঘাঁটি আক্রমণ করেছে। হাজার হাজার মেরেছেও। কিন্তু তাঁরা পিছিয়ে যাননি। তিনি জানান, সোমবার রাত্রিতেই বৃহত্তম আঘাত হানা হবে ঘাঁটিগুলির উপর।

কুষ্টিয়া মিলিটারী ব্যারাককে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সৈন্যদের বলা হয়েছে আত্মসমর্পণ করতে। ডাঃ হক জানান, পাবনায় ও সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা করেনি। ফলে তাদের

সবাইকে মরতে হয়েছে। জনতা আহত পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বিজয়োল্লাস করেছে।

ডাঃ হক বলেনঃ কত হাজার হাজার মানুষে যে ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে তার কোনও গুণতি নেই। কিন্তু তবু মানুষ মরতে ভীত নয়।

তিনি যশোর থেকে খবর পেয়েছেন যে, সেনাবাহিনী কোণঠাসা হয়েছে। খুলনায় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

স্টাফ রিপোর্টার জানান, বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের বহু কর্মী এবং মুক্তিসেনা সীমান্ত পার হয়ে পশ্চিম বঙ্গে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে সাহায্য চাইছেন।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ মার্চ, ১৯৭১

সীমান্তের চারদিক থেকে

[আমাদের স্টাফ রিপোর্টার, বিশেষ প্রতিনিধি, নিজস্ব সংবাদদাতা স্বাধীন বাংলাদেশের নানা সীমান্ত থেকে অজস্র সংবাদ পাঠাচ্ছেন ওখানকার মুক্তিযুদ্ধের। সব মিলিয়ে একসঙ্গে তা প্রকাশিত হল সংক্ষেপে। সব সংবাদেরই বক্তব্য, পাক ফৌজ ভেঙ্গে পড়ছে, মুক্তিফৌজ দখল করে চলেছে একের পর এক এলাকা]

গেদে থেকেঃ কুষ্টিয়ার লড়াই-এ মুক্তিফৌজকে সাহায্যের জন্য হাজারে হাজারে অসামরিক নাগরিক পদ্মা পার হয়ে কুষ্টিয়ার দিক থেকে ছুটে যান। হারডিজ সেতু পার হবার সময় শত্রু বাহিনী বোমারু বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে। বোমায় সেতুর একাংশ বিধ্বস্ত হয় এবং শতখানেক স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাণ হারান।

পাবনায় শত্রু বাহিনী ওই একই নারকীয় দৃশ্য তৈরি করেছে। তবে রক্ত দিয়ে তাদের মূল্য দিতে হয়েছে। শেষ শত্রুসৈন্যও জনতার রোষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

মুক্তিফৌজের কমান্ডার ভারতের জনগণকে তাঁর অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রংপুর আমাদের মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে।

খুলনায় নারী ও শিশুদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যে বর্বর, অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে- মুক্তি ফৌজের নেতা বার বার তার উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, আমরা তা জানি। কিন্তু আমাদের মা-বোন, ছেলেমেয়েদের উপর এই নৃশংস অত্যাচার চলবে-তা আমরা ভাবতে পারিনি।

মেখলিগঞ্জ থেকেঃ বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং বগুড়া শহরে দখলদার পাকিস্তানী ফৌজ ও বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর মধ্যে প্রতি মহল্লায় তুমুল লড়াই চলছে।

দখলদার বাহিনী রংপুর শহরে ট্যাঙ্ক নামিয়েছে। দিনাজপুর ও রংপুর জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অপরদিকে মুক্তি ফৌজ পচাগড়ে অপরূপ দুই কোম্পানী পাকিস্তানী ফৌজকে পর্যুদস্ত করে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে এবং এই লড়াইয়ে অধিকাংশ পাকিস্তানী ফৌজ নিহত হয়েছে। রংপুর ও দিনাজপুর জেলার সীমান্ত ফাঁড়ি এখনও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ন্ত্রণে। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী ফৌজকে পরাজিত করে রাজশাহী শহরকে মুক্ত করেছে।

ইতিমধ্যে এপার বাংলার কাছে ওপার বাংলার তরুন ছাএদের আর্ত আবেদনঃ আমাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করুন। হলদিবাড়ি সীমান্তে গতকাল চারজন ছাত্রপ্রতিনিধি আসেন অস্ত্র সংগ্রহের জন্য।

দিনাজপুর শহরে মুক্তিফৌজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সীমান্ত বাঙ্গালী ইপিআর সীমান্ত টোঁকি ছেড়ে চলে গিয়েছে। দিনাজপুরের পথে পথে পশ্চিমী ফৌজ প্রচন্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন। ঘোড়াঘাট ও হিলির মধ্যে পশ্চিমী ফৌজের একটি ট্রাক রাস্তায় ওপর একটি গর্তে পড়ে উলটে যায়। প্রচুর ফৌজ আহত হয়। হিলি এলাকায় ভারত-পাক সীমান্তের কাছে দুটি অবাঙ্গালী পশ্চিমী ফৌজের মৃতদেহ দেখা গিয়েছে। দুজন পশ্চিমী ফৌজ প্রানভয়ে ভারতের এলাকায় ঢুকে পড়ে। তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার মুক্তিফৌজের তাড়া খেয়ে প্রায় ২০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সপরিবারে হিলি সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে। এরা ভারতীর সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করেছে।

অন্যদিকে পশ্চিম দিনাজপুরের দিক থেকে আওয়ামী লীগের দুজন বিশিষ্ট নেতাও এপার আসেন। জলপাইগুড়ি শহরে এরা পৌঁছালে তাদের বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়।

পাকিস্তানী জাতীয় পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতা মুহম্মদ আবিদ আলী বাংলাদেশে অবিলম্বে সাহায্যের জন্য আর্ত আবেদন জানিয়েছেন।

হাসনাবাদ থেকেঃ সোমবার দুপুরে সাতক্ষীরা সীমান্তে খবর সাতক্ষীরা আদালত ভবন থেকে ত্রুদ্ব জনতা পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে ফেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। সাতক্ষীরার পাঞ্জাবী মহকুমা শাসককে জনতা স্বগৃহে অন্তরীণ করে রেখেছে।

সীমান্ত আজ মুছে একাকার হয়ে গেছে। এপার বাংলা থেকে দলে দলে মানুষ এসে সীমানার এপারে দাঁড়াচ্ছে। ওপারের মানুষ এসে দাঁড়াচ্ছে মুখোমুখি। আজ আর কেউ কারও কাছে অপরিচিত নয়।

সোমবার সীমান্ত পার হয়ে অনেকখানি ঢুকে গিয়েছিলাম স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে। কথা হল বহু মানুষের সঙ্গে। সকলের মুখে এক কথা, শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য আমাদের অস্ত্র দিন।

অস্ত্র আর অস্ত্র। ওপার বাংলার মানুষ এপার বাংলার মানুষের কাছে আজ শুধু একটি জিনিসই চান। শুধু নৈতিক সমর্থন নয়, অস্ত্র না পেলে আমরা লড়ব কি করে। এই তাদের বক্তব্য।

খুলনা থেকে দু'দিন হেঁটে আজই ফিরেছেন এমন একজনের সঙ্গে দেখা হল। সমস্ত রাস্তা বন্ধ। খুলনায় এখনও চলছে জোর লড়াই। সেখানে মুক্তিফৌজ ৪০০ পাঞ্জাবী সৈন্যকে নিহত করেছে। একটি তিনতলা বাড়ীতে কিছু পাঞ্জাবী সৈন্য আশ্রয় নিয়েছিল। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস তাদের ঘেরাও করে। সাদা পাতাকা উড়িয়ে পাঞ্জাবী সৈন্য আত্মসমর্পন করে।

যশোর থেকে সদ্য প্রত্যাগত একটি যুবকের কথাঃ যশোরের পথে বেশীদূর এগুতে পারলাম না। পথে পথে মৃতদেহ। দূরে গুলির শব্দ ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

আগরতলা থেকেঃ গতকাল চট্টগ্রাম দখলদার সৈন্য অবতরণে অসামরিক জনগন বাধা দিলে তাদের ওপর জাহজের কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়। ফলে বহু লোক মারা যায়।

ইপিআর-এর ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে দখলদার ফৌজরা গ্রেফতার করেছে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যেসব বাঙ্গালী ফৌজ ওই বাহিনী থেকে সরে আসতে পারেননি তাদের হয় গ্রেফতার করা হয়েছে অথবা নিমর্মভাবে হত্যা করা হয়েছে।

স্বাধীন বেতারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের জনগনের সমর্থনের সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে।

পাক বিমানবহর হেলিকপ্টারে করে সন্দ্বীপে ফৌজ নামাবার চেষ্টা করছে ; নৌকা করে যশোরেও সেনা পাঠাবার। স্বাধীন বেতার কেন্দ্র আজ দুপুরে ওই খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে জানান, মুক্তিফৌজ তীব্র প্রতিরোধ করছে। এযাবৎ দুজায়গায়ই পাক বিমানবহরের চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশ প্রায় পুরোই মুক্তিফৌজের কজায়

আগরতলা, ৩০শে মার্চ (পিটিআই/ইউএনআই)-পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত সমগ্র এলাকাটি বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এই সংবাদটি আজ সকালে জানা যায়। এখানে শ্রুত এই বেতার ঘোষণায় বলা হয় যে, সমগ্র এলাকায় এখন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে।

বাঙলার রাজধানী ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে আসায় পাকবাহিনী সর্বত্র পশ্চাদপসরণ করছে বলে স্বাধীন বাংলা বেতার দাবী জানিয়েছে। ঢাকার আশেপাশে অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে আছে। অস্থায়ী সরকারের প্রধান মেজর জিয়া আজ বেতারে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়ে তাঁদের সাফল্য প্রত্যক্ষ করার জন্য আহবান জানিয়েছেন।

মুক্তিফৌজ ঢাকা দখলের পর অবশিষ্ট হানাদারদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বিমানঘাঁটি দখলের জন্য তীব্র লড়াই চলছে। পাক-বিমান বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে বোমাবর্ষণ করছে।

চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বন্দর আর এখন ব্যবহার করা যাবে না বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, যশোহর, খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর, শ্রীহট্ট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি মুক্তিফৌজের পূর্ণ দখলে রয়েছে। বরিশাল, পাবনা ও বঙ্গবন্ধুর স্বজেলা ফরিদপুরের কোন খবর পাওয়া যায়নি। মুক্তিফৌজ এখন বাংলার জলপথও সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। মুক্তিফৌজ প্রথম হানাদারদের উপর মর্টার ব্যবহার করেছেন বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার স্বাধীন বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করেছে মুক্তিফৌজ ঢাকা শহর দখল করে নিয়েছে।

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধান মেজর জিয়া আজ ঘোষণা করেন যে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থান এখন তাঁর মুক্তিফৌজের দখলে রয়েছে। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ তথা বিশ্ববাসীকে তা দেখে যাবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ছয়টি বেতার কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি এখন মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা এখন মৃত্যুভয়ে পালাচ্ছে বলে তিনি জানান। বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলা ভাষায় এক বিশেষ ঘোষণায় তিনি বলেন যে, মুক্তিফৌজ বিপুল সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

পাকিস্তান রেডিওর প্রচারণাকে মেজর জিয়া ডাहा মিথ্যা কথা বলে বর্ণনা করেন। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত দশজন পাঠান গতকাল সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম দিনাজপুরের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

চট্টগ্রাম জ্বলছে: চট্টগ্রাম শহর জ্বলছে। মুক্তিফৌজ সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে হাতে হাতে লড়াই করছেন। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সৈন্যরা ট্যাংক ব্যবহার করছে।

শহরের প্রধান অংশ এখন মুজিবের বাহিনীর হাতে রয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রামে বিমান থেকে সৈন্য নামান হয়েছে। জাহাজ থেকে আজও গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। এই বন্দর শহরে এখন প্রবল লড়াই চলছে। চট্টগ্রাম বন্দরকে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছে যে, বন্দরটিকে ব্যবহারযোগ্য করতে কয়েক বছর সময় লাগবে।

দিনাজপুরে প্রবল লড়াই: রাধিকাপুর থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, রবিবার সারারাত ধরে দিনাজপুর শহর এবং সংলগ্ন গ্রামগুলোতে প্রবল লড়াই চলছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা কয়েকটি গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। বোমা ও মেশিনগানের শব্দে রাধিকাপুর ও সংলগ্ন গ্রামের জনসাধারণকে বিন্দ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে।

রাজশাহী ও খুলনা: রাজশাহী ও খুলনাতে কয়েক কোম্পানী পাকিস্তানী সৈন্য বিমানে নামানো হয়েছে। রাজশাহীতে মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ ভাঙ্গার জন্য বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে।

উভয় স্থানে মুক্তিফৌজ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। একটি মাত্র স্থানে বিদেশী সৈন্যরা সীমাবদ্ধ ছিল। রাজশাহীর গোদাগাড়ি ঘাট পর্যন্ত এখন মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে আছে। তাঁরা রাইফেল বাহিনীর সদর দপ্তর পুনরায় দখল করেছেন।

আজ সকালে উপরোক্ত স্থানে পুনরায় সৈন্য পাঠানো হয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলের ও পুলিশের সাহায্যে শেখ মুজিব বাহিনীর লড়াই অব্যাহত রয়েছে। রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ মুক্তিফৌজ দখল করে নিয়েছে। পশ্চিমা পাঞ্জাবী মহকুমা অফিসার নিহত হয়েছে। খুলনার টেলিফোনে এক্সচেঞ্জকে পাক-সৈন্যরা ধ্বংস করেছে।

ক্যান্টনমেন্ট দখলের চেষ্টা: কুমিল্লা ও যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখলের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য মার্কিন স্যাবর জেট থেকে বোমাবর্ষণ করছে বলে স্বাধীন বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মুক্তিফৌজ এই ক্যান্টনমেন্ট দুটিকে দখলে রেখেছেন।

ঢাকাতে তীব্র সংঘর্ষ: ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে এবং ক্যান্টনমেন্ট বিমানবন্দর এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও মুক্তিফৌজের মধ্যে প্রবল লড়াই চলছে। পরে ঢাকা শহর মুক্তিফৌজ দখল করেছেন বলে স্বাধীন বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করেছেন।

কৃষ্ণনগর থেকে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, ঢাকা কর্পোরেশন অফিস এখন মুক্তিফৌজের দখলে। প্রশাসক মেজর এস এ খান নিহত।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতীয় সীমান্ত গ্রাম ভগবানগোলার বিপরীত দিকে পাক-সীমান্ত প্রহরারত ২০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী প্রহরী মুক্তিফৌজের হাতে নিহত হয়েছে।

রাতে নৌকা চলাচল নিষিদ্ধ: নদীমাতৃক পূর্ববাংলার জলপথে রাতে নৌকা চলাচল নিষিদ্ধ করে 'স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌম সরকার' এক নির্দেশ জারী করেছেন।

মুক্তিফৌজের আক্রমণে বিহ্বল ও পর্যুদস্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা যাতে পালাতে না পারে তার জন্যই এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

রংপুর: সমগ্র রংপুর শহর মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রংপুর-কোচবিহার এলাকায় পাকিস্তানী রাইফেলের টহল মুক্তিফৌজের নির্দেশ বন্ধ করা হয়েছে।

আখাউড়াঃ আখাউড়াতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ছয়জন অফিসার নিহত হয়েছেন। সেখানকার আশেপাশে এখনও যুদ্ধ চলেছে।

করাচীর ভাষ্যঃ করাচীর সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে যে,বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় আছেন সে সম্পর্কে আজ কিছুই বলা হয়নি। পাকিস্তান রেডিও থেকে পূর্ববঙ্গের অবস্থাকে ‘সম্পূর্ণ শান্ত’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

-যুগান্তর, ৩১ মার্চ, ১৯৭১

সকল রণাঙ্গনেই পাকফৌজ গা বাঁচিয়ে চলছে

মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে বঙ্গ রণাঙ্গনের সমগ্র পরিস্থিতি মুক্তিফৌজের অনুকূল-বিভিন্ন খন্ডের রণক্ষেত্রে মুক্তিফৌজ প্রচণ্ডভাবে আঘাত হেনে চলেছে।

বাংলাদেশের দূরবিস্তৃত অধিকাংশ রণাঙ্গনেই পাকিস্তানী স্থলবাহিনী কোনরকমে গা বাঁচিয়ে চলছে এবং অনন্যেপায় হয়ে বিমান বাহিনীকে ডেকে আনছে এবং তারাও নিবিচারে সামরিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা চিন্তা না করে বোমাবর্ষণ করে ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছে। দিল্লির প্রতিরক্ষা অনুশীলন সংস্থার বিশেষজ্ঞরা সমগ্র রণাঙ্গনের চিত্রটি এভাবে একেঁছেনঃ

পূর্ব রণাঙ্গনঃ কুমিল্লা থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ সীমান্তবর্তী সব কয়টি ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। তাদের বিমানধ্বংসী কামান হানাদার পাক বিমানকে বার বার তাড়িয়ে দিয়েছে। এই রণাঙ্গনেরই অন্তর্ভুক্ত আখাউড়ায় মঙ্গলবার সকালে পাক বিমান প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করেছে।

মঙ্গলবার সবচাইতে নৃশংস সংগ্রাম চলেছে চট্টগ্রাম-এর সঙ্গে কেবলমাত্র তুলনা চলতে পারে অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর রাজপথের লড়াই। পাকিস্তানী বিমানবন্দর এলাকায় বোমাবর্ষণ করেছে, যুদ্ধজাহাজ গোলা ছুঁড়েছে। চট্টগ্রাম জ্বলছে।

উত্তর-মধ্য রণাঙ্গনঃ উত্তর-মধ্য রণাঙ্গনে ময়মনসিংহ মুক্তিফৌজের হাতে এসেছে।

দক্ষিণ রণাঙ্গনঃ দক্ষিণ রণাঙ্গনে বিপন্ন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য মধ্য রণাঙ্গন থেকে সৈন্য পাঠান হচ্ছে। নদী-নালা, খাল-বিল আকীর্ণ রণাঙ্গনে তারা রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি অগ্রসর হচ্ছে।

মুক্তিফৌজের কমাণ্ড চারিটি রণক্ষেত্রের সংগ্রামরত সৈন্যদের মধ্যে নিখুঁত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। চট্টগ্রাম থেকে খুলনা পর্যন্ত উপকূল বরাবর বিস্তৃত দক্ষিণ রণাঙ্গনের পূর্ব প্রান্ত চট্টগ্রামের দিকে জাহাজ বোবাই করে সৈন্য পাঠানো হয়েছে পশ্চিম প্রান্ত খুলনা থেকে।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনঃ দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে খুলনা-যশোর খণ্ডে মঙ্গলবার তেমন কোন বড় লড়াই হয়েছে বলে মনে হয় না। যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখলের জন্য সোমবার প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত উভয় পক্ষই আগামী দিনে তীব্রতর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

দূরবিস্তৃত চারটি রণাঙ্গনের সর্বত্র আক্রমণোদ্যোগ এখন মুক্তিফৌজের হাতে, পশ্চিম রণাঙ্গন বাহিনী সর্বত্র আত্মরক্ষা করে চলছে।

মুক্তিফৌজের স্থলসেনার অবিরাম চাপে বিব্রত পশ্চিম পাকিস্তানী স্থলবাহিনী বিমান ও হেলিকপ্টারের সাহায্য নিতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু তার ফলে পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে যাওয়ার তেমন নেই।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ মার্চ, ১৯৭১

ইয়াহিয়া ফৌজের ‘বিদ্রোহী’ সেনাকে গুলি করে হত্যা শুভ্রাংশু গুপ্ত

মেহেরপুর (কুষ্টিয়া), ৩১ মার্চ-ইয়াহিয়া ফৌজের বিপুলসংখ্যক সেনা মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে অস্বীকার করেছেন। এরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোতায়েন। পুলিশ লাইনেও এই শহরের একটি স্কুলগৃহে এরা ‘বিদ্রোহী’ সেনাদের প্রায় দুশোজনকে তাদের দলপতির নির্দেশে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু মুজিব কোন এক গোপন ঘাঁটিতে সপরিবারে আছেন। এখানে বঙ্গবন্ধু দু’জন সহকর্মী-আবু আহমেদ আফজল রসিদ এবং মঃ সহীউদ্দিন আমাকে এই সংবাদ দেন। তারা বলেন, মুজিবর রহমানের গ্রেফতার এবং তাঁর পুত্রের হত্যার সংবাদ সম্পূর্ণ তৈরী করা। বঙ্গবন্ধু তাঁর গোপন ঘাঁটি থেকে সর্বদাই এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আগামী এক পক্ষকালের মধ্যে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবর তখন আত্মপ্রকাশ করবেন বলে মুজিবের ওই সহকর্মীদ্বয় জানান।

ওই দুই নেতা জানান, পাবনা, দিনাজপুর, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়ার প্রায় পুরো অঞ্চল এখন আওয়ামী লীগের দখলে। মঃ রসিদ জানান, তাঁরা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের মজুত উদ্ধার করেছেন। সেগুলির বেশির ভাগই চীনের তৈরি। তার মধ্যে হালকা মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, দুটো কামান ও প্রায় পঞ্চাশটি মিলিটারি ট্রাক রয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ এপ্রিল, ১৯৭১

যশোরের বোমাবর্ষণ

বনগাঁ, ৩১ শে মার্চ-সারা যশোর শহর দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই আগুনের আভা সন্ধ্যায় হরিদাসপুর থেকেও দেখা গেছে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট পূর্নদখলের উদ্দেশ্যে আজ বেলা সাড়ে বারটা নাগাদ পাক সামরিক বাহিনী ৫ খানি বিমানে করে ছত্রীসৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দেয়। এরপর বিমান বাহিনী থেকে কিছু সময় পর পর বোমাবর্ষণ করা হতে থাকে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত বোমাবর্ষণ চলছে বলে জানা গেছে।

পাক বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিফৌজের তীব্র লড়াই চলছে। একদল সৈন্য শহরাঞ্চলে মর্টারের সাহায্য আক্রমণ চালায়। শহরে বহু বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সামরিক বাহিনীর লোকেরা অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে, কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

আজ সকালের দিকে হরিদাসপুর সীমান্ত এলাকায় ৫ জন পাকিস্তানী পাঞ্জাবী সৈন্যের মৃতদেহ এবং একটি কাটা মুণ্ডু দেখতে পাওয়া যায়। এখানে সন্দেহ করা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের মধ্যে হত্যা করে এই মৃতদেহগুলি এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

খুলনায় এক খবরে প্রকাশ যে, খালিশপুরে একটি চটকল ডিনামাইট উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রূপসা নদীর ধারে তীব্র সংঘর্ষ চলেছে।

আজ সকালে মুক্তিফৌজের লোকেরা বেনাপোল চেকপোস্টে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে দেয়। সরকারী সূত্রে জানা গেছে যে, মোট ৩২ জন পাকিস্তানী পাঞ্জাবী সৈন্য এই সীমান্ত পার হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

আগরতলা, ৩১শে মার্চ (পিটিআই)- রাজশাহী, খুলনা ও আরও কয়েকটি স্থানে পাকিস্তানী স্যাবর জেট আজ বোমাবর্ষণ করেছে। পাক বিমান বাহিনীর এই হানায় বহু নিরস্ত্র লোক নিহত হয়েছে।

রাজশাহী, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা ও ঢাকাতে তীব্র লড়াই চলছে।

ঢাকা বিমানবন্দরের আশেপাশে মর্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। কামান থেকেও পাক সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করছে। চট্টগ্রামে দুর্ভেদ্য দুর্গঃ যুদ্ধরত চট্টগ্রামের কয়েকস্থানে প্রত্যেকটি গৃহ একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে, পাক-সৈন্যরা কোথাও ঢুকতে পারছে না। রংপুর ও কুষ্টিয়া জেলা মুক্তিফৌজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ঢাকাতে ৩০ হাজার নিহতঃ ২৫ শে মার্চ থেকে দু'দিনে ঢাকা ও শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০ হাজার লোক নিহত হয়েছে বলে ত্রিপুরায় আগত পাক-সংবাদিকরা জানান।

-যুগান্তর, ১ এপ্রিল, ১৯৭১

স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে পাক ফৌজের সর্বাঙ্গিক অভিযান

পরাস্ত, বিপর্যস্ত পাক দখলদার বাহিনী এখন মরিয়া হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক আক্রমণ চালিয়েছে। আক্রমণ-জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে দিশেহারা পাক-সেনাদল প্রধানত শহরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। সর্বত্র পাক-বাহিনীর নগ্ন বীভৎস আক্রমণ। বিমান থেকে ফেলা হচ্ছে নাপাম বোমা, ট্যাংক থেকে বর্ষিত হচ্ছে গোলা, আর সেই সঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় জাহাজ থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে গোলা। বৃহস্পতিবার প্রায় সারাদিন স্যাবার জেট নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এর মুখোমুখি মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ আরও তীব্র, সংহত। নতুন নতুন মুক্তাঞ্চল তৈরি হচ্ছে। ঢাকার কাছে জয়দেবপুরের অস্ত্র-কারখানা মুক্তিফৌজের দখলে। এক কথায় বলা যেতে পারেঃ পাক-সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন আছে ঢাকা শহরের কয়েকটি এলাকায়। আর চট্টগ্রাম, রংপুর, সৈয়দপুর, যশোর, রাজশাহী ও কুমিল্লার শহরাঞ্চলে। অন্যদিকে মুক্তিফৌজের আওতায়ঃ ময়মনসিংহ জেলা পুরোপুরি, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহীর অধিকাংশ। ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের শহর এলাকার বাইরে সর্বত্র। যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলার পশ্চিমবঙ্গ-সীমান্তবর্তী এলাকা।

মঙ্গল ও বুধবার-দু'দিন ধরে জঙ্গীশাহী পশ্চিম পাকিস্তানে সিংহল ও চীনের মধ্য দিয়ে বিমানে, জাহাজে প্রচুর সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী আমদানী করেছে।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে সংগ্রামরত মুক্তিফৌজের ইউনিটগুলিকে একই কমান্ডের অধীনে আনা এবং পরস্পরের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে।

সারাদিন ধরে মুক্তিফৌজ ও পাক-দখলদার বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও খুলনায়। ক্যান্টনমেন্ট ও বিমানঘাটি বাদ দিয়ে যশোরের সর্বত্র মুক্তিফৌজের আধিপত্য অক্ষুন্ন। মুক্তিফৌজের আক্রমণে পিছু হটার আগে যশোর শহরে পাক-বাহিনী আগুন লাগিয়ে দেয়। ক্যান্টনমেন্ট-এর পাক-সেনাদের আজ বিমান থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

কুমিল্লায় প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ করেও মুক্তিফৌজকে কাবু করতে পারেনি। মেঘালয়ের সমীপবর্তী শ্রীহট্ট শহরেও পাক-সেনারা আজ প্রচণ্ড দাপটে আক্রমণ চালায়। এখানে পূর্ব পাক রাইফেল বাহিনী মুক্তিফৌজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছে।

রংপুর ক্যান্টনমেন্টের মুক্তিফৌজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ। খাদিমনগরে পূর্ব পাক রাইফেলস-এর ৬০০ জনকে শ্রম-শিবিরে আটক রাখা হয়েছে। আসাম থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে মুক্তিফৌজের সহায়ক পুলিশ বাহিনীর ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৭০ জন পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছেন বলে খবরে প্রকাশ। চট্টগ্রামে পূর্ব পাক রাইফেল-এর সদর দফতরটি পাক-সৈন্যরা দখল করে নিয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ এপ্রিল, ১৯৭১

মুক্তিযোদ্ধারা যশোর দখল করেছে (নিজস্ব সংবাদদাতা)

বনগাঁ, ১লা এপ্রিল-আজ বেলা ২টার পরেই বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ সমগ্র যশোহর শহর দখল করে নিয়েছে। পাক-সেনাবাহিনী শহরের তিন মাইল দূরে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

বিশেষ নির্ভরযোগ্য সূত্রে আজ সন্ধ্যায় এখানে ঐ খবর পাওয়া গেছে। প্রকাশ যে, সকালে মুক্তিফৌজ যশোর সেন্ট্রাল জেলের গেট খুলে ১০০০ বন্দীকে মুক্ত করে দেয়।

আজ বনগাঁ স্টেশনে সাদা পোশাকে একজন পাকিস্তানী পাঞ্জাবী সৈন্য জনতার হাতে ধরা পড়ে। তাকে জেল হাজতে রাখা হয়েছে। ঐ সৈনিকটি নাকি বলেছে যে, খুলনায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যশোহর ক্যান্টনমেন্টের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খুলনা থেকে বারবার সাহায্য চেয়ে যশোহর থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তখন তারা ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ঢাকা থেকে নাকি তাদের বলা হয়েছে-যে যেভাবে পার, প্রাণ বাঁচাও। ঐ নির্দেশ পাবার পর সৈনিকটি সাদা পোশাকে কোনমতে বনগাঁয় এসেছে।

-যুগান্তর, ২ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশের পশ্চিম ও উত্তর এলাকা মুক্তিফৌজের দখলে

ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলা শহরগুলির ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী সামরিক ঘাঁটিগুলি ছাড়া বাংলাদেশের সব এলাকা পাক সামরিক শাসনের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, শহর ও জনপদে উড়ছে স্বাধীন বাংলার জয় পতাকা। দলে দলে পাঠান সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে, অনেকে মুক্তিসেনাদের তাড়া খেয়ে শূন্য হাতে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আত্মসমর্পণ করেছে।

কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর একে একে মুক্তিফৌজের দখলে চলে আসছে। তবে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে পাকফৌজের আক্রমণ বন্ধ হয়নি এবং ঐ আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য স্বাধীন বাঙলা সরকার সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় দেশ ও জাতিগুলির কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে।

সীমান্ত শহর হাসনাবাদ থেকে ইউ-এন-আই জানাচ্ছেন, গত রাতে যশোহর জেলার মাগুরায় প্রায় ৩৫০ জন পাক-সৈন্য বিনা যুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

সৈন্য দলটি ১৩টি গাড়ী যোগে যশোহর অভিমুখে যাওয়ার সময় মুক্তিফৌজের বহু লোক ও আওয়ামী লীগের কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক তাদের ঘিরে ধরে।

চারদিন তীব্র যুদ্ধ চলার পর গতকাল পাক-সৈন্যদল ক্যান্টনমেন্টে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলে যশোর শহর মুক্তিযোদ্ধাদের করতলগত হয়।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) থেকে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, রাজশাহীতে এখনও যুদ্ধ চলেছে। এখানে দুইজন মেজর সহ অন্তত একশ পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে। প্রকাশ, এই এলাকায় মুক্তিফৌজের পরিচালনা করছেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন কর্নেল। জানা গেছে, তারা শতাধিক রাইফেল শত্রুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

রাজশাহী ও লালমনিরহাটে এখন তীব্র লড়াই চলছে। গত কয়েকদিন ধরে এই দুইটি অঞ্চল পাক সৈন্যদের দখলে আছে।

এক সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম পাকিস্তান রেজিমেন্টের অধিকাংশ সৈন্যই প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুক্তিফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

আবার বোমাবর্ষণঃ মুক্তিফৌজের করতলগত ছোট ছোট শহরগুলি পুনর্দখলের জন্য পাক-সৈন্যরা তৎপর হয়ে উঠেছে। আজ বিকেলে পাক বিমান বাহিনী আবার বাংলাদেশের কয়েক স্থানে বোমা বর্ষণ করেছে। এইসব স্থানের নাম পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুর।

সীমান্ত অঞ্চল থেকে এখানে প্রাপ্ত প্রকাশ, পাকিস্তানী বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বরাবর মোতায়েনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিমানযোগে আধা-সামরিক বাহিনী (সীমান্ত স্কাউট ও রেঞ্জার্স) আমদানী করছে। মুক্তিফৌজ গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করায় পাকিস্তানীরা তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রচুর গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্য আমদানীর কথা বিবেচনা করছে।

পাক-সৈন্যদের আত্মসমর্পণঃ রায়গঞ্জ (পঃ দিনাজপুর), ২রা এপ্রিল-সীমান্তের অপর পার থেকে গতকাল নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখানে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এখন দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট সম্পূর্ণভাবে নিজ দখলে রেখেছে। ঐসব স্থানে পাক-সৈন্যরা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে এবং ঢাকা ও রাজশাহীতে এখনও তীব্র যুদ্ধ চলছে বলে ঐ সূত্র থেকে বলা হয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট থেকে গতকাল প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, পাক-সৈন্যরা ৩১শে মার্চ সন্ধ্যায় দিনাজপুর শহরে নিউ টাউন ও রাজবাড়ীতে পরাজিত হয়েছে। দিনাজপুর ও ফুলবারায় সৈয়দপুর থেকে যে সমস্ত পাক-সৈন্য এসেছিল, তারা হয় নিহত নয়তো বন্দী হয়েছে। রাজশাহী জেলায় চাপাইনবাবগঞ্জে যেসব সৈন্য পাঠানো হয়েছিল, তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত নয়তো বন্দী হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে, শ্রীহট্ট শহরে প্রচন্ড লড়াই চলছে এবং পাক-সৈন্যরা সেখানে আত্মসমর্পণ করছে।

মৌলভীবাজারে ১৪০ জন পাক-সৈন্য নিহতঃ আগরতলা থেকে প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছে যে, শ্রীহট্ট জেলার মহকুমা সদর মৌলভীবাজারে যুদ্ধ চলছে এবং এখানে ১৪০ জন পাক-সৈন্য নিহত হয়েছে। শহরটি এখনও মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে, শ্রীহট্ট অবরুদ্ধ পাক-সৈন্যদের সাহায্য আরও সৈন্য প্রেরণের চেষ্টা চলছে। সৈন্যরা চরম খাদ্য সংকটে পড়েছে।

রংপুরে তুমুর লড়াইঃ শিলিগুড়ি, ওরা এপ্রিল-সৈয়দপুর, পার্বতীপুর ও রংপুর পাক-সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে লড়াই চলছে। সৈয়দপুর থেকে দিনাজপুর এই ২৪ মাইল এলাকায় অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে আছে। রংপুরের পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন জনবসতি আছে বলে মনে হয় না। মুক্তিযোদ্ধারা এদিন একশো পাকসেনাকে খতম করে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন নোয়াজেশের নেতৃত্বে ওরা লড়াই করছেন। এখানে ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলসের এক হাজার নতুন লোক এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

কয়েদী মুক্তিঃ মুক্তিযোদ্ধারা দিনাজপুর জেলাটি মুক্ত করে দিয়েছে। এখানকার কয়েদীরা বেরিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয়। এদের মধ্যে দু'জন ভারতীয় ছিল। এরা ভারতে পালিয়ে এসেছে বলে জনরব।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ এপ্রিল, ১৯৭১

উত্তরাঞ্চলের চারটি জেলা মুক্তিফৌজের দখলে

দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট-বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের এই চারটি জেলা সম্পূর্ণরূপে মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে বলে সীমান্তের ওপার থেকে শিলং-এ কাল খবর পৌঁছেছে। এই জেলাগুলোতে পাকিস্তানী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মধ্যে আটকা পড়েছে।

এদিকে পাকিস্তানী সৈন্যরা চালনা থেকে খুলনা শহর পর্যন্ত মধুমতি সদীর দু'তীরে গানবোট থেকে গোলা ছুঁড়ে নির্বিচারে গ্রামবাসীদের হত্যা করছে। সরবরাহ পথ যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেই জন্যই এই মরণপণ চেষ্টা। বোমা বর্ষণে বহু লোক নিহত হয়েছে।

পাক বিমান ধ্বংসঃ পাক বিমান বাহিনী বগুড়া ও শ্রীহট্ট থেকে মুক্তিফৌজকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য কাল বোমা বর্ষণ করে। সোমবার রাতে রাজশাহীতে মুক্তিযোদ্ধারা একটি স্যাবারজেট বিমান ধ্বংস করে। এই বিমানটি একটি খাদ্যবাহী হেলিকপ্টারকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছিল।

যশোর শহরেও তুমুল সংঘর্ষ হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে শহরটি পুনর্দখলের পর শহরটি যাতে আবার হাতছাড়া না হয় তার জন্য পাক সৈন্যরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এখনও হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী যশোর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে রয়েছে।

পাকিস্তানী বিমান বাহিনী কাল ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, বগুড়া এবং রাজশাহীতে ব্যাপকভাবে বোমাবর্ষণ করে। প্রায় একপক্ষকালীন যুদ্ধের সর্বশেষে যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে বলা হয়েছে যে, স্থলপথে যাতায়াতের সমস্ত সংযোগস্থান মুক্তিফৌজের দখলে রয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, রংপুর, সৈয়দপুর, শ্রীহট্ট ও খুলনায় অবস্থিত পাক সৈন্যরা আত্মরক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। এক ডিভিশনেরও বেশী সৈন্য ঢাকায় নিযুক্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্টদের কুমিল্লা এবং যশোরের ক্যান্টনমেন্ট শহরে হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, যশোর, কুমিল্লা এবং ঢাকার সামরিক ঘাঁটিগুলি ছাড়া অবশিষ্ট এলাকাগুলি দখলে, নয়তো সেগুলিকে অব্যবহার্য করে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার সন্নিহিত রংপুরে এবং সৈয়দপুরে আজও প্রচণ্ড লড়াই চলছে। রাজশাহীতে পাক সৈন্য মুক্তিফৌজের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। আরো সৈন্য ও রসদ আমদানীতে মুক্তিফৌজ বাধা সৃষ্টি করছে।

সমগ্র খুলনা জেলা মুক্তঃ খুলনা শহর এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পাক সৈন্যর ওপর মুক্তিফৌজ প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। জেলার অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলই এখন মুক্ত। মুক্তিফৌজ যশোর এবং খুলনায় মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তাটি নষ্ট করে দেওয়ার প্রায় এক ব্রিগেড পাকিস্তানী সৈন্য বেষ্টিত হয়ে পড়েছে।

কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মুক্তঃ সংবাদে প্রকাশ, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চল মুক্তিফৌজের সম্পূর্ণ দখলে রয়েছে। শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা শহরে প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

-যুগান্তর, ৫ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশ-পূর্ব রণাঙ্গনঃ পূর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ ৪৮০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ঢাকা-শ্রীহট্ট রেলপথটি নানা জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ফলে শ্রীহট্ট শহরে অবরুদ্ধ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে ঢাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাঠানো অসম্ভব করে তুলেছে। সোমবার শ্রীহট্ট খন্ডে জোর লড়াই চলছে।

মুক্তিফৌজ প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে শ্রীহট্টের শালুটিকর বিমানক্ষেত্রটি দখল করেছে। ময়মনসিংহ মুক্তিফৌজের হাতে। সংলগ্ন নতুন জেলা টাঙ্গাইলের অবস্থাও তাই। মুক্তিফৌজ কুমিল্লা শহরও দখল করেছে। পাক ফৌজ শহর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্টে।

বাংলাদেশ-পশ্চিম রণাঙ্গনঃ পশ্চিম রণাঙ্গনের কুষ্টিয়ায় সোমবার প্রচণ্ড লড়াই চলছে। যশোহরের চাচড়ার মোড় পুনর্দখলের জন্য জোর লড়াই শুরু হতে চলেছে। খুলনায়ও চলছে উভয়পক্ষে মরণপণ সংগ্রাম।

বাংলাদেশ-উত্তর রণাঙ্গনঃ সোমবার উত্তর রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ একটি সাফল্য অর্জন করেছে-তারা হানাদার বাহিনীর হাতে রংপুর শহরটি ছিনিয়ে নিয়েছে, তিস্তা সেতু উড়িয়ে দিয়েছে, লালমনিরহাট বিমানক্ষেত্র অকোজো করে দিয়েছে। সামরিক দিক থেকে এ সাফল্যের তুলনা নেই। মুক্তিফৌজ তিস্তা সেতু উড়িয়ে দিয়ে

স্থলপথে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের শেষ পথটি ছিন্ন করে দিয়েছে। দিনাজপুর শহর আগেই মুক্ত হয়েছে। রাজশাহীতেও জোর লড়াই চলছে। মুক্তিফৌজের সাঁড়াশি আক্রমণে হানাদাররা কোণঠাসা। বগুড়া ও পাবনা জেলার মুক্তি সংবাদ শেষ রাতে এসেছে।

বাংলাদেশ-দক্ষিণ রণাঙ্গণঃ দক্ষিণ রণাঙ্গণে চট্টগ্রামে আবার প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে হানাদার ও মুক্তিফৌজে। পাক বিমান বোমা ফেলছে চট্টগ্রামে শহরে। নোয়াখালী জেলার নানা অঞ্চলেও উভয় পক্ষ মুখোমুখি। বরিশাল জেলায় লড়াই হঠাৎ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে।

পূর্বাঞ্চল রণাঙ্গণঃ আগরতলা, ৫ এপ্রিল-বড় বড় শহরের নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল এখন মুক্তাঞ্চল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিনজন মেজর সম্মিলিতভাবে এই মুক্তাঞ্চলের প্রশাসন ভার গ্রহণ করেছেন। তাদের সাহায্য করছেন অসামরিক অফিসার ও আওয়ামী লীগের স্বৈচ্ছাসেবকরা। মুক্তাঞ্চলের শ্রীহট্ট এলাকার অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ, ময়মনসিংহ এলাকার মেজর সফিউল্লা ও চট্টগ্রামে এলাকার মেজর জিয়াউর রহমান।

দিন কয়েক আগে মেজর জিয়াউরই স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তখন তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন মেজর জিয়া বলে।

গত শনিবার শ্রীহট্ট এলাকার কোন এক স্থানে মেজর মোশাররফের সদর দফতরে তিন মেজর এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে স্থির হয়ঃ যতদিন না জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে এই ত্রয়ীই সেনাবাহিনী পরিচালনা করবেন।

শ্রীহট্ট খন্ডের অধিনায়ক মেজর মোশাররফ ইউ এন আইয়ের প্রতিনিধিকে বলেনঃ স্বাধীনতা ঘোষণার সময় মুক্তিফৌজে পুরোদস্তুর সৈন্যের সংখ্যা ছিল হাজার কয়েক মাত্র। এখন তা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। তা ছাড়া আওয়ামী লীগের হাজার হাজার স্বৈচ্ছাসেবককে নিয়মিতভাবে সামরিক তালিম দেওয়া হচ্ছে।

মুক্তিফৌজের রণনীতি প্রসঙ্গে মেজর বলেন, মুক্তিসেনাদের সংঘবদ্ধ করা ও তাদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলাই এখন সবচেয়ে জরুরী। শত্রুপক্ষের শক্তি কোন এলাকায় কি রকম সে-সকল খোজখবর নেওয়ার পর হানা হবে আঘাত। মেজর মোশাররফ জানান, বিভিন্ন জায়গায় লড়াই করা মুক্তিফৌজ হানাদারদের কাছ থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। আরও অস্ত্রশস্ত্র দখল ও অস্ত্রাগারগুলির উপর আক্রমণ চালাবার জন্য গেরিলা বাহিনী গঠন করা হবে।

সমুদ্রবক্ষে পাক সাবমেরিনের বাঙালী নাবিকদের বিদ্রোহ

তউলন (ফ্রান্স), ৫ এপ্রিল-পাকিস্তানী সাবমেরিন ‘মনগ্রো’র বাঙালী নাবিকরা ‘বিদ্রোহ’ করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু তৎপরতার সঙ্গে তা দমন করা হয়। ৪৫ জন নাবিকের মধ্যে ১৩ জনকে ফেলে রেখে সাবমেরিনটি এখান থেকে যাত্রা করে। সাবমেরিনটি এখান থেকে করাচির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। বাঙালী নাবিকরা সেটি থামাবার চেষ্টা করে।

১৩ জন নাবিক সুইজারল্যান্ডের দিকে যাত্রা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ সাবমেরিনের ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। তবে মনগ্রো’র আশেপাশে জাহাজগুলির নাবিকেরা তাতে মহর্মুহু চিৎকার শুনতে পান। মনগ্রো’র নিকটবর্তী দক্ষিণ আফরিকার একটি সাবমেরিনের একজন অফিসার বলেন, আমি মনে করেছিলাম, বুধবার রাতে তারা পরস্পরের গলা কাটছিল।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ এপ্রিল, ১৯৭১

গুরুত্বপূর্ণ রেলশহর পাবতীপুর মুক্ত সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

৬ এপ্রিল-উত্তরখন্ডের গুরুত্বপূর্ণ রেলশহর পাবতীপুরে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ল। আজ ভোর না হতেই মুক্তিফৌজের পাবতীপুর অভিযান শুরু হয়েছিল। দু'হাজারের মত মুক্তিফৌজ বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাবতীপুরের ওপর। অবশেষে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন শত্রু হাত থেকে। পাবতীপুর আজ স্বাধীন, শত্রুমুক্ত।

পাবতীপুর দখলের আগে এই শহরের দু'মাইল দূরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিসে বসে মাঝে মাঝেই গুলির শব্দ শুনছিলাম। বেলা তিনটায় আওয়ামী লীগ নেতা মহম্মদ আনোয়ার তখন দুটি স্টেনগান দেখিয়ে বলেন যে, ওই দুটি তারা পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। আলোচনার কিছু পরেই পাবতীপুর থেকে জয়ের খবর আসে। মুক্তিফৌজের মেজর মনসুন আলি ছুটে এসে ওই খবর দেন। আওয়ামী লীগের আর একজন নেতা এম এ কুদ্দুসকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘পাবতীপুর দখল’ -একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন, এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি দখলের জন্য গত রাত্রি থেকে পাক সেনারা চেষ্টা করছিল। তারা এই শহর দখলের মরিয়া হয়ে ওঠে।

বিকালে দিনাজপুরে ও বগুড়া থেকেও মুক্তিফৌজের জয়ের খবর আসে। ওই দুই স্থানে পাক সৈন্য-বাহিনী প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে।

আরও খবরঃ রাজশাহী, ফরিদপুরের যে ক’টি জায়গা পাক সেনারা দখল করে রেখেছে মুক্তিফৌজ তাও দখলের চেষ্টা করছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জানানো হল যে, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও পাবনার অধিকাংশ অঞ্চল মুক্তিফৌজের দখলেই।

পূর্ব রণাঙ্গনের খবর

চট্টগ্রাম জলধার ক্ষতিগ্রস্তঃ আগরতলা, ৬ এপ্রিল-সীমান্তের ওপার থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর এসেছে, তিন দিন আগে মুক্তিফৌজ চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিমাংশে কোর্ট এলাকায় অবস্থিত ওয়াটার ওয়ার্কস এর জলাধার ও পাওয়ার হাউস ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছেন। এই এলাকায় পাক বাহিনী দিনরাত্র ঘাঁটি আগলাচ্ছিল।

চট্টগ্রাম শহরের ডাকঘর ও বিমানবন্দর এলাকা সম্পূর্ণরূপে পাক দখলদারদের হাতে। বন্দর এলাকা পরিত্যক্ত জনমানবশূন্য।

সারা নোয়াখালী জেলা, নোয়াখালীর লাগোয়া কুমিল্লার কিছু অংশ এবং চট্টগ্রাম জেলা এখন সম্পূর্ণভাবে পাক সৈন্য মুক্ত। এসব মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশে সরকারের অধীনে অসামরিক প্রশাসন ফিরে আসছে।

আবার স্বাধীন বাংলা বেতারঃ “স্বাধীন বাংলা বেতার” কেন্দ্র আবার ফিরে এসেছে। মঙ্গলবার শর্ট ওয়েভে এর অনুষ্ঠান শুরু হয়। তবে ঘোষণাগুলি একরকম শোনাই যায়নি। আগে এই কেন্দ্রটি ছিল চট্টগ্রামের কাছে, পরে পাক ফৌজ-এর তোপের মুখে উড়ে যায়। নতুন জীবন ফিরে পেয়ে স্বাধীন কেন্দ্রটি ঘোষণা করেছে দু’এক দিনের মধ্যেই মিডিয়াম ওয়েভ-এ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে।

সোমবার শিলং-এ সন্ধ্যা ছটায় ৮১ থেকে ৮২ মিটারে (শর্ট ওয়েভ) অনুষ্ঠান শোনা যায়। প্রচারিত গানগুলির মধ্যে “আমার সোনার বাংলা” তো ছিলই, উপরন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা” গানটি শোনা যায়।

এই বেতার বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তির জন্য এবং জয়ের জন্য প্রার্থনা করতে আহবান জানিয়েছে। ধিক্কার দিয়েছে বিশ্বাসঘাতক জঙ্গী স্বৈরতন্ত্রকে-যারা দেশব্যাপী রক্তশ্রোতের জন্য দায়ী। আর শেষে সাড়ে কোটি মানুষের হয়ে সমস্ত বিশ্বের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির জন্য আবেদন জানিয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ এপ্রিল, ১৯৭১

সোমবার জয়-বাংলার জয়ের পালা

রংপুর, কুমিল্লা ময়মনসিংহ মুক্ত, তিস্তা সেতু ধ্বংসঃ সোমবার জয় বাংলার শুধু জয়ের মালা, একটার পর একটা জয়ের পালা জয় রংপুর শহর-অধিকৃত। জয় কুমিল্লা শহরেও-মুক্ত। শ্রীহট্টের বিমানক্ষেত্রও মুক্তিফৌজের করারত। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুরে মুজিব সেনারই জয়জয়কার। সংগ্রামী সেনারাই দিন এই প্রথম সব রণাঙ্গন মিলিয়ে একটি যুক্ত কমান্ড গড়ে তোলার পথে পা বাড়ান। এই উদ্যোগ হানাদার হটানোর লড়াইয়ে শেষ রাউন্ডের প্রস্তুতি।

মুক্তিফৌজ হানাদারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া সাঁজোয়া গাড়ি, মেশিনগান ও অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নরসিংদী (ঢাকা থেকে ১৪ কি.মি.) অভিযানে এগিয়ে চলেছেন। শ্রীহট্ট শহরের একাংশ এবং ছাউনি এলাকা বাদে পাবনা ও বগুড়ার প্রায় সব অঞ্চলই হানাদারমুক্ত।

পাকফৌজ ও হানাদার বিমান বাহিনীর তৎপরতা রোধের জন্য মুক্তিসেনারা পোড়ামাটি নীতি অনুসারে তিস্তা সেতু ধ্বংস করেছেন। একেজো করে দিয়েছেন লালমনিরহাট বিমানক্ষেত্র, উড়িয়ে দিয়েছেন ঢাকা-শ্রীহট্ট রেলপথের (৪৮০ কিলোমিটার) বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে পাকিস্তানী ফৌজ গর্তে তাড়া খাওয়া সাপের মত ছড়িয়ে পড়েছে রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও শ্রীহট্ট আর মার-খাওয়া সাপের মতই ছোবল মারছে যত্রতত্র, যা পাচ্ছে তাই ধ্বংস করছে কামান দিয়ে, মেশিনগান দিয়ে, পেটরোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে। অত্যাচার চালাচ্ছে বিশেষ করে নারীদের ওপর।

রংপুর পাকিস্তানীদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের দরুণ লড়াই হয়েছে। দু'পক্ষের হতাহতের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুক্তিফৌজই জয়ী। দখলদারদের হাত থেকে তাঁরা রংপুর শহর পুনর্দখল করেছেন। রংপুর শহরের কাছেই তিস্তা-সেতু মুক্তিফৌজ সেটি ধ্বংস করে দিয়েছেন। লালমনিরহাট বিমানক্ষেত্রটিও তারা একেজো করে দিয়েছেন। সেতুটি ধ্বংসের ফলে পাকিস্তানীর পালাবার পথ নেই। অন্য সমস্ত পথ মুক্তিফৌজ আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীহট্টেও পাকফৌজের সরবরাহের পথগুলি একে একে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেখানেও তারা প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন। সবত্রই মুক্তিফৌজ দখলদারদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী। ঢাকা-শ্রীহট্ট রেলপথ এখন ব্যবহারের অযোগ্য। শ্রীহট্টের শালুটিকর বিমানক্ষেত্রটি মুক্তিফৌজ প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর দখল করে নিয়েছেন। শ্রীহট্টের শহর ছাড়া ওই জেলার কোথাও পাকফৌজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। হরিপুর (ভারত সীমান্ত থেকে ২৯ কি.মি.) পাকিস্তান পেটরোল লিঃ এর তৈলকেন্দ্রটি মুক্তিফৌজ শনিবার উড়িয়ে দিয়েছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সেখানে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

লালমনিরহাট পাকফৌজের দখলে আছে। পাক বিমান বাহিনীর মদতে তারা সেখানে আছে। আনন্দবাজারের সংবাদদাতা কোচবিহার থেকে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানীরা লালমনিরহাট প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করেছে। কোচবিহারে বাংলাদেশ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার উদ্ধাস্ত এসেছেন। তারা সবাই মুসলমান।

বাংলাদেশের তিন সেনাপতিঃ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকা ও শহর ছাড়া প্রায় সবটাই এখন মুক্তিফৌজের দখলে ও প্রশাসনে। এই প্রশাসনে তিনটি সেকটরের নেতৃত্ব করছেন তিনজন সেনাপতি।

এরাই মিলিতভাবে মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আওয়ামী লীগের অনুগত অসামরিক অফিসার ও কর্মচারীরা এদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন।

এই তিন সেনাপতি হলেন-মেজর খালেদ মুশাররফ (শ্রীহট্ট সেকটর), মেজর সফিউল্লা (ময়মনসিংহ) ও মেজর জিয়াউর রহমান (চট্টগ্রাম)। জিয়াউরই মেজর জিয়া নামে অস্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিলেন।

গত শনিবার শ্রীহট্টের কোন এক জায়গায় মেজর মুশাররফের সদর দফতরে ওরা তিনজন মিলিত হয়েছিলেন এবং ঠিক করেছেন যে, যতদিন না জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসে এবং জাতীয় সরকার গঠিত হয় ততদিন তারা মুক্তিফৌজ ও প্রশাসন পরিচালনা করবেন।

মেজর মুশাররফ সাংবাদিকদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা নিজে সঙ্গে থেকে দেখান এবং জানান যে, পাকিস্তানীদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করেছেন। মুক্তিফৌজ বাংলাদেশে কত জনপ্রিয়, সাংবাদিকেরা তা নিজেদের চোখেই দেখতে পান। বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিফৌজের নতুন স্বেচ্ছাসেবকের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে-তাও তাঁরা দেখেন।

যশোরে সংঘর্ষঃ যশোর শহরের সর্বত্র নিজেদের কর্তৃত্ব দাবির জন্য হানাদার বাহিনী সোমবার রাতে মুক্তিফৌজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে বলে পাওয়া গেছে। যশোর-ঢাকা সড়ক ও যশোর-বেনাপোল সড়কে দোতলা তেতলা বাড়িগুলি দখল করে হানাদাররা মেশিনগান ও মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করে চলেছে।

যশোরের এই খবর ছাড়াও ইউ এন-আই-পি টি আই জানান যে, বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম শহরে পাকবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। কুমিল্লা থেকে বহু হানাদার হটে গিয়ে এখন ময়নামতীর ছাউনি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। মুক্তিফৌজ আঘাত করেই সরে পড়ার নীতিকে আক্রমণ চালিয়েছিল।

কলকাতার খবর পাওয়া যায়, চট্টগ্রাম, রংপুর ও খুলনার বেতার কেন্দ্রগুলি এখন মুক্তিফৌজের হাতে। তবে হানাদাররা যন্ত্রপাতি নষ্ট করে যাওয়ায় বোধহয় প্রচার বন্ধ আছে। বন্দরগুলি সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্তে আনার জন্য মুক্তিফৌজ প্রস্তুত হচ্ছেন।

মজুদ খাদ্য ফুরিয়ে আসছে বলে হানাদাররা এখন ভেঙ্গে পড়ছে। রংপুর এমনকি ঢাকাতেও পাকসেনারা সরবরাহের সংস্থানে খুবই বিপন্ন বোধ করছে। মৌলবীবাজার ও বাক্ষণবাড়িয়ার বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল-এর সেনারা একটি কমান্ডের অধীনে নিজেদের নতুন করে সংগঠিত করে নিচ্ছে।

হানাদাররা ঢাকা-কুমিল্লা এবং ঢাকা-শ্রীহট্টের মধ্যে সড়ক ও রেলসংযোগ খোলার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। কারণ, এর ফলে সেনা চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। হানাদাররা দু'এক জায়গায় সংযোগ পুনরায় চালু করলেও মুক্তিবাহিনী আবার অন্যত্র এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অতর্কিত আক্রমণে সমশেরনগরের কাছে মুক্তিফৌজ হানাদারদের বহু গাড়ি ও অস্ত্র দখল করে নিয়েছেন। রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী একটি হেলিকপ্টার মুক্তিসেনারা গুলি করে ফেলে দিয়েছেন।

পাকফৌজ ট্রেনের উপর গেরিলা আক্রমণঃ মোগলহাট, রংপুর (বাংলাদেশ)-লালমনিরহাট থেকে মোগলহাটের দিকে একটি ফৌজী রেল-ইঞ্জিন এগোবার পথে মুক্তিফৌজের গেরিলাদের বোমার ঘায়ে জখম হয়ে ফিরে যায়। লালমনিরহাটকে চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। লালমনিরহাট-রংপুর ক্যান্টনমেন্ট সড়ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন। পাকমিলিটারী বোঝাই একটি ট্যাঙ্ক এই পথে এগোতে গিয়ে অবরোধের মুখে উল্টে যায়। ২০/২৫ জন ফৌজ আহত হয়েছে। রংপুরে কোনও বিমানবন্দর নেই, আছে শুধু হ্যালিপ্যাড ফলে আকাশপথে জঙ্গী-বাহিনী কোন সুবিধা করতে পারছে না। সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। পশ্চিমী ফৌজ ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ।

আজও রংপুর ও লালমনিরহাটে মিলিটারী লুণ্ঠন ও হত্যা চালায় ব্যাপক। গত তিনদিনে ৪৭ বাঙালী বুদ্ধিজীবিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। রংপুরের ডি সি সৈয়দ আমিজ আহসান ও এস পি আর বারিককে আজ তাদের বাড়ি থেকে ফৌজ ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তাদেরও হত্যা করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১

সংগ্রামের তৃতীয় সপ্তাহের সূচনায় পাকফৌজের পাল্টা অভিযান তবু মুক্তিফৌজেরই প্রাধান্য

সমগ্র উত্তরখন্ড এবং পশ্চিমখন্ডেরও বৃহৎ করায়ত্ত, মুক্তিবাহিনী এই এই দাবিপত্রটি হাতে নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করল। কুমিল্লায় গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটিটি দখলের জন্য বৃহস্পতিবার রক্তক্ষয়ী লড়াই চলে। সর্বশেষ সংবাদ, এই এলাকায় মুক্তিফৌজের চতুর্থ বেংগল রেজিমেন্টেরই প্রাধান্য। এই ক্যান্টনমেন্টটি এখন সম্ভবত ফৌজের হাতে। ময়নামতী ছাউনি এলাকায় ঢুলুপাড়া বিমান ক্ষেত্রটি কার্যত মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে।

কলকাতায় জলপাইগুড়ি থেকে প্রাপ্ত একটি প্রকাশ, উত্তরখন্ডে সৈয়দপুর মুজিব সেনার অধিকারে এসে গেছে। এই ছাউনিতে দুটি ট্যাংক অধিকৃত, ২০০ দখলদার সেনা নিহত। কিন্তু ফৌজী গোলায় আর বোমায় চারপাশের গ্রামের প্রায় পার হাজার লোকের প্রাণ গেছে।

আর একটি খবর-রাজশাহী শহরের পতন। শুধু শহর নয়, রাজশাহী সেনা ছাউনিও শত্রুমুগ্ধ যশোরে ফৌজী বাহিনীর অবস্থা সঙ্গীন। মুক্তিবাহিনী লড়াই জোরদার করার তোড়জোড় করছে। এখানে পাকসেনার দল অবরুদ্ধ ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তিফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলে জানা যায়। সৈন্যরা বন্দী হয়, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এদিনের খবরের বিপরীতে চিত্রও আছে। দখলদার বাহিনী বসে নেই। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে তাদের রনংদেহি মূর্তি দেখা গেছে। নতুন রণসম্ভার এবং মারণাস্ত্রে বলীয়নে পিন্ডি ফৌজ শ্রীহট্ট, যশোর, কুষ্টিয়া এবং দিনাজপুর এলাকায় বহুমুখী অভিযান চালায়। একটি বাহিনী যশোর অঞ্চল থেকে এগিয়ে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে চুয়াডাঙ্গা দিকে। আর একটি উত্তর থেকে নেমে আসে দিনাজপুর অভিমুখে, গোয়ালন্দঘাট থেকে তৃতীয় একটি সেনাদলকে কুষ্টিয়ার দিকে অগ্রসর হতে হতে দেখা যায়। পদ্মা দিয়ে পিন্ডি ফৌজ গোয়ালন্দঘাটে নতুন সৈন্য আর সাজসরঞ্জাম নামাতে পেরেছে। লড়াই চলছে প্রচণ্ড, তবে হানাদার সেনাদল কোথাও বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেনি। পাক বিমান বাহিনী এদিনও রাজশাহী, শ্রীহট্ট, নারায়নগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় বোমাবর্ষণ করে। তারা চারদিন কামানের গোলা ছড়িয়ে গোয়ালন্দ রসদ নামায়। কিন্তু বাধা পায় প্রবল। মুক্তিফৌজ যেন অগণিত যোদ্ধা দিয়ে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করে রেখেছিল।

দিনাজপুর শহরের দশ মাইল দূরে ভীষণ সংঘর্ষ চলছে-অন্তত সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত সংবাদ ছিল এই। পরে আরও খবরে জানা যায়। চিরিরবন্দর পোরের কাছে বাধা পেয়ে তারা পিছু হটে যায়। চুয়াডাঙ্গা এলাকাতেও সংগ্রাম তীব্র। শোনা গেছে শুধু কামানের আওয়াজ, দেখা গেছে খালি ধোঁয়ার কুন্ডলি। ভারত সীমান্ত নিকটবর্তী এই অঞ্চলে মেজর এম এ ওসমানের নেতৃত্ব মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের সম্মান বাঁচাতে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। চালনার খাল দিয়ে হানাদারদের রণতরী চালানোর চেষ্টা মুক্তিফৌজ এদিন বার বার ব্যর্থ করে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা খুলনা আর যশোর শহরে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। দুটি শহরই হাজার হাজার মুক্তিফৌজ বস্তুত ঘিরে রেখেছে। খুলনা এলাকার শিল্পাঞ্চল দখলের জন্য প্রবল সংগ্রাম চলেছে। এই অঞ্চলে মুক্তিফৌজের অধিনায়ক শেখ মুজিবের ছোট ভাই শেখ নাসিরুদ্দীন।

দুর্গ দখলের অভিযানে সেনাপতির সঙ্গী বেগম ওসমান

যশোর, ৮ এপ্রিল-যশোর দুর্গ দখলের জন্য দশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা দূরবর্তী চারটি কোণ থেকে রণাঙ্গনের দিকে কদমে কদমে এগিয়ে চলেছে। বুধবার শেষ রাতে তাঁদের এই অভিযান শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এই বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক মেজর ওসমান। পাশে থেকে শক্তি যোগাচ্ছেন সহঅধিনায়ক বেগম ওসমান। দুর্বীর বেগে এগিয়ে চলা এই বাহিনীর মুখে ধ্বনিঃ চলো, চলো দুর্গে চলো।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দুর্গ দখলের জন্য মুক্তি সংগ্রামীদের প্রস্তুতি পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। নিজেরা কারফু জারি করেছেন প্রয়োজনীয় এলাকায়। সন্দেহজনক ও অচেনা মুখ দেখলেই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। বাইরের কয়েকজন বেঈমান ধরা পড়ায় তাদের চরম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পরিখা খোঁড়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ জায়গায়। বিবর ঘাঁটিও হচ্ছে অগ্রবর্তী অঞ্চলে। দুর্গের চারদিকে বেষ্টিত রচনা করে ওয়ারলেস সংযোগ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছে। নতুন রণকৌশলে শত্রুবাহিনীকে শেষ আঘাত হানার জন্য সব ব্যবস্থাই পাকা। সর্বাধিনায়কের নির্দেশ পাওয়া মাত্র ঝটিকা গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মুক্তি সেনারা এখন তৈয়ার।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজের নাভিশ্বাস উঠেছে। মরণ কামড় দেওয়ার জন্য তারা দুর্গের আশপাশে চালাচ্ছে পোড়ামাটি নীতি। গ্রামের পর গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এ দিন সকাল থেকেই দাউ দাউ করে ঘরবাড়ি পুড়তে দেখা যায়। চাঙ্গুটিয়া, আরিফপুর, পতেঙ্গালি প্রভৃতি এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এছাড়া গুদাম, দোকানপাট লুণ্ঠ করেছে মিলিটারি সমর্থক আর একদল পশ্চিমী ঠ্যাঙাড়ে দল। হত্যা, হামলায় বিতাড়িত হয়ে হাজার হাজার শরণার্থী ভারতে এস আশ্রয় নিচ্ছেন। আরও বহু শরণার্থী ভারত প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছেন।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ এপ্রিল, ১৯৭১

ঝিকরগাছায় পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিফৌজের প্রচণ্ড লড়াই

ঝিকরগাছা রণাঙ্গন, (যশোর), ৯ই এপ্রিল-পাকিস্তানী বাহিনী আজ ঝিকরগাছা পর্যন্ত রণক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে। কামান ও ৬ ইঞ্চির মর্টার নিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা আজ ভোরে মালঞ্চ গ্রামের উপর নতুন আক্রমণ চালানে মুক্তিফৌজ গ্রাম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। গ্রামটি তারা ছেড়ে দিলেও তাদের মেশিনগানের গুলীতে প্রায় একশ' পাকসৈন্য নিহত হয়েছে।

মালঞ্চ গ্রাম ছেড়ে মুক্তিফৌজ এখন একদিকে যশোর রোডের উপর লাউজানি লেভেল ক্রসিং গেটে এবং অন্যদিকে ঝিকরগাছা বাজারের উত্তর দিকে কপোতাক্ষ নদের পূর্ব পাড়ে পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে 'ব্যাক টু দি ওয়াল' লড়াই আরম্ভ করেছে।

সকালের দিকে পাকিস্তানী বাহিনী যখন যশোহর রোড ধরে ঝিকরগাছার দিকে এগোচ্ছিল, সে সময় মুক্তিফৌজ লাউজান ক্রসিং গেট বরাবর মেশিনগান ও ৩ ইঞ্চির মেশিনগান মর্টার দিয়ে পাকবাহিনীর আক্রমণ রোধ করে। কিন্তু পাকবাহিনী তখন যশোহর রোডের উপর তাদের একটি দল রেখে উত্তর দিকে চষা মাঠের মধ্য দিয়ে কাটাখাল পেরিয়ে ঝিকরগাছা বাজারের উপর মর্টারে গোলা ছুড়তে আরম্ভ করে।

পদ্মার তীরে নতুন যুদ্ধ ফ্রন্ট

শুক্রবার ভোর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে নতুন করে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ হানবার চেষ্টা করছে। গতকাল রাত থেকেই পশ্চিম

পাকিস্তানী সেনা ঢাকা জেলার পশ্চিমাংশে পদ্মা তীরবর্তী আরিচাঘাট, শিবালয় প্রভৃতি স্থানে জমায়েত হয়। এ খবর বাংলাদেশের। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের কমান্ডের মুক্তিফৌজ সদস্যরা ফরিদপুরের কাছে পদ্মার তীরে বাস্কার তৈরী করে সারারাত ধরে পাহারা দেয়। পাকিস্তানী সৈন্যদের জলপথে সেনা জমায়েত এই প্রথম হওয়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে আরো একটি নতুন যুদ্ধফ্রন্ট পদ্মা নদীর উত্তর দিক বরাবর এবং দক্ষিণ তীরের কিছু অংশে গড়ে উঠলো।

আজ সকালে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকা জেলার আরিচাঘাট ও শিবালয় থেকে গোয়ালন্দ ও নগরবাড়ীর দিকে নদী অতিক্রম করে বারবার যাবার চেষ্টা করে। নদী পারাপার কালে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের দীর্ঘ লড়াই হয়। সারাদিন লড়াইয়ের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যমুনা নদী পার হয়ে নগরবাড়ীতে নামতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কমান্ডের সদর দপ্তর চুয়াডাঙ্গায় রাতের দিকে খবর আসে গোয়ালন্দের তীর বরাবর ফরিদপুরের দিকে পাকিস্তানী সেনারা এগুতে থাকলে বাংকারের ভেতর থেকে মুক্তিফৌজ আশ্রয় চেষ্টায় তাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করেন। নদী পারাপারের সময়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা মর্টার ও বিমানের সাহায্য নেয়। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা গোয়ালন্দের দিকে নামতে সক্ষম হয়নি।

যুগান্তর, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

হত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে মরীয়া পাক-বিমান শহরে শহরে মুক্তিসেনার প্রতিরোধ

অদম্য মুক্তিফৌজের প্রবল প্রতিরোধের ফলে পাক সেনাবাহিনী দিশেহারা। এখন বর্ষার আগে শেষ ভরসা শুধু আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ। স্বাধীনতার যুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ যে সমস্ত এলাকা দখল করে নিয়েছিল, তার কিছু কিছু অংশ পুনর্দখলের মরীয়া চেষ্টায় এদিন পাকস্থলবাহিনীকে অবিরাম মদদ দিয়েছে বিমানবাহিনী।

মুক্ত শহর রাজশাহীতে শুক্রবার পর্যন্ত মোট গোলাবর্ষণ হয়েছে ১৫ বার। লক্ষ্যস্থল ঠিক না রেখে হানাদার বিমান এলোপাতাড়ি বোমা ফেলেছে রংপুর, শ্রীহট্ট, দিনাজপুর, ফেনী, হরিপুর, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া এবং আরও কয়েকটি জায়গায়। তৎপর মুক্তিফৌজের তাঁরা বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি, তবে অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে নিহতদের সংখ্যা অনেক।

ঢাকা থেকে শুরু হয়েছে দ্বিমুখী আক্রমণ। শহর থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে মানিকগঞ্জের দিকে একটি সেনাদলকে অগ্রসর হতে দেখা গেছে। আর একটি সেনাদল ময়মনসিংহের দিকে। উদ্দেশ্য, নদীপথে পুরো দখল রাখা। টাঙ্গাইলের উত্তরে একটি সেনাদলকে আক্রমণ করেছে মুক্তিফৌজ। শেষ খবরে জানা যায়, সেখানে লড়াই চলছে তুমুল।

পাবনায় আরেকটি বড় রকমের সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। যমুনা পেরিয়ে পাবনা অভিযুক্ত একটি পাকসেনাদলের গতি আটকে দিয়েছে মুক্তিবাহিনী। স্বাধীন বাংলা বাহিনীর দক্ষিণে-পশ্চিমে এলাকার পরামর্শদাতা ডঃ আশাবুল হক জানিয়েছেন যে, ঐ অঞ্চলে পাক স্থলবাহিনীকে সাহায্য করছে নৌজাহাজ ও বিমান-গোলাবর্ষণে, বোমাবর্ষণে। কিন্তু মুক্তিফৌজ অস্ত্রশক্তিতে হীনবল হয়েও হানাদারদের গতি রুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

দিনাজপুরে প্রবল সংগ্রামের খবর আছে, এই শহরটি পুনর্দখল করার জন্য পাকফৌজ ট্যাংক আমদানি করেছে। রংপুরে অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করার জন্য চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছে মুক্তিফৌজ। আওয়ামী লীগের সূত্রে জানা যায়, এই এলাকার সবটাই এখন মুক্তিফৌজের দখলে। কুষ্টিয়ার জঙ্গলগাছিতে পাকফৌজ নতুন করে আক্রমণ চালিয়েছে।

কুমিল্লাঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব খণ্ডে কুমিল্লা শহর ও ক্যান্টনমেন্ট প্রচণ্ড লড়াই চলছে। বিমান বন্দরটি এখন হানাদারদের দখলে। ঢাকা থেকে তাই রোজ সৈন্য আসছে। আসছে খাবার-দাবার। কুমিল্লা থেকে

পাকসৈন্য জাঙ্গালিয়া রোড ধরে চাঁদপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়ত তারা নদী ধরে কুমিল্লা যাওয়ার পথটি আবার চালু করার জন্য নতুন করে চেষ্টা চালাবে।

কুমিল্লা শহর থেকে কয়েক হাজার অধিবাসী পালিয়ে গিয়েছে। পাকসৈন্যরা অবাধ্য অধিবাসীদের শায়েস্তা করতে ওই অঞ্চলে আগুন জ্বালিয়েছে। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাজীপুর, বিবিরবাজার ও তরুণপুর।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

কামানে বিমানে আওয়ান হানাদার বাহিনী বনগাঁ সীমান্তের কাছাকাছি

নাভারন (যশোর), ১০ এপ্রিল-আজ ভোরের দিকে পাকিস্তানী ফৌজ যশোর দুর্গ থেকে বেরিয়ে সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে এগোয়। মুক্তিফৌজ তাদের প্রবল বাধা দেয়। হানাদাররা কামান, মেশিনগান, মর্টার নিয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। দু'খানা জঙ্গী বিমানও ছাতার মত তাদের উপর মাথায় উপর দিয়ে পাহারা দিয়ে যায়। বোমাও ফলে মুক্তিফৌজের লক্ষ্য করে। মুক্তিসেনারাও তার পাল্টা প্রতিরোধের জোর করে। পাকসেনারা তখন গ্রামের পর গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাদের অত্যাচারে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়ের আশায় ছোটেন। দখলদার বাহিনী এরপর ঝিকরগাছা পর্যন্ত এগিয়ে কামান দাগতে থাকে। তারপর হানা দেয় সীমান্তের কাছাকাছি। আগের দিন সন্ধ্যায় পাকিস্তানী সৈন্যরা পিছু হটে যাওয়ার পর মাঝেমাঝে গুলির আওয়াজ ছাড়া রাতে দুই তরফে সামনা-সামনি লড়াই হয়নি। মাত্র কয়েক ঘন্টার যুদ্ধবিরতির পর আজ আবার রণাঙ্গন মুখর হয়ে ওঠে। তখন ভোর সারে চারটা। কামান গর্জন করতে থাকে। মর্টারের গোলার ঘন ঘন আওয়াজ এপার থেকে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। এরপর পাকিস্তানী সৈন্যরা তিনটি লাইনে ঝিকরগাছার দিকে এগোতে থাকে। মাঝের লাইন থাকে যশোর রোডে। আর বাঁ দিকে পাশের রেলপথ বেয়ে এবং ডানদিকে মাঠের মাঝ দিয়ে দুটি লাইনে হানাদাররা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকে। পাকিস্তানী সেনাদের সারবদ্ধ এই অগ্রগতির আকার ইংরেজি 'ভি'-এর মত।

দিনাজপুর শহরের কাছে প্রচন্ড লড়াই

নগরবাড়ি (ঢাকা-পাবনা-বগুড়া রোড)-সন্ধ্যার পর দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি সামরিক বাহিনী দখল করে নিয়েছে। প্রচন্ড লড়াই চলছে। পাক সামরিক বাহিনী ট্যাংকও ব্যবহার করছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে। পাক সামরিক বাহিনী বিহারী মুসলমানদের রাইফেলস দিয়ে কাজে লাগাচ্ছে।

দিনাজপুর শহরের তিন মাইল দূরে রাণীগঞ্জে পাক সামরিক বাহিনী এসে গিয়েছে। মুক্তিফৌজ প্রচন্ড বাধা দিয়ে যাচ্ছে। শহরের দক্ষিণে আত্রাই নদী পার হয়ে এখন কাঞ্চন নদীর তীরে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। পাক বাহিনী তিনটি রেজিমেন্টই ব্যবহার করছে। গতকাল রাতে পাবনায় ছয় পাউন্ড ওজনের মর্টার ব্যবহার করেছে। এখানে ঢাকা-পাবনা রোডের উপর এখনও যুদ্ধ চলছে।

পদ্মা নদীতে জলযুদ্ধঃ গৌহাটি, ১০ এপ্রিল-খুব বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ, পাবনা শহরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পদ্মা নদীতে প্রচন্ড লড়াই চলছে। দ্বিতীয় দিনের এই জলযুদ্ধে একদিকে মুক্তিফৌজের দেশী দ্রুতগামী নৌকা আন অন্যদিকে পশ্চিম পাকসৈন্যের গানবোট।

পূর্ব রণাঙ্গনে পাক আক্রমণঃ আগরতলা, ১০ এপ্রিল-ছাউনিতে বন্দী পাক সেনাদল মুক্তিযোদ্ধাদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পূর্ব রণাঙ্গনের এক বিরাট এলাকায় নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে। সর্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে জানা যায় যে, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্ট প্রচন্ড লড়াই চলছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ এপ্রিল, ১৯৭১

হারাগাছ ও তিস্তা সেতু এলাকা মুক্তিফৌজের হাতে এসেছে

উত্তরাঞ্চলের কোন স্থান, ১০ই এপ্রিল-গত রাতে নতুন করে আক্রমণ চালিয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী তীব্র লড়াইয়ের পর হারাগাছ এবং তিস্তা সেতু এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখলে এনেছে। পাক-হানাদাররা এই যুদ্ধে

দু'কোম্পানী সেনা নিয়োগ করেছিল, তারা এখন মৃত ও আহত সেনাদের ফেলে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের দিকে চম্পট দিয়েছে। মুক্তিফৌজ এই যুদ্ধে কিছু অস্ত্রশস্ত্র, একটি জীপ এবং রসদও দখল করেছে।

হারাগাছ ও তিস্তা সেতু অঞ্চল মুক্তিফৌজের দখলে আসায় রংপুর লালমনিরহাট ক্যান্টনমেন্ট দুটির মধ্যে সরবরাহ পাঠাবার পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পাক হানাদারদের এখন বিমানে সরবরাহের উপর নির্ভর করতে হবে।

রংপুর ক্যান্টনমেন্টকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য মুক্তিফৌজের সেনারা ছোট দলে ভাগ হয়ে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি রেল সেতু ও একটি চলাচলের সেতু ধ্বংস করে দিয়েছে। এই সেতুগুলি রংপুরের সঙ্গে কুড়িগ্রামের যোগাযোগ রক্ষা করতো।

মুক্তিফৌজের অতর্কিত আক্রমণঃ ইয়াহিয়া বাহিনীর একটি দল কয়েকটি ট্রলিযোগে লালমনিরহাট থেকে মোগলহাটের দিকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছিল, পথে মুক্তিফৌজ আচমকা দলটির ওপর হানা দিয়ে কয়েকজন হানাদারকে খতম করে, বাকী হানাদাররা লালমনিরহাটের দিকে পালায়।

আত্মবলি দল গঠিতঃ আরও আশার কথা মুক্তিফৌজ এই অঞ্চলে ছোট ছোট আত্মবলি দল সংগঠন করেছে। এই দলগুলি ইতিমধ্যেই শত্রু-অধিকৃত এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই আত্মবলি দলগুলির নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতেও সক্ষম হয়েছে। মুক্তিফৌজ এসব এলাকা সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে কুড়িগ্রামের দিকে পথে পথে পরিখা খনন করেছে। মুক্তিফৌজের কাছে খবর এসেছে যে, রংপুরের দিকে আগুয়ান পাক হানাদার বাহিনী রংপুর ক্যান্টনমেন্টের ওপর মুক্তিবাহিনীর ত্রিমুখী আক্রমণ আটকে দিতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শেখ মুজিবের মুক্তিবাহিনী গত বৃহস্পতিবার রাতে ভারী মর্টার চালিয়ে হারাগাছ ও তিস্তা সেতু এলাকায় আক্রমণ শুরু করে, কিন্তু শত্রু বিমানাক্রমণের আশঙ্কায় শুক্রবার ভোরের দিকে জঙ্গলে আত্মগোপন করে।

হারাগাছ হচ্ছে তিস্তা নদীর একটি ফেরীঘাট, এটি সামরিক দিক থেকে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন আগে লালমনিরহাটের ক্যান্টনমেন্টের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এই ফেরীঘাট দিয়ে পাকসেনা রংপুর থেকে যায়।

রংপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মুক্তিবাহিনীর দলগুলির মধ্যে এখন যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। মুক্তিফৌজ এ অঞ্চলে প্রথম দিকে যে রকম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, এখন সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। মুক্তিবাহিনী সাধারণ যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধে সেনাদের সুশিক্ষিত করে তোলায় শেখ মুজিবর বাহিনীর সমরসাধ্য এখন পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাক বাহিনী পর্যুদস্তঃ দিনহাটা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, তিনি রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী সফর করেন। মুজাহিদ বাহিনীর ক্যাপ্টন আবুল হোসেন তাঁকে জানান, গতকাল তুগ্রাইহাটের মুক্তিফৌজের সঙ্গে এক সংঘর্ষ পাকহানাদার ফৌজের এগারজন সেনা নিহত হয়। এ জায়গাটি কুড়িগ্রাম শহর থেকে ৪ মাইল দূরে। একজন মুক্তিসেনা আহত হয়ে কুড়িগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি হন। পাক সেনা দলটি জীপে করে কুড়িগ্রাম যাওয়ার পথে তুগ্রাইহাটের কাছে মুক্তিফৌজ তাদের বাধা দেয়। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পাকদল চম্পট দেয়।

রংপুরের দিকে মুক্তিফৌজঃ ইপিআরের জনৈক নায়েক ভূরুঙ্গামারীতে বলেন, মুক্তিফৌজ সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট দখল করার পর রংপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে খবর পেয়ে লালমনিরহাট থেকে একদল পাকহানাদার সেনা রংপুর রওয়ানা হয়।

আওয়ামী লীগ নেতাদের সংবাদ অনুযায়ী, গতকাল তিস্তা সেতুর কাছে এক সংঘর্ষে ছ'জন পাকসেনা নিহত হয় এবং দুটি মর্টার ও চৌদ্দ বাত্র গোলাগুলি মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। অস্ত্রশস্ত্রগুলি কুড়িগ্রামে মুক্তিফৌজের কর্মকেন্দ্রে আনা হয়েছে। আওয়ামী নেতা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, দু'একদিনেই সমগ্র জেলা থেকে পাকসৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

রাজশাহী থেকে কুমারেশ চক্রবর্তী লিখছেনঃ সমগ্র রাজশাহী জেলা এখন প্রায় বিলুপ্ত মুক্তিফৌজের দখলে। এই জেলার প্রধান চারটি মহকুমার মধ্যে নবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ সম্পূর্ণরূপে মুক্তিবাহিনীর দখলে। আর সদর মহকুমার মধ্যে একমাত্র ক্যান্টনমেন্টের কিছু অংশ ছাড়া সম্পূর্ণ সদরে স্বাধীন বাংলার পতাকা শোভা পাচ্ছে। ক্যান্টনমেন্টেই রাজশাহীর একমাত্র মিলিটারী ঘাঁটি।

-যুগান্তর, ১১ এপ্রিল, ১৯৭১

HEAVY FIGHTING CONTINUES PAK FORCES CAPTURE PABNA TOWN

The recapture of the whole of Lalmonirhat-Mughalhat area including the cantonment and the airbase in the northern sector was the most significant score of the Bangladesh Liberation Army on Sunday, report PTI and UNI. Another victory, though small in dimension, was a crushing defeat on the pak troops near Tangail.

The West Pakistan Army had, however, recaptured Pabna town on the day. Massive air support was given to the troops in Dinajpur, Goalanda, Rajshahi, Kustia And Jessore Where the Pakistan Air Force planes bombed several times to shatter the resistance of the Mukti Fouz. Chittagong outskirts were also bombed.

Meanwhile, heavy fighting was reported to be going on in Dacca where the liberation forces embarked upon a big operation Dacca drive by opening a new front near Narsingdi. Repeated assaults were also made to occupy or immobilise the Dhulapara airfield in Comilla. Heavy fighting also flared up near the Hardinge (Sara) Bridge.

Engaged as they are in fighting. The Mukti Fouz have been consolidating their position in the already liberated zones such as Sylhet, Mymensingh and parts of Comilla.

In the Lalmonirhat Encounter two companies of Pakistan Army were exterminated and quite a few of them while running marked or in civil dress were butchered by the local people.

The Mukti Fouz also inflicted a crushing defeat on Pakistani Army column near Tangail, a sub-divisional town in Mymensingh district, close to Dacca. The defeated Pakistani troops fled in disarray. The Pakistani Army command had sent this column to dislodge the Mukti Fouz from Tangail and ultimately recapture Mymensingh, under the control of the freedom fighter.

In Dacca, the liberation army on Sunday launched a strong offensive, operation Dacca by opening a new front near Narsingdi, and engaged them on the Pakistani Army at Tarapur.

Pakistan Army columns, however, moved out of Dacca for capturing Narsingdi Crossing the Demra river. Pakistani troops took positions for the assault on the strong Liberation force units.

The Pakistani troops appeared to be making cautious moves for the assault, and have entrenched themselves at a distance of eight kms from the Liberation Army formations at Narsingdi. The Pakistani Army is meantime reported having occupied Munsiganj, 25 miles west of Dacca.

RAJSHAHI: The liberation forces also made a determined effort to eject Pakistani troops from the cantonment three km from Rajshahi. The offensive followed reports that about 1,000 troops had crossed the Jamuna and were near Pabna town in their march towards Rajshahi.

Bitter fighting between the West Pakistani marauders and the Liberation forces was going on near Hardinge (Sara) Bridge on Sunday, according to Dr. Ashabul Huque, Adviser, South-west command of the Liberation Army. He said to a army agency on trunk telephone from Kushtia that the West Pakistani Army and Air Force shelled and bombed the bridge. Fighting was also going on in Kumarkhali area. Eight miles east of Kushtia.

The West Pakistani Army were now entirely trapped in Rangpur town with the Lalmonirhat air field, Teesta Bridge and Haragachi ferry ghat under complete control of the Liberation forces. The major portion of the Mukti Fauj at Lalmonirhat have also started for Rangpur town.

The whole of Rangpur district, excepting the town and the cantonment and Saidpur was now under the control of the Mukti Fauj. Meanwhile, two companies of the Pakistani Army, which tried to proceed to Dinajpur, were ambushed and they had to fall back to the Rangpur base.

SYLHET : In Sylhet the Liberation Army has consolidated its hold on the town recapturing the radio and railway stations.

Sylhet town continued to be deserted on the third day with the civilians fleeing to villages. The town continued to be well-guarded by a Liberation Army unit who on Saturday ambushed and killed a reconnoitering party of 12 West Pakistanis.

Barring the northern parts of Comilla which are under the Mukti Fauj, the Pakistan Army hold the Comilla airfield and cantonment. But as the freedom fighters hold the supply routes to the garrison in Comilla and Sylhet supplies can be made only by air which is very difficult during the storm season of April-May. The situation will become more difficult during the coming month.

The control of the entire countryside comprising the districts of Comilla, Sylhet and Mymensingh by the Liberation Army means control of the food-producing regions. The area also produces Pakistan bulk tea.

PABNA CAPTURE : The jPabna town was captured by a detachment of about 100 troops sent from Dacca two days ago.

Pakistani troops went on the Teesta Bridge region. Hundreds of huts were set on fire and people killed indiscriminately.

Streams of evacuees from Pabna are crossing to this side through Karimpur border of Nadia district, Krishnanagar relief sources said.

Reports have come in frpm several parts of Bangladesh of heavy stafing and bombing by Pakistani planes. Ther was heavy bombing at Kushtia, Jessore, Rajshahi, Sylhet, Dinajpur and Feni.

Pakistani 52-53 bombers also ombed the outskirt of chittagong, and battery mortars and thanks were also used.The bombing in this area appears to be aimed at making way for army engineers to repair the vital Comilla-feni-Chittagong road link, cut off earlier by liberation force .

GOALANDA BOMBED: A report received at Chuadanga in kushti district said Pakistani planes bombed and starafed Goalanda about 2 p.m on Sunday. About 200 Pakistani paratroopers reportedly landed at Goalanda two days ago.

Bombing is said to have taken a coniderable toll of lives in Goalanda.A large number of houses were destroyed.

-Hindusthan Standard.12th April 1971

রাজশাহী শহরের প্রশাসনভার মুক্তিফৌজের হাতে

রাজশাহী, ১২ এপ্রিল-নাটোরের কাছে মুক্তিসেনার হাতে এক'শ পাকফৌজ আজ খতম হয়েছে। রাজশাহী শহরের ক্যান্টনমেন্ট এখন পরিত্যক্ত। মুক্তিসেনারা আজ সেখানে গিয়ে পরিখাগুলি তন্ন তন্ন করে খোঁজ ও তিনজন পাক সৈন্যকে খুঁজে বের করে খতম করে।

মুক্তিফৌজ রাজশাহী শহরের অসাময়িক প্রশাসনের ভার নিয়েছে। দোকানপাট খোলার জন্য তারা আবেদন জানিয়েছে। কিছু কিছু দোকানপাট ইতিমধ্যে খুলেছে। হানাদাররা যাতে রাতে হানা না দিতে পারে তার জন্য শহরে কারফুজারী করা হয়েছে।

রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট থেকে উৎখাত হয়ে পাকফৌজ এখন রাজশাহী শহরের এক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে আটক রয়েছে। মুক্তিফৌজ পাকসেনাদের পরিত্যক্ত ছাউনির বাংকারের ভিতর হোসপাইপ দিয়ে জল ঢেলে ঢেলে পরীক্ষা করে দেখছে শত্রু লুকিয়ে আছে কিনা। আজ সকালে রাজশাহী শহরের ওপর আবার পাকিস্তানী বিমান হানা দেয়। তারা বিমান থেকে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে নাগরিক ও মুক্তিফৌজের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করে।

ওদিকে নগরবাড়ী দিয়ে একদল পাকফৌজ নাটোরের দিকে এগুতে থাকে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে মুক্তিফৌজ তাদের বাধা দেয়। সেনাবাহিনী নৌকায় করে নদী পার হবার চেষ্টা করে। চারপাশ থেকে কয়েক হাজার মুক্তিফৌজ ওদের ওপর আক্রমণ হানে। প্রবল আঘাতে শত্রুরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অধিকাংশের কপালে জোটে

সলিল সমাধি। বাকি সেনারা গ্রামের পথ ধরে নাটোরের দিকে এগুতে থাকে। মুক্তিসেনারা পথে তাদের বাধা দেয়। এদিকে রাজশাহী জেলায় ঝড়-বৃষ্টি নেমে গিয়েছে। পাকফৌজ এর ফলে বিপন্ন।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭১

ঢাকার উপকণ্ঠে লড়াই, দিনাজপুর আবার মুক্ত- হানাদারদের হাওয়াই হামলা

বাংলাদেশের পূর্ব রণাঙ্গনে কুমিল্লার বেষ্টিতপ্রায় পাকফৌজকে মুক্ত করতে আর সরবরাহ সড়ক পুনরুদ্ধার করতে হানাদার বাহিনী বুধবার গোমতী নদী অতিক্রম করে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তাদের সহায়তা করে চারটি জঙ্গী বিমান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে কসবা শহর এবং তার আশেপাশে পাক বিমান বোমা-বৃষ্টি করে চলে যায়।

কসবা রেল স্টেশন আর বাজার ত্রিপুরা সীমান্তের খুব কাছে। পাকফৌজের লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ আখাউড়া-বাক্সানবাড়িয়া এলাকা পুনরুদ্ধার। আখাউড়া রেল জংশন এখনও মুক্তিসেনাদের হাতে। তাদের আর একটি লক্ষ্য, ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত সেনাদের সঙ্গে সংযোগ সাধন এবং শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ অঞ্চলের মুক্তিসেনাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

উত্তর খণ্ডে মুক্তিসেনাদের দিনাজপুর শহরসহ তাদের মুক্ত ঘাঁটিগুলি আগলে রাখে। আগের দিন রাতে তীব্র সংগ্রামে বহু পাকসৈন্য হতাহত হয়। এবং দিনাজপুর আবার বাংলা বাহিনীর অধিকারে আসে। রেডিও পাকিস্তান অবশ্য পাল্টা দাবী জানিয়ে বলছে যে, দিনাজপুর থেকে বিদ্রোহীদের তারা সরিয়ে দিয়েছে।

এদিন সকালে মুক্তিসেনাদের খাস ঢাকা থেকে মাত্র ১৮ মাইল দূরে সাভারে একটি পাক বাহিনীর উপর প্রবল আঘাত হানে তাহেরপুরের আওয়ামী লীগ সূত্রে এই খবর পাওয়া যায়। এই এলাকাকে ঢাকার উপকণ্ঠে বলা যায়। রাজশাহী, কুষ্টিয়া, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ তীব্র লড়াই চলেছে। মুজিব বাহিনী সারা ব্রিজ দখলে রেখেছে এবং ভেড়ামারা, কুমারখালী আর শিলাইদহ এলাকায় হানাদারদের হটিয়ে দিয়েছে। কুষ্টিয়া শহরে এদিনও বোমাবর্ষণ হয়। প্রবল ধারায় বর্ষণ চলেছে, তবু গোয়ালন্দ এখনও সংগ্রামী সেনাদেরই হাতে। নগরবাড়ী ১৫০ জন পাকসৈন্যকে তারা ঘিরে ফেলেছে। ওদিকে পাকফৌজ ঢাকা থেকে বেরিয়ে নরসিংদীর দিকে এগিয়ে যায় এবং তীব্র সংঘর্ষের পর এই বড় বানিজ্য বন্দরটি দখল করে। মুক্তিসেনাদের এখল গ্রামাঞ্চলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাড়াও এদিন ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, রাজশাহী, রংপুর, কুষ্টিয়া, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লায় বোমাবর্ষণ করা হয়। শ্রীহট্ট শহর পুনর্বাস মুক্ত কিন্তু আজ একটি প্রেতনগরী মাত্র। ঘরে ঘরে রাজপথে স্তূপীকৃত শব, কুড়িদিনের লড়াই-এ নিহতদের সংখ্যা অন্তত আট হাজার।

রংপুরের শহরগুলির হানাদার ফৌজের হামলায় অন্তত দু'শ সাঁওতাল অধিবাসী নিহত হন। ফৌজী দস্যুরা তাদের গ্রামগুলিতে লুটতরাজ চালায়। আমাদের বালুরঘাট সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, আজ এখানে ফুলবাড়িতে প্রচুর বিমান হামলা হয়।

শিকারপুর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, বাংলাদেশ থেকে নদীয়ার সীমান্ত দিয়ে এখানে পাঁচ হাজার উদ্ধাস্ত এসেছে। আগরতলা শ্রীহট্ট থেকে আজ কয়েকজন ব্রিটিশ চাকর এসে পৌঁছান। তাঁরা বলেন শ্রীহট্ট জেলা সম্পূর্ণ মুক্তিসেনাদের দখলে। তাঁরা আরও বলেন, শ্রীহট্টের, শ্রীহট্টের কোথাও সামরিক শাসনের অস্তিত্ব নেই।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১

Army keeps up pressure on Sylhet, Comilla Bid to capture Rajshahi foiled

Agartala, April 15 (UN1/PTI)- Consolidating their gains in the first three weeks of the war for the liberation of Bangladesh, the liberation forces today frustrated the Pakistan Army's continued bid to eject freedom fighters from important fowns in the western and eastern sectors.

In the eastern sector, the We3st Pakistanis kept up pressure on Sylhet, Chandpur and Comilla apparently aiming to kate communication links with Dacca and Chittagong.

The Mukti Fauj, which fought a grim battle to check the advance of the Pakistani troops towards Rajshahi throughout the day, were successful in holding the troops at bay on the outskirts of the town, according to reports from across the border.

The freedom fighter also silenced the Pakistani guns across the Ujaneshwar bridge over river Titas and sent the troops fleeing. The Pakistan army had made a determined bid to cross the river and capture Brahmanbaria which is under the control of the liberation forces.

With skies remaining cloudy over most parts of Bangladesh, the Pakistani air action was limited to Mymensingh town,

Contrary to their earlier claims, the Pakistani troops were holding only the northern portion of Sylhet town today while the liberation forces withdrew to the south bank of the Surma river.

The Mukti Fouj also destroyed the bridge over the Kattakhali river and at Kumardaha and retained their control over Bogra.

The border town of Kasba was heavily shelled by the Pakistani Army which was using inland waterways to fight the liberation forces.

While Kushtia remained under the control of the liberation forces, an armoured column sent from Rangpur to relieve the pressure on beleaguered Pakistani troops in Dinajpur reached the town today and engaged the freedom fighters who were resolutely holding out.

A report received tonight from Chaudanga in Bangladesh said heavy fighting was raging at Iswardy close to the Hardinge Bridge.

Fierce fighting was also going on in the Gangasagar area in the Comilla sector. The Pakistan Army used heavy artillery guns. booms of which could be heard in Agartala.

According to an Agartala report the Army was making a desperate bid to capture Akhaura, an important railway junction town in the Comilla sector.

-Hindusthan Standard, 16 April, 1971.

রণাঙ্গনের খবর

বাংলা বাহিনী দিনাজপুর রণাঙ্গনে বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছেন। তারা গতকাল দিনাজপুর শহর থেকে পাক সাঁজোয়া বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছেন। বাংলা বাহিনীর এই আক্রমণে পাক বাহিনীর বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়া রংপুর শহরের বীরগঞ্জে বাংলা বাহিনীর হাতে পাক-বাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ঢাকাতে পাক বিমান বাহিনী প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করেছে এবং মেশিনগান থেকে গুলি চালিয়েছে। রংপুরের উপকণ্ঠে পাকফৌজ দু'শ সাঁওতালকে হত্যা করেছে। তাদের ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দেয়া হয়।

সিলেট শহরটি মুক্তিবাহিনীর দখলে রয়েছে। খবরে প্রকাশ, শতাব্দীর পুরোনো হযরত শাহ জালালের (রঃ) মাজারের উপর পাক বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ করেছে। আকাশবাণীর খবর প্রকাশ, বিদেশী চা-বাগানের মালিকগণ জানিয়েছেন যে, সমগ্র সিলেট থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জায়গায় পাক সামরিক শাসনের কোন অস্তিত্ব নাই। তারা আশঙ্কা করেছেন যে শীঘ্রই হয়তো বড় রকমের লড়াই বাধতে পারে।

রণাঙ্গের দায়িত্বভারঃ গত ১৪ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ঐতিহাসিক বেতার ভাষণে পাঁচজন সেনাধ্যক্ষের নাম ঘোষণা করেন। এই পাঁচজন সেনাধ্যক্ষ স্বাধীন বাংলার বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। মেজর জলি কে বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালী; মেজর খালেদ মোশাররফকে সিলেট, কুমিল্লা; মেজর জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী; মেজর সফিউল্লাহকে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল এবং মেজর এম এ ওসমানকে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর রণাঙ্গন পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সারা ব্রীজের যুদ্ধঃ ১৫ই এপ্রিল। খবরে প্রকাশ, অদ্য রাজশাহীর ঐতিহাসিক সারা ব্রীজের দখল নিয়ে বিপ্লবী মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানী হানাদার জঙ্গী বাহিনীর মধ্যে সমস্ত দিন ধরে তুমুল লড়াই চলে। বিপ্লবী মুক্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে হানাদার বাহিনী নিদারুণ মার খেয়ে অবশেষে পালাতে বাধ্য হয়, কিন্তু পালাতে গিয়ে বর্বর বাহিনীর কয়েকশত বর্বর পদাগর্ভে পড়ে ডুবে মারা যায়। এবং মুক্তিবাহিনী সগৌরবে সারা ব্রীজের দখল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন।

তিনটি বিমান ধ্বংসঃ বরিশাল, ১৬ই এপ্রিল। স্বাধীন বাংলার বেতারে প্রকাশ, গত ১৬ই এপ্রিল বিপ্লবী মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাক হানাদার বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। এই সময় পাক বিমানবাহিনীর তিনখানা বিমান ছত্রভঙ্গ পর্যুদস্ত শত্রুবাহিনীকে সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর তীব্র পাল্টা আক্রমণের মুখে তিনখানা বিমান ধ্বংস হয়ে যায়। এই নিয়ে মোট ১৭ খানা বিমান ধ্বংস হয়।

মুক্তিবাহিনীর সাফল্যঃ বরিশাল, ১৬ই এপ্রিল। সংবাদে প্রকাশ, রংপুর-তিস্তা রেলসড়কের উপর বাংলা মুক্তিবাহিনী পশ্চিমা বাহিনীর একটি ট্রেনে আক্রমণ চালায়। বেশ কয়েক ঘন্টা তুমুল যুদ্ধের পর পাকবাহিনী পরাস্ত হয়। এ যুদ্ধে ২০ জন পাক সেনা নিহত হয়।

সর্বশেষ সংবাদঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিকটে “তিতাস সেতু” নিয়ে বাংলা বাহিনী ও পাকফৌজের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। বর্তমানে সেতুটি বাংলা বাহিনীর দখলে রয়েছে।

বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তুমুল সংঘর্ষ চলেছে। এছাড়া ঢাকার আশেপাশে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাক বাহিনীর সংঘর্ষ চলছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাক সৈন্যের আক্রমণ মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ করেছে। উজিরনগর এখন বাংলা বাহিনীর দখলে রয়েছে। পাক বিমান বাহিনী ময়মনসিংহ, ফেনী, আশুগঞ্জ, সীতাকুণ্ডে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, মুক্তিবাহিনী চুয়াডাঙ্গার পাক বাহিনীর হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছে। ময়মনসিংহ-কুমিল্লার ৯০০ কিলোমিটার পথে তুমুল যুদ্ধ চলেছে।

-বাংলাদেশ, ১মবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

আখাউড়া দখল নিয়ে জোর লড়াই

লামাকামুরা, ১৭ এপ্রিল-আখাউড়া রেল স্টেশন দখল নিয়ে পাকফৌজের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের জোর লড়াই চলেছে। প্রতিরোধের মুখে পাক-বাহিনী এখন মরিয়া। কুমিল্লা এবং ভৈরববাজার অঞ্চলে তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে বহু লোক মারা যায়। উজানীশাতে গত তিনদিন ধরে মুক্তিযোদ্ধারা যে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে তা ব্যর্থ করে দিতে না পেরে এখন তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তর-পশ্চিম দিকে হেলিকপ্টার ও স্টীমারে সৈন্য নিয়ে যাচ্ছে।

আজ বিকালে মগরাতেও তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। লড়াই চলছে গঙ্গা সাগরেও। পাকসেনারা সর্বত্রই পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছে। তারা ধানক্ষেতে একরকম রাসায়নিক বোমা ফেলছে, ফলে চাষ আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে বহু উদ্ধাস্ত চলে এসেছে। আজ পর্যন্ত এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার। এর মধ্যে আগরতলার শরণার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার।

পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ গেরিলা কায়দায় লড়ছে।

মেহেরপুর, ১৭ এপ্রিল-পাকফৌজের কামান ও বোমাবর্ষণের মোকাবিলার করার জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ সম্পূর্ণ গেরিলা কায়দা অবলম্বন করেছে। রণকৌশল হিসাব তারা শহরগুলি থেকে অসামরিক নাগরিকদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর থেকে সমস্ত অসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুক্তিফৌজ শহরের গোপন জায়গাগুলিতে লুকিয়ে থেকে শত্রুর উপর অতর্কিতে হানা নীতে অবলম্বন করেছে। ইতিমধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের সমরকৌশল ফলপ্রসূ হতে শুরু করেছে। আজ সন্ধ্যার কুষ্টিয়া শহরে পাকফৌজ ঢুকলে গড়াই নদীর পূর্ব দিক দিক থেকে মুক্তিফৌজ অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে হানাদাররা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাত্রিতে উভয়পক্ষের জোর লড়াই চলেছে।

মুক্তিফৌজের জনৈক মুখাপত্র বলেন, কটি বিমান বিধ্বংসী কামান এবং কয়েকটি ফাইটার ও বোমারু বিমান পেলে তাঁরা শত্রুকে সহজেই হটিয়ে দিতে পারেন। নচেৎ তাঁদের গেরিলা যুদ্ধ নীতি অব্যাহত রাখতে হবে।

পাকফৌজের কুড়িগ্রামের দখলের চেষ্টা প্রতিহত

কুড়িগ্রাম (বাংলাদেশ)- কুড়িগ্রাম থেকে ২৩ মাইল মত দূরে তোগরিহাটে গতকাল মুক্তিফৌজ ও পাকফৌজের মধ্যে জোর লড়াই হয়। পাঁচজন পাক সেনা নিহত ও আটজন আহত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধাও আহত হন। মুক্তিফৌজ কিছু অস্ত্রসম্পদ কেড়ে নিয়েছে। এই লড়াইয়ে উভয় পক্ষই মর্টার, মেশিনগান এবং রাইফেল ব্যবহার করে। পরে পাকবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। রেল লাইনের ধারে বেশ কয়েকটি বাড়িতে পাকসেনারা লুটপাট চালায় ও আগুন লাগিয়ে দেয়। মুক্তিফৌজের নেতৃত্ব দেন শ্রীবোরহানুদ্দিন ও শ্রীমেহের আলী মণ্ডল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুদ্ধবিরতি থাকার পর পাকসেনারা কুড়িগ্রাম দখলের যে দ্বিতীয় চেষ্টা চালায়, মুক্তিফৌজ তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

মুক্তিফৌজের চুয়াডাঙ্গা দখল, আখাউড়ায় পাল্টা আক্রমণ

আগরতলা, ৮ই এপ্রিল (ইউএনআই)-মুক্তিফৌজ আজ অপরাহ্নে পাকসৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত রেল জংশনের ওপর প্রচণ্ড রকমের পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে। মুজিবের সৈন্যরা জংশনের ওপর অবিশ্রান্ত মর্টারের গোলাবর্ষণ করেছে।

কৃষ্ণনগর থেকে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে চুয়াডাঙ্গা খণ্ডের ওপরও আজও প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে। গত রাতে পাকবাহিনী মুক্তিফৌজের আক্রমণের মুখে পিছু হটেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ইউএনআই-র খবর, বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ তীব্র সংগ্রামের পর কুষ্টিয়া জেলার সদর শহর চুয়াডাঙ্গা আবার দখল করে নিয়েছে। আজ রাতে সীমান্তের ওপর থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তাঁরা এটা জানিয়েছেন। মুক্তিফৌজ চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রান্তে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ মাথাভাঙ্গা সেতুটিও দখল করেছে।

কৃষ্ণনগর থেকে পিটিআই'র খবরে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা মেহেরপুর দখলের জন্য অভিযান শুরু করেছে এবং পরবর্তী সৈন্যরা মেহেরপুর থেকে চার মাইল দূরে আমজুফিতে পৌঁছেছে। আমজুফি থেকে ভারত সীমান্ত সাত মাইল দূরে। আমজুফি থেকে তারা মেহেরপুরের ওপর গোলাবর্ষণ করছে।

এর আগের এক খবরে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানীরা কাল আখাউড়া রেল জংশন দখল করার পর আজ সকাল দশটার সময় হাওরী নদী পার হয়ে শহরে পৌঁছায়। শহরে ঢুকেই তারা ঘরবাড়ী এবং বাজারে আগুন লাগাতে থাকে। ভারত সীমান্ত থেকে আগুনের শিখা দেখা যেতে থাকে। ভারতীয় সীমান্ত এখান থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে।

আগরতলা থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, পাকিস্তানীরা এখন আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে রেলপথ মেরামত করতে শুরু করেছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের বন্দুক দেখিয়ে কাজ করতে বাধ্য করছে। পাকিস্তানী আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত মুজিবের অনুবর্তীরা আখাউড়া পর্যন্ত ট্রেন চালু রেখেছিলেন। কাল রাতে পাকিস্তানীরা আখাউড়া স্টেশনে ঢোকার আগে স্টেশনের সমস্ত কর্মচারীরা আগরতলায় চলে গেছে।

বরকল জলাধার ধ্বংস করার চেষ্টাঃ শিলং থেকে নীলকমল দত্ত জানাচ্ছেন যে, মুক্তিফৌজের তৎপরতা রোধে পাকিস্তানীরা ক্রমাগত নোয়াখালী জেলার ফেনী ও চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর বরকল জলাধারের ওপর বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। চট্টগ্রামের পাবর্ত্য অঞ্চলের কাপতাইর ওপরও তারা বিমান থেকে রকেট ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে। এখানে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত। বিদ্যুৎ কেন্দ্র দখলের জন্য কাণ্ডাই ও কুমিরা অঞ্চলের ওপর তারা ছত্রীসৈন্যও নামিয়েছে।

লাকসাম অঞ্চলে মেজর জিয়ার অধীন মুক্তিফৌজের একদল পাক-সৈন্যের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়।

সারা সেতুর কাছে প্রচণ্ড লড়াইঃ ভেড়ামারা থেকে আগত পুনর্গঠিত মুক্তিফৌজের আরেকটি দল পাক-বাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থা বিকল করে দিয়েছে। এই পাকবাহিনী পাবনা থেকে পাকসি-কুষ্টিয়া সড়কের দু'ধারে আক্রমণ চালাতে চালাতে কুষ্টিয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল।

হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। মুক্তিফৌজ কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় অবস্থিত পাক-বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং গড়াই নদীর পূর্ব ধার থেকে ফরিদপুরের দিকে অগ্রসরমান শত্রুসৈন্যদের গতিও প্রতিহত করেছে। সংবাদে আরো জানা গেছে যে, হাজার হাজার যুবক বাংলাদেশ সরকারের পুনর্গঠিত সেনাবাহিনীতে যোগদান করছেন।

পাবনা-কুষ্টিয়া সংযোগ পথ বিচ্ছিন্নঃ গোহাটি থেকে পাওয়া পিটিআই'র খবরে প্রকাশ, আজ মুক্তিফৌজ এক ত্বরিত আক্রমণে পাবনা ও কুষ্টিয়ার মধ্যবর্তী পাকফৌজের সংযোগ রক্ষার ও সরবরাহের পথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সীমান্তের ওপার থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখানে এই সংবাদ পৌঁছে। মুক্তিফৌজের এই সাফল্যের বিস্তারিত সংবাদ এখনও পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যেই কুষ্টিয়া থেকে আগত শরণার্থীদের মুখে সেখানে পাকফৌজের নির্ধূর অত্যাচারের নানা কাহিনী শোনা যাচ্ছে। তারা কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী গ্রামগুলির তিন হাজারেরও বেশী ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। পাকফৌজ পৌঁছানোর আগেই গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ফরিদপুর অঞ্চলে মুক্তিফৌজের প্রচণ্ড বাধার ফলে পাকফৌজের অগ্রগতি সম্ভব হয়নি।

দিনাজপুর অঞ্চলে মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণাধীন হিলি থেকে পাঁচশ কিলোমিটার দূরে ফুলবাড়ীতে এক গ্যারিসন পাকফৌজ দেখা গেছে।

ভারত সীমান্ত থেকে সাত মাইল দূরে লড়াইঃ আজ রাত্রে ভারতের সীমান্তবর্তী শহর কৃষ্ণনগরে খবর পৌঁছায় যে, ষাটটি সামরিক গাড়ীতে চেপে পাকফৌজ মেহেরপুর প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে দু'দিকে বেপরোয়াভাবে অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করে ও গ্রামগুলিতে আগুন জ্বালায়।

এখন মুক্তিফৌজ ও পাকফৌজের মধ্যে লড়াই চলছে ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে এবং কৃষ্ণনগর-করিমপুর সড়ক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

-যুগান্তর, ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

মেহেরপুর আবার মুক্ত, শালুটিকরও বাংলাফৌজ নিয়ে নিল-

সোমবার সাফল্যের পর সাফল্য

মুক্তিফৌজের পক্ষে সোমবার সাফল্যের পর সাফল্য। আধুনিকতম মারণাস্ত্রে বলীয়ান পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংঘবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে মুক্তিফৌজ এদিন বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে নিয়েছে। রবিবার দিন যুদ্ধের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকায় আজ মুক্তিবাহিনী নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তীব্র আক্রমণে নাজেহাল করেছেন হানাদার সৈন্যদের। শ্রীহট্ট শহরের অদূরে শালুটিকর বিমানবন্দরে গত কয়েকদিন ধরে দুই পক্ষের মরীয়া আক্রমণ চলছিল। পাকফৌজ সেখান থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের সংবাদদাতা শ্রী ধ্রুব মজুমদার জানাচ্ছেন, প্রায় ১৫০ জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করেছে মুক্তিফৌজের কাছে, ওদিকে হতাহতের সংখ্যা অনেক। শালুটিকর থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার দূরে খাদিমনগরে উপস্থিত হয়ে তিনি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলাফল পেয়েছেন। পাকবাহিনী এখন বিমানবন্দর থেকে হটে গিয়ে শেষ লড়াই চালাচ্ছে। এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ব্টিশরাই একটি বিমানবন্দর বানিয়েছিল এবং পাকিস্তানী সরকার সেটিকে আধুনিক রূপ দিয়েছিল।

এদিন দুপুরের দিকে খবর আসে যে, ভারতের সীমান্তবর্তী মেহেরপুর পাকফৌজ দখল করে নিয়েছে। সন্ধ্যার পর আবার আনন্দ সংবাদ। মুক্তিবাহিনী এখান থেকে হটিয়ে দিয়েছে হানাদারদের। মেহেরপুর ট্রেজারির একজন কর্মী ভারত সীমান্তে আশ্রয় নেবার পর জানান যে, পাকফৌজ মুসলিম লীগের সহায়তায় শহরটি লুটপাট করে অনেক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। পরে তারা মুক্তিবাহিনীর তাড়া খেয়ে বাধ্য হয়। চুয়াডাঙ্গা শহরটি এখন মুক্তিসেনার দখলে। শহরের বাইরে যুদ্ধে চলছে।

আর একটি বড় জয় পূর্ব খণ্ডে কসবায়। আমাদের সাংবাদিক তুষার পণ্ডিত জানাচ্ছেন, আগরতলা থেকে ২০ মাইল দূরে ভারত সীমান্তের কমলাসাগরের ওপাশে কসবায় পাকবাহিনী ক'দিন ধরে ছাউনি গেড়েছিল। এই

সমৃদ্ধ গ্রামটিতে পাকফৌজ যথেষ্ট লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড চালিয়েছে। এদিন ভোর তিনটের ক্যাপ্টন গাফফারের নেতৃত্ব মুক্তিফৌজ অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে দেড়শ শত্রুসৈন্য নিহত করে অঞ্চলটি দখল করে নিয়েছেন। ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ মন্ত্রী তফাজ্জল আলীর বাড়িতে পাকফৌজ থানা গেড়েছিল। মুক্তিবাহিনী সেই বাড়িটিও উড়িয়ে দেন। এই শহরের বাড়িতে বাড়িতে যে পাকিস্তানী পতাকা ওড়ানো হয়েছিল স্বাধীন বাহিনীর সেনারা সেই সব পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন। সমস্ত গ্রামবাসীরাও আবার আস্তে আস্তে এখানে ফিরে আসছে।

আখাউড়া রেল স্টেশনের কাছেও প্রবল যুদ্ধ চলছে। এখানে দখলদার বাহিনীরাই ফাঁদে আটকা পড়ার অবস্থা। আগরতলা থেকে দশ মাইল দূরে সিঙ্গুর বিল সেতুটি মুক্তিফৌজ উড়িয়ে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও পাকফৌজ কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন।

হার্ভিঞ্জ বা সারা সেতু এলাকায় লড়াই এখন তুমুল। ফেনীর কাছে এক আকস্মিক সংঘর্ষ দেড়শত পাকফৌজ নিহত হয়েছে। এখানে পাক বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ করেছে বিস্তর। রংপুর-লালমনিরহাটের মধ্যে সড়ক ও রেলপথের যোগাযোগের ব্যবস্থাও আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মুক্তিফৌজের তৎপরতায়। ঢাকা শহরের আশেপাশে এবং টাঙ্গাইলেও অবিরাম লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে।

আজ পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলি বস্তুত জনশূন্য। সেনাবাহিনী অধিকৃত খুলনা বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে যে, এই শহরের প্রায় তিন হাজার অধিবাসী গ্রামে চলে গেছেন।

রংপুর অঞ্চলে ঠাকুগাঁও ও দিনাজপুর থেকে উত্তর অগ্রসরমান একটি পাক বাহিনীকে মুক্তিফৌজ প্রবলভাবে বাধা দেয়।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশে লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায় মুক্তিফৌজের সাঁড়াশী আক্রমণে পাকবাহিনী পর্যদস্ত

২১শে এপ্রিল-গতকাল বিকেলে বাংলাদেশে লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতদিন যা হচ্ছিল, তা হল মুক্তিফৌজ কর্তৃক পাকিস্তানী সৈন্যের প্রতিরোধ করা এবং তা ছিল একরকম বিচ্ছিন্নভাবেই। অর্থাৎ মুক্তিফৌজ তেমন সংগঠিত ছিল না। বিভিন্ন সেক্টরের সঙ্গে যুদ্ধনীতি অনুযায়ী সমঝোতাও ছিল না। কিন্তু গতকাল থেকে মুক্তিফৌজ পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত হয়ে যুদ্ধনীতি অনুযায়ী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে মুক্তিফৌজের সংগ্রামীরা অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তাদের প্রথম পাল্টা পশ্চিম সেক্টর থেকেই শুরু হল এবং ক্রমে অন্যান্য সেক্টরও এই পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হবে।

গতকাল বিকেলেই মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তবর্তী বুড়িপোতা, গবীপুর ও দৌলতপুর দিয়ে তিন পথে এক সঙ্গে সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়েছে। এই সাঁড়াশী আক্রমণের উদ্দেশ্য হল-মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল দখল করা এবং মেহেরপুর থেকে সাত মাইল দূরে আমঝুপিতে পাকসৈন্য যে ঘাঁটি স্থাপন করেছে তাকে দখল করা এবং যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করা। আজ সকাল পর্যন্ত খবর নিয়ে জানা গেছে যে, মুক্তিফৌজ ইতিমধ্যেই কোর্ট এলাকা দখল করে নিয়েছে এবং মুক্তিফৌজের তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করেছে এবং পাকবাহিনী পর্যদস্ত হয়ে পড়েছে। মুক্তিফৌজের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন।

মুজিবনগর আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থঃ এদিকে গতকাল মঙ্গলবার পাকিস্তানী সৈন্যরা মুজিবনগর আক্রমণের চেষ্টা ও পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু বিকেল থেকে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় এবং রাস্তাঘাট চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় পাকবাহিনীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

মুজিবনগরে মুক্তিফৌজ ট্রেনিং ক্যাম্পঃ গতকাল বাংলাদেশের মুজিবনগরে মুক্তিফৌজের ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং আজ সকাল থেকে তার কাজ শুরু হয়েছে। এই ক্যাম্পে ২০০ জন করে শিক্ষার্থীকে সমরশিক্ষা দেওয়া হবে এবং শিক্ষা শেষে তাদের লড়াইয়ে পাঠানো হবে।

আরও কয়েকটি অঞ্চলে মুক্তিফৌজের সাফল্য

কসবা স্টেশন ও পাকশি সেতু পাক হানাদার কবল মুক্ত

আগরতলা, ২২ শে এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী আজ ভোরের দিকে আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপখণ্ডে কসবা রেল স্টেশনটি পাকিস্তানী সৈন্যদের কবল থেকে মুক্ত করে নিয়েছেন। ময়মনসিংহ আর শ্রীহট্ট শহরটি অবশ্য গতকাল আবার পাকিস্তানী সৈন্যদের দখলে গেছে। সীমান্তের ওপার থেকে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে এই তথ্য জানা গেছে বলে ইউএনআই জানিয়েছেন। কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডের অধিনায়ক মেজর এম এ ওসমান চৌধুরীর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে যে, মুক্তিফৌজ প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পাকশী সেতু থেকে পাক সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছেন। উত্তর পাকশী সেতু থেকে শুরু করে দক্ষিণে শিবতলা, বড়বাজার ও বিকরগাছা লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছেন।

যশোরের পাকসৈন্যরা এখন কেবল ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতেই আবদ্ধ আছে। সীমান্তের ওপার থেকে জানা গেছে যে, বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা আজ বাংলাদেশের এক অজ্ঞাত স্থানে তাঁদের রাজধানীতে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ময়মনসিংহের পতন- ট্যাঙ্কযোগে পাকসৈন্যযোগেঃ ইউএনআই জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে মধুপুর ক্যান্টনমেন্টে সৈন্য আমদানীর পর ময়মনসিংহের পতন ঘটে। ময়মনসিংহের পতনের ফলে গত ২৭ দিনের যুদ্ধের অবশ্য কোন হেরফের হয়নি। খবরে প্রকাশ, কতকগুলি ট্যাংক ইউনিট ঐ সৈন্যদের নিয়ে আসে। ঢাকা থেকে রংপুর, পূর্ব দিনাজপুর ও কুড়িগ্রাম অঞ্চলে ও ট্যাংক ইউনিট পাঠান হয়েছে।

শ্রীহট্টের সড়ক পথ মুক্তিফৌজ বিনষ্ট করে দিয়েছেন বলে ঐ পরিত্যক্ত শহরটির উপর দখল নেবার জন্য বিমান থেকে বহু সংখ্যক পাকসৈন্য নামান হয়েছে।

কসবা, আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুক্তিফৌজ রাত দুটোর কিছু আগে তিন ইঞ্চি মর্টার দিয়ে পাক সৈন্যদের উপর আচমকা আক্রমণ চালান এবং তাদের সঙ্গে ছয় ঘণ্টা লড়াই করেন। কবসার যুদ্ধে মুক্তিফৌজ পাক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার সহ অন্তত ৫০ জনকে গ্রেফতার করেন। পাক সৈন্যরাও মর্টার আর হালকা ফিল্ড গান থেকে গুলি চালায়।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১

ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে পাক আক্রমণ প্রতিহত

কৃষ্ণনগর, ২৪শে এপ্রিল মুক্তিফৌজ আজ বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি যে জেলায় সেই ফরিদপুরে মুক্তিফৌজ একটি পাকিস্তানী সৈন্যদলের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াইয়ে নিযুক্ত আছেন। এই সৈন্যদলটি গতকাল গোয়ালন্দঘাটে এসে নামে। তারা রাজবাড়ির দিকে অগ্রসর হলে তাদের সেই অগ্রগতি প্রতিহত করা হয়।

পাকসৈন্যরা কামারখালীতে নদী পার হবার চেষ্টা করলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সেই চেষ্টাও ব্যর্থ করে দেন।

ময়মনসিংহ শহরে পাক সৈন্যদল ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে এখন প্রচণ্ড লড়াই চলছে। কুষ্টিয়ায় পাকসৈন্য ও মুক্তিফৌজের মধ্যে যুদ্ধ চলছে বলেও খবর পাওয়া গেছে।

ময়মনসিংহে প্রচণ্ড যুদ্ধঃ সীমান্তের ওপার থেকে খবর এসেছে যে, বাংলাদেশের উত্তর খণ্ডে ময়মনসিংহে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। পাকসৈন্যদের একটি অগ্রবর্তী দল গতকাল ময়মনসিংহ শহরে প্রবেশ করে এবং ডেপুটি কমিশনারের বাংলা ও বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে তুমুল লড়াই হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা ময়মনসিংহ থেকে ৬ মাইল দূরে মধুপুর থেকে আগত আর একটি পাকসৈন্যদলের সঙ্গে এখন ও লড়াই করেছেন।

-যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

বেনাপোলে মুক্তিফৌজের হাতে পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনী ঘায়েল

বেনাপোলে, ২৫ এপ্রিল আজ যশোর রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের মূল ঘাঁটি দখল করতে এসে হানাদার দলের গোলন্দাজ বাহিনী ঘায়েল হয়। মুক্তিসেনাদের প্রচণ্ড পাল্টা আঘাতে তারা আধুনিক সমর সরঞ্জাম ফেলে পালায়। কিছু চীনা অফিসার পাকবাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছিল, তারাও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বাংলা বাহিনী দখলদারদের ঘাঁটিতে গিয়ে চীনের প্রচুর উন্নত অস্ত্রশস্ত্র পায়।

বনগাঁ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বেনাপোলে মুক্তিফৌজ ও পাক সৈন্যের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুক্তিফৌজ পাকিস্তানী বাহিনীর অগ্রগতি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছে। ২৫ জনের বেশী মুক্তিসেনাকে বেনাপোল থেকে এনে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আরও আহত সৈনিককে নিয়ে আসা হচ্ছে।

ময়মনসিংহে বোমাবর্ষণঃ দলু (বারেঙ্গাপাড়া) ২৫এপ্রিল পাকিস্তান বিমান বহরের বিমানগুলি গতকাল সকালে ময়মনসিংহ শহরে বোমাবর্ষণ করে। এই নিয়ে পরপর তিনদিন ময়মনসিংহ শহরে হাওয়াই হামলা হল। গারুয়াপাড়া সীমান্ত থেকে বোমাবর্ষণের শব্দ পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ থেকে সদ্য আগত শরণার্থীরা জানান বৃহস্পতিবার থেকে পাক সৈন্যদল শহরটি প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। এইসব শরণার্থীরা শুক্রবার সন্ধ্যায় শহর থেকে পালিয়ে এসেছেন।

পাকসৈন্যদের একটি ময়মনসিংহ এর শহরতলিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১

IN SYLHET FRONT PAK ARMY FAILS TO BREAK RESISTANCE

AGARTALA, Aril 26: The Liberation Force of Bangladesh for the forth day today valiantly defended Sylhet's Sherpur Ferry Ghat despite Pakistan air fore strikes early in the day in support of a ground column .

Reports from across the border said the Pakistani army column which had moved from Sylhet earlier this week could not break the resistance of the Liberation Force despite persistent staffing and bombing of Ferry Ghat by PAF Planes.

Sherpur Ferry Ghat on the Khushiara river is the only connecting link between Sylhet and Akhaura in the Comilla sector .

Meanwhile four Mukti Foj men were injured when PAF shelled Golapganj, 13 km east of Sylhet town where the Mukti Foj guerillas had earlier liquidated a Pakistani detachment of 22 soldiers in an ambush within their firing range .

Pakistani troops, using gunboats were nearing Barisal town, shelling and burning villages on both sides of the madhumati. The gunboats entered through the Bay of Bengal into the Madhumati which has innumerable tributaries touching the entire district. This important district with population of 30 lakh had so far remained untouched by fighting between the Pakistan army and the Liberation Force.

Freedom fighters using guerilla tactics reportedly attacked the radio station in Khulna, which is held by the Pakistan army. In Chittagong sector, Pakistan army columns are trying hard to restore communications between Chittagong and Comilla and Chittagong and Sitakund . The road and rail links in this area have been disrupted by the Liberation Force.

Fifty Pakistani troops were killed today by a guerilla squad of the Liberation Army on the bank of Titas river near Sabaepur. Mukti Foj sources from across the border said .

The Pakistani troops were busy preparing themselves for the day's routine, when the guerillas stealthily entered the camp and killed them in a surprise attack .

In Dacca area the Pakistani troops were being harassed by guerillas of the Liberation force .

The Pakistani army was reported to be withdrawing from Panchagarh near the Indian border after leaving behind some armed irregulars. Pakistani troops were also withdrawing from Nilphamari.

Near Laksham railway station in Comilla sector, Liberation Force ambushed a Pakistani army column, which was moving towards Chittagong and killed a number of Pakistani in the encounter.

The Pakistan army after heavy bombing raids and artillery attack has succeeded in wresting control of Mymensingh and Bogra towns from the Liberation Force .

Reports from Bangladesh today said that Mymensingh fell to the Pakistanis yesterday after heavy fighting lasting over a week . Before the Pakistani columns entered this strategic town outlying areas were pounded by their air force and shelled by heavy artillery and mortars .

Armoured columns moving in from Santahar and Gorahghat took Bogra in an attack without much opposition as the freedom fighters withdrew in the face of superior fire power. The Pakistani columns from Bogra were on the move towards Jamalpur on the north- west, reports said.

The Mukti foud last night swooped on the Pakistan border outpost of Ichakhali on the western side of river Bhairab in Kushtia district and hoisted the Joy Bangla flag on it. They then dug trenches around the outpost and demolished bridge over the river Bhairab .

From early this morinig the Liberation Forces shelled the Pakistan army post at Meherpur town about two miles from Ichakhali compelling them to shift the post to a bamboo grove in village Mayamari, about five miles from Meherpur.

-Hindusthan Standard, 27 april, 1971

পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের ব্যাপক গেরিলা তৎপরতা

আগরতলা ২৭ শে (পি, টি. আ)- বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে ব্যাপকভাবে গুপ্ত ও গেরিলা আক্রমণ যেমন চালিয়ে যাচ্ছেন, ওদিক পাকিস্তান জঙ্গী বাহিনী আজ উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে আসামের কাছাড় জেলার সংলগ্ন শ্রীহট্ট সীমান্তের দিকে নতুন অভিযান শুরু করেছে।

বাংলাদেশ থেকে আজ রাতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাতে বলা হয় যে, মুক্তিফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ের পর পাকবাহিনী আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী কুশিয়ারা নদী সমক্ষে হাজির হয়েছে।

কিন্তু শ্রীহট্টের দিক থেকে পাকফৌজের যে দলটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া দিক থেকে অভিযান কারী অপর একটি ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের আশায় এক সপ্তাহ পূর্বে রওয়ানা হয়েছিল, তারা এখনও গুরুত্বপূর্ণ শেরপুর খেয়াঘাট দখলের জন্য মুক্তিফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ে আটকে আছে।

সংবাদ এ-ও জানা যায় যে, পাক বিমানবাহিনীর বারবার বোমাবর্ষণ ও ব্যাপক ধ্বংসসাধন এবং দুরপাল্লার কামান দাগানো সত্ত্বেও মুক্তিফৌজ শ্রীহট্টের মাইল পনের দূরে অবস্থিত শেরপুরে পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছেন এবং তাদের আক্রমণে পাক জঙ্গী ফৌজ বহু সংখ্যায় হতাহত হয়েছে।

উপকূলবর্তী শহরগুলি দখলের চেষ্টা : প্রকাশ, মধ্য রণাঙ্গনে পাকিস্তানী ফৌজ বগুড়া ও ময়মনসিংহ থেকে যমুনার উভয় তীর ধরে অভিযান চালিয়েছে। নদী তীরবর্তী শহরগুলির পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে পাওয়ার জন্যই তাদের এই উদ্যম। পাক বিমানবাহিনী আজকে বগুড়ার পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বোমাবর্ষণ করে ধ্বংস করেছে। বিশেষ করে যমুনার পশ্চিম উপকূলবর্তী সিরাজগঞ্জ, কাজীপুর ও হরিপুর শহর কয়টি বিধ্বস্ত হয়।

জামালপুরে তুমুল সংগ্রামঃ পূর্ব তীরে ময়মনসিংহের দিক থেকে অভিযানরত পাকিস্তানী ফৌজ জামালপুরে ঢুকছে। ওখানে মুক্তিফৌজের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছে এখন অবধি। সংবাদে বলা হয় যে, ঢাকা, মধুপুর ও কিশোরগঞ্জ থেকে পাকফৌজের যে দলটি ময়মনসিংহের ওপর জড়ো হয়েছিল, এক্ষণে তারা ঐ শহরে সদর কার্যালয় স্থাপন করেছে।

বরিশাল শহর এখনও মুক্তিফৌজের হাতে : দক্ষিন রণাঙ্গনে এখন পর্যন্ত বরিশাল শহরটি মুক্তিফৌজের করায়ত্ত। ফরিদপুর থেকে অভিযানরত পাকবাহিনীকে গেরিলারা বরিশালের পথে অনেক জায়গায় সংগ্রামের মুখে ফেলেন। নদী তীর বরাবর পাকিস্তানী গানবোট ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময়ের সংবাদও পাওয়া গেছে।

সৈন্যরা চট্টগ্রামে শ্রমিক পাচ্ছেনাঃ চট্টগ্রামে পাকবাহিনী নাকি ১৩০০০ বন্দর শ্রমিকের মধ্যে বন্দুক দেখিয়ে মাত্র ১৪০০ জনকে জরুরী মালপত্র উঠানো নামানোর কাজে সংগ্রহ করতে পেরেছে। অধিকাংশ বন্দর ও ডক শ্রমিক পাকিস্তানী সৈন্যদের গুলি এড়িয়ে শহর ছেড়ে চলে গেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

চৌকি দখলের চেষ্টা বানচালঃ শিলিগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের দিনাজপুরে কিশোরগঞ্জ এলাকা থেকে পাক হানাদার বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে। এই এলাকাটি পশ্চিম দিনাজপুরে রাধীকাপুর সীমান্ত শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। সীমান্তের ওপর থেকে এই খবর পওয়া গেছে।

মুক্তিফৌজের অতর্কিত আঘাতঃ শিলং থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, মুক্তিফৌজ বিরাট এক অঞ্চল জুড়ে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করে তুলেছে। কয়েকটি এলাকায় আজ পাকবাহিনীর উপর তারা অতর্কিত আঘাত হেনেছে। বগুড়া শহরের দক্ষিণ-পূর্বে শেরপুর এলাকায় মুক্তিফৌজে পাক বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য করতোয়া নদী পার হওয়ার সময় এই সংঘর্ষ শুরু হয়। নিকটবর্তী কাজিপুর এবং হরিপুর এলাকায় মুক্তিফৌজ ও পাকবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছে।

কুমিল্লা ফ্রন্টে গঙ্গাসাগর এবং ইমামবাড়ী স্টেশনের মধ্যবর্তী একটা এলাকায় মুক্তি সংগ্রামী ও পাকবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে বহু সংখ্যক পাক সৈন্য হতাহত হয়েছে। হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি।

কুচবিহার থেকে প্রাপ্ত একটি খবরে জানা গেছে, হানাদারের কুড়িগ্রাম দখলের চেষ্টা মুক্তিবাহিনী বানচাল করে দিয়েছেন। একটি পাক অগ্রবর্তী বাহিনীর পাঁচজন সৈন্যকে মুক্তি সংগ্রামীর গুলি করে মেরেছেন এবং ধরলা নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এই পাক সৈন্যেরা হাতে তৈরী নৌকাতে করে ধরলা নদী পার হচ্ছিল।

পাক বিমান ভূপাতিতঃ শিলং থেকে পিটিঅই জানাচ্ছে, খাসি পাহাড়ঞ্চল ও মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের শ্রীহট্ট ফ্রন্টে একদল মুক্তি সংগ্রামী আজ সকালে একটি পাক জঙ্গী বিমানকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে। বিমানটি হরিপুরে সার কারখানার দিকে যাচ্ছিল।

- যুগান্তর, ২৮ এপ্রিল. ১৯৭১

গোয়ালন্দে অনূন্য একশ পাকসৈন্য নিহত

মুজিবনগর, ৩০শে এপ্রিল (ইউএনআই)- গতকাল বুধবার ফরিদপুরের নিকট গোয়ালন্দে একটি যুদ্ধে অনূন্য ১শ' পাকিস্তানী সৈন্য নিহত ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই একটি স্টীমার নিমজ্জিত হয়েছে বলে আজ এখানে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এই যুদ্ধে প্রায় ৯ ঘন্টাকাল আক্রমণ করলে এই যুদ্ধ শুরু হয়।

সংবাদ জানা যায়, শেখ মুজিবুরের জন্মস্থানকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে- শুধু কুকুর ও সৈন্যেরা সেখানে অবস্থান করেছে।

শহরে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করা হয়েছে এবং পাইকারী বাজারটি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। ঐ দিনই ফরিদপুরের প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে গুরুত্বপূর্ণ পাট ব্যবসায় কেন্দ্র ভাঙ্গাতে ও যুদ্ধ হয়। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পাট বিনষ্ট করা হয়েছে।

ফেনী শহরের নিকট একশ' পাকসৈন্য নিহতঃ চট্টগ্রাম রণাঙ্গনের কোন এক স্থান থেকে মুক্তিফৌজের কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান জানিয়েছেন যে, গত মঙ্গল বার নোয়াখালী জেলার ফেনী শহরের শুভপুর সেতুর জন্য সংগ্রামে প্রায় একশ' পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে। মেজর রহমান সফররত জনৈক ইউএনআই'র প্রতিনিধিকে লিখিতভাবে জানান যে, ২৭শে এপ্রিল এক ব্যাটালিয়ান পাকিস্তানী সৈন্য শুভপুর সেতু আক্রমণ করলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রতিহত করে। শত্রুসৈন্যেরা ট্যাংক এনে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাগুলি চালায়। শুভপুর

সেতুর নিকট পাকিস্তানীরা ফেনী নদী অতিক্রমের চেষ্টা করলে মুক্তিফৌজের আব্দুল আজিজ নামে জনৈক সিপাই এক প্লাটুন পাকসৈন্যকে হত্যা করেন। মেজর রহমান আরও জানান যে, কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য কোনরূপে সেতু অতিক্রম করলে মুক্তিফৌজ শত্রুপক্ষের অক্রমণ প্রতিরোধ করে। সেতুটি এখনও মুক্তিফৌজেরই হাতে রয়েছে।

মুক্তিফৌজের পাল্টা আক্রমণে ছদ্মবেশী পাক-হানাদাররা পর্যুদস্ত

বয়ড়া সিমাস্তে, ৩০শে এপ্রিল- আজ বিকালে বেনাপোলের সাদিপুরে একদল পাকিস্তানী হানাদার মুক্তিফৌজের ছদ্মবেশে হাত উঁচু করে এগিয়ে এসে মুক্তিফৌজের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে মুক্তিযোদ্ধারা তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেয়। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পাল্টা আক্রমণে বাংলা বাহিনী পাঁচজন হানাদার কে খতম ও কয়েকজনকে জখম করেন। অন্যদিকে, মহেশপুরেও মুক্তিবাহিনী ঝাটিকা আক্রমণে দখলদারদের কাছ থেকে একটি ছোট ঘাটি ছিনিয়ে নেন।

এদিন বেলা তিনটা নাগাদ সাদিপুর মুক্তিফৌজ যখন টহল দিচ্ছিলেন, তখন তারা দেখতে পান সামনে দিয়ে একদল লোক মুক্তিফৌজের বেশে এগিয়ে আসছে। তাদের বুকে বড় ব্যাজ, বড়বড় হরফে লেখা ইপিআর। আর ঊর্ধ্ববাহু এই ছদ্মবেশীরা অনেকটা কাছে এগিয়ে এলে তাদের পিছন থেকে হানাদাররা হঠাৎ মুক্তিফৌজকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। মুক্তিফৌজ সঙ্গে সঙ্গে পজিশন নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাতে থাকেন। আধ ঘন্টা লড়াইয়ে হানাদারের কয়েকজন নিহত ও অহত হওয়ার পর তারা সরে পড়ে। সাদিপুরের ১৮ মাইল উত্তরে মহেশপুরে বেলা ১২ টা নাগাদ যখন মুক্তিফৌজ ঝাটিকা গতিতে দখলদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন দু'জন পাঠানের প্রাণ হারাবার পর তারা ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

নোয়াখালী ও কুমিল্লায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ককেন্দ্র মুক্তিফৌজের দখলে

বাংলাদেশে পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালী মুক্তিফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সব খবর মঙ্গলবার পওয়া গেছে, তাতে প্রকাশ, প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মুক্তিফৌজ নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগস্থল ছাগলনাইয়া অধিকার করেছেন, বাহাদুরাবাদ ঘাট ও চিলমারী ঘাটের (যথাক্রমে ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলা) কয়েকটি জলযান দখল করে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, পাকবাহিনীর বহু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে তাদের অনেককে হতাহত করেছেন। ছাগলনাইয়ার যুদ্ধে শ' তিনেক এবং কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের ওপর মীরবাজারের যুদ্ধে শ' দেড়েক পাকিস্তানী ফৌজ নিহত হয়েছে।

এদিকে যুগান্তরের জলপাইগুড়িস্থিত সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সীমান্ত পেরিয়ে সেখানে খবর পৌছেছে যে, লালমনিরহাটের কাছে পাকিস্তানী বাহিনীর মেজর এজাজ খানকে মুক্তিফৌজের গেরিলারা মেরে ফেলেছেন। মেজর এজাজ ছিলেন পাকবাহিনীর মেজর জেনারেল রিয়াজ খানের ছোট ভাই। তার স্মরণে পাক সামরিক কতৃপক্ষ লালমনিরহাট ও কাউনিয়ার মধ্যবর্তী তিস্তার রেল সেতুটির নামকরণ করেছেন এজাজ সেতু।

আগরতলা থেকে পিটিআই খবর দিয়েছেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগ কেন্দ্রে ছাগলনাইয়াতে তিন দিন ধরে পাকিস্তানী ফৌজের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মুক্তিফৌজ সোমবার ঐ যায়গাটি দখল করে নেন। নোয়াখালী আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল হক ছাগলনাইয়াতে

মুক্তিফৌজের এই সাফল্যের বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলেন, ঐ যুদ্ধে অন্ততঃ ২১জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে। মুক্তিফৌজ মেশিনগান, রাইফেল, রকেট নিক্ষেপক প্রভৃতি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি পলায়মান পাকিস্তানী বাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তাছাড়া গত ১লা মে নোয়াখালীর ফেনাঘাটা সেতুর কাছে মুক্তিফৌজের কমান্ডো বাহিনীর আক্রমণে আরও পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনেঃ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে লালমণিরহাটের কাছে দলহাটিতে (তালহাটি?) মুক্তিফৌজ ও পাকবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে।

-যুগান্তর, ৫ মে, ১৯৭১

মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি, আখাউড়ায় জোড় লড়াই

আগরতলা, ৬ মে- বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিফৌজের তৎপরতা দারুণ বেড়ে গিয়েছে। মুক্তিফৌজের অতর্কিত আক্রমণে পাক-বাহিনী নাজেহাল। বহু পাক-সেনা নিহত হয়েছে। বহু যায়গায় পাক-সেনা পিছু হটেছে। বৃহস্পতিবারও আখাউড়ায় দুই পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। মুক্তিফৌজ এখানে পাক-বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলতে পেরেছে। আখাউড়ার কাছেই গঙ্গাসাগর ও উজানিশর সম্পূর্ণভাবে মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে। মুক্তিফৌজের একজন কমান্ডার জানিয়েছেন, আখাউড়ার যুদ্ধে ১২০ জন পাকসেনা খতম হয়েছে। পাক-সেনাবাহিনী আখাউড়া ও কুমিল্লার মধ্যে সরাসরি সড়ক পথে সংযোগ স্থাপনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের হাতে প্রাণ হারিয়েছে ৩৩ জন পাক সেনা। মুক্তিফৌজ এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সড়ক সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। দিনাজপুর ও রংপুরেও পাক-বাহিনীর উপর মুক্তিফৌজ গেরিলাবাহিনী বার বার আক্রমণ চালায়।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে কুড়িগ্রাম ও লালমণিরহাটে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই হয়। গেরিলা আক্রমণে পাক-বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বেশী হয়। লালমণিরহাটে ২৯জন পাক-সেনা নিহত হয়। দিনাজপুর জেলায় ঘোড়াঘারি ও প্রেমতলাতে মুক্তিফৌজের হাতে চারজন পাক সেনা খতম হয়েছে।

বরিশালেও মুক্তিফৌজের সাফল্য অব্যাহত। এখানে দ্বারকাপুরে পাক-সেনা বোঝাই একটি নৌকা মুক্তিফৌজ ডুবিয়ে দিয়েছে। ফলে বহু পাক-সেনার সলিলসমাধি ঘটেছে। ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্বে আলমপুরে পাক-সেনা ও মুক্তিফৌজের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়েছে।

মুক্তিফৌজের আক্রমণে নাজেহাল পাক-সেনাদল শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের পশ্চিমে ২টি গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়।

গত দুদিন ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করার পর আজ পাক-বাহিনী চট্টগ্রামের দক্ষিণে কক্সবাজার দখল করে নেয়। কক্সবাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে।

গেরিলা তৎপরতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পাক-সেনা কতৃপক্ষ পশ্চিমাঞ্চলের চিলাতন শহরে কারফিউ জারি করেছে।

দেবগ্রামে মুক্তিফৌজ ও পাক-সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। এখানে প্রায় ১০০জন পাক সেনা নিহত হয়েছে। ধরমানি চা বাগান এলাকা থেকে প্রায় ৮০০জনের এক পাক-সেনাদলকে মুক্তিফৌজ তীব্র আক্রমণ চালিয়ে হটিয়ে দিয়েছে। এখানে প্রায় ২০০ জন পাক-সেনা মারা গিয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ মে, ১৯৭১

বিভিন্ন সেনাঙ্গনে মুক্তিসেনাদের আচমকা আক্রমণ

কলকাতা, ৭ মে (ইউএনআই)- সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের পক্ষ থেকে কমাণ্ড আক্রমণে প্রায় ১৫ জন পাক ফৌজ খতম হয়েছে। এরমধ্যে ময়মনসিংহে কালুমাখানায় পাকবাহিনীর আচমকা আক্রমণ করে কমাণ্ডেরা ৮ জনকে হত্যা করে এবং ৩০ টি রাইফেল ছিনিয়ে নেয়।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে রংপুরে। এখানে সরাই নামক স্থানে মুক্তিফৌজ পাকবাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে অন্ততঃ ৭ জন সৈন্যকে হত্যা করে।

শ্রীহট্ট অঞ্চলের বিবির বাজার ও কাজিপুর্বে জোড় সংঘর্ষ হয়। হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সেতু ধ্বংসঃ রংপুরের আমরখানা, মোগলাহাট, লাভলাহাট ও তুগরাইহাট অঞ্চলে মুক্তিফৌজ গেরিলা আক্রমণ চালিয়েছে। তারা ঐ জেলার বাজানপুর সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনের রাদমপুর ও বরিশালের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পটুয়াখালির অঞ্চলে ও এখানে সেখানে যুদ্ধ চলছে।

উত্তর রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের সাফল্যঃ জলপাইগুড়ি থেকে যুগান্তরের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেঃ মুক্তিফৌজ বিগত ৪৮ ঘন্টায় উত্তর রণাঙ্গনে নেকীপাড়া, ডানাকাটা এবং বড়শা সীমান্ত ফাঁড়িগুলি দখল করে নিয়েছেন। তারা ভালাগঞ্জ থেকে পচাঁগড় পর্যন্ত ২০ ব্যাসার্ধের মধ্যে পাক সৈন্যদের চলাচলও বন্ধ করে দিয়েছে। বহুসংখ্যক মুক্তিফৌজ এখন তেঁতুলিয়ায় গেরিলা যুদ্ধে ট্রেনিং নিচ্ছেন।

প্রখ্যাত খেলোয়াড়ের মুক্তিফৌজে যোগদান

নয়াদিল্লী, ৭ই মে (ইউএনআই) এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন আহমদ মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছেন। তিনি এখন বাংলাদেশের কোন এক স্থানে মুক্তিফৌজের সঙ্গে আছেন। ক্যাপ্টেন আহমদ মুক্তিফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তান বাহিনী ত্যাগ করেছেন।

আখাউড়ায় প্রচণ্ড লড়াইঃ ১৫০ পাক সেনা নিহত

আগরতলা, ৮ মে শনিবার সারাদিন ধরে বাংলাদেশের নানা স্থানে মুক্তিফৌজ ও পাক-হানাদারদের মধ্যে তুমুল লড়াই চলে। লড়াই সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করে আখাউড়ায়। এখানে মুক্তিফৌজের আক্রমণে ১৫০ পাক-সেনা নিহত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ বারবার অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাক-বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। মুক্তিফৌজের একজন কমাণ্ডার জানান, উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে তারা চীনা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাচ্ছে। চীনা পদ্ধতি হলঃ শত্রুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে সীমাবদ্ধ অঞ্চলে আবদ্ধ রাখা।

পশ্চিম রণাঙ্গনের রংপুর, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলার শনিবার উভয় পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই চলে। রাজশাহী জেলার মোহনপুরে চারজন পাক-সেনা নিহত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, নতুন কায়দায় যুদ্ধ শুরু করে মুক্তিফৌজ গেরিলা বাহিনী সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে পাক বাহিনীকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। গত দু'দিন নানা স্থানে রেল লাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

রংপুর জেলার মোগলাহাটে ৩০ জন ও কুড়িগ্রামে ৭ জন পাক-সেনা গতকাল মুক্তিফৌজের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। নিহতদের মধ্যে রিজভি নামে একজন পাক-ক্যাপ্টেনও আছে। কুড়িগ্রামে মুক্তিফৌজ পাক-বাহিনীর

একজন সেনা মানওয়ার আলিকে বন্দী করেছে। তার গায়ে গুরুতর আগাতের চিহ্ন ছিল। মোঘলহাটে মুক্তিফৌজ দুজন পাক-গুপ্তচরকে গুলি করে হত্যা করেছে। একজন গুপ্তচরকে বন্দী করা হয়েছে তার নাম মহম্মদ মণ্ডল। কুষ্টিয়া, যশোর ও রংপুর এলাকায় মুক্তিফৌজ পাক সেনাবাহিনীর গাড়ীগুলির উপর চোরাগুপ্তা আক্রমণ চালালে প্রচুর পাকসেনা নিহত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা চালুঃ ইউএনআই জানাচ্ছে, বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার মুক্ত এলাকায় অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। মুক্তিফৌজ ওই সমস্ত এলাকা থেকে উত্তরাঞ্চলে অভিযান চালাচ্ছেন।

-আন্দবাজার পত্রিকা ৯মে, ১৯৭১

কুমিল্লা ও আখাউড়ায় তিনদিন তুমুল লড়াইঃ

তিনশ'পাকসেনা খতম

আগরতলা, ৯ই মে (ইউএনআই)- আখাউড়ায় মুক্তিফৌজের সঙ্গে পাকহানাদার বাহিনীর আজ তিনদিন ধরে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। এই যুদ্ধেবাংলাদেশের সেনাবাহিনীর হাতে এ পর্যন্ত পাকবাহিনীর প্রায় দু'শ সেনা নিহত হয়েছে বলে মুক্তিফৌজের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে। কোহিমায় শ্রুত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে যে, আখাউড়া ও কুমিল্লা খণ্ডে বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের হাতে তিনশ পাক হানাদার নিহত, হয়েছে। বেতারে আরও বলা হয়, বিপুল সংখ্যায় সেনা খতমের ফলে পাকবাহিনীর বেলুচি সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। উক্ত সূত্রে প্রকাশ, মুক্তিফৌজের দু'জন সেনা নিহত, তিনজন আহত এবং দু'জন নিখোঁজ হয়েছেন।

পাক হানাদার বাহিনী আখাউড়া- আগরতলা চেক পোস্টের এক হাজার গজের মধ্যে এসেছে। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী চেকপোস্টের কাছেই ঘাঁটি আগলে রয়েছে, তাই এই জায়গাটিই পাক বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য। বাংলাদেশের সূত্রে প্রকাশ, পাক বাহিনী তিন কোম্পানী সেনার দ্বারা অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ব্যুহ রচনা করে মুক্তিফৌজের এক কোম্পানী সেনাকে চেকপোস্ট এলাকা থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে। আখাউড়া শহরে অতিরিক্ত এক কোম্পানী পাকসেনা মোতায়েন রাখা হয়েছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ত্রিপুরা- বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবার প্রয়াসে পাকবাহিনী বিপুলসংখ্যক সেনাদল নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেছে। এই উদ্দেশ্যেই তারা রামগড় দখলের পর আজ হঠাৎ আখাউড়া ও বিবিরবাজার এলাকায় আঘাত হেনেছে।

একটি বড়সড় পাকবাহিনী আখাউড়া শহর থেকে এগিয়ে আগরতলা চেকপোস্ট থেকে মাইল খানেক দূরে জাঘীশার সেতুর কাছে উপস্থিত হয়েছে। বিপরীত দিকে, আজ সকালে মুক্তিফৌজ আগরতলা চেকপোস্টের আড়াই মাইল দূরে ফকিরমুড়া সীমান্ত ফাড়িটি দখল করে নিয়েছে। সকাল থেকেই আখাউড়ার রাজাপুর অঞ্চলে দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র লড়াই চলতে থাকে।

কুমিল্লা খণ্ডে লড়াইঃ সীমানার এপারে দাঁড়িয়েও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কামানের গোলায় শব্দ চারদিকে কাঁপিয়ে তুলছে। ওদিকে আগরতলা থেকে ৬ মাইল দূরে আখাউড়া উপখণ্ডে এখনও যুদ্ধ চলছে। মুক্তিফৌজের গেরিলা কমাণ্ডেরা সাফল্যের সঙ্গে শত্রুসৈন্যদের প্রচুর সংখ্যায় হতাহত করেছেন। তবে পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রবল গোলাবর্ষণের মুখে তাঁরা ফকিরমুড়া থেকে প্রথম পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন। আগে ৭ই মে মুক্তিবাহিনী গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুসৈন্যদের কসবা ও আখাউড়ার মধ্যবর্তী রাজাপুর গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে দেন।

কৃষ্ণনগরের খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে কুষ্টিয়া খণ্ডে ৭ই মে মুক্তিফৌজ আর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে গুলি বিনিময়ে অন্তত ৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে ও বাংকার বিধ্বস্ত হয়েছে। রাত ১টা থেকে এক ঘন্টা ধরে এই গুলী বিনিময় চলে।

আজ সকালে সীমান্তের অপর পারের এক খবরে বলা হয়েছে যে, মুক্তিফৌজ গত শত্রুবার থেকে মেহেরপুর উপখণ্ডে ভৈরব নদীর পূর্বতীরে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাটির উপর শেল বর্ষণ করছে। মুক্তিফৌজের তরফের কেউ হতাহত হননি।

মুক্তিবাহিনীর চোরাগোষ্ঠা আক্রমণকারীরা গতকাল সন্ধ্যায় ভৈরব নদীর পশ্চিমতীরে মেহেরপুরের একটি গুপ্ত স্থান থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে একজন সুবেদারসহ বেশ কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করেন। মুক্তিফৌজের গেরিলারা গতকাল রাতে দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে চুয়াডাঙ্গা থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে জয়রামপুরের কাছে একটি রেলসেতু উড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে দর্শনার দিকে ট্রেনচলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এবং পাকিস্তানের রসদ সরবরাহের পথ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের কোনো এক স্থান থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, ২৫ শে মার্চ থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ১৫,০০০ পাকিস্তানী সৈন্য নিহত এবং ৩০,০০০ সৈন্য আহত হয়েছে বলে বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নেতা জানিয়েছেন।

-যুগান্তর, ১০ মে, ১৯৭১

বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের ব্যাপক গেরিলা আক্রমণ

কৃষ্ণনগর, ১১ মে- বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে আজ মুক্তিফৌজ ব্যাপক গেরিলা আক্রমণ চালায়। সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, মুক্তিফৌজ কমাঙেরা রংপুর জেলার কোলাঘাট, মোগলহাট ও অমরখানায় পাকিস্তানী সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালিয়ে যায়। মুক্তিফৌজের কমাঙে দলের আচমকা থানায় মোগলহাটে বহু পাকিস্তানী সেনা নিহত হয়।

দিনাজপুর জেলায় মুক্তিফৌজ পার্বতীপুর-সান্তাহার রেল রুটে পঞ্চবিবি ও জয়পুরহাট শহরে পাক সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালিয়ে সড়ক- যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে ফেলে। জয়পুরহাটের সংঘর্ষে সাতজন পাকসেনা নিহত হয়। সেখানে মুক্তিফৌজ রেলওয়ে সিগন্যাল ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র উড়িয়ে দেয়। নিকটবর্তী উরি রেলসেতুটিও বিধ্বস্ত। হিলির পাঁচ মাইল উত্তরে পাকিস্তানী সামরিক ঘাঁটির কাছে গেরিলারা একটি ডিজেল ইঞ্জিন ও কয়েকটি বগি উড়িয়ে দেয়।

পটুয়াখালী, ভোলা ও বরিশালে মুক্তিফৌজ সক্রিয়, তৎপর। দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ ফেনী এলাকায় শোভাপুরে পাকিস্তানীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে বহু পাকসৈন্য খতম হয়।

মুক্তিফৌজ কমাঙেরা কুড়িগ্রামে পাকিস্তানী ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজের ১২ জন বন্দী জওয়ানকে ছাড়িয়ে আনে। ধরলা ও কুড়িগ্রামের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু কমাঙেরা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর থানার কাছে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে কমাঙে দল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি তিনটি জীপ আটক করে।

আখাউড়া চেকপোস্ট থেকে মুক্তিফৌজ সরে গিয়েছেঃ আগরতলার খবর পাঁচদিন ধরে হানাদার বাহিনীকে বাধা দেওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা আখাউড়া চেকপোস্ট থেকে আজ বিকালে সরে গিয়েছে। মুক্তিফৌজ মহল থেকে

বলা হয়েছে, সরে আসার আগে মুক্তিযোদ্ধারা ডজনখানেক পাকসেনাকে খতম করে। মুক্তিফৌজের একজন কমান্ডার জানান, রণকৌশলের অঙ্গ হিসাবেই এই পশ্চাদপসারণ।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মে ১৯৭১

মুক্তিফৌজ এখনো প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন

মুর্জিবনগর, ১৩ই মে (নিজস্ব প্রতিনিধি)- দক্ষিণ-পূর্ব রনঙ্গনে কুষ্টিয়া জেলার দামুড়হুদা থানার অন্তর্গত কুতুবপুরে মুক্তিফৌজ ও পাক-সৈন্যের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। কুতুবপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় মুক্তিফৌজ লক্ষ্য করেন যে, পাক-সৈন্যের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। মুক্তিফৌজের আক্রমণে বহু পাকসৈন্য নিহত হয়। কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ও মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে। পাক-সৈন্যরা বহু গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ইউ-এন আই'র সংবাদে প্রকাশ, মেঘালয়ের মুক্তপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত জয়ন্তিপুর্বে পাকসৈন্য ও মুক্তিফৌজের মধ্যে আজ আবার প্রবল গোলাগুলি বিনিময় হয়েছে।

বালকের কৃতিত্বঃ রানাঘাট, ১৩ ই মে- গত রবিবার মুক্তিফৌজ ইছাখালীতে যে আটজন পাকসেনাকে মেশিনগানের গুলিতে খতম করতে সক্ষম হয় তার মূলে ছিল জনৈক গ্রামবাসী বালকের কৃতিত্ব। মেহেরপুর থেকে ওই গ্রামে এসে পাকসেনারা গ্রাম ঘুরে দেখে এক গাছতলায় ছ'জন অপেক্ষা করতে থাকে ও অপর দু'জন গাছে উঠে বাইনোকুলার দিয়ে গ্রামের চার ধার লক্ষ্য করছিল। সেই ঘটনা উক্ত বালকের নজরে পড়ে। সে তৎক্ষণাৎ মুক্তিফৌজের ট্রেঞ্চ গিয়ে সেই সংবাদ দিলে মুক্তিবাহিনী অতর্কিত তাদের আক্রমণ করে। এই সংবাদ জানা গেছে সদ্য আগত ই-পি-আর বাহিনীর জনৈক কর্মীর পিতার কাছ থেকে।

-যুগান্তর, ১৪ মে, ১৯৭১

গেরিলা আক্রমণে রেলপথ ও সেতু ধ্বংস, তামাবিল হাতছাড়া

রায়গঞ্জ, ১৪ মে-বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গত ৩ দিনে দিনাজপুর জেলায় রেলের ওপর কয়েক দফা গেরিলা আক্রমণ চালান বলে এখানে খবর পাওয়া গিয়াছে। গতকাল রাতে কমাণ্ডেরা হিলির কাছে চারখাই ও ডাঙ্গাপাড়া স্টেশনের মধ্যে রেলপথ উড়িয়ে দেন। বুধবার তাঁরা ধামাইরহাটের কাছে একদল পাকসেনার ওপর গুলি চালিয়ে ৪ জন সৈন্যকে খতম করেন। মুক্তিসংগ্রামীরা মঙ্গলবার জয়পুরহাটের কাছে ৪০ফুট দীর্ঘ একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেন এবং একটি পাওয়ার হাউস ধ্বংস করেন। তাছাড়া পাঁচবিবি স্টেশনের কাছে রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়।

দু'শরও বেশী খানসেনা খতমঃ আগরতলা, ১৪ মে আজ গভীর রাতে মুক্তিফৌজের সূত্রে পাওয়া খবর, চট্টগ্রাম ও ফেনীর মধ্যে শুভপুর এলাকায় মুক্তিফৌজের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে গতকাল ২০০ জনেরও বেশী খান-সেনা খতম হয়েছে।

কৃষ্ণনগরের খবরঃ স্বল্পবিরতির পর মুক্তিফৌজের গেরিলা ও কমাণ্ডেরা বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাঁটিগুলির ওপর আবার আক্রমণ করেছেন।

সীমান্তের ওপর থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, মুক্তিফৌজের গেরিলারা গতকাল রাতে উত্তর পশ্চিম খণ্ডে কড়িগ্রামে পাকবাহিনীর ওপর দুবার আক্রমণ চালান। ৪ জন পাকসৈন্য নিহত এবং ৬জন আহত হয়। কিছু অস্ত্রশস্ত্রও গেরিলারা দখল করেছেন।

মুক্তিফৌজের একদল কমাণ্ডো ১২ মে রাতে কুষ্টিয়া জেলায় মেহেরপুর থেকে ৩ মাইল দূরে কালাচাঁদপুরে রাস্তার ওপর একটি বড় কালভার্ট উড়িয়ে দেন।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ থেকে আধা-সামরিক বাহিনীর লোকদের এনে পাকবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর একটি ব্যাটালিয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছে। মেহেরপুর সীমান্তের পশ্চিম দিকে দৌলতদারের গ্রামে এবং চুয়াডাঙ্গা শহরে পাক-সৈন্যদের একটি বিরাট দল ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে ৬০ টি ট্রাক।

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুরে পাকসেনাদের নৃশংসতাঃ কৃষ্ণনগরে আগত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পাক টহলদার বাহিনী রোজ মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে ওঁৎ পেতে থাকে। তারা বেপরোয়াভাবে নিরস্ত্র লোকদের হত্যা করে মৃতদেহগুলি গর্তে ফেলে দেয়। পাকসেনারা চুয়াডাঙ্গা মহকুমার দুটি গ্রাম বাদে আর মব এলাকা তছনছ করে দিয়েছে। ব্যাপক লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং নারী নির্যাতন তাদের দৈনন্দিন কাজ। পাকিস্তানী বর্বররা বহু তরুণীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। মেহেরপুরে দুটি গ্রামে হানা দিয়া পাক সেনারা ১২ জনকে হত্যা করেছে। প্রকাশ, মুক্তিফৌজ বিভিন্ন অঞ্চলে এর আগে যেসব পরিখা খুঁড়েছিলেন, নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ ফেলে পাকসেনারা সেগুলি ভরে তুলছে।

তামাবিল হাতছাড়াঃ ডাওকি থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়- তিনদিন প্রবল প্রতিরোধের পর মুক্তিফৌজ আজ তামাবিল থেকে হটে গিয়েছে। তামাবিল এখন পাকবাহিনীর দখলে। তামাবিল শ্রীহট্ট খণ্ডে বাংলাদেশের শেষ চেকপোস্ট এবং ডাওবি থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে।

আজ বেলা দেড়টা নাগাদ মুক্তিফৌজ সুবিধাজনক স্থানে সরে যান। পাকসেনারা তামাবিল দখলের পর বাংলাদেশের পতাকা ফেলে দিয়ে পাকিস্তানী পতাকা তোলে।

-আন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মে ১৯৭১

শুভপুর সেতুর দখল নিয়ে প্রচণ্ড লড়াই, দুশো পাক সৈন্য নিহত

আগরতলা, ১৬ ই মে-দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলার সংযোগরক্ষাকারী ফেনীর গুরুত্বপূর্ণ শুভপুর সেতুটির দখল নিয়ে মুক্তিফৌজের সঙ্গে লড়াইতে পাকবাহিনীর এক ব্রিগেড সৈন্যের অন্তত: দুশোজন প্রাণ হারিয়েছে। গত দুদিন ধরে এখানে প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

বিলম্ব প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই মে মুক্তিফৌজের সঙ্গে ট্যাঙ্ক ও ভারী কামানের লড়াইয়ের পর পাকবাহিনী এখানকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি দখল করে। এই যুদ্ধে মুক্তিফৌজের ৩৮ জন মারা যান। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মুক্তিফৌজ পাকবাহিনীর সৈন্যদের বিপুল সংখ্যায় খতম করেছে।

রাজশাহী অঞ্চলে মুক্তিফৌজ তিনজন পাকিস্তানকে শেষ করেছে। বরিশালে মুক্তিফৌজ এক পাক শিবিরের উপর হঠাৎ ঝাপিয়ে পড়ে এবং একজন অফিসার ও পাঁচজন সৈন্যকে খতম করে।

১১টি রেলসেতু ধ্বংসঃ পাকবাহিনী যাতে এগুতে নাপারে সে জন্য মুক্তিফৌজ গত দু'দিনে রংপুরের কাকিনা অঞ্চলে ১১ টি রেলসেতু ধ্বংস করেছে।

-যুগান্তর, ১৭ মে ১৯৭১

কমাণ্ডোদের চোরাগোপ্তা আক্রমণে বহু পাকসৈন্য খতম

বহরমপুরে (পঃবঙ্গ), ১৭ মে (পি টি আই)- গতকাল মুক্তিফৌজের কমাণ্ডোরা রাজশাহীতে আকস্মিকভাবে হানা দিয়ে অন্তত ২৫ পাকিস্তানী সামরিক শিক্ষার্থীকে খতম করেছে। আহত করেছে ৭০ জনকে। ওপার

বাংলাদেশ থেকে পাওয়া এক খবরে আজ বলা হয়েছে যে, কমাণ্ডেরা মর্টার ও হালকা মেশিনগান নিয়ে আকস্মিকভাবে রাজশাহী পুলিশ লাইনে হানা দিলে উক্ত সামরিক শিক্ষার্থীদের মৃত্যু ঘটে। তাছাড়া একটি পাকিস্তানী ট্রাক ও প্রচুর পরিমাণ গোলা-বারুদ ও ধ্বংস হয়। পাকিস্তানী সেনারা পাল্টা মর্টার ও ভারী কামান দাগালে কমাণ্ডেরা পালিয়ে যায়। তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি।

আগরতলা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, মুক্তিফৌজের কমাণ্ডেরা গতকাল ও আজ বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব খণ্ডে বিভিন্ন সৈন্য ঘাঁটিতে হানা দিয়ে ৬টি জল ও স্থলচর ট্রাক দখল করেছেন। তাছাড়া, একটি ট্রাক ধ্বংস করে প্রায় ৮০ জন সেনাকে খতম করেছেন। মুক্তিফৌজের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠ মহলের সূত্র থেকে পাওয়া আরও সংবাদে জানা গিয়েছে যে, কুমিল্লা জেলার কসবায় মুক্তিফৌজের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠ মহলের সূত্র থেকে পাওয়া আরও সংবাদে জানা গিয়েছে যে, কুমিল্লা জেলার কসবায় মুক্তিফৌজ তিনটি পাকিস্তানী সামরিক ট্রাক দখল করে নিয়েছেন। হঠাৎ হানা দিয়ে কমাণ্ডেরা একজন ক্যাপ্টেন সমেত ২৮ জন সৈন্যকে খতম করেছেন।

শ্রীহট্ট সেক্টরে ৬০ জন সৈন্যসহ একটি ট্রাক ধ্বংস হয়েছে এবং ৩টি ট্রাক কমাণ্ডেরা দখলে এসেছে। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোনও সৈন্যহানি না হলেও পলায়নপর সৈন্যরা প্রচুরসংখ্যক মাঝারি মেশিনগানের বুলেট ও কয়েকটি বন্দক ফেলে রেখে যায়। ঐ একই সূত্রে জানা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধারা লাকসাম-নোয়াখালী রোডে রাখীর কাছে একটি সেতু উড়িয়ে দেন।

ইতিমধ্যে আগরতলা থেকে আর একটি খবরে প্রকাশ, পাকিস্তানী সেনারা সীমান্ত পেরিয়ে যাবার সময় দু'টি পরিবারের ১৩ ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করেছে।

পি-টি-আই'র এক খবরে জানা যায়, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে রংপুর খণ্ডে স্বাধীনতা যোদ্ধারা রামনগর এলাকায় একটি পাক টহলদার বাহিনীর উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে একজন পাকিস্তানী মেজরকে সাবাড় করেন। এই আক্রমণে কয়েকজন পাকসৈন্য আহত হয়। লালমনিরহাট এলাকায় মুক্তিফৌজ হাতবান্দা ও বাউরার মধ্যে একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়।

ফেনীর দক্ষিণে পাক-সেনাদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ পি-টি-আই'র খবরে আরও জানা যায়, যে কুমিল্লা খণ্ডে মুক্তিফৌজ ফেনির ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি স্থানে একটি পাকিস্তানী সেনাদলের উপর আক্রমণ চালালে সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। গঙ্গাসাগর এলাকাতেও পাক-সেনাদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের গুলি বিনিময় হয়।

আগরতলা থেকে ইউ-এন-আই জানাচ্ছে: সীমান্তের ওপর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে যে, মাধবপুর-শ্রীহট্ট সড়কে মুক্তিফৌজদের গেরিলা বাহিনী গত ক'দিনে পাকসেনাদের দুটি কনভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে ১২০ জন পাকসৈন্যকে খতম করেছেন। প্রথম কনভয়টি আক্রান্ত হয় শ্রীহট্টের নালুয়া গ্রামের নিকট। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। এই আক্রমণে প্রায় ৭০ জন পাকসৈন্য নিহত হয়।

-যুগান্তর, ১৮ মে ১৯৭১

এক সপ্তাহের লড়াইয়ে আরও সহস্রাধিক শত্রুসৈন্য নিহত

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সিলেট- কুমিল্লা, চট্টগ্রাম-নোয়াখালী, ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তরবঙ্গ সেক্টরের বিভিন্ন রণাঙ্গণে দিনের পর দিন পাক-ফৌজের উপর গেরিলা কৌশলে চোরাগোপ্তা কখনো ঝটিকা বা অতর্কিত হামলা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এতে গত এক সপ্তাহে অন্তত আরো এক সহস্র পাকসৈন্য নিহত হয়েছে।

গত ৯ই মে মুক্তিবাহিনী আখাউড়া সাব-সেক্টর এবং বিবিরবাজার এলাকায় পাকফৌজের উপর এক অতর্কিত হামলা চালায়। মুক্তিবাহিনী আক্রমণের ফলে পাকহানাদার বাহিনীর ৩ শত সৈন্যকে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

হানাদার বাহিনীর এক কোম্পানী সৈন্য বিবিরবাজার থেকে সোনামুড়া সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে মুক্তিবাহিনী সাফল্যের সাথে তাদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করে দেয়।

একই দিনে মুক্তিবাহিনী রংপুর জেলার দুর্গাপুর থানায় পাকফৌজের একটি ঘাঁটির উপর আকস্মিক হামলা চালায়। গেরিলা কৌশলের আক্রমণে পাক-ফৌজ দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং এলোপাতাড়ি গোলাগুলী ছুড়তে থাকে। কিন্তু তবুও মুক্তিবাহিনীর অবস্থান নির্ণয় করতে ব্যর্থ। মুক্তিবাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাক-ফৌজের ৬ জন সৈন্য প্রাণ হারায়।

মুক্তিফৌজ মেহেরপুরের উপকণ্ঠে ভৈরব নদীর পূর্ব তীরে পাক-হানাদার ঘাঁটির উপর শেষ বর্ষণ করে। অন্যদিকে ভৈরব নদীর পশ্চিম তীরে মেহেরপুরের একটি গুপ্তস্থান থেকে মুক্তিবাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে একজন সুবেদারসহ বেশ কয়েকজন জন্মদাহিনীর সৈন্যকে হত্যা করে।

মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে জয়রামপুরের কাছে একটি রেলসেতু উড়িয়ে দিয়েছে। ফলে দর্শনার দিকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এবং পাকবাহিনীর রসদ সরবরাহের পথ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

গত ১০ই মে মুক্তিবাহিনী আখাউড়া সেক্টরে পাক-ফৌজের উপর আকস্মিকভাবে এক বিরাট হামলা চালায়। এই সেক্টরের প্রচণ্ড লড়াইয়ে ৪ শত খান সেনা খতম হয়েছে। এ ছাড়া পাক-ফৌজের কাছ থেকে মুক্তিবাহিনী একটি শক্তিশালী ট্রান্সমিটার হস্তগত করেছে।

এদিকে সিলেট জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি তেলিপাড়া এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেই মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাক ফৌজের প্রচণ্ড লড়াই বাধে। তেলিপাড়া চা-বাগানটি পূর্ণদখল করার জন্য পাক ফৌজ প্রচুর গোলাবারুদ নিয়ে মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী এর সমুচিত জবাব দেয়। এই সংঘর্ষে ১২জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। তাদের মধ্যে দুজন অফিসারও আছে।

ইয়াহিয়া-টিকার জন্মদাহিনী কুমিল্লা জেলার তিতাস প্লান্টটি ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শিল্প-কারখানাগুলো অচল হয়ে পড়েছে।

মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের শুভপুর সেতুতে অবস্থিত হানাদার বাহিনীর উপর এক আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাদেরকে দিশেহারা করে তোলে। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড চাপের মুখে হানাদার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। উত্তর-পশ্চিম সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে আরও ৬০ জন পাকফৌজের ৭টি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ এবং তিনটি বাংকার ধ্বংস করে দেয়া হয়।

মুক্তিবাহিনী গত মঙ্গলবার রংপুর জেলার কোলাঘাট, মোগলাই ও ওমর থানায় পাকসৈন্য ঘাঁটিগুলোর ওপর আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণে মোগলহাট পাকফৌজ হতাহত হয়। দিনাজপুরে মুক্তিবাহিনী পার্বতীপুর-সান্তাহার রেল-রুটে এবং পাঁচবিবি ও জয়পুরহাট শহরে পাকফৌজের ঘাঁটিগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে সড়ক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। জয়পুরহাটের সংঘর্ষে ৭ জন পাক হানাদার খতম হয়েছে।

মুক্তিফৌজের কমাণ্ডেরা কুড়িগ্রামে পাকঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে পাকফৌজের হাতে বন্দী ১২ জন মুক্তিসেনাকে ছিনিয়ে আনে। এছাড়া ধারলা ও কুড়িগ্রামের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু কমাণ্ডেরা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

গত ১২ মে মুক্তিবাহিনী কসবা অঞ্চলে পাকফৌজের উপর হামলা চালান। মুক্তিবাহিনী এখনে দু'মুখী এমন আক্রমণ চালান যে পাকপৌজ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনী ও পাকফৌজের মধ্যে এই ভয়াবহ আক্রমণে একশত ২৭ জন পাকফৌজ নিহত হয়। এদের মধ্যে একজন মেজরও ছিলেন।

-জয়বাংলা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯ মে ১৯৭১

মুক্তিফৌজের অতর্কিত আক্রমণে পাকসেনারা নাজেহাল

আগরতলা, ১৮ই মে (পিটিআই)- গতকাল কুমিল্লা জেলায় মুক্তিফৌজের কমাণ্ডে আক্রমণে আড়াই শতাধিক পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে। মুক্তিফৌজের জনৈক কমাণ্ডার জানান, পাকসেনাদের কয়েকটি দল যখন লাকসাম থেকে ফেনী যাচ্ছিল, সেই সময় তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালানো হয়।

ইউ-এন-আই জানাচ্ছে: গত রবিবার সকালে মুক্তিফৌজের কমাণ্ডেরা রাজশাহীতে পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করলে প্রায় ৫০জন পাকসৈন্য নিহত হয় বলে সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে। প্রায় চারঘণ্টা স্থায়ী এই সংঘর্ষে মুক্তিফৌজের হতাহতের সংখ্যা খুবই নগণ্য। গত চারদিনে রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় গেরিলা বাহিনী হানা দেয়। শিবগঞ্জ থানা এলাকায় সোণামসজিদে পাক বাহিনীর ওপর গেরিলারা আক্রমণ করলে ৫ জন পাকসৈন্য নিহত হয় এবং ৫জন আহত হয়। পাক-বাহিনীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মুসলীম লীগ ও জামাতে ইসলামীর ১১ জন সদস্য মনাকশায় মুক্তিফৌজের হাতে প্রাণ হারায়।

-যুগান্তর, ১৯ মে, ১৯৭১

গেরিলা বাহিনীর হাতে ৬১ জন পাকসেনা খতম

কৃষ্ণনগর ২০ শে মে (পিটিআই)- বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাকসৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের গেরিলাবাহিনীর সংঘর্ষে অন্তত ৬১ পাকসৈন্য খতম হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া গিয়াছে। আজ সকলে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার দর্শনায় মুক্তিফৌজ কমাণ্ডারের আক্রমণে দু'জন পাকসৈন্য নিহত হয়েছে।

জলপাইগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, উত্তরবঙ্গে মুক্তিফৌজ আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে এবং পাঁচগড় ও অমরখানায় পাকবাহিনীর ওপর বেশ কয়েকবার অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছে। পাকসৈন্যরা আতঙ্কিত হয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পাকসেনারা দিনাজপুরের বিভিন্ন পুকুরে সাঁতার শিখছে। ঠাকুরগাঁয়ে অবস্থিত পাক সেনারা একটি গীর্জা বাড়ীকে রান্নঘরে রূপান্তরিত করেছে।

-যুগান্তর ২১, মে ১৯৭১

ঢাকায় গ্রেনেড আক্রমণের কথা পরোক্ষে স্বীকার

নয়াদিল্লী, ২১মে (পি টি আই)- বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক খোদ ঢাকা শহরের বুকে গেরিলা আক্রমণ চালাবার যে সংবাদ ইতিপূর্বে ভারতে এসে পৌছেছিল পাকিস্তান পরোক্ষে তা স্বীকার করেছে। আজ সকালে পাক বেতার থেকে বলা হয়, সামরিক আইন প্রশাসক এ বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নাশকতার কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। ওই ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, ঢাকা শহরে কাউকে হাত-গ্রেনেড ছোড়ার সময় ধরা হলে তাকে ওই শাস্তি দেওয়া হবে।

পাক কর্তৃপক্ষের ওই সতর্কীকরণে আরও বলা হয়েছে: শান্তিপ্রিয়, নাগরিকদের মনে অভাব ও ভীতির অবস্থা সৃষ্টির জন্যই ঢাকায় এই হাত-বোমা ছোড়ার ঘটনা ঘটছে। নাশকতার কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের ধরিয়ে দিলে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বেতার ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে যে ঢাকা শহরে গ্রেনেড ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সপ্তাহের গোড়াতে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, মুক্তিফৌজের কমান্ডো দল ঢাকায় গভর্নরের বাসভবন, সিভিল সেকরেটারিয়েট ও নিউ মার্কেটে মুসলিম কমান্ডারশিয়াল ব্যাংকের ওপর হানা দিয়েছে।

-আন্দবাজার পত্রিকা, ২২শে মে, ১৯৭১

স্ট্রিমার আটক করে ১৭ জন পাকিস্তানীর প্রাণদণ্ডদেশ

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৩ মে (এ,পি) বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ যাত্রীবাহী স্ট্রিমার রকেটটি আটক করেছে এবং গণআদালতে বিচার করে স্ট্রিমারের অবাস্তালী যাত্রীদের ১৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। গতকাল কূটনৈতিক মহলেই খবর দিয়েছে।

তাঁরা বলেছেন, সেনাবাহিনী যদিও বলছেন সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করা হয়েছে তবু ওখানে যে এখনও প্রতিআক্রমণ চলছে এটাই তার বড় প্রমাণ।

ওই মহলেরই খবরঃ এই ধরনের ঘটনাগুলি ওখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। কোন রাজনৈতিক সামরিক শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না এবং যেসব পশ্চিম পাকিস্তানী পূর্ববাংলায় অসামরিক কাজকর্মে লিপ্ত তাঁরা ও নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তিত।

ওয়াকিবহাল মহলের খবরঃ মুক্তিবাহিনী মে মাসের গোড়ার দিকে স্ট্রিমারটিকে আটক করে। স্ট্রিমারটি ঢাকা ও খুলনার মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, খুলনাই শেখের নিজস্ব অঞ্চল।

তাঁরা কালিয়া থানার জয়নগর হাইস্কুলে আয়োজিত গণআদালতে ১৭ জনকে বেছে নিয়ে বিচার করেন। একজন প্রতক্ষদর্শীর খবর, ১৭ জনের মধ্যে ১২ জনের প্রাণদণ্ডদেশ কার্যকর হয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪মে, ১৯৭১

নারায়ণগঞ্জ শহরে মুক্তিফৌজ গেরিলা 'সক্রিয়'

আগরতলা ২৩ মে (পি টি আই)- সীমান্তের ওপার থেকে এখানে বিলম্বে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ শহরে মুক্তিফৌজ গেরিলারা 'সক্রিয়' হয়ে উঠছে। জানা গেল, মুক্তিফৌজ গেরিলাদের হাতবোমায় সম্প্রতি ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি টারমিনাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঢাকায় শাহজাহানপুর কমান্ডোরা পাকসেন্য বোম্বাই ২টি জীপ উড়িয়ে দেয়।

আর এক মহল থেকে এই মর্মে খবর পাওয়া গিয়াছে সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অবাস্তালী তাঁবেদাররা সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে লক্ষীনারায়ণ কটন মিলের বহুসংখ্যক কর্মীকে খুন করেছে। মিলের ম্যানেজার ও মেডিক্যাল অপিসারও রেহাই পাননি।

-যুগান্তর, ২৪মে, ১৯৭১

জীবন দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ

মুজিবনগর, ২৪মে (পি টি আই)- ওরা পশ্চিম বাংলাদেশের রংপুর শহরের পাঁচজন ছাত্র। তাঁরা দেখেছেন, পাকসেন্যরা তাদের মা-বাবাকে হত্যা এবং নারীদের শ্রীলতাহানি করেছে। তাঁরা সংকল্প করলেন, যেভাবেই হোক এই নারকীয় হত্যার প্রতিশোধ তাঁরা নেবেন। তাঁরা মরণপণ করে একটি কমান্ডো দল গঠন করলেন। শত্রুখতম করাই হল তাঁদের লক্ষ্য।

মুক্তিফৌজ থেকে তাঁরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও হাতবোমা সংগ্রহ করলেন। অদিতমারি ও লালমনিরহাটের মধ্যবর্তী রেল লাইনের একাংশকে তারা উড়িয়ে দিলেন। ঠিক সে সময় পাকসৈন্যবাহী একটি ট্রেন পুরো বেগে ঐ লাইনে যাচ্ছিল।

ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় এবং বহু পাকিস্তানী সৈন্য নিহত কিংবা আহত হয়। কিন্তু দু'জন কমাণ্ডোকে গুলী করে হত্যা করে।

দু'জন সহকর্মীকে হারিয়ে বাকী তিনজন কমাণ্ডোর সংকল্প আরোও দৃঢ় হল। তাঁরা লালমনিরহাট বিমানঘাঁটির দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁরা দেখলেন একটি পাকিস্তানী জেট বিমান নামছে। একজন হাঙ্কা মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়লেন। বাকী দু'জন বিমানঘাটি লক্ষ করে বোমা নিক্ষেপ করলেন। বিমানঘাঁটির বেশ ক্ষতি হয়েছে।

এবারও তাঁরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলেন না। পাকসৈন্যরা দু'জনকে গুলি করে মারল। আহত অবস্থায় আর একজন কোনও প্রকারে পালিয়ে একটি গ্রামে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। গ্রামের এক বৃদ্ধ আহতকে সেবা ও করেছিলেন, কিন্তু পরে তার মৃত্যু ঘটে।

-যুগান্তর, ২৫ মে, ১৯৭১

খোদ ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর হামলাঃ এক সপ্তাহে

আরো ৬ শত শত্রুসৈন্য খতম

গত এক সপ্তাহের সংগ্রামে মুক্তিবাহিনীর হাতে আরও ৬ শতাধিক শত্রুসৈন্য প্রাণ হারায়। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ঢাকায় গভর্নর হাউস, দৈনিক পাকিস্তান, সেক্রেটারীয়েট ভবন ও নিউ মার্কেটের মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকে হাতবোমা দিয়ে আক্রমণ চালায়।

কুমিল্লা- চট্টগ্রামের সংযোগকারী শুভপুর সেতু দখলের জন্য মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে গত ১৪ ই ও ১৫ই মে-র লড়াইয়ে প্রায় দু'শ খানসেনা খতম হয়েছে। রাজশাহী শহরের কালীহাটায় পুলিশ লাইনে গেরিলারা দখলদার সৈন্যদের উপর হামলা চালায়। ১৬ই মে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডোরা বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বিভিন্ন সৈন্য ঘাঁটিতে হামলা চলিয়ে ৬টি স্থল ও জলযান দখল করে নিয়েছে। এছাড়া একটা ট্রাক ধ্বংস করে প্রায় ৮০ জন সৈন্যকে খতম করা হয়। কুমিল্লা জেলার কসবায় মুক্তিফৌজ ৩টি পাকিস্তানী সামরিক ট্রাক দখল করে নেয়। এই হামলায় একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৮ জন সৈন্য খতম করা হয়। উত্তর-পশ্চিমে রংপুর অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী রামনগর এলাকায় একটি পাক টহলদার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে একজন মেজরসহ কয়েকজন পাকফৌজ হতাহত করে।

মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম ও ঢাকার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাছাড়া সড়কের সেতুগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। গত ১৭ই মে দিনাজপুর জেলার হাতীডাঙ্গায় মুক্তিবাহিনীর চোরাগোষ্ঠী আক্রমণে ক্যাপ্টেন পদতুল্য একজন অফিসারসহ ৩৫জন পাকসৈন্য নিহত হয়েছে। মুক্তিবাহিনী পূর্বাঞ্চল সেস্টরের আখাউড়ায় এক আকস্মিক হামলা চালিয়ে গত ১৯শে মে ও ২০শে মে ৪০ জন শত্রুসৈন্যকে খতম করেছে। এছাড়া ঐদিন কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার ব্রাহ্মণপাড়া ও জীবনগরে মুক্তিবাহিনী পাকসেনার মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। মুক্তিবাহিনী দুটি সড়কের কালভার্ট উড়িয়ে দেয়। গত ১৯ শে মে কুষ্টিয়া জেলার কামদেবপুর গ্রামে ইছাখালী সীমান্ত ফাড়িটি দখল করে।

গত ১৮ই মে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডোরা দক্ষিণে রেলপথ উড়িয়ে দেয়। গেরিলারা যশোরের একটি রেলসেতু ধ্বংস এবং খুলনার একটি রেল স্টেশনের ক্ষতি সাধন করেছে। ময়মনসিংহ সেস্টরে মুক্তিবাহিনী তিলাকালীতে এক প্লাটুন পাক সৈন্যের ওপর হামলা চালায় এবং উত্তর এলকার একটি সেতু ধ্বংস করে। সিলেট

জেলার শমসেরনগরে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে পাকফৌজের কাছ থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়েছে। সাতক্ষীরা মহকুমার ভোমরায় মুক্তিবাহিনীর হামলায় পাকফৌজ দিশেহারা ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ঐখানে বেশকিছু সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়েছে। গত ১৯শে মে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাকসেনাদের গেরিলা আকস্মিক হামলা চালিয়ে রংপুর ও সৈয়দপুরের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কসেতু উড়িয়ে দেয়। বগুড়া জেলার জয়পুরহাটের কাছে মুক্তিবাহিনী ৩৪ জন পাকসেনাকে খতম করে। এছাড়া তারা অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ৩টি ট্রাক দখল করে।

-জয়বাংলা, ১মবর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৬ মে, ১৯৭১

তামাবিল ঘাঁটি আবার মুক্তিফৌজের দখলে

ডাউকি (মেঘালয়), ২৬মে (ইউএনআই ও পি টি আই)- আজ ৬ঘন্টা তুমুল লড়াই-এর পর মুক্তিফৌজ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন তামাবিল ঘাটি থেকে হটিয়ে দেয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা হটে যাবার পর মুক্তিফৌজের সেনানীরা তামাবিল ঘাঁটির উপর বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেন। এখান থেকে ঐ পতাকা দেখা যায়। প্রকাশ ঐ ঘাটি থেকে মুক্তিফৌজের সেনারা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছেন। মুক্তিফৌজ মহলের খবরে জানা যায় তামাবিলের লড়াইয়ে পাকিস্তানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল মাঝরাাত্রি থেকে লড়াই শুরু করে এবং আজ সকাল ৬টায় লড়াই শেষ হয়। গত ১৪মে পাকিস্তানী সেনার ঐ ঘাঁটিটি দখল করে নিয়েছিল। তামাবিল ঘাঁটি ছেড়ে পালাবার আগে পাকিস্তানী সেনারা তাদের পক্ষের নিহতদের মৃতদেহগুলি নিয় চলে যায়। প্রকাশ, পাকিস্তানী সেনারা পিছু হটে শ্রীপুর চা বাগানের দিকে চলে গেছে।

গত রাতে দিনাজপুরে মুক্তিফৌজের আক্রমণে ৩০ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকিস্তানী সেনারা যখন দুটি মিলিটারী ট্রাকে করে ফুলবাড়ি এলাকা যাচ্ছিল তখন মুক্তিফৌজ অতর্কিত তাদের ওপর আক্রমণ চালায়।

মুক্তিফৌজের সেনানীরা দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও এলাকায় সেতাবগঞ্জ ও পীরগঞ্জের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে অন্যান্য এলাকায় মুক্তিফৌজ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কুড়িগ্রাম এলাকার কুলাঘাটের কাছে গত রাত্রি থেকে মুক্তিফৌজ ও পাকিস্তানী বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে মে, ১৯৭১

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের সফল সংঘর্ষ

কলকাতা, ২৭শে মে (ইউ, এন, আই)- বাংলাদেশের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মুক্তিফৌজ তিনদিন ধরে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সফল সংঘর্ষ চালাচ্ছে। সীমান্তের ওপর থেকে জানা গেছে, রাজশাহী খণ্ডে আহত পাকসেনা বোঝাই দুটি নৌকা আক্রমণ করে চারজন শত্রুসেনাকে খতম করেছে। মহেরপুর, বগুড়া, মোগলহাট এবং বরিশালেও সংঘর্ষ বাধে। পাকসেনা খতমের হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। খুলনা জেলায় পাকবাহিনীর তাঁবেদার লাগিয়ে ফসল কাটাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে পাকসেনাদের অত্যাচার ও হত্যালাীলা বৃদ্ধির পথে। সম্প্রতি ত্রিশ হাজার সাঁওতাল বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ আজ বিকালে শ্রীহট্টের শ্রীপুর চা-বাগান থেকে পশ্চিমা পাক হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করছে। এই সংঘর্ষে বেশকিছু সংখ্যক পাক সেনা নিহত হয়। মুক্তিবাহিনী দুই ট্রাক ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র দখল করেছে বলে বাংলাদেশের সূত্র জানা গেছে। শ্রীপুর চা বাগান বাংলাদেশের তামাবিলের চার কিলোমিটার দক্ষিণে। গতকাল মুক্তিফৌজ তামাবিল সীমান্ত ফাঁড়িটি দখল করার সময় বিপুল সংখ্যক পাক ফৌজ নিহত হয়।

শিলিগুড়ি নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, গতকাল দিনাজপুর জেলার পাঁচাগড় থানা এলাকার অমরখানা সীমান্ত চৌকির দিকে আগুয়ান একদল পাকসেনার ওপর মুক্তিফৌজের কমাণ্ডেরা পচণ্ড আক্রমণ চালায়।

ভরতীয় সীমান্তের গ্রাম চাউলহাটির বিপরীত দিকে এখান থেকে প্রায় পনের মাইল দূরে এই অমরখানা অবস্থিত। মুক্তিফৌজের আঘাতে চারজন পাকসেনা মারা পড়ে।

-যুগান্তর, ২৮ মে, ১৯৭১

GUERRILLA ACTIONS INTENDIFIED 150 PAK TROOPSKILLED

MUJIBNAGAR (Bangladesh), May 28 – About 150 West Pakistani armymen were killed in a bitter fight with the Mukti Font on the Dharla river in th Rangpur sector early this week, reports PTI. reports available here said that tje Pakistani Army shelled Mukti Fouj position on the north bank of the Dharla river and tried to cross over to the other said. The Mukti Font offered stiff redidtance abd foiled the attempts of Pakistan Army to cross river, inflictibng heavy csualt on the enemy.

In another incident in the sylhet sector in May 26, the Mukti font ambushed a convoy killing 25 Pakistani troops and injuring 14 others. One truck and one jeep were damaged,.The Mukti Fouj also raided Rema tea estate in the same sector. Pakistani troops took their heels leaving two vehicles which were captured by the liberation forcer.

Two Pakistni solders were killed when the student – fighter of the mukti Fouj lobbed a grenad on them in sumbrum area of chittgong on the night of May 23. on the same night the Mukti Fouj destroyed a bridge on the Muhuri river near Chhagalnaiya.

In Mymensing, the Mukti Fouj attacked Pakistani army poisitionat at Bhotikhli and belew up a bridge at Joynaiapur in Sylhet sector.

In Comilla sector, the freedom fighters raided Bajitpur police station and took away all armd from the armony there.

There was heavy fighting between the Pakistani toorps and the Mukti Fouj in Pateswari Ghat in Rangpur. Casualty, if any, was not know.

Our shillong office adds ; the biggest bridge on the Dawk-Sylhet road, sari bridge, has been blown off yesterday by valian Mukti Fouj Commandos after a free fight with the pakistani troops.

Pak troops are now completely out off from the mainland of Sylhet, Official source said here that concentration of Pakistani troops were seen in Goalpara- an East Pakistan border.

Dhruba Majumdar at Dawki writes, Tamabil and Sripur, two strongholds of the Pakistani army were captured by the Multi Fouj after a heavy battle. Jayantapur about 18 miles from the international border also fell in the hands of the Mukti Fouj after a grim

fight today. the Mukti Fouj has began their attack on the Pakitani Army at Hairpur about 10 miles from the border.

The situation of the Libaration war in the Sylhet sector of Bangladwesh remaind very fluid on Friday. The Pak army were in the Sylhet sector of Bangladesh remained very fluid on Friday. The Pak army were losing grounds and the Mukti Fouj went on winning, but none of them could be sure about how of thge acquired territory they will be able to retain.

-Hindusthan standard, 29 May, 1971

মুক্তিফৌজের অতর্কিত আক্রমণে শত্রুসৈন্য অতিষ্ঠ

আগরতলা, ২৯ শে মে (পিটিআই)- মুক্তিফৌজের গেরিলা ও কমাণ্ডেরা ও শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ও নোয়াখালী সেক্টরে পাকসেনাদের ঘাটিগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। আজ এখানে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, শ্রীহট্টে মুক্তিফৌজের আচমকা আক্রমণে ৪০ জন পাকসেনা খতম হয়, তিনটি মোটরযান বিধ্বস্ত হয় এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ মুক্তিফৌজের হস্তগত হয়। প্রকাশ, দু'জন পাক অফিসার ও ৭০ জন পাকসৈন্য মারা গেছে।

মুক্তিফৌজের গেরিলারা গত ২৫ শে মে রাত্রিতে কুমিল্লা সেক্টরে সৈদামানিতে পাকসৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালান এবং ২৫ জন পাকিস্তানীকে খতম করেন। এই আক্রমণে ১৪ জন পাকিস্তানী আহত হয় ও একটি পাকিস্তানী জীপ ও একটি ট্রাকবিধ্বস্ত হয় এবং ধর্মনগরে দুটি বিনষ্ট হয়।

নোয়াখালী জেলার ফেনী এলাকায় মুক্তিসেনারা পাকসৈন্যদের তিনটি ঘাটির উপরও আক্রমণ চালায়। বহু পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়।

মুক্তিফৌজের কমাণ্ডেরা যশোর এলাকার উথালিতে দুটি রেলসেতু এবং রংপুর সেক্টরে হিলি ও সান্তাহারের মধ্যে ১ টি রেলসেতু উড়িয়ে দেন। রংপুর জেলার তাজপুরে পাকিস্তানীদের সঙ্গে মুক্তিসেনাদের সংঘর্ষ হয়।

মুজিবনগর থেকে ইউ-এন-আই জানাচ্ছেঃ মুক্তিফৌজের গেরিলা সৈন্যরা উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে বিগত ৪ দিনে কয়েকটি সড়কপথ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় কয়েকটি স্থানে পাকসৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

কয়েকবার আচমকা আক্রমণে তাঁর অন্ততপক্ষে ৮১ জন পাকসৈন্যকে খতম করেন।

মুক্তিসেনারা বিরল ও কাঞ্চনপাড়া স্টেশনের মধ্যে রেল-লাইন বিধ্বস্ত করে দেন। পশ্চিম রণাঙ্গনের তুলাই ও কিশোরীপুরের মধ্যেও তাঁরা রেলপথ অকেজো করে ফেলেন। রংপুর সেক্টরে পাকসৈন্যবাহিনীর একখানি ট্রেন আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ট্রেনখানি স্বর্ণমতির দিক যাচ্ছিল। এই ঘটনায় অন্তত ১০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

-যুগান্তর, ৩০ মে, ১৯৭১

‘আমরা ক্ষান্ত হব নাঃ গৌরকিশোর ঘোষ

বুধবার হঠাৎ যখন তাদের সঙ্গে দেখা হল, তখন বেলা সাড়ে চারটা; গরমে গলগল করে ঘামছি; ওরা, মুক্তিফৌজের শান্ত সৈনিকেরা খোলা জীপ নিজেদের ঘাটিতে ফিরে আসছেন, সারারাত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে নাজেহাল করে। আগের রাতে আমার পৌছতে দেরি হয়েছিল, তাই ওদের সঙ্গে নিতে পারিনি।

দেখে আশ্চর্য লাগে, পাকিস্তান সরকারের এত সোচ্চার প্রচারের পরও বেনাপোলে পাকিস্তানের ঘাঁটির শীর্ষে এখনও বাংলাদেশের জয়বাংলা পতাকা পতপত করে উড়ছে।

-দিনের বেলা এলে ছবি নিতে পারতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিতে একজন বললেন। বললেন, তাঁদের যারা মনে করছেন আমরা শেষ হয়ে গেছি, আমরা এখনও শেষ হইনি। মাতৃভূমির দখল নেবার আগে আমরা ক্ষান্ত হব না।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ মে, ১৯৭১

MUKTI FOUJ KILLS 100 PAKISTANI SOLDIERS

MAY 30- With its intrnsified cimmando activity, the Mukti Fouj continued to harass the Pakistani Army during the past 48 hours, At several places from feni in the south to Ashuganj in the north, the Mukti Fouj inflincted heavy casulties on Pakistani troops, according to the reports available acroos the border, Besides, 100 Pakistani soldders, including 40 officers, were ambushed and killed by Mukti Fouje.

The freedom fighters also blew up three rail and one road bridges, damaged railway engine, and destroyed two moptors and several vehicles.

Rail communication from Comilla to Ashuganj is still disrupted after the successful demolition of the rail bridge at several places.

-Hindusthan Standard, 31 May, 1971

ভারতীয় এলাকায় পাকসেনাদের গোলাবর্ষণ অব্যাহত

কলকাতা, ৩ জুন- পাকিস্তানী সেনারা ভারতীয় এলাকার মধ্যে অসামরিক অঞ্চলসমূহ যথারীতি গোলাগুলি বর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। ইউএনআই জানাচ্ছে গতকাল কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী চারটি গ্রামে পাকসেনাদের গোলাবর্ষণে একজন গ্রামবাসী আহত হয়। গত চারদিন ধরেই পাকসেনারা এই গ্রামগুলিতে প্রচুর গোলাগুলি চালাচ্ছে। ফলে এক বিরাটসংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।

আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সোনাহাট ও তৎসন্নিহিত গ্রামগুলিতে গত রাতে পাকসেনারা কামান থেকে গোলা চালায়। সরকারী সূত্রের রিপোর্টে জানা যায় যে গতকাল সকাল সকাল ১১টা থেকেই পাকসেনারা ঐ অঞ্চলে মারাত্মকভাবে গুলি চালাতে শুরু করে এবং আজ সকাল পর্যন্ত চালায়।

মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বহু পাকসৈন্য খতমঃ সীমান্তের ওপর থেকে জলপাইগুড়িতে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হয় যে, গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী উত্তর রণাঙ্গনে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। কোচবিহারের অপর পারে ভুরুঙ্গামারির সীমান্ত চেকপোস্ট থেকে তাঁরা ইয়াহিয়া বাহিনী উত্তর রণাঙ্গনে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। কোচবিহারের অপর পারে ভুরুঙ্গামারির সীমান্ত চেকপোস্ট থেকে তাঁরা ইয়াহিয়া বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে। এখানকার যুদ্ধে কমপক্ষে সাতজন খান সেনা নিহত হয়।

চিলাহাটি ও ডোমার ও এর মধ্যে তিস্তার উপর এবং কাকিনা ও ভূষিরবন্দর- এর মধ্যে সানাজানসন নদীর উপর মোট ৩ টি সেতু মুক্তিসেনারা ধ্বংস করে দেয়। ফলে লালমনিরহাটের দিকে পলায়নপর খানসেনাদের একটি দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দিনাজপুর জগদলে আগুয়ান পাক সেনাদলকে মুক্তিযোদ্ধারা বাধা দেয় এবং ঠাকুরগাঁ পাওয়ার হাউসটি ক্ষতিসাধন করে। এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে বহু পাকসেনা নিহত হয়েছে। রংপুর জেলার ডিমলা ও বয়রাতে ইয়াহিয়ার সাতজন গুপ্তচরকে মুক্তিযোদ্ধারা খতম করে এরা মুসলিম লীগ ও জামাত-ই ইসলামী দলের লোক বলেও প্রকাশ।

-কালান্তর, ১ জুন, ১৯৭১

চুকনগরে পাকসৈন্যের বেপরোয়া গুলি

হাকিমপুর ৩১ মে (সংবাদদাতা)- পাকিস্তানী সামরিক বর্বরতা অবশেষে সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে। গত ২০ মে খুলনার বৈঠাঘাটা, ফকিরহাট, রামপাল, নকিপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রায় দেড় লক্ষের মত অসহায় মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে আসার সময় চুকনগরে বর্বর বাহিনী তাঁদের ওপর মেশিনগান দিয়ে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে সেখানে বহুসংখ্যক নারী-পুরুষ-শিশু নিহত হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, খুলনার দক্ষিণাঞ্চল থেকে আনুমানিক দেড় লক্ষ মানুষ সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গত ১৯মে কয়েক হাজার নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চুকনগরের নিকটবর্তী নদীর ওপরে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ ও শিশু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পদব্রজে রওয়ানা হয়ে যায়। চুকনগরে তারা মিলিটারীর সম্মুখীন হয়ে। সে সময় পিছনে যারা তাঁরা মেশিনগানের শব্দ শুনে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। চুকনগরের বাজারের বিভিন্ন ঘরগুলোতে শরণার্থীরা আশ্রয় নিলে বর্বর বাহিনী সেখানে গিয়ে ঘর থেকে বের করে তাদের অনেককে হত্যা করে।

সীমান্ত অতিক্রম করার পর শতাধিক আহতকে হাকিমপুরে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ২২ তারিখে গুলিতে আহত শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড়শত বলে হাকিমপুরের মুক্তিফৌজের চিকিৎসক জানান।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে গেরিলা বাহিনীর তৎপরতা

আগরতলা, ১ জুন (ইউএনআই)- মুক্তিফৌজ গেরিলা বাহিনী শ্রীহট্ট সেক্টরের তেলিপাড়া ও আখাউড়ার মধ্যে সংযোগকারী রেল সেতুটি উড়িয়ে দিয়েছে। গেরিলা বাহিনী এই স্টেশন দাঁটি দখলের জন্য পাকফৌজের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে।

একটি পাকিস্তানী জীপগাড়ির ওপর গেরিলা বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করে শত্রুপক্ষের ২ জনকে খতম করে। কুমিল্লা সেক্টরে গেরিলাবাহিনী রেল ইঞ্জিন ও ওয়াগনকে লাইনচ্যুত করে দিতে সক্ষম হয় বলে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধাদের সংবাদে প্রকাশ। ময়মনসিংহ সেক্টরে গেরিলা বাহিনী পাকফৌজের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে ৭ জন পাকসৈন্যকে সশস্ত্র অবস্থায় গ্রেফতার করে। পাক ঘাঁটির পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে দিয়ে গেরিলারা সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

-কালান্তর, ২, জুন ১৯৭১

কমাণ্ডো আক্রমণে পাকসৈন্য মরছে

আগরতলা ৩রা জুন (ইউএন আই)- বিভিন্ন স্থানে পাকসৈন্যের ওপর মুক্তিফৌজের কমাণ্ডো আক্রমণে আবার জোরদার হয়ে উঠছে। গজারিয়া, চাঁদহাট, রাজানগর ও ফরিদপুর এলাকায় মুক্তিফৌজের আক্রমণে পাকসৈন্য নাজেহাল হয়েছে।

বগুড়া অঞ্চলে পয়লা জুন মুক্তিফৌজ পাকসৈন্যের একটি সাঁজোয়া গাড়ী দখল করে নেন। ঐ গাড়ীতে তিনটি রেডিও সেট ও ছয়টি স্টেনগান ছিল। একজন কমাণ্ডোর গাড়ী ও মুক্তিফৌজ দখল করে নেন। পশ্চিম বগুড়ার আর একস্থানে আক্রমণ চালিয়ে তাঁরা কয়েকজন পাকসৈন্যকে খতম করেন। আর একটি সংঘর্ষে পাকিস্তানের টহলদার বাহিনীর সাতজন সৈন্য নিহত ও দুজন আহত হয়।

আসাম সংলগ্ন কানিরঘাটে মুক্তিফৌজের সঙ্গে প্রবল লড়াই চলছে। মুক্তিফৌজের এই শক্তঘাটিতে পাকিস্তানকে ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে গত ২৪ ঘণ্টায়

মুক্তিফৌজের কমান্ডে আক্রমণ প্রবল হয়ে উঠছে। কোচবিহারের বিপরীত দিকে অবস্থিত ভূরুঙ্গামারী চৌকি থেকে পাকসৈন্যদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চিলহাটি ও ডোমারের মধ্যবর্তী তিস্তাসেতু এবং কাকিনা ও ভূষিরবন্দরের মধ্যবর্তী সানিয়াজানা সেতুকে মুক্তিফৌজ উড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরা কাকিনাতে আটক হয়ে পড়েছে। তাদের লারমনিরহাটে ফিরে যাবার পথ নেই।

দিনাজপুরের জগদলে গেরিলা বাহিনী পাকসৈন্যের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। প্রচুর পাকসৈন্য হতাহত হয়েছে। ঠাকুরগাঁয়ের একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও মুক্তিফৌজে নষ্ট করে দিয়েছেন। রংপুরজেলার ডিমলা ও বাউরাতে মুসলিম লীগের সাতজন পাকিস্তানী গুপ্তচরকে মুক্তিফৌজ খতম করেন।

গত সপ্তাহে মুক্তিফৌজের কমান্ডে আক্রমণে ফেনী এলাকায় চারজন অফিসারসহ শতাধিক পাকসৈন্য নিহত হয়েছে। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম ও জগন্নাথদিঘীর মধ্যবর্তী কোন একস্থানে সোমবার মুক্তিফৌজ পাকসৈন্যের একটি জীপের ওপর আক্রমণ চালান। বিধস্ত জীপের ৪জন আরোহী নিহত হয়। পয়লা জুন কসবা ও আখাউড়ার মধ্যবর্তী গঙ্গাসাগরের কাছে মুক্তিফৌজের আক্রমণে কয়েকজন পাকসৈন্য হতাহত হয়েছে। ত্রিপুরার সাক্রমের বিপরীত দিকে অবস্থিত চট্টগ্রামের রামগড় এলাকায়ও কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ জুন, ১৯৭১

GUERRILLA TACTICS OF MUKTI FOIJ PAYING DIVIDENDS

AGARTALA, JUNE – 4 By the use of guerilla tactics, the Mukti Fouj commando, who engaged the Pak army in several places in Chittgong hill tracts, Noakhali, Comill, Saldanadi, Gangasagar and Akhaura sectors at Saldanadi. Among those Pak troops killed, one was a Major Doorani who took active part in mass killing in Comilla town in the months of Margh and April.

Other reports available from across the border say, Pak troops are gradually losing confidence in the so-called peace committees formed earlier by it in various parts of Bangladesh. Pak troops have killed at least five peace committee members at Laksham and Feni.

On June 2. the Army is also reported to have killed a foreigner Mr. P. J. Chalmers, who was looking after Nalua tea estate in sylhet Earlier, Pak troops killed 20 labourers of the garden. The Pak army officials demanded tea, ration and fuel for the troops from Mr. Chalmers who was running short of finance and faced serious economic crisis in the present doldrums in the country, expressed his inability to meet the demands.

Agencies add : Four Pakistanis, including an officer, were killed and several others injured by the Mukti Fouj in an exchange of fire yesterday near Ichakhali village off Meherpore town in south-western Bangladesh.

The Mukti Foj are laying mines near culverts, bridges and on metalled roads in this sector. In Faridpur, the liberation forces damaged a bridge and destroyed an army post.

The freedom fighters are in full control of villages in the Rangamati area, six miles north of Patnitola. an army patrol was also fired upon by the freedom fighters yesterday.

In Sylhet sector, the liberation forces are reported to have damaged two bridges and attacked an army position at Sarlbagh. They also opened fire on a Pakistani army position near the border in Shamsheernagar area.

In Rangpur sector, the freedom fighters destroyed two army gunboats and damaged a railway bridge in Sirjaghat area.

In Comilla sector, the freedom fighters attacked an army position near colonel Bazar and killed 25 soldiers.

Our Cooch Behar Correspondent says that the Pak army started firing on the Gitaldaha border outpost in India from the Moghalhat border. The Border security Force returned the fire and the exchange continued for an hour.

A few Pakistani mortar shells landed on Indian territory at Lalgola in Murshidabad district today as fighting broke out between the Mukti Fauj and the Pakistani army at Kanthalbarti area of Bangladesh. It is officially learnt at Baharampur.

- Hindustan Standard, 5 June, 1971

পাকসৈন্যরা মুজিবনগর দখলে ব্যর্থ

কৃষ্ণনগর, ৫ই জুন- সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা মুজিবনগর দখল করতে এলে গত দু'দিনে মুক্তিফৌজের হাতে ৩৫জন পাকসৈন্য নিহত হয় এবং বেশ কয়েকজন পাকসেনা আহত হয়। মুজিবনগর দখলের এই লড়াইয়ে পাকসেনা নাজেহাল হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। যাবার সময় তারা তাদের হতাহত সহকর্মীদের নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে চলে যায়। যাবার সময় তারা তাদের হতাহত সহকর্মীদের নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে চলে যায়। মুক্তিফৌজের কেউ হতাহত হয়নি।

কার্যু করে গ্রাফতার ও হত্যাঃ এদিকে পাকসৈন্যরা শহর ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় খণ্ড খণ্ড এলাকা ধরে কার্যু জারী করে দিচ্ছে। এবং তারপর বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে যুবকদের ধরে এনে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। এ খবরটি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের একজন মুখপাত্র।

-যুগান্তর, ৬ জুন, ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধ চলছে

রায়গঞ্জ, ৬ই জুন (পি টি আই)- দিনাজপুরের পাক হিলি এলাকায় মুক্তিফৌজের গেরিলারা সম্প্রতি বিজুল শিবির আক্রমণ করেন। ৫ জন পাকসৈন্য নিহত এবং অন্য দু'জন আহত হয়। দিনাজপুর অঞ্চলে মুক্তিফৌজ বাগজানা পাক সামরিক ঘাঁটিতে তৎপরতা চালিয়ে ৬০ জন পাকসৈন্য খতম করেন। ৪ জনকে বন্দী করা হয়েছে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজের হাতে এসেছে।

কুষ্টিয়ায় গত কয়েকদিনের কলারায় প্রায় ২০ জন পাকসৈন্য খতম হয়েছে। কলারো মহামারী জেলার পাকসৈন্যদের মনে প্রবল ভীতির সঞ্চার করেছে।

শরণার্থী সেবাদলঃ বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে ৬০ জন শরণার্থী যুবক কলকাতায় সমাজসেবা সম্পর্কে ট্রেনিং লাভ করছেন। গান্ধী শান্তি সংস্থা ঐ শরণার্থী যুবকদের প্রাথমিক চিকিৎসা, নাসিং, আহার তৈরী ও বন্টন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্ক ট্রেনিং দিচ্ছেন। এই যুবকরা বিভিন্ন শিবির খোলা হবে বলে শান্তি সংস্থার জনৈক মুখপাত্র জানান। পূর্বাঞ্চলে শরণার্থী যুবকদের জন্য ছয়টি ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হবে বলে শান্তি সংস্থার জনৈক মুখপাত্র জানান। পূর্বাঞ্চলে শরণার্থী যুবকদের জন্য ছয়টি ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হবে আশা করা যায়।

নৌকার মধ্যে ৩ হাজার শরণার্থীঃ ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদ সীমান্তে ইছামতী নদীর ওপর দেশী নৌকার মধ্যে প্রায় তিন হাজার শরণার্থী বাসকরছেন।

-যুগান্তর, ৭ জুন ১৯৭১

মুক্তিফৌজের ব্যাপক ও প্রচণ্ড আক্রমণে বহু পাকসৈন্য খতম

আগরতলা, ৮ই জুন (পি টি আই)- বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে কুমিল্লা জেলার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কসবা এলাকায় মুক্তিফৌজ আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে। আজ এখানে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, গতকাল মুক্তিফৌজ মর্টার ও মেশিনগান নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালালে তেত্রিশজন পাকসৈন্য নিহত হয় এবং পাকসৈন্যরা কসবা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। পাকসৈন্যদের জন্য যুবতী নারী সংগ্রহ করে দেওয়ার অপরাধে মুক্তিফৌজ ৬জন পাক দালালকেও গুলি করে হত্যা করেছে।

মুক্তিফৌজ গেরিলাবাহিনীও গতকাল কসবার নিকটবর্তী গঙ্গাসাগরে ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়ে ২৮ জন পাকসৈন্য খতম করে।

আরও দক্ষিণে মুক্তিফৌজ গতকাল নোয়াখালী জেলার চাঁদগাজী, ছাগলনাইয়া, বান্দুরা, আমতলী ও জগন্নাথদিঘী এলাকায় তাদের তৎপরতা বিস্তৃত করে এবং পাকসৈন্যদের পশ্চাদপসরণ করে ফেনী শহরে সরে যেতে বাধ্য করে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই সকল অঞ্চলে মুক্তিফৌজ কমান্ডোবাহিনীর সঙ্গে দু'দিনব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধে বহু পাকসৈন্য হতাহত হয়েছে। ফেনী শহরের উপকণ্ঠে মুক্তিফৌজের গেরিলা দল লুকিয়ে থেকে অতর্কিত সাফল্যের সঙ্গে এক প্লাটুন পাকসৈন্যকে আক্রমণ করে। পাকসৈন্যরা ঐ সময় একটা ছোট নদী পার হচ্ছিল গেরিলাদের আক্রমণে সাতজন পাকসৈন্য এবং অপর কয়েকজন আহত হয়।

রংপুর জেলায়ও তৎপরতাঃ কোচবিহার থেকে পিটিআই জানাচ্ছেন যে মুক্তিফৌজ গতকাল রাতে বাংলাদেশের রংপুর জেলার নাগেশ্বরী থানার এলাকাধীন মুকসী গ্রামে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে অনূন বারজন পাকিস্তানী সৈন্য খতম করেছে। আজ এখানে সংবাদ পাওয়া গেছে যে, ঐ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগরত একটি পাকিস্তানী সৈন্য খতম করেছে। আজ এখানে সংবাদ যে, ঐ অঞ্চলের গ্রামে গামে অগ্নিসংযোগরত একটি পাকিস্তানী টহলদার বাহিনীর সৈন্যদের ওপরই মুক্তিফৌজ এই আক্রমণ চালায়। মুক্তিফৌজ ভূরুঙ্গামারীতে একটি পাকঘাঁটির ওপর হানা দিয়ে দুজন পাকসৈন্যকে গুরুতরভাবে জখম করেছে। মুক্তিফৌজ পাকসৈন্যদের সঙ্গে গুলী বিনিময় করে এবং তাহাতে কয়েকজন পাকসৈন্য নিহত হয়। এই সকল অভিযানে মুক্তিফৌজের মাত্র দু'জন আহত হয়েছে।

মুর্জিবনগর থেকে প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছে যে, রবিবার রাতে রাজশাহী খণ্ডে মুক্তিফৌজ অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে জনৈক মেজরসহ ৪৯ জন পাকিস্তানী সেনাকে বন্দী করেছে।

-যুগান্তর, ৯ জুন, ১৯৭১

MUKTI FOIJ INTENSIFIES GUERILLA ATTACKS

MUJIBNAGAR, JUNE 9- Freedom fighters have intensified their guerilla attacks on the West Pakistani army detachments and patrol and on bridges in Bangladesh, says UNI.

In the Jessore sector an army lieutenant was mobbed and killed a few days ago near Faridpur. The freedom fighter ambushed an army contingent near Chuadanga on June 6. One junior commissioned officer was killed and eight soldiers were injured in this engagement. Guerillas also fired upon some Pakistani troops near Jessore on June 7.

Freedom fighters destroyed two bridges between Panchgarh and Ruha and inflicted heavy casualties on the army in Rangpur sector. Army also suffered casualties in an attack by the freedom fighters with mortars and small arms about 15 miles of Patnitala.

The guerillas have also been active in the areas north-west of river Dharala. They shot dead two Pakistani agents in the Tetulya area.

Heavy rains have rendered the unmetalled roads and tracks unfit for vehicular traffic in several areas of East Bengal. There was an exchange of fire between Punjabi and Pathan soldiers in the Comilla area.

PTI says : Several west Pakistani soldiers were killed in a bitter clash between the Mukti Foj and the Army personnel in Bhurungamari in Rangpur area yesterday.

In Khulna the liberation force destroyed nine enemy bunkers at Kaliganj and killed eight soldiers entrenched there the reports said.

In Mymensingh, the Mukti Foj raided Sibpore village on receipt of information about the presence of Pakistani army supporters and killed six of them in a sudden swoop yesterday. A Pakistani post at Barengapara was attacked by the liberation force and in the resultant clash the army suffered heavy casualties.

The Mukti Foj raided a Pakistani position at Jayantiapur. A Pakistani officer was blown to pieces in a mine explosion there. Five Pak army personnel were killed at Chhotolekhan, when the Mukti Foj commandos attacked them.

Hindusthan Standard, 10 June, 1971

মুক্তিযোদ্ধারা দেশের মাটি থেকে পাক হানাদারদের
উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর

কলকাতা, ১০ জুন- গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী জনাব এম মনসুর আলী বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে চার দিনব্যাপী সফরের পর আজ মুজিবনগরে প্রত্যাবর্তন করে বলেছেন, “বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা দেশের মাটি থেকে পাক হানাদারদের উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর।”

ঐ সফরের সময় তিনি মুক্তিফৌজ নিয়ন্ত্রিত কতিপয় শিবির পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, ঐ শিবিরসমূহে তিনি “তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অদম্য মনোবল ও নমনীয় দৃঢ়তা” পরিলক্ষিত করেছেন। ঐ খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচার করেছে।

পাক স্বাগত কেন্দ্র গুলি বন্দী শিবিরের সঙ্গে তুলনীয়; আকাশবাণী’র খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ সরকারের জনৈক মুখপাত্র বাংলাদেশের পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক (শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য) প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত ‘স্বাগত কেন্দ্র’গুলিকে বন্দী শিবিরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তিনি জানান, সম্প্রতি ভারতের পথে আসার সময় বহুসংখ্যক শরণার্থীকে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ জোর করে ঐ স্বাগত কেন্দ্র গুলিতে ধরে নিয়ে গেছে।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিকের অধিকাংশ বাঙালী কর্মচারী ছাঁটাই; ঢাকা থেকে পাকসামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক মর্নিং নিউজ’ পত্রিকার অধিকাংশ বাঙালী কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করা হয়েছে বলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সংবাদ প্রচার করেছে। পাক অধিকৃত বাংলাদেশে সামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ঐ সকল পত্রিকার কোন গ্রাহক নেই। সামরিক কর্তারা পত্রিকার ২০০০ কপি কিনে নেন, মাঝে মাঝে সেনাদের মধ্যে বিমান থেকে গুলো ফেলে দিওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ নিরপেক্ষ কোন বেসামরিক পাঠক নেই।

পাক নৃশংসতার বিরুদ্ধে ডন পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদকের কঠিন স্বর করাচীর ডন পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব আলী জাফরী আজ লণ্ডনে বাংলাদেশে সংঘটিত পাক নৃশংসতার বিরুদ্ধে দৃষ্ট প্রতিবাদ জানিয়ে জনসাধারণের কাছে এই মর্মে আবেদন জানিয়েছেন যে, তাঁরা যেন ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী টেষ্ট ম্যাচগুলি বয়কট করেন।

জনাব আলী জাফরী ইতিপূর্বে পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতা অপহরণের প্রতিবাদে পাক নাগরিত্ব বর্জন করেছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় পাকসেনাদের মধ্যে “সেম সাইড” কলকাতা, ১০ জুন বাংলাদেশের গেরিলাবাহিনীর তৎপরতা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। গেরিলাদের হাতে মার খেয়ে পাক হানাদাররা নিজেদের মধ্যে সেম সাইড করে বসছে। চুয়াডাঙ্গার কাছে দুই দল পা সৈন্যের পরস্পর সংঘর্ষে ১৩ জন নিহত হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আজ সন্ধ্যায় ঐ সংবাদের কথা উল্লেখ করে চুয়াডাঙ্গার শেয়ালমারীতে গেরিলা বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সংবাদ দিয়েছে।

প্রকাশ, গত ৫ জুন শেয়ালমারীতে মাইন বিস্ফোরণে ২ টি সামরিক ট্রাক ধ্বংস হয়ে ২৯ জন পাকহানাদার নিহত এবং ৪ জন আহত হয়। হানাদাররা জীবননগরের দিকে যাচ্ছিল। ঐ মাইন বিস্ফোরণের শব্দে ভীত পাক হানাদাররা জীবননগর দর্শনা থেকে ঘটনাস্থলে দিক আসে। দুই পক্ষেই পরস্পর মুক্তিসেনা বলে ভুল করে এবং পরস্পরের উপর গুলি চালাতে থাকে। ফলে ১৩ জন পাকহানাদার নিজেদের গুলিতেই আহত হয়।

-কালান্তর, ১১ জুন, ১৯৭১

পাক হানাদারদের উপর মুক্তিফৌজের আক্রমণ

কলকাতা, ১১ জুন- মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতায় চট্টগ্রাম শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাক সেনারা প্রতিদিনই নাজেহাল হচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত সংবাদে বলা হয়েছে যে সম্প্রতি গেরিলা বাহিনী চট্টগ্রাম শহরের নিউ সার্কেট, খাতুনগঞ্জ, চট্টেশ্বরী রোড, চকবাজার, লারদেঘীর মাঠে প্রভৃতি স্থানে গ্রেনেড ও হাতবোমা সহ আক্রমণ চালায়। চকবাজারে ২ জন পাক হানাদার নিহত হয়েছে।

সংবাদে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম এখন পরিত্যক্ত নগরী। দোকানপাট বন্ধ। শতকরা মাত্র ১৫ জন লোক দৈনন্দিন কাজে যোগ দেওয়ার জন্য পথে বেরুচ্ছেন। বেলা ৩টার পর রাস্তায় কাউকে খুব কম দেখা যায়। বন্দর এলাকায় মাত্র ৫০ জন কাজ করছে। চট্টগ্রামের হাজী এলাকায় দ্বিতীয় ক্যান্টনমেন্টে স্থাপন করা হয়েছে। বাগানাবাজার ও আঁধারমানিক অঞ্চলে ২ টি পৃথক আক্রমণে গেরিলারা ৪০ জন পাকসৈন্যকে খতম করেছে। শ্যামপুরে ৮ জন দৌলতপুর-চাঁদিরহাটে ৪০ জন কুমিল্লার হরনপুর , হৃদয়পুরে ১৩ জন এবং যশোহর রণাঙ্গনে ১৫ জন পাক হানাদার গেরিলাদের হাতে নিহত হয়েছে। রামগড় থেকে গড়েরহাটের পথে ৩ জন পাক সামরিক অফিসার নিহত হয়েছে।

গেরিলা বাহিনী মুসলিম লীগের দালালসহ পাক দালালদেরও বিভিন্ন স্থানে খতম করে চলছেন। জাকিগঞ্জ ৪ জন দালাল নিহত এবং ১জন গ্রেফতার হয়েছে। মুক্তিসেনারা জাকিগঞ্জের পুলিশ স্টেশন দখল করেছেন এবং জাকিগঞ্জে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন। কালিগঞ্জের মুসলিম লীগ চেয়ারম্যান অলি মণ্ডলকে মুক্তিসেনারা খতম করে দিয়েছেন। ছাগলগঞ্জ বাজারে ১ দালালকে বন্দী করা হয়েছে এবং যুবতীকে উদ্ধার করা হয়েছে। সিলেট সেক্টরে মুক্তিফৌজের হাতে একটি রেলসেতু ধ্বংস হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে।

আগরতলা থেকে ইউ-এন আই জানাচ্ছেনঃ সম্প্রতি একদল সাংবাদিক বাংলাদেশের দক্ষিণ রণাঙ্গনে সফরে গিয়েছিলেন। মুক্তিফৌজের জনৈক মেজর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, মুক্তিফৌজে বর্তমান পাক-হানাদারদের উপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে এবং সর্বত্র পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

উক্ত মেজর সাংবাদিকদের আরো জানিয়েছেন যে দক্ষিণ রণাঙ্গনে পাঠান ও বালুচ সেনারা নিরস্ত্র বাংলাদেশ নাগরিকদের উপর গুলি করতে অস্বীকার করায় তাঁদের অন্যত্র বদলী করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রায় ৪০০ জন বালুচ সেনাকে জাহাজে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

পাঞ্জাবী ও পাঠান সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষঃ গত ৪ জুন কুমিল্লা সেক্টরে পাক সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবী ও পাঠানদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ৩৫ জন নিহত হয়েছে।

-কালান্তর, ১২ জুন, ১৯৭১

কুমিল্লা শহরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা

আগরতলা, ১১ই জুন (পি, টি, আই) বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ কুমিল্লা শহরটি গতকাল দখল করে। আবার স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়েছে। এই সঙ্গে নানা অঞ্চলে গেরিলা তৎপরতা ও তীব্রতর হয়ে উঠছে। ইউএন আই জানাচ্ছেন সারা বাংলাদেশ জুড়ে শেখ মুজিবের মুক্তিফৌজ গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে বলে সীমান্তের ওপারে মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে খবর এসেছে। পাক সামরিক প্রশাসন শহরে ৭১ ঘন্টার সামরিক আইন জারী করে নির্বিচারে অধিবাসীদের বন্দী করেছে।

সীমান্তের ওপার থেকে জানা গেছে , মুক্তিফৌজ পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, হাবিব ব্যাঙ্ক লিমিটেড, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, জজ কোর্ট এবং টাউন হল ভবনে গ্রেনেড আক্রমণ চালায়। গেরিলা বাহিনী কুমিল্লা শহরের দক্ষিণাঞ্চলে একটি রেল ইঞ্জিন উড়িয়ে দিয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর সূত্র থেকে জানা যায় যে গত ৬ ই জুন মুক্তিফৌজ চট্টগ্রাম জেলায় সৌলাংপুরে পাকসেনা সমাবেশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৩৬ জন শত্রুসেনাকে খতম করে। ৫ ই জুন শ্রীহট্টের তেলিপাড়া খণ্ডে মুক্তিফৌজের সঙ্গে পাক- বাহিনীর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পাকবাহিনী আক্রমণের চাপে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে পশ্চাদপসারণ করে, তবে পালাবার সময় তারা জীবন ও সম্পত্তির বেশ ক্ষতি করে যায়। গত ৩রা জুন লাকসাম অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী হঠাৎ একটি আক্রমণ চালিয়ে পাকবাহিনীর অনেককে খতম করেছে। শত্রুশক্তির বেশকিছু মিজো

এবং চাকমা সেনাও নিহত হয়। মুক্তিবাহিনী তবলছড়িতে বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে নেয়। এই অঞ্চলে পাকসেনাদের অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও বাঙ্গালী অধিবাসীরা দৃঢ় মনোবল নিয়ে তাদের মোকাবেলা করছেন, মহিলা এবং কিশোরীরাও মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।

কুমিল্লা জেলার ননীপুর ও ফকিরহাটে গুপ্তস্থান হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজের গেরিলা দল ২০ জন পাকসেনাকে খতম করে। মিয়ার বাজারে ও মুক্তিফৌজের হাতে পাক হানাদার বাহিনীর আটজন মারা পড়ে। এখানে তিন ঘন্টা লড়াই চলে। পাকসেনারা মর্টার ও মেশিনগানে চালিয়ে মুক্তিফৌজের পাঁচজন যোদ্ধাকে আহত করে। শ্রীহট্ট জেলার মির্জাপুরে মুক্তিবাহিনী মেশিনগান ও মর্টার চালিয়ে পাকসেনাদলের একজন অফিসার ও দশজন সৈন্যকে হত্যা করে।

দিনাজপুরেও গেরিলা তৎপরতাঃ রায়হগঞ্জ, ১০ জুন গেরিলা ইউনিট দিনাজপুরে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তৎপর হয়ে উঠছে। ছোট ছোট দল গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজ পাক দখলদার বাহিনীকে যথেষ্ট বিব্রত করে তুলেছে। কয়েকদিন আগে ঠাকুরগাঁও মহকুমা এলাকায় রুহিয়া রেল স্টেশন থেকে ১ ফার্লং দক্ষিণে ৫০ ফুট দীর্ঘ রেল লাইন মুক্তিফৌজ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। পাক সেনাবাহিনীর লোকেরা গুলি চালাতে থাকে। মুক্তিফৌজ গেরিলারা পিছন থেকে পাক সৈন্যদের আক্রমণ করে ৭ জনকে হত্যা করে। ওই এলাকার মঙ্গলপুর ও বাজানহারের মধ্যবর্তী একটি রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেয় এবং রুহিয়া থেকে ৪/৫ মাইল দূরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সেতুও তারা উড়িয়ে দেয়। বোচাগঞ্জ, পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈলে গেরিলা বাহিনী বেশ কয়েকজন পাক সেনাদের তাঁবেদার গুপ্তচরকে খতম করে।

-যুগান্তর, ১২ জুন, ১৯৭১

গেরিলা আক্রমণে বাংলা বাহিনীর অপূর্ব সাফল্য

বর্তমানে মুক্তিফৌজ তাদের গেরিলা আক্রমণে বাংলাদেশের সর্বত্র পর্যুদস্ত করেন। গত সপ্তাহে বাংলার বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী বহু পাকসৈন্যকে হতাহত করেন। গত ৬ই জুন মেহেরপুরের নিকটে ইছাখালিতে এক গেরিলা যুদ্ধ মুক্তিবাহিনী পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ চারজনকে খতম করেন। যশোহর এলাকায় মুক্তিবাহিনী মেশিনগান ও মর্টারের সাহায্যে পাকবাহিনীর ১ টি শিবির অতর্কিতে আক্রমণ করে কমপক্ষে ২০ জন পাকসৈন্যকে হত্যা ও অনেককে হতাহত করেন-তাদের ক'খানা গাড়ী ও বহু সংখ্যক ভারী ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেন। কালাচাঁদপুরের দিকে পাকসেনার অগ্রতির এক খণ্ড যুদ্ধে মুক্তিফৌজ তাদের ১ জন লেঃ কর্নেলকে আহত করেন। এই যুদ্ধে বাংলা বাহিনী ১টি সেতু ও পাকসেনার ১টি ঘাঁটি ধ্বংস করেন।

বগুড়া জেলার রাঙ্গামাটি এলাকা এখন সম্পূর্ণ মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রনাধীন। সিলেটের সরলবাগে বাংলাবাহিনী পাকসেনার ১ টি ঘাঁটি দখল করে ও এর সন্নিহিতে ২ টি গানবোট বিনষ্ট করেন। সিরাজগঞ্জে তারা একটি রেল সেতু সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হন। দিনাজপুর রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ ৭৫ জন পাকসেনাকে হত্যা, বহু জনকে আহত ও ১৪ জনকে বন্দী করে। উত্তরাঞ্চলে উলিপুরে মুক্তিযোদ্ধারা এক ঝটিকা আক্রমণে ৪০ জন পাকসৈন্য কে হত্যা করেন। এছাড়া খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লাতে কদিনের যুদ্ধে তারা প্রায় দুশো-এর অধিক পাকসৈন্য হত্যা করেছেন।

-বাঙ্গবাণী, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩ জুন, ১৯৭১

মেহেরপুরের পাকবাহিনীর এক সৈন্য খতম

কৃষ্ণনগর ১৩ জুন (পি, টি, আই) মুক্তিফৌজ গতকাল বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম খণ্ডে বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানী ফৌজের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। মেহেরপুরের অদূরে তারা পাক ফৌজের এক প্লাটুন সৈন্য

খতম করে দিয়েছে। সীমান্তের অপর পর থেকে এখানে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ভারতের গোদাডাঙ্গার বিপরীত দিকে ভোমরার নিকটে এবং পেট্রাপোলার বিপরীত দিকে বেনাপোলের নিকটে গত অব্যাহত আছে। তুমুল যুদ্ধের পর মুক্তিফৌজ মেহেরপুর শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে কামদেবপুর গ্রামে ইচ্ছাখালি সীমান্ত চৌকি দখল করে নিয়েছে। ঐ অঞ্চলে মর্টার থেকে গুলিবর্ষণ করে তারা পাকফৌজের এক প্লাটুন সৈন্য খতম করে দিয়েছে। আহত কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্যকে তাদের সাথীরা সরিয়ে নিয়ে গেছে। খবরে প্রকাশ, পাক সৈন্যরা এখান থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের প্রাগপুর এলাকায় ২৫টি বাড়ীতে। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবং পাঁচজনকে হত্যা করেছে।

যুগান্তর. ১৪ জুন ১৯৭১

MUKTI FOIJ ACTIVE ON WIDE FRONT IN BANGLADEHSH

MUJIBNAGAR, JUNE 15- The Mukti Fouj gurikkas have active on a wide front in Bangladesh since June 10 as the Pakistani troops continued their atrocities on unarmed civilians, according to authoritative reports reaching here tonight say agencies.

The guerillas have occupied the border outpost at Baragapara, Mymenshingh district after an encounter with the troops. The also exploded a bomb in a hotel in Dacca city, causing injuries to some collaborators of the Pakistani army.

A Pakistani border outpost in the district of Rajshahi was attacked by the freedom fighters on June10. The next day the liberation forces fired upon an army contingent near Thakurgaon, and also in the Rangpur and Gaibandha.

In the Chilmari area the guerillas destroyed an Army jeep killed the solders travelling in it. They uprooted the railway track in the Hitibandha area and damaged telephone lines between Rangpur and Gaibandha.

In the Sylhet sector, the guerillas shelled an Army position in the Baragram area, inflicting several casualties on the Pakistani troops.

-Hindusthan Standard, 19 June, 1971

চট্টগ্রাম এলাকায় মুক্তিফৌজের তৎপরতা

আগরতলা, ১৯ জুন (পিটিআই)- সীমান্তের অপর পার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনী চট্টগ্রামের পশ্চিমাঞ্চল বিভিন্ন স্থানে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সংবাদে জানা যায় যে জুয়ালগঞ্জে গেরিলাদের আক্রমণে পাকিস্তানী সেনাদলের একজন মেজর নিহত হয়েছেন।

মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনী নোয়াখালী- চট্টগ্রামে খণ্ড শুভপুর এলাকায় শত্রুসৈন্যের অবস্থানস্থলের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে। এর ফলে অনেক পাকিস্তানী সৈন্য আহত হয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ জুন ১৯৭১

মুক্তিফৌজের ভয়ে পাকসৈন্য সদা-সন্ত্রস্ত

মুজিবনগর ২২ জুন (পিটিআই)- বাংলাদেশের বিভিন্ন খণ্ডে মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর টহলদার দলগুলি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মুক্তিফৌজ কমান্ডার জেনারেল উচ্চপদস্থ অফিসার বলেছেন যে মুক্তিফৌজ যে মুহূর্তে আচমকা আক্রমণ চালাতে পারে মনে করে

পকিস্তানী সৈন্যরা আজকাল যতদূর সম্ভব সর্বক হয়ে চলাফেরা করেছে। মুক্তিফৌজ যাতে চিনতে না পারে সেজন্য পাকসৈন্যরা সময় সময় অসামরিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে চলাফেরা করে থাকে। সৈন্যবাহিনী যখন সৈন্য ও সরবরাহ নিয়ে নদী পারাপারের জন্য বোট ব্যবহার করে তখন গেরিলাদের আক্রমণ রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নদী ও খালের উভয় তীরের রক্ষী মোতায়েনের ব্যবস্থা করে।

ভেড়ামারায় ২০ জন পাকসৈন্য নিহতঃ কৃষ্ণনগর ২২ শে জুন কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার মহিষকুণ্ডি অঞ্চলে এক কোম্পানী পাকসৈন্যের ওপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজ অন্ততঃ ২০ জন পাকসৈন্যকে হত্যা ও বেশ কিছুকে জখম করেছে বলে আজ সংবাদ পাওয়া গেছে। স্থানটি কৃষ্ণনগর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে ভারত মেঘনা সীমান্তের বিপরীত দিকে। সীমান্তের ওপর থেকে পাওয়া সংবাদ জানা যায় যে, পাকসৈন্যরা আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগে পালিয়ে যায়।

মুক্তিফৌজ গত রবিবার মেহেরপুরের কাছে একটি সৈন্যবাহী ট্রাকের উপর গোলাবর্ষণ করে এবং উহার ফলে প্রায় ২৪ জন পাকসৈন্য নিহত অথবা আহত হয়। ঐ দিনই মেহেরপুরের প্রায় ১৫ মাইল উত্তর-পূর্বে একটি অঞ্চলে মুক্তিফৌজ একটি সৈন্যঘাঁটির ওপর গুলিবর্ষণ করে। এই আক্রমণে ১১ জন পাকসৈন্য খতম হয়।

রংপুরে লালমনিরহাট খণ্ডে মুক্তিফৌজ একটি সৈন্য শিবিরের ওপর আচমকা আক্রমণ চালিয়ে কিছু অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদসহ একটি ট্রাক দখল করে। এই আক্রমণে যে সকল পাকসৈন্য আহত হয় তাদের মধ্যে একজন আফিসারও আছেন।

-যুগান্তর, ২৩ জুন, ১৯৭১

খান সেনাদের ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর হয়েছেঃ

আরও সাত শতাধিক সৈন্য খতম

স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের খবরে প্রকাশ, হানাদারবাহিনী বাংলাদেশে যে বর্বরোচিত ও সুপরিকল্পিত গণহত্যা চালিয়েছে তারই অংশ হিসাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের সমর্থকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এই নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ পিতামাতাও রেহাই পাননি। গত সাতদিন চট্টগ্রাম রণাঙ্গনে প্রায় একশত ৫০ জন পাক হানাদার মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের হাতে নিহত হয়েছে এবং বহু স্থান থেকে পাকসেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র জানিয়েছে। সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনে গেরিলাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কক্সবাজারে বহু পাকসেনা হতাহত হয়েছে। এদিকে মর্টার ও মেশিনগানসহ আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ফেনীর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ২০০ জন পাকসেনাকে হত্যা করেছেন।

স্বাধীনতাকামী তরুণ যোদ্ধারা গত ১৯শে জুন সিলেট সেক্টরে একটি এলাকায় পাক-হানাদারদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে ১৩ জন পাকসেনাকে খতম করেন এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ৩ জন পাকসেনাকে আটক করেছেন। এর আগেরদিন এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী সিলেটের কয়েকটি স্থানে আক্রমণ চালিয়ে ২২তম রেজিমেন্টের একজন সৈন্যকেও আটক করেছেন।

মুক্তিবাহিনী রংপুরের বজরাপাড়ায় পাকসেনাদের ওপর অতর্কিত গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাদের নাজেহাল করে ছেড়েছেন। এই আক্রমণে অনেক খানসেনা হতাহত হয়েছে। সেই দিনই পাকসেনারা মৃত সৈন্যদের লাশ ও আহত সৈন্যদের নওগাঁয় নিয়ে যায়। এই আক্রমণে একজন অফিসারসহ দু'জন পাকসেনাকে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধার গ্রেফতার করেছেন। কয়েকদিন আগে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা ঠাকুরগাঁয়ের কাছে মর্টার ও মেশিনগান থেকে মুক্তি ছাউনির উপর আচমকা গুলি চালায়। চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দু'সপ্তাহ ধরে চট্টগ্রামে অধিকসংখ্যক গাড়ী ও সৈন্য নিয়ে পাকসেনাদের চলাফেরা

করতে দেখা যাচ্ছে। কুষ্টিয়া রণাঙ্গনে মেহেরপুর এলাকায় এক দুঃসাহসিক আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী কমপক্ষে ৩০ জন পাকসেনাকে খতম করেছেন, সেখানকার কুতুবপুরে মুক্তিবাহিনী খানসেনাদের ওপর আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ১০ জন খানসেনাকে হত্যা করেন। গত ১৫ই জুন নাজিরাকোনায় এক প্লাটুন পাকসৈন্যকে আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনীর অসমবাহিনীর যোদ্ধারা ২০ জন দুশমন সৈন্যকে খতম করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে প্রকাশ, সাতক্ষীরার নিকট দুশমন সৈন্যদের ঘাঁটির ওপর মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালিয়েছেন। এ এলাকায় কয়েকটি আউটপোস্টেও আমাদের মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে দস্যু সৈন্যদের অনেককেই হতাহত করেছেন।

গত ১২ই জুন ভোমরা সেক্টরের কলারোয়ায় মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে খানসেনাকে খতম করেছেন। মুক্তিবাহিনী ঐ দিন রাতে আরেক অভিযানে ৬০ জন খানসেনাকে হত্যা করেছেন। কলারোয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও তথাকথিত শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট ওয়াজেদ আলী চৌধুরীকে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা খতম করেছেন।

মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে খানসেনার উপর ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে মেহেরপুরের নিকটে এক প্লাটুন খানসেনাকে খতম করেছেন। মুক্তিবাহিনী মেহেরপুর শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে কামদেবপুর গ্রামে ইছাখালী সীমান্ত চৌকি দখল করে নিয়েছেন। এতদাধ্বলে মর্টার থেকে গুলিবর্ষণ করে মুক্তিবাহিনী শত্রুসেনাদের এক প্লাটুন সৈন্য খতম করে নিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন পদস্থ অফিসারও রয়েছে।

-জয়বাংলা ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫ জুন,
১৯৭১

MUKTIFIJ KILLS 60 PAK SOLDIERS IN TWO DAYS

JUNE,-27- The Mukti fuj which has recently intensified its guerilla activities throughout the eastern sector have killed at least 60 Pak soldiers and captured some arms during the past two days, according to reports received from across the border, with their active and surprise attacks, the commandos are harassing the Pak troops and their agents everywhere in the eastern sector, the guerillas are now the headache of islamabad's army and have foiled the latter's plan to set up rail communication between Dacca and Chittagong.

Whatever the Pakistani president, General Yahya Khan, might say to the world about the return of refugees, his armed forces in Bangladesh have been keeping the people there terrorised by killing, burning houses and harassing women folk as before to maintain the rate of exodus of Bengalis, The Pak Army's attitude only suggests that islamabad's plan of driving out hindus and progressive muslims remains unchanged which is evident from the uninterrupted heavy influx of evacuees in to Tripura.

Meanwhile, reports PTI the Mukti Fouj gurillas had killed five Pak soldiers including an officer when they ambushed a jeep carrying the Pakistani personnel to Chuadanga town in Kushtia district in the south- western sector of Bangladesh yesterday. The army jeep was badly damaged.

-Hindusthan Standard, 28 June, 1971

সশস্ত্র সংগ্রামের গেরিলা বাহিনী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬। বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে গেরিলা বাহিনীর গঠন ও যুদ্ধ তৎপরতার বিবরণ	‘দৈনিক পূর্বদেশ’ ৮ জানুয়ারী, ১৯৭২	এপ্রিল- ডিসেম্বর ১৯৭১

কাদের বাহিনীর গঠন ও যুদ্ধ তৎপরতা-১

সাক্ষাৎকারঃ কাদের সিদ্দিকী

১৯৭২

প্রশ্নঃ স্যার, কি করে আপনি এই বিরাট সংগঠন গড়ে তুললেন, একটু বলবেন কি?

উঃ ওরা এপ্রিল নাটিয়াপাড়া যুদ্ধের পর আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। পাক বাহিনী টাঙ্গাইলে আসে। ১৯শে এপ্রিল ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসরমান পাকবাহিনীকে কালিহাতীতে বাধা দিই। নেতৃত্বে ছিল ই,পি আর-এর। এখানেই আমি প্রথম গুলিছুড়ি। পাকবাহিনীর একজন মেজরসহ অসংখ্য লোক মারা যায়। আমরা ডিফেন্স উঠিয়ে ছত্রভঙ্গ হই। গ্রাম গ্রামান্তরেও ঘোরাঘুরির পর সংবাদ পাই, পাহাড়ে একটি ই, পি, আর-এর প্লাটুন আছে। এই প্লাটুনকে খুঁজতে থাকি। আমার সঙ্গে এগারোজন ছিল মনি, খোরশেদ আলম ও শাহজাহান। এক রাতে ৪১ মাইল পথ হেঁটে আড়াইপাড়া মাদ্রাসায় আস্তানা গাড়ি। এই সময় পাহাড়ের হামিডুল হকের সঙ্গে দেখা। ই, পি, আরদের রেখে যাওয়া কিছু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়। এই পর্যায়ে আমার সংগঠনের সদস্যসংখ্যা একশতে দাঁড়ায়। এখান থেকেই সত্যিকারের সূত্রপাত।

প্রশ্নঃ স্যার, আপনার নেতৃত্বে কখন কোথায় প্রথম যুদ্ধ হয়?

উঃ কালিহাতী থেকে তিন মাইল দূরে চারান নামক গ্রামে। তারিখটা ২২শে মে। এখানে আমি এলএমজি ব্যবহার করি।

প্রশ্নঃ জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে আপনার সঙ্গে কি ধরনের সহযোগিতা করতো?

উঃ প্রথম দিকে তারা পাক বাহিনীর ভয়ে ছিল। অচিরেই এই ভয় কেটে যায় এবং তারা সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা শুরু করে।

প্রশ্নঃ আপনি কোথা থেকে হাতিয়ার পেতেন? আপনাকে কারা হাতিয়ার সরবরাহ করতো?

উঃ কেন, চীন ও আমেরিকা। অবাক হচ্ছেন বুঝি? অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা তারা পাক বাহিনীকে হাতিয়ার দিতো, আমরা পাক বাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নিতাম।

প্রশ্নঃ স্যার আপনার জওয়ানদের কতটুকু প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে পাঠাতেন?

উঃ যারা দেশমাতৃকার যোগ্য সন্তান তারা নিজের মাকে রক্ষা করার জন্য খালি হাতেও লড়তে পারে। ট্রেনিং এর চেয়ে আদর্শেও চেতনাই বড়। ট্রেনিং দিয়ে তাদের যুদ্ধ শেখাতে হয়নি, শত্রুর মোকাবিলা করেই তারা যুদ্ধ করতে শিখছে।

* ‘দৈনিক পূর্বদেশ’ (৮ জানুয়ারি ১৯৭২)-এ প্রকাশিত ‘বঙ্গবীর সিদ্দিকীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার’ থেকে সংকলিত। সাক্ষাৎকারটি যৌথভাবে গ্রহণ করেছিলেন কাদের বাহিনীর সদস্য রফিক আজাদ ও মাহবুব সাদিক।

প্রশ্নঃ আপনার পরিচালিত অধিকাংশ যুদ্ধগুলো চোরাগোপ্তা, না সম্মুখসমর ?

উঃ অধিকাংশ সম্মুখসমর। ব্যতিক্রম কেবল মাকড়াই-এর যুদ্ধ।

প্রশ্নঃ যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত শত্রুদের ব্যাপারে আপনি সাধারণক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন?

উঃ যতক্ষণ হাতিয়ার থাকতো শত্রুর হাতে ততক্ষণই সে আমার বাধ্য। কিন্তু বন্দী ও আত্মসমর্পিত শত্রুর প্রতি আমার কোন ঘৃণা ছিলো না। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হতো।

প্রশ্নঃ স্যার, আপনি নিজে যে সমস্ত যুদ্ধ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি এবং কেন?

উঃ ধলাপাড়ার কাছে মাকড়াই-এর যুদ্ধ, ২১শে নভেম্বর বাঁশাইলের কামুটিয়ার নদীর ধারে সংঘটিত যুদ্ধ। মাকড়াই-এর দশ মিনিটের এই যুদ্ধ ৩৮ জন খান সেনাকে হত্যা করি। কামুটিয়ার খান সেনাদেরও পাকা বাংকার ধুলিসাৎ করে তাদের তিন মাইল দূরে তাড়িয়ে দিই।

প্রশ্নঃ স্যার, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি আপনার কখনো অনুকম্পা হতো?

উঃ হ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে কখনো হতো বৈকি।

প্রশ্নঃ নয়মাসে আপনার জীবনের প্রতি কোন যুদ্ধে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এসেছিল, কেমন ভাবে এবং কেন?

উঃ নাগরপুরের। আকস্মিকভাবে একটি চরম অসুবিধাজনক অবস্থান থেকে শত্রুর উপর গুলি চালাচ্ছিলাম। তিন দিকেই আমাদের সবার রাস্তা বন্ধ ছিল। চতুর্থ দিকে কেবল পানি আর পানি। ইতিমধ্যে আমার দিকে অগ্রসরমান শত্রুর কমাণ্ডারকে নিজের দলের ছেলে মনে করে তাকে অনেক কছে এগুতে দিই। ৪০ গজ দূরে থাকতে তাকে শত্রু বলে চিনতে পেরে গুলি ছুড়তে থাকি। পরে তিন দিকের শত্রুবৃষ্টনী ভেদ করে নিরাপদ আশ্রয়ে যাই।

প্রশ্নঃ স্যার মুজিবনগর থেকে আপনি কখন সক্রিয় সাহায্য পেয়েছেন?

উঃ আগষ্ট মাসের পূর্ব পর্যন্ত মুজিবনগর থেকে কোন সাহায্য পাইনি। পরে অবশ্য পেয়েছি।

প্রশ্নঃ আপনার অধীনে যে সব জওয়ান আছে তাদের মধ্যে কে কে আপনাকে প্রায় অধিকাংশ যুদ্ধে ছায়ার মতো অনুসরণ করতো?

উঃ সবু, খোকা, হালিম, ফজলুল হক, আবদুল্লা, ফজলু, আজাহার, লতিফ, ঢুলাল, মাসুদ, বেনু, শামসু, সাখাওয়াত এবং আরো কয়েকজন।

প্রশ্নঃ মুক্তিযুদ্ধে আপনাকে কে প্রেরণা জোগাতেন।

উঃ বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

কাদের বাহিনীর গঠন ও যুদ্ধ তৎপরতা-২

\ কাদের বাহিনী সাড়ে তিনশো লড়াই-এ অংশ নিয়েছে \

কাদের বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার। এদের সহায়ক স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ছিল ৭২ হাজারেরও বেশী। একটি সেনাবাহিনীরমতো সুশৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা। সমগ্র টাঙ্গাইল জেলা এবং ঢাকা,

* কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত। প্রতিবেদনটি 'দৈনিক বাংলা' ৮-১৩ ডিসেম্বর '৭২-এ বিভিন্ন শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ।

ময়মনসিংহ ও পাবনার কিছু অংশ ছিল কর্মক্ষেত্র, ৫টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল সমগ্র এলাকা। মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্ত ছিল ৯৭ কোম্পানীতে। ৫টি সেক্টরে ছিল পাঁচটি সদর দফতর। কোম্পানীগুলোরও ছিল পৃথক সদর দফতর। এসব সদর দফতর ছিল ভ্রাম্যমাণ। এছাড়া সবার ছিল একটি উর্ধ্বতন স্থায়ী সদর দফতর যেখানে হানাদার পাকিস্তানীরা কোনদিনই পা ফেলতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনীতে ছিল সিগন্যালার-হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পাতায় যুদ্ধ বর্ণনায় যে ধরনের সিগন্যালার বা খবর সরবরাহকারীর সন্ধান মেলে তেমনি। আবার এর সাথে সাথে ছিল বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এই বাহিনীর কোন যোদ্ধা অধিকৃত বাংলাদেশের বাইরের কোন জায়গা থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসেননি। অধিকৃত এলাকেতেই তারা পেয়েছেন প্রশিক্ষণ, আঘাত হেনেছেন শত্রুর উপরে, ধ্বংস করেছেন শত্রুর হানাদারদের আর একের পর এক মুক্ত করেছেন অধিকৃত অঞ্চল। মুক্ত এলাকায় চালু করেছেন বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা ১৬ই ডিসেম্বর অনেক আগেই। একটি সেনাবাহিনীতে যে সব উপকরণ থাকা প্রয়োজন তার প্রায় সব কিছুই এদের ছিল। হাসপাতাল ছিল, যোদ্ধাদের উদ্দীপনা জাগানোর জন্য ছিল সাংস্কৃতি দল। রণাঙ্গন নামে একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র তারা প্রকাশ করতেন। ছিল সুষ্ঠু গণসংযোগ ব্যবস্থা। আরেকটি কথা- শুধু বিমান ছাড়া একটি সশস্ত্র বাহিনীর যে সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ থাকা প্রয়োজন পরিমাণে সামান্য হলেও তার অনেকগুলোই তাদের কাছে ছিল। শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে তারা এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছিলেন। ব্যাপক সম্মুখসমর, খণ্ড যুদ্ধ ও ছোটখাটো সংঘর্ষসহ বাহিনীর মোট লড়াইয়ের সংখ্যা সাড়ে তিনশোরও বেশি। তাদের হতে নিহত হয়েছে সহস্রাধিক খানসেনা ও রাজাকার। আর এই বাহিনীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা হলো একত্রিশ জন।

তাদের নিজস্ব যুদ্ধপদ্ধতি ও কৌশল ছিল, গেরিলা যুদ্ধ তারা করেছেন। বাঁপিয়ে পড়েছেন অনেক সম্মুখ সমরে। গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধের একটি রীতি হলো ‘হিট অ্যাণ্ড রান’ অর্থাৎ আঘাত হেনে পালিয়ে যাও। কিন্তু এই বাহিনী গেরিলা যুদ্ধে একটি নবতর রীতি সংযোজন করেছিল। তা হলো ‘সাডেন হিট, স্টে অ্যাণ্ড অ্যাডভান্স’ আতর্কিতে এসে আঘাত হনো, অবস্থান করো ও এগিয়ে যাও।

বাহিনীর নাম কাদের বাহিনী আর অধিনায়কের নাম কাদের সিদ্দিকী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বাহিনী আর অধিনায়কের নাম চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। কাদের বাহিনীর নাম শুনলে হানাদার পাকিস্তানীও তাদের সহযোগীদের বুকের পাঁজরে ত্রাসের কাঁপন জাগতো। আর কাদের সিদ্দিকী রূপকার নায়কের মতো একটি নাম, অধিকৃত বাংলাদেশ একটি অঞ্চলের মুক্তিপাগল বাঙ্গালীর কাছে যে নাম ছিল আস্থা, প্রত্যয়, সাহস, সংগ্রাম ও বিজয়ের বরাভয় আর হানাদারদের কাছে ছিল ভীতি আর বিলুপ্তির পরোয়ানা।

... .. দলগত বা বাহিনীগতভাবে ‘কাদের বাহিনী’ প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় একাত্তর সালের ২২শে মে চারানে। এই সংঘর্ষ চল্লিশ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। যুদ্ধে ১৫ জন খান সেনা নিহত হয়। আহত হয় আর বেশী। মুক্তিযোদ্ধারা কেউই হতাহত হয়নি। দুজন গ্রামবাসী শহীদ হন। এরপর থেকে চলেছে খান সেনাদের উপরে অব্যাহত আক্রমণ। খান সেনাদের অস্ত্রবাহী জাহাজের উপর হামলা চালিয়ে এক কিস্তিতেই দখল করেছে একুশ কোটি টাকার গোলাবারুদ। ২৩ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে টাঙ্গাইল থেকে কড্ডা পর্যন্ত রাস্তায় ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস করেছে তারা। একাত্তরের নভেম্বর নাগাদ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ থানা মুক্ত করেন তারা এবং অমনি কয়েকশ অপারেশন। ১২ই ডিসেম্বর মুক্ত হয় টাঙ্গাইল। মেজর জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার ও ব্রিগেডিয়ার সানত সিং-এর ভারতীয় বাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে কাদের বাহিনী অগ্রাভিযান করে ১২ই ডিসেম্বর পরবর্তী কয়েকটি দিন। ১৬ ডিসেম্বর মেজর জেনারেল নাগরার বাহিনী যখন সবার আগে ঢাকা প্রবেশ করে তখন তাঁর সাথে ছিল কাদের বাহিনী ও কাদের সিদ্দিকী।

বাঘা সিদ্দিকীর সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমি মিলিত হয়েছিলাম। আমার টেপ রেকর্ডারে তিনি একনাগাড়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা তাঁর বক্তব্য রাখেন। ২৫শে মার্চের পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বাহিনী সংগঠন থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের কথা বলেন।

কাদের সিদ্দিকী বলেন যে, কোন বাহিনী গঠনের মানসিকতা নিয়ে অন্তত প্রথম অবস্থায় তিনি যুদ্ধে নামেননি। তিনি বললেন, যখন ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া আমাদের উপর তার বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমি আগে ভাবতাম কোন কিছুর সমাধান হিংসাত্মক উপায়ে হয় না। ২৩শে মার্চ আমরা অধিকার আদায়ের শপথ নিলাম। এবং সেদিন প্রথম সবক নিলাম প্রয়োজন হলে অস্ত্রের মাধ্যমেও রাজনীতি করতে হতে পারে। ২৫শে মার্চের পর টাঙ্গাইলে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেখানে আমার কোন যোগ্যতা নেই। তার জন্যে কোন দায়িত্ব না পেলেও নিজে একজন কর্মী হিসাবে থাকার চেষ্টা করলাম। আমি আগে থেকেই জানতাম রাজনীতির মঞ্চে নেতৃত্ব আর যুদ্ধের নেতৃত্ব এক জিনিস নয়।

৩রা এপ্রিল, ১৯৭১ সাল। হানাদার পাক বাহিনী এগিয়ে এলো টাঙ্গাইলের পথে। তাদেরকে সাটিয়াচড়ায় বাধা দেয়া হয়, বললেন কাদের সিদ্দিকী। সেই যুদ্ধ প্রাক্তন ই.পি আররাই করেছিল। মাত্র ২ প্লাটুন ইপিআর সেদিন বাধা দেয় হানাদার খান সেনাদের একটি ব্যাটালিয়নকে। যুদ্ধে আমাদের হার হয়। ভাবলাম পাহাড়ে পালিয়ে চলে যাবো। কিন্তু দেশ ছেড়ে যাবো না। যা হয় দেশেই হবে।

\ শত্রুর মোকাবিলা করেই কাদের বাহিনী যুদ্ধ শিখছে \

১৯শে এপ্রিল। ময়মনসিংহের পথে রওনা হয় পাকবাহিনী। পথে কালিহাতিতে তাদের বাধা দেয়া হয়। নেতৃত্বে ছিল ইপিআর-এর। কাদের সিদ্দিকীও এদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। শত্রুপক্ষের মেজর কামালসহ বহু খান সেনা এই যুদ্ধে হতাহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা ডিফেন্স উঠিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এদিকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কাদের সিদ্দিকী। সঙ্গে রয়েছেন কয়েকজন মুক্তিপাগল যুবক। কাদের সিদ্দিকী বলছিলেন, আমার আয়ত্তে কুড়ি পঁচিশটি বন্দুক ছিল। এগুলো নিয়ে পাহাড়ে চলে গেলাম। লুকিয়ে রাখলাম। কয়েকদিন পর শুনতে পেলাম কাদের বাহিনীর মাথা কেউ এনে দিতে পারে তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। ভয় পেলাম প্রথমে। আমাদের দেশে হাজার টাকার জন্য মানুষ মানুষকে খুন করে। আমাকে তো ধরিয়েও দিতে পারে। অনেকগুলো যুবক ও তরুণ আমার সাথে গিয়েছিল। তাদের কয়েকজনকে ফিরিয়ে দিলাম। আমি তখন কিছুটা ফ্রাস্ট্রেটেড। আমি পারবো কিনা সন্দেহ ঢুকছে মনে। আমি যে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে পারবো তা তখন আমার জানা নেই। সহগামী বন্ধুদের বললাম, তোমরা চলে যাও। তোমরা এখনো দোষী সাব্যস্ত হওনি। আমি মনস্তির করলাম এমনিভাবে পালিয়ে পালিয়ে থাকবো। যদি কোনদিন সুযোগ পাই এবং একজন পাসসেনাকেও হত্যা করতে পারি তাহলে মনে সান্ত্বনা পাবো তবু তো একটাকে মারলাম।

কাদের সিদ্দিকী বললেন, কিন্তু পরে দেখলাম আমাকে জঙ্গলে কাটাতে হলো না। মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ পাগল। সংগ্রামের জন্য তাদের দারুণ আগ্রহ। লাখ টাকার বিনিময়েও তারা ধরিয়ে দিতে রাজী নয়। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেলো। বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেরা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কাদের ভাই, কোথায় ট্রেনিং হচ্ছে? আপনি কোথায় ট্রেনিং দিচ্ছেন, বলুন। বুকে অনেক ভরসা পেলাম। রিট্রুট শুরু করলাম। ৬ই মে নাগাদ আমার দলের লোকসংখ্যা দাঁড়ালো ৪০০ জন। ১৪ই মে বহেরাতৈলে পবিত্র কোরআন হতে নিয়ে আমার জওয়ানদের শপথ করলাম যতদিন বাংলাদেশ স্বাধীন না হবে, বঙ্গবন্ধু ফেরত না আসবেন, ততদিন আমাদের যেই জীবিত থাকি যুদ্ধ করবো। সেই থেকে আমাদের সুপরিকল্পিত যুদ্ধ শুরু হলো।

কাদের সিদ্দিকী বললেন, অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমি চেষ্টা করেছি আমাকে ছায়া দেয়ার মতো এবং নেতৃত্ব দেয়ার মতো কাউকে যদি পেতাম। আমরা তার লুকুম মেনে কাজ করতাম। অনেকে এসেই আমার সাথে যোগদান করেছে। প্রথমে ভেবেছি এই বোধ হয় কোন নেতা পাবো। কিন্তু পরে দেখেছি তারা আমাকে নেতৃত্ব

দেয়ার চেষ্টা করেননি বরং আমার কাছ থেকে নেতৃত্ব আদায়ের চেষ্টা করেছে। তাদের জোরেই আমি নেতা হয়েছিলাম।

কাদের সিদ্দিকী বলেন, কাদের বাহিনী নাম আমি দিইনি। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকেই প্রথম আমাদের যুদ্ধকে কাদেরিয়া মার বলে বর্ণনা করে। আমার বাহিনীর নাম দেয় কাদের বাহিনী। পরে আমার ছেলেরাও এই নাম গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুও পাকিস্তানি কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে কাদের বাহিনী নামে অভিহিত করেন। কিন্তু আমি আগেও ভাবতাম এবং আজো ভাবি স্বাধীনতার জন্যে আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমরা মুক্তিবাহিনী। মুক্তিযোদ্ধা।

৩রা জুন কাদের বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয় গোপালপুর, মধুপুর ও টাঙ্গাইল থানার সম্মিলিত পুলিশ বাহিনীর সাথে। খণ্ডযুদ্ধ হয় বইলামপুরে। হেরে পুলিশ বাহিনী পালিয়ে যায়। সাতজন পুলিশ কাদের বাহিনীর হতে গ্রেফতার হয়। ১২ই জুন হলো বল্লার যুদ্ধ। পাঁচ ঘন্টা চলে এই যুদ্ধ। কাদের সিদ্দিকীর ভাষায় জনগণের মনোবল বৃদ্ধির জন্য প্রথম পর্যায়ের এই যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের কাছে আর্বিভূত হয়েছিল। দল সংগঠনের পর খানসেনাদের সাথে এটা ছিল আমাদের প্রথম সম্মুখযুদ্ধ। আমরা ছিলাম প্রায় ১৫০জন। কিন্তু পজিশন নিয়েছিলাম কৌশলগত কারণে মাত্র ১৩ জন। সেই যুদ্ধে ১৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। আহত কত হয়েছিল বলতে পারবো না। যুদ্ধে ওরা হেরে গিয়ে পিছিয়ে গেলো। কিন্তু লাশগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা তখনো গুলি চালিয়ে একটি কভার সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। আমি তখন ভাবছি, খান সেনাদের অন্তত কয়েকটি লাশ আমাদের নিয়ে যেতেই হবে। তাহলে মানুষ বিশ্বাস করবে যে আমরাও লড়াইতে পারবো। আপ্রাণ চেষ্টা করে পাঁচটি লাশ নিয়ে এলাম। একটি লাইট মেশিন গানসহ ৯টি রাইফেলও হস্তগত করলাম। কিন্তু সেদিন মেশিনগান রাইফেলের চেয়েও বড় কাজ এসেছিল ওই লাশগুলো। ৫টি লাশ দেখার জন্য কুড়ি হাজারের মতো লোক জমায়েত হয়েছিল। এমন কোন লোক ছিল না যে লাশগুলোকে সেদিন ঘৃণাভরে লাথি মারেনি। পরে লাশগুলোকে আমরা নদীতে ভাসিয়ে দিই। এরপর জনগনের মনে এক অদ্ভুত উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল।

আগষ্ট মাসে কাদের সিদ্দিকীর হাতে গুলি লাগে। টাঙ্গাইল থেকে ১২৮ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তিন দিনে তিনি সীমান্তের ওপারে গিয়ে পৌঁছেন। ২৩শে আগষ্ট তিনি চলে যান। বাংলাদেশ আবার ফিরে আসেন ১৩ই সেপ্টেম্বর। ভারত আবস্থানকালীন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কাদের সিদ্দিকী বলেন যে, ‘ভারতীয় বাহিনী আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। আমার যদুর জ্ঞানবুদ্ধি আছে তাতে মনে করি ভারতীয় বাহিনীর লোকেরা খুব ভালো করেই অনুভব করেছে যে আমাদের স্বাধীন করা উচিত।’

কাদের বাহিনীর সংগঠনগত ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্নও আমি কদের সিদ্দিকীর কাছে রেখেছিলাম। তিনি জানান, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়ক হিসাবে ছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। প্রত্যেক ইউনিয়ন, গ্রাম এবং ওয়ার্ডে এই বাহিনী ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা জনগনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতো না। মুক্তিফৌজ কোথাও অপারেশনে গেলে বা ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান করলে তাদের খরবদারির ভার থাকতো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হাতে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও কয়েকটি দল ছিল। এগুলো হলো হেলথ কোর, যোগাযোগ দল ও যুদ্ধের দায়িত্বপ্রাপ্ত যোদ্ধাদল। এই শেষোক্ত শ্রেণীই ছিল সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী। যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন ক্ষেত্রের অভাব ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে। বিশেষ কোন ট্রেনিং দিয়ে তাদের যুদ্ধ শেখাতে হয়নি। শত্রুর মোকাবেলা করেই তারা যুদ্ধ শিখেছে। টাঙ্গাইল জেলায় কাদের বাহিনী তাদের তৎপরতা সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত করেছিল। পাঁচটি সেক্টরে জেলাটি বিভক্ত ছিল। কোম্পানীর অধিনায়ক হিসেবে কাউকে কখনো বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। একজন সিনিয়র কোম্পানী কমান্ডারের উপর তার নিজস্ব কোম্পানী ছাড়াও সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হতো।

বাহিনীর উর্ধ্বতন সদর দফতর ‘মহানন্দপুরে’ অবস্থিত ছিল। বাহিনীর একজন প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন। একাত্তর সালের জুলাই মাস থেকে বাংলাদেশে সরকারের অনুমতিক্রমে কাদের বাহিনীর জনগনের দৈনন্দিন জীবনের সকল দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্যে সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহন শুরু করেন।

কাদের বাহিনীর একটি সিকিউরিটি বা ইনটেলিজেন্স বিভাগ এবং সাথে সাথে কাউন্টার ইনটেলিজেন্স ব্যবস্থা চালু ছিল। বাহিনীর লোকজন সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করে রিপোর্ট করা ছিল এদের কাজ। মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধি ছিল কাঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কাদের বাহিনীর সিগন্যাল বা কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা ছিল অদ্ভুত। সর্বক্ষণ বিভিন্ন এলাকায় রুটিনমাসিক সিগন্যালম্যানের কাছে দ্রুত দৌড়ে গিয়ে খবর পৌঁছে দিতো। সে পৌঁছে দিতো পরের পয়েন্টে। এমনি করে করা হতো খবর এবং তা সব সময়ই (বিশেষ করে যা জরুরী গোপন আশু নির্দেশ) থাকতো লিখিত। বিভিন্ন পয়েন্টের সিগন্যালম্যানের নাম তাতে স্বাক্ষরিত থাকতো। কাদের সিদ্দিকী জানান যে, এভাবে ১০ মাইল দূরবর্তী কোন স্থান খবর পাঠাতে তাদের সময় লাগতো বড়জোর ২৫ মিনিট। নভেম্বর মাস থেকে কাদের বাহিনীর শক্তিসম্পন্ন বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে।

\ যুদ্ধে কখনো হারিনী-কিন্তু নাগপুরের কোন যুদ্ধে আমি জিতিনিঃ কাদের সিদ্দিকী \

কাদের বাহিনীর মোট লড়াইয়ের সংখ্যা তিনশরও বেশী। প্রত্যেকটি যুদ্ধ হামলা কিংবা স্যাবোটাজ অপারেশনই ছিল কোন না কোন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তবুও এর মধ্যে কয়েকটি লড়াই-এর স্মৃতি মনে দাগ কেটে রয়েছে। সে কথাই বলছিলেন কাদের সিদ্দিকী। ১১ই আগস্ট কমাণ্ডার হাবিবের নেতৃত্বে কাদের বাহিনী একটি দল ভূয়াপুরের কাছে মাটিকাটায় ধলেশ্বরীতে পাকবাহিনীর অস্ত্রবাহী জাহাজের ওপর হামলা চালাল। জাহাজটির নাম আর এস ইউ ইঞ্জিনিয়ার্স, এলসি-৩। ঢাকা থেকে রংপুরের সেনানিবাসে যাচ্ছিল ২১ কোটি টাকার অস্ত্র নিয়ে। সঙ্গে আরও কয়েকটি জাহাজ ছিল। কিন্তু কাদের বাহিনীর যোদ্ধারা সিরাজকান্দির উত্তরে মাটিকাটা চরে নদী তীরবর্তী দুটি বাড়ি থেকে স্টেনগান, এলএমজি আর মর্টার দিয়ে হামলা চালিয়েছিল সঠিক লক্ষ্যবস্তুর উপর। ঘায়েল হলো জাহাজ, কুপোকাত হলো জাহাজের অধিনায়ক আমানুল্লাহ খান, খতম হলো শতাধিক খান সেনা। কাদের বাহিনী ছিনিয়ে নিল ২১ কোটি টাকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ যার মধ্যে ছিল ১২০ এম এম ২ ইঞ্চি ও ৩ ইঞ্চি মর্টার, ৮৩ এম এম ক্যালিগার সাইজ ভারী কামান ও প্রচুর রাইফেল। এরপর পাক বাহিনী প্রচণ্ড আক্রোশে পাল্টা হামলা চালিয়েছিল। দুটো এফ-৮৬ স্যাবর জেট তাদেরকে কভার দিকে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু কিছুই হয়নি। ২১ কোটি টাকার অস্ত্র কাদের বাহিনী তাদের সদর দফতর নিয়ে চলে গেল। এই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কাদের সিদ্দিকীও মাটিকাটায় ছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে যে সব যুদ্ধ করেছেন তার মধ্যে মনে দাগ কাটবার মতো কয়েকটি যুদ্ধের কথা কাদের সিদ্দিকী বললেন। একটি যুদ্ধ হল আগস্টে ধলাপাড়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী আহত হন। ২০শে নভেম্বর আড়াই হাজার পাকসেনা অর্থাৎ পুরো একটি বিগ্রেডকে ঢাকা-টাঙ্গাইল রোড থেকে হাটিয়ে দিয়ে করটিয়া পর্যন্ত এলাকা কজায় রেখে ২৩ ঘণ্টায় ১৭টি সেতু ধ্বংস করে দেয় কাদের বাহিনী। পাক বাহিনী পাল্টা বিমান আক্রমণ চালায় কাদের সিদ্দিকী জানান, এত সামনাসামনি যুদ্ধ এর আগে আমি কোনদিন করিনি। ওরা একবার এগিয়ে আসছে, আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। আবার আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ওরা পিছু হটছে। এভাবে পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর পাক সেনারা হেরে যায়। কাদের বাহিনী পাকসেনাদের কয়েক মাইল পিছু হটিয়ে দিয়ে আসে।

কাদের সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ-সমৃদ্ধ যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে ধকল গেছে নাগপুরের যুদ্ধে। কাদের সিদ্দিকী আমাকে বললেন, আমার জন্য টাঙ্গাইল জেলায় একটি দুর্ভাগ্যজনক থানা ছিল নাগরপুর। আমি

জীবনে কোন যুদ্ধেই হারিনি। কিন্তু নাগরপুর থানায় কোন যুদ্ধেই জিতিনি। ১৭ই অক্টোবর আমি নাগরপুর অভিযান করেছিলাম। সেদিন আমার মারা যাওয়ার মতো অবস্থা। কোন রকমে বেঁচে যাই। তারপরও আমি অভিযান চালাই। সেখানেও আমি হেরে যাই। ৩০শে নভেম্বর বেলা প্রায় সাড়ে ১২টায় নাগরপুর থানা দফতরের উপর হামলা করি। আমাদের মনে ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। নাগরপুর থানায় ৬৫জন সৈন্য রয়েছে-তাও মিলিশিয়া। আর আমাদের হল ২৫০ জন যোদ্ধা। ভাবলাম, আজ হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে খানায় উঠবো। কিন্তু পারলাম না। ২টা তিন ইঞ্চি মর্টার, ২টা আড়াই ইঞ্চি মর্টার, ৭/৮টি ২ইঞ্চি মর্টার, ৪টা গ্রেনেড নিষ্ক্ষেপকারী রাইফেল আমাদের সাথে। এ ছাড়া রয়েছে ১৯টি লাইট মেশিনগান। জীবনে এত এলএমজি আর কোথাও ব্যবহার করিনি। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছাড়া কোন সিংগলশট অস্ত্রও আমরা ব্যবহার করিনি। কিন্তু থানাটির অবস্থান ছিল ভারী বিদঘুটে। সম্মুখে ফাঁকা জায়গা। কবার নেয়ার মতো কোন স্থান নেই। ফলে এগোনো যায় না। আর শত্রুরা মরিচা থেকে ফায়ার করছে। আমি ১৫৮ রাউণ্ড ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলাবর্ষণ করি। কিন্তু একটি গোলাও থানার ওপরে ফেলতে পারলাম না। আমি এমন ব্যর্থ আর কোথাও হয়নি। একশ গজ দূর থেকে ৫৪ রাইও দুই ইঞ্চি মর্টারের ফায়ারও করেছি। কিন্তু একটাও লক্ষ্যস্থলে পড়েনি। ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত হামলা চালালাম। কিন্তু পাক সেনাদের মরিচা থেকে ডিবপার্জ করতে পারলাম না। এত প্রস্তুতির পরও সবচেয়ে বেশি ধকল আমার এখানে গেছে। আসল চাইনিজ ৮৩ রেডিওসাইড কিন্তু তার ফ্লাশ প্রোটেক্ট করার জন্য যে কভার থাকে তা নেই। রাউণ্ড ভরলাম ফায়ার করলাম। থানায় শত্রুদের একটা মরিচা ছিটকে উড়ে গেল। কিন্তু আমাকেও ধাক্কা মেরে হাত তিনেক পেছনে ফেলে দিল। আমার মাথার টুপি উড়িয়ে নিয়ে ফেলল প্রায় পনের হাত পেছনে।

৩রা ডিসেম্বর পাক বাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট কন্টিনজেন্ট এগিয়ে এলো ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল। কাদের সিদ্দিকী এগিয়ে গেলেন এলাসিন গুদারা ঘাটে পাক বাহিনীকে বাধা দিতে। কিন্তু সময়ের সামান্য হেরফের তিনি গুদারা ঘাটের ওপারে পাক বাহিনীকে বাধা দিতে পারলেন না। পাক বাহিনী এপারে চলে এলো। কাদের বাহিনী সুবিধামত পজিশন নিতে পারলেন না। কাদের সিদ্দিকী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। আবার সবকিছু ঐ এলাকায় সুসংগঠিত হয়ে গেল। ৩রা ডিসেম্বর মধ্য রাতে কাদের সিদ্দিকী ছিলেন কেদারপুরে। শেষ রাতে গোলা আর বোমাবর্ষণের শব্দ শুনতে পেলেন। খানিক পরই মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল বিমান। সঙ্গীদের বললেন কাদের সিদ্দিকী, কাল থেকে নতুন সুখবর হবে। সঙ্গীরা এ কথার অর্থ জানতে চাইলেন। কাদের সিদ্দিকী বললেন, এই যে দেখলে না আমাদের বিমান শত্রুদের উপর আক্রমণ হেনে চলে গেলো। এরকম আঘাত হানলেই কাজ হবে। বাদবাকি আমরা পারব। পরের দিন কাদের সিদ্দিকী নবতর পরিস্থিতিতে সবাইকে সংগঠিত করলেন।

কাদের সিদ্দিকী নতুন পরিকল্পনা নিলেন ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কে যে সেতুগুলো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে তার নিচু দিয়ে যে রাস্তা হয়েছে তাতেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে। সেখানে এন্টি ট্যাংক মাইন বসানো হবে এবং এই মাইন প্রতিরক্ষার জন্য এর চারপাশে বসানো হবে একাধিক এন্টি পারসোনেল মাইন। প্রতি রাতে এই মাইন বসানোর নির্দেশ দেয়া হল। কাদের বাহিনীর যোদ্ধারা জালের মতো মাইন বিছিয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে কাদের সিদ্দিকী আরেকটি পরিকল্পনা নিলেন, আগামী দুই দিনের মধ্যে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের সেতুগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তারপর টাঙ্গাইল দখল করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০শে নভেম্বর টাঙ্গাইল দখলের পরিকল্পনা কাদের সিদ্দিকী ছিল। ঢাকা-টাঙ্গাইল এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের সড়কের সেতুগুলো একযোগে ভেঙ্গে ফেলা হবে- মধুপুর থেকে শুরু করে ৯টা সেতু ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওপাশের দায়িত্ব যারা ছিলেন তারা আর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে হাত দিতে পারেনি।

যাহোক, এবার কাদের সিদ্দিকী সেতু ভাঙ্গার জন্যে নতুন করে পরিকল্পনা নিলেন। তিনি ভাবলেন, ঢাকায় এখন শত্রুদের ওপর বিমান আঘাত হানা হবে; সীমান্ত ছেড়ে পাকবাহিনী আসবে না এবং এই সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেতু ভেঙ্গে পাকবাহিনী যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করে টাঙ্গাইল তিনি দখল করবেন।

ডিসেম্বর কাদের সিদ্দিকী মার্চ শুরু করলেন। তখন কামালপুরে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে পাকবাহিনীর যুদ্ধ চলছে। কাদের সিদ্দিকী স্থির করলেন তিনি মধুপুর দখল করে পুংলী সেতু পর্যন্ত আসবেন।

কাদের সিদ্দিকী বললেন, ৭ই ডিসেম্বর আমি নিকরাইল থেকে কোথায় কি করা হবে তার পরিকল্পনা করলাম। স্থির করলাম আমার ৫হাজার যোদ্ধাকে নিয়ে এবারকার পরবর্তী পর্যায়ের অপারেশন চালাবো। আর সব যোদ্ধা থাকবে ডিফেন্সে এবং এই ৫হাজার করবে অ্যাকশন। এর আগে ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃত দিয়েছে। ৭ই ডিসেম্বর আমি নিকরাইলে জনসভা করলাম। কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার লোক হল। সভায় জনগণকে বললাম, আপনাদের সাথে আর দেখা হবে কিনা জানি না। বাংলাদেশ আজ স্বীকৃতি পেয়েছে। কাদের সিদ্দিকী বললেন, ৭ই ডিসেম্বর রাতে সম্মিলিত বাহিনীতে ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সানত সিং আমাকে অয়ারলেসে যোগাযোগ করে জানালেন, আমরা জামালপুর পর্যন্ত এসে গেছি, ব্রহ্মপুত্র নদী আমরা পার হতে পারছি না। আপনি জামালপুরের দক্ষিণ দিক থেকে পাকবাহিনীর উপর হামলা করুন আর আমরা উত্তর দিকে থেকে হামলা করছি। আমি তাই জামালপুর রওয়ানা হলাম। কিন্তু ধনবাড়ী পর্যন্ত গিয়ে মত পরিবর্তন করলাম। আমি ঘুরে পথ পরিবর্তন করলাম। ৯ই ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার সানত সিংকে অয়ারলেসে জানালামঃ আমি আপনার প্রস্তাবে মানতে পারলাম না। কিন্তু ঢাকা থেকে পাকবাহিনী যেন ফোর্স পাঠাতে না পারে আমি সেই চেষ্টা করছি। আমি কথা দিলাম, পাক বাহিনীর একটি সৈন্যও যদি এই পথে এইদিকে আসতে পারে তবে আমি আইনত দণ্ড নেবো। আপনি আমাদের একটু উপকার করুন- গোপালপুরে আমাদের একটু এয়ার কভার দিন।

কাদের সিদ্দিকী বললেন, তাঁরা আমাদের কথায় রাজী হলেন। ১০ই ডিসেম্বর সকাল বেলা আমরা ঘাটাইল থানার হামলা করলাম। বিকেল সাড়ে চারটায় থানা ঘাঁটির উপর হামলা করলাম। সেদিনই ঘাটাইলের পতন হলো। এদিকে সকাল ১০টা-১১টায় গোপালপুরে এয়ার কভার দেওয়ার কথা, আমার বাহিনীর যোদ্ধারা সেখানে অপেক্ষা করছে। কিন্তু বিমানের দেখা নেই। আমাদের কোন কনফার্মও করেনি। আমার ছেলেরা গোপালপুর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে কজা করে নিতে পারে। কিন্তু তারা বিমান হামলার জন্য অপেক্ষা করছে। পরে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে আমার ছেলেরা শত্রুরা ঘাঁটির উপর আক্রমণ করলো। পতন হলো গোপালপুরের।

বলছিলেন কাদের সিদ্দিকীঃ এদিকে জামালপুরে আর আমাদের সাহায্যের দরকার হয়নি সম্মিলিত বাহিনীর। জামালপুরে শত্রু অবস্থানের উপর সম্মিলিত বাহিনীর বিমান এক হাজার পাউণ্ডের দুটি বোমাবর্ষণ করে। এতে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে শত্রুদের প্রায় ৩৮টি মরিচা ধসে একেবারে পুকুরের মতো হয়ে যায়। এরপর পাকবাহিনী পালাতে শুরু করে। এদিকে রাস্তাটি এলাঙ্গা পর্যন্ত আমাদের দখলে এসেছে। টাঙ্গাইলে পাকবাহিনীর রয়েছে। পলাতক পাকবাহিনীর কনভয়ের উপর সম্মিলিত বাহিনীর বিমান স্ট্রাফিং করে গেল। ১১ ডিসেম্বর ভোর বেলায় আমরা পরিকল্পনা নিলাম আজ টাঙ্গাইল দখল করতেই হবে। কমাণ্ডার হাবিবের নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে পাঠানো হলো ময়মনসিংহ থেকে পাকবাহিনী আগমনকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য। আগের রাতেই খবর পেয়েছি পাকবাহিনীর কনভয় যেতে পারছেন। টাঙ্গাইল-ঢাকা রোডে পাতা আমাদের মাইনের জালের ফাঁদে তারা আটকা পড়েছে। প্রত্যেকটি সেতুর নিচের ডাইভারসন রোডে রয়েছে মাইন। ভাতকুড়া ব্রীজের নীচে একটি মাইনের ঘায়েই পড়ে গেলো এগারোটি গাড়ি। রোড ক্লিয়ার নেই। টাঙ্গাইল থেকে ভাতকুড়া হয়ে কালিহাতি পর্যন্ত লাইনআপ হয়ে রয়েছে শত্রুদের কনভয়ের গাড়ী। কালিহাতি থানা আমাদের ছেলেদের দখলে। আমরা এগিয়ে এলাম। আমি ১১ই ডিসেম্বর আবার সম্মিলিত বাহিনীর বিমানকে টাঙ্গাইল থেকে এলাঙ্গা পর্যন্ত বিমান হামলা ও এয়ার কভারের কথা বলেছি। তারা জানিয়েছেন, দিচ্ছেন। এদিকে কমাণ্ডার সবুরকে রেকি পার্টি নিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা এগিয়ে গেছে। ভয় হলো বিমান হামলা না আবার ভুলে তার উপর হয়। আল্লাহর রহমত, এলাঙ্গা থেকে অল্প একটু এ পাশে সবুর হল্ট হরেছে। হল্ট এ জন্য করেছে যে ওপাশে পাকবাহিনী রয়েছে এক ব্যাটালিয়ন। আটকা পড়েছে। সবুরকে নির্দেশ দিলাম একটু পিছিয়ে আসার জন্য। এর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিমান হামলা হলো। সে কি মার! পাকবাহিনীর সেখানে পালিয়েছে সেখানেই তার ওপর হামলা। শত্রুরা দিশেহারা

হয়ে পড়লো। আমরা ডবল মার্চ করে এগিয়ে গেলাম। আমাদের দেখে পাকবাহিনীর সেকি দৌড়। পাকবাহিনী যে এমন দৌড়াতে পারে তা না দেখলে বোঝা সম্ভব নয়। আমরা তাদের দিকে দ্রুতপন্থ করলাম না। ধরাতো ওরা পড়বেই। আমাদের বাহিনী সড়ক ধরে এগিয়ে চললো। আমাদের বাহিনীর তারপর পুংলী ব্রীজে পৌঁছলো। সে সময় ওখানে ভারতীয় বাহিনীর ছাত্রীসৈন্য নামল। অনেক এলাকা জুড়ে তারা নামলো। একটু পরে খবর আসলো ভারতীয় বাহিনী এসে পড়েছে। আমি ভাবতে পারিনি এত তারাতাড়ি তারা আসতে পারবে। আমকে তারা জিজ্ঞাসা করলেন টাঙ্গাইলের খবর কি? আমি বললাম, টাঙ্গাইলের দায়িত্ব তো আমার। একটু সবুর করুন। খানিক পর খবর দিচ্ছি। পাকবাহিনীর ফেলে আসা বাসে উঠলাম। এসে দেখি গোলাগুলি চলছে শহরে। পাকবাহিনীর তিনশ সৈন্য রয়েছে শহরে। আমার বাহিনীর যোদ্ধাদের সঙ্গে পাল্পা গুলি বিনিময় হচ্ছে। কিন্তু আত্মসমর্পণ করছে না। বলছে যে, হয় ভারতীয় বাহিনী, নাযতো কাদের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। আমি গিয়ে আহবান জানালাম আত্মসমর্পণের জন্যে। পাকবাহিনীর কমান্ডার এসে আত্মসমর্পণ করে বললোম ‘যো আপ করে।’ ভারতীয় বাহিনীর কাছে খবর গেল, এবার আসতে পারেন। টাঙ্গাইল ক্রিয়ার। অবশ্য টাঙ্গাইল সকালেই ক্রিয়ার হয়েছিল। আমার শুধু অন্য সব দায়িত্ব আটক থাকায় আসতে দেরি হয়েছিল। ভারতীয় বাহিনী টাঙ্গাইল এলো। গোড়াই পর্যন্ত আমি অপারেশন প্লান করে দিয়েছিলাম। খবর পেলাম গোড়াই পর্যন্ত সব ক্রিয়ার।

\\ আমার পরিচয় পেয়ে নিয়াজী তড়াক করে দাঁড়িয়ে আমাকে স্যালুট করলো \\

১২ই ডিসেম্বর। গোরাই গিয়ে অবস্থান নিল ভারতীয় বাহিনী। কাদের সিদ্দিকী তার বাহিনীকে ১২ ও ১৩ই ডিসেম্বর বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। ১৪ ডিসেম্বর তিনি টাঙ্গাইলে জনসভা করলেন। সেই জনসভায় বললেন ভাইসব, এই বোধ হয় শেষ দেখা। আর দেখা নাও হতে পারে। এই যে আপনাদের সাথে মিলিত হতে পারলাম এটাই আমার শান্তি। কাদের সিদ্দিকী আমাকে এ প্রসঙ্গে বললেন, ঢাকা যে এত সকালে মুক্ত হবে তখনো তা ভাবিনি। আমি মনে করেছিলাম অন্তত আরো একমাস যুদ্ধ হবে। কাদের সিদ্দিকী ঢাকা অভিযানের জন্য নিজের বাহিনী থেকে আড়াই হাজার যোদ্ধা বাছাই করলেন। শুরু হলো ঢাকা অভিযানে। স্থির হলো দুটি পথে সম্মিলিত বাহিনী ঢাকার দিকে এগিয়ে যাবে-১। সাভার হয়ে এবং ২। টঙ্গী হয়ে।

১৫ই ডিসেম্বর সকালে পাকবাহিনী সম্মিলিত বাহিনীর অগ্রাভিযান রোধ করার জন্য কড্ডার সেতু ভেঙ্গে দেয়। এসব ঘটনার কথা বলছিলেন কাদের সিদ্দিকী, ‘সকালে ওরা ব্রিজ উড়িয়ে দিল। সম্মিলিত বাহিনীতে ভারতীয় বাহিনীর মেজর জেনারেল নাগরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়া সিদ্দিকী! কেয়া হো গোয়া! আমি বললাম, কি আর হবে। পাক বাহিনী ব্রিজ ভেঙ্গে দিল। পাকবাহিনীর কাণ্ড দেখে আমার তখন খুব হাসি পাচ্ছিল। ভাবছিলাম, পাক মিলিটারি তাদের রোধ করার জন্য ব্রিজ ভেঙ্গে ফেলি। মেজর জেনারেল নাগরাকে বললাম, আজ আভি অর নেহী যায়েগা। জেনারেল নাগরা বললেন, কিউ সিদ্দিকী কিউ? আমি বললাম, হাম প্লান বানায়েঙ্গে। রাতের বেলা পরিকল্পনা তৈরি করলাম। একদল ডানদিকে আর এক দল বাম দিকে রাতের আরছায়ার নদী পার হলো স্থানীয় লোকজনের সহায়তায়। আমাদের ১০০ জন করে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনীর একটি করে ব্যাটালিয়ান। পাক বাহিনী তখনো নিশ্চিন্তে রয়েছে। ভেবেছে, আমরা তো নদী পার হতে পারবোই না। আল্লাহর কি রহমত, সম্মিলিত বাহিনী নদী পার হয়েই শত্রুদের দুজনকে মেরে ফেললো। ব্রিজ ভেঙ্গে যারা খেতে বসেছিল তাদের পাকড়াও করলো।’

১৫ই ডিসেম্বর সকালে সম্মিলিত বাহিনীর আরেকটি দল এগিয়ে গিয়েছিল সাভারের পথে। এখন যেখানে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প সেখানে যুদ্ধ হয়। তারপর আর কোন যুদ্ধ হয়নি। এই বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর সকালে মিরপুর থেকে সাভার অভিমুখী সড়ক সেখানে প্রস্থে দ্বিগুণ হয়ে অর্থাৎ ডবল রোড হিসেবে শুরু হয়েছে সেখানে এসে অবস্থান নিল। আর এদিকে টঙ্গী অভিমুখী বাহিনী ১৬ ই ডিসেম্বর বোট বাজারে এসে পৌঁছলো।

১৬ই ডিসেম্বর সকালে মেজর জেনারেল নাগরা ও কাদের সিদ্দিকী একটি হেলিকপ্টারে এসে সাভারগামী সড়কে মিরপুর ব্রিজের পরবর্তী ব্রিজের কাছে নামলেন। সঙ্গে রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার। বলছিলেন কাদের সিদ্দিকীঃ ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার টঙ্গী অভিমুখে এগিয়ে যাওয়া বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছিলেন। সাভারগামী বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছিলেন ব্রিগেডিয়ার সানত সিং। হেলিকপ্টার থেকে নেমে মেজর জেনারেল নাগরা জেনারেল নিয়াজীর কাছে একটি চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি নিয়াজীকে লিখলেন, আমি অমুক জায়গায় রয়েছি। তুমি আত্মসমর্পণ করবে কিনা জানাও এবং উত্তর দাও। ভারতীয় বাহিনীর একজন মেজরকে বাহক করে চিঠি পাঠানো হলো। তার সাথে রয়েছে ভারতীয় বাহিনীর তিনজন জওয়ান ও পথ চেনাবার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা। দু'টি জীপ তাদের নিয়ে চলে গেলো। জীপের সম্মুখে সাদা পতাকা। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। নিয়াজী চিঠি পেয়ে জানাল যে, সে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোন লিখিত ভাষ্য সে দিল না। পাকবাহিনীর মেজর জেনারেল জামশেদকে পাঠিয়ে দিল। জামশেদ এসে মেজর জেনারেল নাগরাকে স্যাঁলুট করলো। তখন নাগরা বললেন, ‘শুনো সিদ্দিকী, হামকো স্যাঁলুট করোগা তো হাম লেগা আউর তুম লেগা। হামলোগ দো এক সাথে আয়া হ্যায়।’ জামশেদ এসে তার নিজের রিভলভার ও মাথার ফোঁজি টুপি তুলে দিল সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে। রিভলভারটি গ্রহণ করলে মেজর জেনারেল নাগরা এবং টুপি তুলে দিল আমার হাতে। জেনারেল নাগরা তখন আমকে বললেন, আরে সিদ্দিকী, ক্যামেরাম্যান হ্যায়? ইয়েতো হিস্ত্রি বন যায়েগা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে সময়ে কোন ক্যামেরাম্যান সেখানে ছিল না। মেজর জেনারেল জামশেদ যখন আত্মসমর্পণ করলো, তখন সকাল দশটা।

কাদের সিদ্দিকী বললেন, ‘আমরা ঠিক করলাম যে, জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। মিরপুর ব্রিজের এপারে এলাম জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার, ব্রিগেডিয়ার সানত সিং ও আমি। এলাম পাক বাহিনীর গাড়ীতে চেপে। রাস্তায় প্রহররাত পাক বাহিনী আমাদের স্যাঁলুট ঠুকছে। আমাদের বাহিনী পড়ে রইলো পেছনে। এপারে এসে এক জায়গায় টেলিফোন করতে গিয়ে দেখি কোন শব্দ নেই। টেলিফোন ডেড। লাইন কাট আপ। এলাম মোহাম্মদপুর। নিয়াজীকে টেলিফোন করা হলো কিন্তু সাড়া নেই রিং হচ্ছে না। তখন জেনারেল নাগরা বললেন, উন লোক চালাকি কিয়া। যেধার যাতাহ ওধারই লাইগ নেহী হ্যায়। তখন সকাল প্রায় সোয়া দশটা পেরিয়েছে। জেনারেল নাগরা তখন ভাবছেন যে আমরা ক্যান্টনমেন্টে যাবো কি যাবো না। যাওয়াটা কি ঠিক হবে। আমি বললাম, যখন এসেই পরেছি তখন যাবোই। তারপর দশটা চল্লিশ মিনিটে আমরা ক্যান্টনমেন্ট নিয়াজীর দফতরে পৌঁছলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। নিয়াজী এসে স্যাঁলুট করলো। নাগরা স্যাঁলুটের জবাব দিলেন। নাগরা বসলেন। নিয়াজী বসলো। নাগরা তখন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, ইয়ে হা ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার, ইয়ে হ্যায় ব্রিগেডিয়ার সানত সিং, আউর ইয়ে হ্যায় বাংলাদেশ বাহিনীর কাদের সিদ্দিকী। নিয়াজী তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্যাঁলুট করলো এবং করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি তখনো বসে রয়েছি। ইতস্তত করছি, আর ভাবছি নিয়াজীর সাথে হ্যাণ্ডসেক করবো কিনা। নিয়াজী তখনো হাত বাড়িয়ে রয়েছে। জেনারেল নাগরা বললেন, কেয়া হুয়া সিদ্দিকী, হাত মিলাও। তুমকে নিয়াজীকে সাথে নেহী-এক ইনসানকে সাথ হাত মিলাতা হ্যায়। মিলাও।

কাদের বাহিনী সম্পর্কিত আরো বিবরণ-৩*

১৪ই মে বহেরাতৈল গ্রামে মুক্তিবাহিনীর শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের পর কয়েজন প্রতিভাবান দেশভক্ত ছাত্র কাদের সিদ্দিকী সাথে এসে যোগ দিলেন এবং দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে জীবন করার শপথ নিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল আলম শহীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র নুরুলবী, টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি

* কাদের বাহিনীর বিভিন্ন সাংগঠনিক দিক সম্পর্কে এ বিবরণ গৃহীত হয়েছে মোহাম্মদ মোদাবেবর ও শিরিন প্রেস, ঢাকা প্রকাশিত মুক্তি সংগ্রামে বাঘা সিদ্দিকী (১৬ ডিসেম্বর ৭৩) গ্রন্থ থেকে। কাদের বাহিনী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

এনায়েত করিম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম। রঞ্জু, মুসা ও ফজলু নামক তিনজন ছাত্রও এই সময় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। অছাত্রদের মধ্যে সামরিক বাহিনী থেকে দলত্যাগী ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান এবং লোকমান, গফুর, লাবিবুর বহমান, লাল্টু ও সরওয়ার মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করে। লাবিবুর রহমান পরে এক সম্মুখ সংঘর্ষে শাহাদাৎ বরণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে চারান সংঘর্ষ সাফল্যের পর দেশবাসির মনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আমাদের জয় যে সুনিশ্চিত, এ কথা দেশের তরুণদের মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি করলো। তাই দলে দলে তরুণ, যুবক ও ছাত্ররা কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য পাহাড় এলাকায় মুক্তিবাহিনী ঘাঁটির তল্লাসে বেরিয়ে পড়লো। যথারীতি পরীক্ষার পর তাদের মুক্তি বাহিনীতে ভর্তি করা হলো।.....

মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরসহ মুক্ত এলাকা ছিল উত্তরে মধুপুর ময়মনসিংহ সড়কের দক্ষিণ থেকে কালিয়াকৈর-এর উত্তর পর্যন্ত ৫০ মাইল জঙ্গল এলাকা, পূর্বে ভালুকা, গফরগাঁও ও শ্রীপুর। পশ্চিমে টাঙ্গাইল মধুপুর সড়ক ৩০ মাইল। অথ্যাৎ এই ১৫০০ বর্গমাইল এলাকা কাদেরিয়া বাহিনীর করায়ত্ত নিরাপদ ছিল। এই অঞ্চল রক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হবে, সে জন্য এই এলাকে এক শক্তিশালী বৃত্তাকারে প্রতিষ্ঠিত রক্ষাব্যূহে দ্বারা পরিবেষ্টিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অধিনায়ক সিদ্দিকী বিচক্ষণ সেনানায়কের ন্যায় নিম্নলিখিতভাবে ঘাঁটি পত্তন করলেন এক একজন দক্ষ নায়কের অধীনেঃ-

- ১। বহেরা ৪নং কোম্পানী। অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান, সহকারী গোলাম মোস্তফা।
- ২। মরিচা- ২নং কোম্পানী। কমাণ্ডার নবী নেওয়াজ খান।
- ৩। দেওয়াপাড়া ১ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার লোকমান হোসেন।
- ৪। রাঙ্গামাটি ১ নং (কো) কোম্পানী। কমাণ্ডার আবদুল হাকিম।
- ৫। আসিম ১১ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার লালু, সহকারী সারোয়ার হোসেন।
- ৬। রাঙ্গামাটি ১২ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার। মুনির হোসেন।
- ৭। ভালুকা- শ্রীপুর ৬ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার আফসারউদ্দিন আহম্মদ।
- ৮। হতেয়া ১২ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার হাবিবুর রহমান, সহকারী ইউনুস আলী।
- ৯। পাথরঘাটা ৩ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার মোকাদ্দেস আলী খান। সহকারী মতিউর রহমান।

সঙ্গে সঙ্গে আর আরেকটি মুক্তাঞ্চল গড়ে ওঠে টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ সড়কের পশ্চিম দিক থেকে যমুনার পার পর্যন্ত বিরাট চরভর এলাকা, উত্তরে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট থেকে দক্ষিণে নাগরপুর পর্যন্ত ধলেশ্বরী যমুনার চর। অঞ্চল মিলে গড়ে ওঠে এই মুক্ত এলাকা। এই অঞ্চলের আঞ্চলিক সদর হল ভুয়াপুর থানায়।

এই নতুন মুক্তাঞ্চলের জন্য নিম্নরূপে তিন কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা স্থায়ীভাবে মোতায়েন করা হয়।

- ১ নং (খ) কোম্পানী-নায়ক- আবদুল গফুর।
- ১ নং (গ) কোম্পানী-নায়ক-খুরশিদ আলম।

বাঘা কোম্পানী নায়ক হাবিবুর রহমান। এই বাঘা কোম্পানীর উপর বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয় নদী পথ পাহারা দেওয়ার। ছোট ছোট টাপুরে নৌকা সব সময়ে প্রস্তুত রাখা হত নদীতে টহল দেওয়া ও দুশমনের লঞ্চ ও গানবোট এ্যামবুশ করার জন্য।

এ সব কোম্পানী ছাড়া রেজাউল কোম্পানী, হুমায়ন কোম্পানী, বেনু কোম্পানী, আমানুল্লাহ কোম্পানী প্রভৃতি ছোট ছোট মুক্তিসেনা দল এই অঞ্চলে অভিযান চালাতো।

‘৭১ সালের ৭ই জুলাইয়ের মধ্যে মুক্তাঞ্চলের চারিদিকে এই দুর্ভেদ্য ঘাঁটি স্থাপন শেষ হলো। বাঘা সিদ্দিকী প্রতিদিন এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে ঘুরে ঘুরে বীর সৈনিকদের নিয়ম শৃঙ্খলা ও কর্তব্য নিষ্ঠা পরীক্ষা করে ফিরতে লাগলেন। তার সঙ্গে রাখলেন ৩০/৩৫ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। এঁরা রণকৌশল অতি নিপুণভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। যখনই কোন অঞ্চলে যুদ্ধ লেগেছে, এই দল উদ্ধার মতো ছুটে গিয়েছে এবং যুদ্ধরত স্থানীয় সেনাদের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। সেজন্য বাঘা সিদ্দিকী এই দলটিকে বলা হতো ফাইটিং প্লাটুন বা লড়ুয়ে দল।

গ্রেনেড পার্টি বা সুসাইড স্কোয়াড : মুক্তিযুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করে গ্রেনেড বা হাতবোমা নিক্ষেপকারীর দল। এরা হানাদার সেনাদের আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কদেরিয়া বাহিনীতে এই রকম গ্রেনেড নিক্ষেপকারীদের শক্তিশালী দল গড়ে তোলা হয়। এদের বলা হত সুসাইড স্কোয়াড যাকে যুদ্ধের পরিভাষায় বলা হয় জানবাজ। জীবনকে বাজি রেখে এরা জীবনের সন্ধান দেয়। এই শাখায় যারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বাকু সালাহউদ্দিন (শহীদ), আবুল কালাম ও মিনুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সদর দফতর : মুক্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার বা সদর দফতরের অবস্থান ও কার্যপ্রণালী বিবৃত করা প্রয়োজন। শালগজারী আবৃত গভীর জঙ্গলের মধ্যে এই সদর দফতর স্থাপন করা হয়। এই দফতরটির পাঁচটি বিভাগ, যথা- (১) অস্ত্রাগার (২) বেসামরিক দফতর (৩) বেতার যোগাযোগ ও টেলিফোন (৪) হাসপাতাল ও (৫) জেলখানা। সদর দফতরের আবাসিক অধিনায়ক হলেন আনোয়ারুল আলম শহীদ। অস্ত্রাগার বেতার যোগাযোগ ও টেলিফোন দফতরটি কড়া প্রহরাধীনে রাখা হয়। এগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠোর। স্বয়ং অধিনায়ক সিদ্দিকীর অনুমোদন ব্যতীত অন্য কারো এই দফতরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক মাইল এলাকা জুড়ে এই সব দফতর স্থাপন করা হয়। প্রত্যেকটি বিভাগই টেলিফোন দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করা হয়।

সদর দফতরের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ট্রেনিং ক্যাম্প বা শিক্ষা শিবির ও ট্রানজিট ক্যাম্প। ট্রেনিং ক্যাম্পটি খোলা হয় সখীপুর থেকে দুই মাইল উত্তরে আন্দী নামক স্থানে। এই স্থানটিও ছিল গভীর জঙ্গলের মধ্যে। তিন একর পরিমাণ জমির উপর টিনের ছাপড়া ঘর তুলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। জঙ্গল গাছপালার ডালপাতা টিনের ছাদের উপর স্বাভাবিক আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছিল। ফলে পৃথক ছদ্মাবরণের প্রয়োজন হয়নি। দূশমনের বিমান কখনো এই অঞ্চলের সন্ধান পায়নি। শিবির এলাকায় কূপ খনন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। সর্বাধিক সিদ্দিকীর অনুপস্থিতিতে রিক্রুটিং অফিসার খোরশেদ আলম নতুন লোক ভর্তি করতেন। রেশন সরবরাহের দায়িত্ব তাঁর উপর দেওয়া হয়। সদর দফতরের পাঁচ বর্গমাইল এলাকা বাঘা সিদ্দিকীর নির্দেশে সংরক্ষিত এলাকা বলে গণ্য হতো।

বেসামরিক দফতর : এই দফতরের অধিনায়ক আনোয়ারুল আলম শহীদ তাঁর দফতর স্থাপন করেন মহানন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন। সংরক্ষিত এলাকার বাইরে এই দফতর স্থাপন করার কারণ হলো, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের রক্ষা করা। এটাই এদের অন্যতম কর্তব্য। সংরক্ষিত এলাকায় থেকে এটা সম্ভব নয়। শহীদ সাহেব তার দফতরের কাজ ভাগ করে কয়েকজনের উপর ন্যস্ত করেন। অর্থ ও হিসাব বিভাগের ভার পেলেন আনোয়ার হোসেন। ইনি বেঙ্গল রেজিমেন্টের নন কমিশনড অফিসার ছিলেন। হিসেব সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী এই হোসেন সাহেব অতি দক্ষতার সঙ্গে অর্থ সংরক্ষণ ও ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের জন্য সাহায্য ও দালালদের জরিমানার মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া যেত তার সবটাই প্রথমে সদর দফতরে পাঠানো হতো। বাঘা সিদ্দিকীর অনুমোদনক্রমে এই অর্থই পরে বিভিন্ন

কোম্পানীর জন্য বরাদ্দ করা হতো। শাসন বিভাগের অন্যান্য কাজের জন্যও এই অর্থ বরাদ্দ দেয়া হতো। দখল আমলের নয় মাসে যে অর্থ আয় হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজে ব্যয় হয়েছে তার প্রতিটি কর্পদকের হিসেব নিখুঁতভাবে রক্ষা করায় মুজিবনগরে তাঁর কাজ প্রশংসিত হয়েছে। আনোয়ারুল আলম শহীদ মুজিবনগরের বাংলাদেশ সরকারের নিকট যখন আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব দাখিল করেন তখন তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী বিশ্বম্ভাবিষ্ট হয়ে বলেছিলেন, তোমাদের এই কাজে আমি মুগ্ধ হয়েছি। একদিকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, অপরদিকে পাই পয়সার হিসেব রাখা অসম্ভব ব্যাপার। তোমরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছো।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীঃ সদর দফতরে এই বাহিনীর বিভাগীয় অধিকর্তা নিযুক্ত হন প্রাক্তন ছাত্রনেতা সোহরাব আলী খান আরজু। একে সহায়তা করেন দাউদ খান, আলী হোসেন, আবদুল লতিফ ও অধ্যাপক আতোয়ার কাজী।

খাদ্য দফতরঃ খাদ্য দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয় পাহাড়িয়া অঞ্চলের ছেলে করটিয়া সাদত কলেজের ছাত্র ওসমান গনির উপর। সদর দফতরের সকলের খাদ্য সরবরাহ করতেন ইনি। মুক্তিবাহিনীর খাদ্যসামগ্রী পূর্বাঞ্চলীয় মুক্ত এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হতো এবং তা গনির ভাণ্ডারে জমা থাকত। গনির বড় ভাই আলী এই খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেছেন।

ইনটেলিজেন্স বিভাগঃ এই বিভাগ এক কথায় গোয়েন্দা বিভাগ বলা যায়। নুরুল্লাহী ও হামিদুল হকের উপর এই অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কাজ দেওয়া হয়। এই বিভাগের কাজ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (১) দুশমনের সম্পর্কে তথ্য, পাকবাহিনীর গতিবিধি ও তাদের শক্তি, অবস্থান এবং বাঙ্গালী রাজাকার প্রভৃতি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সংবাদ সংগ্রহ। (২) মুক্তিবাহিনীর কেউ কোন অন্যায় কাজ করে কিনা, দলীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এমন কোন কাজ করে কিনা, অধিনায়কের নির্দেশ অমান্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিনা, সে সবের বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করা।

নুরুল্লাহী ও হামিদুল হক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই বিভাগে বাছাই করে লোক ভর্তি করেন। অচিরে এটি একটি শক্তিশালী বিভাগরূপে গড়ে ওঠে। অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রত্যেক কোম্পানীতে একজন করে গোয়েন্দা নিয়োগ করা হয়। যেমন ৪ নং কোম্পানীতে গোয়েন্দা অফিসার হিসেবে ঢুকে পড়লেন জনাব নজরুল ইসলাম। তিনি পূর্বে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।

শত্রুক্ষবলিত এলাকায় একটু বেশি বয়সের লোকদের গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কারণ বেশী বয়সের লোকদের হানাদার বাহিনী একটু কম সন্দেহ করতো। প্রায় তিন গ্রামে একজন করে গোয়েন্দা মোতায়েন করা হয় এবং তারা নিয়মিতভাবে দুশমনের সব সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দিতো। গুনলে অনেকে আশ্চর্য হবেন যে, শান্তি কমিটির কয়েকজন সদস্য মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দার কর্তব্য সম্পাদক করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভূয়াপুর শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আবদুল বারী তালুকদার মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দার কাজ করেছেন। গোয়েন্দা বিভাগের আর একজন নামকরা অফিসার ছিলেন ছাত্রনেতা সোহরাওয়ার্দী। তিনি পাকবাহিনীর হাতে বন্দী হন। মুক্তিবাহিনী থেকে তার উপর আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের সব সংবাদ মুক্তিবাহিনীর কাছে পাচার করতে থাকেন।

বেতার ও টেলিফোন বিভাগ : এই বিভাগের দায়িত্ব নিযুক্ত হন আবদুল আজিজ বাঙ্গাল। ভূয়াপুর কলেজের ছাত্র ও একজন ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি সুপরিচিত। বেসামরিক দফতর থেকে এক মাইল দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ইংরেজ নামক এক কাঠুরিয়ার বাড়ীতে আজিজের টেলিফোন ও বেতার দফতর খোলা হয়। এখান থেকেই সদর দফতরের সকল বিভাগে টেলিফোন যোগাযোগ সাধিত হয়। ফোনের রিসিভার, তার, বেতার ট্রান্সমিটার ও রিসিভার সেটগুলো বিভিন্ন থানা লুট করে সংগ্রহ করা হয়। এই দফতরের সঙ্গে আরো দুটি অঞ্চলের বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়- একটি পশ্চিমাঞ্চলে ভূয়াপুরের গ্রাম এলাকায় এবং অপরটি ধলাপাড়ায়। এই দফতরে

আজিজের সহকারী হিসাবে কাজ করেন আবদুল্লাহ, শামসু রশীদ, ইমাম, আবদুল ও হাকিম। কাঠুরিয়া ইংরেজ এই দফতরে বাবুর্চির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অনেক দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানার নায়ক ছিলেন এই দফতরের কর্মীরা। তারা পাক হানাদারদের বেতার যোগাযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে অদ্ভুত রকমে যোগাযোগ স্থাপন করে। টাঙ্গাইল অয়ারলেস কেন্দ্রের কয়েকজন অপারেটরকে এরা দলে ভিড়িয়ে ফেলে। এই অপারেটররা সুযোগ পেলেই দুশমনদের সব গোপন খবর মুক্তিবাহিনীর বেতার কেন্দ্রে জানিয়ে দিতো নিজেদের ট্রান্সমিটারের সাহায্য। বলাবল্য, এই সময় খান সেনাদের বেতার যোগাযোগ কেন্দ্র সর্বদা কড়া প্রহরাধীনে থাকতো। তার মধ্যেই কয়েকজন দেশপ্রেমিক অফিসার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ জানিয়ে দিতেন। এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল বেতার কেন্দ্রের আবদুর রাজ্জাক অভূতপূর্ব দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রায়ই গভীর রাতে মুক্তিবাহিনীর বেতার কেন্দ্রের আজি বাঙ্গালের সঙ্গে কথা বলতেন। এমনিভাবে মানিকগঞ্জের অপারেটর জিল্লুর রহমান, জামালপুরের মুজিবুর রহমান, গোড়াই ক্যাডেট আবু বকর সিদ্দিক এবং সিরাজগঞ্জের একজন অপারেটর নিয়মিত ভাবে তাদের ট্রান্সমিটার যন্ত্রের সাহায্য মুক্তিবাহিনীকে সকল সংবাদ পাচার করতেন।

সিগন্যাল বিভাগ : বেতার যোগাযোগ ও টেলিফোন ছাড়াও বার্তা বিনিময়ের জন্য সদর দফতরে সিগন্যাল বিভাগ খোলা হয়। প্রথমদিকে মুসা ও খালেকের উপর এই বিভাগের ভার দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে সদর দফতরে শহীদ সাহেব স্বয়ং এই বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। মুসা ও খালেককে অন্য বিভাগের বদলি করা হয়। মুক্তিবাহিনীর মধ্যে থেকে বাছাই করা লোক নিয়ে এই বিভাগে কর্মঠ লোক নিয়োগ করা হয়। এদের কাজ ছিল যে কোন উপায়ে হোক সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া এবং সংগ্রহ করা। এ জন্য এরা পায়ে হেঁটে, সাইকেলে, ঘোড়ায় চড়ে, স্পিডবোটে বা নৌকায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতো। শত্রুকবলিত এলাকার মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে হলে এরা সাধারণ পায়ে হেঁটে, সাইকেল অথবা নৌকার সাহায্য নিত।

সদর দফতর ছাড়াও প্রতি কোম্পানীতে দুইজন করে সংকেদদানকারী বা সিগন্যালম্যান থাকতো। সদর দফতরের সিগন্যালম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল (করটিয়া কলেজের ছাত্র) ও আবদুল গণি (কচুয়া হাই স্কুলের ছাত্র) ছিল দক্ষ ঘোড়সওয়ার। ঘোড়ায় চড়ে এরা সংবাদ আদান-প্রদান করতো। এদের কাজ ছিল পূর্বাঞ্চলীয় মুক্ত এলাকার চারিদিকে রক্ষা ঘাঁটির সাথে প্রাত্যহিক যোগাযোগ রক্ষা করা। অপর সিগন্যালম্যান কাসেম সগুহে দুইবার ভূয়াপুর ও সদর দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো।

জেলখানা : মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক রাজাকার, দালাল ও ধৃত খানসেনাদের রাখার জন্য জেলখানায় প্রয়োজন হয়। এ জন্য বেসামরিক সদর দফতর থেকে এক মাইল দূরে একটি জেলখানা খোলা হয়। এ জন্য একটি বেশ বড় ধরনের বাড়ি নেওয়া হয়। এক প্লাটুন মুক্তিসেনা নিয়োগ করা হল এই জেলখানা পাহারা দেওয়ার জন্য। এই প্লাটুনের কমান্ডার ছিল আনসার। আর জেলার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয় মছ নামক এক দুর্ধর্ষ লোককে।

হাসপাতাল : সামরিক প্রয়োজনে ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য কর্তব্য। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রভৃতি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাকে যেমন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকেও তেমনি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কাজের পরিকল্পনা দিলে তা কার্যকারী করতে মানুষের অভাব হয় না। মুক্তিযুদ্ধে এটা প্রমাণিত হয়েছে। বাঘা সিদ্দিকী হাসপাতাল খোলার নির্দেশ দিলেন আর তা কার্যকারী করতে এগিয়ে এলে কাউলজানির একজন মেজিক্যাল ছাত্র শাহজাদা চৌধুরী। ইনি ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের শেষ বর্ষ এমবিবিএস-এর ছাত্র। সিদ্দিকী এই তরুণের উপর হাসপাতাল খোলার গুরুদায়িত্ব দিলেন। সদর দফতরের শিক্ষা শিবিরের কাছে আন্দি নামক স্থানে বড় বড় তিনটি টিনের ছাপড়া ঘর তৈরি হল। রোগীদের জন্য বিছানাপত্র ও খাটিয়া এলো। ডাঃ শাহজাদার সঙ্গে যোগ দিলেন সখীপুর সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডার রতন। সব রকমের সক্রিয়

সাহায্য দিলেন স্কুল শিক্ষক আমজাদ হোসেন। গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় ঢাকা থেকে হাসপাতালের জন্য ওষুধ ও অস্ত্রোপাচারের যন্ত্রপাতি আমদানি করা হলো। রোগীদের আরামের জন্য হাসপাতাল বেডের উপর কেরোসিনচালিত দুইটি পাখা টাঙিয়ে দেওয়া হলো। এমনি করে ২০ বিছানার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল গড়ে উঠলো। আর রোগীদের সেবার সার্বিক দায়িত্ব নিলেন হামিদ সাহেব। হাসপাতাল ছাড়াও প্রত্যেকটি কোম্পানীতে একজন করে ডাক্তার রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

সদর দফতরের নিরাপত্তা রক্ষা : সদর দফতরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হলো। নৌবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক খলিলুর রহমানের অধিনায়কত্বে ১৩নং কোম্পানী ক শাখাকে এই দফতরের তদারকির ভার দেওয়া হয়। সদর দফতরের কাছেই ছিল অধিনায়ক খলিলের বাড়ী। সর্বাধিনায়ক সিদ্দিকীর বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে তার কর্তব্যপারায়ণতা ছিল পরীক্ষিত। তার কোম্পানীর আর একটি প্লাটুনকে সদর দফতরের বেসামরিক বিভাগের রক্ষণায় নিয়োগ করা হয়। এই প্লাটুনের কমাণ্ডে দেওয়া হয় কালিহাতি ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রাজ্জাককে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে যে সব বেপরোয়া তরুণ মুক্তিযোদ্ধা আরামকে হারাম করে ও রাতের ঘুম ত্যাগ করে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদর দফতরের নিরাপত্তা রক্ষা করেছিল তাদের মধ্যে ঢাকা কলেজের সানু, কালিহাতির মান্নান, শহীদ সালু, পাহাড়িয়া উপজাতীয় ছেলে লক্ষণ চন্দ্র বর্মণ ও কচুয়ার আবদুল্লাহর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আফসার ব্যাটালিয়ন

ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার নিভৃত পল্লী মল্লিকবাড়ী গ্রামে একটি মাত্র রাইফেল নিয়ে মেজর আফসার উদ্দিন আহমেদ সাহেব পার্টি গঠন করেন। পাকবাহিনী ও দুষ্কৃতকারীগণের সাথে লড়াই করে মেজর আফছার সাহেব শত্রুদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি তার পার্টি নিয়ে শত্রু পক্ষের নিকট থেকে আড়াই হাজারেরও অধিক রাইফেল, ব্রেটগান, রকেট লাম্পার, স্টেনগান, এমএমজি ইত্যাদি উদ্ধার করেন। তার দ্বারা পরিচালিত বাহিনীতে সর্বমোট প্রায় সাড়ে চার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

মেজর আফছার সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় আফছার ব্যাটালিয়নের তরফ থেকে সাপ্তাহিক জাগ্রত বাংলা পত্রিকা যাবতীয় সংবাদ পরিবেশন করে মুক্তিকামী মানব মনে প্রেরণা জুগিয়েছে।

আফছার ব্যাটালিয়নের তরফ থেকে রোগাক্রান্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং বিপর্যস্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য ১৩ জন ডাক্তার ও ৩ জন নার্স সমন্বয়ে একটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল মেজর আফসার সাহেবের প্রচেষ্টায়। আফছার ব্যাটালিয়ন কর্তৃক মুক্ত এলাকার সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা কয়েম করা হয়েছিল। এই শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে আফছার ব্যাটালিয়ন তাদের দ্বারা মুক্ত এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে।

মেজর আফছার সাহেব কর্তৃক পরিচালিত মুক্তিবাহিনীকে সেনাবাহিনীর নিয়মানুযায়ী মোট ২৫টি কোম্পানী অর্থাৎ ৫টি ব্যাটালিয়নের ভাগ করা হয়। প্রত্যেক কোম্পানীতে ৩টি প্লাটুন, প্রত্যেক প্লাটুনে ৩টি সেকশন এবং প্রত্যেক সেকশনে ১৫ জন করে মুক্তিসেনা ছিল। প্রকাশ থাকে যে হাসপাতাল, পত্রিকা অফিস এবং বার্তা বিভাগের মুক্তিযোদ্ধারা কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) ও ঢাকা সদর (উত্তর) সেক্টরের সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আফসার ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়েছিল। আফছার ব্যাটালিয়নের কৃতিত্বের কথা এ পুস্তক তুলে ধরা হয়েছে। আফছার ব্যাটালিয়নের প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাই এই কৃতিত্বের অংশীদার।

স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্ষীবাহিনী এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। রক্ষীবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রম, অকৃত্রিম সেবায়ত্ত্ব এবং অসীম ভালোবাসার উপর ভিত্তি করেই আফছার ব্যাটালিয়ন সফলতার চরম শিখরে

আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে বাটাজুর, কচিন, ডাকাতিয়া, পাঁচগাও, কাওলামারী, রাঁজৈ, ফুলবাড়িয়া, আমিরাবাড়ী, নারান্ধী, বড়ইদ, দক্ষিণ ফুলবাড়ীয়া ও কালিয়াকৈর এলাকার রক্ষীবাহিনী স্বাধীনতা সংগ্রামে যে ভূমিকা পালন করেছে তা মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

...পাকবাহিনী কর্তৃক হামলার প্রথমাবস্থায় মুক্তিকামী বাঙ্গালী নওজোয়ানগণ (প্রাক্তন ই,পি,আর বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ বাহিনী, আনসার, মুজাহিদ ও অন্যান্যরা)। বীরবিক্রমে পাল্টা আক্রমণ চালান, কিন্তু পাকবাহিনীর মত সুসংগঠিত বর্বর বাহিনীর সাথে টিকে ওঠা সম্ভব না হওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বন্ধু রাষ্ট্রে আশ্রয় নেন।

মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য জীবন-মরণ পণ করে অগণিত বাঙ্গালী নওজোয়ান অপর বাংলার সামরিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। মেজর আফছারউদ্দিন আহমেদ সাহেব অপর বাংলার পাড়ি না জমিয়ে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনী গঠন করেন, বর্বর বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে এক বিরাট এলাকা মুক্ত করেন। একই সময়ে টাঙ্গাইল জেলার কাদের সিদ্দিকী সাহেবও দেশের অভ্যন্তরে পার্টি গঠন করেন এবং এক বিরাট এলাকা মুক্ত করার প্রয়াস পান।

.....ওপর বাংলা থেকে মুক্তিকোরা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আসার বেশ কিছুদিন আগেই পাকবাহিনীর নিকট থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে এনে মেজর আফছার উদ্দিন তাঁর পরিচালিত মুক্তিদলকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলেন। তিনি ১৯৭১ সনের জুন মাসে ভালুকা থানার ভাওয়ালিয়া বাজু এলাকায় পাকবাহিনীর সাথে একটানা ৪৮ ঘণ্টা সম্মুখযুদ্ধ করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অগণিত সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তাঁর অসীম কর্মদক্ষতার গুণে তিনি একটি রাইফেল থেকে শুরু করে প্রায় সাড়ে চার হাজারেরও অধিক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

তিনি শপথ করেছিলেন- ‘দেশকে শত্রুমুক্ত না করা পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করবো না। আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে যেন মুক্ত এলাকেতেই হয়।’ বর্বর বাহিনী শত চেষ্টা করেও আফছার ব্যাটালিয়ন কর্তৃক মুক্ত এলাকায় প্রবেশ করতে পারেনি। আফছার সাহেব শপথ করেছিলেন, “জীবিত থাকতে মুক্ত এলাকায় শত্রুদরকে প্রবেশ করতে দেব না।’ তাঁর শপথ অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা সাপ্তাহিক ‘জাগ্রত বাংলা’য় তাঁর বাহিনী কর্তৃক মুক্ত এলাকার মানচিত্র অংকন করে সমস্ত বাংলাদেশ, ওপার বাংলা ও পাক বাহিনীর অনেক ঘাঁটিতেও বিতরণ করেছেন। তিনি ১৯৭১ সনের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি আগরতলা যেয়ে লেঃ কর্নেল নুরুজ্জামান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। লেঃ কর্নেল নুরুজ্জামান সাহেব বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কিছু অস্ত্র ও অসীম উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত করেন।

ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) সেক্টরের মুক্তিবাহিনী অধিনায়ক মেজর আফছার উদ্দিন আহমেদের গঠিত ব্যাটালিয়নের স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্যাবলীঃ

২৩-৪-৭১ ময়মনসিংহ জিলার ভালুকা থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মল্লিকবাড়ী ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য জনাব আফছার আহমেদ মাতৃভূমিকে পশ্চিমাদের কবল হতে শোষণমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভালুকা থানার রাঁজৈর গ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী মোঃ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সাহেবের নিকট থেকে একটি রাইফেল ও ৩০ রাউণ্ড গুলি নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত করেন। ২৪-৪-৭১- প্রাক্তন ই,পি, আর বাহিনীর ফেলে যাওয়া ৭টি রাইফেল এবং উপরোক্ত আবদুল হামিদ সাহেবের নিকট থেকে সংগ্রহ করা ১টি রাইফেল মোট ৮টি রাইফেল নিয়ে জনাব আফছারউদ্দিন আহমেদ সাহেবের নেতৃত্বে মল্লিকবাড়ী এলাকায় ১। মোঃ আমজাদ হোসেন ২। মোঃ আবদুল খালেক ৩। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র পাল ৪। মোঃ আবদুল বারেক মিয়া ৫।

মোঃ আবদুল মান্নান ৬। শ্রী-অনীলচন্দ্র সাংমা ও ৭। ছমির উদ্দিন মিয়ার সহযোগিতায় সর্বপ্রথম মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। মোঃ আবদুল মান্নান ভাওয়ালিয়া বাজু যুদ্ধে এবং শ্রী অনীলচন্দ্র সাংমা ডুমনিঘাট যুদ্ধে নিহত হন।

মুক্তিবাহিনী গঠনে সক্রিয়ভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন মোঃ জবান আলী ফকির, ডাঃ হাফিজউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আবদুর রাজ্জাক, মোঃ আবদুল হামিদ, মোঃ মোসলেম মিয়া, বাবু প্রেম অধিকারী এবং মোঃ হাফিজুর রহমান। উক্ত পার্টি ভালুকা, গফরগাঁও, ফুলবাড়ীয়া, ত্রিশাল, কোতোয়ালী, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর বাশাইল, কালিহাতি, মির্জাপুর এবং মুক্তগাছা ইত্যাদি এলাকায় কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিচালিত জনাব আফছারউদ্দিন আহমেদ সকল সদস্যসহ মাতৃভূমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবার জন্য শপথগ্রহণ করেন।

২৬-৪-৭১ বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে ঢাকাতে ও দুস্কৃতকারীদের নিকট থেকে অস্ত্র উদ্ধার কার্য শুরু করা হয়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মোট ২৫টি রাইফেল বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করা হয়। ২-৫-৭১ অধিনায়ক আফছারউদ্দিন আহমেদ সাহেবের নেতৃত্বে ভালুকা থানা হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করা হয় এবং সেখানে থেকে ১০টি রাইফেল এবং ১৫৫০ রাউণ্ড গুলি ও ৩০টি বেয়নেট উদ্ধার করা হয়। ১২-৫-৭১-টাঙ্গাইল জেলার বগুয়া এলাকায় পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে অধিনায়ক আফছার সাহেব একটি কোম্পানী নিয়ে বগুয়া আক্রমণ করেন। উক্ত যুদ্ধে ৫১ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। ২০-৫-৭১-ভালুকা থানার বাইন্দা গ্রামের কুখ্যাত ডাকাত, লুণ্ঠনকারী ও পাক বাহিনীর দালাল ইছহাক খানকে হত্যা করা হয়। ২১-৫-৭১- এই দিনে ভালুকা থানা আক্রমণ করে ২টি ব্রেটগান, ১০টি রাইফেল এবং এক বাস্রগুলি উদ্ধার করা হয়।

২২-৫-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেবের নেতৃত্বে গফরগাঁও থানার কাওরাইদ রেল স্টেশনের উত্তর পার্শ্বস্থিত গ্রাম গয়েশপুর থেকে মুক্তিসেনা নুরুল ইসলামের সহায়তায় ২টি চাইনীজ রাইফেল এবং ৬ বাস্র গুলি উদ্ধার করা হয়।

২৬-৭১ বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে ডাকাত ও দুস্কৃতকারীদের নিকট থেকে মোট ১১টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়। ২৩-৬-৭১ ভালুকা থানার পোনাশাইল এলাকার একদল মুক্তিসেনা টহল দেওয়াকালীন সময়ে একখানা সন্দেহজনক নৌকা আটক করা হয়। উক্ত নৌকা তল্লাশী করে ৫টি রাইফেল ও ৪ বাস্র গুলিসহ ৫ জন পুলিশ ধরা হয়। উক্ত পুলিশের নিকট থেকে অনেক গোপন তথ্য জানা সম্ভব হয়। তারা মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

২৫-৬-৭১ পনের শতাধিক পাক সেনার একটি দল তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে ভালুকা ঘাঁটি করার উদ্দেশ্যে গফরগাঁও থেকে ভালুকা রওয়ানা হয়। পাক সেনাদের এই সুসজ্জিত বাহিনী ভালুকা যাওয়ার সময় অধিনায়ক আফছার সাহেব ৪১ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সকাল ৮ ঘটিকায় ভাওয়ালিয়া বাজু বাজারের ঘাটে তাদের রাস্তা রোধ করেন এবং যুদ্ধ শুরু হয়। পাকসেনারা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মুক্তিসেনারা মাত্র ২ টি,এল,এম,জি (হালকা মেশিনগান) ও ৩৭ টি রাইফেল নিয়ে যুদ্ধে শুরু করেন। অবিরাম ৩৫ ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর পাকবাহিনী অগ্রসর হতে না পারায় মুক্তিসেনাদের পিছন দিকে পাক সেনাদের সাহায্যের জন্য হেলিকপ্টার দ্বারা কয়েকবারে ৩ শতাধিক পাকসেনা আবতরণ করানো হয়। এই যুদ্ধ মোট ৪৮ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এতে ১৯৫ জন পাকসেনা নিহত ও বহুসংখ্যক আহত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিসেনা আঃ মান্নান শহীদ হন এবং ৩জন মুক্তিসেনা আহত হন। ২৮-৬-৭১- অধিনায়ক আফছারউদ্দিন সাহেব নিজেই রাত্রি ৩ ঘটিকায় ভালুকা থানায় গ্রেনেড আক্রমণ চালিয়ে ১৭ জন পাকসেনাকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করেন।

১৭-৭-৭১ মেজর আফছারউদ্দিন আহমেদ সাহেবের নেতৃত্বে গফরগাঁও থানার দেউলপাড়া এলাকায় পাক সেনাদের একটি টহলদারী ট্রেনের উপর মুক্তিসেনারা আক্রমণ চালায়। ফলে ৭ জন পাক সেনা নিহত ও

কয়েকজন আহত হয়। ১৯-৭-৭১- ভালুকা থানার হরিরবাড়ী এলাকায় সিস্টার বাজারে আফছার সাহেবের নেতৃত্বে রাত্রি ৩-২০ মিনিটে পাকসেনাদের ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। ফলে ২৩ জন পাকসেনা নিহত ও ৯ জন আহত হয়। রাত্রের আক্রমণে তারা ভীত হয়ে পরের দিন ত্যাগ করে পলায়ন করে।

২৫-৭-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেব নিজে একদল মুক্তিসেনা নিয়ে অতর্কিত মল্লিকবাড়ী ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে রাত্রি ৪-২০ মিনিটে পাকসেনাদের ১৬ জনকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করেন। ২৬-৭-৭১ মল্লিকবাড়ী পাক বাহিনীর ঘাঁটিতে মুক্তিযোদ্ধারা রাত্রি ২ ঘটিকায় গেরিলা পদ্ধতিতে গ্রেনেড চার্জ করে পাক সেনাদের ৪ জনকে নিহত ও ৩ জনকে গুরুতরভাবে আহত করেন। একই দিন অন্য একদল মুক্তিযোদ্ধা ঢাকা জেলার শ্রীপুর থানার মাওয়া গ্রামের কুখ্যাত ডাকাত ও দালাল হাবিবুর রহমান (এম,ইউ,সি) এবং হামিদ ফকিরকে হত্যা করেন। ২৯-৭-৭১- আফছার ব্যাটালিয়নের কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়ার দলের হাতে পাকবাহিনীর ৩ জন গুপ্তচর পারুলদীয়া বাজারে ধরা পড়ে ও তাদেরকে হত্যা করা হয়। অধিনায়ক আফছার সাহেব ১লা আগষ্ট তারিখে অন্য একদল মুক্তিসেনা নিয়ে ভালুকা থানার ভয়াবহ খেয়াঘাটে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে ৯ জন পাকসেনাকে হত্যা করেন।

৩-৮-৭১-প্লাটুন কমান্ডার হাফিজুর রহমান, মোঃ আইয়ুব আলী এবং সেকশন কমান্ডার আবদুল করিমের নেতৃত্বে একদল মুক্তিসেনা ত্রিশাল থানার কানিহারী গ্রামে একদল রাজাকারের উপর আক্রমণ চালিয়ে একটি রিভলবার ও কয়েক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেন। ঐদিন রাতে প্লাটুন কমান্ডার হাফিজুর রহমান একজন মুক্তিসেনা সাথে নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে কালীরবাজার স্কুলের ছাত্র ফোরকানউদ্দিন আহমেদ, কাঁঠাল গ্রামের মোঃ আবু তাহের, মহসীন, শামছুল হক, জালাল, টুকু ও সুন্দর আলীর সহায়তায় কালীরবাজার হাই স্কুল ল্যাবরেটরী থেকে কিছু হাত বোমা, এসিড, বারুদ ইত্যাদি উদ্ধার করেন। একই দিন প্লাটুন কমান্ডার আইয়ুব আলী সাহেব অন্য কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সাথে নিয়ে কাঁঠাল গ্রামে হানা দিয়ে ২ জন দুস্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করেন।

৪-৮-৭১- পাকবাহিনী ভালুকা থানার ডাকাতিয়া বাজার এবং গ্রামের বাড়িঘর লুটপাট করে ফিরবার পথে অধিনায়ক আফছার সাহেবের নেতৃত্বে ২ দল মুক্তিসেনা পাকসেনাদের পিছন ও বাম দিক থেকে আক্রমণ চালায়। ফলে পাক বাহিনীর ৩০ জন সেনা নিহত ও আহত হয়। লুট করা সমস্ত মালপত্র মুক্তিসেনাদের হস্তাগত হয়। একটি ব্যারোমিটারও পাওয়া যায়। মেজর আফছার সাহেবের নির্দেশে গফরগাঁও থানার কুখ্যাত ডাকাত ও রাজাকার কমাণ্ডার গাওয়াকে মুক্তিবাহিনীর কোম্পানী কমাণ্ডার চাঁন মিয়ার নেতৃত্বে তার নিজ বাড়িতে গ্রেপ্তার ও পরে হত্যা করা হয়।

৯-৮-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেব নিজেই কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজউদ্দিন ও অল্প কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বিকাল ৫ ঘটিকায় মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করেন এবং ১৪ জন পাকসেনা, ৪ জন রাজাকারকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করেন। ১০-৮-৭১- সকাল ঘটিকায় পাকবাহিনীর একটি দল মল্লিকবাড়ী বাজার থেকে ভালুকা যাওয়ার জন্যে খেয়াঘাটে এসে নৌকায় চড়লে অধিনায়ক আফছার সাহেবের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনাদলকে আক্রমণ করেন। ফলে ১৪ জন পাকসেনা এবং ২ জন নৌকার মাঝি নিহত হয়। মল্লিকবাড়ী বাজারে ২৪ জন খানসেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।

১২-৮-৭১-মল্লিকবাড়ী বাজারের ঘাট আক্রমণ চালিয়ে ১১জন পাকসেনা ও ২ জন রাজাকার হত্যা করা হয়। ১৩-৮-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেবের নেতৃত্বে মল্লিকবাড়ী বাজারে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ২৬ জন রাজাকার ও ২জন পাক সেনাকে হত্যা করা হয়। ১-৮-৭১- মেজর আফছার সাহেবের নির্দেশে প্লাটুন কমান্ডার আইয়ুব আলী ও সেকশন কমান্ডার আমজাত হোসেনের দল কর্তৃক ভরাডুবা গ্রামের হজরত আলী নামে একজন রাজাকার ধৃত ও নিহত হয়। অধিনায়ক আফছার সাহেবের নেতৃত্বে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। ফলে ৭ জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয় এবং ৩টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়। এই দিন সন্ধ্যায় অধিনায়ক আফছার সাহেব হাকিম সাহেবকে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করে ওপার বাংলায় রওয়ানা হন।

১৫-৮-৭১- একদল মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক ভায়াবহ ঘাটে পাকবাহিনী একটি দলের সাথে অবিরাম ৪ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের ফলে ১৯ জন রাজাকার নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। উক্ত রাজাকারদের নিকট থেকে ৪ টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

২৬-৮-৭১- মেজর আফছার সাহেবের নির্দেশে প্লাটুন কমান্ডার আইয়ুব আলীর নেতৃত্বে একদল মুক্তিসেনা ভালুকা থানার ভায়াবহ এলাকা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করেন। ফলে পাকসেনাদের ৮ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ২৭-৮-৭১- ভালুকা থানার বাটাজুর এলাকায় পাকসেনাদের একজন গুপ্তচর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হাকিম সাহেবের দলভুক্ত প্লাটুন কমান্ডার নারায়ণচন্দ্র পালের হাতে ধরা পড়ে, তাকে পরে হত্যা করা হয়। ২৮-৮-৭১- ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হাকিম সাহেবের নেতৃত্বে প্লাটুন কমান্ডার ফজলুল হক বেগ, নুরুল ইসলাম ও হাফিজুর রহমান তাদের দলের মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর থানার শালদাহপাড়া এলাকায় হানা দেন। এই হামলায় পাকবাহিনীর কুখ্যাত দালাল ও রাজাকার সাহেব আলী গ্রেপ্তার হয় ও তাকে হত্যা করা হয়। অনেক লুটের মাল উদ্ধার করা হয় এবং এই সমস্ত মালামাল তাদের প্রকৃত মালিক ও গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ২৯-৮-৭১-প্লাটুন কমান্ডার কাছিমউদ্দিন তার দল নিয়ে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটিতে গেরিলা আক্রমণ চালান, ফলে পাকসেনাদের ৪ জন নিহত ও ৩জন আহত হয়।

১-৯-৭১- প্লাটুন আইয়ুব আলী ও সেকশন কমান্ডার আমজাদ হোসেন মিলিতভাবে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করেন, ফলে ১২ জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ২-৯-৭১- প্লাটুন কমান্ডার কাছিমউদ্দিন তার দল নিয়ে ভালুকা পাকসেনাদের ঘাঁটিতে গেরিলা আক্রমণ চালান। ফলে ২জন সান্নী নিহত ও ৩ জন আহত হয়। ৩-৯-৭১- সেকশন কমান্ডার আমজাদ হোসেন ১৬ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ভালুকা থানার ভরাডুবা গ্রামে একদল রাজাকারের উপর আক্রমণ করেন। ফলে ৫ জন রাজাকার নিহত হয়। ৪-৯-৭১-এই তারিখে বিকাল ৩ ঘটিকায় ভালুকা থেকে ভরাডুবা ও মেদুয়ালী এলাকায় ২ শতাধিক রাজাকার ও পাকবাহিনীর একটি দল বাজার ও বাড়ি ঘর লুট করে এবং বাংলাদেশ সরকারের সমর্থক ৭৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করে তাদের মাথায় লুট করা মালের বোঝা চাপিয়ে ভালুকায় ফিরতে থাকে। এই খবর পেয়ে প্লাটুন কমান্ডার মোঃ হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, দিলদার আহমেদ, মোঃ আবদুল মোতালেব, মনিরউদ্দিন ও আব্দুল মান্নানসহ মোট ১৪ জন মুক্তিসেনা নিয়ে ৪ মাইল রাস্তা দৌড়ে যেয়ে ভান্ডার গ্রামের সীমান্তে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১২ জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। গ্রেফতারকৃত সমস্ত লোক ও লুট করা জিনিসপত্র ফেলে পাকসেনারা ভালুকা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পাকসেনাদের নিকট থেকে ১০টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

১০-৯-৭১-পাকবাহিনীর একটি দল ভালুকা ঘাঁটির পাকসেনাদের খাদ্য সস্তার বড় বড় ৫টি নৌকা বোঝাই করে ভালুকা আসার পথে কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া তার দল নিয়ে ঝালপাজা গ্রামে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ৪ জন পাকসেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। নৌকাসহ ৫৭০ মণ আটা ও ২০ মণ চিনি মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। উক্ত আটা ও চিনি রাজৈ ইউনিয়নের গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ১৩-৯-৭১- অধিনায়ক মেজর আফছার সাহেবের ব্যাটালিয়নের কোম্পানী কমান্ডার আবুল কাশেম একটি কোম্পানী ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসার পথে রায়ের গ্রাম এলাকায় এক স্কুলে রাত্রি যাপন করেন। গ্রাম্য রাজাকার ও দালালরা খবর দেওয়ার ফলে ত্রিশাল ও গফরগাঁও ঘাঁটি থেকে পাকবাহিনী ভোর রাতে তিন দিক থেকে আতর্কিত আক্রমণ চালায়। দীর্ঘ ৭ ঘণ্টা যুদ্ধের পর কাশেম সাহেবের দল কর্তৃক ১৬ জন পাকসেনা ও ৫ জন রাজাকার নিহত হয়। এই যুদ্ধে ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

১৫-৯-৭১- প্লাটুন কমান্ডার আইয়ুব আলী, দিলদার আহমেদ, হাফিজুর রহমান, মোঃ আবুল কাশেম যথাক্রমে কুমারঘাট, মুচারঘাট, বান্দিয়া ও নিমুরী এলাকায় দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা যাবৎ পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধ করেন। ফলে ৫জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ১৮-৯-৭১- কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজউদ্দিন খানের

নেতৃত্বে বাদিয়া এলাকায় ৪ ঘণ্টা যাবৎ পাকবাহিনীর সাথে গুলি বিনিময় হয়। ফলে ১২ জন রাজাকার নিহত হয়। ১৯-৯-৭১- ভালুকা থানার রাঁজৈ গ্রাম এলাকায় পাকবাহিনী লুট করতে আসলে কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া তার দল নিয়ে আক্রমণ করেন। ফলে ৭ জন পাকসেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ২ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর পাকসেনারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। একই দিন ভালুকা থানার পোনাশাইল এলাকায় কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়ার একটি প্লাটুনের সহিত একদল রাজাকার ও পাকসেনাদের এক ঘণ্টাকাল গুলি বিনিময় হয়। এই যুদ্ধে ২ জন পাকসেনা নিহত হয়।

২১-৯-৭১- এই দিন সকাল ৯ ঘটিকায় ভালুকা ঘাঁটি থেকে প্রায় চার শতাধিক রাজাকার ও পাকবাহিনীর একটি দল ৪ ভাগ হয়ে বড়াইদ এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বড়াইদ গ্রামে আফছার ব্যাটালিয়নের কোম্পানী হেডকোয়ার্টার ছিল। পাকবাহিনীর আসার খবর পেয়ে কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজউদ্দিন খান, প্লাটুন কমান্ডার সামছ উদ্দিন, মনির উদ্দিন, মোঃ মোতালিব মাস্তার ও হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে পাকবাহিনীর ৪টি রাস্তা প্রতিরোধ করেন। দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর পাকবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে ১৪ জন পাকসেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। তারা অনেক লুটের মাল ফেলে যায়। উক্ত মাল প্রকৃত মালিকদেরকে ফেরত দেওয়া হয়। ২৪-৯-৭১- পাকসেনাদের একটি দল মল্লিকবাড়ী এলাকায় লুট করতে আসলে অধিনায়ক আফছার সাহেবের দলের প্লাটুন কমান্ডার নাজিমউদ্দিন ও হাবিলদার আবদুল মোতালেব পাকবাহিনীর উপর আতর্কিত আক্রমণ করেন। ফলে ২ জন পাকসেনা ও ৩ জন রাজাকার নিহত হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অধিনায়ক আফছার উদ্দিন আহমেদ ওপার বাংলা থেকে মেজর পদে উন্নীত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। ২৭ তারিখ সকাল ৮ ঘটিকায় তিনি নিজে কোম্পানীর কমান্ডার নাজিমউদ্দিন ও তাঁর দলসহ মল্লিকবাড়ী পাক ঘাঁটি আক্রমণ করেন। ফলে ৫ জন পাকসেনা ও ৪ জন রাজাকার নিহত হয়। ২৯-৯-৭১- রাত্রি ২ ঘটিকায় কোম্পানী কমান্ডার আবুল কাশেম এবং প্লাটুন মনিরুদ্দিন কয়েকজন মুক্তিসেনা নিয়ে ভালুকা ঘাঁটিতে গেরিলা আক্রমণ চালান। ফলে ৪ জন পাকসেনা ও ৩ জন রাজাকার নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়।

১লা অক্টোবর ভোর ৪ ঘটিকায় ভালুকা, কাশীগঞ্জ ও ত্রিশাল থেকে পাকবাহিনীর তিনটি দল একযোগে বাইন্দা ও বড়াইদ এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কোম্পানী কমান্ডার কাশেম সাহেবের নেতৃত্বে কমান্ডার কছিম উদ্দিন, মনির উদ্দিন ও হাফিজুর রহমান তাদের পথ রোধ করেন। ১৭ ঘণ্টাকাল স্থায়ী এই যুদ্ধে মোট ৭১ জন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। ৩রা অক্টোবর মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি থেকে পাকবাহিনীর একটি দল ভালুকা থানার তালাব এলাকায় লুট করার সময় অধিনায়ক আফছার সাহেব ও কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজ উদ্দিন খান একদল মুক্তিসেনাসহ বাঁপিয়ে পড়েন। ফলে ৪ জন পাকসেনা ও ২২ জন রাজাকার নিহত এবং ৩ জন আহত হয়। ৫-১০-৭১- ভালুকা ঘাঁটি হতে পাকবাহিনীর একটি দল বিরুনিয়া ও মেদীলা গ্রাম লুট করতে আসলে কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজউদ্দিন গ্রামের পরিচালনায় প্লাটুন কমান্ডার মজিবুর রহমান ও মোঃ নুরুল ইসলাম পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। ২ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর ৯ জন রাজাকার নিহত ও ৫ জন আহত হয়।

৭ অক্টোবর মেজর আফছার সাহেব স্বয়ং একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করেন। ২ ঘণ্টাকাল গুলি বিনিময়ের পর ১৯ জন পাকসেনা ও ১৪ জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। পরদিন পাকবাহিনীর একটি দল পোনাশাইল এলাকার বাগেরপাড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মুক্তিসেনারা আতর্কিত আক্রমণ চালায়। ফলে ৮ জন রাজাকার নিহত ও ৩ জন রাজাকার আহত হয়। এই দিন কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া তার দল নিয়ে গফরগাঁও থানার এক রাজাকার ক্যাম্পে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ৪টি রাইফেল এবং ১২ শত রাউন্ড গুলী উদ্ধার করেন এবং ৯ জন রাজাকার নিহত কয়েকজন আহত হয়। ৯-১০-৭১- কোম্পানী কমান্ডার হাকিম সাহেব তাঁর কোম্পানীর প্লাটুন কমান্ডার দিলদার আহমেদ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল ও তমিজউদ্দিন আহমেদ এবং ৯০ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর ঘাঁটি আক্রমণ করেন।

পাকসেনারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। রাজাকারগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই মারা যায়। মোট ৩৪ জন রাজাকার ও ১২ জন পাকসেনা খতম হয়।

১০ অক্টোবর মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি থেকে ৫০ জন পাকসেনা ও ৩৫০ জনের একটি রাজাকার দল চানপুর গ্রামে লুটতরাজ আরম্ভ করে। এই খরব পেয়ে মেজর আফছার মাত্র ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। দীর্ঘ ১০ ঘণ্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে ৫ জন পাকসেনা ও ৭ জন রাজাকার নিহত হয়। পাকবাহিনীর গুলিতে মুক্তিসেনা অনিলচন্দ্র সাংমা মৃত্যুররণ করেন। এছাড়া, একজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক এবং একটি ছেলেকে পাকবাহিনী পালায়নের সময় গুলি করে হত্যা করে। ঐ দিন দিবাগত রাতে সেকশন কমান্ডার আবদুল হালিম তার দল নিয়ে ধলা-গফরগাঁও রেল লাইনের চারিপাড়া পুলে পাহারারত রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালান। ফলে ১৪ জন রাজাকার আহত ও ৪ জন নিহত হয়। রাজাকারগণ ৫ শত রাউন্ড গুলি ফেলে পালিয়ে গেলে তা মুক্তি সেনাদের হস্তগত হয়।

১৩-১০-৭১- ভালুকা থেকে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের একটি দল মেদুয়ারী গ্রামের সরকার বাড়িতে ক্যাম্প করে। একদল মুক্তিসেনা তাদের উপর আতর্কিত আক্রমণ চালায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর পাকবাহিনীর ৮ জন নিহত হয় এবং অন্যন্যরা পালিয়ে যায়। ১৫-১০-৭১- আফছার ব্যাটালিয়নের কোম্পানী কমান্ডার মোঃ চাঁন মিয়া তার দলসহ মশাখালী রেল স্টেশনের দক্ষিণে করচঙ্গীর পুলের ধারে পাকবাহিনীর সাথে দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর পুলের বাস্কারে পৌঁছতে সক্ষম হন। পর পর ৯টি গ্রেনেড চার্জ করে বাস্কারগুলি দখল করা হয়। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক দ্বারা পুলটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পুল ধ্বংস করার পর মশাখালী স্টেশনে আক্রমণ চালানো হয়। ফলে একজন দারোগাসহ ১৫ জন রাজাকার ও পাকসেনা নিহত হয়। ১৩ টি রাইফেলসহ ১২ জন রাজাকার চাঁন মিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করে। একই দিন দিবাগত রাতে উক্ত কোম্পানী কমান্ডার তার দলসহ অন্য একটি অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০০ গজ রেলপথ নষ্ট করে দেন। মাইন বিস্ফোরণে মুক্তিসেনা আঃ মান্নান শহীদ হন।

১৬-১০-৭১- বিকল ৪-৩০মিনিটে কোম্পানী কমান্ডার মোঃ চাঁন মিয়া তার দলসহ গফরগাঁও থানার শীলা নদীর পুলে পাকসেনাদের উপর আতর্কিত আক্রমণ চালান। ফলে পাকসেনাদের ৪ জন নিহত ও ৬ জন আহত হয়। একই দিন দিবাগত রাতে করচঙ্গী পুলের দক্ষিণে পাচগড়িয়া পুলে পাহারারত রাজাকারদের উপর আক্রমণ করেন। রাজাকার দল পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পুলটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ৭ জন রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে।

২২-১০-৭১- মশাখালী রেল স্টেশনের পশ্চিমে শীলা নদীর পাড়ে পাকসেনাদের উপর মুক্তিসেনারা আতর্কিত আক্রমণ করেন। ৫ জন রাজাকার ও একজন পাকসেনা নিহত হয়। আত্মসমর্পণকারী ৪ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে এই যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করেন। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করার পর পাকবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

২৪-১০-৭১- ভালুকা থানার বিরুনীয়া গ্রামে পাকসেনারা লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ আরম্ভ করলে অধিনায়ক আফছার সাহেব চাঁন মিয়া কোম্পানীর মুক্তিসেনাদের নিয়ে পাকবাহিনীকে আক্রমণ করেন। ২ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর ৫জন পাকসেনা আহত হয়। ২৬ অক্টোবর- প্লাটুন কমান্ডার আবদুল হালিম কাশীগঞ্জে পাকসেনাদের ঘাঁটি আক্রমণ করেন। পাকসেনারা উপায় না দেখে অয়ারলেস মারফত তাদের অন্যান্য ঘাঁটিতে সাহায্য চায়। ভালুকা, আছিম, ত্রিশাল, এবং গফরগাঁও থেকে পাকসেনারা কাশীগঞ্জে আসতে থাকে। কোম্পানী কমান্ডার মনিরউদ্দিন মিলিতভাবে তাদের দলের জোয়ানদের নিয়ে স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কাশীগঞ্জের মাহ্ ভূঞাসহ মোট ৬৫ জন রাজাকার নিহত এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ ১৭ জন গ্রেপ্তার করা হয়। ঘাঁটি সম্পূর্ণরূপে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে এবং মোট ৫২ টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

২৮-১০-৭১- মেজর আফছার সাহেবের নির্দেশে কোম্পানী হাকিম ঢাকা জেলায় কালিয়াকৈর থানার কচিঘাটা এলাকায় পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করে। দীর্ঘ ১৫ ঘণ্টা যুদ্ধে ৫২ জন পাকসেনা নিহত হয়। ৩০-১০-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেব নিজেই একদল মুক্তিসেনাসহ ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর থানার ফুলবাড়িয়া এলাকায় পাকসেনার ওপর হামলা করেন। ফলে ৭ জন পাকসেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। মুক্তিসেনারা মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুল সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। ৩১-১০-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেব কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজউদ্দিন খান, সিরাজুল হক, হালিমউদ্দিন এবং তাদের জোয়ানদের নিয়ে গফরগাঁও থানার রসুলপুরে (আমলীতলা) রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মোট ৬৮ জন রাজাকার নিহত হয়। ৬৫ টি রাইফেল, একটি স্টেনগান ও ৩ বাস্তু গুলি উদ্ধার করা হয়। ঘাঁটিখানা মুক্তিসেনাদের দখলে আসে। এই যুদ্ধে অসীম সাহসী যোদ্ধা মোমতাজউদ্দিন খান শহীদ হন।

৯-১১-৭১- মেজর আফছার সাহেব নিজে কোম্পানী কমান্ডার সামছউদ্দিন আহমেদ, ফয়েজউদ্দিন ও মোতালেব হাবিলদার এবং মুক্তিসেনাদের নিয়ে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ৩৩ জন পাকসেনা ও ৬ জন রাজাকার নিহত হয়। পাকবাহিনী ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং ঘাঁটিটি মুক্তিসেনাদের আয়ত্তে আসে। ১০-১১-৭১- কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া রাজৈ এলাকায় পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন এবং একটি রাইফেল ও ৪৪ রাউন্ড গুলিসহ একজন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করেন। ১১ নভেম্বর অধিনায়ক আফছার সাহেব কমান্ডার চাঁন মিয়া, সিরাজুল হক ও দুলা একত্রিত হয়ে ভালুকায় পাকঘাঁটি আক্রমণ করেন। দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা যুদ্ধের ফলে ৯ জন পাকসেনা ও ৭ জন রাজাকার নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। পরদিন ভালুকা থানার চান্দের আটি গ্রামে একদল পাকসেনা লুট করতে গেলে কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া তার দল নিয়ে পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ করেন। ১১ ঘণ্টা এই যুদ্ধে ১১ জন পাকসেনা ও ৯ জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর প্লাটুন কমান্ডার সমশের আলীসহ ৫ জন মুক্তিসেনা শহীদ হন। ১৩-১১-৭১- কোম্পানী কমান্ডার ফজলুল ওয়াহাব ও চাঁন মিয়ার পরিচালনায় ভালুকা থানার ও ভাওয়ালিয়া বাজু এলাকায় পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। ৩ জন পাকসেনা ও কয়েকজন রাজাকার আহত হয়।

১৫ নভেম্বর- পাকবাহিনী ও রাজাকার বাহিনী প্রায় ৪ শতাধিক সৈন্য ধানশুর গ্রামে ঢুকে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করতে থাকে। মেজর আফছার সাহেবের পরিচালনায় তিনদিক থেকে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করা হয়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনী ও রাজাকার সমন্বয়ে ৩৪ জন নিহত হয়। মুক্তিসেনা জহিরউদ্দিন শহীদ হন। ২-১২-৭১- কোম্পানী কমান্ডার মোছলেহ উদ্দিন আহমেদ, প্লাটুন কমান্ডার এমদাদুল হক ও নাজিম উদ্দিন খানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ধানশুর ও কাটালী গ্রামের বড় রাস্তায় পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ১৪ জন পাকসেনা ও ১৩ জন রাজাকার নিহত হয়। একই দিন মশাখালী ও কাওরাইদ থেকে পাকবাহিনী রাজৈ গ্রামে লুট করতে আসলে কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া প্লাটুন কমান্ডার মজিবর রহমান ও নজরুল ইসলাম মুক্তিবাহিনীর দল নিয়ে পাক সেনাদের ওপর গুলি চালান। এই যুদ্ধে একজন পাকসেনা নিহত হয়। ৩ ডিসেম্বর প্লাটুন কমান্ডার আবুল হাশিম ও কোম্পানী কমান্ডার ফজলুল ওয়াহাবের নেতৃত্বে ভালুকা থানার ভাওয়ালিয়া বাজু এলাকায় পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করা হয়। ফলে ৩ জন পাকসেনা ও ২৭ জন রাজাকার নিহত হয়। একজন রাজাকার তার নিজ দলের কমান্ডারকে ও একজন রাজাকারকে হত্যা করে ৩ টি রাইফেলসহ মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ৪-১২-৭১- ভালুকা থানার চাপড়াবাড়ী এলাকায় রাজাকারদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৩ জন রাজাকার হত্যা করা হয়। একই দিন কোম্পানী কমান্ডার মোছলেহ উদ্দিন আহমেদ ও প্লাটুন কমান্ডার গিয়াসউদ্দিন আহমেদ একদল মুক্তিসেনা নিয়ে কাঠালী ও বাশিল একালায় পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন। ফলে ৭ জন পাকসেনা ও ১০ রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।

৬-১২-৭১- বিকাল ৪ ঘটিকায় ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর হতে ৪টি ট্রাক ভর্তি হয়ে পাকসেনারা যাওয়ার সময় কোম্পানী কমান্ডার হাকিম সাহেব, প্লাটুন কমান্ডার দিলদার আহমেদ ও নারায়ণচন্দ্র পালের নেতৃত্বে

মুক্তিযোদ্ধারা আতর্কিত আক্রমণ করেন। এই হামলায় ২৭ হস পাকসেনা নিহত ও ৪ জন গুরুতররূপে আহত হয়, ৩ টি ট্রাক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ৭-১২-৭১- মেজর আফছার সাহেব ও কোম্পানী কমান্ডার ফজলুল ওয়াহাব তিনটি কোম্পানীসহ পাকসৈন্যের ভালুকা ঘাঁটি আক্রমণ করেন। ২ জন পাকসেনা ও ৩০ জন রাজাকার নিহত হয়। ৩০ ঘণ্টাকাল যুদ্ধ চলার পর পাকবাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে ভালুকা ঘাঁটি সম্পূর্ণরূপে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। ৮ ডিসেম্বর পলায়নরত পাকফৌজের পিছু ধাওয়া করে মেজর আফছার ও কোম্পানী কমান্ডার ফজলুল ওয়াহাব গফরগাঁও থানার ভারইল গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে পাক সেনাদেরকে ঘেরাও এবং আক্রমণ করেন। তিনজন পাকসেনা ও ৫ জন রাজাকার নিহত হয়। পরের দিন মেজর আফছার মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গফরগাঁও থানা হেডকোয়ার্টার দখল করেন এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেন।

১০-১২-৭১- গফরগাঁও থানার নতুন অফিস ইন-চার্জ হাফিজুর রহমান, কোম্পানী কমান্ডার ফজলুল ওয়াহাব, কোম্পানী কমান্ডার নাজিমউদ্দিন খান ও প্লাটুন কমান্ডার আবদুল বারী মাস্টার সাহেবের নেতৃত্বে ত্রিশালে পাকবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। পাকসেনারা রাজাকারদের সাথে ছলনা করে পালিয়ে যায়। রাজাকাররা অন্য উপায় না দেখে বাধ্য হয়ে ১০৬ টি রাইফেলসহ আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশাল ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। ১৪-১২-৭১- ময়মনসিংহ শহর থেকে পলায়নরত প্রায় ১০০ জন পাকসেনারা একটি দল ভালুকা থানার পাড়াগাঁও এলাকার এক গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। মেজর আফছার সাহেবের তৃতীয় ছেলে সেকশন কমান্ডার নাজিমউদ্দিন কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা উক্ত পাকসেনাদেরকে আক্রমণ করে। ২ ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর নাজিমউদ্দিন আহত হয়।

১৫ ডিসেম্বর- মেজর আফছার উদ্দিন তাঁর দলের কোম্পানী কমান্ডার কুদ্দুছ খান, গিয়াসউদ্দিন ও কোম্পানী কমান্ডার নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রমণ করেন উক্ত পলায়নরত পাকবাহিনীকে। মেজর সাহেব পাকবাহিনীর ওপর তুমুল আক্রমণ চালিয়ে ৪০ জনকে হত্যা করেন এবং ১৮ জনকে অস্ত্রশস্ত্রসহ জীবন্ত ধরে ফেলেন। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ১৭ ডিসেম্বর তিনি ঢাকা পৌঁছেন। কুরমীটোলা ঘাঁটির নিকট পাকবাহিনীর ২ জন সৈন্য মারা যায়। বাকী মৃত সৈন্যদেরকে নিয়ে মেজর আফছার ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছতে সক্ষম হন।

আফছার ব্যাটালিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকাঃ অধিনায়ক -মেজর আফছারউদ্দিন আহমেদ; সহকারী অধিনায়ক- মোমতাজউদ্দিন খান (শহীদ); নাজিমউদ্দিন (শহীদ); আবদুল হাকিম; আবুল কাশেম এবং হাফিজুর রহমান। এডজুট্যান্ট- এ, এম এম মোছলেহউদ্দিন আহমেদ বি,এ; সিকিউরিটি অফিসার- মোঃ আখতার হোসাইন মন্ডল; সহ-সিকিউরিটি অফিসার- মোঃ আঃ হামিদ (গফরগাঁও), কোয়াটার মাস্টার - ডাঃ হাফিজউদ্দিন আহমেদ ও এ, কে, এম আছাদুজ্জামান; মোঃ মোছলেহ উদ্দিন (ডাকাতিয়া) ও নুরুল আমিন, মোঃ ফজলুল হক বেগ ও এস,এস ওমর আলী, মোঃ আবদুল গফুর মাস্টার ও মোছলেহ উদ্দিন (রসুলপুর) এবং মোঃ আবদুল মোতালিব; সুবেদার মেজর - সুলতান আহমেদ; অফিস-ইন-চার্জ- মোঃ হাফিজুর রহমান; জে, সি, ও এডজুট্যান্ট- মোঃ আঃ মোতালেব হাবিলদার; একাউন্ট ক্লার্ক- মোঃ আবুল কাশেম; সহকারী ক্লার্ক-মোঃ নুরুল আমীন; ডিসপাচ ক্লার্ক- মোঃ আব্দুল খালেক; সহকারী ক্লার্ক- মোঃ শাহজাহান চৌধুরী; স্টেট ক্লার্ক- মোঃ জামালউদ্দিন; সহকারী ক্লার্ক- মোঃ আলী আকবর; রেকর্ড ক্লার্ক এফ, এম আবুল কাশেম; সহকারী ক্লার্ক - নুরুল হুদা চৌধুরী (ডুলু); বি, এইচ, এম- মোঃ আবুল কাশেম (বখুরা) গফুরগাঁও; অডিটর মোঃ আঃ সবুর, বি, কম।

উপদেষ্টা পরিষদঃ ১। মেজর আফছারউদ্দিন আহমেদ, অধিনায়ক; ২। ডাঃ ওয়াইজউদ্দিন আহমেদ, মেডিক্যাল অফিসার; ৩। মোঃ হাফিজুর রহমান, অফিস-ইন-চার্জ; ৪। মোঃ আবদুল হাকিম, কোম্পানী কমান্ডার; ৫। হাফিজ উদ্দিন আহমেদ; সাম্পাদক ‘জাগ্রত বাংলা’, ৬। আখতার হোসাইন মন্ডল, সিকিউরিটি অফিসার, ৭। মোঃ ফজলুল হক বেগ, কোম্পানী কমান্ডার; ৮। মোঃ আবদুল জলিল, কোয়াটার মাস্টার; ৯। মোঃ আনহারউদ্দিন মাস্টার, কোম্পানী কমান্ডার; ১০। এবং মোঃ ফজলুল ওয়াহাব।

বিচার বিভাগঃ ১। মেজর আফছারউদ্দিন আহমেদ, অধিনায়ক; ২। মোঃ সিরাজুল হক কোম্পানী কমান্ডার; ৩। আইয়ুব আলী, কোম্পানী কমান্ডার ৪। আখতার হোসাইন মন্ডল, সিকিউরিটি অফিসার; ৫। মোঃ হাফিজুর রহমান, অফিস-ইন-চার্জ; ৬। মোঃ চাঁন মিয়া, কোম্পানী কমান্ডার; ৭। আঃ হাকিম, কোম্পানী কমান্ডার; ৮। আবুল কাশেম, সহকারী অধিনায়ক; সামছউদ্দিন, কোম্পানী কমান্ডার; ১০। এ,এন,এম, মোছলেহউদ্দিন আহমেদ, এডজুট্যান্ট।

শাসন বিভাগঃ ১। মেজর আফছার উদ্দিন আহমেদ, ২। মোঃ আবদুল হাকিম, ৩। আনছারউদ্দিন মাস্টার, ৪। হাফিজুর রহমান, ৫। আবুল কাশেম, ৬। আব্দুল জলিল, ৭। ফজলুল হক বেগ, ৮। আখতার হোসাইন মন্ডল, ৯। চাঁন মিয়া, ১০। ফজলুল ওয়াহাব।

কোম্পানী কমান্ডার ও সহকারী কোম্পানী কমান্ডারবৃন্দ-

১ম ব্যাটালিয়ন

কোম্পানী কমান্ডার	সহকারী কোঃ কমান্ডার
‘এ’ কোম্পানী মোঃ চাঁন মিয়া	মোঃ কাজিমউদ্দিন
‘বি’ ” মোঃ আবদুল কুদ্দুছ খান	মোঃ মজিবুর রহমান
‘সি’ ” মোঃ আইয়ুব আলী	মোঃ আঃ বারী মাস্টার
‘ডি’ ” মোঃ আঃ হাকিম	মোঃ ছিদ্দিক হোসাইন
‘ই’ ” মোঃ আনছারউদ্দিন মাস্টার	মোঃ সিরাজুল হক

২য় ব্যাটালিয়ন

‘এ’ কোম্পানী শামছউদ্দিন আহমেদ	মোঃ মুজিবুর রহমান
‘বি’ ” মোঃ কাছিমউদ্দিন	মোঃ আঃ হালিম
‘সি’ ” মোঃ নাজিমউদ্দিন	মোঃ হাসমত আলী
‘ডি’ ” মোঃ ফয়েজউদ্দিন	মোঃ জবান আলী
‘ই’ ” মোঃ আঃ মজিদ	মোঃ আবুল কাশেম (ফুলপর)

৩য় ব্যাটালিয়ন

‘এ’ কোম্পানী বশিরউদ্দিন আহমেদ	তমিজউদ্দিন আহমেদ
‘বি’ ” মোঃ ফজলুল ওয়াহাব	মোঃ আইয়ুব আলী
‘সি’ ” মোঃ ওয়াহেদ আলী	মোঃ হাতেম আলী খান
‘ডি’ ” মোঃ নূরুল ইসলাম	মোঃ আঃ ছাত্তার
‘ই’ ” মোঃ ফজলুল হক বেগ	মোঃ সিরাজুল হক (কাঠালী)

৪র্থ ব্যাটালিয়ন

‘এ’ কোম্পানী মোঃ শামসুর রহমান	মোঃ আঃ রশিদ
‘বি’ ” মোঃ সিরাজুল হক (গফরগাঁও)	মোঃ খোরশেদ আলম
‘সি’ ” এমদাদুল হক (ডুলু)	মোঃ সিরাজুল হক (কাচিনা)
‘ডি’ ” মোঃ আঃ রাজ্জাক	মোঃ আনছারউদ্দিন মুন্সী (গফরগাঁও)
‘ই’ ” মোঃ খলিরুর রহমান	মোঃ নজরুল ইসলাম

৫ম ব্যাটালিয়ন

‘এ’ কোম্পানী মোঃ আলাউদ্দিন আহমেদ	মোঃ আঃ কাশেম (বোকাইনগর)
‘বি’ ” গিয়াসউদ্দিন আহমদ	মোঃ সিরাজুল হক (রায়মনি)
‘সি’ ” মোঃ আঃ করিম পাঠান	আঃ মান্নান (আমিরাবাড়ী)
‘ডি’ ” মোঃ এস,এম, শামসুল হক (খোকন)	মোঃ নূরুল আমীন খান
‘ই’ ” মোঃ আঃ ছামাদ	মোঃ আঃ মোতালেব খান।

হেমায়েত বাহিনী *

যে গোপালগঞ্জের এক মহান সন্তানের ভাবমূর্তি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠভাবে নেতৃত্ব দান করেছে তারই আরেক সন্তান হেমায়েতউদ্দিন গোপালগঞ্জ এলাকায় স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে এ সম্পর্কেই আলোচনার প্রয়াস পাবো।

হেমায়েতউদ্দিন ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন হাবিলদার। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চের কালো রাত্রে হানাদার বাহিনী যখন ঢাকায় আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে তখন তিনি জয়দেবপুর ছাউনিতে ছিলেন। এখানে অবস্থানরত ২য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট তখনও সরকারী নিয়ন্ত্রণে ছিল। ২৭ শে মার্চ সর্বপ্রথম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের (বর্তমানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি) কণ্ঠস্বর ঘোষিত হলো, ‘আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি’। এই ঘোষণা শ্রুত হবার কিছুক্ষণ আগে বা পরে মেজর কে, এম, শফিউল্লাহ মর্টার প্লাটুন ও একটি কোম্পানী নিয়ে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি মেজর মঈনুল হোসেনকে একটি গোপন নির্দেশ দিয়ে গেলেন, যার ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাউনির মধ্যস্থ সমস্ত বাঙ্গালী পরিবারকে গ্রামের দিকে পাঠিয়ে দেয়া শুরু হলো। হাবিলদার হেমায়েতউদ্দিন ও আব্দুল আজিজকে ৩৮ জন জোয়ান নিয়ে দক্ষিণের রথখোলার পেট্রোল ডিউটিতে পাঠানো হলো। তারা ডিউটিতে যাবার সময় অন্য কোন নির্দেশ পাননি। শুধু পরস্পর জানতে পেরেছিলেন যে, গভীর রাতে কয়েকটি গুলির আওয়াজ হলে সবাইকে পূর্বদিকের রানীর ঘাটে একত্রিত হতে হবে।

হঠাৎ রাত ১১ টায় গোলাগুলি শুরু হলো। অনর্গল গুলি হওয়ার ফলে অনেকে এটাকে বাইরের আক্রমণ বলে সন্দেহ করলো। হেমায়েত এবং আব্দুল আজিজের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিল। ফলে এই দলও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। হেমায়েতউদ্দিন জোয়ান আইয়ুব ও আলমকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঢুকে পড়লেন। তারা ভোর পাঁচটার

* ফরিদ থেকে প্রকাশিত মাসিক ‘গণমন’ (ডিসেম্বর, ১৯৭৭)-এর হেমায়েতউদ্দিন বীর বিক্রম শীষক প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।
হেমায়েতউদ্দিন লিখিত যুদ্ধকালীন ডায়েরী এবং সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন এম, এ, সামাদ।

দিকে বুকে হেঁটে (ক্রলিং করে) শিবিরের দিকে অগ্রসর হন। তারা লক্ষ্য করলেন যে, অভ্যন্তরে বঙ্গালী কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বরং কয়েকজন পাঞ্জাবী জোয়ান বাইরের সাহায্যের প্রতীক্ষায় তখনও পূর্বদিকের গেট পাহারা দিচ্ছে। সুযোগ বুঝে এরা তিনজন বালিকা বিদ্যালয়ের গা ঘেঁষে অগ্রসর হন এবং পাহারারত এই পাঁচজন পাঞ্জাবী সৈনিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের খতম করে দেন। অতঃপর ভেতরে প্রবেশ করে তারা আরও ৮ জনকে হত্যা করেন এবং আহতদের বেয়নেট দিয়ে শেষ করেন। দক্ষিণ পাশে অফিস সংলগ্ন অয়ারলেস সেন্টারের অপারেটরদের মধ্যে জীবিত দুজনকে তারা এস এম-জির ব্রাশ করে খতম করে ফেলেন। এই নিধনযজ্ঞ সমাপ্ত করে তারা আবার ছাউনিতে ফিরে এসে চতুর্দিক থেকে বাইরের লোক আহবান করেন। বাঙ্গালী কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে চারদিক থেকে লোকজন এসে পড়লো। এদের মধ্যে ই,পি, আই, ডিসির শ্রমিক নেতা আবদুল মোতালেব ও প্রচুর ছাত্র ও শ্রমিক ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো হেমায়েতের নেতৃত্বে অস্ত্র অপসারণ।

এখান থেকে হেমায়েতউদ্দিন শতাধিক অস্ত্র, প্রচুর গোলাবারুদ, ৩টি গাড়ী এবং কয়েকজন জোয়ান নিয়ে পূর্ব দিকে মাত্র হাইস্কুলে চলে যান। অবশ্য দু'দিনের মধ্যেই ২০ জন ছাড়া বাকী সকলেই অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। অবস্থা দেখে ৩০শে মার্চ তিনি এই ২০ জন জোয়ানসহ কাপাসিয়া থানার দিকে অগ্রসর হন। সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন ২৭শে মার্চ রাতে জয়দেবপুর থেকে মেজর কে. এম শফিউল্লাহর নেতৃত্বে বেরিয়ে আসা বাহিনী এখান দিয়ে চলে গেছে। ইতিমধ্যেই পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ জোরদার হবার ফলে কাপাসিয়া অবস্থান নিরাপদ নয় দেখে হেমায়েতউদ্দিন তাঁর লোকজন নিয়ে একটা বিশেষ লঞ্চে বর্মী গমন করেন। যেখান থেকে পায়ে হেঁটে ঢাকা-ময়মনসিংহ সীমান্ত বরাবর 'কাওরাইদ' নামক স্থানে পৌঁছেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার আবুল বাশার ও নায়েব সুবেদার মীর মোশারফ হোসেনের নেতৃত্বে এখানে একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠেছিল। হেমায়েত তাঁর ২০ জন সঙ্গীসহ এখানে তাদের সাথে যোগদান করেন। এই ক্যাম্প সেনাবাহিনীর লোকের চেয়ে আনসার ও মোজাহিদ বাহিনীর লোক বেশী থাকার ফলে তাদের কার্যকলাপে 'কাওরাইদ' ক্যাম্পে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং নিয়মিত বাহিনীর জোয়ানদের মন বিগড়ে যায়।

ফলে ৯ই এপ্রিল ফরিদপুর ও বরিশালের মাত্র ১১ জন সংগী নিয়ে হেমায়েত ফরিদপুর রওয়ানা হন। তার সাথে কাপাসিয়ার ইব্রাহিম নামক একটি যুবকও ছিল। এদের প্রত্যেকের সাথে ছিল ১টি করে চাইনিজ রাইফেল ও ৮০০ রাউন্ড গুলি। এ ছাড়া ২টি হালকা মেশিনগান, ৪টি চাইনিজ এস,এম,জি ও ৪০০০ গোলা-বারুদও তাদের সাথে ছিল। গ্রাম থেকে লোক ধরে এনে তাদের দিয়ে বোঝা টানিয়ে এবং পথ দেখিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছিলেন। গজারী বন পার হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে পাকবাহিনীর একটি ইউনিটকে তারা আক্রমণ করেন। এই সংঘর্ষে হেমায়েতের ৪ জন সংগী শহীদ হয়ে যান। কিন্তু তারা পাক-বাহিনীর ৫ খানা জীপসহ বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেন।

এভাবে কয়েকটি অপারেশন চালিয়ে অবশেষে ১৭ ই এপ্রিল অপরাহ্ন ২টায় এক জেলে নৌকায় পদ্মা পাড়ি দিয়ে হেমায়েত ও তার সঙ্গীরা নারারটেক চরে অবতরণ করেন। তারা ফরিদপুর পৌঁছে খন্দকার ওবায়দুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার সাথে জেলা বোর্ডের কমলাপুরস্থ ডাকবাংলায় দেখা করেন এবং জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করে পুলিশ বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ হাতে পাবার দাবী করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে ২১ শে এপ্রিল প্রত্যুষে পাকবাহিনী গোয়ালন্দে পৌঁছে যায় এবং ফরিদপুর শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের প্রতিহত করার কাজে সংশ্লিষ্ট কারো সহযোগিতা না পাওয়ায় সঙ্গীদের নিয়ে তিনি ভাঙ্গা উপস্থিত হন। সেখানে কিছু প্রশিক্ষণহীন যুবক প্রতিরোধ রচনার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে দলাদলি দেখে হেমায়েতউদ্দিন নৌকাযোগে টেকেরহাট হয়ে 'বাঘিয়ার বিল' অতিক্রম করে ২৬শে এপ্রিল 'ফান্দি' নিজ গ্রামে বাড়ীতে উপস্থিত হন। তার গ্রামের নিরীহ জনসাধারণ ও আত্মীয়স্বজন ইতিমধ্যেই পাক-বাহিনীর অত্যাচারের

কথা শুনে এবং দুর্বৃত্তদের দৌরাড্য দেখে সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। হেমায়েত বাড়িতে যেতেই নিরীহ গ্রামবাসীর তাকে এ বিদ্রোহের পথ পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করে, আর দালাল দুর্বৃত্তরা ভয় দেখাতে থাকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেমায়েতর স্ত্রী হাজেরা ৭ই মে এক দুর্ঘটনার মারা যায়। চান মিয়া নামক একজন মাতবর শ্রেণীর লোক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে দল পাকাতো শুরু করলে ৯ই মে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অতঃপর হেমায়েত বাড়ি থেকে লোকজনসহ পার্শ্ববর্তী ‘পিঠা বাড়ী’ গ্রামে চলে যান। অবশ্য তিনি তার সাথীদের আগেই বিদায় করে দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম এবং সোলায়মান ছাড়া আর কেউ তার সাথে ছিলো না।

৯ই মে চাঁন মিয়ার হত্যার দিনই কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ থানা থেকে পুলিশ ও পাকবাহিনী এসে হেমায়েতের বাড়ি পুড়িয়ে তার শেষ আকর্ষণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এরপর হেমায়েত বেপরোয়া হয়ে উঠেন এবং সত্যিকারভাবে নতুন করে সংগ্রামের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন।

কয়েকদিন পর ১৪ ই মে ভোরবেলা হেমায়েত তাঁর সঙ্গী ইব্রাহিম ও সোলায়মানকে নিয়ে কোটালীপাড়া থানা আক্রমণ করে বসেন। তাদের আধুনিক অস্ত্রের মার এবং বেপরোয়া বীরত্বের কাছে মুহূর্তেই ৫৪ জন পুলিশ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অভ্যন্তরীণভাবে শক্তি সঞ্চয় করে এ ধরনের সাফল্য গ্রাম বাংলায় এটাই প্রথম! এতে স্থানীয় জনসাধারণ বিপুলভাবে উৎসাহিত হল। হেমায়েত থানা থেকে ৫ মণ চাউল ও অন্যান্য রসদ নিয়ে বাঘিয়ার বিলের কলাবাড়ী গ্রামের চিত্ত গয়ানের বাড়িতে চলে যান। পরে পীরের বাড়ীর আওয়ালী লীগ কর্মী লক্ষ্মীকান্ত বলের অনুরোধে হেমায়েত তার গ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করেন। এ সময় গৌরনদী অঞ্চলের ১২ জন সশস্ত্র জোয়ান ও কিছু ছাত্র হেমায়েতের সাথে যোগ দেয়।

পাকবাহিনীর লোকেরা নদীপথে খোঁজাখুঁজি করলেও বিলের অভ্যন্তরে মোটেও প্রবেশ করত না। তবে এখানে দল সংগঠনে তেমন সুবিধা না হওয়ায় হেমায়েত গৌরনদী চলে যান এবং ২৯শে মে বরিশাল গৌরনদী থানার ‘বাটরা বাজারে’ আনুষ্ঠানিকভাবে হেমায়েত বাহিনী উদ্বোধন করেন। এর আগে ২৬শে মে তারিখে এক সফল আক্রমণের ফলে এই বাটরা বাজার তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

শীঘ্রই বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুলসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এই বাহিনীতে যোগ দিতে আরম্ভ করে। স্থান সংকুলানে অসুবিধা হওয়ায় পশ্চিম দিকে পয়সার হাটের উত্তরে রাজাপুর নামক গ্রামে তিনি সদর দফতর স্থাপন করেন।

১লা জুন বরিশাল ও ফরিদপুরের এই অঞ্চলে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। দেশের এই অঞ্চলেই সর্বপ্রথম মুক্ত অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুজিবনগর বেতার কেন্দ্র থেকেও এ কথা প্রচার করা হয়।

৩রা জুন পাকবাহিনীর এক বিরাট দল কোটালীপাড়া থানায় উপস্থিত হয় এবং রাত্রে নৌকাযোগে কোটালীপাড়া ও পয়সার হাটের খাল বেয়ে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করতে এগিয়ে যায়। এই দলে ১২ খানা নৌকায় পুলিশ, লাঠিয়াল ও পাকবাহিনীর প্রায় ৩০০ লোক ছিল। রাত দু’টায় হেমায়েত তার বাহিনী নিয়ে অগ্রবর্তী ‘হন্যহাটি’ নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে খালের দু’পার থেকে এদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। পথে এই আক্রমণের জন্য পাকবাহিনীর প্রস্তুত ছিল না; তাই এই আতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তবে হেমায়েত বাহিনীর ইব্রাহিম শাহাদাৎ বরণ করেন। এই আক্রমণের ফলে ২৪ জন পুলিশ ও লাঠিয়াল ধরা পড়ে।

এই নাজেহাল অবস্থায় প্রতিশোধ নেবার জন্য ৭ই জুন পুনরায় ৩খানা ‘স্টীল বডি’ লঞ্চ নিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে পাকবাহিনী ‘রাজাপুর’ ঘাঁটি আক্রমণ করে। হেমায়েত কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে লঞ্চগুলোকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেন। অপর দিকে ঘাঁটির বাঁকার থেকে সামনের দিক গিয়ে গোলাবর্ষণ শুরু করা হয়। উপায়ন্তর না দেখে লঞ্চগুলো পালাতে শুরু করে এবং শাতলা গ্রামের বাঁক ঘুরে কোন রকমে পালিয়ে রক্ষা পায়।

এই দৃশ্যে জনসাধারণ বিপুলভাবে আনন্দিত হয়। তারা হেমায়েত বাহিনীর এই দলটিকে কাঁধে তুলে ‘পয়সার হাঁটে’ নিয়ে আসে। সেখানে তড়িঘড়ি এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়ে যায় এবং হেমায়েতকে জনসাধারণ ‘মেজর’ খেতাবে ভূষিত করে। এই যুদ্ধের ফলে প্রায় ২০ মাইল এলাকা মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়। এই সময় শাতলা গ্রামে নদীর বাঁকে একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটিও স্থাপন করা হয়।

এরপর রাজাপুর থেকে সরে গিয়ে জহরের কান্দি হাইস্কুলে ঘাঁটি স্থাপন করে সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলা হয়। দলে দলে যুবক-ছাত্র জনতা এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে লাগল। পক্ষান্তরে এ সময় ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলারাও কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে দলে ভিড়তে লাগলো। অতঃপর, কালকিনি থানার চলবল গ্রামে অপারেশন ঘাঁটি সরিয়ে নেয়া হয়। ১১ই জুলাই টুঙ্গীপাড়া শেখ বাড়িতে দেড়শত পাঞ্জাবী সৈন্যের বিরুদ্ধে এক সফল আক্রমণ পরিচালনা করা হয়।

১৪ই জুলাই পাকবাহিনী মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও টেকেরহাট-এই তিন দিক থেকে আবার চলবলের ঘাঁটির উপর হামলা চালায় এবং ক্যাম্পের কাছে রামশীল নামক গ্রামে ঢুকে পড়ে। হেমায়েতের সাথে তখন মাত্র ১৩ জন সঙ্গী ছিলো। এদের নিয়েই তিনি অগ্রসর হন এবং এই হামলা প্রতিহত করার প্রয়াস পান।

রামশীল গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটি খাল গৌরনদী থানার বাসাইল গ্রামের দিকে চলে গেছে। গৌরনদী থেকে ঐ খাল বেয়ে হানাদার বাহিনী আসতে পারে ভেবে পূর্ব দিকে মুখ করে ৩ জন, দক্ষিণ দিকে মুখ দিয়ে ৩ জন এবং সংকেত দেবার জন্য বাইরে একজন বসানো হলো। অতঃপর হেমায়েত বাকী ৬জন পশ্চিমমুখী হয়ে বসলেন। কোটালী পাড়া বান্দাবাড়ী খালের মধ্যে দিয়ে হানাদার বাহিনী অগ্রসর হতে পারে মনে করেই তিনি এ জায়গায় অবস্থান নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এদিক থেকেই হানাদারদের অগ্রগামী বাহিনী দেখা গেল। তারা কাছাকাছি আসতেই হেমায়েত মেশিনগানের গুলি চালালেন। তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ শত্রুপক্ষের একটা বুলেট তার সহকর্মী মকবুলের মাথায় খুলি ভেদ করে চলে গেলে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। মকবুলের লাশ টানতে যেতেই একটা শেলের টুকরো হেমায়েতের গালের বাঁ পাশ দিয়ে ঢুকে ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এতে জিহবার খানিকটা কেটে গেল এবং কয়েকটা দাঁতও পড়ে গেল। তবুও তিনি কর্তব্যচ্যুত হলেন না। বরং অসীম সাহস আর প্রবল প্রতাপের সাথে পাল্টা আক্রমণ রচনা করে চললেন। এভাবে দীর্ঘ সময় তুমুল সংঘর্ষের পর হানাদার বাহিনী পিছু হটতে শুরু করলো। এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর প্রচুর হতাহত হয়। যুদ্ধের পর হেমায়েত বুঝতে পারলেন যে আঘাত খুবই সাংঘাতিক, ফলে তাকে দীর্ঘদিন রাজ্যেশ্বর ডাক্তারের চিকিৎসায় থাকতে হয়।

একস্থানে বেশী দিন ঘাঁটি রাখা যায় না। কারণ, পাকবাহিনীর খোঁজ পেলেই সেখানে আক্রমণের আশংকা দেখা দেয়। তাই রামশীলের যুদ্ধের পর আর চলবল ঘাঁটি রাখা মোটেই নিরাপথ নয়। তাছাড়া যে কোন সময় বিমান আক্রমণ ও অসম্ভব নয়। তাই ঘাঁটি সরিয়ে গোপালগঞ্জের পূর্ব সীমান্তে বিলের উত্তর প্রান্তে ‘রুখিয়ার পাড়ে’ একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ছাউনি ফেলা হলো। এ বাড়ির প্রায় সকলেই ভারতে চলে গিয়েছিল। পাঁচখানা দোতলা ঘর নিয়ে বেশ বড় বাড়ি। এখানেই জুলাই মাসের শেষ দিকে ‘এসোসিয়েটেড প্রেসের’ একজন সাংবাদিক হেমায়েতের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ ‘দি সান’ নামক পত্রিকার ৪ঠা আগষ্ট সংখ্যায় হেমায়েতের ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

ওদিকে কোটালীপাড়া থানায় পুনরায় অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্যশস্য মওজুদ করার খবর পাবার পর ১৫ই সেপ্টেম্বর তারা আবার কোটালী পাড়া থানা আক্রমণ করেন। ১৪ ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর থানা দখলে আসে। প্রচুর খাদ্যশস্য ও গোলাবারুদ হস্তগত হলো। অতঃপর হেমায়েত বাহিনী ৩রা ডিসেম্বর শেষবারের মত কোটালী পাড়া থানা দখল করেন।

কোটালীপাড়ায় আরও তিন জায়গায় পাকবাহিনীর ঘাঁটি ছিল- ঘাগোর গুদাম ঘর, কুরপালামু কম্যুনিটি সেন্টার এবং গোপালগঞ্জ মাদ্রাসায়। ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে এই সব ঘাঁটি নাস্তানাবুদ করে দেয়া হয়। ৩ রা ডিসেম্বর যুদ্ধের ফলে চূড়ান্তভাবে এই থানা মুক্ত হয়ে গেল। এই যুদ্ধে জেলা অধিনায়ক ক্যাপ্টেন নুর মোহাম্মদ বাবলুও তার সাথে ছিল।

হেমায়েত বাহিনীর কর্মক্ষেত্র ছিল বরিশালের উজির পুর ও গৌরনদী থানা, ফরিদপুরের কালকিনি, মাদারীপুর, রাজৈর, গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া। মকসুদপুর, কাশিয়ানী এবং খুলনার মোল্লারহাট থানার অংশ বিশেষ ও তার কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে উঠেছিল এই হেমায়েত বাহিনী। তার দলে মুক্তিযোদ্ধা ছিল ৫০৫৪ জন। তাদের মধ্যে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী লোক ছিল ৩৪০ জন। এদের সাহায্যে তিন কোটালীপাড়া থানার জহরের কান্দি হাইস্কুলে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলেন এবং তিন মাসে প্রায় চার হাজার যুবককে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। এদের মধ্যে দেড় হাজার গরীব শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ৯৫.০০ টাকা হিসেবে বেতনও দেয়া হতো। কোটালীপাড়া, নারকেলবাড়ীর চার্চমিশনে একটি সংক্ষিপ্ত নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও খোলা হয়েছিল। সেখানে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি হাসপাতালও পরিচালনা করা হত।

আগেই বলা হয়েছে হেমায়েত বাহিনী ছিল সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে ওঠা একটা সংগঠন। এদের অস্ত্রশস্ত্রের বেশীর ভাগই ছিল পাকবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া। তারা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আঠারটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করেন। এই বিরাট সাফল্য মূলতঃ হেমায়েতউদ্দিনের নিষ্ঠা এবং তার সঙ্গীদের দায়িত্ববোধ আন্তরিকতা ও আনুগত্যের ফলেই সম্ভব হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এমন একক প্রচেষ্টায় অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানের নজীর বিরল। বাংলাদেশের সরকার এই বীর যোদ্ধার কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ‘বীর বিক্রম’ খেতাবে ভূষিত করেন।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-১

সাক্ষাৎকার* : মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) বীর বিক্রম

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে অর্থাৎ মে মাসের শেষের দিকে আগরতলার এক ক্যাম্পে আমাদের ‘কমান্ডো’ আক্রমণের কলাকৌশল সম্পর্কে ক্লাশ নিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন হায়দার (পরবর্তীকালে কর্নেল)। ক্লাশ চলাকালে ক্যাম্প পরিদর্শনে এলেন ২নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ (পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার)। সেখানে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবলকে দৃঢ় করার জন্য সংক্ষিপ্ত এক জুলাময়ী ভাষণ দেন। এরপর তিনি একটি ‘সুইসাইড স্কোয়াড’ গঠন করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই স্কোয়াড পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ছিলো ঢাকা শহরে দখলদার সামরিক বাহিনীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা, সেই সঙ্গে বিদেশী সাংবাদিক এবং বিদেশী অর্থনৈতিক সাহায্যদাতা সংস্থার লোকজনের মধ্যে এই ধারণা দেয় যে, ঢাকা শহরের কেন্দ্রবিন্দুতেও মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ও আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে।

জুনের প্রথমে আমাদের ১৬ জনের দলটি ঢাকার দিকে রওয়ানা দেয়। আমাদের এই ১৬ জনের কাছে জনপ্রতি ৪টি করে গ্রেনেড এবং ২০ পাউন্ড করে বিস্ফোরক ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। ঢাকা আসার পথে

* ‘রোববার’ বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৮১-এ প্রকাশিত জিল্লুর রহিম-রচিত ‘ঢাকা শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম সকল অভিযান’ শীষক প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

দলের ৪ জন সদস্য স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিরে যান। ৬ই জুন আমরা ঢাকা শহরে প্রবেশ করি। ঢাকায় এসে আমরা জানতে পারলাম যে ৯ই জুন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সামরিক জাস্তা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। প্রিন্স সদরুদ্দিনসহ অর্থনৈতিক সাহায্যদাতা সংস্থার বেশকিছু প্রতিনিধি এবং বিদেশী সাংবাদিক এসেছিলেন। তারা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ছিলেন। সামরিক জাস্তা তাদের ভেতর প্রচার করেছিল যে ঢাকা শহর সম্পূর্ণ শান্ত। দেশের কোথাও মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে না, শুধু সীমান্ত এলাকায় সামান্য গোলমাল ছাড়া। আমরা সেই ধারণা পাল্টানোর জন্য প্রথমে ইন্টারকন্টিনেন্টালে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অপারেশনের দিন ঠিক করা হয় ৯জুন। কারণ, ঐদিন রাত ৭-৩০ মিনিটে বিদেশী সাংবাদিক ও সাহায্যদাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সম্মানে সামরিক জাস্তা নৈশভোজের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রথমে আমরা ইন্টারকন্টিনেন্টালে ‘রেকি’ করি। আমরা সব সময় ‘রেকি’র ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতাম। কারণ, অভিযানের সাফল্য শতকরা ৯০ ভাগ নির্ভর করে সঠিক ‘রেকি’র ওপর। রেকিতে আমার সঙ্গে ছিলো আলম ও জিয়া। রেকি করার দিন বিকেলবেলা একটি গাড়িতে করে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই আমরা হোটেলের সামনে নেমে ভেতরে যাই। প্রথম আমাদের কাজ ছিলো অপারেশনটা কিভাবে পরিচালনা করা যায় সে সম্পর্কে হোটেলের ভেতরের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেয়া। সিদ্ধান্ত মোতাবেক রেস্টুরেন্টে যাই এবং কিছু খাওয়া-দাওয়ার ছলে আমাদের প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করে ভেতরের সকল অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকবহাল হয়ে ফিরে আসি। শেলটারে ফিরে আমরা দলগতভাবে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে পর্যালোচনা করার পর আক্রমণের কৌশল নির্ধারণ করি। আমরা শুধুমাত্র গ্রেনেড ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য ৬ জনের একটি দল যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। অপারেশনের জন্য একান্তভাবে গাড়ির প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের কোন গাড়ির ব্যবস্থা ছিলো না।

ইন্টারকন্টিনেন্টালে যেদিন অপারেশন করেছিলাম সেইদিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৬-৩০ মিনিটের পর গুলশান থেকে একজন অবাস্তবিকারী একটি গাড়ি জোরপূর্বক সংগ্রহ করা হয়। ঐ গাড়িতেই ৬ জনের ‘অপারেশন গ্রুপ’ নিয়ে আমরা রওয়ানা হই। বাদল মামা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়ির সামনের সিটে ছিলেন চুলু ভাই ও স্বপন। পেছনে আমি জিয়া ও আলম। হোটেলের সামনের দিকে গাড়ি থামিয়ে আমরা তিনজন নেমে পড়লাম। তখন ইন্টারকন্টিনেন্টালে সামনের দিকটায় উঁচু কয়েকটি গাছ ছিলো। গাড়ি থেকে নেমে সামনের দেয়াল টপকে আমরা ভেতরে প্রবেশের করে অবস্থা অন্ধকারে গাছের অড়ালে চলে যাই। ঘড়ির কাঁটার সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের সময় অতিবাহিত হচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তে আমরা তীক্ষ্ণতার সঙ্গে লক্ষ্য করে হোটেলের মূল প্রবেশ পথে পরপর তিনটি গ্রেনেড ছুড়ে ফেলি। গ্রেনেডগুলো বিস্ফোরিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়ে থাকি। ইতিমধ্যে বিস্ফোরণের শব্দে লোকজনের ছোটোছুটি, চিৎকার শুরু হয়েছে। আমরা দেয়াল টপকে তড়িৎ গতিতে গাড়িতে উঠে পড়ি।

আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাড়ি ঘুরিয়ে আমরা চলে যাই রমনা থানার কাছে জনৈক জামাত নেতার বাড়িতে। সেখানে তখন হানাদার বাহিনীর তাবেদার শান্তি কমিটির লোকজনের এক সম্মেলন চলছিলো। আকস্মিকভাবে আমরা গাড়ি নিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ে পরপর তিনটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে চোখের নিমেষে গাড়ি ঘুড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যাই। সেদিন আমাদের সিদ্ধান্ত ছিলো ইন্টারকন্টিনেন্টালে অপারেশন সফল হলে ঢাকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আক্রমণ করা। তাই রমনা থেকে সোজা চলে যাই ‘দৈনিক পাকিস্তান’ (দৈনিক বাংলা) ও ‘মনিং নিউজ’ সংবাদ-পত্র অফিসের সামনে। চলন্ত অবস্থায় সেখানে ২ টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আমরা পুরানা পল্টনের গলিতে ঢুকে পড়ে সেখানে গাড়ি ফেলে নিরাপদে ফিরে যাই।

ঢাকা শহরের একই দিনে আমরা তিনটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম। সেদিনের ঘটনা আজো আমার স্মৃতিতে ভাসে, কারণ, এই আক্রমণ ছিলো ঢাকা শহরের প্রথম সকল গেরিলা অভিযান।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-২

সাক্ষাৎকার* : এ, মাসুদ (চুলু)

“আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ফার্মগেটে আমরা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পে এক সফল গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম। এই অপারেশনের দিনটি আমার কাছে এই জন্য স্মরণীয় যে সেদিনের ঘটনার সবকিছু আজো চোখের সামনে ভাসে। তখন গুলশানে আমাদের ‘শেলটার’ ছিলো। ফার্মগেটে সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প কিছু সিপাইসহ একজন ক্যাম্পেট র‍্যাংকের অফিসার থাকতো। ফার্মগেট দিয়ে চলাচলকারী সকল গাড়ী ও লোকজনকে তারা তল্লাশী করায় আমরা চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছিলাম। তাই এই ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রথম রেকি করলাম আমি, মায়া, বদি ও কাজী। রেকির পর সিদ্ধান্ত হলো যে, ক্যাম্প আক্রমণ করতে আমরা সক্ষম হবো। ফার্মগেট আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেবার পর দ্বিতীয় দফা রেকির জন্য পাঠানো হলো উলফত ও দুলালকে। প্রথম ও দ্বিতীয় রেকি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আক্রমণের কৌশল নির্ধারণ করি।

সামাদ ভাইয়ের তৎকালীন মগবাজারের বাড়িতে আমাদের অপারেশন গ্রুপের অবস্থান ছিলো। অপারেশনের আগে ফার্মগেট সামরিক ক্যাম্পের খুব কাছে একটি বাড়ি থেকে দুলাল টেলিফোনে সামরিক ক্যাম্পের সর্বশেষ তৎপরতা এবং অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করছিলো। অপারেশনে আমরা দুটো গাড়ি ব্যবহার করেছিলাম। অপারেশনের গাড়িটি ছিলো সামাদ ভাইয়ের, চালাচ্ছিলেন সামাদ ভাই নিজেই। তাঁর সঙ্গে ছিলো আলম, কাজী, পুলু, উলফত ও বদি। সামাদ ভাইয়ের গাড়ি চালনার ভেতর সেদিন যেন যাদুর স্পর্শ ছিলো। সে এক অকল্পনীয় কৌশল। আমি পেছনে কভার গাড়িতে ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলো কাজী দস্তগীর, জিয়া ও আনু। এখন যেখানে ফার্মগেট ওভারব্রিজ সেখানে রাস্তার দু’পাশে সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারা ছিলো। অপারেশনের জন্য আমরা ত্বরিত কৌশল গ্রহণ করেছিলাম।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এমন সময় অপারেশন স্থলে পৌঁছে লক্ষ্য করলাম সেনাবাহিনীর কয়েকজন লোক টুলের ওপর বসে গল্প করছে ও কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো, আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করা যাতে হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। প্রথমেই ২ টি এস-এমজি দিয়ে আলম ও পুলু দু’দিকে গার্ড দুজনকে বুলেটবিদ্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে ক্যাম্পের ভেতর ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। এই ত্বরিত আক্রমণে পাকসেনারা হতভম্ব হয়ে যায়। আতঙ্কে তাদের ছুটোছুটিতে এক বিশৃঙ্খলা অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় পাল্টা আক্রমণের সুযোগ নিতে তারা সক্ষম হয়নি। এরই ভেতর সামাদ ভাই গাড়িটাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাস্তার সেই স্বল্প পরিসর জায়গায় মুহূর্তের ভেতর এমনভাবে ঘুরিয়ে নিলেন যা আমার কাছে আজো বিস্ময়কর- অলৌকিক মনে হয়। গাড়িটাকে তিনি এমনভাবে ঘুরিয়েছিলেন ঠিক যেন ডিগবাজির মতো। এই অস্বাভাবিক গাড়ি ঘুরানোর সাথে সাথেই আলম ও পুলু গাড়িতে উঠে পড়ে এবং গাড়ি থেকে পাকবাহিনীর প্রধান ক্যাম্প লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। সফল আক্রমণ পরিচালনা করে চোখের পলকে সামাদ ভাইয়ের গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়। সামাদ ভাই নিরাপদে আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মতিঝিলের নাভানা ওয়ার্কশপে পৌঁছে জামান ভাই ও আনোয়ার ভাইয়ের হেফাজতে আর্মসসহ গাড়ি রেখে ফিরে যান বাড়িতে। কভার গাড়ি নিয়ে আমরা গুলশানের শেলটারে পৌঁছাই। পরে জানতে পেরেছিলাম এই অপারেশনে ১ জন অফিসারসহ ১৭ জন পাকসেনা নিহত হয়েছিলো।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-৩

সাক্ষাৎকার* : আবদুস সামাদ, বিপি

একাত্তরের মার্চে আমার বাসা ছিল ৪১৫ নিউ ইষ্কাটন রোডে, এখন চীনা দূতাবাস অবস্থিত ঠিক তার পাশে। ঢাকা নিওন সাইন নামে একটি ছোট লাইটিং কারখানা ছিল আমার। ঢাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান,

* সূত্র পূর্বোক্ত।

* স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প কর্তৃক ৫-৬-৮৩ তারিখে গৃহীত।

ব্যাংক ইত্যাদিতে প্রাস্টিক সাইন সরবরাহ হতো আমার কারখানা থেকে। সে সময় যেহেতু ঢাকায় বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক প্রভৃতির কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ছিল অবাকালী, সেহেতু তাদের সাথে আমার ব্যবসায়িক যোগাযোগের সুবাদে আমি পাঞ্জাবী ও উর্দু ভাষাটা ভালোই শিখেছিলাম। এটা ঢাকায় গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা কালে আমার পক্ষে অনুকূল হয়েছিল। অনর্গল উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষা বলতে পারার কারণে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাস্থানীয় কোনও অবাকালী আমাকে ঢাকায় গেরিলাযুদ্ধের একজন সংগঠক বা সহায়তাকারীরূপে সন্দেহ করতে পারেনি।

যা হোক, ২৫ মার্চ সন্ধ্যা থেকে যখন সমস্ত শহরের পরিস্থিতি ক্রমেই থমথমে হয়ে উঠছিল এবং পাকিস্তানী সামরিক কার্যক্রমের আসন্নতা যখন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তখন আমার কারখানার কিছুসংখ্যক কর্মী এবং আমার বাড়ির পার্শ্ববর্তী আলী ডেকরেটরের আরও কিছু লোকজন মিলে নিউ ইস্কাটন রোডের কিছু জায়গায় গর্ত করা শুরু করে এবং দিলুরোডসহ আশেপাশের এলাকায় বহু ঠেলাগাড়ি জমা করে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে যেন পাকবাহিনী এই পথ দিয়ে অগ্রসর হতে না পারে। আমাদের আশংকা বাস্তবে রূপ নিতে বেশী দেরী হল না। রাতের মধ্যেই বাংলা মোটর (তৎকালীন পাকমোটর) হয়ে নিউ ইস্কাটন রোড ধরে পাকবাহিনীর সামরিক যানগুলি এগিয়ে এলো। মনে আছে, সামনের যে জীপগুলি ছিল, সেগুলির বাতি ছিল হলুদ রঙের। গাড়িগুলি আমাদের তৈরী ব্যারিকেডের সম্মুখীন হতেই প্রচণ্ড ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল। ফায়ারিংয়ের মুখে রাস্তাঘাট মুহূর্তেই ফাঁকা হয়ে গেল। আমরাও আত্মরক্ষার্থে বাসার ভেতরে আশ্রয় নিলাম। উন্মুক্ত গাড়িগুলি ব্যারিকেড চুরমার করে মৌচাক হয়ে রাজারবাগের দিকে ছুটে যায়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করতে পাকিস্তানী সামরিক যান এই নিউ ইস্কাটন রোডই ব্যবহার করেছিল।

ঢাকা শহর পাক কবলিত হওয়ার পর এপ্রিলের শেষের দিকে আমার বিশিষ্ট বন্ধু তৎকালীন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হামিদুল্লাহ খানের- যিনি পরে ১১নং সেক্টর অধিনায়ক কর্নেল তাহের আহত হওয়ার পর ঐ সেক্টরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সাথে তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে একদিন দেখা হয়। তিনি তখন পাক বিমানবাহিনী থেকে ডিফেস্ট করার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু ঠিক উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আমি তার পরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হলে তিনি আগরতলা চলে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন। এ ব্যাপারে আমি যোগাযোগে সাহায্য করি।

এ সময় আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গেরিলা ট্রেনিং চলার কথা শুনতে পাই, এবং কোনও গেরিলা দলের খোঁজ পাই কিনা তার জন্য অনুসন্ধান চালাতে থাকি। এই অবস্থার মধ্যে আমার বাড়ির নিকটের প্রতিবেশী পাকিস্তান রেডিও-এর একজন কর্মচারী হাফিজ ভাইয়ের বাসায় হঠাৎ একটি ছেলের মুখে মুজিবনগর এলাকায় জোর গেরিলা ট্রেনিং চলার কথা শুনতে পাই। আরও শুনতে পাই যে, অতি শীঘ্রই ভারত থেকে ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দল পাঠানো হবে। খবর শুনে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি এবং সত্যি সত্যি এরূপ গেরিলা দল এলে আমি তাদের সর্মতোভাবে সাহায্য করার আগ্রহ প্রকাশ করি। ছেলোটি তার নিজের আইডেন্টিটি গোপন রেখে শীঘ্রই একজন গেরিলা যোদ্ধাকে আমার কাছে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এর সপ্তাহ দু'য়েক পরেই হঠাৎ এক সকালে আমার বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে একটি ছেলে এসে হাজির। সে এসে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে আমার খোঁজ করতেই আমি তার কাছে আমার পরিচয় দিলাম এবং তাকে নিয়ে এসে আমার ড্রয়িংরুমে বসালাম। আমি গেরিলাদের যুদ্ধে সাহায্যদানে ইচ্ছুক কিনা সরাসরি জানতে চাইলে আমি তাকে আমার পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করি। নিশ্চিত হয়ে সে তখন গাজী দস্তগীর বলে নিজের পরিচয় দেয় এবং খুব শীঘ্রই সে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করবে বলে আমাকে জানায়। ঢাকায় গেরিলাদলের সাথে এ ভাবেই আমার প্রাথমিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে, এবং আমি তাদের কিভাবে সাহায্য-সহায়তা করতে পারি সেসম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করি। আমার কিছু পূর্ব সামরিক জ্ঞান ছিল এবং বেশকিছু সামরিক অফিসারের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। ভেতরে দেশপ্রেম কাজ করছিল, তারই প্রেরণায় আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত একটি হৃদয়হীন শক্তির মুখে সামরিক ছাউনি পরিবেষ্টিত ঢাকা শহরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিরোধের শিক্ষা জ্বালাতে আমি আমার

সামান্য সীমিত শক্তি নিয়োগে সংকল্পবদ্ধ হই। এটা সুবিদিত যে, গেরিলারা জনবিহীনভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। গণসমর্থন তাদের কাজের অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত। সে জন্য আমি প্রথম যে কাজটি করেছিলাম সেটা ছিল ঢাকায় আগত প্রথম গেরিলাদের জন্য শেলটারের ব্যবস্থা করা।

গাজী দস্তগীরের সাথে আলাপের কয়েকদিন পরই সে কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে আমার বাসায় চলে আসে। এরা ছিল ২ নং সেক্টরের মেলাঘর, নির্ভয়পুর প্রভৃতি স্থানে আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিংপ্রাপ্ত। এদের মধ্যে যাদের নাম এখনো আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল তারা হচ্ছেন মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়্যা (মায়্যা ক্র্যাক প্লাটুনের দায়িত্বপ্রাপ্ত), উলফত, জুয়েল এবং আরো দু'টি ছেলে যাদের নাম এখন আমার স্মরণে নেই। গাজী দস্তগীর এদের সবাইকে একে একে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানায় যে, তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে করে এনেছে। তখন গেরিলাদের ঢাকা প্রবেশের রাস্তা ছিল দু'টি- একটি বিবিরবাজার-কুমিল্লা হয়ে, অপরটি মীরপুরের নদীপথে মালিবাগ পর্যন্ত। গেরিলারা আমাকে জানানো, যে অস্ত্রশস্ত্র আনা হয়েছে সেগুলি তারা মালিবাগের একটি বাসায় রেখে এসেছে, রাস্তায় রাস্তায় পাকবাহিনীর জোর তল্লাশী চলায় সেগুলো তারা আমার বাসা পর্যন্ত আনতে সাহস পায়নি। অস্ত্রগুলি দু'টি বস্তায় ভর্তি। একটিতে ছিল কয়েকটি স্টেনগান, চাইনিজ রাইফেল, বুলেট ইত্যাদি। অপরটিতে ছিল, যাকে বলা হয় প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, অনেকটা গোলানো ময়দার মতো দেখতে, প্লাস্টিকের থলিতে ভর্তি। এ ছাড়া ছিল বিস্ফোরণ ঘটানোর অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

গেরিলারা অস্ত্রগুলি নিরাপদে রাখার ব্যাপারে স্বতঃই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। আমি তাদের এ ব্যাপারে আশ্বাস দিই, গাজী দস্তগীরের পরিচিত দু'টি ছেলেসহ আমার নিজের টয়োটা করোলা গাড়ি নিয়ে মালিবাগের সে বাসায় চলে যাই এবং বস্তাভর্তি অস্ত্রগুলি নিয়ে আসি এবং আমার অফিসের স্টীলের আলমারি খালি করে তাতে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি। দলে তখন আমরা ছিলাম মোট ৭ জন। আমাদের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতেই হবে, এই ছিল প্রতিজ্ঞা।

এভাবেই প্রথমে প্রশিক্ষিত জনে ও অস্ত্রে গেরিলা অপারেশনোপযোগী তৎপরতার প্রাথমিক ভিত্তি রচিত হবার পরই ঢাকায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী গেরিলা যুদ্ধের সূচনা ঘটে। গেরিলাদের আনা অস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আমার পূর্বধারণা বিশেষ কিছু ছিল না। তাই আমার বাসায় নিয়ে আসার পর আমরা সেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমার কাছে সবচেয়ে মারাত্মক ঠেকেছিল এক্সপ্লোসিভগুলি, সেগুলি ছুঁয়ে দেখতে সাহসে কুলোচ্ছিল না, ছিল টাইম পেপিল বোম, ইগনেটিং অয়ার, ডেটোনেটর ইত্যাদি বিধ্বংসী ধরনের নানা ডিভাইস।

অস্ত্রগুলি আনার পরদিনও আমরা সেগুলি নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখি। তারপর উলফত, মায়্যা, জুয়েল আমরা সবাই মিলে কিভাবে কোথায় অপারেশন চালানো যাবে এ নিয়ে পরিকল্পনা করি। মায়্যাকে ২ নং সেক্টর থেকে এই দলের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, এবং সেই জন্য তার দল পরিচিত ছিল মায়্যা ক্র্যাক প্লাটুন বলে। ঢাকা শহরে আমার বিশেষ অবস্থানগত কারণে- যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মায়্যা পরিকল্পিত অপারেশনগুলিতে স্থানীয়ভাবে আমার নেতৃত্ব ভূমিকা কামনা করে এবং আমি তার আগস্ট মাসে পাক সামরিক জাস্তার হাতে ধরা পড়ার পূর্বমুহূর্তে পর্যন্ত সানন্দে পালন করেছিলাম। গেরিলাদের ঢাকায় নিজ বাসগৃহে থাকার সমূহ অসুবিধা ছিল। গেরিলা যুদ্ধের জন্য অত্যাৱশ্যক গণভিত্তি হিসাবে আমি তাদের নিরাপদ শেলটারের ব্যবস্থা করেছিলাম, তাদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহ করেছিলাম- সমস্তই এককভাবে এবং তাদের অপারেশন সংগঠন ও পরিচালনায় সাহায্য করেছিলাম প্রত্যক্ষভাবে।

২ নং সেক্টরের অধিনায়ক তৎকালীন মেজর খালেদ মোশাররফ এবং গেরিলা প্রশিক্ষক মেজর, এ, টি এম হায়দার প্রায়শঃই গোপনে কুরিয়ার মারফৎ আমাকে চিঠিপত্র পাঠাতেন ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা এবং গেরিলাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। এক পর্যায়ে মুজিবনগর থেকে জেনারেল এম, এ, জি ওসমানীরও নির্দেশ সম্বলিত চিঠি পেয়েছিলাম।

ঢাকায় পরিকল্পিত গেরিলা অপারেশন চলাকালীন সময়ে আমরা দ্বিতীয় দফা আরও কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাই। এগুলো ছিল বিশেষ ধরনের এবং গেরিলাদের ভাষায় ছিল ঢাকা শহরকে কাঁপিয়ে তোলা মতো। অস্ত্রগুলি এসে পৌঁছেছিল স্বামীবাগের পুরনো একতলা একটি বাসায়, সেগুলি ছিল বয়স্ক এক মহিলার হেফাজতে। আমি দু'জন গেরিলা যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে অস্ত্রগুলো আনতে যাই। গেরিলা দু'জন উক্ত মহিলার পরিচিত থাকায় তিনি সন্দেহমুক্ত হয়ে দ্রুত অস্ত্রগুলো আমার হাতে তুলে দেন। একটি সুটকেসে ও একটি বস্তায় সেগুলি ভর্তি ছিল। অস্ত্রগুলো বেশ ভারী থাকায় সুটকেসের তলা ফেটে গিয়েছিল, এ নিয়ে মহিলা বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। অস্ত্রগুলি নিয়ে আমরা দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই, এবং সেটি আমার অফিসেই। খোদ ঢাকা শহরই ছিল আমাদের এরিয়া অব গেরিলা অপারেশন, অস্ত্র প্রয়োগের কলাকৌশল রপ্ত করারও গোপন কেন্দ্র ছিল আমার প্লাস্টিক নিওন সাইন কারখানা ছোট্ট অফিসগৃহে- কারখানার ভারী ভারী হাতুড়ি, শাবল, কোদাল সমবায় লোহার কাজকর্মের দৈনন্দিন ধাতব শব্দরাজির আড়ালে। এসব নতুন পরীক্ষিত অস্ত্রগুলির মধ্যে ছিল বেশকিছু হ্যান্ড গ্রেনেড, ফসফরাস গ্রেনেড, এম-কে ১৪ মাইন, এম-কে ১৬ মাইন এবং ১৬ মাইনের ক্যাবলসহ একখানা রীল।

উল্লেখ্য, আমাদের গেরিলা তৎপরতার মান ক্রমশঃ যতই উন্নত হয়ে উঠছিল ততই আমরা সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশ সমেত অনেক নতুন নতুন অস্ত্রও পাচ্ছিলাম। এ প্রসঙ্গে একজন অত্যন্ত সাহসী গেরিলা-আবু বকরের নাম মনে পড়ছে, গুলশান ২য় মার্কেটের পেছনে তার বাসা ছিল। সে মাঝে মাঝেই প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসতো এবং তার মারফত আরও কয়েকজন তরুণ গেরিলার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল, যাদের মধ্যে দু'জন স্বৈরাচারী আইয়ুব আমলের পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনেম খানের সাড়াজাগানো হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করেছিল। এরা ছিল খুবই স্মার্ট এবং সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বিশেষ করে আবু বকরের পায়ে আড়ালে প্লাস্টিকে মোড়ানো ভাঁজ করা স্টেন বহনের কৌশল ছিল খুবই চমকপ্রদ। চেকিংয়ে দেহতল্লাশীর সময় তার হৃদিসই মিলত না। মাহবুব সালাম ও নীলুর গুলশানের বাসায়ও এক্সপ্লোসিভ রাখা হতো। নীলু ও শাহজাহান নামের একটি ছেলে দু'টো অপারেশন করেছিল, যদিও তা সফল হয়নি। এরা ছিল আমার রিক্রুট। এদের অপারেশনে আমি নিজেও জড়িত ছিলাম।

অপারেশনকালে আমাদের সাথে আরও কিছু ছেলে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) আমজাদ আহমেদ চৌধুরীর ছোট ভাই আনোয়ার চৌধুরী ছিল অন্যতম। মিঃ জামানের নাভানা ওয়ার্কশপে গোপনে তাদের সাথে আমার যোগাযোগ ঘটে। আনোয়ার চৌধুরী অপারেশনে বিশেষ করে গাড়ির ব্যবস্থা করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল।

দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, বিশ্ববাসীর কাছে দখলদার বাহিনীর এই দাবী চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথম প্রচেষ্টা নিই ঢাকা শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টির। সংশ্লিষ্ট সেক্টর কমান্ডারদেরও নির্দেশ ছিল এটা। এ ব্যাপারে যা কিছু প্লান প্রোগ্রাম তার সবই হতো আমার বাসার ড্রয়িং রুমে। সন্ধ্যার অন্ধকার ছিল আমাদের অপারেশনগুলি উপযুক্ত সময়। অপারেশনগুলি ছিল কমান্ডার খালেদ মোশাররফের ভাষায়ঃ ‘সিটি টেররাইজিং অপারেশনস’।

মুক্তিবাহিনীর সুদৃষ্ট অস্তিত্ব ঘোষণার জন্য আমরা মোহাম্মদপুরের অবাস্তালী অধ্যুষিত এলাকা থেকেই প্রথম যাত্রা শুরু করি। বিশ্বস্ত বাহন আমার টয়োটা করোলা, দলে হাফিজ ভাই, উলফত, গাজী বাপী এবং আমি। আগস্টের দিকে ঘটনা। আমরা যখন আইয়ুব (বর্তমানে আসাদ) গেটের কাছাকাছি, তখন মীরপুরের দিক থেকে একটি আর্মি কনভয় আসছিল। আমরা সেটা লক্ষ্য করি। আমাদের সাথে কিছু এম-কে মাইন-১৪ ছিল। পেট্রোল নেবার ছল করে কাছের পেট্রোল পাম্পে গাড়ি থামাই, এরই মধ্যে উলফত রাস্তায় খুব দ্রুত ক’টি মাইন পেতে দিল, কনভয় এগিয়ে আসার আগেই। কনভয়ের প্রথম দু'টো গাড়ি নির্বিবাদেই পার হয়ে গেল, পরের গাড়ির বেলায় ঘটল পরম আকাজ্জিত বিস্ফোরণটি। মাইনের আঘাতে গাড়ির চাকা প্রচণ্ড শব্দে বাঁষ্ট হয়ে গেল, চারিদিক নড়ে উঠল। আমরা ততোক্ষণে হাওয়া।

আসাদ গেটে সন্ত্রাসের কান্ডটি ঘটিয়ে ঐদিনই শিকার খুঁজতে টয়োটা করোলা চলে আসে হাইকোর্ট-ময়মনসিংহ রোড ক্রসিং-এর ট্রাফিক রাউন্ডে- এখন যেখানে স্বাধীনতা উত্তর শিল্পকীর্তি জোড়া দোয়েল ডানা বিস্তার করে আছে। সেখানে বাপী আর উলফতের পাতা মাইনের শিকার হয় অবাঙ্গালী যাত্রীবাহী এক ডবল ডেকার বাস। এর পরদিন নর্থ-সাউথ রোডের ওপর চাংওয়াতে অপারেশনের প্ল্যান নেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ করে আর্মি চলে আসতে অপারেশন হলো না। তবে রাস্তার উল্টো পাশে রাখা আর্মি অফিসারের জীপের চাকার নিচে এম-কে ১৪ মাইন রেখে আমরা দ্রুত সরে পড়ি। গাড়িতে ছিলাম আমরা মোট ৪ জন। স্ট্রয়ারিংয়ে আমি, বাকী ৩ জন ছিল উলফত, হাফিজ ও বাপী। আমরা সরে পড়ার আধ ঘন্টার মধ্যে প্লাস্টিক মাইন দারুণ আওয়াজে ফেটে গিয়ে জীপ দু'টির চাকা বিধ্বস্ত হয়।

এভাবে আরো বেশ কিছু গেরিলা অপারেশন আমরা করি। এগুলি ছিল গ্যানিজ ও ভোগ ফ্যানশন বিপনিকেন্দ্র অপারেশন, গ্রীন রোডের মোড়ে পেট্রোল পাম্প অপারেশন- যাতে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর রাস্তায় হাফিজের (পরবর্তী কালে শহীদ) বসানো এম-কে ১৬ মাইনের তোড়ে খানসেনাসহ একটি মিলিটারী জীপ উড়ে গিয়েছিল, কমলাপুর স্টেশন অপারেশন, টয়েনবি সার্কুলার রোডস্থ গভর্নর হাউসের পার্শ্ববর্তী পি-এন-ও (পাকিস্তান ন্যাশনাল ওয়েল বা দাউদ পেট্রোলিয়াম লিঃ) পেট্রোল পাম্প অপারেশন ইত্যাদি। মায়া ক্র্যাক প্লাটুনের এসব অভিযানে অংশ নিয়েছিল (গ্যানিজ ও ভোগ-এর অপারেশনে) মায়া, মানু এবং গাজী দস্তগীর। এরা একটি ৯০ সিসি হোল্ডায় চেপে অপারেশনে যায়। সাথে ছিল একটি স্টেন, গোটা কয়েক গ্রেনেড-৩৬ ও ফসফরাস বোমা। কভারে ছিলাম টয়োটাতে চেপে আমি (সামাদ) উলফত ও জুয়েল (পরবর্তীকালে শহীদ)। পি-এনও পেট্রোল পাম্প অভিযানটি হয়েছিল একটু ভিন্ন কায়দায়। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা এখানে হানা দিয়েছিল কালো মুখোশ পরে, শুধু চোখ দুটো বের করে রেখে। মুখোশগুলো সেলাই করে দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী শাহীন বানু। পাম্পের অবাঙ্গালী কর্মচারীর ‘ফ্যান্টোমাস আগেরা’ বলে আতঁ চীৎকার করে পালিয়ে যায়। গেরিলা দল ১০ পাউন্ড পিকে চার্জ লাগিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায় অপারেশনের স্টেন হাতে ছিল গাজী দস্তগীর ও টুলু। পাম্প অফিস ঘরের পাহারায় ছিল নীলু। বিস্ফোরক চার্জ বসিয়েছিল মায়া। গাড়ির ড্রাইভিংয়ে ছিলাম আমি। এই ভয়ঙ্কর ওয়াগান গাড়িটি ছিল এয়ার ভাইস-মার্শাল (তৎকালীন উইং কমান্ডার), কে, এম, আমিনুল ইসলামের। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সীমান্ত অতিক্রমের পূর্বে এই গাড়ি ও তার নিজের পিস্তলটি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই গাড়িটি পাওয়ার স্টেশনসহ ঢাকার বিভিন্ন অপারেশনে আমাদের প্রভূত কাজে এসেছিল।

কমলাপুর রেল স্টেশনের অপারেশনটি ছিল আমার, মায়া, দস্তগীর- সম্মিলিতভাবে এই তিনজনের একটি গ্রেনেড থ্রো-এর অপারেশন। গ্রেনেড দুটি ছিল আমার গাড়ির ডেস্ক বোর্ডে দুটি বৈদ্যুতিক বাল্বের মোড়কে ঢাকা, যাতে চেকিংয়ে পড়লে খানসেনাদের দৃষ্টিকে তা সহজেই প্রতারণিত করতে পারে। প্রয়োজনীয় কভার দেওয়ার জন্য আমার গাড়ির পেছনের বনেটে বানানো, ঠিক সীটের মতো দেখতে, একটি চোরা পকেটে রাখতাম সর্ব সময়ের দুটো স্টেনগান।

আমাদের এই অপারেশনগুলির উদ্দেশ্য ছিল হানাদার বাহিনী অধিকৃত খোদ ঢাকা নগরীতেই যে স্বাভাবিক অবস্থা আদৌ বিরাজ করছে না তা বিশ্বকে জানিয়ে দেয়া। আমরা এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলাম এবং আমাদের এই দুর্ধর্ষ অভিযানসমূহের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে অপরাহ্নকাল অতিক্রান্ত হতে না হতেই ঢাকা শহর জনশূন্য হয়ে পড়া ছিল তখনকার দিনে প্রায় রোজকার অবস্থা। তবে আমাদের যা কিছু অপারেশন হয়েছিল, তা হয়েছিল নতুন ঢাকা এলাকাতেই, পুরনো ঢাকায় আমাদের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে পারিনি।

অপারেশনের সমস্ত খবর আমি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করে সেস্টরে পাঠিয়ে দিতাম। আমাদের এই প্রাথমিক গেরিলা মিশনগুলি সাফল্যের পরবর্তী পর্যায়ে মেজর অপারেশন চালানোর নির্দেশ পেতে থাকি। এই সময় আমরা জেনারেল ওসমানীর একখানি চিঠি পাই। তাঁর চিঠিতে ছিল অপারেশনের জন্য রেকি করা, অবজেকটিভ বা টার্গেট স্থির করা, এসকেপ রুট ঠিক রাখা এবং বিভিন্ন স্থানে নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে বের করা সংক্রান্ত মূল্যবান পরামর্শ।

প্রাথমিক অভিযানগুলির সাফল্য আমাদের আরবান গেরিলা কার্যক্রমকে আরও বিকশিত করে তুলতে থাকে এবং উন্নত ফায়ার পাওয়ারসজ্জিত একটি আধুনিক সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থায় এনে দাঁড় করায়। আমাদের গেরিলা দলে ক্রমেই আরো নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেরা আসতে শুরু করে। এদের মধ্যে বদি (বদিউল আলম), আলম, স্বপনের কথা মনে পড়ছে। জন সমর্থনের ক্ষেত্রেও ক্রমশঃ প্রসারিত হতে শুরু করে। উলফতের চাচা সাংবাদিক আতাউস সামাদ, ফ্লাইট লেঃ হামিদুল্লাহকে সীমান্ত অতিক্রমে সাহায্যকারী পরিবারের টিকাটুলী হাটখোলার শাহাদাত চৌধুরী (বর্তমানে সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রার’ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) তার ছোট ভাই ফতে আলী, এবং তাদের কনিষ্ঠ আরেক ডাক্তার ভ্রাতা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। হাফিজ ভাইয়ের বাসায় আলতাফ মাহমুদের যাতায়াত ছিল, গেরিলা তৎপরতায় তাঁর সক্রিয় সমর্থন ছিল। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এক জায়গায় থাকলে সহসা তা জানাজানির পর যদি পুরো সম্ভারই শত্রুদের হাতে পড়ে যায় এই আশংকায় আলতাফ মাহমুদ সেগুলি বিভিন্ন স্থানে রাখার পরামর্শ দেন এবং তাঁর নিজের বাসায়ও তার কিছু নিয়ে রাখেন। গেরিলাদের সাথে তাঁর এই সংযোগ ও তাঁর বাসায় রক্ষিত এই অস্ত্র পাওয়ার জন্য পাকবাহিনী তাকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যায় এবং অকথ্য নির্যাতন করে বাংলাদেশের এই প্রখ্যাত সুরকারকে হত্যা করে।

গেরিলা কর্মকাণ্ডের ক্রম বিস্তৃতিতের পরবর্তী ধাপে মায়া ক্র্যাক প্লাটুন যে অপারেশনগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিশেষভাবে সেগুলি ছিল (১) ফার্মগেট অপারেশন (২) দুঃসাহসিক উলান পাওয়ার স্টেশন অপারেশন (৩) গুলবাগ পাওয়ার স্টেশন অপারেশন (৪) ওয়াপদা পাওয়ার হাউস রেইড (৫) কাঁটাবন মসজিদের উত্তর পার্শ্বস্থ বৈদ্যুতিক স্টেশনে হামলা (৬) হোটেল ইন্টারকনের বিস্ফোরণ ইত্যাদি।

এ ছাড়া, এনারগা রকটে যোগে এমপি হোস্টেল আক্রমণও ছিল এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যাতে ব্রিগেডিয়ার বশরি, লেঃ কর্নেল হেজাজীর মতো পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররাও ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল। এম-কে ১৬ মাইন সংস্থাপন করে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসও এই সময়ের ব্যাপর। এগুলি সবই ছিল জুলাই-আগস্ট মাসের ঘটনা।

ফার্মগেট অপারেশন চালিয়েছিল মোট ৬ জন গেরিলা- আমি (ড্রাইভিংয়ে) জুয়েল, বদিউজ্জামান, আলম, পুলু ও স্বপন। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল আলমের হাতে একটি চাইনীজ এস, এম জি, বাকী সবাইয়ের হাতে স্টেনগান। একটি ফসফরাস গ্রেনেড ও একটি গ্রেনেড-৩৬ জুয়েল ও পুলুর হাতে। অপারেশনটি মাত্র তিন মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। অবশ্য তার পূর্বে কয়েক দফা রেকি করে অভিযানের পরিকল্পনা স্থির করা হয়। এ অপারেশনে মারা গিয়েছিল হানাদার বাহিনীর ৫ জন মিলিটারী পুলিশ ও তাদের সহযোগী ৬ জন রাজাকার। ঢাকা সেনানিবাস, অপারেশন হেড কোয়ার্টার, এম পি এ হোস্টেল এবং তৎকালীন দ্বিতীয় রাজধানী (বর্তমানে শেরে-বাংলা নগর) এলাকার কাছাকাছি ফার্মগেটে খান সেনাদের একটি বড় ধরনের কড়া চেকপোস্টের ওপর গেরিলাদের এই দুঃসাহসিক হামলা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। উলান অপারেশনেও এমনি ইমপ্যাক্ট সৃষ্টি হয়েছিল। এটি ছিল জুলাইয়ের শেষ পক্ষের ঘটনা। অপারেশনটি সংঘটিত হয় গাজী দস্তগীরের নেতৃত্বে। দলে ছিল জিয়া, নীলু, হাফিজ এবং অন্যান্য আরো কয়েকজন। এরা ক্ষিপ্ততার সাথে পাওয়ার স্টেশনে পাহারারত পুলিশদের অতি সহজেই পরাভূত করে ট্রান্সফর্মারটির মারাত্মক ক্ষতি সাধনে সমর্থ হয়েছিল। একই সময় রাত্রি নয়টার দিকে গুলবাগ পাওয়ার স্টেশনটিও উড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্র্যাক প্লাটুনের পুলু, সাইদ, জুয়েল, হানিফ ও বাশার আরেকটি দলে বিভক্ত হয়ে এই অপারেশন চালায়, নেতৃত্বে ছিল জুয়েল। গাড়ির ড্রাইভিংয়ে ছিলাম আমি। ওয়াপদা পাওয়ার হাউজ অপারেশন করি মায়া, আমি, উলফত এ কয়জনে মিলে। কাঁটাবনের উত্তর পার্শ্বস্থ কেন্দ্রের ওপর হামলাটি চালিয়েছিল আলম, জিয়া, বদি চুল্লুর গাড়িতে করে।

বিশেষভাবে ঢাকার পাওয়ার স্টেশনগুলি মায়া ক্র্যাক প্লাটুনের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এ উদ্দেশ্যে যে, এগুলিকে অকেজো করে দিতে পারলে শুধু ঢাকা নগরীই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে না, বন্ধ হয়ে যাবে দখলদার বাহিনীর রেডিও, টিভির সমস্ত প্রচার ও তাদের কর্মপ্রবাহ। এসব বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার সম্পর্কিত খুঁটিনাটি তথ্য জুগিয়েছিলেন দু’জন প্রকৌশলী। এদের একজন ছিলেন ওয়াপদার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী

জনাব নজরুল ইসলাম (পরবর্তীতে শহীদ)। তারা ট্রান্সফর্মারগুলি কিভাবে ধ্বংস করতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় ডায়াগ্রাম ইত্যাদি সরবরাহ করেছিলেন। একই সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সেকশন অফিসার জনাব ডাবলু আহমেদের কথা। তিনি বাংলাদেশের সমস্ত ব্রিজ আর কালভার্ট-এর ক্লসিং তঁার অফিস থেকে গোপনে মুজিবনগর সরকারের কাছে আমার মাধ্যমে সরবরাহ করেছিলেন, পরে তিনি পাকবাহিনী কর্তৃক ধৃত হয়ে ক্যান্টনমেন্টে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। সেলিম নামের এক বোম্বাইয়া যুবকের কথাও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখের দাবী রাখে। সে বার্মা থেকে এসে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। পাঞ্জাবীদের সাথে তার যোগাযোগ থাকায় তার মারফত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতাম। সেগুলি আমাদের অপারেশনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

হোটেল ইন্টারকনের ওপর ১১ ই আগস্টের ২য় দফায় হামলা ছিল ক্র্যাক প্লাটুনের একটি মাস্টার পিস বিশেষ। এ অপারেশনের মূল নায়ক ছিলাম আমি এবং বাকের (পরে শহীদ)। উলফত, মায়া ও গাজী ছিল সাথে। হোটেল ইন্টারকনের ওপর জুন মাসের হামলার পর খানসেনারা কড়া পাহারা বসিয়েছিল। সেখানে প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। মিঃ জামান ও ওয়ারিস নামে জনৈক বিহারীর বদৌলতে হোটেলের প্রেমিসে অবস্থিত থাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের নতুন অফিস কক্ষের জন্য গ্লো-সাইন তৈরীর অর্ডার সংগ্রহ করে সেই সুবাদে হোটеле প্রবেশের সুযোগ করে নিই এবং কিভাবে অপারেশন করা যায় সে সম্বন্ধে রেকি করি। ব্যবসার নাম করে আমি সব সময় একটি ব্রীফকেস বহন করে নিয়ে যেতাম। গ্লো-সাইন তৈরীর কাজ শেষ হওয়ার পর দিনই ব্রীফকেসে ২৮ পাউন্ড পি-কে এবং ৫৫ মিনিট মেয়াদী ‘টাইম পেন্সিল’ ভরে বিকেলে গাড়ীতে চেপে রওয়ানা হলাম আমি, বাকের, মায়া ও গাজী। এদের মধ্যে শেষের দু’জন গাড়ীতে স্টেনগান নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এরপর হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ-রচিত ‘বিচ্ছুদের নেপথ্য কাহিনী’ শিরোনামে দৈনিক বাংলা, ১০ জানুয়ারী, ১৯৭২-এ প্রকাশিত সিরিজে* অপারেশনের অবশিষ্ট বর্ণনা হচ্ছেঃ হোটেলের লাউঞ্জে প্রবেশের জন্যে মূল দরজা দিয়ে না ঢুকে ‘সুইস এয়ার’- এর অফিসকক্ষের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো সামাদ ও বাকের। এ ব্যাপারে সহায়তা করলো ঐ অফিসেরই এক বন্ধু মোঃ শফি। প্রথমে সামাদ টয়লেট রুমে ঢুকলেন। খানিক পরে বাকের। ব্রীফকেস নিয়ে একবারে কোনার ল্যাট্রিনে ঢুকলো বাকের। বাস্ক খুলে ‘টাইম পেন্সিল’ প্রেস করলো। এর আগেই ল্যাট্রিনের দরজার ‘লক’ করা হয়েছে, সামাদ সাহেব রয়েছেন টয়লেটের মূল দরজায় দাঁড়িয়ে ‘কভার’ হিসেবে। বাকের ব্রীফকেসটি রাখলো কমোডের পেছনে। তারপর দরজা তেমনি বন্ধ রেখে ল্যাট্রিনের উপর দিক দিয়ে দেয়াল টপকে বেরিয়ে এলো বাকের। তারপর প্রথমে সামাদ ও পরে বাকের হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ৫-৫৬ মিনিটে ঘটলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। হোটেল লাউঞ্জ, শপিং আর্কেড এবং আশেপাশের কক্ষের কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল, ছিটকে গেল কক্ষের দরজা, ভেঙ্গে পড়লো কক্ষের ভেতরকার এবং লাউঞ্জের লাগোয়া দেয়াল। আহত হলো বেশ কয়েকজন। বিশ্ব সংবাদপত্রসমূহে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার আরেকটি রোমাঞ্চকর সচিত্র সংবাদ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হলো। প্রকাশিত এরূপ একটি সংবাদের অংশবিশেষ এখনো আমার মনে আছে। এটা ছিল, “ It shows that the guerillas can move at Dacca city at their will.”

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-৪

সাক্ষাৎকার : নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু

২৫ এপ্রিল আমি সীমান্ত অতিক্রম করি। কাঠালিয়া হয়ে আগরতলা এসে পৌঁছি। সেখানে মেজর হায়দারের সাথে আমার দেখা হয়। মেজর হায়দারের সাথে আলাপ হলো। মেজর হায়দার আমাকে ঢাকা থেকে ছেলে

* পরবর্তীতে ‘ঢাকায় গেরিলা অপারেশন’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ঢাকার গেরিলা অপারেশন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য বইটি দ্রষ্টব্য।

** মানিক বাহিনী গেরিলা ইউনিট প্রধান রেজাউল করিম মানিক হানাদার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে শাহাদাৎ বরণের পর তিনি উক্ত ইউনিটের অধিনায়কত্ব করেন। সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ১২-৭-৮৩ তারিখে গৃহীত।

সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে বললেন। এরপর আমি ঢাকায় আসি। ঢাকায় এসে আমি কিছু ছেলে জোগাড় করি এবং পুনরায় ২২ মে ঢাকা ত্যাগ করি এবং মতিনগরে উপস্থিত হই। আমাদের সেখানে ট্রেনিং নিতে দেয়া হয়নি। এই সময় কামাল লোহানীর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতারে নিয়ে যান। সেখানে আমি দুই সপ্তাহকাল অবস্থান করি। স্বাধীন বাংলা বেতারে আমি কিছু কবিতাও পাঠ করি। সেখানে নওগাঁর জলিল সাহেবের (এম-পি) সাথে আমার দেখা হয়। আমি সরাসরি যুদ্ধ করতে চাই এই ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমাকে তিনি তাঁর দিনাজপুর ক্যাম্পে ট্রেনিং নিতে বলেন। আমি সাথে সাথে রাজী হয়ে যাই এবং ২৭ জন ছেলেসহ পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট ট্রেনিং নিতে শুরু করি। আমার ছেলেদের মধ্যে ছিল আসাদ, ওমর, পনির, মঞ্জু, ইফতেখার, তৌফিক প্রমুখ ছাত্র। সেখানে ৪৫ দিনে আমাদের ট্রেনিং আমাদের ট্রেনিং সমাপ্ত হয়।

এর মধ্যে ট্রেনিং চলাকালে আমি কলকাতায় আসি। কলকাতায় মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি তখন ২নং সেক্টরের অধিনায়ক। ঢাকা যেহেতু ২নং সেক্টরের অধীনে ছিল, সেহেতু তিনি আমাদের ২৭ জনকেই দিনাজপুর থেকে আগরতলায় তাঁর অধীনে নিয়ে আসেন। এর প্রধান কারণ ছিল আমরা ছিলাম ঢাকার বাসিন্দা।

মেজর খালেদ মোশাররফের অধীনে পুনরায় আমাদের ১৫ দিনের একটি ব্রাশ-আপ ক্লাশ হয়। সেখানে তিনি আরো ২৫ জন ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে মোট ৫২ জনের একটি টিম তৈরী করেন এবং সবাইকে ঢাকা উত্তরের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। আমরা প্রথমে তিতাসের ভেতর দিয়ে ঢুকতে শুরু করি। আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের একটি ব্রিজের নিচ দিয়ে আমরা গভীর রাত্রিতে ঢুকতাম। এর পাশের গ্রামটি ছিল মনিহন। সেই সাথে আমরা প্রথম ঢুকি সেপ্টেম্বর মাসে।

পাকবাহিনী ঐ ব্রিজের ওপর মোতায়েন ছিল। একদিন পাকসেনারা ব্রীজের ওপর থেকে আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের সাথে ফরিদপুরের একটি দল সেই পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এ আক্রমণে অগ্রগামী দলটির ১৪ জন ঘটনাস্থলে মারা যায়। ঐ ঘটনার দুই দিন পর আমরা সেখানে পেনিট্রেট করি এবং তিতাসে এসে পৌঁছি। সেখান থেকে আমরা ধামরাই থানার এক গ্রামে এসে উপস্থিত হই।

এই গ্রামে আসতে আমাদের সাত দিন সাত রাত লেগেছিল। সেই রাতগুলো ছিল ভীষণ ভয়াবহ। দু'দিন দু'রাত আমরা শ্রেফ নদীর পানি খেয়ে কাটাই। কারণ, আমাদের রেশন ফুরিয়ে গিয়েছিল। নদীতে যে সমস্ত গয়নার নৌকা যাতায়াত করতো সে সমস্ত নৌকার মাঝিদের সহায়তায় পাটাতনে লুকিয়ে থেকে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতাম। এ ব্যাপারে মাঝিদের ভূমিকা ছিল খুবই নিভীক। বলতে গেলে এঁরা আমাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি জড়িত ছিল।

এবার আমরা রোহর একটি ছোট বাজারে এসে উঠি এবং সেখানে যখন আমরা রাত্রিযাপন করছিলাম, তখনই হঠাৎ পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। আমরা যে সেখানে এসেছি এই কথা দালালেরা ইতিমধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই আক্রমণ আমরা প্রতিহত করি। সেদিনের ঐ পাল্টা আক্রমণে আমাদের দলের আশরাফ নামে এক ছেলে (বি,ডি,আর সুবেদার) অত্যন্ত সাহসের সাথে যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে আমরা ১৯ জন পাকসেনার প্রাণনাশ করি। পাকবাহিনী নিরুপায় হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে এবং ফিরে যাওয়ার পথে গ্রামের নিরীহ জনগণের উপর অত্যাচার চালায়, তাদের ঘরবাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ করে।

এরপর রোহা ছেড়ে আমরা সিঙ্গাইর থানা এলাকার কাছাকাছি একটি গ্রামে ক্যাম্প করি। এখানে আমরা একটি অপারেশন করি। এই অপারেশনে ১৪ জন পাকসেনার একটি রেশনিং কোরকে আক্রমণ করি এবং সবকটা পাকসেনাকে খতম করি। এরপর আমরা সেই স্থান থেকে আমাদের ক্যাম্পকে নিরাপদ এলাকায় নিয়ে আসি। এই নতুন স্থানটির নাম ছিল শিমুলিয়া। এখানে এসে আমরা ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করি। এভাবে আমাদের আক্রমণের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ২৩ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল নিয়ে মূল

ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করি। দলটি ঢাকা শহর এলাকায় বেশ কয়েকটি অপারেশন করে। এই দলটির মধ্যে ছিল রইসুল ইসলাম আসাদ, মুনীরউদ্দিন, ফেরদৌস, মাহবুব আলী, জাহেদ, শফিকুল ইসলাম স্বপন, জন, ফিরোজ, মোহাম্মদ আলী, ওমর, আরিফ, রমজান এবং আরো বেশ কয়েকজন নির্ভীক যোদ্ধা।

আমাদের দল ছাড়া আরও একটি দলকে শাহাবুদ্দীনের (চিগ্রিশিল্পী) নেতৃত্বে ঢাকা দক্ষিণের কিছু এলাকায় গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্য পাঠানো হয়। এরা বুড়িগঙ্গা ও তার আশেপাশের এলাকা জুড়ে বিভিন্ন সময়ে শত্রুদের নাজেহাল করে। এই দলে ছিল কুতুব, ইমাম হোসেন, বজলু এবং আরো অনেকে।

গেরিলা কার্যক্রমের পাশাপাশি আমাদের দলকে আরো একটি দায়িত্ব দেয়া হয়। এটা ছিল ঢাকা শহরে গেরিলা তৎপরতার কথা প্রচার করা। এর উদ্দেশ্য ছিল ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশীদেরকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপারে অবহিত করা। এজন্য আমরা প্রথমে ঢাকার সেগুনবাগিচা হাই স্কুল থেকে একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিনিয়ে এনে ‘গেরিলা’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। পত্রিকাটির ভাষা ছিল ইংরেজী। পত্রিকার মূল দায়িত্বে ছিল ফেরদৌস, ফিরোজ, জন, মোহাম্মদ আলী, জাহেদ, আরিফ এবং আরো বেশ কিছু মুক্তিকামী কর্মী। প্রতিমাসে পত্রিকাটির দু’টি করে পরপর সাতটি সংখ্যা বের হয়। এতে মূলতঃ যুদ্ধের খবরাখবর থাকতো। পত্রিকাগুলো আমরা ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন বিদেশী সংস্থায় পাঠিয়ে দিতাম।

ঢাকায় আমাদের মূল দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ঢাকার সাথে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ বিহীন করা। পাকসেনারা যাতে রসদ সরবরাহ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা এবং হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য ঢাকা শহরে পাকসেনাদের যে সমস্ত ঘাঁটি ছিল সেগুলো ধ্বংস করা।

ঢাকায় আমাদের প্রথম অপারেশন হয় কাকরাইলের মোড়ে। কাকরাইলের মোড়ে যে পেট্রোল পাম্পটি ছিল সেটিকে আমরা প্রথমেই ধ্বংস করি। তারপর মাহবুব আলী এবং ফেরদৌসের নেতৃত্বে ঢাকা ডি,আই,টি, ভবনে অবস্থিত টেলিভিশন কেন্দ্রটি নষ্ট করে দেয়ার পরিকল্পনা করি। তখন মাহবুব আলী ডি,আই,টি, ভবনেই চাকুরী করতেন। সে অফিসে আসার সময় প্রতিদিন কিছু কিছু বিস্ফোরক শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে শত্রু চোখ ফাঁকি দিয়ে ডি,আই,টি, ভবনেই গোপনে জমাতে শুরু করলো। প্রথমে আমাদের পরিকল্পনা ছিল ৮ পাউন্ড দিয়ে ডি,আই,টির চূড়া উড়িয়ে দেয়া। কিন্তু পাঁচ পাউন্ড সরানোর পর শত্রুবাহিনী সন্দেহ করতে শুরু করলো। তখন মাহবুব আলী তাড়াতাড়ি আমার কাছে ছুটে আসে। আমি তাকে ধরা পড়ার আগেই ওটা ফাটিয়ে দিতে বলি। মাহবুব আলী তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডি,আই,টি চূড়ার নীচে ওটা ফাটিয়ে দেয়। তবে বিস্ফোরকের পরিমাণ কম হওয়াতে চূড়াটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা যায়নি। তবুও চূড়াটিতে চির ধরে যায়। ঢাকা শহরে আমাদের এই অপারেশনের ওপর বিদেশী পত্রিকায়ও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।

নভেম্বরের দিকে ঢাকা শহরে পাকবাহিনীর নির্যাতন আরো বেড়ে যায়। তাই আমরা ঢাকা শহরে পাকবাহিনীর ওপর সরাসরি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিই। এ ব্যাপারে আসাদকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এর দু’একদিন পরেই আরিফ, ফেরদৌস ও জন একটি গাড়ি হাইজ্যাক করে বায়তুল মোকাররমে নিয়ে আসে। সেখানে পাকবাহিনীর দু’টি লরীর মাঝখানে আমাদের গাড়িটি রেখে বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কিন্তু প্রায় ১০ মিনিট চলে যাওয়ার পরও বিস্ফোরণ হচ্ছে না দেখে আসাদ পুনরায় গাড়িটির ভেতর ঢুকে অগ্নিসংযোগ করে। এই যাত্রায় আমরা সাফল্য লাভ করি। সেখানে ১৬ জন পাকসৈন্য মারা যায়। আমরা এই অপারেশন করি সাড়ে ১২টার দিকে এবং বিবিসি ৩টার সংবাদে এই ঘটনাটি প্রচার করা হয়।

অক্টোবরের দিকে আমরা মুসলিম কর্মশালায় ব্যাংক অপারেশন করি। এই অপারেশনে নেতৃত্বে দিয়েছিল মুনির। ফিরোজ, আরিফ এবং আসাদও এর সাথে যুক্ত ছিল। মুনির অত্যন্ত সাহসের সাথে একটি মাত্র খেলনা পিস্তল দিয়ে এই ব্যাংক অপারেশন করেছিল। সেখান থেকে আমরা কিছু টাকা সংগ্রহ করি। এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল শিমুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পের জন্য।

এছাড়া নভেম্বরের দিকে ঢাকা শহরে আমরা আরো কয়েকটি অপারেশন করি। সেগুলি ছিল রেডিও বাংলাদেশ (শাহবাগ), মালিবাগ রেলক্রসিং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি এলাকায় অপারেশন। মালিবাগ রেলক্রসিং-এর কাছে রেললাইন উড়িয়ে দিতে গিয়ে ভোর চারটা থেকে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। এতে তাদের একটি সেকশন পুরোপুরিভাবে বিনষ্ট হয়। একই মাসে আমরা বাংলাদেশ রেডিও (শাহবাগ) আক্রমণ করি এবং পাহারারত বহু পাকসেনাকে আঘাত হানি। এই অপারেশনে আমরা কিছু পাকসৈন্যকে খতম করে অন্যত্র সরে যাই।

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণের পরিকল্পনা করি অক্টোবরের দিকে। তখন দখলদার পাক সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ চালু করার চেষ্টা করছিল। আমরা এই সংবাদ পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু এক্সপ্লোসিভ বসাই। প্রথমে সাইকোলজি বিভাগে একটি এবং তিনতলা, চারতলাতেও কিছু এক্সপ্লোসিভ বসাই। এই অপারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ চলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আমাকে খোজাখুঁজি শুরু হয় এবং আমার বাড়ি তল্লাশী করে আমার পাঁচ ভাইকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমরা আরো একটি অপারেশন করি অক্টোবরের প্রথম দিকে, সাভারের রেডিও স্টেশনের সামনে। এই পথে আমরা তিনটি পাকিস্তানী লরী আক্রমণ করি এবং প্রায় ৩৭ জন পাকসৈন্য হত্যা করি। এরও আগে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে শেষের দিকে সাভারে আমরা একটি অপারেশন করেছিলাম। এটি হয়েছিল সাভার রেডিও স্টেশন থেকে মানিকগঞ্জের বড়াল ব্রীজ পর্যন্ত প্রায় ৩০ মাইল এলাকা জুড়ে। এই হাইওয়ে অপারেশনে আমরা একদিনে প্রায় চার'শ ছেলেকে কাজে লাগাই এবং ৩০ মাইলের মধ্যে আমরা ৩১৯ জন রাজাকারকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করি এবং তাদের কাছ থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিই।

১৪ নভেম্বরের ভায়াডুবি ব্রীজ অপারেশন ছিল আমাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গেরিলা অভিযান। এখানে আমরা প্রচন্ডে সংঘর্ষে লিপ্ত হই। শত্রুসেনারা সংখ্যায় ছিল ২০ জন। আমাদের আক্রমণ ভাগে ছিল ৪৪ জন। পাঁচ জনের ওপর দায়িত্ব ছিল ব্রীজ দখলের। সে ৫ জন ছিল মেজবাহউদ্দিন সাবু, সুবেদার আশরাফ, সুবেদার ওয়াজেদ হাকিম এবং আমি। আমরা সব শত্রুসেনাকে খতম করে অবশেষে ব্রীজটা দখল করতে সমর্থ হই। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল একটি এল-এমজি, একটি ২" মর্টার এবং একটি স্টেনগান। এ দিয়ে আমরা ব্রীজটা দখল করি। তবে আমরা বেশী সময় ব্রীজটা দখলে রাখতে পারিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পুনরায় শত্রুর দখলে চলে যায়। তারা মানিকগঞ্জ থেকে তিন গাড়ি সৈন্যসহ (প্রায় ৭০০ জন) ব্রীজ অভিমুখে রওয়ানা হয়। রাত্রি তখন গভীর। তারা মানিকগঞ্জের দিক থেকে আমাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। আমরা এক ভীষণ সংঘর্ষে লিপ্ত হই। এই যুদ্ধে আমাদের প্লাটুনের অধিনায়ক মানিক শহীদ হয় এবং বেশ কয়েকজন যোদ্ধা আহত হয়। আমরা সেখান থেকে পিছু হটে যাই। এর চারদিন পর ১৮ নভেম্বর পুনরায় ব্রীজটা আমরা দখল করি এবং পরবর্তীতে উড়িয়ে দেই। এরই মধ্যে ধামরাই এলাকাও আমরা পুরোপুরি মুক্ত করে ফেলি। ধামরাইতে ১৫০ জনের একটি কোম্পানী মোতায়ন রেল মূল ক্যাম্প সাভারের জিরাবতে স্থানান্তরিত করি। এখান থেকেই আমার সাভারের মহাসড়ক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিই এবং উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। সাভারে তখন পাকিস্তানীদের বড় ধরনের ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পটি আমরা ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে দখল করে ফেলি। আক্রমণটি চালানো হয় নভেম্বরের শেষ দিকে। এর পরপরই আমরা সাভার থানা দখল করি, ফলে পুরো সাভার এলাকাই আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

১৩ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল থেকে ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট মিত্র বাহিনীর চাপে পিছু হটে ঢাকার দিতে আসছিল। আমরা এই রেজিমেন্টকে সাভারের কাছে বাধা দিই এবং ফলে সেখানে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে আমরা পুরো শক্তি কাজে লাগাই এবং ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে আত্মসমর্পণ করাই। এখানে শত্রুশক্তির প্রায় শতাধিক সৈন্য নিহত হয় এবং একজন পাকিস্তানী সুবেদার মেজর আত্মসমর্পণ না করে আত্মহত্যা করে। আমাদের মুক্তির পূর্ব মুহূর্তের এ যুদ্ধই ছিল এ এলাকার সবচেয়ে বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমরা টিটোকে

হরাই। এরপর আমরা ১৬ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর সাথে প্রথম ঢাকায় প্রবেশ করি। আমাদের ছেলেদের মধ্যে মানিক, আফতাব, আমজাদ, নেহাল, টিটো এবং মানিকসহ মোট ছয়জন বিভিন্ন সংঘর্ষে শহীদ হয়।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-৫
প্রতিবেদন* : শাহাদাত চৌধুরী

নভেম্বরের প্রথম দিকে বিবিসির খবরে বলা হয়েছিল ঢাকা শহর ঘিরে রেখেছে ৮ হাজার মুক্তিবাহিনী। তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে গেরিলা তৎপরতা চালাচ্ছে, কিন্তু যে কোন সময় এক সঙ্গে শহরে প্রবেশ করবে।

গেরিলা রণনীতিতে বেছে নিতে হয় শত্রুর দুর্বলতম অংশ। সেক্ষেত্রে শত্রুর সবচেয়ে বড় ঘাঁটি রাজধানী শেষ লক্ষ্যস্থল হওয়ার কথা। কিন্তু ঢাকা শহরে যেসব আক্রমণ চালানো হয় তার উদ্দেশ্য সামরিক কৌশলগত আধিপত্য অর্জন ছিল না। উদ্দেশ্যটা ছিল মূলতঃ পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়া মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে, এবং সহজেই আঘাত হনছে শত্রুর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যুহে।

এ সম্পর্কে খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন অধিনায়ক। শহরে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। শত্রুকে শুধু জানিয়ে দাও তোমরা আছো। দুই নম্বর সেক্টর এবং ‘কে’ ফোর্সের অধিনায়ক কর্নেল খালেদ মোশাররফ সব সময় বলতেন গেরিলাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার কয়েকটি দুঃসাহসিক গেরিলা প্লান্টুনকে প্রত্যাহার করা হয়। কারণ, এদের কিছু যোদ্ধা ধরা পড়েন শত্রুর হাতে। তখন কর্নেল খালেদ বলেছিলেন, কাউবয় এ্যাডভেঞ্চার গেরিলা যুদ্ধ নয়। গেরিলা যুদ্ধ বীরত্ব দেখাবার জন্য নয়।

বিবিসির ভাষ্যকারের তথ্য নির্ভুল বলা যেত যদি তিনি গেরিলাদের সংখ্যাকে দ্বিগুণ। শহরকে ঘিরে থাকা গেরিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যা-ই হোক, মাথা তুলবে না প্রয়োজন ছাড়া। ঢাকার পুরনো যে দলটাকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল তারাও নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ‘ক্র্যাক’ নাম নিয়ে ঢাকার পাশেই ত্রিমোহনী, গোরানবাহিরদা অঞ্চলে ঘাঁটি করে। কর্নেল খালেদ আশা করতেন, নভেম্বর মাসে মেজর হায়দারকে দিয়ে ঢাকা শহরে মিরাকল দেখাবেন। সে জন্যেই মেজর হায়দার তার প্রিয় দলটাকে অনেকদিন ক্যাম্পে আটকে রেখেছিলেন। অক্টোবরে কর্নেল খালেদ আহত হলে পুরো সেক্টরের দায়িত্ব মেজর হায়দারের ওপর এসে যায়। তাই মেজর হায়দার নভেম্বর হায়দার নভেম্বর ঢাকা আসতে পারেননি।

মে মাসে ঢাকা শহরে একটি গোপন কথা প্রবাদের মত লোকের মুখে মুখে ফিরত, ক্যাপ্টেন হায়দার আসছেন। কথাটা মেজর হায়দারকে জানানো হলে তার চোখে মুখে অদ্ভুত আনন্দ, প্রত্যয় দেখা যেত। বলতেন, আমি যাবো। কিন্তু তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না। কারণ, গেরিলা এ্যাকশনের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। সকাল ৬ টায় ঘুম থেকে উঠে ছেলেদের শিক্ষা দেয়া, ব্রিফ করা, গাড়ী করে বাংলাদেশের ভেতরে তাদের নামিয়ে দেয়া তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী ছিল। তিনটার আগে ঘুমাতে পারতেন না।

২নং সেক্টরের বৈশিষ্ট্য ছিল তার নিজস্ব ট্রেনিং ক্যাম্প। ভারতের সঙ্গে চুক্তি হবার আগেই মেজর হায়দার কাঠালিয়াতে কুমিল্লার কিছু ছেলেকে ট্রেনিং দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেন দালাল হত্যার জন্যে। ঘরের বিভীষণকে আগে শেষ করা প্রয়োজন। তারপর প্রথম ব্যাচের শিক্ষা দেয়া নবীনগরে, পরে মেলাঘরে। এদেরকে নিখুঁত গেরিলা হিসাবে তৈরীর জন্য নানাভাবে ট্রেনিং দেয়া হত। সুবিধে ছিল মেজর কমান্ডো বাহিনীর লোক।

নভেম্বর মাস থেকেই ঢাকাকে ঘিরে গেরিলারা তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ‘মানিক গ্রুপ’ সাভার অঞ্চলে আর এদিকে ‘ক্র্যাক’। ‘ক্র্যাক’রা এসেই বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিয়েছিল স্থানীয় পাঠশালায় যেখানে তাঁরা

* ‘দৈনিক বাংলা’ ১ ডিসেম্বর ১৯৭২-এ প্রকাশিত ‘মানুষের সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করেছে গেরিলারা’ শীর্ষক প্রতিবেদনের অংশ।

থাকতো। এই পতাকাকে কেন্দ্র করে পাক হানাদাররা আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। হেলিকপ্টারে করে কমান্ডো নামাতে চেষ্টা করেও পারেনি। পুরো রূপগঞ্জ থানা তখন গেরিলা ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। শীতলক্ষ্যা পাড় ধরে মিলগুলোতে ছিল আর্মি বাংকার। তারা গেরিলা আক্রমণে আস্তে আস্তে কেটে পড়তে থাকে। ঢাকায় যখন ওরা ডিসেম্বরে ভারতীয় বিমান এয়ার পোর্টে বসিং করে তখন ঢাকার লোক শহর ত্যাগ শুরু করে। এই শহরত্যাগীরা বাসাবো এবং পরে ভাঙ্গা ব্রিজটা পার হয়েই বাংলাদেশের পতাকা আর অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে অবাক হয়ে যায়।

বিমান আক্রমণের রাতে গেরিলার সব পজিশন নিয়েছিল। কারণ, রাতে বিমান আক্রমণে বিভিন্ন অংশ থেকে পাক আর্মি এবং রাজাকাররা রাইফেল ফায়ার শুরু করে প্লেনের উদ্দেশ্যে। গেরিলারা প্রথমভাবে চারিদিক থেকে পুরো অঞ্চলটা ঘেরাও করা হচ্ছে। কিন্তু পর মুহূর্তে আকাশে প্লেন দেখে বুঝে নেয় ব্যাপারটা কি।

এর ভেতর ঢাকা শহরের উপর ‘ক্র্যাক’ প্লাটুন বড় কিছু করেনি। কিন্তু যেদিন বেতারে সপ্তম নৌ-বহরের কথা বলা হলো তার পরদিন দু’জন গেরিলাকে পাঠিয়ে দেয়া হল আমেরিকান সেন্টারে উড়িয়ে দিতে। ঢাকা শহরে হানাদারদের নাকের ডগায় আমেরিকান সেন্টার উড়িয়ে দেয়া হয়।

এদিকে গুল টেক্সটাইল মিলের শত্রুবাংকার আক্রমণ করা হয়। বাইরে থেকে শত্রুর রি-ইনফোর্সমেন্ট ঘটে। পুরো এলাকা নিয়ে যুদ্ধ হয়। শত্রু ২৭টি লাশ রেখে পালিয়ে যায়। গেরিলারা বৃহত্তর আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করে। এ সময় ঢাকা থেকে দাঙ্গার সম্ভাবনার খবর আসে। কিছু গেরিলা শহরে চলে স্টেনগান নিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ করার জন্যে। এদিকে শহর থেকে বেরুবার প্রত্যেকটি পথে এ্যামবুশ পেতে রাখা হয়। প্রত্যেকটা মুক্তিবাহিনীর গ্রুপই এসব এ্যামবুশে অংশ নেয়। দু’একটা সিভিলিয়ান গাড়ী করে বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যাবর্তন করতে দেখা যায় শত্রু অফিসারদের। শহরে পালিয়ে আসছিলো তারা। তারাই ফাঁদে পড়ে। পাক হানাদারদের নিশ্চল হয়ে যেতে দেখেই গেরিলারা বুঝেছিল যুদ্ধ করার ক্ষমতা আর তাদের নেই। যুদ্ধ শেষ হল বলে।

এগারোই ডিসেম্বর খবর আসে ভারতীয় বাহিনী তারাবোর কাছাকাছি এসে গেছে। এর পরই এসে পড়েন ক্যাপ্টেন মালেক ২নং সেক্টরের সেক্টর ট্রুপ নিয়ে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন নারায়ণগঞ্জ রোডের পাশে স্ট্রোর হাউজের শত্রুশূহ তিনি আক্রমণ করবেন। কিন্তু সকালে খবর এলো শীতলক্ষ্যার উপর সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেছে। সমস্ত মর্টার-এর মুখ এদিকে, গেরিলারা মনে করে বোধ হয় শত্রুর আক্রমণ এদিক থেকেই ঘটবে। শহর আর শীতলক্ষ্যার মধ্যবর্তী অঞ্চলের সব গেরিলা হয় আরো সামনে আসে অথবা লক্ষ্যার ওপারেই চলে যায়। অবস্থা বুঝে সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট বালু নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

১৩ ডিসেম্বর তারিখে মেজর হায়দারকে একা একা পৌঁছান, রূপগঞ্জ এলাকায় ‘এস’ ফোর্সের অধিনায়ক কর্নেল শফিউল্লাহর সঙ্গে দেখা হয় তার লক্ষ্যার তীরে।

কর্নেল শফিউল্লাহ মেজর হায়দারকে জিজ্ঞেস করেন, হায়দার তোমার ছেলেরা এখানে এভাবে ঘোরাফেরা করছে কেন?

মেজর হায়দার বলেন, স্যার এরা ন’মাস ধরে এখানেই আছে। এদের সব চেনা।

মানুষের সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করেছে গেরিলারা। প্রত্যেকটা ঘরে ছিল তাদের ঠাঁই। লোকের বিশ্বাস তাদের আত্মবিশ্বাস দিয়েছে শত্রুকে প্রতিহত করার। গ্রামবাসীরা তাদের ভেতর জাগিয়ে দিয়েছে দায়িত্ববোধ।

এক সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ গেরিলারা করতে পারেনি। মেজর হায়দারকে সঙ্গে পেয়েও নতুন আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা সময় পায়নি। দরকার হয়নি বলে।

১৬ই ডিসেম্বর দুপুরে দশটা হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছিল এক সঙ্গে। নিয়মতান্ত্রিক জৌলুসে, অহংকারে। গেরিলারা হঠাৎ বিহবল হয়ে পড়ল। তারপরই ফেটে পড়ল উল্লাসে। চারিদিক থেকে সবাই ঢুকে পড়ল শহরে, নিজের ইচ্ছায়, স্বাধীনতায়।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-৬

প্রতিবেদন* : মোঃ জহিরুল হক

During the first week of July, 1971, our valiant Mukti Bahinis started their operations in different places of the country. The guerillas better known as Mukti Bahini started their operations even in and around Dacca city which was the mightiest stronghold of the occupation army.

The operations in the city were not carried out attaining supremacy over the enemy forces. Rather, these were performed to inform the world people that the guerillas had been gallantly fighting against a trained and strong forces of the world. The guerillas were divided in two different groups.

In the first week of September, 1971 some of the guerilla platoons were withdrawn from the city following the arrests of some commandos who were caught by the pakistani army during their operations. It was the command of their leader that nothing should be disclosed regarding the whereabouts and plans and programmes of the Mukti Bahini. The undaunted guerillas who were caught by the enemy forces embraced death with a smiling face but did not disclose anything about the guerilla operations.

Major Khaled Mosharraf transferred the platoon which was withdrawn from the city to Goran-Bahirda, an area in the vicinity of the Dacca city, where platoon carried out some successful operations on Rajakars. Since August 1971 the guerillas geared up their operations in and around the city which made the enemy forces at a loss what to do. They could not imagine how the guerillas came and hit them and ran away. The Crack platoon carried out some successful operations in the city. Their main job was to blow up the power stations and petrol pumps, to attack Police checkpoints and to cause explosions in important places. It was also one of the jobs of the Crack platoon to create panic among the people of the city so that the normalcy could not be restored. The pakistani military administration was giving wide publicity in and outside the country that everything had been going normal in erstwhile East Pakistan.

Among the commendable operations the Crack platoon performed were the blow-up of Rampura power station, explosion in Hotel Purbani and the USIS library, attack on Thatari Bazar Rajakar camp and face-to-face fight with the Pakistani army at Jatrabari. At the initial stage when the Crack platoon arrived in Dacca it had only 17 guerillas, but gradually the figure reached upto 140. On June 30, nine of the guerillas of the Crack platoon were caught by the pakistani army and seven of them were killed. They were Hafiz, Jewel, Bodi, Azad, Bakey, Rumi and Altaf.

* দৈনিক 'মনিং নিউজ' ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ প্রকাশিত 'Guerilla Operation in Dacca' শীর্ষক প্রতিবেদনের অংশ।

The Crack platoon blew up the Rampura power house and Gulbag power with a view to putting the city into darkness. This action led to close many industries which ultimately affected the economy.

On 16th July of 1971 six guerillas of the Crack platoon at about 9 p.m. started for blowing up the biggest power station of the city at Rampura. They took 20 lbs. of plastic explosive, detonator and fuse. Only these few number of commandos very successfully performed the operations. Reaching the gate of the power station they very tactfully overpowered the police and the guard at the gate and took away their rifles. By this time one of the commandos disconnected the telephone lines. They took away the key from guard and forced them at the point of sten gun to show rooms where the policemen and other guard were present. They also overpowered 17 policemen and made the operators oblige to take them to the transformer room. They successfully planted the explosive and blew up the transformer.

In the first week of November 1971 only two guerillas performed a heroic operation near Kalabagan on an army van. The guerillas in disguise of rickshawpuller while coming from Kalabagan area saw a military van coming towards their direction and they immediately got down from the rickshaw and took up their arms hidden in the rickshaw. When the van reached near them they opened fire and killed all of the army except the driver of the van.

When the guerilla operations were intensified in Dacca city the army virtually never came out of the barracks at night. The guerillas in broad day light performed an operation on Razakars at the Bakhsibazar medical college hostel gate and killed two rajakars. The guerilla also killed five rajakars who were on duty at Narayanganj Victoria hospital.

The guerillas caused explosion at the Hotel Intercontinental notwithstanding the strong security measurers taken by the authority. The explosion at Hotel Intercontinental was done with a view to make the foreigners at the hotel a ware of the false pakistani propaganda regarding the normalcy in the city. Explosions were also caused at the Arts Faculty Building of Dacca University, at Siddheswsri High School during the S.S.C. exammination, at Baitul Mukarram and Motijheel area and some other places. The explosions at Baitul Mukarram and Motijheel commercial area had a good effect because the people got panicky and they started leaving the city. The students also stopped going to the classes due to the explosions at the university and the schools. At Jatrabari the guerillas of the Crack platoon fought face-to-face with the pakistani army and killed many of them and they blew up the bridge at Jatrabari, disconnecting Dacca from Narayanganj.

When the day of the liberation was approaching the guerilla operations were being intensified. The guerillas geared up their operations since October. Meanwhile, Maink platoon was active at Savar and carried out some operations on the enemy forces. The platoon raised the Bangladesh flags on the top of school building in the locality in November. During November the entire Roopganj police station came in the hands of the guerillas and they made foothold there.

When Pakistan declared war with India on December 4 the Indian fighter planes began to strafe Dacca city, virtually surrounded by the guerillas from all directions. About 8000 guerillas were active in and around the city. The guerillas attacked the enemy bunker at Gul Textile mills and killed 27 soldiers as a result the army retreated from the area. On December 11, Captain Malek reached Tarabo with his troops and on December 13 Major Haider came to Roopganj and met Major Shafiullah at the bank of the river Shitalakhya. Major Shafiullah was the commander of the “S” force. Meanwhile the guerillas of Quadder Siddiqui also marched towards Dacca city after liberating Tangail from the enemy forces.

Dacca could not be liberated without the assistance of the guerillas, because their operations broke the morale of the Pak army and they understood that their fall was imminent.

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে রংপুরের স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত কোডসমূহঃ

পাকবাহিনী	R. F.
পাঞ্জাব রেজিমেন্ট	P. R.
বেলুচ রেজিমেন্ট	B. R.
রাজাকার বাহিনী	R. F.
লাইট মেশিন গান	L. M. G
ভারী মেশিনগান	H. M. G
মর্টার	M. G.
জয়পুর হাট	৩য় বাড়ী
পাঁচবিবি	২য় বাড়ী
হিলি	১ম বাড়ী
ক্যাম্প	বাড়ী
ট্রেঞ্চ	কুঠরী
কর্নেল	বড়কর্তা
বিগ্রেডিয়ার	বড় ভাই
মেজর	মেজ ভাই
ক্যাপ্টেন	ছোট ভাই
বিহারী	N. B.
গোলাগুলি	রাগারাগি
D. I. B.	টিকটিকি
পশ্চিম পাকিস্তানী	লাল কুকুর
INDIA-PAK BORDER	বেড়া

(রংপুর জেলার পলাশবাড়ী হতে সংগৃহীত)

নির্ঘণ্ট

অ

অধিকারী, প্রেম ৪৬৬, ৪৬৭-৪৬৯
 অনিয়মিত বাহিনী (গণবাহিনী) ১০৬
 ‘অমৃত বাজার’ পত্রিকা ২৫২
 অসহযোগ আন্দোলন ১, ৮৮-৮৯, ২৮৩-২৮৪
 অয়ারলেস ১৬৫, ১৭২

আ

আইজুদ্দিন, ইপিআর সুবেদার ৬৭, ৬৮
 আইনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ১০২, ১০৩-১০৫, ১০৯-
 ১১০, ১১৫-১১৬, ১২৬, ১৩৩-৩৪, ১৩৬-১৪২,
 ১৪৮-১৫০
 আওয়ান, আবদুর রহমান, পাক লেঃ-কর্নেল ১৩
 আওয়ামী লীগ ১, ২, ৪-৬, ৭, ৮, ৯, ৪১-৪৩,
 ৪৬, ৪৯, ৭২, ৯০, ৯৬, ১৪৪, ২১৭, ২২১, ২৩৫,
 ২৩৭, ২৫৩, ২৬৩, ২৭০-২৭১, ২৮১, ২৯০,
 ২৯১, ৩০১, ৩২২, ৩৫১, ৩৫৪, ৩৫৭-৩৫৮, ৩৬২
 ৩৬৩, ৩৭৫-৩৭৬, ৩৮৭-৩৮৯, ৩৯৩, ৩৯৫,
 ৩৯৮-৩৯৯, ৪০৪, ৪১০, ৪২১, ৪২৩, ৪৪০, ৪৪৬,
 ৪৪৭
 আকন্দ, আকবর হোসেন, ৩৪১
 আকন্দ, মোশাররফ, এডভোকেট, ২১৭
 আকন্দ, মোঃ আসমত আলী, ১৪-১৬
 আকবর, আলী, হাবিলদার ৩৩০-৩৩২, ৩৪৪-৪৪৬, ৩৪৭
 আকবর, মোঃ আলী (অফিসার বাহিনী) ৪৭৩
 আকরাম(বেগ), মেজর(পাঞ্জাবী), ৩২১, ৩২৯-৩৩১
 আকাশবাণী, ১৮৫, ২০৯, ২১৫, ২১৮, ২৪০, ৪৪৩
 আকাস, আলী ৩৮০
 আকতার, পাক মেজর, ২৭৯, ২৮০, ২৮৪-২৮৫
 আক্কেলপুরী, মুজিবর রহমান, এম-সি-এম ৩৩১
 আখতার, ক্যাপ্টেন ১১৪-১১৫, ১৩১-৩২
 আখতারুজ্জামান, ইপিআর সুবেদার, ৩০২
 আজম, আলী, এম-এন-এ ১৩৯
 আজাদ, আব্দুস সামাদ, ৩৪৭
 আজাদ, রফিক (কাদের বাহিনী), ৪৫০
 আজাহার (কাদের বাহিনী), ৪৫০
 আজিজ, ক্যাপ্টেন, ৩৪
 আজিজ, (ম্যানেজার, চা-বাগান), ২২৩

আজিজ, ২২৪

আজিজ, আবদুল, ইপিআর হাবিলদার, ২৯৩
 আজিজ, শেখ আবদুল (এম-সি-এ), ৩৫৯
 আজিম, পাক হাবিলদার, ২০১-২০২
 আতিয়ার (ছাত্র), ৩৮২
 আদিলউদ্দিন, (এম-এন-এ), ৩৮৩, ৩৮৪
 ‘আনন্দ বাজার পত্রিকা’ ৩৮৬, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৪,
 ৩৯৭, ৩৯৯-৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪১০,
 ৪১১, ৪১৩, ৪১৬, ৪১৭-৪১৮, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪,
 ৪২৫, ৪২৬-৪২৭, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৪৬
 ‘আনসার’ ২২, ৮৬, ২২১, ২৩৭, ২৪৫, ২৫৪,
 ২৫৯, ২৬৪, ২৬৯-২৭০
 আনসার এ্যাডজুট্যান্ট, ৩৬২
 আনসারী, পাক মেজর জেনারেল ২
 আনসারী, পাক বিগ্রেডিয়ার ২৯, ৩৩, ৩৫, ৪১
 আন্তঃসার্ভিসেস কুচকাওয়াজ ১১
 আনু (গেরিলা), ৪৭৯
 আনোয়ার, ক্যাপ্টেন (পাঞ্জাবী), ৩৬
 আনোয়ার নুরুল (বাদশা), ৩৪১
 আনোয়ার, মহম্মদ (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৯৯
 আফজাল, নাবিদ (পাক ক্যাপ্টেন), ৩২৯
 আফতাব, গেরিলা (শহীদ), ৪৯০
 আফসার ব্যাটালিয়ন, ৪৬৪-৪৭৫
 আবদুল্লাহ (কাদের বাহিনী), ৪৫০
 আববাস, ড্রাইভার, ৯৪
 আব্বাস, কমর, পাক ক্যাপ্টেন, ১৭০-১৭১, ২০১-
 ২০৩, ২১২-২১৩, ২১৭-২১৮
 আবুল (মিস্ত্রী), ৩৫১-৩৫২
 আবেদীন, জয়নাল, সিপাই, ২০৩-২০৪
 আবেদীন, জয়নাল, হাবিলদার, ২৮৭
 আবেদীন, জয়নাল, ল্যান্স নায়ক (শহীদ), ২৯৩-২৯৪
 আমজাদ (সাইদ), ক্যাপ্টেন (পাঞ্জাবী), ৯৯, ১০০-
 ১০১, ১৩১-১৩২, ১৩৩-১৩৪, ১৩৯
 আমজাদ, গেরিলা (শহীদ), ৪৯০-৪৯১
 আমজাদ (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৪৮-৩৪৯
 আমানুল্লা কোম্পানী, ৪৬১
 আশিয়া, সৈয়দ গোলাম, ইপিআর নায়ক সুবেদার,-
 ১৩৮, ১৪৮-১৫০

আমিনুদ্দীন, এম-পি, ৩৪৮
 আলী, আবদুল, হাবিলদার, (ইপিআর), ৩৩২
 আমীনউল্লাহ (আওয়ামী লীগ কর্মী), ১৪৫-১৪৬
 আমীন, নূরুল হাবিলদার, ১৪৬-১৪৭
 আমীন, মোঃ নূরুল (অফিসার বাহিনী), ৪৭৩-৪৭৪
 আমীন, রুহুল, সুবেদার-মেজর, ৩৭-৩৮
 আমীন, রুহুল, (শহীদ), ১৪৩-১৪৪
 আমু, মোঃ আমির হোসেন (এম-সি-এ), ৩৫৭
 ৩৬২-৩৬৩
 আরজান, ৩৭১
 আরজু, সোহরাব আলী খান, (ছাত্র নেতা), ৪৬২
 আরবাব, জাহানজের, পাক বিগ্রেড কমান্ডার
 (২য় বেঙ্গল), ১৬০-১৬৩, ১৬৬-১৬৭, ১৮৩-১৮৫,
 ১৮৭, ১৯২, ১৯৩
 আরানী ব্রিজে প্রতিরোধ, ৩২৮-৩২৯
 আরাফাত, ইয়াসির, ৪৭-৪৮
 আরিফ, পাক ক্যাপ্টেন, ১২
 আরিফ, ইপিআর হাবিলদার, ২১২
 আরিফ, (গেরিলা), ৪৮৯-৪৯০
 আল মাহমুদ, ডাঃ আবদুল্লাহ, ২১৭
 আলতাফ, ২২৪
 আলফা কোম্পানী (৪ বেঙ্গল), ১০৪-১০৫, ১১৩-
 ১১৪, ১১৬-১৭, ১২০-১২১, ১২২-১২৩, ১২৪,
 ১৯৬-১৯৭, ১৯৮-১৯৯
 আলম, (শহীদ), ৩৭৫
 আলম, (গেরিলা), ৪৭৯-৪৮১, ৪৮৫-৪৮৬
 আলম, কবিরুল (ছাত্র নেতা), ৩৮২-৩৮৩
 আলম, কবিরুল (ইপিআর সৈনিক), ৩৮৪
 আলম, খোরশেদ, (কাদের বাহিনী), ৪৫০, ৪৬১-৪৬২
 আলম, বদরুল, ফ্লাইং অফিসার, ১১
 আলম, দিদারুল, লেফটেন্যান্ট, ১০৩-১০৪
 আলম, নাবিদ, পাক ক্যাপ্টেন, ২৯০, ২৯১-২৯২,
 ৩০৪-৩০৬
 আলম, শামসুল, ইপিআর (শহীদ), ২২
 আলম, শামসুল (প্রাক্তন নৌ অফিসার), ২৭০
 আলাউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ২৩০, ২৩১-২৩২
 আলি, মনসুর, মেজর, ৩৯৯
 আলি, মানওয়ার, (পাকসেনা), ৪২৪-৪২৫
 আলী, আইয়ুব (অফিসার বাহিনী), ৪৬৭-৪৬৮
 আলী, আকবর (চেয়ারম্যান), ৩০৫-৩০৬

আলী, আজম আমীর, ৩৮২-আমিনউদ্দিন, ৩৮২-
 ৩৮৩
 আলী, আবেদ, ৩৪৩-৩৪৪
 আলী, আসমত (জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক), ৩৬২-৩৬৩
 আলী, আসাদুর, ইপিআর হাবিলদার, ১৪৮-১৪৯
 আলী, আরব, ইপিআর সুবেদার, ২৮৭-২৮৮,
 ২৮৯, ৩০১-৩০২
 আলী, আহমদ, ডাঃ, ১৭২
 আলী, ইউনুস, এম-পি-এ, ২৩৯-২৪০
 আলী, ইউনুস (কাদের বাহিনী), ৪৬১
 আলী, ইউসুফ, ল্যান্স নায়েক (১ম বেঙ্গল), ২৬৮-২৬৯
 আলী, মোঃ ওয়াহেদ (অফিসার বাহিনী), ৪৭৪-৪৭৫
 আলী, করম, নায়েক, সুবেদার, ২৮১
 আলী, খান জাহান, ৩৫৯-৩৬০
 আলী, জমজম, হাবিলদার, ৩৩২-৩৩৩
 আলী, ডক্টর, ২২৪
 আলী তোফাজ্জল (প্রাক্তন মুসলিমলীগ মন্ত্রী), ৪১৬
 আলী, নায়েব, নায়েক (শহীদ), ৯২-৯৩
 আলী, নওশের, (চেয়ারম্যান, দালাল), ২৭৪-২৭৫
 আলী, ফতে, ৪৮৫-৪৮৬
 আলী, মকসেদ, ৩৬৩-৩৬৪
 আলী, ক্যাপ্টেন মনসুর (অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশ
 সরকার), ২৯৮, ৩৪৬-৩৪৭, ৪৪৩-৪৪৪, ৪৬২
 আলী, মনোয়ার, ইপিআর সুবেদার, ৩৩০-৩৩১
 আলী, মাহবুব, ৪৮৯-৪৯০
 আলী, মীর শওকত, মেজর, ৩০-৩১, ৩৪-৩৫,
 ৪৪-৪৫, ৭২-৭৩, ৭৯, ৮৮-৯৫
 আলী, মোবাস্শের, ল্যান্স নায়েক, ১৪৮-১৪৯
 আলী, মোবারক, সিপাই (শহীদ), ১৮২-১৮৩
 আলী, মোহাম্মদ, নায়েক, (পুলিশ), ১৮
 আলী, মোহাম্মদ, সিপাই (পুলিশ), ১৮-১৯
 আলী, মোহাম্মদ, (রিকশা শ্রমিক), ২৯০-২৯১, ৩০৬
 আলী, মোহাম্মদ আনসার, নায়েক সুবেদার, ২৯৯-৩০১
 আলী, মোহাম্মদ নওশের, সিপাই, ২০৩-২০৪
 আলী, রজব (দালাল), ৩৫৯-৩৬০, ৩৬০-৩৬১
 আলী, শরীফ খান মোহাম্মদ (এস-আই-পুলিশ), ১৬-১৭
 আলী, সমশের, প্লাটুন কমান্ডার (শহীদ), ৪৭১-৪৭২
 আলী, সাহেব (রাজাকার), ৪৬৮
 আলী, সুন্দর, ৪৬৭-৪৬৮
 আলী, সুরত, নায়েক (শহীদ), ১৮০-১৮১

আলী, সৈয়দ কেরামত (গোরা) (শহীদ), ৩৪১-৪২, ৩৪৩, ৩৪৫
 আলী, হাজী মুরাদ, নায়ক সুবেদার, ২৯৩-২৯৪
 ২৯৯-৩০০
 আলী, হাতেম, (আর-আই, পুলিশ) ৩৩১-৩৩২
 আলী, মোঃ হাসমত (অফিসার বাহিনী), ৪৭৪
 আলেকজান্ডার (গ্রীক বীর), ১৬০-১৬১
 আশরাফ, মেজর, ৩৮
 আশরাফ, ক্যাপ্টেন (৩য় বেঙ্গল), ২৭৯-২৮১,
 ২৯৪-২৯৫, ৩০৪-৩০৫, ৩০৫-৩০৬, ৩০৭, ৩৪৫
 আশরাফ, মোঃ পাক হাওয়ালাদার, ৩
 আশরাফ, সুবেদার, ৪৮৯, ৪৯০
 আশুগঞ্জের যুদ্ধ, ২৭৯
 আসকের দীঘি অপারেশন, ৪৩
 আসমা (মেডিকেল ছাত্রী), ১১৫
 আসলাম, মোঃ পাক লেঃ কর্নেল, ২৪৯
 আসলাম, পাক মেজর, ৩২৪-৩২৫
 আসাফউদ্দৌলাহ, (সরকারী অফিসার), ৬-৭
 আসাদুজ্জামান, ৩৪৭
 আসাদুজ্জামান, এ, কে, এম, (অফিসার বাহিনী),
 ৪৭৩-৪৭৪
 আহমদ, অলি, ক্যাপ্টেন, ২৮-২৯, ৩০-৪১, ৩৪,
 ৪০-৪১, ৪২-৪৫, ৪৭-৪৮, ৯২-৯৩, ৯৫
 আহমদ, আসাদ (বায়রন) ছাত্র-গেরিলা, ৩৩৩-
 ৩৩৪, ৩৩৫
 আহমদ, ইলিয়াসউদ্দিন, ৩৪১-৩৪২
 আহমদ, খাজা, ৩৯-৪০
 আহমদ, গিয়াসউদ্দীন, নায়ক, ১১২-১১৩, ১২৪-১২৫
 আহমদ, গোলাম(অতিরিক্ত পুলিশ সুপার), ৩৬২-৩৬৩
 আহমদ, ডাঃ টি, ৩৪২-৩৪৩
 আহমদ, ডাবলু (সেকশন অফিসার), ৪৮৬-৪৮৭
 আহমদ, তোফায়েল, ৩৪৬-৩৪৭
 আহমদ, নজির, ক্যাপ্টেন, ২৯০-২৯২, ৩০৪-৩০৬
 আহমদ, ডঃ নফিজ, ৬-৭
 আহমদ, নুরু, পাক ক্যাপ্টেন, ৩৩১-৩৩২, ৩৪৫-
 ৩৪৬ আহমদ, নেসার, পাক বিগ্রেডিয়ার, ১৩-১৪
 আহমদ, ফকরুদ্দিন (পুলিশ সুপার), ৩৬২-৩৬৩
 আহমদ, ডাঃ ফরিদ (আওয়ামী লীগ নেতা), ২৬৩-২৬
 আহমদ, ফরিদউদ্দিন, ইপিআর সুবেদার, ২০১,
 ২০৩-২০৪, ২১২-২১৭, ২১৭-২১৮
 আহমদ, ফয়েজ, হাবিলদার (১ম বেঙ্গল), ২৬৮-২৬৯
 আহমদ, মনজুর, ৩৫৫

আহমদ, মহীউদ্দিন (এম-পি), ৩৫৭, ৩৬২-৩৬৪,
 ৩৬৫-৩৬৬
 আহমদ, মাহাবুবউদ্দিন (এস-ডি-পিও, বিনাইদহ),
 ২৪৩-২৪৪, ২৪৫-২৪৭, ২৪৯-২৫০, ২৫২-২৫৩
 ২৫৬, ২৫৮-২৬১
 আহমদ, সালাউদ্দিন (ছাত্র নেতা) ৩৮২-৩৮৩
 আহমদ, সুলতান, নায়ক সুবেদার, ২০৫-২০৬
 ২০৭-২১০, ২১৬
 আহমদ, সৈয়দ, এডভোকেট, ২১৭
 আহমদ, আলী, ইপিআর সুবেদার, ২৮৫
 আহমদ, আফসারউদ্দিন, ৪৬১, ৪৬৫-৪৭৪
 আহমদউল্লাহ, নায়ক সুবেদার (১ম বেঙ্গল), ২৬৭-
 ২৬৮
 আহমেদ, ইমামউদ্দিন, ৩৮২-৩৮৩
 আহমেদ, ডাঃ ওয়াইজউদ্দিন, ৪৬৬-৪৬৭
 আহমেদ, তমিজ (অফিসার বাহিনী), ৪৭০-৪৭১
 আহমেদ, তাজু, হাবিলদার (পুলিশ), ১৮
 আহমেদ, তাজউদ্দিন (প্রধানমন্ত্রী), ৪, ৮০-৮১,
 ১০৩, ১১৫-১১৬, ২৪২, ২৪৪-২৪৭, ২৫২-২৫৩
 ২৫৭-২৫৮, ২৫৯-২৬১, ২৯৯-৩০০, ৩০৬, ৩৪৬-
 ৪৭, ৩৮৩, ৪১২
 আহমেদ, দিলদার (অফিসার বাহিনী), ৪৬৮-৪৬৯,
 ৪৭০-৪৭১
 আহমেদ, ফোরকানউদ্দিন (ছাত্র), ৪৬৭-৪৬৮
 আহমেদ, মোজাফফর, ইপিআর সুবেদার, ২৩৫-
 ২৩৬, ২৩৭-২৩৮, ২৪৫, ২৪৯-২৫০
 আহমেদ, মোমিনউদ্দিন (এম-পি), ৩৮১-৩৮২
 আহমেদ, মোঃ আলাউদ্দিন, ৪৭৪-৪৭৫
 আহমেদ, শফিক, সিপাই, ২৩১-২৩৩
 আহমেদ, সুলতান,
 সুবেদার-মেজর (অফিসার বাহিনী), ৪৭৩-৪৭৪
 আহসান, সেলিম, ছাত্র (শহীদ), ১৮১-১৮২, ১৮৩
 আহসান, সৈয়দ (জেলা প্রশাসক, রংপুর), ৪০১-৪০২
 আহমেদ, ডাঃ হাফিজউদ্দিন, ৩৯৪
 আড়িয়ালবাজার অপারেশন, ৩৩১-৩৩২, ৩৪৫-৩৪৬
 ই
 ইউ-ও-টি-সি, ৩৯
 ইউথ ক্যাম্প, ১০৭
 ইউনুস, হাবিলদার (৪ বেঙ্গল), ১৩২
 ইউনুস, আবু মোহাম্মদ (এম-পি), ৩৪৫
 ইউসুফ, এ, এন, এম (ডি-সি, ফরিদপুর), ৩৮২-
 ২৮৩, ৩৮৪-৮৫

ইউসুফ, এ্যাডভোকেট, ৩৬২-৩৬৩
 ইকবাল, মেজর, ৬
 ইকবাল, পাক মেজর, ৫৭-৫৯, ৬৩-৬৫
 ইকবাল (বাচ্চু), গেরিলা যোদ্ধা, ১১৬
 ইকবাল, ভুঁইয়া, (সাংবাদিক), ৩৮৫
 ইকবাল, হল, ৬-৭, ১৮
 ইতবার, পাক সুবেদার-মেজর, ৬৩, ৬৪-৬৫
 'ইত্তেফাক' (পত্রিকা), ৭
 ইদ্রিস, সিপাই, ২০১
 'ইঞ্জিনিয়ার্স' (পাক অস্ত্রবাহী জাহাজ), ৪৫৫-৪৫৬
 ইনসান, শেখ (হাজী), ৩৪৪-৩৪৫
 ইপিআর, ১ নং উইং, ২৩১-২৩২
 "২ নং" ২০১
 "৩ নং" ২৩১-২৩২
 "৪ নং" ২৩৪-২৩৫, ২৪৮-২৪৯, ২৬১
 "৫ নং" ২৪৩, ২৫০-২৫১
 "১২ নং" ২৩১-২৩২
 ইপফাক, ১১৯-১২০
 ইফতেখার (গেরিলা), ৪৮৮-৪৮৯
 ই, বি, আর, সি-এর প্রতিরোধ, ৩২-৩৪, ৬৫-৬৬
 ইব্রাহিম, লেঃ, ১৭২, ১৭৬, ১৮৪, ১৯৪-১৯৫
 ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, হাবিলদার (১ম বেঙ্গল), ২৬৬-২৬৯
 ইব্রাহিম, (শহীদ), ৩৭২-৩৭৩
 ইব্রাহিম, হেমায়েতবাহিনী, (শহীদ), ৪৭৫-৪৭৭
 ইমাম, (কাদের বাহিনী), ৪৬২-৪৬৩
 ইমাম, জাফর, ক্যাপ্টেন, ৫১-৫২
 ইমাম, মেহেদী আলী, মেজর, ৩৫৭-৩৬২
 ইমামুজ্জামান, লেঃ, ১০৮, ১১২-১১৩, ১৪২-১৪৪
 ইলিয়াস, ২২৪
 ইসমাইল, মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ), ১৪৬-১৪৭
 ইসলাম, আমিরুল, ব্যারিস্টার, ২৫৩-২৫৩, ২৫৭-২৫৯
 ইসলাম, ওয়ালিউল (এস-ডি-ও, মাগুরা), ২৫১, ২৭০-২৭১
 ইসলাম, কাজী আজিজুল, এ-ডি-সি, (শহীদ), ৩৬২-৩৬৩
 ইসলাম, কে, এম, আমিনুল (উইং কমান্ডার), ৪৮৫
 ইসলাম, নজরুল (প্রকৌশলী), ৪৮৬-৪৮৭
 ইসলাম, নুরুল, মেজর, ২-৩, ১৬৫-১৬৬, ১৬১, ১৬৯-১৭০, ১৭০-১৭২, ১৭৫-১৭৬, ১৮৪, ১৯৬-১৯৮, ২০১, ২০২-২০৩, ২১২-২১৫

ইসলাম, নুরুল, প্রফেসর, ৯০-৯১
 ইসলাম, নুরুল (ছাত্র নেতা), ৩২৭
 ইসলাম, নুরউল (পুলিশ অফিসার), ৩৪০-৩৪১, ৩৪২
 ইসলাম, নুরুল, ৩৮২-৩৮৩
 ইসলাম, নুরুল (মুক্তিসেনা), ৪৬৬-৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৭-৪৭০
 ইসলাম, রফিক-উল, মেজর, ২৯-৩০, ৩৪-৩৫, ৪০-৪৩, ৪৪-৪৭, ৫৭-৫৯, ২৬১-২৬২
 ইসলাম, রফিকুল (লাল), ৩৪২-৩৪৩
 ইসলাম, শফিকুল (গেরিলা), ৪৮৯
 ইসলাম, সিরাজুল, সুবেদার (শহীদ), ১৭৯
 ইসলাম, সিরাজুল, লেঃ, ২৮৫
 ইসলাম, সৈয়দ নজরুল (অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সরকার), ৮০-৮১, ১০৩, ১১৫-১১৬, ১৩৯, ২১৭, ২১৭-২১৯, ২৪৫-২৪৬, ২৫৯-২৬১
 ইসলাম, সৈয়দ নজরুল (ছাত্র), ৪৬০-৪৬১
 ইসহাক, নায়ক সুবেদার, ১৪৫-১৪৭
 ইসহাক, নায়ক সুবেদার, ১৪৫-১৪৭
 ইসহাক, পাক ক্যাপ্টেন, ৩৩৩
 'ইয়া আলী' (রণধ্বনি), ২২৪-২২৫, ২৯৫
 ইয়াসিন, লেঃ কর্নেল, ১৯৬
 ইয়াহিয়া, ফৌজ, ৩৯৩
 ইয়াহিয়া, মোঃ সাইফউদ্দিন (কনভেনশন লীগ), ৩৫৪
 ইংরেজ (কার্হুরিয়া), কাদের বাহিনী, ৪৬২-৪৬৩
 উ
 উদালিয়া চা বাগান, ৭৮-৭৯
 উলফত (গেরিলা), ৪৭৯-৪৮০, ৪৮২-৪৮৩, ৪৮৪-৪৮৫, ৪৮৬-৪৮৭
 এ
 'এজাজ ব্রিজ', ২৮২-২৮৩, ৪০৯-৪১০
 এজাজ, পাক মেজর, ২৮২-২৮৩, ৪২২-৪২৩
 এনাম, মেজর, ৭-৮
 এনায়েত (অধ্যাপক), ৩৭৪-৩৭৫
 ৪ এপ্রিল (তেলিয়াপাড়া বৈঠক), ১৭৫
 এফ-৮৬ (পাক জঙ্গী বিমান), ১৭৯, ১৯২
 এরশাদ, হাবিলদার, ১৮০
 ও
 ওমর, পাক মেজর-জেনারেল, ২
 ওমর, গেরিলা, ৪৮৮-৪৮৯
 ওসমান, মিসেস, ২৩৯-২৪১, ২৪২-২৪৩, ২৪৫-২৪৬, ৪০২-০৩

ওসমানী, এম, এ, জি, কর্নেল (অবঃ) সি-ইন-সি,
(বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী), ৮০-৮১, ৯৫, ১০৩,
১০৬, ১১৫-১১৬, ১৭৫, ১৭৭-১৭৮, ২২৬-২২৮,
২৫৯-২৬০, ২৮১, ২৮৯, ২৯৯, ৩০৬, ৩২৭-৩২৮,
৩৬৩, ৪৮৩, ৪৮৫
ওহাব, ক্যাপ্টেন, ২৬০-২৬১
ওহাব, আবদুল সুবেদার (৪ বেঙ্গল), ১২৯
ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম, ১১৮-১১৯
ওয়ারিস, জামান (বিহারী), ৪৮৬-৪৮৭
ওয়ালীউল্লাহ, নায়েক সুবেদার, ১৪৫-১৪৭
ওয়াহাব, ফজলুল, ৪৭২-৪৭৩
ওয়াহিদুজ্জামান (মুসলিম লীগ নেতা), ২৭৬-২৭৭
ক
কছিমউদ্দিন, ৪৬৮, ৪৬৯-৪৭০
কটিয়াদী খানা অপারেশন, ২০৪
কফিলউদ্দিন, সিপাহী (শহীদ), ১৭৯
কবির, সহকারী আনসার এ্যাডজুট্যান্ট, ২৯৩-২৯৪
কবির, হুমায়ুন, লেঃ, ১০০-১০১, ১০৮, ১১৫-
১১৮, ১২১-১২৩, ১২৫-১২৯, ১৩১-১৩২, ১৩৪-
১৩৬, ১৪১-১৪২
কমরউদ্দিন, পীর, মেজর (পাঞ্জাবী), ৫-৬
কমলছড়ি চা বাগানস, ১১২
কমাতো পার্টি, ১০৫-১০৬, ১০৯
করিম, আবদুল (অফিসার বাহিনী), ৪৬৭-৪৬৮
করিম, এনায়েত (ছাত্রনেতা), ৪৬০-৪৬১
করিম, কার্পোরাল, ৯৪-৯৫
করিম, পাক মেজর, ২৩১-২৩২
করিম, ফজল, পাক লেঃ কর্নেল, ২৭৯, ২৮৩-
২৮৪
করিম, ফজলুল, নায়েক সুবেদার, ৮, ৮-৯
করিম, ফজলুল, এম-সি-এ, ২৯২-২৯৩
করিম, সুবেদার, ১৮০
করিম, হাওলাদার (পুলিশ), ৩৪৫
করিমউদ্দিন, এম-সি-এ, ২৮৮-২৮৯
করিমউল্লাহ, বিগ্রেডিয়ার (গাজীপুর অর্ডিন্যান্স
ফ্যাক্টরী), ১৬০-১৬১
কর্নেলবাজার অপারেশন, ১৪১-১৪২
কর্মকার, মিছির, ৩৮২-৮৩১
কলি, ২৪০-২৪১
কলিমুদ্দিন, পুলিশ (শহীদ), ৩৩৭-৩৩৮
কয়েদী, ২৭০
কাইয়ুম, জহুরুল, এম-সি-এ, ৪০

কাউসার, নায়েক সুবেদার, ৩০২-৩০৩
কাজিমউদ্দিন, ইপিআর সুবেদা মেজর,
২৯০-৩০০, ৩০৪-৩০৭
কাজী (গেরিলা), ৪৭৯-৪৮০
কাজী, আতোয়ার, অধ্যাপক, ৪৬২
কাদের, ফ্লাইট লেঃ, ১১
কাদের, আফতাব, ক্যাপ্টেন (আর্টিলারী), ৮৫-৮৭,
৯৩-৯৫
কাদের, আবদুল সিপাহী, ২৮৬-২৮৭
কাদের, এম, এ (স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক), ৩৫-৩৬, ৬৭-৬৮
কাদের, সরদার আবদুল, মেজর (অবাস্কালা),
২৩৫-২৩৬
কাদের বাহিনী, ২৩৭-৩৫২
কানু, ৩৬৩-৩৬৪
কানুপুরের যুদ্ধ, ৩৩৩-৩৩৪
কামরুজ্জামান, এ, এইচ, এম (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), ৩৪৬-
৩৪৭
কামাল, বেগম সুফিয়া, ১১৫
কামাল, মোস্তফা, সিপাহী, ১৪০-১৪১, ১৪১-১৪২
কামাল, মোস্তফা, হাবিলদার (ইপিআর), ৩৩২-৩৩৩,
কামাল (ছাত্র), ৩৬৪-৩৬৫
কামাল, আবু হেনা মোস্তফা, (ছাত্র), ৪৬৩-৪৬৪
কামাল, আহমেদ, অধ্যাপক, ৩৮৪-৩৮৫
কামাল, কাজেম (পাক সামরিক অফিসার), ১৬৯,
১৮৪-১৮৫, ১৯৪-১৯৫, ১৯৭
কামাল, শেখ, ৪-৫
'কালান্তর' (পত্রিকা), ২২, ৪৩৮, ৪৪৪-৪৫
কালাম, আবুল, হাওলাদার, ১৮৩
কালাম, ক্যাপ্টেন (শহীদ), ২৬১
কালাম, ড্রাইভার, ৬০-৬২
কালাম, আবুল (কাদের বাহিনী), ৪৬১-৬২
কালিয়া (বি-এস-এফ অফিসার), ৭৭
কালুরঘাটের যুদ্ধ, ৪৩-৪৪, ৯০-৯১
কাশেম, আবুল, সুবেদার (পুলিশ), ১৮
কাশেম, আবুল, নায়েক সুবেদার (৩য় বেঙ্গল),
৩৩১-৩৩২
কাশেম, আবুল (অফিসার বাহিনী), ৪৬৮-৪৭০
কাশেম, সিগন্যালের (কাদের বাহিনী), ৪৬৩-৪৬৪
কায়সার (আতাউর রহমান) এম-পি-এ, ৪০-৪১,
৪৪-৪৫, ৬৭, ৭২-৭৩, ৯০-৯১
কায়েস, সিপাহী (পুলিশ), ১৯
কিবরিয়া, গোলাম, ৩৫১-৩৫২

কৃষ্ণ, ২২, ১৫২, ৩৪৮-৩৫১, ৩৬৯-৩৭০,
৩৭৪-৩৭৫,
কুইয়া, লোকাস(খুস্তান), ২০১-২০২
কুতুব, গেরিলা, ৪৮৯
কুদ্দুস, এম, এ, মেজর, ২৩১-২৩২
কুদ্দুস, এম, এ (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৯৯,
কুমিল্লার লড়াই, ৪৮-৫২, ৬৯
কুমিল্লা-নোয়াখালীর প্রতিরোধ, ১৩৩-১৫৯
কুষ্টিয়ার যুদ্ধ, ২৬১
কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার প্রতিরোধ, ২৩৪-২৫১
কুষ্টিয়া-যশোরের প্রতিরোধ, ২৫১-২৬১
কেরানী, হাজী মোঃ, পাক মেজর, ৮
ক্লেয়ার, ভারতীয় বিগ্রেডিয়ার, ৪৫২-৪৫৩, ৪৫৯-৪৬০
কোর্ট মার্শাল, ৯-১০
কোরেশী, আরশাদ, পাক লেঃ কর্নেল, ২৮৩-২৮৪
কোরেশী, তারেক রসুল, পাক লেঃ কর্নেল, ২৮৪-
২৮৫, ২৮৭-২৮৮, ৩০০-৩০১
২৯-ক্যাভালরি, ২৮৭
খ
খলিল (গেরিলা কমান্ডার), ১২৬-১২৭
খসরু পার্টি, ৩৭৪-৩৭৫
খান, আওয়াল, সুবেদার (পাঠান), ২৮৬-২৮৭
খান, আবদুল মালেক (আওয়ামী লীগ নেতা),
৩৬২-৩৬৩
খান, আবদুল মোনেম, ৪৮৩-৪৮৪
খান, আবদুল লতিফ, ৩৫৪
খান, আবদুল হামিদ, জেনারেল, চীফ অব স্টাফ,
১, ৪-৫, ১০, ২৮-৩০, ৩৩
খান, আমানুল্লাহ (পাক সামরিক অধিনায়ক),
৪৫৫-৪৫৬
খান, ইসহাক (দালাল), ৪৬৬-৪৬৭
খান, ইয়াহিয়া, জেনারেল, ২, ৪, ১০, ১৩, ২৮,
৪৯-৫০, ৫৯-৬০, ৭৪, ১২৬-১২৮, ১৩২, ১৮৪-
১৮৫, ২১২, ২৭৯, ২৮১-২৮২, ৩২১-৩২২, ৩৩৬-
৩৩৭, ৩৪৮-৩৪৯, ৩৯১-৩৯২, ৪৩০, ৪৩৮,
৪৫২-৪৫৩
খান, এতয়ার, (পাক ইপিআর কোম্পানী কমান্ডার),
২৮৭-২৮৮
খান, এস, আর, ৬-৭
খান, ওয়ালী, ৪
খান, কালা, সুবেদার (পাঞ্জাবী), ৩০৪
খান, খানে আলাম (ডি-সি, বগুড়া), ৩৪১, ৩৪৫,
৩৪৬-৩৪৭

খান, খিজির হায়াত, পাক লেঃ কর্নেল, ৯৬-৯৭,
৯৯-১০০, ১০০-১০১, ১৩০-১৩২, ১৩৩-১৩৪
১৩৮-১৩৯
খান, খোদাদাদ, মেজর জেনারেল, ১৭৪-১৭৫
খান, গুলজার, পাক হাবিলদার মেজর, ৩৩২-৩৩৩
খান, টিক্কা, লেঃ জেনারেল, ১, ৪-৫, ৮-৯, ৪০,
১৬৪, ১৬৬-১৬৭, ১৮৪-১৮৫, ১৯৬-১৯৭, ২১২,
৪৩০
খান, দাউদ, ৪৬২
খান, দাদু, পাক সুবেদার-মেজর, ৩৩২-৩৩৩
খান, নবী নেওয়াজ, কোম্পানী কোমান্ডার, ৪৬১
খান, নুরুল কাদের (ডি-সি, পাবনা), ৩৪৮-৩৪৯
৩৫৪-৩৫৫
খান, নুরুল মোমেন (পুলিশ সুপার), ৩৮২-৩৮৩
খান, পয়া, নায়েক (পাঠান), ৮-১০
খান, বোস্তান, পাক নায়েক সুবেদার, ২১৩-২১৪
খান, ভুট্টো, ক্যাপ্টেন, পাঞ্জাবী, ২৮৭-২৮৮
খান, মাহমুদ হাসান (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৪১-
৩৪৩
খান, মিঠা, মেজর-জেনারেল, ২, ২৯-৩০, ৩১-
৩২
৭৫, ৯২, ২৫৮
খান, মীর্জা, সুবেদার, পাঞ্জাবী, ৩০৪
খান, মুজিবর রহমান, ৩৮২-৩৮৩
খান, মোকাদ্দেস আলী (কাদের বাহিনী), ৪৬১
খান, মোহাম্মদ, পাঞ্জাবী ইপিআর, ১৩-১৪
খান, রশীদ, ৩৪২-৩৪৩
খান, রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল, ২
খান, রিয়াজ, পাক মেজর-জেনারেল, ৪২২-৪২৩
খান, শওকত, পাক মেজর, ২৩০
খান, শাহপুর, পাক কর্নেল, ৬৯
খান, সিকান্দার, ইপিআর স্টাফ কর্নেল, ২১৭
খান, সেকান্দার, পাক লেঃ কর্নেল, ২৩১-২৩২
খান, হজরত, পাক নায়েক সুবেদার, ২০১, ২১৩-২১৪
খান, মোঃ হাতেম আলী, ৪৭৪-৪৭৫
খান, হামিদুল্লাহ, ফ্লাইট লেঃ, ৪৮১-৪৮২, ৪৮৫-৪৮৬
খালিদ, হুমায়ুন, অধ্যক্ষ, ২১৭-২১৮
খালেক, সুবেদার, ৪১-৪২
খালেক, আবদুল, সিপাহী, ১৫-১৬
খালেক, আবদুল, সুবেদার (ইপিআর), ২৯৩-২৯৪
২৯৭-২৯৯, ৩০৪
খালেক, মোঃ আবদুল, সুবেদার (৩য় বেঙ্গল),
২৮৩-২৮৭

খায়ের, সিপাহী (শহীদ), ১৮০
 খুলনার প্রতিরোধ যুদ্ধ, ৩৭৫, ৩৮১-৩৮২
 খোকন, (গেরিলা যোদ্ধা), ১০৮-১০৯
 খোকা, গেরিলা (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৪৫১
 খোন্দকার, আবদুল করিম, এয়ার ভাইস মার্শাল, ১১
 গ
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৮০-৮১, ৮৪,
 ৮৬, ১০৩, ১০৭-১০৮, ২৫৮-২৬১
 গণবাহিনী, ১০৭, ১৮১-১৮২
 গণহত্যা, ৫-৬, ৬-৮, ৬৩, ৮৯, ৯৯-১০০
 গনজালভেজ, ভারতীয় মেজর জেনারেল, ১০৩
 গণি, সুবেদার, ২১৫-২১৬
 গণি, আবদুল (ছাত্র), ৪৬৩-৪৬৪
 গণি, ওসমান, (ছাত্র), ৪৬২
 গফুর, আবদুল (কাদের বাহিনী), ৪৬১
 গয়ান, চিত্ত, ৪৭৬
 গাওয়া (রাজাকার), ৪৬৭-৪৬৮
 গান্ধী শান্তি সংস্থা, ৪৪০
 গাফফার, আবদুল, ক্যাপ্টেন, ৯৬-৯৭, ৯৯-১০০,
 ১০৫, ১১২, ১১৩-১১৫, ১২৯, ১৩৩-১৩৭, ১৩৮-
 ১৩৯, ৪১৬
 গিয়াস, ক্যাপ্টেন, ১২
 গিয়াসউদ্দিন, ২২৪
 গীল, পাক কর্নেল, ১১
 গুপ্ত, শুভাংশু (সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা), ৩৯৩
 গুল, জিন্নত, সুবেদার মেজর (পাঠান), ২০১-২০৩,
 ২১৩-২১৪
 গুলাব, ৩৪২-৩৪৩
 'গেরিলা' (পত্রিকা), ৪৮১-৪৮২
 গেরিলা বাহিনী, ১৮১-১৮২
 গেরিলা যুদ্ধ, ৮১-৮২, ১৮০-১৮১
 গ্যাদা, ২৪
 গোয়ালন্দের প্রতিরোধ, ২৪৪-২৪৫
 ঘ
 ঘটনা প্রতিরোধ, ৩৫৩
 ঘোষ, গৌর কিশোর (সাংবাদিক, আনন্দবাজার
 পত্রিকা), ৪৩৬
 ঘোষ, তারাপদ, ৩৮২-৩৮৩
 ঘোষ, বি-এস-এফ লেঃ কর্নেল, ৭৮

চ
 চক্রবর্তী, এইচ, আর, (বি-এস-এফ লেঃ কর্নেল),
 ২৪২-২৪৩, ২৪৫, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩-২৫৪,
 ২৫৯-২৬০
 চক্রবর্তী, কুমারেশ (সাংবাদিক, যুগান্তর), ৪০৬-
 ৪০৭
 চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৪০-৪১, ৪৪-৪৫
 চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র, ৮-৯, ১১, ৩১-৩২, ৩৯,
 ৪৩, ৪৬-৪৭, ৯০
 চট্টগ্রামে স্বাধীনতার লড়াই, ২৮
 চট্টগ্রামের প্রতিরোধ, ৪০-৪৭, ৫১-৫২, ৫৭-৯৫
 চট্টেশ্বরী রোড অপারেশন, ৪৩
 চন্দন, ৩৪২-৩৪৩
 চন্দর, কিয়ণ, ২৩
 চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধ, ১৫৫
 চম্পা, ২৪০-২৪১
 চাকমা উপজাতি, ৯৫-৪৪৫
 চাটাজ্জী, ভারতীয় বিগ্রেডিয়ার, ৩৪৬-৩৪৭
 চার্লি কোম্পানী (৪ বেঙ্গল), ১০৫, ১১৩-১১৪,
 চিত্ত বাবু, ৩৮২-৩৮৩
 চিমা, পাক ক্যাপ্টেন, ৩০৩
 চিলমারী কোম্পানী (ইপিআর), ২৮৭-২৮৮
 চৌধুরী, মোহাম্মদ আবু ওসমান, মেজর, ২৩৪-
 ২৫২, ২৫৩-২৫৪, ২৫৮, ২৬০-২৬১, ২৬৭-২৬৮,
 ৩৮৫, ৪০২-৪০৩, ৪১২, ৪১৭-৪১৮
 চৌধুরী, আবু তাহের, এডভোকেট, ৫-৭
 চৌধুরী, আমজাদ আহমেদ, মেজর-জেনারেল,
 (অবঃ) ৪৮৩-৪৮৪
 চৌধুরী, আমিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন, ২-৩, ২৮-৩০,
 ৩৩-৩৫
 চৌধুরী, আমিনুল হক, ৩৬২-৩৬৩
 চৌধুরী, ই, এ (পুলিশ সুপার), ১৫, ১৮
 চৌধুরী, এ, আর, আজম, ক্যাপ্টেন, ২৩৪-২৩৭,
 ২৪০-২৪১, ২৪৩-২৪৪, ২৪৮-২৫১, ২৫৩-২৫৫,
 ২৬১
 চৌধুরী, এজাজ আহমেদ, ক্যাপ্টেন, ৭৮-৭৯,
 ১৭২, ১৭৫-১৭৬, ১৮৪, ১৯৪-৯৫

চৌধুরী, এনামুল হক, ক্যাপ্টেন, ৩২-৪২, ৪৭-৪৮, ৬৫-৬৬, ১৪৪
 চৌধুরী, এম, আর, লেঃ কর্নেল, ২৮-৩২, ৩৪-৩৬, ৪২-৪৩, ৬৫-৬৭
 চৌধুরী, ওয়াজেদ, ৩৮২-৩৮৩
 চৌধুরী, ওয়াজেদ আলী (ইউ-সি চেয়ারম্যান), ৪৪৭
 চৌধুরী, কাদের, মুজাহিদ ক্যাপ্টেন, ১৪২-৪৩
 চৌধুরী, কায়স (চা বাগান ম্যানেজার, জাফলং), ২৩০
 চৌধুরী, খালেদুজ্জামান, ক্যাপ্টেন, ৩০-৩১, ৪০-৪১, ৪৪-৪৫, ৬৭-৬৮, ৯২-৯৫
 চৌধুরী, খুরশীদ আলম, ক্যাপ্টেন, ৩২১-২৮, ৩২৯-৩১, ৩৩৩-৩৪
 চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ৩২১-২৮, ৩২৯-৩১, ৩৩৩-৩৪
 চৌধুরী, জাবেদ বরকত, (কমান্ডার, ইপিআর), ২৩২-২৩৩
 চৌধুরী, তৌফিক-ই-এলাহী, (এস-ডি-ও, মেহেরপুর), ২৪৩-৪৪, ২৪৫-৪৭, ২৪৯-৫০, ২৫৯-২৬১
 চৌধুরী, বজল আহমদ, (প্লাটুন কমান্ডার, ইপিআর), ২৯২-৯৩, ৩০৪
 চৌধুরী, বি, আর (কোম্পানী কমান্ডার, ইপিআর), ২৩০-২৩২
 চৌধুরী, ডাঃ মফিজ, ৩৪৬-৪৭
 চৌধুরী, মানিক, ১৭৬-৭৭, ২২১-২২, ২২৬
 চৌধুরী, মিজানুর রহমান (এমপি), ৩৫৭-৫৮, ৩৬২-৬৩
 চৌধুরী, মোফাজ্জল হোসেন (মায়া), ৪৭৮-৭৯, ৪৮২-৮৭
 চৌধুরী, শমসের মুবিন, ক্যাপ্টেন, ৩৯, ৪০-৪৮, ৭৯-৮০, ৯২-৯৩
 চৌধুরী, শামসুল হুদা, ৮৮-৮৯
 চৌধুরী, শাহাদাত, ৪৮৫-৮৬, ৪৯০-৯২
 চৌধুরী, শাহজাদা, (মেডিকেল ছাত্র, কাদের বাহিনী), ৪৬৪-৬৫
 চৌধুরী, সমসের আলম, ৪৬
 চৌধুরী, সারু, ১৭৬
 চৌধুরী, হাফিজুল্লাহ, নায়েক (ইপিআর), ২৩০
 চৌধুরী, হারুন আহমেদ, ক্যাপ্টেন, ৪০-৪১, ৪৩-৪৭, ৬৯-৭০, ৭৮, ৭৯-৮০, ৯২-৯৩

ছ

ছাত্রলীগ, ৪-৫
 ছাত্র, ৪-৭, ২২, ৩২-৩৩, ৩৯, ৮০, ৯০-৯১, ৯৬-৯৭, ২০১, ২০৫-০৬, ২১০, ২১৭, ২১৯-২০, ২৩৭, ২৩৯-৪০, ২৫৪-৫৫, ২৬৩-৬৫, ২৬৬-৬৭, ২৬৯-৭০, ২৭৩, ২৭৪-৭৫, ২৮১-৮৪, ২৮৮-৮৯, ২৯২-৯৩, ৩০১, ৩২২-২৪, ৩২৫-২৬, ৩৩১-৩২, ৩৩৬-৪০, ৩৪৮-৪৯, ৩৫৪, ৩৬২, ৩৬৯-৭০, ৩৭৫-৭৮, ৩৮৪-৮৫, ৩৮৮-৮৯

জ

জগন্নাথ হল, ৬-৭, ৭
 জন, গেরিলা, ৪৮৯-৯০
 জবেদ, নায়েক সুবেদার, ১৪৬-৪৭
 জব্বার, আবদুল (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
 জব্বার, সুবেদার, ১৪৩-৪৫
 জলিল, এম, এ, নায়েক সুবেদার (৪ বেঙ্গল), ১৩০-৩১, ১৩৩
 জলিল, রেজাউল, লেঃ কর্নেল, (১ম বেঙ্গল), ১৯৬
 ২৩৭-৩৮, ২৫০-৫১, ২৬১, ২৬৫-৬৬, ২৬৬
 জলিল, ইপিআর জওয়ান (শহীদ), ২৮১-৮২
 জলিল, মোহাম্মদ আবদুল (ছাত্রনেতা), ৩২২-৫৯, ৩৬০-৬৬, ৩৭৭-৭৯, ৩৮১-৮২, ৪১২
 জলিল, আবদুল, ৩৮২-৮৩
 জলিল, মিঃ (এম-পি), ৪৮৮-৮৯
 জহির, সুবেদার (৪ বেঙ্গল), ১৩১-৩২
 জহিরউদ্দিন, (শহীদ), ৪৭১-৭২
 জয়দেবপুরের প্রতিরোধ, ১৬০
 জয়দেবপুর-তেলিয়াপাড়া প্রতিরোধ, ১৯৬-৯৯
 জয়নাল, সুবেদার, ৬৪-৬৫
 'জয়বাংলা', ২২, ৪৯, ৬৯০-৭০, ৮৮-৮৯, ৯০-৯১, ১০০, ১০৫-০৬, ১৩২-৩৩, ১৬৮-৬৯, ১৮৯
 ১৯৭, ২০৯-১০, ২২১-২৬, ২৫২, ২৫৫-৫৬, ২৯১-৯২, ৩০৮-০৯, ৩৪০-৪১, ৩৬৮-৭০
 'জয়বাংলা', (পত্রিকা), ৪৩০-৩১, ৪৩৪-৩৫, ৪৪৮
 'জাগ্রত বাংলা' (অফিসার বাহিনীর সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৪৬৬
 জাফর, ডাঃ, ৫৯-৬০, ৬৭, ৬৮, ৭২-৭৩
 জাফর, শাহ আবু (ছাত্র নেতা), ৩৮২-৮৩

জাফরী, আলী (প্রাক্তন সম্পাদক, 'ডন') ৪৪৪
 জাফরুল্লাহ, ডাঃ, ১১৫-১৬
 জাতীয় সঙ্গীত, ('আমার সোনার বাংলা'), ২৬০-৬১
 জানজুয়া, আবদুর রশীদ, পাক কর্নেল, ৩০-৩১,
 ৪১-৪৩, ৬৭-৬৮, ৮৮-৮৯
 'জানবাজ', ৪৬১-৬২
 জামশেদ, পাক মেজর-জেনারেল, ২, ৪৬০
 জামাতে ইসলাম, ৪৩০-৩১, ৪৩৮
 জামান, মোহাম্মদ, পাক হাবিলদার, ২৯১-৯২
 জামান, মিঃ, ৪৮০-৮১, ৪৮৩-৮৪
 জামাল (গেরিলা যোদ্ধা), ১০৮-০৯
 জামাল, ৩৮৪
 জামালউদ্দীন, সিপাই (শহীদ), ১৮২-৮৩
 জামিল, পাক মেজর, ১২
 জামিল, শাফায়াত, মেজর, ৯৭-৯৮, ৯৯-১০১,
 ১২৮-৩৫, ১৪১-৪২, ১৭৩-৭৪, ২৮১
 জামিল, অবাস্গালী মেজর (কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট),
 ১৩৭-৩৮
 জালাল, সর্দার, ৩৬২-৬৪
 জালাল, হযরত শাহ (রঃ), ৪১১-১২
 জালাল (আফসার বাহিনী), ৪৬৭-৬৮
 'জাহাঙ্গীর' (পাক যুদ্ধ জাহাজ), ৪৭-৪৯
 জাহেদ, গেরিলা, ৪৮৯
 জায়দী, ক্যাপ্টেন (পাঞ্জাবী), ৪৪-৪৫, ৪৬
 জিন্নাহ (ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী), ৩৪৫
 জিয়া, লেফটেন্যান্ট, ৩৫৮-৫৯, ৩৬০-৬১
 জিয়া, গেরিলা, ৪৭৯, ৪৮৬-৮, ৪৮৫-৮৭
 জুয়েল, গেরিলা (শহীদ), ৪৮২-৮৫, ৪৮৫-৮৭
 জেনেভা কনভেনশন, ১৩৭-৩৮
 জোয়ারদার, সুলতান আলী, ২৩৮-৩৯
 জোয়ারদার, বিনোদবিহারী, ৩৫৪
 বা
 বাবু, ৩৪২-৪৩০
 ট
 টগর, (গুডা), ২৭৩-৭৫
 টাটারু, ৩৪১-৪২
 টি, আলীর বাড়ি, ১০৫
 টিটু, ছাত্র (শহীদ), ৩৩৭, ৩৪১-৪২
 টিটো, গেরিলা (শহীদ), ৪৯০-৯১
 টুকু, ৩৫৯

টুকু, (আফসার বাহিনী), ৪৬৭-৬৮
 টুলু, ১১৫
 টুলু, গেরিলা, ৪৮৫
 টেলিফোন বিভাগ, ৯৯-১০০, ১১৮
 ট্যাংকস স্কোয়াড্রন, ১৬৫
 ঠ
 ঠাকুর, কপূরী (মুখ্যমন্ত্রী, বিহার), ২৪২, ২৯৬-৯৭
 ঠাকুর, তাহেরউদ্দিন, ১০১, ১০৩
 ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুরের প্রতিরোধ, ২৯০-৩০৩,
 ৩০৬, ৩০৮-১০
 ডগলাসম্যান, মিঃ (ব্রিটিশ এম-পি), ২৪৬-৪৭,
 ২৬১
 'ডন' (পত্রিকা), ৪৪৪
 ডালিয়া, (মেডিকেল ছাত্রী), ১১৫
 ডিউক ৩৪৩-৪৪
 ডিনায়াল প্ল্যান, ১৭৫
 ডেল্টা কোম্পানী (৪ বেঙ্গল), ১০৪-০৬, ১১৬-
 ১১৮, ১২১-২২, ১২৫-২৬
 ঢ
 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬-৭
 ঢাকা সেনানিবাস ও শহরের ঘটনা, ১-১১, ২১-২২
 ঢাকায় গেরিলা অপারেশন, ৪৭৮-৯৪
 ত
 তমিজউদ্দিন, মুজাহিদ কমান্ডার (শহীদ), ২৮৮
 তাপস (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
 তারিক, আমীন, মেজর (পাঞ্জাবী), ৩০২, ৩০৯-
 ৩১০
 তারেক (শহীদ), ৩৪১, ৩৪৩-৪৪
 তালুকদার, আবদুল গণি, ১৫-১৭
 তালুকদার, আবদুর রহিম (আওয়ামী লীগ নেতা)
 ৩৪৬-৪৭
 তালুকদার, ডাঃ কছিরউদ্দিন, মুসলিম লীগ নেতা
 (শহীদ), ৩৪৩-৪৪
 তালুকদার, গুরুদাস (কৃষক নেতা), ৩০৮
 তালুকদার, জাকারিয়া, ৩৪১-৪২
 তালুকদার, সৈয়দ আলী, হাবিলদার, (ইপিআর),
 ৩৩২-৩৩
 তালুকদার, হাতেম আলী, এম-পি, ২১৪-১৫,
 তালেব, আবু, লেঃ, ৩৭-৩৮
 তালেব, আবু, ইপিআর হাবিলদার, ২৯০-৯১, ৩০৪

তাহের, নায়েক, ৯২-৯৩, ৯৪-৯৫
 তাহের, আবু সিপাহী, ২৯৩-৯৪
 তাহের, মোঃ আবু (আফসার বাহিনী), ৪৬৭-৬৮,
 তাহের, মোঃ আবু, কর্নেল, ৪৮১-৮২
 তেলিয়াপাড়া এ্যামবুশ, ১৬২-৬৩
 তাহের, নায়েক, ৯২-৯৩, ৯৪-৯৫
 ত্যাগী, বালজিৎ সিং, (বি-এস-এফ ক্যাপ্টেন),
 ২১৮-১৯
 তৌফিক, ছাত্র (গেরিলা), ৪৮৮-৮৯
 ত্রিবেদী (বি-এস-এফ মেজর), ৩২৫-২৬
 দত্ত, চিত্তরঞ্জন, মেজর, ১৭৬-৭৮, ২২১-২৮,
 ২৩০-৩১, ২৩৩
 দত্ত, নীল কমল (সংবাদদাতা, 'যুগান্তর') ৪১৪-
 ১৫,
 দত্তগীর, গাজী, গেরিলা, ৪৮২-৮৩, ৪৮৪-৮৫
 ৪৮৬-৮৭
 দরগা, ৩৫৯-৬০
 দাস্কা, ৩২১-২২
 দানেশ (মুক্তিযোদ্ধা), ২৩৭-৩৮, ২৬১
 দারাস, (বি-এস-এফ, মেজর), ৩২৭
 দাশগুপ্ত, সুখরঞ্জন (সাংবাদিক, আনন্দবাজার
 পত্রিকা), ৩৯৯
 দাস, লেঃ কর্নেল, (বি-এস-এফ), ১৩৯
 দালাল, ১৫৬, ২৭৩-৭৪
 দাফী, ডাঃ অমলেন্দু (ভাসানী ন্যাপ নেতা), ৩৪৮
 দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ২৩৭
 তুররানী, পাক মেজর, ১১৩-১৪
 তুররানী, সরদার আবদুর রহিম, পাক বিগ্রেডিয়ার
 ২৩৭-৩৮, ২৬৫-৬৬
 তুলাল (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১
 তুলাল, গেরিলা (ক্রয়ক প্লাটুন), ৪৭৯-৮০
 দেওয়ান (হাবিবুল্লাহ), অধ্যাপক, ২১৭
 দেওয়ান, হাবিলদার, ২৯৯-৩০০
 দেব, ডঃ গোবিন্দচন্দ্র, প্রফেসর, ৭
 দেলওয়ার, সিপাই, ২১৩-১৪
 'দৈনিক বাংলা', ২৮, ৩৫৫, ৩৭৩-৭৪
 দৌলাহ, এম, এ, মেজর, ৬-৭
 ধ
 ধলু, ৩৪২-৪৪
 ন
 নওগাঁ-রাজশাহীর প্রতিরোধ, ৩২১
 নওয়াজ, মোহাম্মদ শাহ, সিপাই, ২০৩-২০৪

নওয়াজেশ, পাক জেনারেল, ৩৩
 নওয়াজেশউদ্দীন, ক্যাপ্টেন, ২৮১-৮৩, ২৮৭-
 ৮৯, ২৯৯, ৩৯৭-৯৮
 নওয়াবগঞ্জের প্রতিরোধ, ৩২৬-২৭
 নকভী, পাক ক্যাপ্টেন, ১৮৪, ১৯১-৯২, ১৯৫-৯৬
 নক্সালপহী, ৯৬, ৯৯, ১২৯-৩০
 নজরুল, সুবেদার, ১৪৩-৪৪
 নবীদ, পাক ক্যাপ্টেন, ৩২১
 নমঃশূদ্র সম্প্রদায়, ৩৬৯
 নরসিংদীর প্রতিরোধ, ২৪-২৭, ২০৫-২০৬
 নসরুল্লাহ, শাহেদ (ছাত্র), ৩-৫
 নাগ বাবু, ১৪৪-৪৫
 নাগরা, ভারতীয় মেজর জেনারেল, ৪৫২-৫৩,
 ৪৫৯-৬০
 নাজিবর (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
 নাজিমউদ্দিন, প্লাটুন হাবিলদার, ৩০০-৩০১,
 ৩০২-৩০৩
 নাজিমউদ্দিন (আফসার বাহিনী), ৪৬৯-৭০
 নাজির, নসির, ক্যাপ্টেন (পাঞ্জাবী), ২৩১-৩২
 নাথের পেটুয়ার যুদ্ধ, ১৪৪-৪৫
 নান্না, ৩৪১-৪২
 নাদির (গুডা), ২৩-২৫
 নান্নু সিপাই (ইপিআর), ২০১-২০৪, ২১৫-১৬,
 ২১৭-১৮
 নাপাম বোমা, ১৪৫, ২৪১-৪২
 নাভানা ওয়ার্কশপ, ৪৮০-৮১, ৪৮৩-৮৪
 'নারায়ে তকবীর' ২০২-২০৩
 নারী বাহিনী, ২৭০
 নালুয়া চা বাগান এ্যামবুশ, ১৮৩
 নাসিম, এ, এস, এম, ক্যাপ্টেন, ১৩৪-৩৫, ১৪০,
 ১৭২, ১৭৬, ১৮০, ১৮৪, ১৯৪-৯৫, ১৯৮-২০০,
 ২০৪-২০৫, ২০৬, ২১৪-১৫
 নাসিরুদ্দিন, শেখ, ৪০২-৪০৩
 নাসের, প্লাটুন কমান্ডার (ইপিআর), ২০১-২০২
 নাসের, লেঃ, ৩৬৩-৬৬
 নিজামউদ্দিন, নায়েক (শহীদ), ১৮২-৮৩
 নিজামউদ্দিন, (নিজামউদ্দিন আহমদ) মেজর (৩
 য় বেঙ্গল), ২৭৯-৮০, ২৮৩-৮৫, ২৮৬-৮৭
 নিজামউদ্দিন, ও-সি (পুলিশ), ৩৩৯-৪২
 নিয়মিত বাহিনী, ১০৬, ১৮১-৮২

নিয়াজ, হাবিলদার, ২১৪-১৫
 নিয়াজী, এ, কে, লেঃ জেনারেল, ১, ৪৫৮-৬০
 নিয়ামতউল্লাহ, পাক নায়েক সুবেদার, ৩০৩
 নীলু, গেরিলা, ৪৮৩-৮৭
 নুরুজ্জামান, কাজী, মেজর (অবঃ), ১৭১, ১৭৫,
 ১৭৭-৭৮, ২২৬-২৭
 নুরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন, ১৭৬, ২১৭-১৮
 নুরুজ্জামান, মোঃ ইপিআর সৈনিক, ২৮৮-৮৯
 নুরুম্বী, ছাত্র (কাদের বাহিনী), ৪৬০-৬১, ৪৬২
 ৪৬২-৬৩
 নুরুম্বী, ৩২৮-৮৩
 নেওয়াজ, আলী, সুবেদার, ২৮১
 নেওয়াজ, (সাদেক), পাক মেজর, ১০০-১০১,
 ১২৯-৩২, ১৩৩-৩৪, ১৩৮-৩৯
 নেহাল, গেরিলা, ৪৯০-৯১
 ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ২৭০-৭১, ৩৭৫-৭৬
 নোয়াপাড়া আমবাগান, ২৬৯-৭০
 প
 পন্ডিত, তুষার (সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা),
 ৪১৬
 পনির, গেরিলা, ৪৮৮-৮৯
 পরিমল, মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ), ৩৬৪-৬৫
 প্রতিরোধ যুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ, ১৪-১৯
 প্রতিরোধ যুদ্ধে ২য় বেঙ্গল, ১৬০-১৮৪
 প্রতিরোধ যুদ্ধে যশোর, ২৬৮-৬৯
 প্রথম গেরিলা পার্টি, ২০৩-০৪
 প্রধান, বি-এস-এফ-মেজর, ৮২-৮৩
 পলাশীর আত্মকানন, ২৪৫-৪৬
 পাইওনিয়ার পার্টি, (৪ বেঙ্গল), ১১৬
 পাইকাড়, খোকন (শহীদ), ৩৪১, ৩৪৫
 ১৪-পাক ডিভিসন, ১৭২
 পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ৩
 পাঁচদোনা প্রতিরোধ, ২০৩-০৪
 পাটগ্রাম কোম্পানী (ইপিআর), ২৮৭-৮৮
 পাটোয়ারী, আলী আকবর, সুবেদার, ১০৮, ১১৭-
 ১৮, ১২৪-২৫
 পাঠান, ৪৪৫
 পাভে, ভারতীয় বিগ্রেডিয়ার, ১০৩-১০৪, ২২৬-
 ২৭
 ১৩-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৮
 ১৮-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ১৬৫, ১৯৩

২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৩২৪-২৫, ৩৩৩-৩৪
 ৩১-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৯৯, ১০০, ১২৯, ১৩৩
 ১৩৪-১৩৫, ১৭৭-৭৮, ২৩১-৩৩, ৪১৫-১৬
 ৩২-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ২-৩, ১৬৫, ১৮৩-৮৪,
 ২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৩২৪-২৫, ৩৩৩-৩৪
 ১৯৪
 ৩৩-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৪৯০-৯১
 প্রাক্তন সৈনিক, ১৫৬-৫৭
 পাল, নারায়নচন্দ্র (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭,
 ৪৬৮, ৪৭০-৭১
 পুলিশ, ৬, ৭, ৮, ৩১-৩২, ৩৫-৩৬, ৩৯, ৪৭-
 ৪৮, ৭৪, ৮৩, ৮৬, ৯২-৯৩, ১৩০-৩১, ১৭১,
 ১৭২-৭৩, ১৭৬, ২৩৭, ২৬১, ২৬৩-৬৪, ২৬৯-
 ৭০, ২৮১-৮২, ৩২৩-২৫, ৩৪৮, ৩৫৪, ৩৬২,
 ৩৭৬-৭৭, ৩৮৪-৮৫
 পুলু, গেরিলা, ৪৭৯, ৪৮০-৮১, ৪৮৫-৮৭
 'দি পিপলস' (পত্রিকা), ৩, ৪-৫, ৬-৭
 পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প, ৮, ১১, ১২-১৩, ১৮
 পীরজাদা, লেঃ জেনারেল, ২
 পীযুষ (যশোর পুলিশ), ২৬৯
 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট' ৪৭-৪৮
 ফ
 ফকির, জবান আলী (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭
 ফকরুদ্দিন (ব্যাটম্যান), ৪৬
 ফকরুদ্দিন, ইপিআর সুবেদার, ৮৭
 ফজলু (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
 ফজলু (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৪৫১, ৪৬০-৬১
 ১২-ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ১০৫-১০৬, ১১১
 ১৩-ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ১৬৫
 ২২-ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ২৫৪-৫৬, ২৬৬
 ২৪-ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ৪৮-৪৯, ৫১-৫২, ৬৮,
 ১৩৩
 ২৬-ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ২৭৯-৮০, ২৮৩-৮৬, ৩০০
 -৩০১
 ফরাসী টেলিভিশন কর্পোরেশন, ২৪০-২৪১, ২৫৬
 ফরিদ, শাহ মোহাম্মদ (এস-ডি-ও, গোয়ালন্দ)
 ২৫১, ২৫৪-২৫৫, ২৫৬-৫৭
 ফরিদপুরের প্রতিরোধ, ৩৮২, ৩৮৪
 ফসিউদ্দিন, মোহাম্মদ, হাবিলদার (ইপিআর)
 ৩৩২-৩৪
 ফহমউদ্দিন (তহশিলদার), ৩৮২
 ফয়েজ, আহসান কাদির (সিগন্যাল অফিসার),
 ২৩১-৩২

ফয়েজউদ্দিন, ৪৭১-৭২
 ফাতমী, পাক লেঃ কর্নেল, ২৯-৩০, ৩৩, ৩৭-৩৮, ৩৮
 ফারুক, লেঃ, ৮৫, ৯৪-৯৫
 ফারুক, ক্যাপ্টেন (পাঠান), ৪৪-৪৫, ৪৬
 ফারুকী, পাক মেজর, ৫-৬
 ফায়েকুজ্জামান, ২৭৬-৭৭
 ফিরু, ক্যাপ্টেন, ৩৬৩
 ফিরোজ, ৩৬৩-৬৪
 ফিরোজ, গেরিলা, ৪৮৯-৯০
 ৪৪ফ্রিডম ফাইটার, ১৮১-৮২
 ৬০৪-ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিট ৩
 ১-ফিল্ড এম্বলেন্স, ২৬১
 ৩১- ফিল্ড রেজিমেন্ট, ৪, ৪-৫, ১৬৫
 ২৩- ফিল্ড রেজিমেন্ট, ২৭৯-৮০, ২৮৩-৮৪, ২৮৪-৮৫
 কেনাকাট পুলের সংঘর্ষ, ১৪৯-১৫০
 ফেনীর যুদ্ধ, ১৫৩
 ফেরদৌস, গেরিলা, ৪৮৯-৪৯০
 ব
 বকর, আবু, গেরিলা, ৪৮৩-৪৮৪
 বকুল (শহীদ), ৩৪১-৩৪২
 বগাদিয়ায় যুদ্ধ, ১৪৫-৫৬
 বগুড়ার ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ, ৩৩৬
 বঙ্গবন্ধু, ২, ৪, ৪-৫, ৮-৯, ১১, ১৪-১৫, ২৮, ৩২-৩৩, ৮৮-৮৯, ৯০-৯১, ১০০, ১০৩, ২৯০, ৪৫০
 'বঙ্গবাণী' (পত্রিকা), ৪৩৮
 বঙ্গ শার্ভুল, ১০০-১০১, ২৮৫-২৮৭, ২৯৫
 বংশাল ফাঁড়ির প্রতিরোধ, ২২
 বজলু, গেরিলা, ৪৮৯
 বজলু, ৩৪৩-৪৪
 বদি, গেরিলা, ৪৭৯, ৪৮৫-৮৭
 বদিউজ্জামান, ইপিআর নায়েক সুবেদার, ২৯৩-৯৪
 বর্মণ, লক্ষণচন্দ্র (আদিবাসী), ৪৬৪-৪৬৫
 বরুয়া, মিঃ ভাইস-প্রিন্সিপাল, সারদা পুলিশ একাডেমী, ৩২৮
 বল, লক্ষ্মীকান্ত (আওয়ামী লীগ কর্মী), ৪৭৬
 বশীর, পাক বিগ্রেডিয়ার, ৪৮৫-৮৬
 বড় কামতার যুদ্ধ, ১৪৯-১৫০, ১৫৩
 বড়ুয়া, নায়েক সুবেদার (২ বেঙ্গল), ২১২-১৪, ২১৭-১৮

বয়তুল্লাহ, এম-এন-এ, ৩২২-২৩
 বাকাইয়ের বীর জনতা, ৩৭৫
 বাকী, খোন্দকার আবদুল (কৃষক নেতা), ২১০-১১
 বাকুলিয়া গ্রাম অপারেশন, ৪৩
 বাকের, গেরিলা (শহীদ), ৪৮৬-৮৭
 বাঘা কোম্পানী, ৪৬১
 বাঘাবাড়ি প্রতিরোধ, ৩৫১-৫২, ৩৫৪-৫৬
 বাঙ্গাল, আবদুল আজিজ, ৪৬২-৬৪
 'বাংলাদেশ' (পত্রিকা), ৪১২-১৩
 বাংলাদেশ বাহিনী, ৮০-৮১, ৮৬
 বাংলাদেশ মন্ত্রীসভা, ৪১৭-১৮
 বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন(লন্ডন), ১১৫
 বাংলাদেশ জাতীয় পতাকা, ১২-১৩, ৭৩-৭৪, ১০০-১০১, ১৬৯-৬৯, ২৪৬-৪৯, ২৬৮-৬৯
 বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা, ৮-৯, ১৬৮-৬৯
 বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্রকরণ, ৩, ১৩
 বাচ্চু, নাসিরউদ্দিন, (মানিক বাহিনী), ৪৮৭-৯১, বাদল, ৩৬৩-৬৪
 বাদল, গেরিলা, ৪৭৯
 বাদশাহ, নাজির, পাক হাবিলদার, ২০১-২০২, ২১৩-২১৪
 বাপী, গেরিলা, ৪৮৪-৮৫
 'বাবর' (পাক যুদ্ধ জাহাজ), ৩১-৩২
 বারি, (ইপিআর ক্লার্ক), ২৪৯-৫০
 বারিক, আর (পুলিশ সুপার, রংপুর), ৪০১-৪০২
 বারী, সিপাহী, ৯৪-৯৫
 বারেক, মোঃ আবদুল (এম-সি-এ), ৩৫৭
 'ব্রাশ', ১৫১-৫২
 বালজিত, বি-এস-এফ ক্যাপ্টেন, ১৭১
 বালা, গৌরচন্দ্র, ৩৮২-৮৩
 বাশার, এম, কে, উইং কমান্ডার, ৯-১০, ১১
 বাশার, ক্যাপ্টেন, ৩৮
 বাশার ল্যান্স নায়েক (শহীদ), ১২, ১৩-১৪
 বাশার, আবদুল, সুবেদার, ৪৭৫-৭৬
 বাস্তিল, ২৫৭-৫৮
 বাসারতুল্লাহ, ইপিআর হাবিলদার, ৩০২-৩০৩
 বাহাদুর, খান, নায়েক সুবেদার (পাঠান), ২০১-২০২, ২১৩-১৪
 বাহার, ইপিআর হাবিলদার, ১৩-১৪
 বাহার, এম, এইচ, মেজর, ৬৮, ১৩৯

‘বি’ (ব্রাহ্ম) কোম্পানী (৪ বেঙ্গল), ১০৩-০৪,
 ১০৮, ১১৬, ১২২-২৩
 ৯২-বি-এস-এফ ব্যাটালিয়ন, ৭৮
 ‘বিচিত্রা’ ১৫২, ১৮৩-৮৪, ১৯২-৯৩
 বিবিসি, ১৮৫-৮৬, ২৪০-৪১, ৪৮৯-৯০, ৪৯০-৯১
 ‘বিরলা’ (জাহাজ), ২৬৪-৬৫
 বিগ্রেড, ১০৬
 ৫৩ বিগ্রেড, ৩২-৩৩, ৬৯, ৭৩-৭৪
 ৫৭-বিগ্রেডের, ২-৩
 ১০৭-বিগ্রেড (যশোর), ২৬৫-৬৬
 বিলু, ৩৪১-৪২
 বিশ্বাস, টিপু, ৩৩২
 বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল, ১১৫
 ব্রিৎস, ভারতীয় কর্নেল, ৩৪৭
 বুঝা, ৩৪১-৪২
 বুঝা, ৩৪১-৪২
 ‘বুলেটিন’, ৩৪২
 বেগ, পাক মেজর, ৩৪-৩৫
 বেগ, ফজলুল হক (গেরিলা), ৪৬৮
 ‘বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট’, ৪৭-৪৮
 ১-বেঙ্গল, ২-৩, ২৩৭-৩৮, ২৪৬-৪৭, ২৫০-৫১,
 ২৫৮, ২৬০-৬১, ২৬৫-৬৯, ২৭২-৭৩
 ২-বেঙ্গল, ২-৩, ২১, ১০১-০২, ১৩৪-৩৬, ১৬০,
 ১৬২, ১৬৫, ১৬৭-৬৮, ১৭০-৭১, ১৭৬, ১৭৭-
 ৭৮, ১৯৪-৯৬, ১৯৭-২০০, ২০১, ২০২-২০৩,
 ২০৬-২০৯, ২১৩-১৪, ২১৭-১৮, ২২৬-২২৮,
 ৩২৩-২৪, ৪৯১
 ৩-বেঙ্গল, ২-৩, ২৯৭-৮২, ২৮৩-৮৫, ২৮৭,
 ২৯৪, ৩০২, ২৯৪-৯৫, ৩০৪-৩০৬, ৩২৭-২৮
 ৪-বেঙ্গল, ২-৩, ৯৬-৯৭, ৯৯-১০০, ১০২, ১২৮,
 ১৩২-৩৮, ১৩৯, ১৪১-৪২, ১৪৮-৪৯, ১৯৮-
 ২০০, ২০৭-২০৯
 ৮-বেঙ্গল, ২-৩, ৩১-৩২, ৩৪-৩৫, ৪২-৪৭,
 ৪৮-৪৯, ৬৫-৬৬, ৬৭-৬৮, ৬৯-৭০, ৮৮-৯০,
 ১০৩-১০৪, ১২৯
 বেনাপোল পতাকা, ৪৩৬
 বেনু (গেরিলা যোদ্ধা, কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১,
 বেনু কোম্পানী, ৪৬১
 বেলাল, রাজা, পাক নায়ক সুবেদার, ২০১
 বেলাল, ৩৪১-৪২
 বেলুচ, ৪৪৫

৮-বেলুচ, ১৯২, ২৯৬-৯৭
 ২০-বেলুচ, ২৮-৩০, ৩২-৩৩, ৩৫-৩৬, ৪৫-৪৬,
 ৬৬-৬৮, ৭০
 ২২-বেলুচ, ১১-১২, ১৬৫
 ২৫-বেলুচ, ২০৫-২০৬, ২৬৬
 ২৭-বেলুচ, ২৩৭, ২৬১-৬২
 ৩১-বেলুচ, ১১৩-১৪, ২১৬
 ৩৯-বেলুচ, ১০৫-০৬
 বোরহানউদ্দিন, ইপিআর, সুবেদার, ২৮৭-৮৯
 বোরহানুদ্দিন (মুক্তিফৌজ কমান্ডার), ৪১৩-১৪
 ব্যানার্জী, বি-এস-এফ কর্নেল, ২৯৪, ২৯৬-৯৭,
 ২৯৮
 ব্যানার্জী, হিমাংশু (যশোর পুলিশ), ২৬৯-৭০
 ব্যারিকেড, ৪-৫, ১৪-১৫, ১৬-১৭, ৩০-৩১, ৩৪,
 ৪২-৪৩, ৪৯-৫০, ৬৭-৬৮, ৯৬-৯৭, ১০০,
 ১২৯-৩১, ১৩২-৩৩, ১৬০-১৬২, ১৬৯, ১৯৩,
 ১৯৭-৯৮, ২২১-২২, ২৫১-৫২, ২৬২, ২৯০-৯১,
 ৩০১, ৩২৩-২৪, ৩২৬-২৭, ৩৩৬-৩৮, ৩৪০-৪১
 ৩৫৮-৫৯, ৩৬১-৬২, ৩৬৮, ৩৬২-৬৩, ৩৮৪-
 ৮৫, ৪৮১-৮২
 ভ
 ভট্টাচার্য, বি, এন (বি-এস-এফ মেজর), ২৪২-
 ৪৩
 ভাতগাঁও কনফারেন্স, ২৯৫, ৩০৭
 ভিমালী, এম, কে, (বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি),
 ২৪২
 ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধা, ১৫৪
 ভুট্টো, জুলফিকার আলী, ৩
 বুঝা, হাবিলদার, ৩০০-৩০১, ৩০২-৩০৩
 ভূঁইয়া, আবদুল হক, সুবেদার, ১১২, ১১৩-১৪,
 ১২২-২৩
 ভূঁইয়া, আলী আজম, সিপাই (শহীদ), ১৮২-৮৩
 ভূঁইয়া, শহীদুল্লাহ, ইপিআর নায়ক সুবেদার
 (শহীদ), ২৮৫-৮৭
 ভূঁইয়া, রফিকউদ্দিন (আওয়ামী লীগ নেতা),
 ২১৪-২১৫, ২১৭-২১৯
 ভূঁইয়া, সুবেদ আলী, ক্যাপ্টেন, ৩৯, ৪৬-৫২,
 ১৮১-৮২, ২০৪-২০৬
 ভূঞা, ওলিউল্লাহ, সিপাহী, ২৯৩-৯৪
 ভূঞা, গুল মোহাম্মদ, সিপাহী (শহীদ), ২৯৭-৯৮

ভূঞা, মাহু, ৪৭১

ম

মইনুল, ইবিআর হাবিলদার (শহীদ), ১৩২

মইনুল (মেডিক্যাল ছাত্র), ৩৬৫-৬৬

মওলা, মেজর, ৬

মকবুল (আই বি অফিসার), ৩৩৯-৪১

মকবুল, মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ), ৪৪৭

মগ (উপজাতি), ৯৫

মজিদ, আবদুল, সুবেদার (ইপিআর), ২৯৪-৯৫,

মজিদ, কাজী আবদুল, পাক মেজর-জেনারেল, ২-৩

মজুমদার, এম, আর, বিগ্রেডিয়ার, ২-৩, ২৮-৩০

৩২-৩৫, ৪১-৪২, ১৬৪, ১৮৩-৮৪, ১৯২, ১৯৬,

৩৮৯

মজুমদার, গোলক (বি-এস-এফ কর্মকর্তা), ২৫৩

মজুমদার, প্রব (সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা)

৪১৫-১৬

মধুপুর গড়ের যুদ্ধ, ২১৮-২০

মতিন, আবদুল, ক্যাপ্টেন, ১৭২-৭৩, ১৭৬,

১৮০, ১৮১-১৮৩, ১৯৯-২০০, ২০৬-১০

মতিন, আবদুল, হাবিলদার, ১৪৭

মতিন, এম, এ, ক্যাপ্টেন (৪ বেঙ্গল), ৯৬-৯৭,

১৩৫-৩৬, ১৯৯-২০০

মতিন, ক্যাপ্টেন (চট্টগ্রাম সেক্টর), ৭৮

মঞ্জু, গেরিলা, ৪৮৮-৮৯

মঞ্জু, ৩৪১-৪২

মঞ্জুর (জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী), ১৪৪

মঞ্জুর, নুরুল ইসলাম, এম-সি-এ, ৩৫৭-৫৯

৩৬০-৬১, ৩৬২-৬৬

মন্ডল, অলি (ইউ-সি চেয়ারম্যান), ৪৪৫

মন্ডল, মহম্মদ (পাক গুপ্তচর), ৪২৪-২৫

মন্ডল, মেহের আলী (মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার),

৪১৩-৪১৪

মন্ডল, মোশাররফ হোসেন, ৩৪৩-৪৪

মনতলার পতন, ২০৪

মনসুর, কম্পাউন্ডার, ২৯৯

মনি (গেরিলা যোদ্ধা, কাদের বাহিনী), ৪৭১

মনি, শেখ, ৩৪৬-৪৭

মনিরউদ্দিন (আফসার বাহিনী), ৪৬৮-৬৯, ৪৬২

৪৬২-৬৩

মন্নান, আবদুল সিপাহী, ২৯৭-৯৮

মনোহরদী গেরিলা অপারেশন, ২০৪

মফিজ, সুবেদার, ৬৯-৭০

মফিজ, ডাঃ, ১৪৫

মফিজউদ্দীন, আর-আই, পুলিশ, ১৫-১৬, ১৮

মফিজউদ্দীন, মোহাম্মদ, সিপাহী, ২০৩-০৪

মবিন, ডাঃ, ১১৫-১১৬

মমতাজ, সিপাহী (অবাস্কালা), ২০১-০২

মমতাজ (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৪১-৪২

‘মর্নিং নিউজ’, ৪৯২

মল্লিক, অমূল্য, ৩৬৯-৭০

মল্লিক, ডাঃ এ, আর, ৪৭-৭৯

মলেটিভ ককটেল, ৩৫৮-৫৯

মহসীন, সিপাহী, ১৯৯-২০০

মহসীন, ৪৬৭-৬৮

মহাপাত্র, বি-এস-এফ ক্যাপ্টেন, ২৪৯-৫০,

২৫৩-৫৪

মহাম্মদ, পীর, পাক মেজর, ৪৪-৪৬

মহিউদ্দিন, কাজী, ৩৬২-৬৩

মহিউদ্দিন, নায়ক, (ইবিআর), ৩৫৩

মহিউদ্দিন, মীর্জা, সিপাহী, ১৫-১৬

মহু, ৪৬৩-৬৪

ময়নুল, লেঃ, ৩৬৩-৬৪

মাঝি, ৪৮৮-৮৯

মাধবপুর গ্র্যামবুশ, ১৮২-৮৩

মান্নান, পুলিশ সুপার (অবঃ), ২১

মান্নান, ডাঃ, ৪০-৪১, ৪৪-৪৫

মান্নান, আবদুল, ৭২-৭৩

মান্নান, আবদুল (গেরিলা কমান্ডার), ১১৮

মান্নান, আবদুল, লেঃ, ১৭০-৭১, ২০২-০৩,

২১৩-১৪

মান্নান, সিপাহী, ১৮০

মান্নান, সুবেদার, ২০৫

মান্নান, সিপাহী ক্লার্ক, ২১৫-১৬

মান্নান, আবদুল, এম-পি, ২১৮-১৯

মান্নান, আবদুল সিপাহী (১মে বেঙ্গল), ২৬৮-৬৯

মান্নান, আবদুল ইপিআর সুবেদার, ২৮৭-৮৮

মান্নান, আবদুল, এম-পি, ৩৪৭

মান্নান, আবদুল, হাবিলদার (ইপিআর), ৩৬১-৬২

মান্নান, মোঃ আবদুল (শহীদ), ৪৬৬-৬৭

মান্নান (কাদের বাহিনী), ৪৬৪-৬৫

মানিকছড়ির রাজা, ৯৫

মানিক বাহিনী, ৪৮৭, ৪৯১

মানিক, রেজাউল করিম (শহীদ), ৪৮৭, ৪৯০-৯১

মামুন, ৩৪৩-৪৪

মারগুব, ফ্লাইট লেঃ, ১১

মালিক, আবদুল্লাহ খান, (পাক বিগ্রেডিয়ার), ২৭৯-৮১

মালিক, পাক ক্যাপ্টেন, ২৮৫
 মালেক, নায়েক সুবেদার (ইপিআর), ২৪৩, ২৬৪
 মালেক, আবদুল নায়েক সুবেদার, ২০৭-০৯
 মালেক, আবদুল, ইপিআর নায়েক (শহীদ), ৩৩৩
 মালেক, ডাঃ এস, এ, ৩৮২-৮৩
 মালেক, ক্যাপ্টেন, ৪৯১
 মাসুদ, জাফর, এয়ার কমান্ডার, ১০
 মাসুদ (শহীদ), ৩৪২-৪৬
 ‘মাসুদনগর’, ৩৪৫-৪৬
 মাসুদ (গেরিলা যোদ্ধা, কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১
 মাসুদ এ, (চুল্লু) গেরিলা, ক্র্যাক প্লাটুন, ৪৭৯-৮১
 ৪৭৩
 মাহতাব, ৩৪১-৪২
 মাহবুব, ২৪৩-৪৪
 মাহবুব (মাহবুবুর রহমান) লেঃ, ৯৭-১০০, ১০১,
 ১০২, ১০৩-০৪, ১১৫-১৬, ১১৭-১৮, ১২২-২৪,
 ১২৬-২৭, ১২৮-৩০, ১৩৪-৩৫, ১৩৮-৩৯
 মাহবুব, গেরিলা, ৪৮৩-৮৪
 মাহমুদ, ৩৪২-৪৩
 মাহমুদ, আলতাফ, ৪৮৫-৮৬
 মায়া ক্র্যাক প্লাটুন, ৪৮২-৮৩, ৪৯১
 মিজো (উপজাতি), ৮০, ৯২-৯৫, ৪৪৫
 মিঞা, মোঃ আলকাস, ১৭৬
 মিঞা, হামদু, হাওলাদার, ৯২-৯৩
 মিন্টু, ৩৪৪-৪৫
 মিনু (গেরিলা, কাদের বাহিনী), ৪৬১-৬২
 মজিদ, ফ্লাইট লেঃ, ১১
 মিলিশিয়া (পাক পুলিশ), ১১৯-২০
 মিয়া, আবু সিপাই (শহীদ), ১৮২-৮৩
 মিয়া, আবু, ৩৪৩-৪৪
 মিয়া, আবুল ফজল (ইপিআর প্লাটুন কমান্ডার),
 ২৩০
 মিয়া, আবদুল গফুর, সিপাই (শহীদ), ১৮২-৮৩
 মিয়া, আবদুস সালাম, ৩৮২-৮৩
 মিয়া, আলকাস, মুজাহিদ (শহীদ), ১৮২-৮৩
 মিয়া, আসলাম, ল্যান্স নায়েক (শহীদ), ১৮২-৮৩
 মিয়া, আহম্মদ, ইপিআর হাবিলদার, ২১২
 মিয়া, কালা, ইপিআর সিপাই, ড্রাইভার (শহীদ),
 ২৬৭-৬৮
 মিয়া, চাঁদ, সুবেদার, ১৮৯

মিয়া, চাঁন (কোম্পানী কমান্ডার, আফসার বাহিনী),
 ৪৬৭-৬৮, ৪৬৮-৬৯, ৪৭০-৭১
 মিয়া চান (গ্রাম্য মাতবর), ৪৭৬
 মিয়া, ছমিরউদ্দিন (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭
 মিয়া, মোঃ আবদুল বারেক (আফসার বাহিনী),
 ৪৬৬-৬৭
 মিয়া, মোহাম্মদ (ইপিআর), ১৪৮-৪৯
 মিয়া, মোঃ মোসলেম (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭
 মিয়া, রঙ্গু, সিপাই (শহীদ), ১৮২-৮৩
 মিয়া, লাল (আওয়ামী লীগ নেতা), ২১৫-১৬
 মিয়া, শহীদ, হাবিলদার (৪ বেঙ্গল), ১৩২
 মিয়া, শামসু, ৩৭৫
 মিয়া, সিরাজ, ২০৪
 মিয়া, সোনা, ল্যান্স নায়েক, ২৩০-৩২
 মিয়া, হারিস, সুবেদার-মেজর (৩য় বেঙ্গল), ২৮৪-
 ৮৬
 মীর্জা, পাক মেজর, ৫-৬
 মীর্জা, কমর আলী, পাক মেজর- জেনারেল, ২
 মীর্জা, লতিফ, ৩৫১-৫৩
 মীরপুরের প্রতিরোধ, ১৯
 মৃধা, মোসলেম আলী, ৩৮২-৮৩
 ‘মুক্তিফৌজ’, ৪৭-৪৮
 মুক্তিবাহিনী, ২৬, ৩৯, ৮৬, ১৮১-৮২
 মুক্তিযুদ্ধ, ৮-৯
 মুকিদ, আবদুল (ইপিআর সুবেদার), ২৫০-৫১
 মুকিত, ইপিআর সুবেদার, ২৫৩-৫৪
 মুকুল, ৩৪২-৪৩
 মুকুল, এম, আর, আখতার, ৩৪৭
 মুখলেস, ক্যাপ্টেন, ৪৭-৪৮
 মুখার্জী, মিঃ (জেলা প্রশাসক, নদীয়া), ২৫২
 মুখার্জী, বি-এস-এফ কর্নেল, ২৮১, ৩৪৬-৪৭
 মুখার্জী, মিঃ (ভারতীয় সামরিক অফিসার), ৩৬৩-
 ৬৪
 মুখোপাধ্যায়, অজয় কুমার (মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ),
 ৩৮৭-৮৮
 মুজাফফর, ইপিআর সুবেদার, ২৫৩-৫৪
 মুজাহিদ, ২২, ৩৯, ৮৩, ৮৬, ২২১, ২৩৭, ২৪৪-
 ৪৬, ২৫৪-৫৫, ২৫৯-৬০, ২৬৪, ২৬৪-৬৮,
 ২৬৯-৭০
 মুজিবনগর, ৪৬-৪৭, ৮০-৮১, ৮৬, ৪১৬-১৭

মুন্তালিব, সুবেদার, ৯৩-৯৫
 মুন্তালিব, আবদুল, ক্যাপ্টেন, ২২৬, ২৩১-৩২
 মুন্সী, আফতাবউদ্দিন (গ্রাম চেয়ারম্যান), ৩৭১
 মুন্সী, জহিরউদ্দিন, সুবেদার (শহীদ), ১৩
 মুনির, হাবিলদার, ১০৭
 মুনির, গেরিলা, ৪৮৯-৯০
 মুস্তাফিজ (বাবু), ৩৪০-৪১
 মুস্তাফিজ, ছুনু (শহীদ), ৩৪১-৪২
 মুসলিমউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ৫৯
 মুসলিম লীগ, ২২৬-২৭, ৩৬৬, ৪১৬, ৪৩০, ৪৩৮-৩৯, ৪৪৫
 মুসা, সুবেদার, ৬৮
 মুসা, টি, এম (পেস্টা), ৩৪১-৪২
 মুসা, নাসিরউদ্দিন (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
 মুসা (গেরিলা, কাদের বাহিনী), ৪৬০-৬১, ৪৬৩-৬৪
 মেহের, কামাল, পাক-মেজর, ৩৪
 'মেজর', ৪৭৬-৭৭
 'ম্যানগ্রো' (পাক ডুবোজাহাজ), ৩৯৮-৯৯
 মোখলেস, লেঃ (৩য় বেঙ্গল), ২৭৯-৮১
 মোগলহাট কোম্পানী (ইপিআর), ২৮৭-৮৮
 মোদাকের, মোহাম্মদ, ৪৬০-৬১
 মোতালেব, আবদুল (শ্রমিক নেতা), ১৬১, ১৬৮-৬৯, ৪৭৫, ৭৬
 মোতালেব, আবদুল, হাবিলদার, ৪৬৯-৭০
 মোতালেব, মোঃ আবদুল (আফসার বাহিনী), ৪৬৮-৬৯
 মোবিন, পাক সুবেদার, ৬৩-৬৫
 মোমতাজউদ্দিন (আফসার বাহিনী), ৪৭১-৭৪
 মোরশেদ, গোলাম, হেলাল, লেঃ ১০০-১০১, ১৭২, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১-৮৪, ১৮৯, ১৯৬-৯৯, ২০৪-০৫
 মোরশেদ, হেদায়েত হোসাইন (সাংবাদিক), ৪৫০-৫১, ৪৮৭
 মোল্লা, আবদুল মজিদ ইপিআর সুবেদার, ২৬৩-৩৮, ৩৩১-৩২
 মোল্লা, আবদুল লতিফ, সুবেদার মেজর (ইপিআর), ৩৩২
 মোল্লা, আবদুল হামিদ (শহীদ), ৩৮২
 মোল্লা, আফসারউদ্দিন (মুসলিম লীগ নেতা), ২৭৫-৭৬
 মোল্লা, জহরউদ্দীন, কৃষক (শহীদ), ৩৭৪-৭৫

মোল্লা, মোবারক (শহীদ), ৩৭৪-৭৫
 মোল্লা, রহিসউদ্দিন, সিপাহি (শহীদ), ১৮০-৮১
 মোল্লা, শামসুউদ্দিন, ৩৮২-৮৩
 মোল্লা, শামসুউদ্দিন (এম-এন-এ), ৩৮৪
 মোশাররফ, খালেদ মেজর, ২-৩, ১১, ৪০-৪১, ৯৬-১২৮, ১২৯-৩৩, ১৩৩-৩৯, ১৪০-৪১, ১৪২, ১৪৬-৪৭, ১৪৮, ১৭৩-৭৫, ১৮০, ১৯৮-২০০, ২২২-২৩, ৩৯৮-৪০১, ৪১২, ৪৭৮-৭৯, ৪৮৩-৮৪, ৪৮৮-৮৯, ৪৯১
 মোশাররফ, মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ), ৩৬৪-৬৫
 মোস্তফা, সিপাই, ২০১-০৪
 মোস্তফা (ম্যানেজার, চা-বাগান), ২২১-২২৩
 মোসলেম, ইপিআর সুবেদার, ৩০২-০৩
 মোসলেহউদ্দিন, কাজী, হাওয়ালদার (শহীদ), ১৭৭-৭৮
 মোহাম্মদ, তাজ, পাক কর্নেল, ২-৩, ৮
 মোহাম্মদ, দোস্ত, হাবিলদার (৩১ পাঞ্জাব), ২৩১-৩২
 মোহাম্মদ, নূর (আওয়ামী লীগ কর্মী), ১৪৬-৪৭
 মোহাম্মদ, নূর, হাবিলদার, ১৪৫-৪৭
 মোহাম্মদ, নূর, নায়ক সুবেদার (ইপিআর), ২৮৭-৮৮
 মোহাম্মদ, দীন, হাবিলদার (ইপিআর), ২৯৩-৯৪
 মোহাম্মদ, নূর, হাবিলদার, ২৯৩-৯৪
 মোহাম্মদ, নূর, ক্যাপ্টেন, ৪৭৭
 মোহসীনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ৩২-৩৫, ৩৮, ৪০-৪১
 মোহসীন, মোহাম্মদ, সিপাই (শহীদ), ১৭৮-৭৯, ১৮০-৮১
 মোয়াজ্জেম, নায়ক সুবেদার (ইপিআর), ৩০৩
 য
 যশোর-গোপালগঞ্জ প্রতিরোধ যুদ্ধ, ২৬৩-৬৬
 যশোর সেনানিবাসের ঘটনা, ২৬৫-৬৬
 যাত্রাবাড়ি প্রতিরোধ, ২০৩-০৪
 'যুগান্তর' (পত্রিকা), ২৫২, ৩৮৬-৮৭, ৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫-৯৬, ৩৯৮, ৪০৪, ৪১৫-১৭, ৪১৮-১৯, ৪২১-২৩, ৪২৪-২৫, ৪২৬, ৪২৮-২৯, ৪৩০-৩২, ৪৩৫-৩৬, ৪৪০-৪২, ৪৪৫, ৪৪৬-৪৭
 যুদ্ধ পরিকল্পনা, ১০৬
 যুবক, ১০৬, ৩৫৭-৫৯
 যৌথ কমান্ড (দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও), ২৯৪-৯৫

র
 রউফ, আবদুর, এম-সি-এ, ২৯৮
 রকিব, এম, ৩৭৪-৭৫
 রকিব (রকিবউদ্দিন আহমদ), মহকুমা প্রশাসক,
 ১০১, ১৩৮-৩৯
 রকিব, কাজী, আবদুর, লেঃ কর্নেল, ২-৩, ১৫২,
 ১৬৪-১৭০, ১৮৩-৯৭
 'রকেট' (স্টীমার), ২৬৪-৬৫, ২৭৭-৭৮, ৪৩১-৩২
 রঞ্জু (ছাত্র), ৪৬০-৬১
 'রণাঙ্গন' (কাদের বাহিনীর মুখপাত্র), ৪৫১-৫২
 রফিব, ক্যাপ্টেন, ১২
 রফিব, সেকেন্ড লেঃ (৩য় বেঙ্গল), ২৭৯, ২৮৫
 রব, আবদুর, কর্নেল, ১০১, ১০৩, ১৭৫, ২২১-২৪,
 ২২৬
 রব, আবদুর, ক্যাপ্টেন, ২২৭-২৯, ২৩৩
 রব (আবদুর রউফ) নায়ক (১ম বেঙ্গল), ২৬৫-৬৬,
 ২৭২-৭৮
 রব, আবদুর, সুবেদার-মেজর (ইপিআর), ২৯৫,
 ৩০৫-০৬, ৩০৯-৬২
 রব, মুন্সী আবদুর, ল্যান্স নায়ক (৮ বেঙ্গল), ৯৩-৯৪
 রশিদ, মেজর (এ্যাডজুট্যান্ট, ক্যাডেট কলেজ, সারদা)
 ৩২৩-২৪, ৩২৪-২৫, ৩২৮-২৯
 রশিদ, আবু আহমেদ আফজাল, ৩৯৩
 রশীদ, আবদুর এম-সি, ৪০
 রশীদ (কাদের বাহিনী), ৩৯০-৯১
 রশীদ (গুডা), ৩৪৩-৪৪
 রশীদ, বাদল (ব্যারিস্টার), ২৩৯-৪০
 রশীদ, হারুন (হারুন), লেঃ ১০০-১০১, ১০৯-
 ১১০, ১১০-১১, ১১২, ১২৯-৩০, ১৩১-৩২, ১৩৪-
 ৩৫, ১৩৮-৩৯, ১৪১-৪২
 রসুল, গোলাম, পাক ক্যাপ্টেন, ২৩২
 রসুল গোলাম, ৩৪২-৪৩
 রহমতুল্লাহ, সুবেদার (৩য় বেঙ্গল), ২৮৯-৮১
 রহমতুল্লাহ, সুবেদার (ইপিআর), ২৮৬-৮৭
 রহমান, সুবেদার, ৩৭
 রহমান, পুলিশ সুপার, ৩৯
 রহমান, ক্যাপ্টেন, ৩৬৩-৬৪
 রহমান, আজাদুর, ছাত্র (শহীদ), ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪২

রহমান, আজিজুর, ক্যাপ্টেন (২ বেঙ্গল), ১৭১, ১৭২,
 ১৭৬, ১৮০-৮১, ১৮৪, ১৮৬-৮৯, ২৮৯-৯২, ১৯৩,
 ১৯৪-৯৫, ১৯৭, ১৯৯-২০০, ২২৫-২৭
 রহমান, আজিজুর (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩২৮
 রহমান, আতাউর, হাবিলদার (পুলিশ), ১৮
 রহমান, আতাউর, (ঠাকুরগাঁও বিমান বন্দর কর্মকর্তা)
 ২৯৪
 রহমান, আনিসুর (ছাত্র), ১৮২-৮৩
 রহমান, আনিসুর, সিপাই, ২০৩-০৪, ২১৩-১৪
 রহমান, আবদুর, ৩৪৩-৪৪
 রহমান, আবদুর, এম-সি-এ, ৩৫৩-৫৫
 রহমান, (আবদুর) এম-সি-এ, ৩৫৯-৬০
 রহমান, আবদুর, সুবেদার, ১০৯
 রহমান, আবদুর ডাঃ, ১৭২
 রহমান, আবদুর, ল্যান্স নায়ক (শহীদ), ১৭৭-৭৮
 রহমান, আবদুর, এম-সি-এ, ৩৩১-৩২
 রহমান, কে, এম, ওবায়দুর, এম-এন-এ, ৩৮২-৮৩,
 ৩৮৪, ৪৭৫-৭৬
 রহমান, খলিলুর, সুবেদার (পুলিশ), ১৮
 রহমান, খলিলুর (প্রাক্তন নৌ সেনা), ৪৬৪-৬৫
 রহমান, কাজী খলিলুর, ৩৮২-৮৩
 রহমান, জিল্লুর (অয়ারলেস কর্মী), ৪৬৩-৬৪
 রহমান, ডাঃ জাহিদুর, এম-পি, ৪৭৪, ৩৩৯-৪০,
 ৩৪২, ৩৪২-৪৩, ৩৪৫-৪৭
 রহমান, জিয়াউর, মেজর, ৮-৯, ১০, ১১, ২৮-৩৩,
 ৩৯, ৪০-৪৪, ৪৬-৪৭, ৬৫-৬৬, ৬৭-৬৮, ৬৯-৭০,
 ৭২-৭৩, ৭৯-৮০, ৮৮-৯১, ৯২-৯৩, ৯৫, ১০৩-
 ০৪, ১৪৩-৪৪, ১৫৩-৫৪, ১৬৮-৬৯, ১৭২, ১৭৫,
 ১৯৮-২০০, ২৬৫-৬৭, ৩০৩, ৩২১-২২, ৩৪৩-৪৪,
 ৩৮৪-৮৫, ৩৯০-৯২, ৩৯৮-৯৯, ৪০০-০১, ৪১২,
 ৪১৪-১৫, ৪২১-২২, ৪২২-২৩, ৪৭৫
 রহমান, নাজিবুর, সুবেদার (ইপিআর), ২৩০-৩১
 রহমান, ফজলার, ৩৪২
 রহমান, ফজলুর (ক্যাপ্টেন), ৪৬০-৬১
 রহমান, ফিরোজার, ৩৮২-৮৩
 রহমান, মজিবুর সুবেদার (ইপিআর), ২৩০
 রহমান, মজিবুর, ইপিআর হাবিলদার (শহীদ), ২৩০
 ২৫৩-৫৪, ২৬১
 রহমান, মজিবুর, হাবিলদার-মেজর (ইপিআর),
 ২১৪-১৫, ২৪৯
 রহমান, রহমান, মজিবুর, এম-পি, ৩৪৭

- রহমান, মজিবর, ৩৪৩-৪৪
 রহমান, মজিবুর (আফসার বাহিনী), ৪৬৯-৭০
 রহমান, মতিউর, মেজর, ১৪০, ১৭২, ১৭৬, ১৮৩, ১৯৮-৯৯, ১৯৯-২০০, ২০৩-০৪, ২০৫-১০, ২১৪-১৬, ২১৬-১৭, ২১৮-১৯
 রহমান, মতিউর, অধ্যক্ষ, ২১৭
 রহমান, মতিউর, লেঃ (আগরতলা মামলার আসামী) এম-পি, ২৬৪
 রহমান, মতিউর, নায়েক সুবেদার (ইপিআর), ২৯০-৯১, ২৯২-৯৩, ২৯৮, ৩০৪
 রহমান, খোন্দকার মতিউর, সুবেদার (ইপিআর), ৩২৯-৩২
 রহমান, মতিউর, ক্যাপ্টেন, ৪২৯
 রহমান, মতিউর (কাদের বাহিনী), ৪৬১
 রহমান, মাহফুজুর, লেঃ, ৪১-৪২, ৪৪-৪৫, ৫১-৫৮, ৯২-৯৫
 রহমান, মিজানুর (মিল ম্যানেজার), ১৭৬, ২১৫-১৬
 রহমান, মুখলেসুর, সিপাহী, ১৫-১৬
 রহমান, শেখ মজিবর, ২, ৪, ৪-৫, ৮-৯, ১৩, ১৪-১৫, ২৮, ৩২-৩৩, ৪০-৪১, ৫৯, ৮০-৮১, ৮৮-৮৯, ২৫৩, ৩২৯-৩০, ৩৩৬-৩৭, ৩৪২, ৩৪৩-৪৪, ৩৪৬-৪৭, ৩৫৪, ৩৮২, ৩৮৬-৮৭, ৩৯০-৯২, ৩৯৩, ৪০২-০৩, ৪০৬-০৭, ৪১৩-১৪, ৪১৭-১৮, ৪২১-২২, ৪৩১-৩২, ৪৪৫, ৪৪৬-৪৭, ৪৫০-৫১, ৪৫২-৫৩
 রহমান, মুজিবর, কোয়াটার গার্ড কমান্ডার (ইপিআর) ৩২৯-৩০
 রহমান, মুজিবর (অয়ারলেস কর্মী), ৪৬৩-৬৪
 রহমান, মুজিবর, ল্যান্স নায়েক (১ম বেঙ্গল), ৩৩৭-৩৮
 রহমান, মুস্তাফিজুর, ফ্লাইট লেঃ, ৪-৭, ৮-১০
 রহমান, মুস্তাফিজুর, ক্যাপ্টেন, ২৪৬-৪৭, ২৬০-৬১
 রহমান, মুস্তাফিজুর, (পটল), ৩৪৪-৪৫
 রহমান, মোখলেসুর (মোজাফফর ন্যাপ) ৩৪২-৪৩
 রহমান, মোখলেসুর, ৩৮২-৮৩
 রহমান, রেজাউর, মেজর, ৩৮-৩৯
 রহমান, রেজাউর (ডিঙ্গু) ছাত্র ইউনিয়ন নেতা, ৩৪০-৪১
 রহমান, লাবিবুর, ৪৬০-৬১
 রহমান, লুৎফর, নায়েক সুবেদার, ৩৭-৩৮, ৪০, ১৪৩-৪৭, ১৫৫, ১৫৬-৫৮
 রহমান, সাইদুর, সিপাহী, ২০৩-০৪
 রহমান, সিদ্দিকুর, হাবিলদার (ইপিআর), ৩৩২-৩৩
 রহমান, সৈয়দুর, হাবিলদার-মেজর (পাঠান), ৩২৯-৩০
 রহমান, হাফিজুর, আর-ও (পুলিশ), ১৮
 রহমান, হাফিজ আবদুর, সিপাহী (শহীদ), ২৯৭-৯৮
 রহমান, মোঃ হাফিজুর (আফসার বাহিনী), ৪৬৯-৭০, ৪৭৩-৭৪, ৪৭৪
 রহমান, হাবিবুর (এম-পি), ৩৪১
 রহমান, ডাঃ হাবিবুর, ৩৪৩-৪৪
 রহমান, হাবিবুর (ডি-সি, বরিশাল), ৩৬২-৬৩
 রহমান, হাবিবুর (প্রাক্তন নৌ সেনা), ৩৮৪-৮৫
 রহমান, হাবিবুর (কাদের বাহিনী), ৪৬১
 রহমান, হাবিবুর (দালাল), ৪৬৭-৬৮
 রহিম, জিল্লুর, ৪৭৮-৭৯
 রংপুরের প্রতিরোধ, ২৮১-৮২, ২৮৭-৮৮
 রংপুরের গেরিলা কোডসমূহ, ৪৯৪
 রাও, ক্যাপ্টেন (বি-এস-এফ), ২৩০-৩১
 রাজশাহীর যুদ্ধ, ৩২৫-২৭
 রাজা, খাদেম হোসেন, পাক মেজর জেনারেল, ১, ২৯-৩০, ৩৩
 রাজা, সালাউদ্দিন মোঃ কর্নেল, ১৬৮, ১৭৫, ১৭৮-৭৯
 রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, ৭-৮, ১৪-১৫, ১৮
 রাজ্জাক, আবদুর (অয়ারলেস কর্মী), ৩৯১-৯২
 রাজ্জাক, আবদুর (ছাত্রলীগ), ৪৬৪-৬৫
 রাজ্জাক, মোঃ আবদুর, (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭
 রাজিউল্লা, ৩৪১-৪২
 রাজ্যেশ্বর, ডাঃ, ৪৭৭
 রানা, পাক মেজর, ৮-১০
 রানার, ১৭৮-৭৯
 রায়, দ্বিজেন্দ্র লাল, ৩৭৬-৭৭
 রায়, সিদ্ধার্থ শংকর, ২১৮-১৯
 রায়, রাজা ত্রিদিব, ৯৩, ৯৫
 রাংগাজান (বি-এস-এফ কর্নেল), ২১৮-১৯
 রিজভী, পাক ক্যাপ্টেন, ৪২৪-২৫
 রিয়াজ, মোহাম্মদ, পাক ক্যাপ্টেন, ১৮৪, ১৮৫-৮৭, ১৯১-৯২

রহমান, মজিবর, ৩৪৩-৪৪
 রিয়াজউদ্দিন (আনসার কমান্ডার), ২৮৮-৮৯
 'রেকি', ৪৭৮-৭৯
 রেজা, ফ্লাইট লেঃ (অবঃ), ১১
 রেজা, পাক ক্যাপ্টেন, ৩২৪-২৫
 রেজা (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
 রেডিও (ছাত্র), ৩৪২-৪৩
 রেঞ্জার্স, ৩৯৬-৯৭
 রেশমা (মেডিক্যাল ছাত্রী), ১১৫
 রোকেয়া হল, ৭
 ল
 লতিফ, আসজাদ, পাক মেজর, ১৮৪-৮৫, ১৮৯-৯০
 লতিফ, আবদুল (কম্যুনিষ্ট পার্টি), ৩৪২-৪৩
 লতিফ, (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১, ৪৬২
 ৪৩-লাইট এ্যান্টি এয়ার ক্রাফট রেজিমেন্ট, ১৬৫
 লাকসামের যুদ্ধ, ১৪৪
 লালটু (কমান্ডার), ৪৬০-৬১
 লিমাইয়া, লেঃ কর্নেল (বি-এস-এফ), ২২৬
 লিয়াকত, ৩৪৩-৪৪
 লুলু, ১১৫
 লুৎফর, নায়ক সুবেদার, ৩৭
 লোকমান, কাদের বাহিনী, ৪৬০-৬১
 লোহানী, কামাল, ৪৮৮-৮৯
 শ
 শওকত, লেঃ, ৮৫, ৯৪-৯৫
 শওকত, ক্যাপ্টেন (তয় বেঙ্গল), ৩৩১-৩২
 শওকত, লেঃ কর্নেল (বেলুচ), ৩২৬
 শফি (ইপিআর গার্ড কমান্ডার), ২১৭
 শফি (ইকবাল পাক বিগ্রেডিয়ার), ৬৯, ৭০, ৯৬-৯৭, ১৩৩
 শফিউদ্দিন, মোঃ, ১৭৬
 শফিউল্লাহ, কে, এম, মেজর, ২-৩, ১০১-১০৪, ১০৬, ১৩৫-১৩৬, ১৪০, ১৬০-৮৪, ১৮৪-৮৯, ১৯০-৯১, ১৯২-৯৬, ১৯৭-২০০, ২০৩-০৪, ২১৪-১৫, ২১৭-১৯, ২২৫-২৬, ৩২৪, ৩৯৮-৯৯, ৪০০-০১, ৪১২, ৪৭৫-৭৬, ৪৯২
 শমিক, ২-৩, ৪৯, ৯০-৯১, ১৬০-৬১, ৩৩৬, ৩৬২, ৩৭৪-৭৫, ৩৭৬, ৩৮০-৮২, ৪২১
 শমিক লীগ, ৩৫৪
 শরাফত, ইপিআর হাবিলদার (শহীদ), ২৩০

রহমান, সাইদুর, সিপাই, ২০৩-০৪
 শরিফ, পাক লেঃ কর্নেল, ৯-১০
 শহীদ (শহিদুল ইসলাম), ক্যাপ্টেন, ১৩৮-৩৯
 শহীদ, আনোয়ারুল আলম, ৪৬০-৬২, ৪৬৩-৬৪
 শহীদুল্লাহ, এম-পি, ২১৭-১৮
 শহীদুল্লাহ, নায়ক সুবেদার, ২৮১
 শাকিল, পাক ক্যাপ্টেন, ২৩৭
 শামস, কর্নেল, পাক সেক্টর কমান্ডার, ৩৭৭-৭৮
 শামসু মিয়া (এম, শামসুল হক), এম-সি-এ, ৩৫৭
 শামসু (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১, ৪৬২-৬৩
 শামসুদ্দীন (মেডিক্যাল ছাত্র), ১১৫
 শাহ, আতাউল্লাহ, পাক লেঃ, ২৩৭, ২৩৮-৩৯, ২৪১-৪২, ২৪৯-৫০, ২৫৫-৫৬
 শাহ, নজর হুসেন, পাক মেজর জেনারেল, ২
 শাহজাহান, পুলিশ সুপার, ১৫-১৬
 শাহজাহান, সিপাহী (শহীদ), ১৮০
 শাহজাহান, সিপাহী, ১৪৫-৪৬
 শাহজাহান, ডাঃ মোহাম্মদ, ৩৬৪-৬৬
 শাহজাহান (কাদের বাহিনী), ৪৫০
 শাহজাদপুরের প্রতিরোধ, ৩৫১-৫২
 শিকদার, আবু তালেব, নায়ক সুবেদার, ৩০৬-০৭
 শিগরী, হামিদ হোসেন, পাক কর্নেল, ২৯-৩০, ৩১-৩২, ৩৫-৩৭
 শিক্ষক, ৬-৭
 শুকুর, আবদুস, ইপিআর সুবেদার, ৩০০-০১, ৩০২-০৩
 শুভপুর, সেতুর যুদ্ধ, ৮৭-৮৮
 শেখ, আবদুল আজিজ, পাক লেঃ কর্নেল, ৬৩
 শের, বাহাদুর, পাক মেজর-জেনারেল, ২
 শোয়েব, পাক মেজর, ২১৬, ২৩৮-৩৯, ২৫৫-৫৬
 য
 ষোড়শ ডিভিশন, ৩২-৩৩
 স
 সদরউদ্দিন, প্রিন্স, ৪৭৮-৭৯
 সগুম নৌবহর, ৪৯১
 সফি, নায়ক, ১৪৫-৪৭
 সফিউল্লাহ, অধ্যাপক (বিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ), ২৪৩-৪৪, ২৫১, ২৬০-৬১
 সবিতা (মেডিক্যাল ছাত্রী), ১১৫
 সবুর (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১, ৪৫৮-৫৯
 সরওয়ার, গোলাম, ডাঃ, ৩৩১-৩২

সরওয়ার (কাদের বাহিনী), ৪৬০-৬১
 সরকার, আবদুর রহমান, সিপাহী (শহীদ), ১৭৯
 সরকার, আহমদ হোসেন (আওয়ামী লীগ নেতা),
 ২৮১-৮২
 সরকার, আলী মোঃ মকিবর রহমান, সুবেদার,
 ৩২৮-৩০
 সরকার, দেবেন, ৩৬৯-৭০
 সরকার, প্রফুল্ল, ৩৬৯-৭০
 সরকার, সিদ্দিক (প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক), ৩৬৯
 সরকার, আবদুল করিম, এম-পি, ৩৬৪-৬৫
 সরকার, মোঃ আশরাফ আলী, ১৩-১৪
 সরফরাজ, পাক মেজর, ৩৫৬

সরবত, আবদুল গফুর, ৩৫৪
 সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ৭
 স্বপন, গেরিলা, ৪৭৯, ৪৮৫-৮৬
 সশস্ত্র প্রতিরোধে বরিশাল, ৩৫৭, ৩৬২, ৩৬৬,
 ৩৭৩-৭৪
 সশস্ত্র প্রতিরোধে ওয় বেঙ্গল, ২৭৯, ২৮৩-৮৪
 সাইগল (জেলা প্রশাসক, আগরতলা), ১০৩
 সাঈদ, আবু (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
 সাঈদ, ছাত্রনেতা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), ৩৫৩
 সাঈদ, গেরিলা, ৪৮৬-৮৭
 সাইফউদ্দিন (ইঞ্জিনিয়ার), ২৩৯-৪০
 'সাউথ-ওয়েস্টার্ন কমান্ড', ২৩৪-৩৫, ২৪৯-৫০
 সাঁওতাল, ৪৩৫
 স্কাউট, ৩৯৬-৯৭
 সাক্ষ, লুতফুল হাই, এম-সি-এ, ৯৬-৯৭, ১০১,
 ১০৩, ১৩৩-৩৪, ১৩৯, ১৭৬
 সাটিয়াচড়ার যুদ্ধ, ২০৯-১০
 সান্তার, ৩৪৩-৪৪
 সান্তার, আবদুস, (সিপাহী), ২০৩-৪
 সান্তার, সিপাহী (পুলিশ), ১৯
 সাদুল্লাহ, পাক কর্নেল, ১৭২
 সাদিক, মাহবুব, ৪৫০
 সাদেক, পাক ক্যাপ্টেন, ২৩৪, ২৩৫-৩৭, ২৪১-৪২,
 ২৪৯, ২৫০-৫১
 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র', ৪৬-৪৭, ৩৯৯-৪০০,
 সানু (ছাত্র), ৪৭-৪৮
 সাবু, মেসবাহউদ্দিন, গেরিলা, ৪৯০
 সামছউদ্দিন (আফসার বাহিনী), ৪৬৯-৭০

সামরিক আইন, ১৬৬-৬৭
 সামসুউদ্দিন, এস-ডি-ও, সিরাজগঞ্জ (শহীদ), ৩৩১-
 ৩২, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫১-৫৩, ৩৫৪-৫৬
 সামাদ, পাক ক্যাপ্টেন, ২৩৭
 সামাদ, খোন্দকার আবদুস, ৩০৭
 সামাদ (ছাত্রলীগ নেতা), ৩৪০-৪২, ৩৪৪-৪৫
 সামাদ, আবদুস, গেরিলা, যুদ্ধ সংগঠক, ৪৭৯-৮০,
 ৪৮০-৮৭
 সামাদ, আতাউস (সাংবাদিক), ৪৮৫-৮৬
 সামাদ, এম, এ, ৪৭৫
 সামিয়াল, খাজা, ৩৪১-৪২
 সারদার প্রতিরোধ, ৩২৮
 সালমান, পাক ক্যাপ্টেন, ৩২৪-২৫
 সালাম, ৩৪১, ৩৪৫
 সালাম, আবদুস (মুজাহিদ), ২০৪
 সালাম, মোঃ আবদুস লেঃ, ২৮১-৮৩
 সালাম, মওলানা আবদুস (চেয়ারম্যান, শান্তি কমিটি)
 ৩৬৩-৬৪
 সালাম, এম, এ, নায়েক সুবেদার, (৪ বেঙ্গল), ১৩৩
 সালাম, লেঃ (২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট), ২৭৯-৮০
 সালাম, হাবিলদার, ১২০-২৩
 সালাম, গেরিলা, ৪৮৩-৮৪
 সালাহউদ্দিন, আবু তাহের, লেঃ কর্নেল, ১-১০
 সালাহউদ্দিন, বাকু (শহীদ), ৪৬১-৪২
 সালাহউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ২৪৫-৪৭, ২৬০-৬১
 সালেক (সালেক চৌধুরী), ক্যাপ্টেন, ১১২-১৫,
 ১২২-২৩
 সাহা, ননীগোপাল, ৩৫৪
 সায়গাল, ক্যাপ্টেন, ১৩৯, ২১৫-১৬
 সাংমা, অনিলচন্দ্র, ৪৬৬-৬৭, ৪৭০-৭১
 সিকদার, সিদ্দিক (মুসলিম লীগ নেতা), ২৭৫-৭৬,
 ১৯-সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, ৮
 সিতারা বেগম, ক্যাপ্টেন, ১১৫
 সিদ্দিক, সিপাই, ৩০৪-০৫
 সিদ্দিক, আবু বকর, ৪৬৩-৬৪
 সিদ্দিক, এ, বি, নায়েক সুবেদার (১ বেঙ্গল), ২৬৬-
 ৬৭
 সিদ্দিক, এ, বি, অধ্যাপক, সারদা ক্যাডেট কলেজ
 (শহীদ), ৩২৬-২৭
 সিদ্দিক, পাক ক্যাপ্টেন, ৩৩২-৩৩

সিদ্দিকী, এম, আর, ৩৯, ৪৫-৪৬, ৫৯, ৭২-৭৩, ৯০-৯১
 সিদ্দিকী, কাদের, ১৯৭-৯৮, ২১৭-১৮, ৪৫০-৬৭
 সিদ্দিকী, কামাল (এস-ডি-ও, নড়াইল), ২৫১, ২৬৩-৬৪
 সিদ্দিকী, লতিফ, এম-পি, ২১৭-১৮
 সিনওয়ারী, পাক লেঃ কর্নেল, ৮
 সিনিয়র টাইগার, ২৩৭, ২৪৩-৪৪, ২৪৬-৪৭
 'সিপাহী বিদ্রোহ', ২৮-২৯
 সিরাজ, নায়ক, ১৪৫-৪৭
 সিরাজ, নায়ক সুবেদার, ২১৬
 সিরাজ, হাবিলদার (ইপিআর), ১১২
 সিরাজগঞ্জের প্রতিরোধ, ২৯৪-৯৫
 সিলেটের প্রতিরোধ যুদ্ধ, ২২১-৩৩
 সিনহা, ভারতীয় লেঃ কর্নেল, ১৭১
 সিং মেঘ, লেঃ কর্নেল (বি-এস-এফ), ২৪৩
 সিং, মেহের, বি-এস-এফ ক্যাপ্টেন, ৭৮
 সিং শচীন (মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা), ৭৭-৭৮
 সিং, সানত, ভারতীয় বিগ্রেডিয়ার, ৪৫২-৫৩, ৪৫৮-৬০
 সিং, কে, বি, লেঃ কর্নেল (বি-এস-এফ), ২৫০-৫১
 সিংহ, বিশ্রাম (বি-এস-এফ), ৩৬৩-৬৪
 সিংহ, কে, বি, (ভারতীয় নৌ কমান্ডার), ৩৬৩-৬৪
 সুইসাইড স্কোয়াড, ৩৭৯
 সুফিয়ান, আবু (শহীদ), ৩৪১-৪৩
 সুরদন, নমশূদ্র, মুজাহিদ (শহীদ), ১৮০-৮১
 সুলতান, নায়ক সুবেদার (২য় বেঙ্গল), ২১৭-১৮
 সুলতান, সৈয়দ আবদুস, এম-এন-এ, ১৭১, ২১৪-১৭
 স্টেশন মাস্টার, ১৭২-৭৩
 সেন, লেঃ কর্নেল (বি-এস-এফ), ৩২৫-২৬
 সেন, সত্যেন, ২২, ২৪, ১৪৯-৫০, ২০৯-১০
 সেন্টু, ৩৭৪-৭৫
 স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ২৩৭
 সেরনিয়াবাত (শহীদ), ৩৭৩-৭৪
 সোনািমুড়ির প্রতিরোধ, ১৫৭-৫৮
 সোবহান, আবদুস, নায়ক (পুলিশ), ১৯
 সোবহান, মোঃ আবদুস, আর-এস-আই, পুলিশ, ১৯-২১
 সোবহান, আবদুস, হাবিলদার (ইপিআর), ৩০২-০৩

সোবহান, আ,ন,ম, আবদুস, ৩৮২-৮৩
 সোলেমান, সিপাহী, ১৮০
 সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ৮৮-৮৯
 সোহরাওয়ার্দী (ছাত্রনেতা), ৩৯০-৯১
 সোহরাব, সৈয়দ, ৩৪১-৪২
 এম-ভি, 'সোয়াত', ২৯-৩০, ৩৪-৩৫, ৪১-৪২, ৬৭-৬৮
 হ
 হক, আজিজুল, সুবেদার (ইপিআর), ২১৩-১৪
 হক, আতাউল, ইপিআর সুবেদার (শহীদ), ২৯০-৯২, ২৯২-৯৪, ৩০২-০৩, ৩০৪-০৬
 হক, আবদুল, মুজাহিদ ক্যাপ্টেন, ১০৯
 হক, মোহাম্মদ আবদুল (পুলিশ), ২০৪
 হক, ডাঃ আসহাবুল (এম-পি), ২৩৫-৩৭, ২৩৯-৪০, ২৪২-৪৩, ২৪৫-৪৬, ২৪৬-৪৭, ২৮৭-৮৮, ৪০২-০৩
 হক, একরামুল (স্বপন), ৩৪১-৪৩
 হক, এনামুল (তপন), ৩৪১-৪২, ৩৪৩-৪৪
 হক, এমদাদুল (তরুন), ৩৩৯-৪০
 হক, গাজিউল, এ্যাডভোকেট, ৩৩১-৩২, ৩৩৯-৪৭
 হক, মোঃ জহিরুল, ৪৯২-৯৪
 হক, মোঃ জহিরুল, নায়ক (ইপিআর), ১৩-১৪
 হক, নজমুল, সুবেদার মেজর, ৪৪-৪৫
 হক, খোন্দকার নজমুল, ক্যাপ্টেন (অবঃ), ২৪৪-৪৫
 হক, নজমুল, মেজর ২৪৪-৪৫, ২৮১, ৩২১-২৪, ৩২৯-৩২, ৩৪৪-৪৫, ৩৪৬-৪৭
 হক, নজরুল, ক্যাপ্টেন, ২৯৫, ২৯৮-৩০০, ৩০২, ৩০৬, ৩০৭
 হক, নুরুল, এম-সি-এ, ৪০, ১৪৩-৪৫
 হক, নুরুল, সুবেদার, ১৮৫-১৯০, ১৯২-৯৩
 হক, নুরুল, এম-পি, ২৫০-৫১
 হক, নুরুল, জওয়ান (ইপিআর), ২৮৮
 হক, নুরুল, এম-এন-এ, ৪২২-২৩
 হক, ফজলুল, সুবেদার, ২২৫-২৬
 হক, ফজলুল, সার্জেন্ট (এম-পি), ৩৬২-৬৩
 হক, ফজলুল (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১

হক, মুজিবল, নায়ক সুবেদার, ইপিআর (শহীদ), ২৪৭-৪৯, ২৬৮-৬৯
 হক, মোজাম্মেল, সিপাহী, ১৫-১৬
 হক, মোমিনুল, সুবেদার (কমান্ডার), ২৪৮-৪৯
 হক, মোমিনুল, নায়ক সুবেদার, ৩০২-০৩
 হক, এ, কে, এম রেজাউল (রাজু), ৩৪১-৪২
 হক, শামসুল, ইপিআর নায়ক সুবেদার (শহীদ), ১৩-১৪
 হক, শামসুল, সুবেদার, ১০৫, ১০৯-১০
 হক, শামসুল, এম-পি-এ, ২১৭-১৮
 হক, শামসুল, হাবিলদার (ইপিআর), ২৩৩
 হক, শামসুল, (ডি-সি, কুষ্টিয়া), ২৩৪
 হক, শামসুল, নায়ক সুবেদার, ২৪৪-৪৫
 হক, শামসুল, ৩৮২-৮৩
 হক, শামসুল (আফসার বাহিনী), ৪৬৭-৬৮
 হক, শামসুল, সুবেদার (৪ বেঙ্গল), ১২৯
 হক, সিরাজুল, সুবেদার, ১৪৩-৪৫
 হক, হামিদুল (কাদের বাহিনী), ৪৫০, ৪৬২-৬৩
 হাই, আবদুল, ল্যান্সনায়ক (শহীদ), ১৭৯, ১৮০-৮১
 হাই, আবদুল, হাবিলদার, (১ বেঙ্গল), ২৬৮-৬৯
 হাই, আবদুল, ৩৮২-৮৩
 হাই, এস, এ, কর্নেল (১ম ফিল্ড এম্বুলেন্স) (শহীদ), ২৬১
 হাকিম, আবদুল, হাবিলদার, (ইপিআর), ২০৩-০৪
 ২১২, ২১৫-১৬
 হাকিম, আঃ সুবেদার, (ইপিআর), ২১৩-১৪, ২১৬-১৮
 হাকিম, আবদুল, নায়ক (ইপিআর), ২৯০-৯১
 হাকিম, (কাদের বাহিনী), ৪৬২-৬৩
 হাকিম, আবদুল (কাদের বাহিনী), ৪৬১
 হাকিম, (আফসার বাহিনী), ৪৭০-৭১
 হাকিম, ওয়াজেদ, সুবেদার, ৪৯০
 হান্নান, আবদুল (অধ্যাপক), ২১৭
 হানিফ, গেরিলা, ৪৮৬-৮৭
 হাফিজ, সিপাহী (পুলিশ), ১৯
 হাফিজ, সুবেদার, ২৮১
 হাফিজ, সুবেদার (ইপিআর), ২৯০-৯৩, ২৯৪-৯৮, ২৯৯, ৩০৪-০৫, ৩০৬

হাফিজ, গেরিলা যোদ্ধা (শহীদ), ৪৮১-৮২, ৪৮৪-৮৫, ৪৮৫-৮৭
 হাফিজউদ্দিন, লেঃ (১ বেঙ্গল), ২৩৭-৩৮, ২৪৩-৪৪, ২৪৫-৪৭, ২৫৮-৫৯, ২৬০-৬১, ২৬৫-৭৯, ৪২৪
 হাবিব, ৩৫৯
 হাবিব (কাদের বাহিনী), ৪৫৫-৫৬, ৪৫৮
 হাবীবুল্লাহ (আওয়ামী লীগ কর্মী), ১৬১
 হামিদ, আবদুল (ছাত্রনেতা), ২১৭-১৮
 হামিদ (কাদের বাহিনী), ৪৬৪-৬৫
 হামিদ, মোঃ মোহাম্মদ আবদুল (আওয়ামী লীগ কর্মী) ৪৬৬-৬৭
 হারিস, নায়ক সুবেদার (ইপিআর), ২১৬-১৭
 হারিস, সুবেদার মেজর (৩ বেঙ্গল), ২৭৯
 হারুন, সিপাহী, ২০১-০৪
 হারুন, (ব্যাংক অফিসার), ৩৪৩-৪৪
 হালিম, আবদুল, মেজর, ২৬৩-৬৬
 হালিম, (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১
 হালিম, আবদুল (আফসার বাহিনী), ৪৭০-৭১
 হাশমত, ক্যাপ্টেন, ২৪৩, ২৬৩-৬৪
 হাশিম, আবুল (শহীদ), ৩৬৪-৬৫
 হাশেম, আবুল (ছাত্রনেতা), ২১৭-১৯
 হাশেম, আবুল সুবেদার (ইপিআর), ২৯৩-৯৪, ২৯৮-৯৯
 হাশেম, আবুল, হাবিলদার, (১ বেঙ্গল), ২৬৬-৬৯
 হাসমত, পাক সুবেদার, ৬১-৬২
 হাসান, গুল (পাক মেজর জেনারেল), ২
 হাসান, জাহেদ (পাক কর্নেল), ৪
 হাসান (পাক বিগ্রেডিয়ার), ১২৩-২৪
 হাসান, আনিসুল (ছাত্র), ২৮১-৮৩
 হাসান, (মাহমুদুল হাসান খান), লেঃ কর্নেল, ২-৩, ১৬১-৬৪, ১৬৮, ১৮৩-৮৪, ১৯৩-৯৪, ১৯৬
 হাসান, মাহমুদুল, ক্যাপ্টেন (পাঞ্জাবী), ১৩৭-৩৮
 হাবিবুল্লাহ, হাবিলদার মেজর (ইপিআর), ২১৭-১৮
 হাসেম, ইপিআর নায়ক (শহীদ), ১৩-১৪
 হাসেম, আবুল, সুবেদার (পুলিশ), ১৮
 হায়দর, এ,টি,এম, ক্যাপ্টেন, ১০৭, ১৩৯, ৪৭৮-৭৯, ৪৮৩, ৪৮৭, ৪৯১-৯২
 হায়দার, গোলাম (পাক হাবিলদার), ২০১-০২, ৪
 ২১৩-১৪
 হায়াত (পাক ক্যাপ্টেন), ৬১-৬৪

হিটলু (শহীদ), ৩৪১-৪২
 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড', ৪০৯-১০, ৪১১-১২, ৪২০,
 ৪৩৫-৩৬, ৪৩৬-৩৭, ৪৪০, ৪৪৩-৪৪, ৪৪৬,
 ৪৪৮,
 হিরু (শহীদ), ৩৩৭, ৩৪২-৪৩
 হুদা, নজমুল, ক্যাপ্টেন, ২৬০-৬১, ৩৫৪-৫৫
 হুদা, নুরুল, ক্যাপ্টেন, ৩৫৭-৫৮, ৩৬২-৬৩,
 ৩৬৪-৬৫, ৩৬৫-৬৬
 হুমায়ুন (এম-পি), ৩৬২-৬৩
 হুমায়ুন কোম্পানী, ৪৬১
 হুসেন, এম.পি (অবঃ) মেজর, ২৯৪-৯৮, ৩০৭
 হেজাজী, পাক লেঃ কর্নেল, ৪৮৫-৮৬
 হোমায়তউদ্দিন (এ্যাডভোকেট), ৩৬২-৬৩
 হোমায়তউদ্দিন, ৩৭১-৭৫, ৩৮৫, ৪৭৫-৭৮
 হোমায়ত বাহিনী, ৪৭৫-৭৮
 হ্যান্ড গ্রেনেড, ৩৫৮-৫৯
 হোসেন, আওলাদ, ক্যাপ্টেন, ২৪৩, ২৬৩-৬৪
 হোসেন, আকবর, (পাক মেজর জেনারেল), ২
 হোসেন, আকবর, ক্যাপ্টেন, ১০৮
 হোসেন, আকমল (যশোর পুলিশ), ২৬৯
 হোসেন, আতাহার, ৩৮২-৮৩
 হোসেন, আনোয়ার, লেঃ (অবঃ), ২ বেঙ্গল, ২১-২২,
 হোসেন, আনোয়ার, লেঃ ১ম বেঙ্গল (শহীদ), ২৫৮,
 ২৬৬-৬৭
 হোসেন, মোঃ আনোয়ার, ক্যাপ্টেন, ২৭৯-৮২,
 ২৮৫-৮৭, ৩০২, ৩২৭-২৮, ৩৩১-৩২, ৩৪৫,
 ৩৫২-৫৩
 হোসেন, আনোয়ার (কাদের বাহিনী), ৪৬২
 হোসেন, আফতাব, সিপাহী (ইপিআর), ২০১-০৪
 ২১৫-১৬, ২১৭-১৮
 হোসেন, আবুল, হাবিলদার (পুলিশ), ১৮
 হোসেন, আবুল, (মুজাহিদ ক্যাপ্টেন), ৪০৬-০৭
 হোসেন, আবুল, নায়েক, ১৪৭, ১৪৮
 হোসেন, আবুল, (মুক্তিযোদ্ধা), ৩৬৩-৬৪
 হোসেন, আবুল, (সিপাহী), ২৯৯-৩০০
 হোসেন, আমজাদ (পৌরসভা কমিশনার), ৩৪৩-৪৪
 হোসেন, আমজাদ (শিক্ষক), ৪৬৪-৬৫
 হোসেন, মোঃ আমজাদ (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-
 ৬৭, ৪৬৮
 হোসেন, আলী (কাদের বাহিনী), ৪৬২
 হোসেন, আহম্মদ সুবেদার-ইপিআর, ৩০৩, ৩০৬
 হোসেন, ইমাম, গেরিলা, ৪৮৯
 হোসেন, তাসাদ্দুক (প্রিন্সিপাল), ৩৩১-৩২

হোসেন, তাহাজ্জুদ (অধ্যক্ষ), ৩৫৪
 হোসেন, দেলওয়ার, মেজর, ১১-১৩
 হোসেন, সৈয়দ নাসির, ৩৮৪
 হোসেন, নূর, নায়েক (ইপিআর), ১৩
 হোসেন, নূর ডাঃ, ৪৬
 হোসেন, ফজল (ছাত্র), ১৮১-৮২
 হোসেন, ফরহাদ, নায়েক, ২১৬-১৭
 হোসেন, ফুলে (প্রিন্সিপাল), ২৩৯-৪০
 হোসেন, বখতিয়ার, বখতু (আর্ট কলেজ ছাত্র),
 ৩৪১-৪২,
 হোসেন, বেলায়েত, (ইপিআর হাবিলদার) (শহীদ), ১৩
 হোসেন, বেলায়েত, হাবিলদার, ৪ বেঙ্গল (শহীদ),
 ১৩২,
 হোসেন, মঈনুল (চৌধুরী), মেজর, ১৬১-৬৩, ১৬৭-
 ৬৮, ১৬৯-৭০, ১৭২, ১৭৫-৭৬, ১৮৪-৮৫, ১৮৬-
 ৮৯, ১৮৯-৯০, ১৯০-৯১, ১৯৩, ১৯৪-৯৫, ২০৪-
 ০৫, ৪৭৫
 হোসেন, মনোয়ার (পাক মেজর), ৩-৬, ৯-১০
 হোসেন, মুর্তজা, সার্জেন্ট, (পুলিশ), ১৮
 হোসেন, মুনির (কাদের বাহিনী), ৪৬১
 হোসেন, মোজাফফর, ৩৫০-৫১, ৩৫৩-৫৪
 হোসেন, মোশাররফ, সিপাহী, ৪-৬
 হোসেন, মোশাররফ, ৩৮২-৮৩
 হোসেন, মোশাররফ, নায়েক সুবেদার (২ বেঙ্গল)
 ২১২-১৪
 হোসেন, মীর মোশাররফ, নায়েক সুবেদার, ৪৭৫-
 ৭৬
 হোসেন, মোঃ সিপাহী (শহীদ), ৩০২
 হোসেন, মোহাম্মদ, পাক মেজর, ২৯০, ২৯১, ৩০৪,
 ৩০৬
 হোসেন, মোয়াজ্জেম (কমান্ডার), ৩৮৪-৮৫
 হোসেন, লিয়াকত আলী, ৩৮২-৮৩
 হোসেন, লোকমান (কাদের বাহিনী), ৪৬১
 হোসেন, শরীফ আফজাল (ছাত্রনেতা), ৩৮২
 হোসেন, শাফায়েত, পাক মেজর, ২৮৯-৯০, ২৮৬-৮৭
 হোসেন, শাহাদৎ, সিপাহী (শহীদ), ১৮০-৮১
 হোসেন, শাহাদৎ (এসিস্ট্যান্ট কমিশনার, যশোর),
 ২৬৩-৬৪
 হোসেন, সরোয়ার (কাদের বাহিনী), ৪৬১
 হোসেন, সোহরাব, ৩৫১-৫২
 হোসেন, সোহরাব (শান্তি কমিটি প্রধান), ৩৬৩-৬৪
 হোসেন, হায়দার, এম-পি, ৩৮৪
 হোসেন, সৈয়দ হায়দার, ৩৮২-৮৩
 হোসেন, কাজী হেদায়েত, ৩৮২-৮৩

INDEX

- A
 Abbas, Civilian, 55-56
 Abdullh, Sub (3 Beng), 316-17, 317-18
 Abedin, Jainal, L/NK, 315-16
 Ahmed, Badsha, Sub (Behari), 312-14
 Ahmed, Mr. Faizuddin, DC, Dinajpur, 311-12, 314-15
 Ahmed, Farooqae, Lt. 56-57
 Ahmed, Mahbubuddin, 243-44
 Ahmed, Nazir, Capt., 310-11, 312-13, 313-14, 315-16
 Akbar, Mohammad, Pak Sep, 53-54
 Alam, Nabil, Capt. (Punjabi), 315-16
 Altab, Guerilla (Shaheed), 492-93
 Ali, Amir, NK/Sub, 314, 316
 Ali, Arab, Hav, 55-56
 Ali, Meer Shawkat, Maj, 52, 54-55, 56-57, 57-58
 Ali, Muslim, Hav, EPR, 310-311, 312-14
 Ali, Nabi, L/Nk, (8 Beng.) Shaheed 54-55
 Ali, Nesar, Ex-EPR (Shaheed), 318-19
 Ali, Shawkat, Lt. 56-57
 Ali, Syed Hyder, MNA, 320
 Ali, Prof. Yousuf, 311-12
 Ansar, 52-53, 229, 313-14, 314-15, 316-17, 319-20
 Anwar, Sub, (8 Beng) 57-58
 Anwar (Anwar Hossain) Capt. 3 Beng, 316-17, 319-20
 Asaf, Mohammed, Civilian, 52-53
 Asraf, Capt. (3 Beng.), 315-17
 Awal, Sepoy, 313-14
 Awami League, 52-53, 312
 Azad, Guerilla (Shaheed), 492-93
 Aziz (Azizur Rahman) Capt. 227-29
 Aziz, A, L/Nk, 313-14
 B
 Baiitullah, Mr. MNA, 320
 Bakey, Guerilla, (Shaheed), 492-93
 20-Baluch, 51-52
 'Banga Bandhu', 312
 'Bara Khana', 311-12
 Barricade, 51-52, 160-61, 162, 167-68
 BBC Team, 316-17
 Bedi, Maj, BSF, 319-20
 Bhatgaon Conference, 316
 Bodi, Guerilla (Shaheed), 492-93
 C
 Chakravarty, Barada, 312, 314-15
 Chalmers, Mr. P.J.....
 Chema, Pak Capt., 314
 Chowdhury, Gyasuddin, Maj, 327-28
 Chowdhury, Harun Ahmed, Capt. 52-55
 Chowdhury, Mr. Hannan, Dist Judge Dinajpur, 314-15
 Chowdhury, M.H, Maj. 312-16
 Chowdhury, Shamsheer Mobin, L. 52-55
 Chowdhury, Taufiq Elahi, 243-44
 Crack Platoon, 493-94
 D
 Danesh, Haji, 316
 Datta, C.R, Maj, 229
 Din, Ahmed, Pak Capt. 51-52
 Doorani, Pak Maj, 312, 314, 439-40
 E
 2 E Bengal, 167-68
 3 E Bengal, 315-16, 319-20
 8 E Bengal. 51-52, 54-55, 56-57, 172
 EBRC, 52
 EPR-3 Wing, 227-29
 "-6 " 320, 327-28
 "-7 " 319-20, 327-28
 "-8 " 309-10, 317-18
 "-9 " 314-15, 317-18
 "-17 " 52-53
 Ex-Defence Personnel, 52-53
 Evacuees, 448
 F
 Feroz, Javed, Capt (Punjabi) 311-12
 26-FF Regt. 310-12, 314
 Flag meeting, 319-20

G

Gani, Osman, Sub/Maj (EPR), 328-30, 319-20

Gofran, Mohd, N/Sub(EPR) 316-18

H

Habib, 312-13

Hafiz, Sub 316

Hafiz, Guerilla, (Shaheed), 492-93

Haider, A.T.M. Maj, 494

Hakim, Nk. 316-18

Hamza Company, 53-54

Hasem, Mr. SP, Dinajpur, 314-15

Heard, Alam, BBC Correspondant, 316-17

Hoque, Dr. Ashabul, 408-09

Hoque, Ataul, Sub, EPR (Shaheed) 310-11, 312, 315-16

Hoque, Mominul, N/Sub. (EPR) 314, 316-17

Hoque, Nazrul, Capt. 310-12, 313-14, 314-17, 318-19

Hoque, Md. Zahirul, 492-94

Hossain, Amjad, 320

Hossain, Miah, Hav, (Shaheed) 318-19

Hossain, M. T. Maj (rtd.) 316

Hossain, Moazzem, N/Sub (EPR) 310-12, 314, 316

Hossain, Mr. Shahadat (Engineer, Dinajpur), 314-15

Hossain, Zahid, N/Sub, 316

Humayune, Mohammad, 2/Lt. (Pak offr.) 52

I

Ibrahim, Mohd. N/Sub (non Benaglee), 310-11

Idrish, Lt. 320

Idrish, Hav, (EPR) 313-14, 314-15

Ishaque, Mr. (Chemical Engineer) 55-56

Ishaque, Hav. (EPR) 316-17

J

‘Jahangir’ PNS, 54-55

Jahangir, Mr. MNA, 320

Jalil, M.A. MNA, 320

Janjua, Abdur Rashid, Pak Lt. Col 51-52

K

Kalam, Lt. 314

Kalam, Hav (EPR), 313-14, 316-18

Karim, Ex-Corporal, 55-57

Kawser, N/ Sub, 316-17

Kazimuddin, Sub/Maj (EPR), 315-16, 317-18

Khairuaaman, Sub, (EPR), 55-56

Khaleque, Sub, 316

Khalequzzaman, Chowdhury

Khan, Yehya, General, 448

Kibria, Hav. 316, 317-18

L

Lohia, Sohunlal, 312, 314-15, 316

M

Mahtabuddin, Shah, MCA, 314, 316

Majid, A. Sub (EPR), 314, 316-17

Majid, Sub, 315-16

Majumder, M.R. (Brig), 55-56

Malek, Capt. 494

Manik Platoon, 493-94

Mannan, abdul L/Nk (EPR), 310-11

Mia, Loni, Sub (EPR), 56-58

Mia, Tuta (Shaheed), 319-20

Miah, Bhulu, Hav (EPR), 310-11, 313-14, 314-15

Miah, Harish, Sub/Maj (3 Beng) 316

Mohammed, Noor Sep. EPR, 52-54

Mokaddes, Mir, N/Sub (EPR), 314 316-18

Mominullah, N/Sub(EPR), 314

Mondal, Kashem, Hav/Asstt. 316-17

Mosharraf, Khaled, Maj, 492-93

Motahar, L/Nk(EPR), 310-11, 313-14

Mujaheed, 53-54, 229, 313-14, 314-15, 319-20

Murree, Mr. (football player), 55-56

Mutaleb, Abdul, Sub, 56-57

N

Nasir, Ahmed, N/Sub (3 Beng.) 316 317-18

Nazim, Hav (EPR), 310-11, 312-14, 316, 317-18

Nizam, Maj, 316, 319-20

- O
 Oli, Ahmed, Capt. 56-57
 Osmani, M.A.G. Col, 56-57, 175
 P
 Pandey, B.C. Brig, (B.S.F)173-74,229
 Peace Committee, 439-40
 Police, 52-53, 313-15
 31-Punjab, 54-55
 Q
 Quader, Abdul, Sub (8 Beng), 52
 Quader, Aftab, Capt. (shaheed)55-57
 Quader, Pak, Col. 314
 R
 Rab, A Capt. 158-61
 Rab, A Sub/Maj (EPR), 309-20
 Rab, Munshi Abdur, L/Nk (8 Beng)
 56-57
 Rahim, Abdur (Shaheed), Hav. EPR,
 313-14
 Rahman, Abdur MCA,314,316,317-18
 Rahman, Azizur, MNA, 316
 Rahman, K-52
 Rahman, Lutfur, N/Sub (EPR), 310-11
 312, 313-14, 314-15, 316, 317-18
 Rahman, Mahfuzur. Lt, 51-52
 Rahman, Matiur, N/Sub (EPR),316-18
 Rahman, Motiur, N/Sub(EPR), 228-29
 Rahman, Mustafizur, Sepoy, 310-11
 Rahman, Mustafizur, L/Nk (Shaheed)
 316-17
 Rahman, Ziaur, Maj, 52-54, 55-56
 Rauf, Mr. A, (Engineer), 314-15
 Rawshan (Ali) N/Sub EPR (Shaheed)
 316-18
 Razzaque, Sepoy, 56-57 1
 Rumi, Guerilla (Shaheed), 492-93
 S
 'S' Force, 494
 Sajjaad, Pak Capt. , 53-54
 Salauddin (Bihari), L/Nk, 54-55
 Santals, 312
 Sarkar, Sabed Ali, Sub, 53-56
 Sattar, A.L./Nk (Shaheed), 317-18
 Sayeed, Prof Abu. MNA, 320
 Shafiullah, K.M. Maj, 494
 Shafiqullah, Md. 243-44
 'Shams' (Pak Ship), 52
 Siddiqui, Quader, 494
 Siddique, Raja, (Pak Maj), 312
 Sobhan, A. Hav (EPR), 313-15
 Students, 52-53, 311-12, 314-15, 319-
 20
 Sukur, Sub (EPR), 314, 315-16
 Syeed, Khandaker, Abu, Hav. (EPR)
 310-14
 T
 Talukder, N/ Sub, 315-16
 Talukder, Gurudas, 312, 314-16
 Taly, Mark (BBC), 316-17
 Tarique, Amin, Pak Maj, 309-10
 Taymur, Mr. MPA, 327-28
 Tomalin, Nikolas, (BBC), 316-17
 V
 Volunteer Freedom Fighter, 327-28
 Y
 Youth Camp, 320
 Z
 Zaman, Mr. 311-12
 Zubairi, Pak Maj, 314